আধুনিক ভারতীয় নাটক

ড. দিলীপ কুমার মিত্র

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

শ্রীমতী পূর্ণশ্রী মিত্র-কে

● শিবকুমার জোষী স্মারক সম্মান ● উৎপল দত্ত সম্মান
● ওয়ার্ল্ড হিউম্যান সার্ভিস সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত

ড. দিলীপ কুমার মিত্র রচিত অনূদিত সম্পাদিত কয়েকটি গ্রন্থ

আধুনিক ভারতীয় নাটক
ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
আধুনিক বিশ্বনাট্য সাহিত্য
একাঙ্ক নাটকের কথা
সাঁওতালী নাটকের কথা
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভারতীয় নাটক
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
হিন্দী সাহিত্যের পঞ্চ-সাধক থিয়েটারের গল্প
নবশ্রুতি (নতুন রীতির ন'টি শ্রুতি নাটক)
নাট্যপঞ্চক (তারাশঙ্করের কাহিনীনির্ভর পাঁচটি নাটক)
জাগ্রত প্রাণ (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনাশ্রিত দুটি নাটিকা)
অনির্বাণ অগ্নি (স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কদের জীবনী নাট্য)
প্রভুর শরণ (গুরু নানকের জীবনকথা ও তাঁর ভাবনাশ্রিত নাটক)
মহাসাধন (ছটি নাটক)
দলিত নাট্যগুচ্ছ
এক গুচ্ছ শ্রুতিনাটক
বিদেশী নাটক
দুই বাংলার সেরা একাঙ্ক
কিশোর একাঙ্ক সম্ভার
শ্রুতি-নাট্য সংগ্রহ (১ম ও ২য়)
সেরা শ্রুতি নাটক (১ম ও ২য়)
সেরা শ্রুতি সম্ভার
আন্তর্জাতিক শ্রুতিনাট্য সংগ্রহ
শ্রুতিনাট্যগুচ্ছ (রবীন্দ্র কথা ও কল্পনা নির্ভর)
কবি ও নারী (জীবনানন্দ ভাবনাকেন্দ্রিক কটি শ্রুত সংলাপ)
কালো কবিতা সংকলন
অট্টহাসির নাটক (তিনটি কালজয়ী হাসির নাটক সংকলন)
অরূপ নগরী কলকাতা
রুদ্র আলোকে এসো (স্বামীজী বিষয়ক রচনা সংকলন)
বিদেশী অলৌকিক কাহিনী
বিশ্বের নির্বাচিত রহস্য কাহিনী
সীতার বনবাস (বিদ্যাসাগর)
স্বর্ণলতা (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)
LEARNING WORDS (Dictionary in Colour for Students)

লেখকের নিবেদন

আমরা ভারতবর্ষের মানুষ বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে যতটা আগ্রহী ও ওয়াকিবহাল, দুর্ভাগাবশত ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে ততটা নই। ইওরোপ কিংবা আমেরিকায় নাটক নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে তা হয়ত আমাদের আকর্ষণ জাগায় কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে নাট্যচর্চা চলছে সে খবর আমরা ঠিকমত রাখি না। অথচ আমরা ভারতবাসী, ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি। বিশেষ করে বাংলার কথা আমাদের উল্লেখ করতেই হয়। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, এখানে নাট্যচর্চা হয় নিয়মিত। আমরা মনে করি পশ্চিম বাংলায় যেভাবে নাটকের সাধনা চলে ভারতবর্ষের অন্যত্র যেন তেমনটি হয় না। এজন্য আমরা অহংকৃত। সেই অহংকার আমার ঘা লাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে, যেখানে নাট্যচর্চা চলছে প্রবলভাবে। এবং দেখা যায় সে সব স্থানের বেশ কিছু প্রযোজনা বাংলা নাট্যপ্রযোজনার থেকে অনেকক্ষেত্রেই উন্নত। আতিশয্য ও বাহুল্য নিয়েও দিল্লী এন এস ডি-র ভারত রঙ্গ মহোৎসব অবিকল্প, সেই নাট্যোৎসবে ভারতীয় নাটক দেখা এক বিরল অভিজ্ঞতা। নতুন সহস্রাব্দের সূচনায় কেরালায় যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শেক্সপীয়র নাট্যোৎসব হয়েছে তেমন নাটক বাংলায় দেখিনি। নান্দীকার আয়োজিত নাট্যমেলাও আধুনিক ভারতবর্ষের কিছু অসামান্য প্রযোজনা দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। তথাপি দেখা গেছে অন্য প্রদেশের মানুষরা বাংলা নাটকের প্রতি যতটা শ্রদ্ধাশীল, বাংলার সাধারণ নাট্যামোদী দর্শক তাদের প্রতি ততটা নয়। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আমাদের মনোবৃত্তির সংকীর্ণতায় আমি লজ্জিত হয়েছি, আহত হয়েছি। তাই আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নাটক চর্চায়, পাঠে ও অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি বাংলায় এ বিষয়ে প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। তখন এ বিষয়ে নিজেই কাজ করতে শুরু করি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যাওয়ার সৌভাগ্যময় সুযোগ আমার প্রায়শই ঘটে; সেই সব জায়গার নাট্যকারদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের নাটক দেখেছি, সেখানকার মানুষদের সঙ্গে আলোচনাতেও উপকৃত হয়েছি। পরিশেষে আমার সাধ্য সামান্য জেনেও আধুনিক ভারতীয় নাটক বিষয়ক এই গ্রন্থরচনার দুরূহ কার্যে ব্রতী হয়েছি। পরিণাম যাই হোক, আমার আন্তরিকতায় খাদ ছিল না।

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকেই ভারতীয় নাটকে আধুনিকতার সূচনা হয়েছে। এই গ্রন্থে মূলত ১৯৩০ থেকে ভারতবর্ষের নাট্যসাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং বাংলা নাটকের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছি। প্রাজ্ঞজনের মত আমিও মনে করি যে Indian literature is one though written in different languages. প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষ একই আবেগে স্পন্দিত একই ভাবনায় মথিত হচ্ছে। নাট্যসাহিত্যের মধ্যেও তার সম্যক প্রতিফলন ঘটেছে। প্রায় একই সামাজিক রাজনৈতিক ও মননগত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে ভারতীয় নাটকে। সেই অর্থে বাংলার সঙ্গে ভারতবর্ষের মানসিকতা বিশেষত নাট্যভাবনার একটা নৈকট্য আছে—পারস্পরিক অনুবাদ অভিনয় ও ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তা নিবিড় হয়ে উঠেছে। বাংলার সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার নাটকের সম্পর্ক খোঁজার প্রয়াসও এই গ্রন্থে আছে। তবে নাটকের

ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বাংলা থেকে যতটা গ্রহণ করেছে, অন্য ভারতীয় ভাষার নাটক থেকে সেই পরিমাণ গ্রহণ করতে বাঙালীর অনীহা। তার কারণ নির্ণয় করা যায়। রেনেসাঁসের আলোকধারায় স্নাত উজ্জ্বল কলকাতা, প্রথম পর্যায়ে ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা, বিভিন্ন মহামানবের আবির্ভাব-ধন্য কলকাতার কাছে সবাই ছিল শ্রদ্ধায় আনত। তাই অন্য প্রদেশের শিল্পীরা স্রস্টারা সম্মানে মর্যাদায় এখান থেকে নিয়েছেন অনেক, আজও চলেছে নেওয়ার পালা। কিন্তু বাংলার মানুষ আজ নিঃশেষিত হয়েও আত্মতৃপ্ত, সর্জনে পূর্বমহিমাচ্যুত হলেও গ্রহণে পরাঙ্‌মুখ। যে মানসিক প্রসারতা ও ঔদার্য থাকলে, আত্তীকরণ ক্ষমতা থাকলে অন্য ভাবকে গ্রহণ করে নিজেকে আরো সমৃদ্ধ ও বিকশিত করা যায় বাংলার চেতনায় তা যেন অনেকটাই অনুপস্থিত। অবশ্য অধুনা বাংলার নাট্যরসিকরা ভারতীয় নাটকের প্রতি আগ্রহ অনুভব করছেন যদিও তার পরিমাণ স্বল্প। বাংলার নাট্যামোদী মানুষের কাছে আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার নাটকের একটা সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ পরিচয় তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি 'আধুনিক ভারতীয় নাটক' গ্রন্থে। প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের কথা। ভারতীয় নাটক নিয়ে কাজ করার অসুবিধা অনেক। ভাষাগত, তথ্যসংগ্রহগত, বিভিন্ন ভাষার নাট্যগ্রন্থ পাওয়া সম্পর্কিত, লিপ্যন্তরজনিত, শব্দের উচ্চারণগত ইত্যাদি বিবিধ সমস্যা আছে। তাই ভারতীয় নাটক নিয়ে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন বিশেষত একক প্রচেষ্টায়। এত ভাষায় এত নাটক লেখা হয়েছে যে সে সব জানা দুঃসাধ্য। কোন কোন নাটক পত্রিকায় মুদ্রিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাদের সন্ধান পাওয়া সহজ হয়নি। তাছাড়া লিপ্যন্তর এক প্রবল সমস্যা, কোন কোন ভাষার নাট্যকার ও নাটকের নাম অন্য ভাষায় প্রতিলিপিত করা যায় না ঠিকমত। বিভিন্ন ভারতীয় নাটকের বই পাওয়াও সহজসাধ্য নয়। সাধারণ শব্দের উচ্চারণও কত তফাত হয়ে যায় ভাষা থেকে ভাষান্তরে। যেমন 'জোষী' শব্দের কত বানান। বিভিন্ন বিষয় জানতে চেয়ে অনেক সময় অন্য প্রদেশের নাট্যকার ও নাট্যব্যক্তিত্বদের একাধিকবার চিঠি লিখেও উত্তর পাইনি। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কাজ করতে চেষ্টা করেছি, হয়ত পরিণামী ব্যর্থতা অনিবার্য জেনেও। বইটিতে অবশ্য ভুল ত্রুটি রয়ে গেছে অনেক। প্রাজ্ঞ পাঠক যদি সেগুলো নির্ণয় করেন তবে অনুগৃহীত হব এবং সংশোধন করব।

এবার ঋণ স্বীকারের পালা। গ্রন্থ রচনায় অনেকের কাছ থেকে নিয়েছি অনেক, যে ঋণ শোধ করতে পারব না। কিন্তু স্বীকার করে ভার মুক্ত হতে পারব। উপেক্ষা অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে কত ভালবাসাও পেয়েছি। আমাকে এই কাজে নানাভাবে প্রণিত করেছেন সুধীজন। অনন্য নট নাট্যকার নাট্যপরিচালক উৎপল দত্ত বিভিন্নভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন—তাঁর সম্পাদিত 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকার মূল্যবান পৃষ্ঠাগুলো আমার জন্যে অবারিত ছিল। পি এল টি-র নাট্যকার অভিনেতা শক্তি বিশ্বাসের কথাও ভোলার নয়। প্রয়াত বিশিষ্ট কবি মনীন্দ্র রায়ের প্রয়াসে 'অমৃত' পত্রিকায় ভারতীয় নাটক সম্পর্কিত কটা লেখা প্রকাশিত হয়। 'আজকাল' পত্রিকায় আমার লেখার ব্যাপারে কবি-প্রাবন্ধিক মুকুল গুহ ছিলেন আন্তরিক। কলকাতা দূরদর্শনে ভারতীয় নাটক বিষয়ে কয়েকবার আলোচনা করেছি—অকাল প্রয়াত বন্ধু সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কথা এ প্রসঙ্গে বেদনামথিত চিত্তে স্মরণ করি। অনুজপ্রতিম বিশিষ্ট নাট্যবিদ ড. দীপকচন্দ্র পোদ্দার আমার কাজ সম্বন্ধে সতত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর সহযোগিতায় আকাশবাণীর সৌজন্যে ভারতীয় নাটক সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ পেয়েছি অনেকবার। প্রতিভাবান নাট্যকার অমল রায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন দুরন্তভাবে; এর মধ্যেও তিনি আমাকে সহযোগিতায় আশ্চর্যভাবে

উদার অকৃপণ। নাট্যকার স্বপন দাসের আগ্রহে প্রয়াগ পত্রিকায় ক'টা লেখা মুদ্রিত হয়েছে। ভ্রাতৃপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব সলিল সরকার সহযোগিতায় আন্তরিক। শ্রীমান ধীমান ভট্টাচার্য অনেকভাবে আমার উৎপীড়ন সয়েছেন। প্রুফ দেখার বিরক্তিকর কাজে এঁরা সহযোগী হয়েছেন। ড দেবাশিস রায়চৌধুরীর বিদগ্ধ সহযোগিতাও কখনোই ভুলব না। পরমাবিদুষী ও প্রতিভা অগ্রওয়াল-এর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ও নাট্যশোধ সংস্থানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের দুর্লভ সুযোগ দিয়ে আমায় অনুগৃহীত করেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণাতেই আমি কার্যসাধনে ব্রতী হয়েছিলাম যা আজ পূর্ণতা পেয়েছে। অনেকের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছি, তাই ঋণ স্বীকার করে ঋণশোধের ব্যর্থ প্রয়াস।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভাষাভাষী সুধীজন বিভিন্ন প্রকারে আমাকে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছেন। অসমীয়া নাট্যকার মহেন্দ্র বরঠাকুর (সম্প্রতি প্রয়াত), গুজরাতী নাট্যকার শিবকুমার জোষী (অধুনা প্রয়াত), কন্নড় নাট্যকার ড চন্দ্রশেখর কম্বর ও ড এইচ এস শিবপ্রকাশ, ওড়িয়া নাট্যকার মনোরঞ্জন দাস ও কার্তিকচন্দ্র রথ, পঞ্জাবী নাট্যকার ড চরণদাস সিধু, মরাঠী অধ্যাপিকা বীণা আলাসে ও মৃণালিনী কেলকর প্রমুখ শ্রদ্ধেয় নাট্যব্যক্তিত্বদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা কখনোই বিস্মৃত হব না। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের কন্নড় বিভাগের প্রধান প্রখ্যাত লেখক জি কুমারাপ্পা, ওড়িয়া বিভাগের প্রধান ও বিশিষ্ট অভিনেতা সাফল্য কুমার নন্দীর ঋণ অপরিশোধ্য। কতবার কতভাবে যে তাঁদের বিরক্ত ও বিব্রত করেছি। তেলুগু বিভাগের প্রধান কে এস রাও, অসমীয়া বিভাগের লক্ষ্মী মুখার্জী, পঞ্জাবী বিভাগের গুরবিন্দর কৌর ও সুনীতা অরোরা, মলয়ালম বিভাগের কে মাধবন, হিন্দী বিভাগের শ্যামল গুপ্ত র কাছে আমি গভীর কৃতজ্ঞ। সত্যভামা রাঘবন এর কাছেও অনেক সাহায্য পেয়েছি। এঁদের সহৃদয় আনুকূল্য কখনো বিস্মৃত হব না।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই দে'জ পাবলিশিং এর কর্ণধার শ্রী সুধাংশুশেখর দে'কে যাঁর রুচি সৌন্দর্যবোধ ও আভিজাত্য বাংলা প্রকাশনা শিল্পকে দুর্লভ মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর সহৃদয় আনুকূল্যেই গ্রন্থটি মুদ্রিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতায় নমিত।

এত প্রয়াস ও পরিশ্রম, এত সহৃদয়তা ও সহযোগিতা সত্ত্বেও বইটি যদি পূর্ণতা না পায় সেটা আমার ব্যর্থতা। তবু আশা করব 'আধুনিক ভারতীয় নাটক' গ্রন্থটি সুধীজনের অনুমোদন লাভে সমর্থ হবে।

দিলীপ কুমার মিত্র

সূচীপত্র

আধুনিক ভারতীয় নাটক

নটসূর্য ফণী শর্মা।

অসমীয়ায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', প্রযোজনা—ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, গুয়াহাটি শাখা।

অসমীয়া নাট্যকার মহেন্দ্র বরঠাকুর ও লেখক।

হিন্দীতে 'উৎপল দত্তকে তীন নাটক' গ্রন্থের প্রচ্ছদ, অনুবাদ : সান্ত্বনা নিগম।

মোহন রাকেশ রচিত সত্যদেব দুবে পরিচালিত থিয়েটার ইউনিট মুম্বাই প্রযোজিত হিন্দী 'আধে অধুরে' নাটকে অমরীশ পুরী, সুনীলা প্রধান ও চিত্রা পালেকর।

সঙ্গীত কলা মন্দির প্রযোজিত কুমার রায় পরিচালতি হিন্দীতে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে উমা মেহতা ও প্রতাপ জয়সওয়াল।

হিন্দীতে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ', প্রযোজনা—সংস্কৃতি সাগর, কলকাতা, পরিচালনা—শ্যামানন্দ জালান।

কোমল স্বামীনাথন রচিত স্টেজ ফ্রেন্ডস প্রযোজিত
তামিল 'তান্নীর তান্নীর' নাটকের একটি দৃশ্য।

তামিল নাট্যকার কোমল স্বামীনাথন ও লেখক।
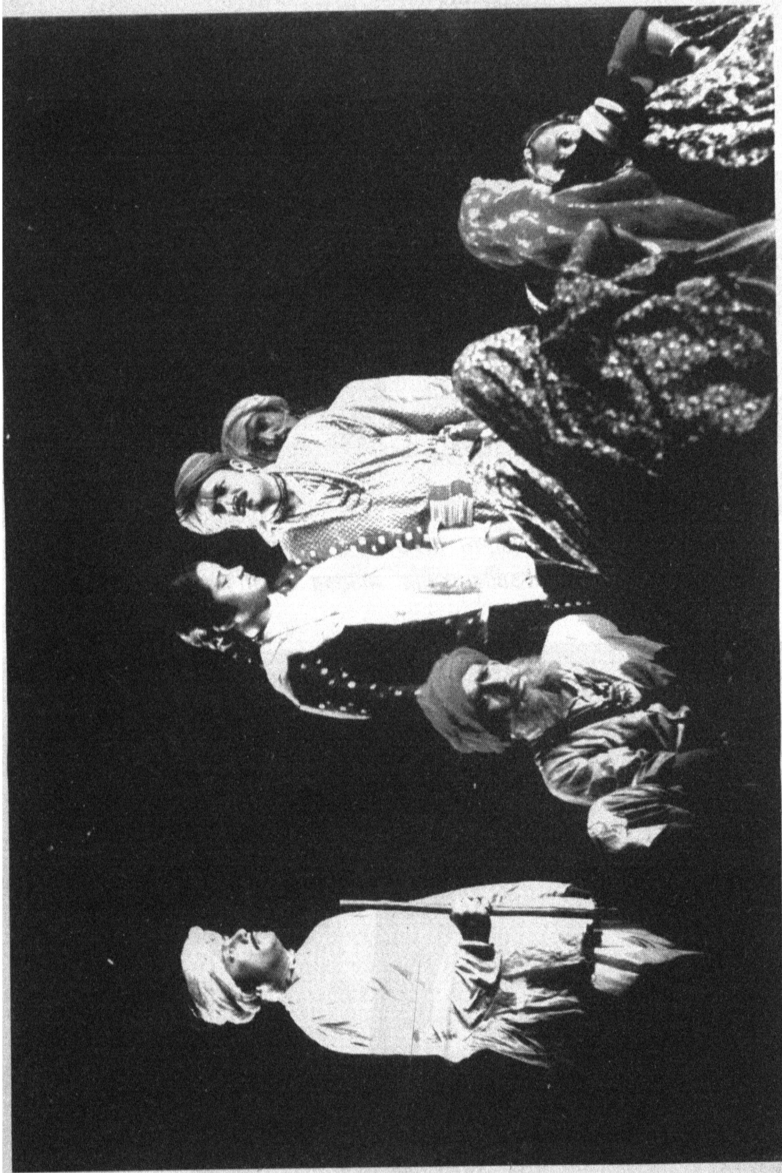
সায়ক প্রযোজিত মেঘনাদ ভট্টাচার্য পরিচালিত অমৃতা প্রীতমের পঞ্জাবি কাহিনী অবলম্বনে চন্দন সেন রচিত 'কর্ণাবতী' নাটকের একটি দৃশ্য।

বিজয় তেন্ডুলকরের 'কমলা' (বাংলায়) নাটকে কমলার ভূমিকায় শান্তি জানা, পরিচালক—সমর দত্ত।

মরাঠীতে বিজয় তেন্ডুলকর রচিত জব্বর প্যাটেল পরিচালিত 'ঘাসিরাম কোতওয়াল' নাটকে মোহন আগাসে ও অন্যান্য শিল্পী।
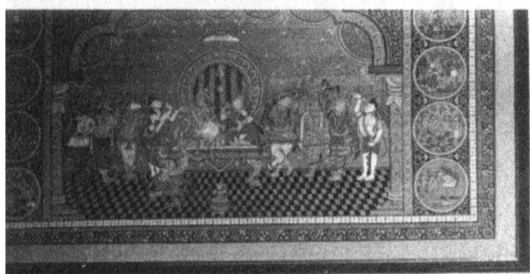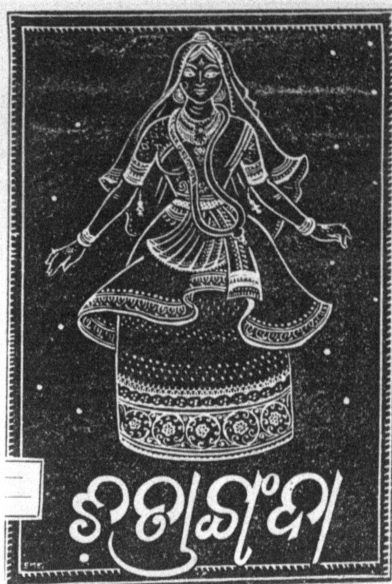
ওড়িয়া নাট্যকার মনোরঞ্জন দাস ও লেখক।

রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' (ওড়িয়াতে) নাটকে মালিনীর রূপসজ্জায় অলকা কানুনগো।

ওড়িয়া-য় 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রচ্ছদ

ভুবনেশ্বরে ভঞ্জ কলা মণ্ডপ-এর সামনে অনন্ত মহাপাত্র, দিলীপ কুমার মিত্র, কার্তিকচন্দ্র রথ, বিশ্বজিৎ দাস ও সুবোধ পট্টনায়ক।
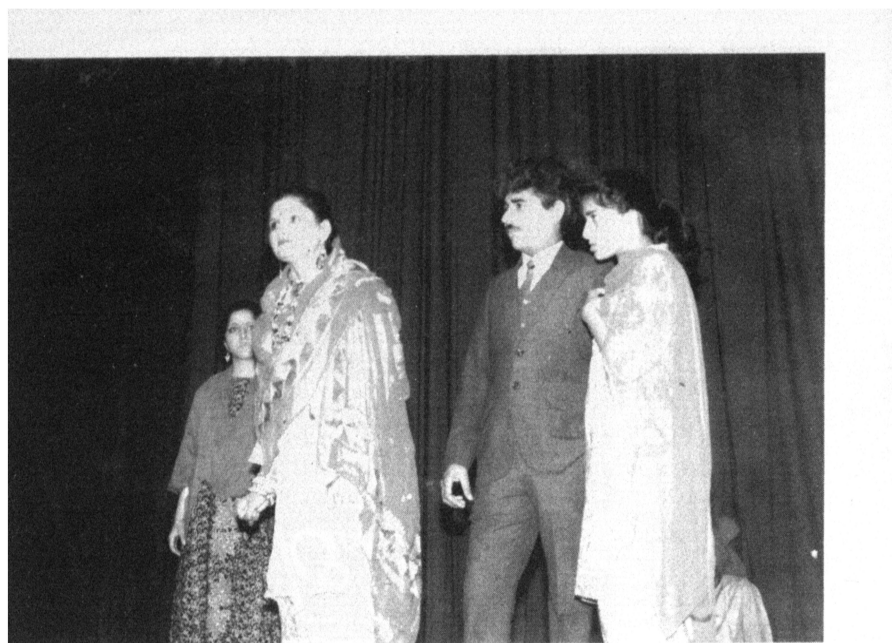
পঞ্জাবিতে ড. চরণদাস সিধুর 'পুনম কি বিছুয়া'।
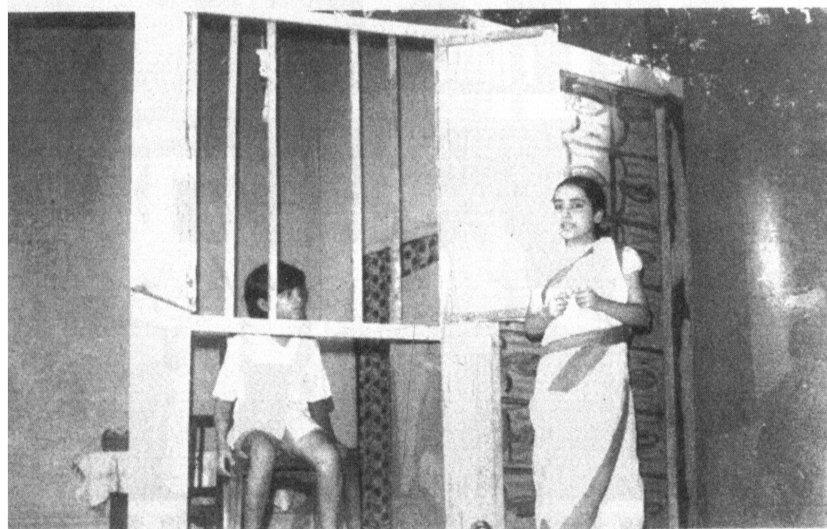
পঞ্জাবীতে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে কমলদীপ কৌর ও মোহন সিং মনটী।

মলয়ালমে উৎপল দত্তর 'সূর্যশিকার' (সূর্যভেট্টা), পরিচালক— জোস চিরামেল।

মলয়ালম নাট্যকার কে টি মহম্মদ, টি এম আব্রাহাম ও লেখক।

মলয়ালম ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালের
'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রচ্ছদ। অনুবাদ:
ভি কে আম্মা, ৪র্থ সংস্করণ-১৯৪৮
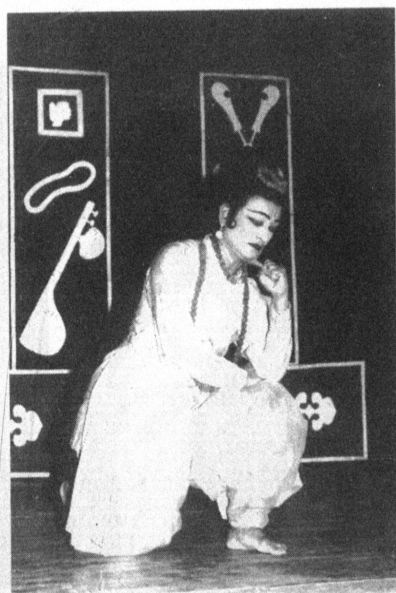
কথাকলি আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'য়
অর্জুনের ভূমিকায় গোবিন্দন কুট্টি।

মলয়ালমে কথাকলি আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'। পরিচালক—সদানাম বালকৃষ্ণণ।
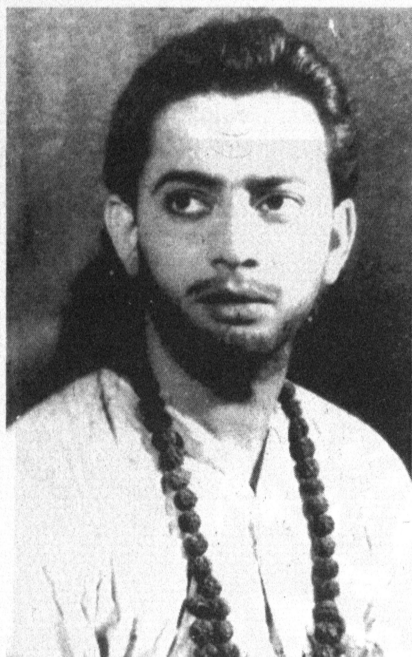
মরাঠীতে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে
জয়সিংহ-র ভূমিকায় কাশীনাথ ঘাণেকর।
প্রযোজনা—আই এন টি।
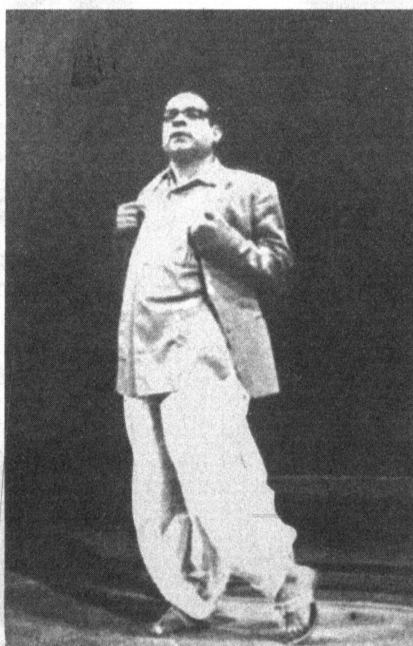
একক অভিনয়ে পি এল দেশপাণ্ডে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রচিত 'দুঃসময়' (হিন্দী রূপান্তর) নাটকের একটি দৃশ্য।
পরিচালক—প্রতাপ জয়সওয়াল।

ধর্মবীর ভারতীর 'অন্ধাযুগ' নাটকের একটি দৃশ্য। পরিচালক—ইব্রাহিম আলকাজী।
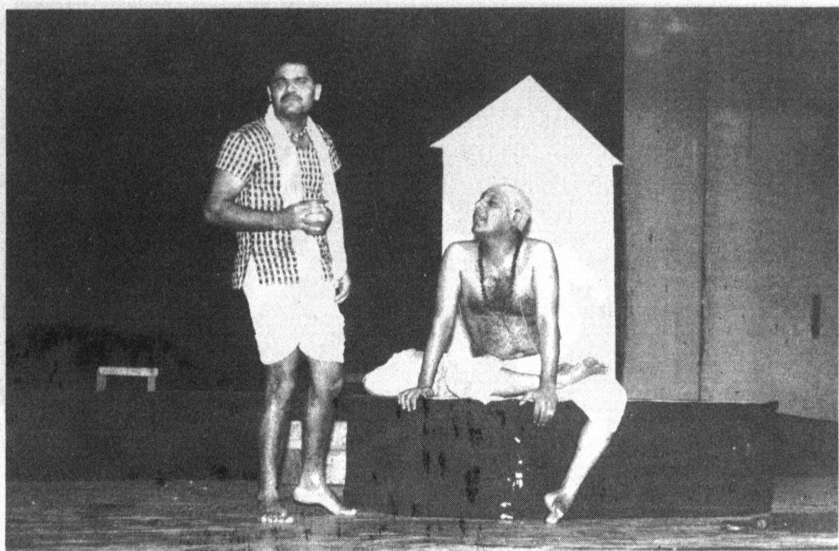
হিন্দীতে মনোজ মিত্রর 'রাজদর্শন', প্রযোজনা—আই পি টি এ, মুম্বাই।

হিন্দীতে উৎপল দত্ত-র 'তুরুপের তাস', পরিচালক—বাপী বসু।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর 'দুঃসময়' নাটকের হিন্দী মঞ্চায়নকালে দর্শকাসনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও লেখক।
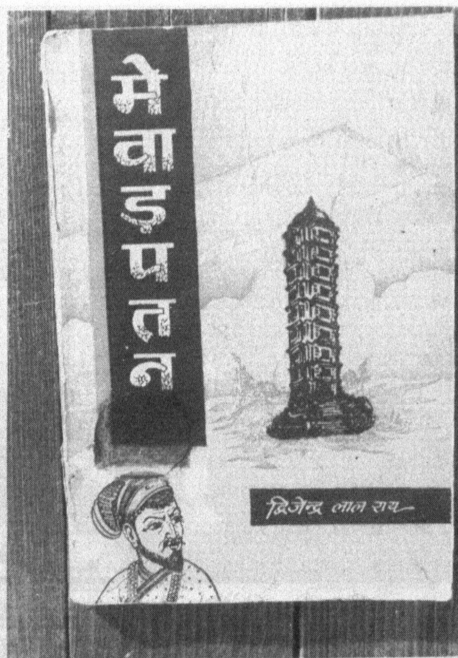
হিন্দীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন' গ্রন্থের প্রচ্ছদ। গ্রন্থ প্রকাশ ১৯১৭।

কন্নড় নাট্যকার গিরিশ কারনাড ও লেখক।

বিজয়শ্রী পরিচালিত কন্নড় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' (যক্ষনগরী),
প্রযোজক সংস্থা—স্পন্দন, বাঙ্গালোর।

বি ভি করন্থ নির্দেশিত কন্নড় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'।
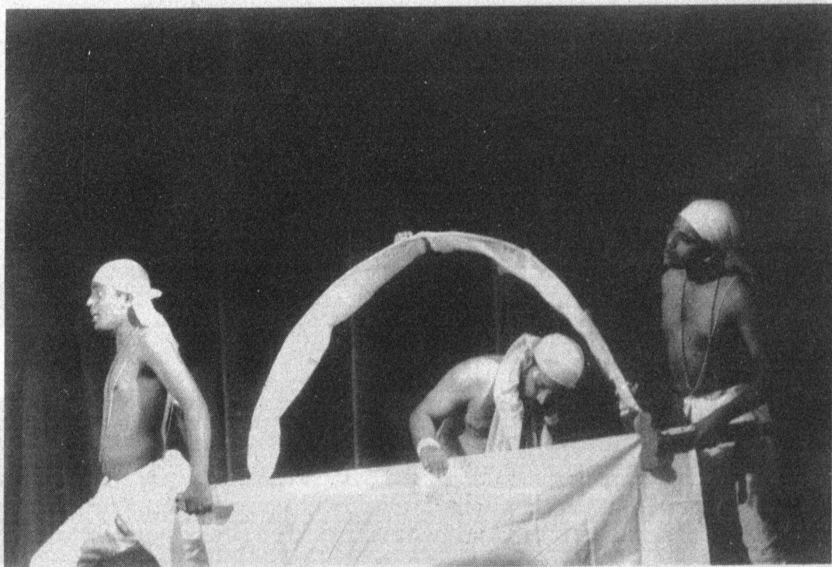
এইচ এস শিবপ্রকাশ রচিত প্রয়োগরঙ্গ প্রযোজিত সুরেশ আনগল্লি পরিচালিত কন্নড় নাটক 'মন্টেস্বামী কথাপ্রসঙ্গ'।

কন্নড় নাট্যকার ড. চন্দ্রশেখর কম্বর, সুলেখক জি কুমারাপ্পা ও লেখক।
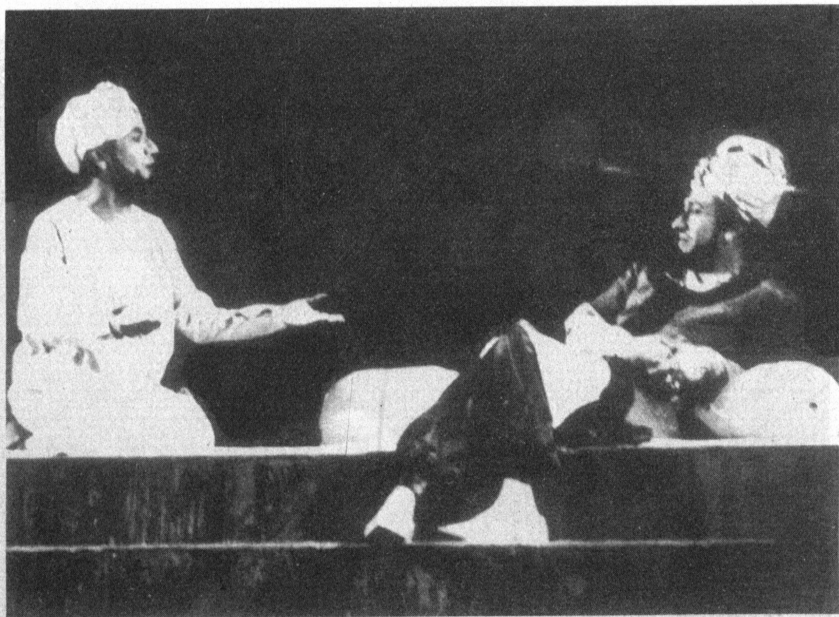
গিরিশ কারনাড-এর 'তুঘলক' (বাংলায়) নাটকে শম্ভু মিত্র ও কুমার রায়,
নির্দেশনা—শ্যামানন্দ জালান।

কন্নড় ভাষায় ড. চন্দ্রশেখর কম্বর রচিত কে ভি সুবান্না পরিচালিত নিনসম-এর 'সিরিমপিগে'।

মলয়ালম নাট্যকার ও পরিচালক কে এল পানিক্কর ও লেখক।

পানিক্কর প্রযোজিত মলয়ালম নাটক 'করিম কুট্টি'।
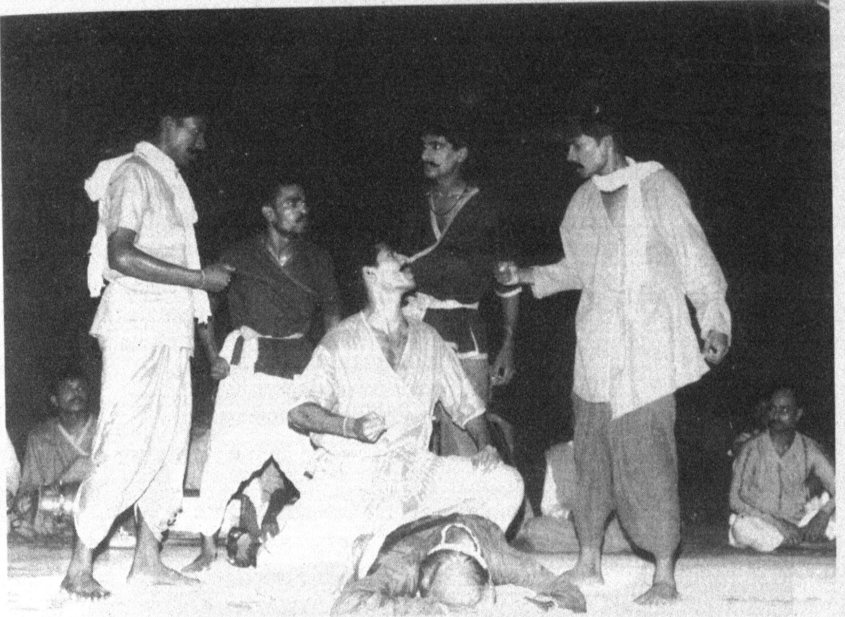
পটনা, কলাসংগম্ প্রযোজিত সতীশ আনন্দ নির্দেশিত
রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' (হিন্দী) নাটকের একটি দৃশ্য।
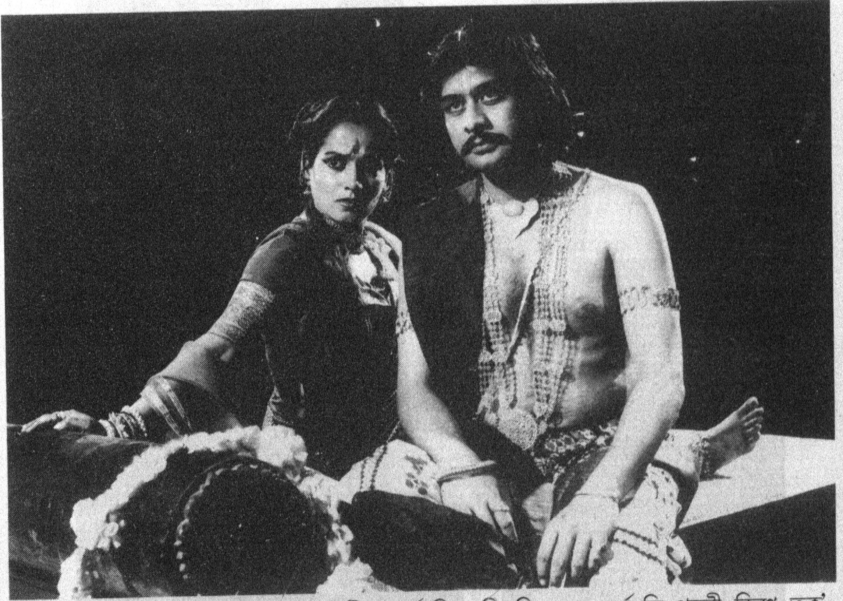
সুরেন্দ্র বর্মা রচিত এন এস ডি রেপেটরীর 'সূর্য কি অন্তি কিরণ সে সূর্য কি পহলী কিরণ তক'
নাটকের একটি দৃশ্যে হিমানী শিউপুরী ও অভিজিৎ লাহিড়ী।
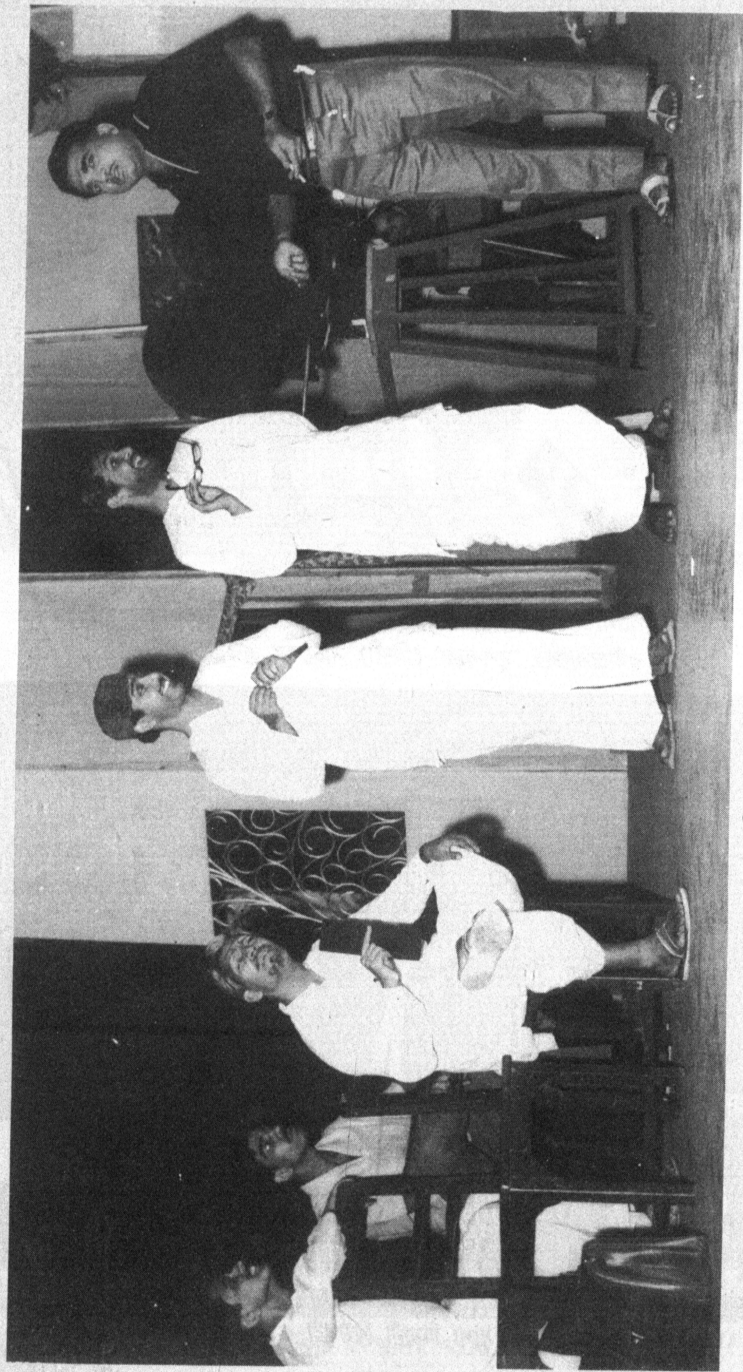
অদাকার প্রযোজিত হিন্দীতে উৎপল দত্তর 'ছায়ানট'।

গুজরাতিতে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ', পরিচালনা—মৃণালিনী সারাভাই।

গুজরাতীতে রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়-সূচনায় নাচের সাজে ইন্দিরা নেহরু (গান্ধী)।

থিয়েটার ফ্রন্ট প্রযোজিত বাংলায় প্রেমচন্দের 'গোদান'।
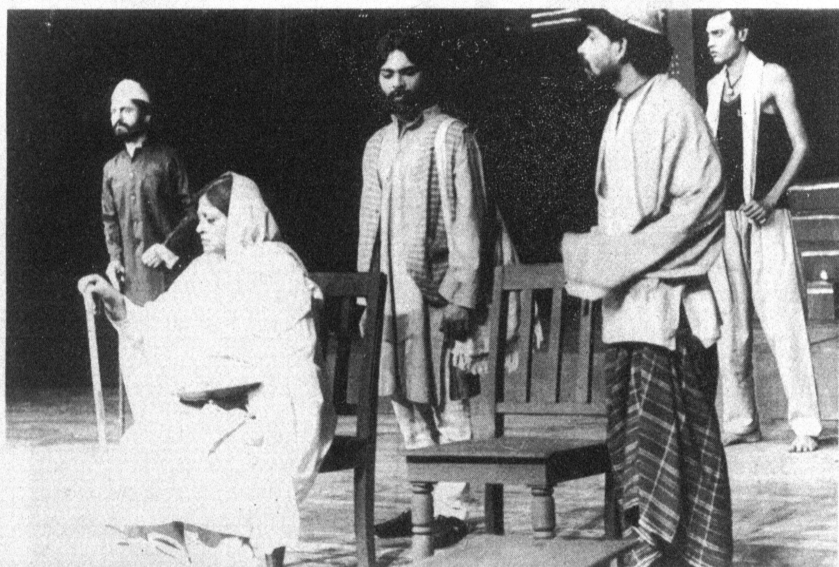
হিন্দীতে অসগর ওয়াজহতের 'জিস লাহোর নহী দেখা'র একটি দৃশ্য।

গুজরাতী নাট্যকার মধু রায় ও লেখক।

গুজরাতী নাট্যকার উমাশঙ্কর জোশী ও লেখক।
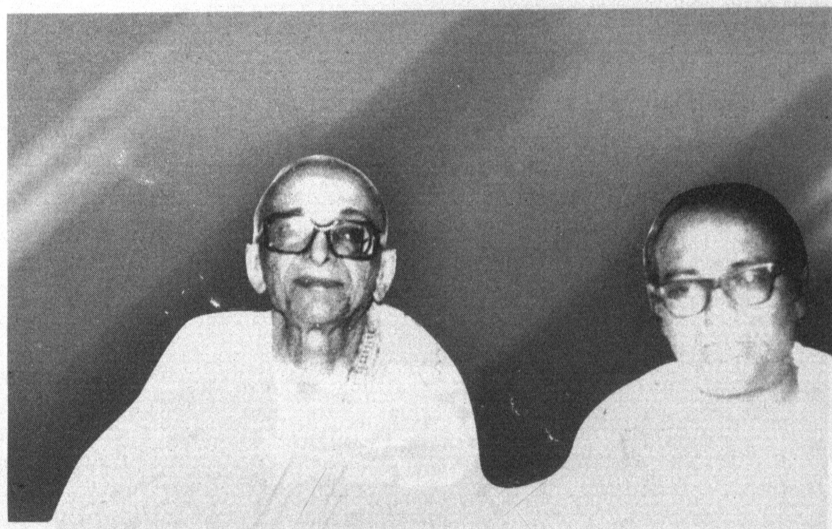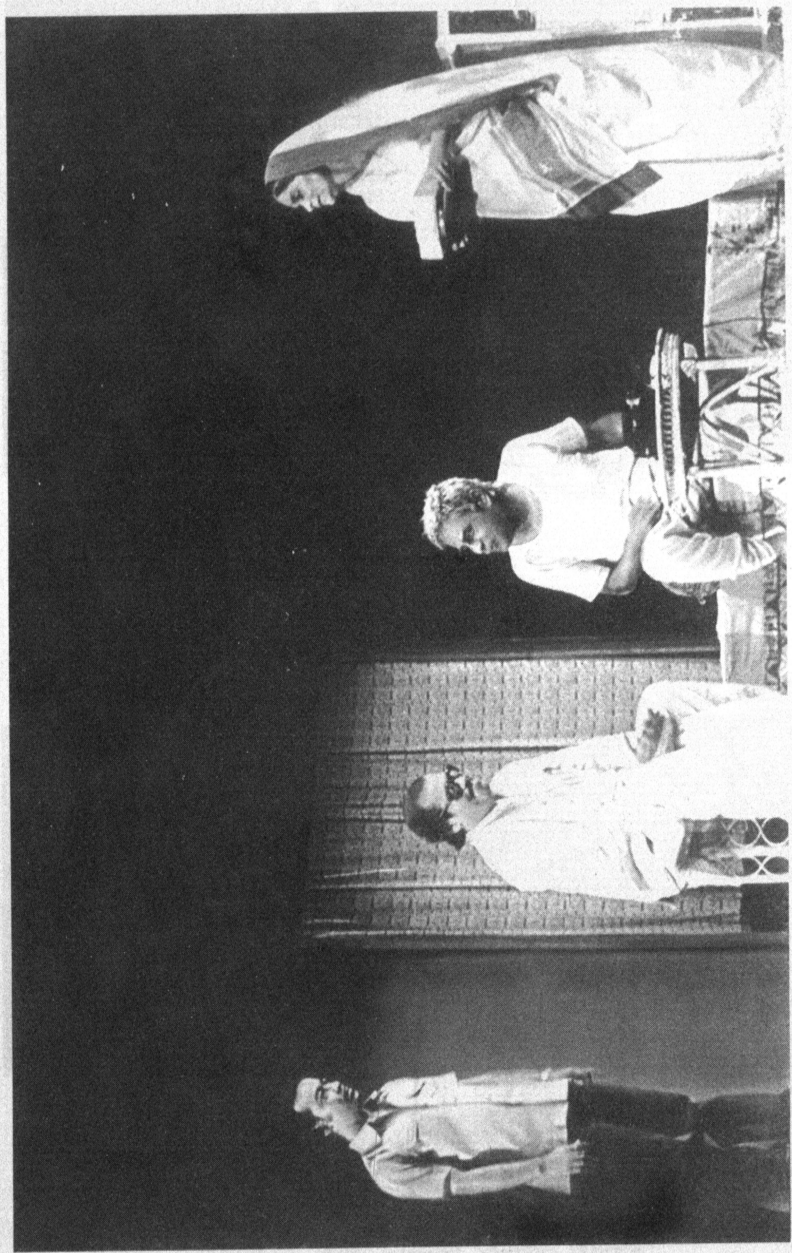
জয়বন্দ দলভী রচিত ভূমিকা প্রযোজিত মরাঠী 'সূর্যাস্ত' নাটকের বাংলা রূপায়ণে মলয় বিশ্বাস, বিমল দেব, শরণ চ্যাটার্জি ও কাজল চৌধুরী।
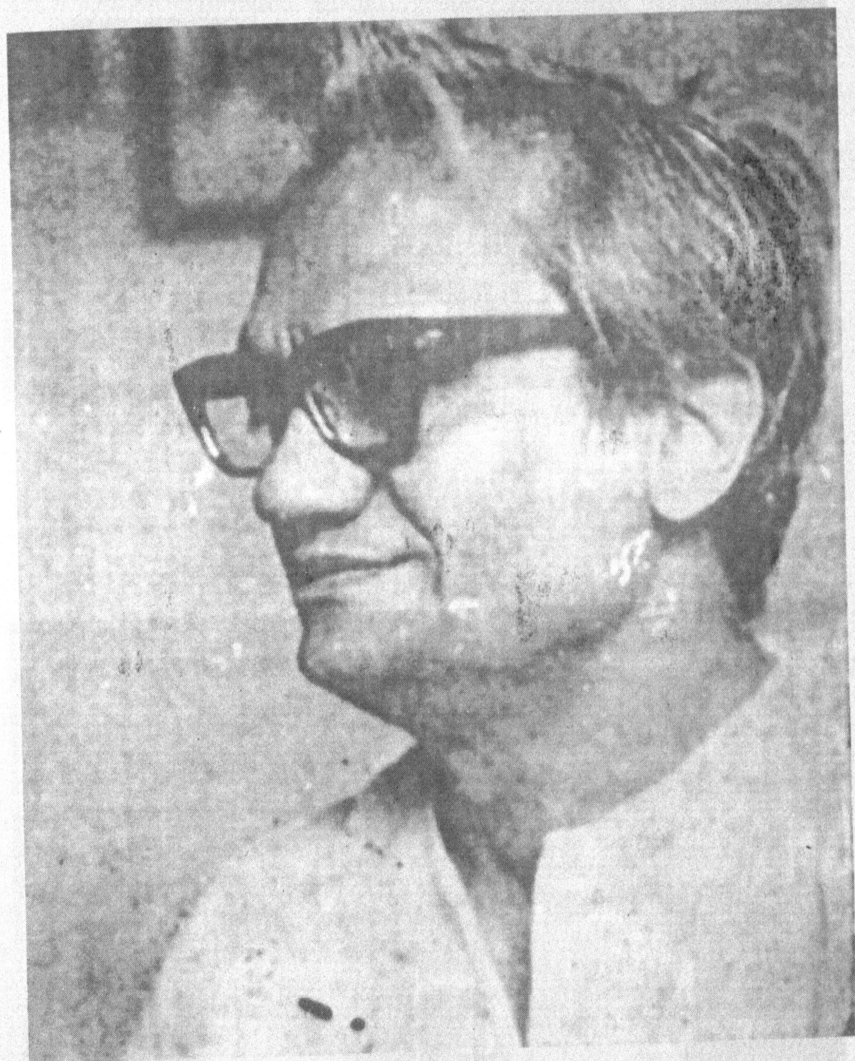
গুজরাতী নাট্যকার শিবকুমার জোশী।

বহুরূপী প্রযোজিত, বাংলায় বিজয় তেন্ডুলকরের 'চোপ্‌, আদালত চলছে'।
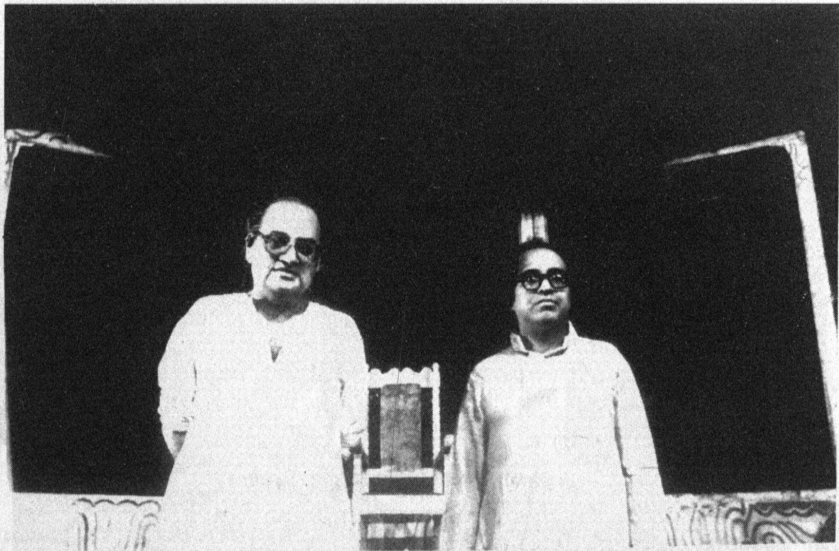
উৎপল দত্ত ও লেখক।

তামিল ভাষায় কলাক্ষেত্র-র 'শ্যামা', পরিচালনা—রুক্মিনী অরুণ্ডালে।

তেলুগুতে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা', পরিচালক—ভেম্পটি চেনা সত্যম।
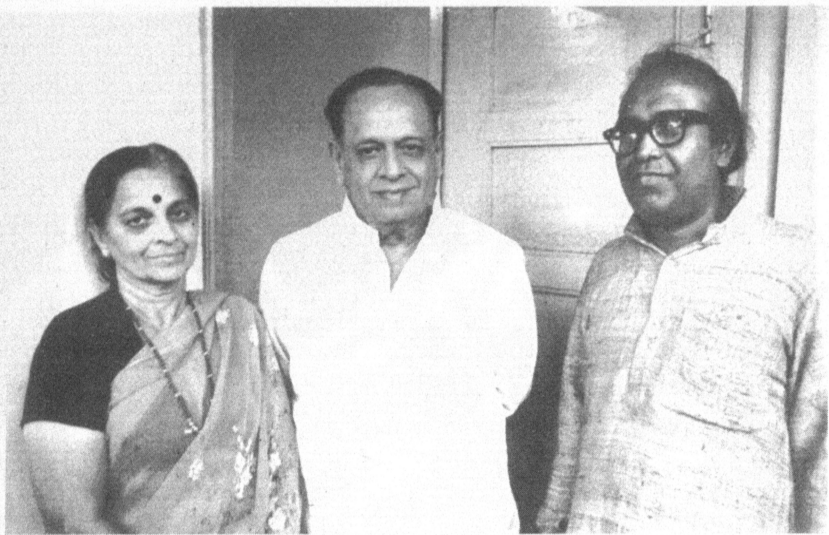
মরাঠী নাট্যকার বসন্ত কানেটকর, শ্রীমতী কানেটকর ও লেখক।
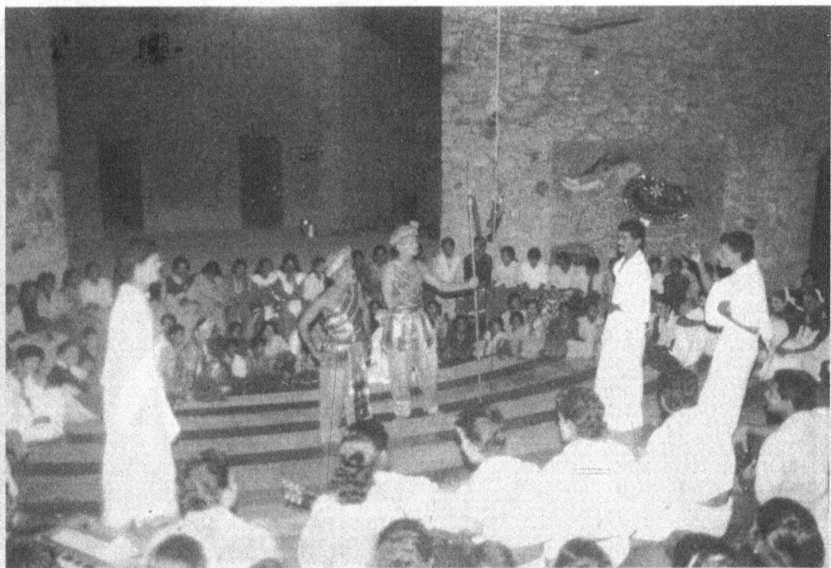
মলয়ালমে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'। প্রযোজনা—মিত্র নিকেতন।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা—দেশ কাল জাতি নাটক

১. ইতিহাস

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর। মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হল। পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি কেটে গেল। ঘটল নতুনের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব। তারায় তারায় দীপ্তশিখার আগুন জ্বলছে। তীক্ষ্ণ তীব্র বাতাসে মুক্তির প্রবল বার্তা প্রবাহিত হচ্ছে। অগণিত মানুষের চোখে সংগ্রামের উজ্জ্বলতা, মনে দুরন্ত উল্লাস, চেতনায় কঠিন শপথ। সেই নিদ্রাবিহীন গগনতলে অন্তবিহীন অগ্নিধারায় স্নাত মাটিতে ইরাবতীর চ্ছলচ্ছল শব্দের প্রবাহে আকাশ ছোঁয়া ত্রিবর্ণ পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে জহরলাল নেহরু উচ্চারণ করলেন স্বাধীনতার শপথ, মুক্তির বাণী, সংগ্রামের অঙ্গীকার —

"আমরা বিশ্বাস করি যে কোন জাতির মতই ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জন করবার মৌলিক অধিকার আছে এবং যতদিন না জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার ও বেঁচে থাকার উপাদান পাবার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে যদি কোন সরকার জনগণকে এইসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের ওপর অত্যাচার করে, তাহলে সেই সরকারকে বদলাবার বা ধ্বংস করার অধিকারও তাদের থাকবে। ভারতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কেবল স্বাধীনতা থেকেই বঞ্চিত করেনি জনগণের শোষণের ওপরই তাদের ভিত গড়ে তুলেছে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও আত্মিক দিক থেকে ধ্বংস করেছে। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে ও পূর্ণ স্বরাজ লাভ করবে।

এই ব্রিটিশ শাসনের আর বেশিদিন বশ্যতা স্বীকার করা মানে মানুষ ও ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হওয়া।"[১]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরল বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ লড়াই শুরু হয়েছে অনেকদিন। ১৯১৫ সালে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফেরেন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়কর ঘটনা সংগঠন করলেন সত্য ও অহিংসাশ্রয়ী প্রবল গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল বর্বর ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগে যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের ক্রোধ ঝলসে ওঠে। ১৯২০-তে বালগঙ্গাধর তিলকের মহাপ্রয়াণ। শুরু হয় বিদেশি বস্ত্র বয়কট যা বহ্ন্যুৎসবে শেষ হয়। কংগ্রেস প্রবলভাবে বেড়ে ওঠে - লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকামনার প্রতীক হয়ে ওঠে কংগ্রেস। খাদি বস্ত্র নির্মাণ ও পরিধান, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মদ্যপান নিবারণ, হিন্দু-মুসলমান মিলন, দেশীয় ভাষার বিকাশ সাধন, জাতীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি কাজে সারা দেশ ঝাঁপিয়ে পড়ল কংগ্রেসের নেতৃত্বে। খাজনা বন্ধের আহ্বানে সাড়া দিলেন বাংলা বিহার উত্তরপ্রদেশ অন্ধ্র তামিলনাড়ুর কৃষকরা। গান্ধীজী কারারুদ্ধ হন।

উত্তাল হয়ে ওঠে প্রতিবাদ প্রতিরোধ, সারা দেশে চলতে থাকে অসহযোগ, কলে কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়। মানুষের ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে চলে দমন পীড়ন, ব্রিটিশ সরকারেব শাসন আরো নির্মম হয়ে ওঠে, দেশের কারাকক্ষগুলি বন্দীদের স্রোতে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কারাগার পরিণত হয় পবিত্র তীর্থস্থানে। ১৯২৮-এর ৩ ফেব্রুয়াবি বোম্বের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত গর্জন করে ওঠে তীব্র ধিক্কারে—'সাইমন ফিরে যাও'।

১৯২৯ এর ৩১ ডিসেম্বর লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষিত হল। ১৯৩০ সাল। শুরু হল গান্ধীজীর দ্বিতীয় পর্যায়ের অসহযোগ আন্দোলন। ১২ মার্চ ডান্ডী অভিযান। সারাদেশে আরম্ভ হয়ে গেল দুর্বার দুরন্ত আইনভঙ্গ অভিযান। নির্ভীক প্রশান্ত অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিতমুখ গান্ধীজী যষ্ঠিহাতে এগিয়ে চলেছেন দৃঢ় পদক্ষেপে কঠিন প্রত্যয়ে। কিন্তু এ অভিযান শুধু গান্ধীজীরই নয় সারা জাতির। এটা সমগ্র ভারতবর্ষের মানস অভিযান। গান্ধীজী বললেন—"ডান্ডীকে মানুষ নির্বাচন করেনি, করেছেন ঈশ্বর। ডান্ডী আমাদের কাছে এক পবিত্র স্থান যেখানে আমরা মিথ্যে বলব না, পাপ করব না। .... এটা একার লড়াই নয়, এটা লক্ষ মানুষের লড়াই। এই স্বরাজের সংগ্রামে অগণিত প্রাণ হবে বলিদান এবং এই স্বরাজ সমগ্র দেশের মানুষের কল্যাণ বিধান করবে।"[২]

গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন। এগিয়ে এলেন সরোজিনী নাইডু। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের পাঠান উপজাতিরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। খান আবদুল গফ্ফর খান অসহযোগ অহিংসার অস্ত্রকে যেন দিব্যমহিমায় উদ্ভাসিত করলেন। সেনাবাহিনীতেও বিদ্রোহ দেখা দিল। পেশোয়ারে গাড়োয়ালী সৈন্যরা মুসলমান পাঠান সহযোগীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করতে অস্বীকার করে, তাদের সামরিক বিচার হয়। বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। উত্তর ভারতের সন্ত্রাসবাদী নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে মারা যান। উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্রেও শুরু হয় বিপ্লবী গণ আন্দোলন। দক্ষিণ ভারত ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কৃষকরাও সঙ্ঘবদ্ধ হন। শুধু ব্রিটিশ শাসক নয়, জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধেও সমবেত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ১৯৩১-র ২৩ মার্চ ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়—মানুষের ক্রোধ তীব্র ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। জনচেতনার জাগরণ ঘটে। মুক্তির প্রবল বাসনা ও প্রয়াস, সাম্প্রদায়িক মিলন সম্প্রীতির বিকাশ, বেতন ছুটি স্বাস্থ্য কাজের সুব্যবস্থা, শ্রমিকের বিভিন্ন অধিকার অর্জন, রাজস্ব খাজনা ঋণের সুদ প্রভৃতি ব্যাপারে কৃষকের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি ঘটনা উত্তর তিরিশ ভারতবাসীর মনকে উত্তাল করে তোলে। সে সময়ের দুটি বিশেষ উল্লেখ্য ঘটনা হল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হরিজনদের মর্যাদা দেবার আন্দোলন এবং নারীদের বিস্ময়কর জাগরণ।

এই সময় ব্রাত্য অন্ত্যজ মানুষরা মর্যাদা পেল, পার্বত্য উপজাতি ও তপশীলভুক্ত জাতিদের উন্নতির প্রবল প্রয়াস চলল, হরিজনদের মূল্য সম্মান অধিকার দিয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা হল, হরিজনদের আইন সভায় প্রবেশাধিকারের জন্য গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন। হরিজনদের জন্য সব মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়ার আন্দোলন প্রবল হয়। ১৯৩৩ এর ৮ জানুয়ারী 'মন্দির প্রবেশের দিন' রূপে উদযাপিত হয়।

তৃতীয় দশকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল - নারী জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অংশ গ্রহণ। নেহরু লিখেছেন—"বেশিরভাগ

পুরুষ কর্মীরা তখন জেলে। ইতিমধ্যে একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটে গেল - আমাদের দেশের মেয়েরা এলেন এগিয়ে। আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তাঁরা। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম থেকেই এ আন্দোলনে জড়িত ছিলেন, সেকথা সত্য। এবার কিন্তু তাঁরা এলেন দলে দলে, কাতারে কাতারে, বন্যার মত আকস্মিক ও দুর্বার বেগে। ব্রিটিশ সরকার যতটা আশ্চর্য হল তার চাইতে কম আশ্চর্য হননি এই সব মেয়েদের স্বামী, পিতা ও ভায়েরা। নানা শ্রেণীর মেয়েরা যোগ দিয়েছিলেন এই আন্দোলনে—কেউ তাঁরা অভিজাত কেউ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ঘরের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে তাঁরা কখনও হয়তো বেরোন নি। কেউ ছিলেন বা কৃষাণ - মজুরের মেয়ে ঃ ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এঁরা সহস্রধারে বেরিয়ে পড়লেন সরকারের ভ্রুকুটি ও পুলিশের লাঠি ডান্ডা উপেক্ষা করে। সাহস তো এঁদের ছিলই, উপরন্তু আরও একটা আশ্চর্য জিনিষ দেখেছি এঁদের মধ্যে সে হল মেয়েদের সংগঠন ক্ষমতা।''[৩]

যুগের এই চরিত্র লক্ষণ এই বিশিষ্টতাসমূহ ত্রিশের ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে যা ভারতীয় নাটককে পূর্ববর্তী যুগ থেকে সরিয়ে এনে নতুন ভাবনায় উজ্জ্বল নতুন প্রত্যয়ে দীপ্ত নতুন আদর্শে ঋদ্ধ করেছে যাকে আমরা 'আধুনিক' বলে আখ্যাত করেছি।

স্বাধীনতার সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ নেয় বিয়াল্লিশ-এ। ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে 'সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে' গণ অভ্যুত্থানের ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু ৮ আগস্ট গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় আকস্মিকভাবে। পরদিন এ সংবাদে দেশবাসী স্তম্ভিত হয়। ''অবিলম্বে এর যে প্রতিক্রিয়া হল তা যেমনই চকিত তেমনই স্বতস্ফূর্ত। সারা দেশে জীবনযাত্রা অচল হয়ে গেল, কাজের চাকা গেল থেমে। প্রত্যেক শহরে প্রত্যেক শহরাঞ্চলে হরতাল পালিত হল, সংগঠিত হল বিক্ষোভ আর মিছিল। জাতীয় সঙ্গীত ও শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে দেশবাসী দাবী করল নেতাদের মুক্তি। .... ছোটখাটো প্রতিরোধ এবং সংঘর্ষ হিসাবে যা শুরু হয়েছিল অচিরেই তা আন্দোলনের রূপ ধরল। সে আন্দোলন আবার অচিরেই রূপান্তরিত হল বিদ্রোহে। এ বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিলেন ছাত্র শ্রমিক ও কৃষক। স্কুল কলেজ এবং কারখানায় ধর্মঘট শুরু হল, থানা পোস্ট অফিস রেলওয়ে স্টেশন প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রতীক বলে ধরা হত তাদের ওপরও আক্রমণ চলল, বিদ্রোহীরা সেগুলিতে হয় আগুন ধরিয়ে দিল কিংবা ধ্বংস করে ফেলল, টেলিগ্রাফের তার কাটা বা ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপও শুরু হল কিছুদিন পরে। কৃষকরা যাতে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে তার জন্য ক্রমাগত প্রচারকার্য চালানো হল। অনেক অঞ্চলে কৃষকরা নিজেরাই বিকল্প সরকার গঠন করল, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ব্রিটিশ সরকারের কোনো ক্ষমতাই ছিল না সেসব অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করার। বালিয়ার স্থানীয় নেতারাই শহরের কর্তৃত্ব দখল করে নিলেন, সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তবে তাদের দমন করা সম্ভব হল। সুতাহাটা, সাতারা এবং কর্ণাটকে কৃষকেরা গুপ্ত গেরিলা আন্দোলন শুরু করলেন ও গেরিলা সংগ্রাম অব্যাহত ছিল ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। জয়প্রকাশ নারায়ণ রামমনোহর লোহিয়া অরুণা আসফ আলি প্রমুখ ছিলেন এই যুগের গুপ্ত আন্দোলনের প্রধান নেতাদের অন্যতম। বৈপ্লবিক হিংস্রতাও ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করল এই সময়। ....

সারা দেশে শুরু হল সন্ত্রাসের রাজত্ব। লাঠি চালনা, গুলিবর্ষণ, ব্যাপকহারে গ্রেফতার—এতো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল এবং সারা দেশ পুলিশী রাষ্ট্রের রূপ

ধারণ করল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিরস্ত্র জনতার ওপর শূন্যপথ থেকে পর্যন্ত মেশিনগানে গুলিবর্ষণ করা হল। শাস্তিমূলক জরিমানা, বা প্রায় বিনাবিচারে দণ্ডাদেশ দেওয়াও স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠল। এই অল্পস্থায়ী অথচ প্রচণ্ড রকমের তীব্র বিদ্রোহকে দমন করতে সরকার যে নির্মমতার আশ্রয় নিল তা অভাবনীয়। পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর গুলিবর্ষণে প্রাণ হারাল দশ হাজারের ওপর মানুষ। ১৮৫৭-র বিদ্রোহেব পর সারা দেশে সবকাবী দমননীতির এরকম ব্যাপক ও নিষ্ঠুর প্রকাশ আর কখনো দেখা যায়নি।"[৪]

বিয়াল্লিশের সন্ত্রাস যে কি ভয়ঙ্কর অমানবিক হয়েছিল তার পরিচয় অনেকে দিয়েছেন।[৫] কিন্তু বিয়াল্লিশের মুক্তি সংগ্রাম যে ভারতের জয়কে আসন্ন ও অনিবার্য করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় রাজনীতিতে ঝড়ের মত এসেছেন। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, তার আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন, গান্ধীজীর প্রবল অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছেন, বামপন্থী মতবাদে আস্থাশীল হয়ে লড়াই করেছেন এবং কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছেন বিদ্রোহী মূর্তিতে। তিনি মনে করতেন সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া ভারতের মুক্তি অর্জন অসম্ভব। ১৯৪১ এর মার্চ মাসে রোমাঞ্চকর ও ঐতিহাসিক দেশত্যাগের পর রাশিয়া ও জার্মানীতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জাপানে যান। জাপানের সহযোগিতায় তিনি গঠন করেন 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' (INA) এবং ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৯৪৩ সালে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৪ সালের ১৮ মার্চ শুরু হল দিল্লী জয়ের অভিযান—'দিল্লী চলো'। ইমফলেব মাটিতে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়ল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের গৌরবময় ভূমিকা ভারতবর্ষের জীবনে ও সাহিত্যে গভীর প্রভাব মুদ্রিত করেছে। আধুনিক ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের সৃজন প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখতে হবে।

শতাব্দীর প্রারম্ভেই লেনিন তাঁর The Inflammable Material in World Politics রচনায বলেছিলেন যে ভারতীয় শ্রমিক ইতিমধ্যেই শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক গণসংগ্রাম আরম্ভ করার উপযুক্ত স্তরে পৌঁছেছে।[৬] ১৯০৮ সালে তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বোম্বাই মিল শ্রমিকদের ধর্মঘটে এক শ্রেণী সচেতন ও রাজনৈতিক গণসংগ্রাম পরিচালনায় সক্ষম শক্তি রূপে লেনিন ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানান এবং মন্তব্য করেন যে ঐ রাজনৈতিক ধর্মঘট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার পূর্বাভাস।[৭]

১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লব হয় - পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির জন্মকাল। মার্কসবাদী চিন্তাচর্চা ভাবধারণার অনুশীলন চলতে থাকে তখন থেকে। সমাজজীবনে মার্কসবাদের প্রয়োগের প্রচেষ্টা ঘটে। সর্বহারার মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার ব্রত সাধনের পালা শুরু হয়। সমাজবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেদের ছড়িয়ে দিলেন সারা দেশে, তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হল বাংলা বিহার উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র পঞ্জাবের কলকারখানায় আর কৃষিক্ষেত্রে। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী শ্রমিক কৃষক নেতারা সাইমন কমিশনকে প্রত্যাখানে দৃঢ়তা দেখালেন। সর্বহারা মানুষের অধিকার অর্জনের জন্য প্রয়াসী হয়ে ও অন্যান্য অধিকারের ভিত্তিতে সর্বভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের সমাবেশের আয়োজন হয় কলকাতায় ১৯২৮ সালে। বিভিন্ন বামপন্থী ইউনিয়ন সারা ভারতের কলকারখানাগুলিতে সাফল্যের সঙ্গে শ্রমিক ধর্মঘট করায়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক প্রমাদ গোনে। ১৯২৯

সালের মার্চ মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তেত্রিশজন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতাকে সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের জন্য গ্রেপ্তার করা হয় - যাদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ, এস এ ডাঙ্গে, পি সি যোশী, মিরাজকর প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ - ও মামলা দায়ের করা হয় যা 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' নামে প্রসিদ্ধ। ১৯৩৩ সালে এর বর্বরোচিত রায় বেরোয় ও অধিকাংশ বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

সারা দেশে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা প্রবল বেগে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি বৃদ্ধি হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ আচার্য নরেন্দ্র দেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে ১৯৩৪ এ। কেরালা অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ুর কংগ্রেসি সমাজবাদীরা মার্কসবাদের অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন বেশি মাত্রায়। ১৯৩৫ সালে মে দিবসে আন্দামান জেলের একত্রিশ জন বন্দী একটা কমিউনিস্ট কো-অর্ডিনেশন গঠন করেন। ১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নেহরু সমাজতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করে বললেন—

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর এবং ভারতের, সকল সমস্যার সমাধান সমাজতন্ত্রের মধ্যে নিহিত। .... এ সমাজতন্ত্রের অর্থ আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় বিপুল ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন, এ সমাজতন্ত্র ভূমি ও শিল্পের উপর কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটাবে, ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী বুনিয়াদকে উচ্ছেদ করবে।"

সারা দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মজুরদের লড়াইয়ের হাতিয়ার ধর্মঘটের অস্ত্র বারবার ঝলসে ওঠে। ১৯৩৭ এ মোট ধর্মঘট হয় ৩৭৯টি, এতে যোগ দেন ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার মজুর। বাংলার চটকল ধর্মঘট প্রবল হয়।[৯] বিভিন্ন ধর্মঘট ছাড়াও ১৯৩৮ সাল একারণে উল্লেখ্য, এ বছরের নভেম্বর মাসে মালিক শ্রমিক বিরোধ আইনের (যাতে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে) বিরুদ্ধে সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অনুমোদনে বোম্বাইতে ৯০ হাজার শ্রমিক প্রতিবাদ-ধর্মঘট করে। ১৯৩৯ সালের ২রা অক্টোবর এক রাজনৈতিক প্রতিবাদ-ধর্মঘট করে বোম্বাই-এর ৯০ হাজার মজুর একদিন কাজ বন্ধ রাখলেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা প্রথম যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘট। এক সুসংগঠিত শক্তিরূপে শ্রমিক শ্রেণী ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ১৯৪০ এর ৫ মার্চ বোম্বাই এর বস্ত্রশিল্পের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মজুর মহার্ঘভাতার দাবিতে ধর্মঘট করেন। পুলিশের নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও ৪০ দিন ঐ ধর্মঘট চলে। ১৫ মার্চ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মজুর এক দিনের ধর্মঘট করে। বোম্বাই ধর্মঘট সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কানপুরে বস্ত্রশিল্প, কলকাতা কর্পোরেশন, বাংলা বিহারের চটকল, অসমে তৈল খনি, ঝরিয়া ধানবাদে কয়লাখনি, জামশেদপুরে লৌহশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বিভিন্ন অধিকারের দাবিতে ধর্মঘট করে চলেন ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্থানে। সরকারও হিংস্র বর্বর হয়ে উঠে আঘাত হানে। কিন্তু শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়তা রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকার অর্জনের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের ভিতকে প্রকম্পিত করে তোলে।

২. সাহিত্য

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সভ্যতার ভয়াবহ সংকট ও বিপর্যয় চূড়ান্ত হয়ে ওঠে তিরিশের সূচনা থেকেই। ১৯৩৩ সালের ১০ মে বার্লিনের রাজপথে ফ্যাশিস্ত হিটলারের নাৎসী বাহিনী বিশ্ববিখ্যাত প্রায় সকল লেখকের বইয়ের বহ্ন্যুৎসব করে।

রবীন্দ্রনাথের বইগুলোও বাদ পড়েনি এই দহন থেকে।

"তারপর হিটলার আর মুসোলিনীর উদগ্র সাম্রাজ্য লালসা আর যুদ্ধ প্রস্তুতির ফলে সমগ্র ইউরোপ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত তখন ফ্যাসিজমের এই দানবিক ঔদ্ধত্য ও যুদ্ধ প্রস্তুতিকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য রোলাঁ, গোর্কী, বারবুস সারা বিশ্বের বিবেকবান প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানালেন প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হতে। ১৯৩৫ সালের ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হল শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাশিবাদ বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে আঁদ্রে জিদ, ঈ এম ফরস্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডাস হাক্সলী, জুলিয়া বাঁদা, ওয়াল্‌ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্র্যাচি প্রমুখ বরেণ্য সাহিত্যিক ও মনীষীরা যোগ দিলেন, আহ্বান জানালেন ফ্যাশিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে সকল মানবপ্রেমিক শিল্পী সাহিত্যিককে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অগ্রসর হতে। এই বিশ্ব সম্মেলনে ইয়োরোপ-প্রবাসী ভারতীয় লেখকদের পক্ষ থেকে খ্যাতনামা সাহিত্যিক মুলকরাজ আনন্দ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।"[১০]

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সূচনা হয় লন্ডনে ওখানকার প্রতিভাবান তরুণ ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। ১৯৩১ সাল থেকেই সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা ও ফ্যাশিস্ত নিষ্ঠুরতায় ভারতীয় তরুণ বুদ্ধিজীবীরা ক্রুদ্ধ হয়ে সভ্যতার মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। রোলাঁ গোর্কী বারবুস জিদ ল্যাসকি রীড রজনীপাম দত্ত প্রমুখ মনস্বীদের প্রেরণায় ও সান্নিধ্যে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়ে মার্কসীয় দর্শন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে তাঁরা প্রগতিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলন গড়ে তুলতে চান যা মানব সভ্যতাকে যথার্থ মুক্তির পথ দেখাবে। মুলকরাজ আনন্দ সজ্জাদ জহীর হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ভবানী ভট্টাচার্য ইকবাল সিং রাজা রাও মহম্মদ আশরাফ প্রমুখ এই মহান আদর্শকে কার্যকরী করতে ব্রতী হন। বিশ্ব ইতিহাসের মহান শিল্পী ও মনীষীরা তাঁদের প্রেরণা দেন। ভারতীয়রা কিভাবে প্রগেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সূত্রপাত করেন তার বর্ণনা করেছেন মুলকরাজ আনন্দ[১১] ও সজ্জাদ জহীর[১২]।

বাংলাদেশেও প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফ্যাশিস্ত মুসোলিনী কর্তৃক আবসিনিয়া আক্রমণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অমানবিক বর্বরতার বিরুদ্ধে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ গঠন করেন যুদ্ধ ও ফ্যাশিবিরোধী সঙ্ঘের সাংগঠনিক কমিটি ১৯৩৫ সালের ২৭ অক্টোবর। উল্লেখ করা দরকার রবীন্দ্রনাথ সর্ববিধ প্রগতিশীল ভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ফ্যাশিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠেছেন।

প্রথম নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন (First All India Progressive Writers' Conference) অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্ণৌতে ১০ এপ্রিল ১৯৩৬ যাতে বাংলা উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র গুজরাত মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লেখকরা অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাণী পাঠান। সরোজিনী নাইডু, মৌলানা হজরৎ সোহানী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। সজ্জাদ জহীর এর সম্পাদক। সভাপতির ভাষণে প্রখ্যাত হিন্দী কথাশিল্পী প্রেমচন্দ যে কথা বলেন তা প্রগতিশীল ভারতীয় সাহিত্যচিন্তাকে গভীরভাবে ব্যক্ত করে। প্রেমচন্দ বলেন—

The role of literature is not simply to provide us with amusement or recreation; it does not follow, but is, on the contrary, a torch-bearer to all the progressive movements in society...

We shall consider only that literature as progressive which is thought-

ful, which awakens in us the spirit of freedom and of beauty; which is creative, which is luminous with the realities of life; which moves us; which leads us to action and which does not act on us as a narcotic ; which does not produce in us a state of intellectual somnolence - for, if we continue to remain in that state it can only mean that we are no longer alive.[১৩]

স্পেনের বৈধ রিপাবলিকান সরকারের ওপর ফ্র্যাঙ্কোর ফ্যাশিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে রোমাঁ রোলাঁ বিশ্ববাসীর কাছে মর্মস্পর্শী আবেদন জানান। ১৯৩৭ এর জানুয়ারী মাসে 'মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সচেতন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা League against Fascism and War এর সর্বভারতীয় কমিটি গঠন করেন যার সভাপতির পদ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ এবং সম্পাদক ও সদস্য হন কে টি শাহ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু, সজ্জাদ জহীর, তুষারকান্তি ঘোষ, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, এন জি রঙ্গ, এস এ ডাঙ্গে, পি ওয়াই দেশপান্ডে, মিঞা ইফতিকারউদ্দিন প্রমুখ সংস্কৃতি ও রাজনীতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

১৯৩৮ এর ডিসেম্বরে কলকাতায় সারা ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। প্রগতিশীল লেখকরা ফ্যাসিবিরোধী ভাবনাকে গ্রহণ করেন। সারাবিশ্বে ফ্যাসিবাদের বর্বর তাণ্ডব তাদের মন ক্লিষ্ট পীড়িত করছিল। বাংলায় ফ্যাসিবিরোধী ভাবনা উত্তাল হয় ও তার কাজ চলতে থাকে। ১৯৪২ এর মার্চে ঢাকায় তরুণ প্রতিভাবান লেখক প্রগতি লেখক সংঘের উৎসাহী সদস্য সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ত গুণ্ডাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। সারা দেশে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। সারা বাংলার শিল্পী লেখকদের নিয়ে গড়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। এই শিল্পীরা নাচে গানে অভিনয়ে বিশ্বব্যাপী ফ্যাশিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে যেমন জনমত গঠন করেন তেমনি অপরদিকে সারা ভারতবর্ষকে উন্মথিত উদ্দীপ্ত করে তোলেন।

তৃতীয় দশক এভাবেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবনার মধ্যে মেলবন্ধন রচনা করে। রাজনীতি ও সংস্কৃতির আশ্চর্য মিলন সংঘটিত হয়। রাজনীতি সচেতনতা, প্রগতিশীল ভাবনা ও মানসিকতা এবং আন্তর্জাতিকতা আধুনিক মানসের বিশিষ্টতম লক্ষণ হিসাবেই বিবেচিত হবে। সাহিত্যে ও নাটকে তার গভীর প্রভাব পড়েছে।

সারা দেশে নেমে আসে এক ভয়াবহ সর্বনাশা বিপর্যয়।

পঞ্চাশের মন্বন্তর তার সর্বগ্রাসী করাল ছায়া বিস্তার করে দেয় দেশের ওপর। দুর্ভিক্ষের হিংস্র নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দেশ, লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনাশ ঘটে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কালোবাজারী মুনাফাখোর মজুতদারের পাপ অন্যায়ের অমানবিক হিংস্রতা। এবং ব্রিটিশ শাসকের ভারতবাসীর প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা ও অবহেলা এবং শোষণ জীবনের শেষ মুহূর্ত যেন আসন্ন করে তোলে। জওহরলাল নেহরু পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ ছবি আঁকলেন—

"এল দুর্ভিক্ষ। অতি করাল অতি কুটিল বর্ণনাতীত বীভৎস দুর্ভিক্ষ দেখা দিল মালাবারে বিজাপুরে উড়িষ্যায়। শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ নিদারুণ দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কাতারে কাতারে পুরুষ নারী ও শিশু অন্নাভাবে প্রতিদিন মারা পড়তে লাগল। কলকাতার প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির সামনে, বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে পর্ণকুটিরে পথে প্রান্তরে মাঠে ঘাটে হাজার হাজার মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে উঠল।

এ কি রকম মৃত্যু! এর মধ্যে অর্থ নেই, যুক্তি নেই, প্রয়োজনের তাগিদ নেই। কতকগুলি হৃদয়হীন অকর্মণ্য মানুষের হাতে গড়া এই মৃত্যু। মন্থরগতি ভয়াল সরীসৃপের মত মৃত্যু এসে সব গ্রাস করে নিল। জীবন মৃত্যুর মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে বিলীন হয়ে গেছে, প্রাণটা ধুকছে আর কঙ্কালসার শরীরের কোটরগত চক্ষু থেকে মৃত্যু যেন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে।''[১৪]

তিনি আরও বললেন, ''ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও পূর্ণতালাভের নিদর্শন এই দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টির অভাব ও চরম ঔদাসীন্যের প্রত্যক্ষ ফল এই দুর্ভিক্ষ।''[১৫]

এই পটভূমিকায় ইতিহাসের অনিবার্য দাবীতে গড়ে ওঠে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। ভারতের প্রতি প্রান্তে বিভিন্ন নামে কিন্তু একই উদ্দেশ্যের সাধক ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘ জননাট্য সঙ্ঘ লোকনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রগতিশীল জীবননিষ্ঠ শিল্প-সাংস্কৃতিক সংস্থা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে সমবেত সংহত হল—১৯৪৩ সালে বোম্বাই সম্মেলনে 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ' বা Indian Peoples Theatre Association পরিপূর্ণ রূপ পেল।

উত্তর চল্লিশের ভারতবর্ষ। ইতিহাসের এক অগ্নিগর্ভ অধ্যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনে ভাঙন এনেছে। ফ্যাসিস্ত আক্রমণের আশঙ্কায় সারা দেশ থরথর করে কাঁপছে। দুর্ভিক্ষের হিংস্র থাবা পড়েছে লক্ষ প্রাণের ওপর। কালোবাজারের তমিস্রার অন্তরালে পাপ আর অন্যায় পুঞ্জীভূত হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ইংরাজ বিতাড়নের মারণ যজ্ঞে মেতে উঠেছে। কোটি কণ্ঠের 'ভারত ছাড়ো' বজ্রধ্বনি ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূল কাঁপিযে দিচ্ছে। পূর্ব সীমান্তে মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের মুক্তিবাহিনী দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। ক্রুদ্ধ আতঙ্কিত ব্রিটিশ জাতীয় আন্দোলনকে দমন করতে চাইছে বর্বর পাশবিকতায়। সেই সময় শহরের রাজপথে দেখা দিল অদ্ভুত এক ধরনের জীব—ঠিক মানুষ নয় কিন্তু মানুষের মত যেন তার ক্যারিকেচার, তারা নড়ে চড়ে আর্ত গোঙায় আর তাদের তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকার ইটকাঠ পাথরের দেয়াল ভেদ করে বুকের পাঁজরে কাঁপন তোলে - একটু ফ্যান দিবি মা!

মানবেতিহাসের এই সব করুণ বেদনাময় ঘটনায় সংযোজিত হল ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি তথা নাট্যসাহিত্যের এক বিশিষ্টতম অধ্যায়।

৩. নাট্য আন্দোলন

এই যুগ এই জীবন এই যন্ত্রণা এই দাহকে রূপায়িত করতে এগিয়ে এলেন নাট্যকাররা, গণআন্দোলনের আগুনঝরা পরিবেশে সৃষ্টি হল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, রচিত হল ইতিহাস।

গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বিশিষ্ট নাট্যকার নাট্যতত্ত্ববিদ দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন—

'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘকে কোন একটা বিশেষ গোষ্ঠী ভাবলে ভুল করা হবে। চল্লিশের দশকে এটা গড়ে ওঠে এক সর্বভারতীয় নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন রূপে। আসমুদ্রহিমাচল এতে আলোড়িত হয়। এর ব্যাপ্তি ছিল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, গুজরাত থেকে মণিপুর পর্যন্ত। সাংস্কৃতিক ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠতো গণনাট্য' সঙ্ঘের প্রতিটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে ও তার নাট্য উৎসবে। প্রতিরাজ্যের

শিল্পকলা ও সংস্কৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যেত সেখানে। নাম গণনাট্য সঙ্ঘ হলেও কেবল মঞ্চনাট্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না তার সৃষ্টি: সঙ্গীত, নৃত্য, ছায়ানাট্য, কবিগান, উর্দু কবিতার মুশায়েরা প্রভৃতিও ছিল তার অন্যতম অঙ্গ। নতুন যুগের সৃষ্টির পাশে স্থান পেত ঐতিহ্যময় কলাসম্পদ, পল্লীগীতি ও পল্লী নৃত্যের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়েছিল মার্গ সঙ্গীত ও ধ্রুপদী নৃত্য। সেই মঞ্চে পরিবেশিত হতো নবজীবনের গান ও নব সঙ্গীত; পঞ্জাবের লোকগীতি ও ভাঙরা নৃত্য, কাশ্মীরের পল্লীগীতি, গুজরাতের গরবা নৃত্য, মারাঠী পল্লীগীতি ও মালাবারের পল্লীনৃত্য, দক্ষিণ ভারতের পল্লীগীতি, কেরালার কথাকলি, মাদ্রাজের (বর্তমানের তামিলনাডু) ভারতনাট্যম, ওড়িশী নৃত্য, উত্তর ভারতের কথক নৃত্য, রাজস্থানের পল্লীগীতি, বিহারের ভোজপুরী গান ও সাঁওতালী নৃত্য, বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি, তরজা, ভাওয়াইয়া, চটকা, কবিগান ও যাত্রাপালা; অসমের পল্লীগীতি, মণিপুরী নৃত্য, নাগা নৃত্য ইত্যাদি। রূপে-রসে ছন্দে-সুরে ভারতীয় সংস্কৃতির এক মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠতো গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিটি উৎসব। ভাবগত এমন ঐক্য এবং সারা ভারতব্যাপী এমন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নজির এদেশে স্মরণকালের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না'।[১৬]

গণনাট্যের দোষত্রুটি বিচার করেও সমালোচক সিদ্ধান্তে এসেছেন—It's contribution to the modern theatre movement in India has been both significant and valuable. All over India it brought out new dramatists, new actors, new themes, and an active theatre. যুদ্ধের পর এর আবেদন চলে যায় কিন্তু the fact that the IPT was the first modern organization of the Indian theatre on an all India basis remained. From now an, dramatists and theatre people from the various regions of India could meet on one platform, exchange views and discuss the theatre in all its aspects in relation to the life of the people.[১৭]

৪. আধুনিকতা ও ভারতীয় নাটক

উপর্যুক্ত প্রতিবেশ পটভূমিতে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ভারতীয় ভাবনায় ও মননে যে নূতনতর বোধ ও প্রত্যয় দেখা দিয়েছে তারই গতিশীল দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ প্রকাশ আধুনিক নাটক। সময়ের অনিবার্য বিবর্তনের ধারায় প্রচলিত মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শক অস্বীকার ও অতিক্রম করে জগত ও জীবনকে পরিবর্তিত কালের নূতন ভাবনায় অভিনব আঙ্গিকে বিচিত্র শিল্পরূপে প্রকাশ করাই সাহিত্যের আধুনিকতা, নাট্য সাহিত্যের তো বটেই। আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বহুল পরিচিত বক্তব্যকে স্মরণ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্য তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব : বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল

বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক" ।[১৮]

প্রখ্যাত লেখিকা ভার্জিনিয়া উলফ চমকে দিয়ে বলেছিলেন—On or about December 1910 human nature changed .. All human relations shifted — those between masters and servants, husbands and wives, parents and children And when human relations change there is at the same time a change in religion, conduct, politics and literature"[১৯] কিং এডওয়ার্ডের মৃত্যু ও First Post Impressionist Exhibition এর গুরুত্ব মনে রেখেই ভার্জিনিয়া উলফ আধুনিকতার এই বিশিষ্টতা উল্লেখ করেন। ভার্জিনিয়া উলফের এই আধুনিক ভাবনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচক বললেন—

Virginia Woolf, holding that the modern stylistic revolution came from the historical opportunity for change in human relationships and human character, and that modern art therefore had a social and epistemological cause, nonetheless believed in the aesthetic nature of the opportunity; it set the artist free to be more himself, let him move beyond the kingdom of necessity to the kingdom of light. Now human consciousness and especially artistic consciousness could become more intuitive, more poetic; art could now fulfil itself. It was free to catch at the manifold–the atoms as they fall—and create significant harmony not in the universe but within itself (like the painting which Lily Briscoe completes at the end of "To The Lighthouse"). The world, reality, is discontinuous till art comes along, which may be a modern crisis for the world; but within art all becomes vital, discontinuous, yes, but within an aesthetic system of positioning"[২০]

ভার্জিনিয়া উলফের মতে আধুনিক শৈলীগত বিপ্লব সম্ভব হয়েছে মানবিক সম্পর্ক ও চরিত্রের পরিবর্তনের ঐতিহাসিক সুযোগের ফলে এবং আধুনিক শিল্পের পেছনে রয়েছে সামাজিক ও জ্ঞানতত্ত্বীয় কারণ। তবুও ভার্জিনিয়া উলফের বিশ্বাস যে ঐ সুযোগের চরিত্র নান্দনিক বটে, তার ফলে শিল্পী অধিকতর স্বাধীনতা পেয়েছে স্বনির্ভর ও সুস্থ হবার, যেতে পেরেছে প্রয়োজনের জগৎকে পেছনে ফেলে আলোর রাজত্বে। ফলে মানুষের চেতনা বিশেষ করে শিল্পচেতনা - হতে পেরেছে অধিকতর স্বজ্ঞা নির্ভর ও কাব্যিক, শিল্প পেরেছে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে। সে স্বাধীনতা পেয়েছে বহুকে বিবিধকে ধরার - অর্থাৎ ভাবনার অণুগুলো যখন যেভাবে ধরা পড়ছে - এবং অর্থময় গুরুত্বপূর্ণ ঐকতান রচনা করার ভাবনা বহির্বিশ্বের মধ্যে নয়, নিজের মধ্যেই। শিল্পবিচ্ছিন্ন যে পৃথিবী ও বাস্তব তা ধারাবাহিক নয়। এবং সেটাই পৃথিবীর বর্তমান সঙ্কট, কিন্তু শিল্পের মধ্যে ধারাবিহীনতা সত্ত্বেও সবকিছু প্রাণময় হয়ে ওঠে সংস্থাপনের নান্দনিক প্রক্রিয়ায়।

উপর্যুক্ত ভাবনার পটভূমিতে আধুনিক ভারতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণসমূহ উল্লেখ করা যাক—

১। মুক্তিবাসনা ঃ সর্ববিধ বন্ধন মোচনের প্রয়াস

২। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ঃ জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম

৩। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই

৪। আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ববোধ

৫। বিশ্বইতিহাসের প্রগতিশীল ধারাগুলিকে গ্রহণ
৬। হিন্দু-মুসলমান মিলন
৭। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ
৮। নারীমুক্তির আন্দোলন
৯। সমাজে নারীর যথাযোগ্য স্থান নির্ণয়
১০। সহজ যৌনতা
১১। মার্কসবাদের শিক্ষা
১২। শ্রমিক কৃষক নিম্নবিত্ত মানুষের অধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা
১৩। সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই
১৪। ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান
১৫। গণ সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ রূপকে তুলে ধরা
১৬। ব্যক্তির অস্তিত্ববোধ-এর দ্বান্দ্বিক রূপায়ণ
১৭। ব্যক্তির অস্তিত্বের বোধকে বিশ্বচেতনায় প্রসারিত করা
১৮। মৌল মানবিক অধিকারের দিগন্তের উদ্ভাসন।

ত্রিশের সূচনা থেকেই ভারতীয় নাটকে এই সব ভাবনার প্রকাশ ঘটতে থাকে এবং বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই আধুনিক ভারতীয় নাটকের উদ্ভব হয়েছে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

৫. ভারতীয় নাটক ও বাংলা পাঠক

বিগত পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় নাটক বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই উপলব্ধ হয় যে একই ভাবনা ও মানসিকতা আধুনিক সাহিত্য তথা নাট্যসাহিত্যের মধ্যে বিদ্যমান, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভারতীয় নাটকে একই জীবনবোধ সমাজচেতনা হৃদয় অনুভব স্ফুরিত হচ্ছে। সাহিত্য আকাদেমি ভারতীয় সাহিত্যের সমমর্মিতার এই বৈশিষ্ট্য অসাধারণ ব্যক্ত করেছে—

Indian literature is one though written in many languages. The basic sources of tradition and environments, the social and spiritual subconscious from which all creative art derives its impulse and even the external influences, native and foreign, are shared in common by writers, whether they are writing in Tamil or Bengali.[২১]

উমাশঙ্কর জোশী বলেছেন যে তিনি একজন ভারতীয় সাহিত্যিক যিনি লেখেন গুজরাতি ভাষায়।[২২] ভারতবর্ষের জীবনচেতনার কেন্দ্রপুরুষ রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষের নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর অবিসংবাদী গৌরবময় অগ্রণী ভূমিকা। আধুনিক ভারতীয় নাট্যকাররা একই সূত্রে গেথেছেন তাঁদের মনকে, বিনি সুতোর অনুভব ও প্রত্যয়ে বাঁধা পড়েছে সহস্র জীবন। এইভাবেই বাংলা নাটকের সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নাট্য সাহিত্যের একটা যোগসূত্র আছে, একটা ভাব ও শিল্পগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তারা পরস্পরকে আকৃষ্ট করেছে প্রভাবিত করেছে, অন্তর বিনিময়ের দ্বারা আপনাকে আরো উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করেছে। তবে বাংলা নাটকই অধিকতর প্রভাব ফেলেছে অন্যান্য ভাষার নাট্যসাহিত্যের ওপর। বাংলা পেয়েছে রেনেসাঁসের উত্তরাধিকার। বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদন গিরিশচন্দ্রের অনন্য আবির্ভাব, দ্বিজেন্দ্রলালের উজ্জ্বল অস্তিত্ব, রবীন্দ্র নাটকের অপরূপ ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, শরৎচন্দ্রের হৃদয়স্পর্শী ভাবনা, গণনাটকের মানবিক

আবেদন—সর্বহারা শোষিত নিপীড়িত মানুষের অধিকার অর্জনের বার্তা, সাম্প্রতিক নাটকের সমাজ ভাবনার গভীরতা ও বিপ্লবের জয়গান : এই সব উদ্দীপিত করেছে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যকে। সাম্প্রতিককালে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার প্রমুখ বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছেন ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ওপর। অন্যদিকে প্রেমচন্দ কৃষণচন্দর বিজয় তেণ্ডুলকর শিবকুমার জোষী মনোরঞ্জন দাস গিরিশ কারনাড প্রমুখ স্রষ্টারা আধুনিক বাংলা নাটকের কায়াকান্তি নির্মাণে অনেকখানিই সচেষ্ট হয়েছেন, বলা যায় তাঁরা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা নাটকই বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে আধুনিক ভারতীয় নাটকের ওপর। প্রথমত, ভাব অনুসরণের দ্বারা, দ্বিতীয়ত, অনুবাদের দ্বারা, তৃতীয়ত, অভিনয়ের দ্বারা। সম্প্রতিকালে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান আর নেই, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষরাও কাছাকাছি আসছেন। তাই নাটক পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার না করে সোজাসুজি অনূদিত ও অভিনীত হচ্ছে বেশি মাত্রায়। একই মানসিকতা দেখা যাচ্ছে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার নাটকে। এই সর্বব্যাপ্ত সার্বভৌম মানসিকতার উজ্জ্বল অপরূপ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ যার মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ সংহত হয়েছে এবং অগ্রণী ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়ে যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের নাট্যসাহিত্যকে প্রেরণা দিয়েছেন উদ্বুদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের ভারতীয় ধর্ম ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে আমরা খ্যাতিমান পাঞ্জাবী নাট্যকার ও নাট্যতত্ত্ববিদ বলবন্ত গার্গীর কথা স্মরণ করতে পারি—

Ranindranath Tagore stands as a unique figure in the history of Indian theatre. A great poet, a talented actor, director and composer, he had an inborn feeling for the stage. At a time when commercial companies were burdened with unwidely sets and ornate productions, Tagore discovered the vitality and freshness of folk theatre and taught his contemporaries simplicity of form and depth of theme. Steeped in the classics of Hindu drama and indigenous folk forms but alive to European techniques of production, he evolved a dramatic form which influenced Bengali theatre at the beginning of the century.[২৩]

রবীন্দ্রনাথের নাটকের লোক উপাদান, মুক্ত মঞ্চের আদর্শ, সঙ্গীত নৃত্যের অসাধারণ প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেন বলবন্ত গার্গী। তারপর বলেন —

When we talk of an Indian theatre national in form, we look around vaguely and wonder what it is. Is it the folk theatre? Or the ancient Sanskrit drama ? Or the Western influenced professional stage ? Nobody can lay a finger on it definitely as one can for example in the case of Peking Opera or the Kabuki theatre. But one can say with certainty that Tagore's plays are Indian through and through.[২৪]

অসমীয়া নাট্যকার অতুলচন্দ্র হাজরিকা জানালেন—"কবিগুরুর রচনার আশিস নির্মাল্য লৈ প্রতিটো ভারতীয় ভাষাই নিজক সমৃদ্ধ করিবলৈ প্রয়াস করিছে।"[২৫] গুজরাতি নাট্যকার শিবকুমার যোশী রবীন্দ্রনাথের নাট্যাদর্শ সম্বন্ধে বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথ এক মহান নাট্যকার। তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন মঞ্চকে। তৈরী করেছেন নতুন থিয়েটার যাকে বলা যায় মুক্ত মঞ্চ। বক্তব্যের দিক থেকে তিনি আধুনিক, তিনি চিরনবীন। তাঁর নাটকের আদর্শকে বলা যায় ইউনিভার্সল—সব দেশে সব কালে তার সমান আবেদন।"[২৬]

হিন্দী কবি নাট্যকার সুমিত্রানন্দন পন্ত বলেছেন—"ম্যয় কবীন্দ্র কী প্রতিভা কে গহরে কো ভী কৃতজ্ঞতা পূর্বক স্বীকার করতা হুঁ"।[২৭] ওড়িয়া নাট্যকার প্রাণবন্ধু কর বললেন—"অত্যন্ত উচ্চমানের কবি চিত্রশিল্পী ও স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক ফিলসফি বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত ও বৌদ্ধ দর্শন যা তাঁর নাটকের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। ... কবির চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা প্রভৃতিতে হাস্যরসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আধুনিক ভারতীয় নাটকের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম ও গভীর।"[২৮] এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের নাট্যকার নাট্যবিদ্‌দের কাছে গৃহীত হয়েছেন গভীর সম্মানে, বৃত হয়েছেন পরম শ্রদ্ধায়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ভারতীয় নাটকে দেখা গেছে—

ক - ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির গৌরবময় ও সমৃদ্ধময় প্রকাশ
খ - প্রাচীন ঐতিহ্যের নবীন রূপ
গ - প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমন্বয়
ঘ - অধ্যাত্ম চেতনা
ঙ - সামাজিক ভাবনা
চ - মানবিকতা
ছ - প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যময় প্রকাশ ও গভীর অনুভব
জ - সুতীব্র রোমান্টিকতা
ঝ - রূপক, প্রতীক ও সাংকেতিকতা
ঞ - গীতিময়তা
ট - ঋতুনাটক
ঠ - কাব্য নাটক
ড - ব্যঞ্জনাঢ্য ভাষা ও সংলাপ, কবিত্বময় সংকেতদ্যোতিত প্রকাশভঙ্গী।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে সমাদৃত হয়েছেন।

ক - ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের গৌরব, তার ঐশ্বর্য ও মহিমার উদ্ভাসন
খ - জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশচেতনার উন্মাদনা
গ - সাম্প্রদায়িক ঐক্য সাধন
ঘ - কল্পনার বিস্তার ও ভাবের গভীরতা
ঙ - অলংকৃত আবেগময় ভাষা
চ - দ্যুতিময় তীক্ষ্ণ সংলাপ
ছ - নান্দী প্রস্তাবনা ইত্যাদি প্রাচীন রীতির বিলোপ।

শরৎচন্দ্র ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে এক গভীর প্রেরণা। ভারতীয় নাট্যকাররা শরৎচন্দ্রকে গভীর সম্মানের স্থান দিয়েছেন। মরাঠী নাট্যকার বসন্ত কানেটকরের মতে "শরৎচন্দ্রকে একমাত্র শেকসপীয়রের সঙ্গে তুলনা করা চলে।"[২৯] গুজরাতি নাট্যকার শিবকুমার জোষী "গুজরাতের শরৎচন্দ্র"[৩০] হতে চেয়েছিলেন, হিন্দী কথাশিল্পী-নাট্যকার বিষ্ণু প্রভাকর শরৎচন্দ্রকে গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তাঁর শরৎচন্দ্রের জীবনী - উপন্যাস 'আওয়ারা মসীহা' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভারতীয় নাট্যকার নাট্যবিদ্‌দের কাছে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার মূলে আছে তাঁর এই বিশিষ্টতাসমূহ যার ছাপ আছে তাঁদের নাটকে—

ক - রোমান্টিক কোমল মাধুর্যময়ী এবং তার সঙ্গে আত্মমর্যাদাদীপ্ত তেজস্বিনী নারীর চিত্রণ

খ - নারীত্বের প্রকাশ, যা সতীত্ব থেকে স্বতন্ত্র
গ - পতিতা নারীদের চিত্র - তাদের সৎ শুভ হৃদয়ের প্রকাশ
ঘ - পারিবারিক প্রেমপ্রীতির গভীর বন্ধন:
যৌথ পরিবারকে ধরে রাখা
ভাই ভাইয়ের ভালবাসা
দেওর-বৌদির স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক
ঙ - সামাজিক সমস্যা সংকটের ছবি
চ - হৃদয়দ্রবী করুণরসের প্রবাহ
ছ - সহজ আকর্ষণীয় শিল্পরীতি
জ - প্রকাশভঙ্গীর যাদু।

তরুণ রায়ের সহজ জীবনানুরাগ; উৎপল দত্তর বিপ্লব ভাবনা, বস্তুবাদী দর্শন ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য; বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার নাট্যকলার প্রয়োগ, নমনীয় সহজ বহনযোগ্য স্বল্প ব্যয়ের প্রযোজনা, 'শারীর অভিনয়'-এর (ফিজিকাল অ্যাকটিং) চমৎকারিত্ব, 'অ্যাবসার্ড' দর্শন; মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অ্যাবসার্ডিটি ও প্রকাশের কবিত্ব; মনোজ মিত্রর ব্যঙ্গ কৌতুকাশ্রিত সমাজ ভাবনা ও মানববোধ—ভাব ও রূপের এই সব বৈশিষ্ট্য ভারতীয় নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করেছে।

অন্যদিকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নাটক বাংলায় গৃহীত হয়েছে গভীর মর্যাদায়। প্রেমচন্দের রচনায় ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কথা, কৃষক মজুর সর্বহারা মানুষের জীবনচর্যা, তাদের ম্লান অস্তিত্ব, সামাজিক অর্থনৈতিক শাসন শোষণের তীব্রতা এবং তার মধ্য দিয়েই জীবনের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, প্রাণশক্তির দুর্বার প্রকাশ, নির্বেদ স্থৈর্য, অবসাদ ও ঔদাসীন্য, বিষণ্ণ অন্ধকারকে অতিক্রম করে প্রতিবাদের ক্বচিৎ দীপ্তি : ভারতবর্ষের এক স্থির অবিকম্পিত চিরায়ত জীবন সত্যকে উদ্ভাসিত করে ও তা পায় মহাকাব্যিক মহিমা ও বিস্তার। প্রকাশভঙ্গীর ঋজু সারল্য, গদ্য ভাষার প্রত্যক্ষ আবেদন, বক্তব্যের নাটকীয় বিন্যাস ও প্রতিবেশের নিখুঁত চিত্রণ প্রেমচন্দের বক্তব্যকে আকর্ষণীয় ও হৃদয়স্পর্শী করে তোলে। সমাজমনস্ক নাট্যরসিক বাঙালীর কাছে প্রেমচন্দের গল্প কাহিনী অপরিমেয় আবেদন নিয়ে এসেছে এবং তার প্রভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্য হয়েছে সুন্দর সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যবান।

কৃষণচন্দের প্রতিবাদী ভাবনা ও প্রখর সমাজ সচেতনতা; বিজয় তেণ্ডুলকরের গভীর জীবনবোধ, তীব্র সমাজ ভাবনা ও অপরূপ শিল্পময় রূপায়ণ (বিশেষত জব্বর প্যাটেল পরিচালিত 'ঘসিরাম কোতোয়াল' ইত্যাদি প্রযোজনা); বলবন্ত গার্গীর বুদ্ধিবাদী চিন্তাধারা ও জীবন প্রত্যয় প্রভৃতি বাংলার নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করেছে ও তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে এঁদের নাটক অনুবাদে অভিনয়ে এবং নতুন নাটক সৃষ্টিতে।

সময় এগোচ্ছে, ভাবনাও পরিবর্তিত হচ্ছে, প্রাদেশিকতার সীমারেখা ভেঙে ভারতের শিল্পচেতনাও সংহত নিবিড় হয়ে উঠেছে। দিল্লীর 'অভিযান' নাট্যসম্প্রদায়ের নাট্যপরিচালক রাজিন্দর নাথ ভারতবর্ষের ঐক্যভাবনার কথা বলেছেন যেখানেও বাংলা নাটকের অগ্রণী ভূমিকা আছে—"ত্রিচুরে এক অনুষ্ঠানে বাদলবাবুর একটা নাটক আমরা হিন্দীতে পরিবেশন করেছিলাম। এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে গিয়ে গিরিশ কারনাড বলেন, 'আমি এক কন্নড় নাট্যকার, আজ মালয়ালী দর্শকদের কাছে এক বাঙালী নাট্যকারের নাটকের হিন্দী অনুবাদের অভিনয়ের উদ্বোধন করছি'। এই ধরনের

আত্মীয়তাই আজকের ভারতীয় থিয়েটারের প্রাণবস্তু।"[৩১]

আজকের নাটক শুধু সাংস্কৃতিক সমন্বয়ই ঘটাচ্ছে না, সমগ্র জাতির মিলনের আহ্বানও তাতে মন্দ্রিত হচ্ছে। ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ৮ মে ১৯৮৪ কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ভারতীয় নাট্য সম্মেলন'-এর উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য। সেখানে বিভিন্ন ভাষার নাট্যসমালোচকগণ আধুনিক কালের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নাটক নিয়ে আলোচনা করেন এবং পঞ্জাবী ওড়িয়া তামিল তেলুগু ইত্যাদি ভাষা থেকে বাংলায় রূপান্তরিত চারটি ছোট নাটক অভিনয় হয়। "সেদিনের এই ছোট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে যেন গোটা ভারতবর্ষ উপস্থিত হয়। বাংলা হিন্দী ওড়িয়া অসমীয়া তামিল তেলুগু পঞ্জাবী মারাঠী কন্নড় গুজরাতী — নাট্যাভিনয় নাট্য-সঙ্গীত নাট্য আলোচনায় সমগ্র ভারতবর্ষের এক সম্মিলিত উজ্জ্বল অপরূপ ছবি আঁকা হয়েছিল। আজ যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে ভারতবর্ষে অনৈক্য বিভেদ প্রবল হয়ে উঠতে চাইছে, সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতার হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, দেশের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে তখন এই জাতীয় অনুষ্ঠানের উপযোগিতা অপরিসীম।"[৩২]

এভাবেই গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের আধুনিক কালের অপরূপ ঐশ্বর্যময় নাট্যসাহিত্য। এবং বাংলার সঙ্গে ঘটেছে তার নিবিড় অচ্ছেদ্য যোগসূত্রের বন্ধন।

সূত্র পরিচিতি

১. Nehru The First Sixty Years (Vol One), Ed. Dorothy Norman, P. 215 - 216. Bombay, 1965.
২. The Collected Works of Mahatma Gandhi (Vol 43), p. 183 - 184, New Delhi, 1971.
৩. ভারত সন্ধানে, জহরলাল নেহরু (সিগনেট সংস্করণ), পৃ: ৩২ - ৩৩, কলিকাতা, ১৩৫৬।
৪. স্বাধীনতা সংগ্রাম, ড: বিপান চন্দ্র ড: অমলেশ ত্রিপাঠী ড: বরুণ চন্দ, পৃ: ২৮৫ - ২৮৭, নয়া দিল্লী, ১৯৮১।
৫. 'The horrible face of a soulless alien despotism had revealed itself to the Indian people in all its nakedness. A new chapter in the history of India's struggle for freedom had begun'–Subas Ch. Bose (The Indian Struggle, 1935 – 1942, P. 45, 1952).
৬. 'In India the proletariat has already developed to conscious political mass struggle – and that being the case, the British regime is doomed' – V.I. Lenin, collected works Vol. 15 (article, The Inflammable Material in World Politics), P. 184 Moscow, 1963.
৭. Ibid, P. 183 - 184.
৮. 'I am convinced that the only key to the solution of the world's problems and of India's problems lies in socialism.... That involves vast and revolutionary changes in our political and social structure, the ending of vested intersts in land industry as well as the feudal and autocratic Indian states system'–Nehru, Lucknow Congress – Presidential Address. Nehru The First Sixty Years (Vol. One), Ed. Dorothy Norman, P. 433, Bombay, 1965.
৯. সরকারপক্ষ ও মালিক এই চটকল ধর্মঘট ভাঙতে যেন সম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি অশুভ ও ক্ষতিকর পথ গ্রহণ না করে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে

তিনি বিবৃতি দেন The Hindu পত্রিকায় ৩০ এপ্রিল ১৯৩৭ এ। বিবৃতিটি দ্রষ্টব্য - ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (চতুর্থখণ্ড), নেপাল মজুমদার, পৃঃ ১৯২ - ১৯৩, কলিকাতা, ১৯৭১।

১০. মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, ধনঞ্জয় দাস সম্পাদিত, পৃঃ নয়, কলিকাতা, ১৯৭৫।

১১. Marxist Cultural Movement (1936-1947), Ed. Sudhi Pradhan [article - On the Progressive Writers Movement, Mr. M. R. Anand P. 1-22]. Calcutta, 1979.

১২. Raushnai, Sajjad Zahir. Ref. The Influence of the West on Punjabi Literature, Dr. M. P. Kohli, P. 62 - 63, Ludhiana, 1969.

১৩. Marxist Cultural Movement (1936 - 1947), Ed. Sudhi Pradhan. Calcutta, 1979.
'কুছ বিচার', প্রেমচন্দ। প্রথম গ্রন্থে ইংরাজী ও দ্বিতীয় গ্রন্থে হিন্দী ভাষণটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত।

১৪. ভারত সন্ধানে, জহরলাল নেহরু, সিগনেট সংস্করণ, পৃ: ২ - ৩, কলিকাতা, ১৩৬৫।

১৫. তদেব, পৃ: ৫৬৪ ও ৫৬৬।

১৬. নাট্যচিন্তা : শিল্পজিজ্ঞাসা, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৩৬ - ৩৩৭, কলিকাতা, ১৯৭৮।

১৭. The Indian Theatre, Adya Rangacharya, P. 137 - 138, 1st Edition, New Delhi.

১৮. সাহিত্যের পথে - আধুনিক কাব্য, রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম - শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৪ খণ্ড, পৃ: ৩৪১ - ৩৪৮)।

১৯. 'Mr. Benett and Mrs. Brown' (1924), Virginia Woolf, reprinted in Collected Essays, Vol. I, P. 321, London, 1966

২০. Modernism, Malcolm Bradbury and James McFarlane, P. 25, Penguin Edition.

২১. Indian Literature, Sahitya Akademi, Book Cover, April-Sept. 1958, New Delhi.

২২. Indian Lit. since Independence, Ed. K. R. S. Iyenger, P. VIII, New Delhi, 1973.

২৩. Theatre in India, Balwant Gargi, P. 116, New York 1962.

২৪. Ibid, P. 123.

২৫. তপতী, অনুবাদ অতুলচন্দ্র হাজরিকা, আমার কথা, গুয়াহাটী, ১৯৬১

২৬. অনুবাদ পত্রিকা, বৈশম্পায়ণ ঘোষাল সম্পাদিত, (সারা ভারতবর্ষের মানুষ আমার প্রিয়জন, শিবকুমার জোষী, পৃ: ৫৯) ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭, কলিকাতা।

২৭. পল্লব, ভূমিকা, সুমিত্রানন্দন পন্থ।

২৮. প্রসঙ্গ রবীন্দ্র নাট্য, বীরেন্দ্র বসু দিলীপকুমার মিত্র সম্পাদিত (প্রবন্ধ - রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রসঙ্গে, প্রাণবন্ধু কর, পৃ: ৪৯), কলিকাতা, ১৯৮৭।

২৯. Lecture, Basant Kanetkar, Natya Sodh Sansthan, Cassette No. 172, 26.11.85, Calcutta.

৩০. অনুবাদ পত্রিকা, বৈশাম্পায়ণ ঘোষাল সম্পাদিত (সাক্ষাৎকার - সারা ভারতবর্ষের মানুষ আমার প্রিয়জন, শিবকুমার জোষী, পৃ: ৫৯) ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, কলিকাতা।

৩১. বহুরূপী (৪০) পৃ: ৯৬, কলিকাতা, ১৯৭৩।

৩২. পশ্চিমবঙ্গ, পৃ: ৩০, কলিকাতা, ৩ আগস্ট ১৯৭৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক অসমীয়া নাটক

২. সূচনা পর্ব

এক অসাধারণ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে অসমীয়া নাটক উনবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হল। একদিকে মধ্যযুগের উজ্জ্বল ঐতিহ্য অন্যদিকে আধুনিক ভাবধারা ও শিল্পচেতনা - দুয়ের সমন্বয়ে সুন্দররূপে গড়ে উঠল নাটক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে অসমীয়া যুবকগণ কলকাতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার কালে বাংলা নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত হন ও তদনুযায়ী নাট্যচর্চায় ব্রতী হন। কলকাতার মঞ্চের মত গুয়াহাটি যোরহাট তেজপুর প্রভৃতি স্থানে মঞ্চ স্থাপিত হয়। আধুনিক অসমীয়া নাটকের জন্মলগ্নে এইভাবে বাংলা নাটক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।[১]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে কটি অসমীয়া নাটক লেখা হয় তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল সামাজিক দুরবস্থা ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা। এদের মধ্যে উল্লেখ্য **গুণাভিরাম বরুয়ার** বিধবা বিবাহ সমর্থন করে লেখা 'রামনবমী'। **হেম বরুয়ার** 'কানীয়া কীর্তন' (১৮৬১) মাদক আসক্তির কুফল দেখায়। রুদ্ররাম বরদলৈ রচিত 'বঙাল বঙালনী' (১৮৭২) সামাজিক নীতিহীনতা ও ব্যভিচারকে আঘাত করে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বেশ কটা পৌরাণিক নাটক লেখা হয়। **রমাকান্ত চৌধুরীর** 'সীতাহরণ' (১৮৭৫) সম্ভবত প্রথম আধুনিক অসমীয়া পৌরাণিক নাটক। এতে মেঘনাদ বধ কাব্যের মত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ আছে। অন্যান্য নাটক হল ভারতচন্দ্র দাসের 'অভিমন্যু বধ' (১৮৮৫), রজনীকান্ত বরদলৈ প্রমুখের 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৯১), পূর্ণকান্ত শর্মার 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' (১৮৯৩) প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা বাড়ে, ফলে নাটকও বেশী লেখা হয়। বেনুধর রাজখোয়ার 'দুর্যোধনর উরুভঙ্গ' (১৯০৩), দুর্গাপ্রসাদ মজিন্দার বরুয়ার 'গুরু দক্ষিণা' (১৯০৩) প্রভৃতি এ সময়ের উল্লেখ্য নাটক।

অসমীয়া পৌরাণিক নাটক বিশিষ্ট হয়ে ওঠে **চন্দ্রধর বরুয়ার** (১৮৭৪ - ১৯৬১) হাতে যিনি পৌরাণিকের সঙ্গে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকও লিখেছেন। তাঁর স্মরণীয় সৃষ্টি 'মেঘনাদ বধ' (১৯০৪) যার বিষয় ও আঙ্গিকের ওপর মাইকেলের প্রভাব আছে। তাঁর 'তিলোত্তমা সম্ভব'ও (১৯২৯) মাইকেলকে অনিবার্যভাবে মনে করায়। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান নিয়ে লেখা 'রাজর্ষি' (১৯৩০) তার অপর পৌরাণিক নাটক। চন্দ্রধর বরুয়ার 'মেঘনাদ বধ'ই শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক।

দুর্গেশ্বর শর্মা (১৮৮২-১৯৬১)-ও পৌরাণিক নাটকে খ্যাতি অর্জন করেন। শেকসপীয়রের 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট' ও 'সিম্বেলিন' অবলম্বনে 'চন্দ্রাবলী' ও 'পদ্মাবতী' প্রায় নতুন হয়ে উঠেছে। তাঁর 'পার্থ পরাজয়' (১৯০৯) ও 'বালীবধ' (১৯১২) বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় - তৃতীয় দশকে অসমের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বিশেষ খ্যাতি পায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথমটি কমেডি ও দ্বিতীয়টি ট্র্যাজেডী। **অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী**-র 'জয়দ্রথবধ'

(১৯১২) বাংলা যাত্রাব আদর্শে লেখা। বলবাম পাঠকেব 'লবকুশ' (১৯১৪) সাবলীল আমিত্রাক্ষব ছন্দে বচিত পাঁচ অঙ্কেব নাটক। সুদক্ষ অভিনেতা চিত্রশিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ ইন্দ্রেশ্বব ববঠাকুব লেখেন 'শ্রীবৎস চিন্তা' (১৯২৭)। নাট্যকাব অভিনেতা **মিত্রদেব মহন্তব** প্রথম প্রকাশিত পৌবাণিক নাটক 'বিদেহী বিচ্ছেদ' (বচনা ১৯৩০ প্রকাশ ১৯৫০), দ্বিতীয 'প্রচ্ছন্ন পাণ্ডব' (১৯৫৬)। গীতিকবি **কমলানন্দ ভট্টাচার্যব** সৃজন ক্ষমতা তিনটি পৌবাণিক নাটকে বিশেষ প্রকাশিত 'অবসান', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'সাবিত্রী' ঃ শেষ দুটি নাটক লেখকেব মৃত্যুব পব প্রকাশিত।

বিংশ শতাব্দীব সুচনাতেই ঐতিহাসিক নাটক বচিত হযেছে। **পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুয়া**-কে (১৮৭১ ১৯৪৬) প্রথম ঐতিহাসিক নাট্যকাব বলা যায এবং সম্ভবত 'জযমতী'ই তাঁব প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। তাঁব দ্বিতীয ও তৃতীয বুবঞ্জীমূলক নাটক হল 'গদাধব' (১৮২৯ শক) ও 'সাধনী' (১৮৩২ শক)। গোহাঞি বৰুযাব সৃজন ক্ষমতা চমৎকাব প্রস্ফুটিত হয়েছে 'লাচিত ববফুকন' (১৮৩৭ শক) নাটকে যা স্বদেশিকতায দীপ্ত সমুজ্জ্বল। বিশিষ্ট কবিদ্রষ্টা **লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুযা** (১৮৬৪ ১৯৩৮) তিনটি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন— 'বেলিমাব', 'জযমতী', 'চক্রধ্বজ সিংহ' ঃ তিনটিবই বচনা কাল ১৯১৫। জাতিকে উদ্বুদ্ধ কবতে প্রেবণা দিতে এই গাম্ভীর্য পূর্ণ নাটক তিনি লেখেন। **চন্দ্রধব বৰুযাব** (১৮৭৪ - ১৯৬১) 'মোগলবিজয' ও 'আহোম সন্ধ্যা' দুটি নাটকই বচিত হয ১৯৩৬ এ কিন্তু প্রকাশকাল ১৯৭৫। ঐতিহাসিক নাটক ও পৌবাণিক নাটক পববর্তীকালেও বচিত হয়েছে অত্যন্ত সাফল্যেব সঙ্গে।

২. প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব

বর্তমান শতাব্দীব তৃতীয় দশক থেকে অসমীযা নাট্য সাহিত্যে এক বিচিত্র আবেগ উত্তেজনা অনুভূত হতে থাকে। কুড়ি সালেব পব থেকেই সমগ্র ভাবতবর্ষ এক অস্থিব উন্মত্ত আবেগে স্পন্দিত হচ্ছে ভাবতবর্ষেব এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তেব মানুষ ইংবেজ বিতাডনেব অগ্নিযজ্ঞে মেতে উঠেছে, লক্ষ প্রাণ গর্জন কবে উঠেছে - বৃটিশ ভাবত ছাডো। অসমেব মানুষও বিদ্রোহী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হন। তীব্র স্বদেশানুবাগ তাদেব চেতনাকে বিস্ফাবিত কবল, মাঠে মযদানে নগবে প্রান্তবে উদ্দীপিত হ'ল বিদ্রোহেব অগ্নিশিখা। "২০ চনব পাছতহে মহাত্মা গান্ধীব নেতৃত্বত সমগ্র ভাবতবাসীয়ে মুব তুলি মুকলি ভাবে কব পবা হল - 'স্ববাজ আমাব জন্ম সত্ব'। স্বাধীনতাব ওঙ্কাব ধ্বনিত সুপ্তসিংহ সাব পাই গবজি উঠিল। জাতীয যজ্ঞত আহুতি দিবলৈ জনগণ গলবস্ত্র হৈ দলে দলে আগবাঢি আহিল। কেবে ললে মন্ত্রপূত সচন্দন ফুল বেল পাত, কেবে ললে পূর্ণাহুতিব ঘৃতপূর্ণ স্রুব-স্রুচ। জাতীয় যজ্ঞব এই ওঙকাবধ্বনি - প্রতিধ্বনি নাট্য সাহিত্যেব আঁবে - আঁবে ছেগা-চোবোকা ভাবে হলেও বিণিকি বিণিকি কাণত পবিল।"[২] অতুলচন্দ্র হাজবিকা, জ্যোতিপ্রসাদ আগবওয়াল, গণেশ গগৈ, প্রবীণ ফুকন, নকুল ভুইঞা, লক্ষ্যধব চৌধুবী, প্রসন্নলাল চৌধুবী, দুলাল বৰুযা, প্রমুখ নাট্যকাবগণ এই মহান দাযিত্ব পালন কবতে এগিয়ে গেলেন যুগেব এই আবেগ উত্তেজনা উন্মাদনা তাঁদেব নাটকে ৰূপাযিত হল, অসমীযা নাট্য সাহিত্যে নতুন যুগেব সূচনা হল — সূত্রপাত হল আধুনিকতাব।

It was in the third decade of this century that the modern drama came to its full glory in Assamese[৩]

প্রায় প্রতি শহবেই নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হল এবং অভিনয় ক্ষেত্রে নব নব প্রতিভা বিকশিত হতে লাগল, পূর্বোল্লিখিত নাট্যকাবগণ প্রয়োজনীয় নাটক বচনা কবলেন, ছোট

টাউন থিয়েটারগুলোকে কেন্দ্র করে ড্রামাটিক সোসাইটি গড়ে উঠতে শুরু করল। নাট্যপ্রয়োজনার পদ্ধতি পরিবর্তিত ও উন্নত হল, অভিনেত্রীরা স্ত্রী চরিত্রে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। অভিনয় যথার্থই এক শিল্পকলা রূপে পরিগণিত হল।

ত্রিশের ঐতিহ্য পূর্ণতা পাবার আগেই এসেছে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অসমের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনে এনেছে বিপর্যয়, সর্ববিধ মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়েছে। নাটকে তাও রূপবিম্বিত হল।

কেবল নাটকে নয়, শিল্পীরা জীবন দিয়ে অনুভব করলেন যুদ্ধের ডাক বিদ্রোহের আহ্বান। লক্ষ্যধর জ্যোতিপ্রসাদ বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ব্রজ শর্মা প্রমুখ শিল্পীরা যেন সৈনিক হলেন সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। বিদ্রোহ তাঁদের বিষয়, সমাজ তাঁদের রঙ্গমঞ্চ, আর জনগণ হলেন কুশীলব। যেমন জ্যোতিপ্রসাদের 'লভিতা' একটা সাধারণ নাটক নয়, তা হল ৪২-এর মূর্ত প্রতীক — অগ্নিপ্রদীপ্ত বীর্যবান মহিমাময় বিয়াল্লিশ এই নাটকে যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

দেশকালের এই পটভূমিকায় সারা ভারত গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে সমতা রেখে অসমেও গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটল। ১৯৪৩ - ৪৪ সাল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আছড়ে পড়েছে অসমের প্রান্ত দেশে। অসমের সুনীল আকাশে বোমারু বিমানের আনাগোনা, বাতাসে বারুদের বিষাক্ত গন্ধ, সুন্দর প্রাকৃতিকশোভা ঝলসে যাচ্ছে আগুনে। অন্যদিকে জেগে উঠছে জনতা : প্রবল হয়েছে স্বাধীনতার আন্দোলন। অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অমানবিক বর্বরতায় দমন করতে চাইছে স্বাধীনতার দুরন্ত সংগ্রামকে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অনিবার্য দোসর হয়ে এল মজুতদার মুনাফাখোর কালোবাজারীর দল - তারা ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত দংষ্ট্রা দিয়ে মানুষের রক্ত পান করতে শুরু করল। যুগ যুগান্তরের সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অসমীয়া মানুষ সহ্য করতে পারল না অন্যায় অত্যাচার। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এরা সামিল হল, সমবেত হল আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকাতলে, স্বাধীনতার বেদীতে প্রাণ দিলেন কণকলতা, কুশল কুঁয়র, ভোগেশ্বরী, মুকুন্দ কাকতি প্রমুখ বীর বীরাঙ্গণারা; মুনাফাখোর মজুতদার কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল সাধারণ মানুষ। দেশবাসীর এই ক্রোধ ক্ষোভ জ্বালা যন্ত্রণা দাহকে রূপ দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন গণশিল্পীরা, আসামের বিভিন্ন জায়গায় গঠিত হল গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রফুল্ল বরুয়া, রঘু চৌধুরী, অনাদিরাম দাস, কুলধর চলিহা, করুণাধর বরুয়া, সুরেশ গোস্বামী, সৈয়দ আবদুল মালিক, নিজাম উদ্দিন হাজরিকা, গোবিন্দ শর্মা, মুক্তা বরদলৈ, নগেনে কাকতি, নগেন শ্যাম, গুরু কামিনী সিং, নীলেশ্বর ব্রহ্ম, রবীন বসুমাতারি, বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, মণি ভট্টাচার্য প্রমুখ। বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকার সংস্কৃতিবান মানুষরা গণনাট্য আন্দোলনকে জোরদার করে তুললেন। রচিত হল অজস্র গান কবিতা নাটক। বিভিন্ন স্কোয়াডে অভিনীত হল গণনাটক, প্রদর্শিত হল 'রক্তের ঋণ' প্রভৃতি নৃত্য নাটক, কুশল কুঁয়রের ফাঁসির ছায়াছবি, গণশিল্পীরা গানে গানে মাতিয়ে তুললেন হাজার হাজার মানুষকে।

অতুলচন্দ্র হাজরিকা (১৯০৩-১৯৮৬) নতুন যুগের নাট্য সাহিত্যের অগ্রণী পুরুষ। আজীবন শিক্ষাব্রতী শ্রীহাজরিকা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার অনশ্বর স্বাক্ষর রেখেছেন। অসমীয়া সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি বিভাগ তাঁর স্পর্শে দীপ্ত বিশেষত কবিতা ও নাটক। পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক সব ধরনের নাটক তিনি লিখেছেন। বিশেষ করে পৌরাণিক নাটকের মণিমাণিক্যপূর্ণ ভাণ্ডার তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

অতুলচন্দ্র হাজরিকা প্রথম পর্যায়ের দুটো নাটক 'বেউলা' (পৌরাণিক) ও 'কনৌজ কুঁয়রী' (ঐতিহাসিক) ১৯২৩ সালে রচিত হয়। 'স্বদেশমন্ত্রত আত্মবলিদান' নাটকটিও তিনি এই সময়েই রচনা করেন। সেই সময় অসম রঙ্গমঞ্চ বাংলা নাটকের অনুবাদে ভরপুর - কিছু ছায়ানুবাদ, কিছু ভাবানুবাদ, কিছু সম্পূর্ণ অনুবাদ। এতে অসমীয়া সাহিত্যানুরাগী মানুষের মন কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছিল না। দেশে তখন মৌলিক নাটকের অভাব মানে চিন্তাশীল লেখকের অভাব। তরুণ লেখক হাজরিকা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি অসমীয়া নাটকের এই অভাব দূর করবেন। তিনি একে একে নাটক রচনা করতে শুরু করলে তা মঞ্চে অভিনীত হতে লাগল। নতুন ও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন স্রষ্টারূপে নাট্যকার অভিনন্দিত হলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে লিখে চললেন—নরকাসুর, দাতাকর্ণ, ছত্রপতি শিবাজী, চম্পাবতী, নন্দদুলাল, কুরুক্ষেত্র, শ্রীরামচন্দ্র, সতী, মানস প্রতিমা, মর্জিয়ানা, টিকেন্দ্রজিৎ ইত্যাদি।

'বেউলা' পাঁচ অঙ্কের নাটক — পদ্ম পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনীকে মঞ্চের উপযোগী করেছেন নাট্যকার। 'নরকাসুর' (১৯২৬) চার অঙ্কের নাটক, মূলত কলিকাপুরাণের অনুসরণ করেছেন নাট্যকার নাট্যরূপ নির্মাণে। 'নন্দদুলাল' সঙ্গীতবহুল নাটক —শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ পর্যন্ত কাহিনী এতে ব্যাপ্ত।

'কনৌজ কুঁয়রী' (বা হিন্দুস্থান বিজয়) ঐতিহাসিক নাটক কটন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় লেখেন। 'বিদেশী মুসলমান সকল' ভারতবর্ষে কেমন করে ঢোকবার সুবিধে পেয়েছিল নাটকে তাই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই সঙ্ঘর্ষ আধুনিক ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলিমের সংঘাতের মত নয়। নাট্যকার দেখিয়েছেন হিন্দুর শত্রু হিন্দু — মুসলমান নয়। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের বিবাদ বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে নাট্যবস্তু গঠিত হয়েছে ও তার সঙ্গে রয়েছে মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ ও দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে হারিয়ে ভারত অধিকার।

'টিকেন্দ্রজিৎ' পাঁচ অঙ্কের নাটক--মণিপুরের বীর সন্তান দেশপ্রেমিক টিকেন্দ্রজিতের জীবন নিয়ে লেখা। ১৯৫৮ সালে নাটকটি বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাতে তা সম্প্রচারিত হয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে আনন্দ দেয়। ১৮৫৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশব্যাপী আন্দোলনে শত সহস্র শহীদের বুকের রক্ত ঝরে। স্বাধীনতা আসেনা কিন্তু সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। মণিপুর রাজ পরিবারের টিকেন্দ্রজিৎ বীরযোদ্ধা স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৮৯১ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই শুরু করেন। পরিণামে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই মহান বীরের জীবন নিয়ে লেখা নাটকটি। শ্রী হাজরিকার নাটকে মহৎ আদর্শও এক গভীর প্রত্যয়ের উদঘোষণ পাওয়া যায় যা অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত।

জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৯০৩ — ১৯৫১) এক অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী স্রষ্টা। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা আধুনিক অসমীয়া নাটকের মহানায়ক মহান উদ্গাতা রূপে চিরস্মরণীয়।

স্বল্পপরিসর এই জীবনের সাধনায় জ্যোতিপ্রসাদ অপরিসীম সিদ্ধি অর্জন করেছেন। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসমকে আধুনিক ভারতবর্ষের মানচিত্রে উজ্জ্বলবর্ণে দীপ্ত করেছেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধাও। তিনি অসমকে, অসমীয়া মানুষদের কেবল বিদেশী শাসন শৃঙ্খল থেকেই মুক্ত করতে চাননি, সর্ববিধ সামাজিক নীতিনিয়ম সংস্কার গোঁড়ামি থেকে, কিছু সমাজ-প্রতিষ্ঠিত অর্থবান পরস্বভোগী লোভী লোলুপ মানুষের ভয়ঙ্কর থাবা থেকেও শোষিত নিপীড়িত মানুষকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন।

তিনি অসম গণনাট্য সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ, প্রগতিশীল ভাবনার প্রবক্তা তিনি — তাঁর গণসঙ্গীত হাজার হাজার মানুষকে প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর নাটক আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটিয়েছে, তাঁর সঙ্গীতে দেশের প্রাণ আবেগে উচ্ছ্বাসে জ্যোতির্ময়তায় উদ্ভাসিত হয়েছে- প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনে সেই গান হয়েছে অপরূপ।

জ্যোতিপ্রসাদের রচিত নাটক হল — শোণিত কুঁয়রী, কারেঙর লিগিরী, লভিতা, রূপালীম, নিমাতী কইনা ও সোণপখিলী। 'শোণিত কুঁয়রী' জ্যোতিপ্রসাদের ছেলেবেলার রচনা, ভাবতে অবাক লাগে যে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে এই নাটক তিনি রচনা করেছেন। ভাগবতের উষা অনিরুদ্ধর কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাটক নির্মিত হয়েছে — উষাই হল শোণিত কুঁয়রী।

'কারেঙর লিগিরি' (প্রাসাদ কন্যা) নাটকটি জ্যোতিপ্রসাদের বিলাত ভ্রমণের কালে (১৯২৭ ২৮) লেখা। মধ্যযুগীয় এক কাল্পনিক কাহিনী এই নাটক - কিন্তু এক তীব্র জোরালো সংস্কারমুক্ত বন্ধনছিন্ন মানসিকতা এতে দুর্বার প্রকাশ লাভ করেছে। কাল্পনিক এক রাজ্যের রাজকুমার সুন্দর কোঁয়র। তার মা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাঞ্চনমতী নামে এক মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ সম্বন্ধ ঘটায়, কিন্তু সেই মেয়েরও এক প্রেমিক ছিল এই বিবাহে সেই ছেলে মেয়ে দুজনেরই মনে অশান্তি। সুন্দর কাঞ্চনমতীর হৃদয় পেল না, পেল না ভালবাসা। তার মানসিক যন্ত্রণা তীব্র। সে কাঞ্চনমতীকে নির্বাসন দেয় প্রেমিকের সঙ্গে। সুন্দর প্রকৃত পক্ষে লিগিরী (রাজসেবিকা) শেবালীর প্রণয়াসক্ত। এই সে কাঞ্চনমতীর প্রতি অনাসক্ত। সুন্দর শেবালী পরস্পরকে গভীরভাবে কামনা করে। কিন্তু এই অঘটন ঘটতে দেবে না কেউ, এই অসম মিলনের কথা ভাবাই যায় না, রাজকুমার বিবাহ করবে এক সামান্য মেয়েকে। তাকে সুন্দর বিবাহ করলে সুন্দরের অভিভাবকরা সুন্দরকে রাজ্যচ্যুত করবে বা হত্যা করবে - এই আশঙ্কা করে শেবালী আত্ম বিসর্জন দেয়। তার প্রিয়র সঙ্গে মিলনের শয্যা পাতা হল না, তাদের স্বপ্ন নিষ্ঠুর বেদনায় শেষ হল। এটা রোমান্টিক নাটক, কিন্তু রোমান্সের আবরণের মধ্যেও নাট্যকারের তীব্র দুর্বার বিদ্রোহী মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট। সুন্দরের মধ্য দিয়ে তিনি যুগপোষিত সংস্কার যুক্ত ভাবনার মূলে প্রবল আঘাত করে তাকে উৎপাটিত করতে চেয়েছেন। যে নিষ্ঠুর সংস্কার যে অন্ধ গোঁড়ামি যে ভয়ঙ্কর প্রথাবদ্ধতা মানুষের প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা ঘটায় এমন কি তার বিনাশ ঘটায় তার বিরুদ্ধে প্রবল নিঃসংশয় প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন বিদ্রোহী নাট্যকার জ্যোতিপ্রসাদ।

'লভিতা' (১৯৪৮) বিয়াল্লিশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় লেখা। তখন বৃটিশের বিরুদ্ধে অসম তথা ভারতবাসীর বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। নাটকের ঘটনা শুরু গোলাঘাটে লহরজান এরোড্রামের কাছে। এখানে রামেশ্বর বরুয়ার ঘর, তার শিক্ষিতা রূপসী মেয়ে লভিতা। মিলিটারী তাদের ঘর থেকে উঠে যেতে বললে লভিতা তীব্র প্রতিবাদ করে। উপায় না দেখে অসমীয়া এ আর পি ক্যাপ্টেন গোলাপ তাকে ফৌজদারের ঘরে রাখে আত্মরক্ষার জন্য। স্বাধীনচেতা লভিতা সেখানে থাকতে না পেরে চলে যায়। পথে মিলিটারী অসৎ অভিপ্রায়ে তাকে ধরে জোর জুলুম করছে, এমন সময় একজন অসমীয়া এ এস আই তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। সেই সময় এলাহী বক্স নামে এক বৃদ্ধ মুসলমান তাকে আশ্রয় দেয়। মুসলমানের ঘরে হিন্দু মেয়ে সুখে দিন কাটায়। গোলাপ নিজের বাড়ীতে লভিতাকে রাখার কথা ভাবে কিন্তু সমাজের ভয়ে সংকুচিত হয়। লভিতা গোলাপের সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির নিন্দা করে। সে ধাত্রীবিদ্যা শিখতে শুরু করে ও কোহিমায় তার চাকরী হয়। সেখানে কিছুদিন চাকরী করার পর সে কজন অসমীয়া সৈনিকের সঙ্গে

জাপানীদের হাতে বন্দী হয় ও তাদের উত্তর বর্মায় রাখা হয়। সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের অসমীয়া লেফটন্যান্ট বরুয়া আছে। সে লভিতা ও অপর বন্দী অসমীয়া সৈনিকদের বোঝায় এবং তাদেব আজাদ হিন্দ ফৌজে ভর্তি করিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য কোহিমাতে নিয়ে আসে। সেখানে বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লভিতা মৃত্যুবরণ করে।

নাটকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য লভিতার চরিত্র। সে নির্মল চরিত্রের সাহসী তেজস্বিনী নারী, সে উদার উন্নতমনা দেশপ্রেমিক। অন্যায় অপরাধের সঙ্গে সে চিরকাল লড়াই করেছে যা পরিপূর্ণতা পায় স্বাধীনতার সংগ্রামে। নেতাজী-র আজাদ হিন্দ ফৌজ-এ ভর্তি হয়ে সে বন্দুকধারিণী রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে। সৈন্যদের প্রতি সে বলে—"এখোজো পাছলৈ নাহিবা (কেউ পিছুবে না)। আজির যুদ্ধ জিকিবই লাগিব। যুদ্ধ করা, যুদ্ধ করা—প্রাণপনে শত্রুক ধ্বংস করা। আগ বাঢ়া, জয়হিন্দ জয়হিন্দ—জয়হিন্দ" (৫।৪)। ব্রিটিশের মেশিনগানের গুলীতে তার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। মৃত্যুর সময় তার কথায় দেশপ্রেমের সোনালী পরিচয় ধরা পড়েছে। সে সঙ্গীদের বলে 'যাবর সময়ত মোর অসম আইর (মায়ের) মাটিরে কপালত এটা ফোঁট দিয়া - মোর দেশর মাটিরে ফোঁট ... মই যাবর সময়ত অসমর সুবদিসুরীয়া নাম এটা গাই শুনোয়া অসমর সুবদি মাত — অসমর সুরীযা মাত ..."। 'লভিতা' নাটক সম্বন্ধে সমালোচকের উক্তি স্মরণীয়—

Labhita with its epic grandeur, it must be admitted, heralded the dawn of a new era in the realm of modern Assamese Drama and theatre.[৪]

'রূপালীম' প্রবল প্রেম ও সুতীব্র ঈর্ষার দ্বন্দ্ব, ভালবাসার সঙ্গে কামনার সংঘাত। রূপালীম নামক সুন্দরী নারীকে কেন্দ্র করে নাটক গড়ে উঠেছে—প্রেম প্রতিহিংসা যুদ্ধ সংঘাত মৃত্যু নাটককে ঘিরে আছে। 'নিমাতী কইনা' দুটি ছোট ছোট দৃশ্যে লেখা 'রূপকথা'। নাটকে রতনপুরের রাজার মেয়ে নিমাতীর সঙ্গে জ্যোতিদেশের রূপ কোঁয়রের সাক্ষাৎ হয় ও আনন্দের প্রস্রবণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রূপকুমার চিরসুন্দরের প্রতীক, সিদ্ধ সাধক; নিমাতী কইনা কলা-লক্ষ্মীর প্রতীক মানব-সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। চির সুন্দরের সাধনায় কলালক্ষ্মী জেগে ওঠে, হাসে, নৃত্যগীতে পৃথিবীকে মুখর উচ্ছল করে তোলে। সঙ্গীতের অপরূপ সুন্দর প্রয়োগ নাটকটিকে দিব্য সুরভিত করেছে। 'সোণ পখিলী' শিশুনাটক তবে অসমাপ্ত - যশস্বী নাট্যকার অতুল হাজরিকা একে সম্পূর্ণ করেন। নাটকটিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণবিলসিত পরিচয় আছে।

নকুলচন্দ্র ভূঞা (১৮৯৫ - ১৯৬৮) ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। গল্প কবিতা ইতিহাস - সবজাতীয় সৃষ্টির দ্বারাই তিনি অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৬৬ - ১৯৬৭ সালে তিনি অসম সাহিত্য সভার সভাপতি হন। অসমীয়া নাটকের অভাব পুরণার্থে তিনি নাট্যরচনায় ব্রতী হন ও অপরিসীম সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর নাটকের মধ্যে খ্যাত - জেরেঙার সতী (১৯২৪), বদন বরফুকন (১৯২৭), চন্দ্রকান্ত সিংহ (১৯৩১), বিদ্রোহী মরাণ (১৯৩৮), নুমলী কুঁয়রী (১৯৬৩), শাহ আই প্রভৃতি।

অসমের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার কাহিনী চিত্রিত হয়েছে 'বদন বরফুকন', 'চন্দ্রকান্ত সিংহ' ও 'বিদ্রোহী মরাণ' নাটকে। 'নুমলী কুঁয়রী'র ঘটনা আহোম যুগের মধ্যবর্তী কাল।

'বদন বরফুকন' অসম রাজনীতির এক দুর্যোগময় পটভূমিকায় লেখা। চন্দ্রকান্ত সিংহর রাজত্বকাল (১৮১০-১৮১৮) এক অরাজকতার কলে। রাজার অপদার্থতা ও অযোগ্যতা, প্রধানমন্ত্রী পূর্ণানন্দর প্রবল ক্ষমতা অর্জন, কামরূপের শাসন অধিকার

ভারপ্রাপ্ত (বরবফুকন) বদনের উচ্চাশা, অন্যান্য ফুকনের বদনের বিরোধিতা, বর্মী-অসমীয়া যুদ্ধ, বদনের দেশদ্রোহিতা ও শেষ পর্যন্ত তার হত্যাসাধন - ইতিহাসের জটিল বিক্ষুব্ধ সময়কে নাটকে রূপ দেওয়া হয়েছে। 'চন্দ্রকান্ত সিংহ' নাটকের পটভূমি আহোম রাজত্বের শেষ পর্ব। তবে ইতিহাসে চন্দ্রকান্তকে ভীরু দুর্বল প্রকৃতির বলা হয়েছে, এখানে তা হয়নি। নাটকের ঘটনায় প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের তৎকালীন স্বরাজ্য আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রবল প্রভাব পড়েছে। 'বিদ্রোহী মরাণ' নাটকও ঐতিহাসিক। শ্রীনকুল চন্দ্র ভূঞা মূলত ঐতিহাসিক নাটক লিখিলেও অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাবনাই তুলে ধরেছেন।

কীর্তিনাথ বরদলৈ (১৮৮৭ - ১৯৫২), **মুক্তিনাথ বরদলৈ** সঙ্গীত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। উভয়ে একসঙ্গে লিখেছেন 'বাসন্তীর অভিষেক' (১৯৩০), 'লুইত কোঁয়র' (১৯৩০), 'সুর বিজয়' (১৯৩৪), মেঘাবলী (১৯৫২)। মুক্তি বরদলৈ লিখেছেন 'অবলম্বন' (১৮৩৮), 'ভক্ত প্রহ্লাদ' (১৯৪৯), 'ববাগী' (১৯৫৪), 'শিশু গান্ধী' (১৯৬৩) — প্রভৃতি। এঁদের নাটক সঙ্গীত প্রধান গীতিনাট্য ধরনের রচনা। চরিত্রের কথোপকথন সঙ্গীতের মাধ্যমে সঙ্ঘটিত হয়। অমূর্ত অশরীরী বস্তুসমূহ মূর্তি পরিগ্রহ করে—যেমন রাগ-রাগিণী, প্রকৃতি প্রভৃতি।

লক্ষীকান্ত দত্ত অসম শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অতি পরিচিত নাম। কৃষ্টিবান সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ লক্ষীকান্ত একজন যথার্থ কর্মীও বটেন। একদিকে তিনি শিল্প সাধক অন্যদিকে শিল্প স্থাপক। ডিব্রুগড় আর্ট প্লেয়ারস সোসাইটি, সেন্ট্রাল কালচারাল অর্গানাইজেশন, ডিব্রুগড় সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর অভিন্ন সম্বন্ধ, অন্যদিকে নাটক সৃষ্টি—দুটোই তাঁর গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করে। লক্ষীকান্ত দত্তর 'মনোমতী' রজনীকান্ত বরদলৈ-এর ঐ নামীয় উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে লেখা নাটক। ইতিহাসের পটভূমিকায় জীবনের অস্থির উন্মাদনাময় তরঙ্গক্ষুব্ধ পরিচয় এতে বিধৃত। সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সমন্বিত সমাজ ও সংসারের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'সংসার চিত্র' নাটকে। 'মুক্তির অভিযান' (১৯৫৩)—বিয়াল্লিশের গণ আন্দোলন থেকে শুরু করে সাতচল্লিশের স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত ব্যাপ্ত কালসীমার একটা উজ্জ্বল চিত্র এখানে আঁকবার সার্থক প্রয়াস আছে। মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া হাজার হাজার নরনারীর প্রতিনিধি স্বরূপ অসমের কনকলতা, তিলক ও কুশল কোঁয়র প্রমুখ শহীদদের প্রাণ বিসর্জনের দৃশ্য এর রোমাঞ্চকর চিত্র। সঞ্জীব প্রভাত উদয় প্রমুখ একনিষ্ঠ সমাজ সেবকসেবিকাদের পরিচালনায় অভিযান সফল হয় ও সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট সকলে ভারতের জাতীয় পতাকার তলে সমবেত হয়ে 'বন্দোমাতরম' ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করে।

দৈবচন্দ্র তালুকদার (১৯০০ -১৯৬৭) কাব্য উপন্যাস সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে আপন প্রতিভার পরিচয় মুদ্রিত রেখেছেন। নাট্য সৃজনের ক্ষেত্রেও তাঁর অপরিসীম দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। অসমের প্রচীন কলাকৃষ্টি সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি নাট্যকারের সুগভীর শ্রদ্ধা, অসমের মধ্যযুগের ইতিহাসের রঙীন বর্ণাঢ্য চিত্রকে তিনি নাটকে তুলে ধরেছেন। যদিও সামাজিক ভাবনাও তাঁর নাটক দুর্নিরীক্ষ্য নয়—নাট্যকারের সামাজিক চেতনা তাঁকে আধুনিক কালের অগ্রণীক্ষেত্রে স্থাপন করেছে। তাঁর বিখ্যাত নাটক হল 'অসম প্রতিভা', 'বামুনী কোঁয়র', 'বিপ্লব', 'চন্দ্রকলা', 'ভাস্কর বর্মা' প্রভৃতি।

তাঁর প্রথম নাটক 'অসম প্রতিভা' (১৯২৪) অসমের মধ্যযুগের বৈষ্ণব ইতিহাসের পটভূমিকায় লেখা। শ্রীমন্ত শঙ্কর, মাধব প্রমুখ মহাপ্রাণ বৈষ্ণবদের নাটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

'বামুনী কোঁয়র' দৈবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটক। এর পটভূমি ঐতিহাসিক, ঘটনা তীব্র, গতি দুরন্ত—যদিও প্রচলিত রীতিতেই এটি লেখা।

'বিপ্লব' (১৯৩৭) অসম তথা ভারতবর্ষের অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা। দুঃস্থ দারিদ্র্য-পীড়িত প্রজারা জমিদারকে খাজনা দিতে না পারায় জমিদার ক্রুদ্ধ ও অত্যাচারত। কবি চন্দ্রমোহন জনগণকে জাগ্রত করতে বিপ্লবী গান লেখে ও তার মেয়ে পার্বতী সেই গান গায়। জমিদার পুত্র বিপিন কলকাতায় উচ্চশিক্ষালাভ করে স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দেয়। সে প্রজাদের আন্দোলনে অংশ নেয় কিন্তু জমিদারের সেপাইদের হাতে সাংঘাতিক আহত হয়। পার্বতীর সেবা শুশ্রূষায় সে আরোগ্য লাভ করে। উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। লেখকের বক্তব্যে ভাববাদ প্রবল, শ্রেণী সচেতনার পরিচয়ও প্রত্যক্ষ নয়, তবু দেশচেতনায় উজ্জ্বল মানসিকতার প্রকাশ সুন্দর ঘটেছে নাটকে।

প্রসন্নলাল চৌধুরী (১৮৯৮ - ১৯৮৫) একদিকে দেশপ্রেমিক অন্যদিকে সাহিত্য সা· ·। তিনি জনগণের প্রিয় শিল্পী ছিলেন। নাট্যাভিনয়েও তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। নাট্য · ·নায়ও তিনি বিশিষ্ট। 'নীলাম্বর' (১৯২৬) ঐতিহাসিক নাটক। অসম ইতিহাসের কমতাপুর ধ্বংসের কাহিনী এর মূল বিষয়। এটি সুদীর্ঘ পঞ্চাংক নাটক। 'অপেস্বরী' (১৯৬১) কাল্পনিক নাটক। স্বর্গের নটী বীণাকে ভালবেসেছিল মর্তের কবি চিত্র। অনেক দুঃখ বেদনার পর দেবতার বরে চিত্র বীণার মিলন হয়। এটা নিতান্তই রোমান্টিক নাটক—বস্তুভিত্তি এর নেই।

বিনন্দ বরুয়া বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। গদ্য পদ্য সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আছে। 'পার্থ সারথি' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিয়ে লেখা। 'শরাইঘাট' (১৯৩৭) অসম ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র নদের শরাইঘাটে মহাবীর লচিত বরফুকনের বীরত্ব সংগ্রাম ও দেশরক্ষার কাহিনী। 'বেঙেলা রহস্য' ও 'ট টি হেই' গ্রাম জীবনের হাস্যরসাত্মক চিত্র।

আনন্দ চন্দ্র বরুয়া কবিতা গান রচনায় সুদক্ষ। তাঁকে 'বকুল বনের কবি' বলা হয়। তাঁর রচিত কয়েকটি নাটক খ্যাতি অর্জন করেছে। 'বিজয়া' (১৮৫৪ শক) এক স্প্যানিশ নাটক অবলম্বনে লেখা। 'বিসর্জন' (১৯৩৪) রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড অবলম্বনে লক্ষ্মণ বর্জনের কাহিনী। 'কমতা কুঁয়রী' (১৯৪৫) ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে লেখা সুন্দর কাহিনী। এই নাটক তীব্র প্রবল নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য কোন কোন সমালোচক একই ঘটনা নিয়ে লেখা প্রসন্ননাল চৌধুরী 'নীলাম্বর'-এর মধ্যে নাটকীয় উপাদান ও উৎকর্ষ অধিক দেখেছেন। এই নাটক প্রচলিত রীতির ইতিহাসাশ্রিত রচনা, আধুনিক সমাজসচেতন মানুষের কাছে এর আবেদন কতটা বলা কঠিন।

দণ্ডিনাথ কলিতা (১৮৯০ - ১৯৫০) কবি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। এ্যাকাডেমিক গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল—সতীর তেজ, (১৯৩১) অগ্নি পরীক্ষা, (১৯৩৭) মুক্তির অভিযান, নগরর বিহুতলী, পরাজিত, কীচক বধ ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'সতীর তেজ' সর্বশ্রেষ্ঠ। সতী মাধবী আহোম রমণী জয়মতীকে নিয়ে আগেও নাটক লিখেছেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, পদ্মনাথ গোহাঞি বড়ুয়া, নকুল ভূঞা, গণেশ গগৈ প্রমুখ শিল্পীরা। দণ্ডিনাথের নাটক তাতে একটি উল্লেখ্য সংযোজন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্য স্বর্গদেও চুলিকফা তার বংশের রাজত্ব নিরঙ্কুশ ও নিষ্কণ্টক করবার জন্য রাজ্যের সিংহাসনে বসার যোগ্য সমস্ত যুবককে হত্যা করে বা অঙ্গক্ষত করে (কারণ আহোম রাজনীতিতে অঙ্গক্ষত রাজা সিংহাসনে বসার অযোগ্য)। দেশে কান্নার রোল ওঠে, কত

শত মানুষের প্রাণ যায়। হত্যাকারীরা খুঁজছে গদাপাণিকে। সতী নারী পতিপ্রাণ জয়মতীর কথায় গদাপাণি পালায়। রাজাদেশে জয়মতীকে ধরা হয়, স্বামীর সংবাদের জন্য তার ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়। কিন্তু সে কোন সংবাদ দিল না। অত্যাচারে জয়মতী মৃত্যু বরণ করে।

লক্ষ্মীধর শর্মা (১৮৯৮ ১৯৩৪) অসমীয়া সাহিত্যের সুপরিচিত শিল্পী সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদ। গল্প কবিতা ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার গৌরবময় পদচারণা ঘটেছে। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে তিনি দীক্ষিত স্বাধীনতা যুদ্ধের তিনি নির্ভীক সংগ্রামী সৈনিক। বিপ্লব তাঁর চেতনার মর্মমূলে বিদ্যমান। অজস্র নাটক তিনি লিখেছেন এবং আধুনিক অসমীয়া একাংকিকার পথপ্রদর্শক রূপে তিনি বিশিষ্ট।

'শৃঙ্খলা' (১৯৩১) নাটকে দেখানো হয়েছে কমলা ও জিতেনের প্রেম কীভাবে সমাজের প্রতিকূলতার জন্য সার্থকতা পায় না যক্ষ্মারোগাক্রান্ত জিতেনের মৃত্যু হয়। 'হৃদয়ের মূল' (১৯৩৬) একাংকিকায় সমাজের রূপ ফোটানো হয়েছে যেখানে বড় মানুষের লোভলালসা ও অপদার্থতা চিত্রিত। 'প্রজাপতির ভুল' নাটকেও কৌতুক রঙ্গের মাধ্যমে সামাজিক ছবি ফুটেছে।

'নির্মলা' (রচনা ১৯২৬ প্রকাশ অনেক পর) পারিবারিক বিষাদের নাটক। লেখকের ভগ্নী অল্পবয়সেই বিধবা হয়ে চিরকাল দুঃখভোগ করে। সেই ঘটনা লেখকের মনের গভীরে প্রোথিত। এই নাটকে এক বিধবা রমনীর প্রেম ও আত্মহননের কথা বেদনার রঙে আঁকা হয়েছে।

অন্যদিকে জোর কদমে এগিয়ে চলছে অসম গণনাট্য সঙ্ঘের কার্যকলাপ। অসম গণনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রতিবেদনে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'১৯৪৬ ৪৭ ৪৮ আসামের গণনাট্য বিকাশের যুগ। সভাপতি জ্যোতিপ্রসাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে গণনাট্য সঙ্ঘ বিকাশ লাভ করে। ১৫ই আগস্ট ও তারপর পাহাড়ের প্রতিধ্বনি'' প্রভৃতি ছায়ানাট্য, ''মাছ মরিয়ার জীবন '' ওজা আর ভূত ' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য আর বহু নতুন নতুন গানের সৃষ্টি হয়। চা শ্রমিকের সাদ্রী ভাষায় পান পালের লেখা নাটিকা 'বদলা লেনা' চা মজুর দর্শকদের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে দেখানো হয়। গণনাট্যের মঞ্চের জন্য জ্যোতিপ্রসাদ সেই সময়েই শহীদ কণকলতার জীবন নিয়ে একটি নাটক লিখতে সুরু করেন। কিন্তু তা অসমাপ্ত রেখেই তিনি আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যান। ১৯৪৮ সনে খোয়াং-এ নিখিল আসাম ট্রাইবল সম্মেলনে ডিব্রুগড স্কোয়াডের অনুষ্ঠান অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সেই সম্মেলনে সংস্কৃতি শাখার সভাপতি ছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা।

জোড়হাটে সৈয়দ আবদুল মালেকের রচনা ও নিজামুদ্দিন হাজরিকার সুর সংযোজনা অসম গণনাট্য সঙ্ঘের শক্তি বৃদ্ধি করে। 'ঘরতে লাগিছে জুই', 'বন্দীও কানদিনা মুকলি হবি' প্রভৃতি গান অসমের গ্রামে ও শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। নগাঁও শাখা মণি বরার পরিচালনায় নৃত্যনাট্যে ও ছায়ানাট্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। কাছাড় শাখায় এই সময়ে মণিপুরী কৃষকদের মধ্যে গণনাট্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের ফলে কাছাড়ের শ্রেষ্ঠ নৃত্য শিল্পী গুরু কামিনী সিং তাঁর দলবল নিয়ে গণনাট্যে যোগ দেন। 'আঠারটিলা' চা মজুরদের মধ্যে একটি গণনাট্যের শাখা গঠিত হয়। রামনগর, জয়পুর, পাথারকান্দি প্রভৃতি অঞ্চলে শাখা স্থাপিত হয়। মুক্তাধন সিং, ধনঞ্জয় সিং প্রমুখ গণনাট্য শিল্পীরা কৃষকের সংগ্রামী চেতনা নিয়ে বহু গান ও নাচ রচনা করেন। মণিপুরের বীর

টিকেন্দ্রজিৎ-এর জীবন অবলম্বন করে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। শিলচর টাউন শাখা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বিরোধী 'আবাদ' নাটক মঞ্চস্থ করে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। শিলং শাখার সভাপতি নলিনী মিশ্র আর সম্পাদক বিজন রায় ও হিরু দত্তের পরিচালনায় শিলং পাহাড়েও গণনাট্য সঙ্ঘের কাজ যথেষ্ট ব্যাপ্তি লাভ করে। ১৯৪৮ সনে শিলং শাখা প্রদর্শিত ছায়া নাটক 'টিরোট সিং' খাসিয়া পাহাড়ের সাংস্কৃতিক জীবনে এক যুগান্তর সৃষ্টি করে। বিস্মৃত ইতিহাসের পাতা থেকে উদ্ধার করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গত শতাব্দীতে খাসিয়া পাহাড়ের বিদ্রোহের পরিচালক বীর টিরোট সিং-এর জীবন আলেখ্য তুলে ধরা হয়। গণনাট্য সঙ্ঘ সাফল্যের সঙ্গে এই ছায়ানাট্য প্রদর্শন করে পর্বত এবং সমতলের সম্প্রীতির এক নতুন অধ্যায় রচনা করে। জয়ন্তীয়া পাহাড়ে জোয়াই শহরে বিগত শতাব্দীতে ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের নেতা কিয়াং নাংবার ফাঁসী হয়। গণনাট্য সঙ্ঘের ছায়াভিনয়ে বীর কিয়াং নাংবার জীবন আলেখ্য তুলে ধরে এক যুগান্তর সৃষ্টি করে"[৫]।

অসম গণনাট্য সঙ্ঘের কার্যাবলী আরো ব্যাপ্ত ও প্রসারিত হতে থাকে। সুরের জগতে গণনাট্য নিয়ে আসে নতুন জীবনমুখী সংগ্রামমুখী ধারা। জ্যোতিপ্রসাদের গানের ধারা নতুন উন্মাদনা আনে, তার সঙ্গে লোকসঙ্গীতকার আনন্দীরাম দাস, হেমেন ঠাকুর ও পরবর্তীকালে আবদুল মালেকের রচনাও ছিল। এই ধারায় ঢল নামিয়ে দেন ডঃ ভূপেন হাজরিকা। গণ জীবনের বিভিন্ন স্তরে সামাজিক বাস্তবতা অনুপম সুরের অবলম্বনে মুখর হয়ে উঠল তাঁর প্রেরণায়। অসমের গণজীবনের কাঠুরিয়া, পাথর ভাঙানিয়া, রেল চালক, চা মজুর জগনু রংমন, তাঁতিশালের মেয়ে রহদই আর পাল্কী চালক দোলাভারী এই সব চরিত্র এসে এতদিনকার নৈর্ব্যক্তিক সমাজ চেতনাহীন গানের ধারাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

নাটকের ক্ষেত্রে অসমে গণনাট্য সঙ্ঘ সঙ্গীতের মত সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও 'সোনালী ধাননী আরু সেউজিয়া কুঁহিপাত' (সোনার ধান ও সবুজ চা পাতার কুঁড়ি) 'ছপা শালার ছেকা' (ছাপাখানার দাগ) প্রভৃতি নাটকে সংগ্রামী নতুন বাস্তবতাকে সার্থক ভাবে মঞ্চস্থ করেছে। অসমের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দশ লক্ষের ওপর চা মজুরের চরিত্রকে মুখ্য চরিত্র করে এর আগে কোন নাটক অসমে হয় নি। চা মজুর চরিত্র অতীতের কোনো কোনো নাটকে আনা হলেও তা অত্যন্ত গৌণ পার্শ্বচরিত্র হিসেবেই এসেছে। 'তুফান' নাটকের নায়ক রন্টুর ভূমিকা অসম নাট্য-আন্দোলনের চরিত্রায়ণে এক দিগদর্শন। 'ছপাঁশালার ছেকা'তে দেখা যায় জীবনবিমুখ হতাশামূলক পরিবেশের মধ্যে প্রেস কর্মীর সংগ্রামের বলিষ্ঠ বাস্তবতা। ডিব্রুগড়ের 'নবপ্রভাত' নাটকও তেমন একটি সৃষ্টি। গণনাট্য সঙ্ঘের একটি মস্ত বড় দান হল প্রথম অপেশদার মঞ্চে সহাভিনয়ের রীতি প্রবর্তন"[৬]।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব

অসমীয়া নাট্য সাহিত্যে নতুন বাঁক ফিরেছে নবতর যুগের পত্তন হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকে বিশেষ করে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকে। নাটকের ভাব ও আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রেই অভিনব ও বিচিত্র পরিবর্তন দেখা গেল। পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটক বিদায় নিল, তীক্ষ্ণ তীব্র সমাজচেতনা নাটকে আত্মপ্রকাশ করল। যুদ্ধ আগেই প্রবল আঘাত হেনেছে জনজীবনের ওপর, প্রচলিত চিরায়ত মূল্যবোধগুলি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল পরিবর্তন এল। যে স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীরা সংগ্রাম করেছে প্রবলভাবে তা কিন্তু তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারল না। এই স্বাধীনতা নিছক রাজনৈতিক। কিন্তু

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা জনগণ পেল না। তা হয়ে রইল দূরের বিষয় এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ক্রমশই বাড়তে লাগল। অসংখ্য সমস্যায় দীর্ণবিদীর্ণ হল সমাজ, অর্থনৈতিক অসাম্য ও সামাজিক অনাচাব প্রকট হয়ে উঠল, একটা প্রবল হতাশা সুতীব্র বিদ্বেষ আচ্ছন্ন করল মানুষের চেতনাকে, সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাসে তীব্রভাবে ক্লিষ্ট আন্দোলিত হল তার মন। স্বাধীনতার পরবর্তী অসমীয়া নাটকে তাই রূপায়িত হল— পুরাণ ইতিহাসের সুদূর প্রান্ত থেকে নাটক নেমে এল নিকটে, তার গায়ে লাগল মৃত্তিকাব রঙ, প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের সমস্যা যেখানে রূপায়িত হল নির্মোহ নিস্পৃহতায়।

এর সঙ্গে ঘটে চলেছে সায়েন্স ও টেকনোলজির প্রসার। জগৎ জীবন সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হচ্ছে। বস্তুজগৎ তার চৈতনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কঠিন নির্মম বাস্তব ও বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিই ক্রমশ হয়ে উঠছে নাটকেব প্রধান বিষয়। তাই আধুনিক নাটকের বক্তব্য নির্দিষ্ট, লক্ষ্য স্থির, উদ্দেশ্য স্পষ্ট—মানুষের জীবন তার অন্বিষ্ট; অন্যদিকে সর্ববিধ আধিক্য আতিশয্য আংগিকগত অস্বচ্ছতা পরিহার করে আধুনিক অসমীয়া নাটক তীক্ষ্ণ তীব্র বেগবান হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক সঙ্কট কাটলেও সামাজিক জীবনে তীব্র অসন্তুষ্টি দেখা দিল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটল না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করবাব জন্য আগ্রহ সবল হল। গণজীবনের এই সমাজ সচেতনতার ভিত্তিতে নতুন নাটক গড়ে উঠল। 'শ্রেণী-বৈষম্য, ধনী দুখীয়ার ব্যবধান, অর্থনৈতিক সঙ্কট, নিবনুয়া সমস্যা আদিকে ধরি সামাজিক জীবনের উদ্ভব হোয়া সমস্যা সমূহে নাট্যকার সকলর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলত নতুন আরু পুরণির মাজত বিরোধ দেখা দিলে। পুরণি ধ্যান-ধারণার নতুন মূল্যায়নর প্রয়োজন অনুভূত হল। থোরতে ক'বলৈ গলে, অর্থনৈতিক অসমতাব ফলত সৃষ্টি হোয়া শ্রেণীদ্বন্দ্বর রূপ আরু নতুন নতুন জ্ঞানর পোহরত পুরণি সংস্কারর পরা মুক্তির চেষ্টা স্বাধীনতার পাছর নাটকত প্রধান বিষয়বস্তু হৈ পরিল। বিষয়বস্তুর লগে লগে প্রকাশ-রীতিরো পরিবর্তন হল। যুগর প্রকৃতি আরু শিল্প চেতনা অনুযায়ী নাট্যকার সকলে নতুন গঠন পদ্ধতি আরু ভঙ্গি গ্রহণ করিলে'[৭]।

আঙ্গিকের নতুনতর বৈশিষ্ট্য দেখা দিল একালের নাটকে। নাটকের আকৃতি ছোট হল। পূর্ব প্রচলিত অঙ্কদৃশ্যের প্রচলন লুপ্ত হল—অঙ্কবিভাগ, অঙ্কানুবর্তী দৃশ্যবিভাগ, দৃশ্যানুবর্তী পটপরিবর্তন, প্রস্তাবনা প্রভৃতি রীতি সাধারণভাবে পরিত্যক্ত হল। কোন কোন নাটকে দৃশ্য বিভাগ অঙ্ক বিভাগের স্থান নিল, কোথাও রইল দৃশ্য-বিহীন অঙ্ক, কোথাও অঙ্ক বা দৃশ্যের বদলে পরিস্থিতি বা বিষয়গত নামকরণ ঘটল—যেমন যুগল দাসের '১৮৫৭' নটা পরিস্থিতিতে বিভক্ত; নগাঁও নাট্য সমিতির 'পিয়লী ফুকন'-এর বিভাগ বিষয়গত, যেমন—'রজামৈদাম', 'সন্ধান', 'ফাঁচী' প্রভৃতি; লক্ষীকান্ত দত্তর 'মুক্তির অভিযান'-এর দৃশ্য বিন্যাসে আছে 'বিভ্রাট', 'সূত্রপাত', 'সংকল্প' প্রভৃতি। সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি বা নেপথ্য ভাষণ অবাস্তব ও অনাটকীয় রূপে বর্জিত হল। মাইক প্রভৃতি দিয়ে নেপথ্য ভাষণ ঘোষক ইত্যাদি নাটকে এল। নাটকে অভিনয় নির্দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে কথা-ছবি শৈলীর অনুকরণ দেখা দিল—যেমন দৈবচন্দ্র তালুকদার প্রবীণ ফুকন সত্যপ্রসাদ বরুয়া প্রমুখের নাটকে। স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরীর জন্য কোন কোন নাটকে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ মঞ্চ নির্দেশনা দেওয়া শুরু হল। Thus a new kind of drama with innovations in form and content marked the beginning of a new era in the Assamese dramatic world.[৮]

সারদা বরদলৈ (১৯০২ - ১৯৮৫) : 'বঙাল-বঙালনী' নাটকের বিখ্যাত লেখক রুদ্ররাম বরদলৈর উত্তর পুরুষ, নগাঁও নিবাসী সারদা বরদলৈ শিল্প সাহিত্য নাট্যানুরাগ বংশানুক্রমিক ভাবেই পেয়েছেন। অভিনয়েও তিনি পারদর্শী। স্বাধীনচেতা বরদলৈ চাকরীর বদলে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করেছেন। ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় থাকাকালীন 'স্টার', 'মিনার্ভা' ইত্যাদি থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগ ঘটে পরবর্তীকালে নাট্যকার অভিনেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তা তাঁকে সহায়তা করেছে। তিনি নগাঁও নাট্যমন্দির-এর বিশিষ্ট অবদান 'পিয়লী ফুকন'- এর অন্যতম লেখক - অপররা হলেন চন্দ্র ফুকন, যুগল দাস প্রভৃতি।

চার অঙ্কের 'মগরীবর আজান' (১৯৪৮) কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্যর সঙ্গে একত্রে লেখা ১৯৩৬ সালে। 'মগরীবর আজান' অসমের গ্রাম্য জীবনের নিপুণ বাস্তব চিত্র। হিন্দু-মুসলমান মিলনের সুন্দর চিত্র নাটকে অঙ্কিত হয়েছে যথাযথ।

'পহিলা তারিখ' (১৯৫৪) পাঁচ অঙ্কের সামাজিক নাটক, এটি আধুনিক কালের বিশিষ্ট অবদান। চাকুরীজীবী লোকের প্রবল অর্থসমস্যা ও তজ্জনিত পারিবারিক সামাজিক মানসিক সঙ্কট—এই নাটকে রূপায়িত। বাপুরাম শইকিয়া চাকুরীজীবী, সামান্য অর্থে কোন রকমে সংসার চালায়। তার পুত্র নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হলে অর্থাভাবে তার চিকিৎসা হয় না। সে মৃত্যুপথযাত্রী হয়। ডাক্তার এনে চিকিৎসা করা যায় না, মাসের পয়লা তারিখেই টাকা শূন্য। মাড়োয়ারী মহাজনও পাওনা টাকা আদায়ে ওর ওপর কেস করল। বাপুরামের অবস্থা দুঃসহ হয়ে ওঠে। অবশ্য মোকদ্দমায় সে জেতে। চাকুরীজীবী তথা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের প্রবল সঙ্কট এই নাটকে চিত্রিত।

'সেই বাটেদি' (১৯৫৭) দু অঙ্কের সামাজিক নাটক। চিত্রগুপ্ত বরুয়া চায়ের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। অভিজাত লোক বলে সে পরিচিত। তার পুত্র দিলীপের প্রকৃতি পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। চিত্রগুপ্ত বরুয়ার ড্রইংরুমে মহাত্মা গান্ধীর ফটোর তলায় লেখা আছে He showed us the way (সেই বাটেদি নামকরণের সূত্র)। পিতার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত দিলীপের মনে কোন নীচতা নেই, আছে ঔদার্য সহানুভূতি, সে চা বাগানের উপার্জনের টাকা গরীবকে বিলিয়ে দেয়। চিত্রগুপ্তর জীবনে এক গোপন ঘটনা ছিল—সে এক অবৈধ সন্তানের পিতা। সেই ছেলের সন্ধান পেয়ে দিলীপ তাকে ভাই বলে গ্রহণ করে কিন্তু বিমূঢ় লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্রগুপ্ত আত্মহত্যা করে। নাট্যকার দিলীপকে আদর্শবাদী চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন— জীবনের মহৎ আদর্শ কল্যাণকর ব্রত তার মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন। ধনীকন্যা আভিজাত্যগর্বিতা গীতা দিলীপকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে কিন্তু পরে দিলীপের মহত্ত্ব বুঝতে পেরে সে ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

সারদা বরদলৈ সাতষট্টি সালে কয়েকটি ছোটো নাটক প্রকাশ করেছেন —'সোনালী মইনা', 'পঢ়া শুনা করে যেই গাড়ী ঘোড়া উঠে সেই', 'রেকর্ডিং বিড়ম্বনা' ও 'বিহুবান'— এগুলি হাস্যরসাত্মক অথবা শিক্ষামূলক, সভা-সমিতিকে অনুষ্ঠিত হবার যোগ্য। বিহু উৎসবের উপযোগী শেষ নাটকটিতে মানুষে মানুষে মিলনের সুরই ঝঙ্কৃত।

প্রবীণ ফুকন (১৯১২ - ১৯৮৫) গুয়াহাটির বিশিষ্ট সমাজসেবী, নাট্যকার এবং অভিনেতাও বটেন। 'মণিরাম দেওয়ান' ও 'লাচিত বরফুকন' ঐতিহাসিক নাটক— ইতিহাসের আধারে সুতীব্র দেশানুরাগ ও প্রবল স্বজাতিপ্রীতি এর পরতে পরতে বিদ্যমান। বাকিগুলি সামাজিক নাটক - সমাজের বিবিধ সঙ্কটের নাট্যরূপ। তাঁর নাটক একাংকিকার সুন্দর নিদর্শন—একাংক নাটকের স্বল্প সীমিত পরিসরে সামাজিক ভাবনার রূপায়ন ঘটেছে।

'আসাম হলিউড' নাটক অসমের ভাবিষ্যৎ কলাকৃষ্টির এক সুন্দর শিল্পময় পূর্বাচিত্র। অসম হলিউড কোম্পানি স্থাপিত হয় ও একে কেন্দ্র করে প্রেমপ্রীতি হৃদয়ের বিস্তার, নারী স্বাধীনতা, প্রগতিশীলতা ইত্যাদি রূপ পেয়েছে। 'কাল পরিণয়' নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন কীভাবে ভেমপুরীয়ার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও পদ্মধর নরযার মত লোক প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে লজ্জিত অপমানিত হয় — এটা মানবিকতার অপমান।

'শতিকার বাণ' (১৯৫৪) নাটকেও স শ্কারমুখী প্রগতিশীল মনোভাব ফুটে উঠেছে। অর্থ ও প্রেম — এই দুইকে কেন্দ্র করে নাটক গড়ে উঠেছে এবং যথার্থ প্রেমই যে মানুষকে মূল্য দেয় সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'বিশ্বরূপা' (১৯৬১) নাটকে প্রবীণ ফুকনের প্রগতিশীল দুবার চিন্তাধারা সার্থক রূপ পেয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তিত্বময়ী নারী বেণু তার চরিত্রহীন লম্পট স্বামী হেমন্তর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করে ও কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বেণুকে গ্রহণ করতে চায়। এদিকে হেমন্ত আবার বেণুকে ফেরাবার জন্য আসে। বেণু উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করে এবং নাট্যকার অভিনেতা উদার চরিত্রবান শচীপ্রসাদকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে। নাটকে নাট্যকারের বলিষ্ঠ সংস্কারমুক্ত দৃঢ় সাহসিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বেণুর চরিত্রের তেজ নির্ভীকতা সাহসিকতা অসমীয়া নাট্য সাহিত্যে দুর্লভ। শচীপ্রসাদের চরিত্রও সুন্দর উজ্জ্বলভাবে ফুটেছে — সে নাট্য জগতের উজ্জ্বল পুরুষ, মানবিক গুণসম্পন্ন, সহানুভূতিপরায়ণ এবং ব্যক্তিগত সুখৈশ্বর্যের প্রতি উদাসীন। সে স্বামী পরিত্যক্তা দুঃখিনী সমাজধিকৃতা অথচ নিষ্পাপ রমণী বেণুকে মর্যাদা ও গৌরবের সঙ্গে গ্রহণ করে। এভাবে নাট্যকার সমাজের বিরুদ্ধে একটা স্পর্ধিত প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন।

'মণিরাম দেওয়ান' (১৯৪৮) ঐতিহাসিক নাটক, জ্বলন্ত দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে সারাভারতের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে অসমে মণিরামের আবির্ভাব। অহোম রাজা স্বর্গদেও কমলেশ্বর সিংহ তখন রাজা। অসম ব্রহ্মদেশের আক্রমণে বিপর্যস্ত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড স্কট বর্মী আক্রমণ থেকে অসমকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গদেশ থেকে ফৌজ আনে। মণিরাম তখন যুবক। সাহেবের সেনাদের পথ প্রদর্শক রূপে ও দেশের সর্বত্র শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে তিনি ব্রিটিশের সহায়ক হন। ব্রিটিশ অফিসে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি বুঝতে পারলেন ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ, ব্রিটিশও তার ওপর রুষ্ট হল। যুবরাজ কন্দর্পেশ্বর সিংহর তরফে তিনি তখন কলকাতায়, উদ্দেশ্য অসমের উজনি খণ্ড ব্রিটিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজেদের অধিকারে রাখা। এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধিতার তীব্র সুর বাজছে। মণিরাম কলকাতা থেকে চিঠি লিখলেন—'এই ফালে দেশ ভাগিল, আমারো ঘর সাজিবালৈ গা দাঙক।' এই চিঠি অসমের শাসনকর্তা মিলস ও হলরইডের হস্তগত হল। এভাবে মণিরামের ফাঁসির সূত্রপাত। এই বিদ্রোহের কাহিনীকে লেখক রঙে রসে অপরূপ করে তুলেছেন। মণিপুর কন্যা ফুলকুমারীর চিত্রণে লেখক রোমান্টিক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। বিদ্রোহী বীর মণিরামের চরিত্র চিত্রণে লেখকের মহৎ আবেগ ও গভীর সহানুভূতি প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রবীণ ফুকনের আর একটি বিশিষ্ট ও শিল্পিত সৃষ্টি 'লাচিত বরফুকন' নাটকও ইতিহাসের পরিচিত কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা।

লক্ষ্যধর চৌধুরী (১৯১৫ - ২০০০) অসম সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি গুয়াহাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান হন এবং অসম

বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর শিল্প সাধনা, ছাত্রাবস্থা থেকেই নাট্য রচনা ও অভিনয়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে স্মরণীয় — একলব্য (১৯৩৫), আলিবাবা (১৯৩৯), রক্ষকুমার (১৯৫২), নিমিলা অঙ্ক (১৯৬৫) প্রভৃতি। যবনিকার আরে আরে (যবনিকার আড়ালে), বিষ্ণুশর্মার বিচার, অচল টাকা, রূপান্তর প্রভৃতিও অভিনীত হয়েছে। লক্ষ্যধর চৌধুরীর 'নিমিলা অঙ্ক' অসম নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অতীব স্মরণীয় সৃষ্টি।

'একলব্য' নাট্যকারের বাল্যকালের রচনা, ১৯৩২-এর ডিসেম্বর স্কাউটদের বার্ষিক সভায় এটি অভিনীত হয়। প্রচলিত কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা এই নাটকে গুরু ভক্তি, ছাত্রদের কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা একে শিক্ষাপ্রদ করে তুলেছে। 'রক্ষকুমার' তরণীসেনের কাহিনী নিয়ে লেখা। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেও নাট্যকারের স্বকীয় ভাবনা এক বিশিষ্ট মূল্য দিয়েছে—এক, দেশাত্মবোধ; দুই, আর্য-অনার্য উচ্চ-নীচের মিলন সুর।

'নিমিলা অঙ্ক' (না মেলা অঙ্ক) ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় যদিও প্রায় দশ বছর আগে এটা চিত্ররূপ পায়। মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী লোকের দুঃখদারিদ্রপূর্ণ জীবনের এক নিষ্ঠুর নির্মম চিত্র এই নাটকে ফুটেছে। ষাটোর্ধ্ব পেনসনপ্রাপ্ত হরকান্তর পাঁচ পুত্র, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, চাকরবাকর নিয়ে বিরাট সংসার—এদের ভরণপোষণের দায় হরকান্তর। ভাবনা চিন্তায় সে শুকিয়ে যাচ্ছে। একে সব সময়ের আর্থিক চিন্তা, তার ওপর চতুর্থপুত্র সোণ-র টাইফায়েড হল। হরকান্ত অপরের সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি করে। পুত্রের জন্য সে নিয়ে আসে ওষুধ। সঙ্গে সঙ্গে আসে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। সে অসার আগেই আদরের ছেলে সোণ চিরদিনের জন্য বিশ্রাম পায়। অর্থনৈতিক সমস্যা সঙ্কট জর্জরিত নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের অসহায়তা কাতর যন্ত্রণা এই নাটকে সুন্দর রূপ পেয়েছে।

লক্ষ্যধর চৌধুরীর 'ঠিকানা' এক সার্থক মঞ্চসফল হাস্যরসাত্মক নাটক। বৃদ্ধ পেনসনভোগী গজানন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সমন্বয় করে থাকতে পারছে না। সর্বদা সে ভাবছে যে তাকে সবাই অবহেলা অপমান করছে। এতে তার মন এমন দৃঢ় অথচ কুটিল হয়েছে যে সমস্ত স্বাভাবিক পরিবেশ পরিস্থিতি যেন উলটে যাচ্ছে, হাস্যকর হয়ে পড়ছে। তার ও অপরের আচরণের মধ্যে বিরোধ বৈপরীত্য স্বাভাবিকতার সব কিছু পরিপন্থী হয়ে প্রবল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। বাড়ীর অধিকার কার, কার নামে ঘরের ঠিকানা—এই প্রশ্ন দেখা দেয়। তবে হাসির অন্তরালে এক বৃদ্ধর অসহায় মানসিকতার ক্ষীণ প্রকাশও মনে দাগ কাটে।

সত্যপ্রসাদ বরুয়া (১৯১৯—২০০১) কর্মক্ষেত্রে গুরু দায়িত্ব পালন করেও সারাজীবন সাহিত্য সাধনা করেছেন এবং অসমীয়া নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি যথার্থই 'নাট্যপ্রভাকর' রূপে অভিহিত। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট হল কল্পনার মৃত্যু (১৯৩৮), চাকৈ চকোবা (১৯৪০), শিখা (১৯৫৭), জ্যোতিরেখা (১৯৫৮), আনারকলি (১৯৫৮), কুনাল কাঞ্চন (১৯৫৮), বাণাদিল (১৯৫৮), বনহংসী (১৯৬১), ভাস্বতী, নায়িকা-নাট্যকার প্রভৃতি।

'কল্পনার মৃত্যু' একাঙ্কটি মনস্তত্ত্ব ও আদর্শবাদের প্রকাশ। শিল্পী রবীন সুন্দরী জয়ার মূর্তি অঙ্কনে তৎপর হলে জয়া তাকে বলে 'আপুনি জয়াক এরি দেশক পূজা করক, কল্পনা এরি বাস্তবক পূজা করক।' রবীন বোঝে যে নারী পুরুষের পূজা চায়না, আরাধনা চায় না, চায় পৌরুষ তার বিজয় গৌরব। 'শিখা' একাংকে প্রতাপ নিজের হৃদয় বেদনা নীরবে

রেখেছিল এবং প্রদীপ ও শিখার সুখের জন্য বেদনায় মৃত্যুবরণ করে। 'জ্যোতিরেখা' স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত স্বাক্ষর, বিয়াল্লিশের পটভূমিকায় লেখা। স্বাদেশিকতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রকাশ ও তার বোন রেখার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পুলিশ অফিসার জ্যোতি চাকরি ছেড়ে দেশসেবায় ব্রতী হয়। পুলিশের গুলিতে প্রকাশ মারা যায়, রেখা অন্ধ হয়ে যায়। জ্যোতিও ফাঁসিকাঠে মৃত্যুবরণ করে হয় অমর। 'আনারকলি', সেলিমের প্রণয়িনী ইরান কন্যার নিষ্ঠুর বেদনার কাহিনী। 'কুণাল কাঞ্চন'-এ সম্রাট অশোকের দ্বিতীয় পত্নী সুন্দরী তিষ্যরক্ষিতার প্রণয় প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় তারই নির্দেশে অশোক-পুত্র কুণালের চক্ষু উৎপাটন করা হয় ও বুদ্ধের সান্নিধ্যে সে দিব্যদৃষ্টি পায়। 'বাণাদিল' নাটকে দারার অন্যতম পত্নী বাণাদিল দারার মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেবের কামাগ্নি থেকে রক্ষা পাবার অনেক চেষ্টা করে ও শেষ পর্যন্ত কৃপাণে নিজমুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করে।

'বনহংসী' ইবসেনের দি ওয়াইল্ড ডাকের সুন্দর স্বচ্ছন্দ অসমীয়া রূপান্তর।

সত্যপ্রসাদ এক্সপেরিমেন্টাল নাটক লিখে চলেছেন। 'ভাস্বতী' নাটকে চেতনা প্রবাহ পদ্ধতির নিপুণ প্রয়োগ পাই — অসমীয়া নাটকে তা প্রথম। সমাজ ও সংস্কারের দ্বন্দ্বে ব্যক্তিচেতনার সঙ্ঘর্ষে ব্যক্তিসত্তা আহত হয়, এভাবে নরনারীর জীবনেও আসে ট্র্যাজেডি। 'নায়িকা-নাট্যকার'-এ এই সমস্যা রূপায়িত। আদর্শ চরিত্র চিত্রণে, নীতিনিয়মের প্রতিষ্ঠায়, করুণ রসের সৃজনে সত্যপ্রসাদ নাটক বিশিষ্ট।

খ্যাতনামা শিল্পী নৃত্যগীতবিশারদ **সুরেশ গোস্বামী** লিখেছেন 'রুণুমী' (১৯৪৬) ও 'শ্রীমন্ত শঙ্কর-মাধব' (১৯৫৯)। 'রুণুমী' ইবসেনের The Vikings at Helgeland নাটকের রূপান্তর, বলা ভাল অভিযোজনা। রুণুমীর প্রেমের আধার নির্মাণ করা কাহিনী অসমের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের জনজাতীয় জীবনের পটভূমিতে উপস্থাপিত। দ্বিতীয়টিতে একশ কুড়ি বছর ব্যাপ্ত শ্রীশঙ্করের জীবনকথাকে যুক্তিগ্রাহ্য রূপে উপস্থাপিত করেছেন। **সর্বেশ্বর চক্রবর্তী** যশস্বী অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল অভিমান (১৯৫২) ও কঙ্কন (১৯৫৬)। রোমান্টিক বিষাদের নাটক 'অভিমান'-এ অরূপের সঙ্গে রেণুর বিবাহ হলনা অভিমানের আধিক্যে। শেষ পর্যন্ত আকস্মিক আঘাতে অরূপের বিষণ্ণবিরহী চিত্ত শেষ বিশ্রাম পায়। 'অভিমান' একটি কারণে স্মরণীয়—ফ্ল্যাশব্যাকের প্রয়োগে একসপ্রেসানিস্টিক টেকনিকের ব্যবহার মনে হয় এই প্রথম অসমীয়া নাট্য সাহিত্যে দেখা গেল।

খ্যাতনামা রূপদক্ষ শিল্পী **যুগল দাস** (১৯১০ - ১৯৮৯) রচিত 'মীরাবাঈ' সম্ভবত বরেণ্য বৈষ্ণব সাধিকাকে নিয়ে প্রথম নাটক। সর্বভারতীয় পটভূমিকাতে লেখা '১৮৫৭' নাটকে সিপাহী বিদ্রোহের অন্তরালে আছে মোগল সাম্রাজ্যের মত বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের হেতু। তখন দুর্বল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ দেশের শাসক, নানাসাহেব বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, লক্ষ্মীবাঈ নেমেছেন লড়াই-এ; অসমেও জ্বলল বিদ্রোহের আগুন — মণিরাম দেওয়ান, পিয়লী ফুকন প্রমুখ বীররা লড়াইয়ে নেমেছেন : এক দুরন্ত ঝটিকাক্ষুব্ধ সময়কে সার্থকভাবে নাট্যরূপে গ্রথিত করেছেন যুগল দাস।

মথুর ডেকা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সাহিত্যসেবী। তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' (১৯৫২) সাতটি সামাজিক একাংকিকার সমষ্টি—'মোর অসম', 'চিকারীর স্বর্গ', 'স্বর্গপুরী', 'অশৌচ পর্ব', 'সূচনা', 'বুরবুরণি', 'রাজনীতি'। 'আঁর কাপোর' (১৯৫৬) বিশিষ্ট নাট্য সংকলন। 'নির্যাতিতা' (১৯৫৭) বর্মী আক্রমণের পর থেকে স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত অসম ইতিহাসের একটা অস্থির চিত্র : অসমীয়া ভাষা সাহিত্যে বাংলার প্রভাব ও প্রতাপ, 'অরুণোদয়' সাহিত্যরথীদের রথচক্রের দাগ, বিয়াল্লিশের গণআন্দোলন প্রভৃতি।

সংবাদ সাহিত্যে সুপবিচিত কবি শিল্পী **হেম শর্মা** (১৯২৫) স্মবণীয নাটক লিখেছেন বেশ কয়েকটি। 'কালিদাস' (১৯৫১) জীবনী নাটক, 'বালিঘব' (১৯৫৭) ঐতিহাসিক ও 'কাঞ্চনমালা' (১৯৫৮) রূপক গীতিনাট্য।

দুর্গেশ্বব ববঠাকুব বেশ কয়েকটা নাটক লিখেছেন তাদেব মধ্যে উল্লেখ্য 'চাকনৈযা' ও 'নিকদ্দেশ'। 'চাবনেযা' ব বচনাকাল ১৯৫৫, প্রকাশ ১৯৫৮, এটি পূর্বনাম 'টেকসি ড্রাইভাব' রূপেই সমাধিক খ্যাত।

নাট্যকাব পাবিবাবিক ও সামাজিক জীবনেব সুন্দব ছবি একেছেন। ট্যাক্সি ড্রাইভাব চাবন সমাজে অবহেলিত অল্পশিক্ষিত মানুষ কিন্তু তাব মন উঁচু। তাব ভাই গুবিন শিক্ষিত সম্রান্ত সমাজেব মানয কিন্তু উদ্ধত মদাপ। সে একদিন জীবনেব গাযে হাত তোলে— যেটা নাটকেব শীর্ষবিন্দু কিন্তু তাব মনেব পবিবর্তন হয এবং অশ্রুভাবাক্রান্ত হৃদয়ে সে বলে কব নোবাবো কিয উচ্চশিক্ষিত' কমলাব প্রবোচনাত পবি এক দুবল মহূর্তত আজি তোমায গালত হাত দিছিলো। বোযা কবাইদেও কিয দিছিলা বন্ধকত নবীন একেডালি হাব মোব ঔষধব কাবণে? কিয চলাইছিলা দিন বাত টেকসি মোব নিচিনা এটা কুলাংগাবক শিক্ষিত কবি দেউতাব পবিত্র নামত কলঙ্ক আনিবলৈ?

সাহিত্যপ্রাণ নাট্যশিল্পী **ফণী তালুকদাব** (১৯২১--১৯৯৮) একাংক বচনায দক্ষ বেতাব নাটকেও পাবদর্শী। মঞ্চ নাটক বচনায তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন কবেছেন। 'শিবোনামব আবত' একাংকে দেখানো হয়েছে নাবীব ঈর্ষা বহ্নিব এক করুণ পবিণতি। তাব 'জুযে পোবা সোণ' (১৯৬৭) চীন আক্রমণেব পটভূমিকায লেখা।

সৈযদ আবদুল মালিক (১৯১৯---২০০০) বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও অসাধাবণ শক্তিশালী গল্পকাব। তাঁব 'বাজদ্রোহী' (১৯৫৭) নাটকটি সবিশেষ খ্যাতি পেয়েছে। নাটকেব প্রধান চবিত্র সৎবাম বাজদ্রোহী দেশেব অগণিত মানুষকে অত্যাচাবী বাজাব শাসন থেকে মুক্ত কবাই তাব বাসনা। বাজ আদেশে তাব মৃত্যুদণ্ড হলে সে বলে—'মোব দেহাটো যতেই নাথাকক, মোব মনটো প্রাণটো এই অসমতেই চিবদিন থাকিব। মোব দেহাটোক নির্বাসন দিব পাবে, কিন্তু মনটোক নির্বাসন দিব কেনেকৈ?'

বংপুব কলেজেব অধ্যক্ষ শিল্পবসিক সঙ্গীতজ্ঞ **পবাগধব চলিহা** (১৯২৩) বচিত 'নিযতি, পৃথিবী আরু মানুহ' (১৯৫১) প্রতীকধর্মী নাটক। 'চাবি হেজাব বছবব অসম' (১৯৫২) বামাযণ মহাভাবতেব যুগ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত অসমেব কথা যাব বীব ও বীবাঙ্গনাদেব গুণগাথায জাতীয ভাবেব হিন্দোল তুলে অবশেষে বলা হয়েছে— 'যাউতিযুগীযা হৈ রূপে-বসে গুণে/ জিলিকিব অসমীযা,/ জিলিকিব সোণব অসম।'

১৮৫৭ সালেব সিপাহী বিদ্রোহেব অগ্রণী নাযক পিযলী ফুকন এব জীবন ও কার্যাবলীকে নিযে নাটক লিখেছেন **প্রফুল্ল বরুযা ও নগাঁও নাট্য সমিতি**। ইংবাজদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধে পিযলি ফুকন সক্রিয অংশ নেন ও ইংবাজদেব বিতাডিত কবতে চান। দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামীব শেষ পবিণাম হল ফাঁসি। বীবযোদ্ধাব সংগ্রামী আদর্শপূত জীবন নিযে অন্য নাটকও লেখা হয়েছে 'পিযলি ফুকন' (১৯৪৮)। দুটি নাটকেব মধ্যে নগাঁও নাট্য সমিতিব নাটকটিই অধিকতব শিল্পসম্মত হয়েছে। ইতিহাসেব তথ্যকে নিযে শিল্পেব অপরূপ প্রতিমা নির্মিত হয়েছে। ফাঁসি দেবাব সময পিযালি ফুকন বলে—

মেই মবিম—মই ভূত হৈ স্বর্গদেযব মৈদাম বাখিম, কিন্তু মই আকৌ আহিম। মোক স্বর্গ নেলাগে — মোক বৈকুণ্ঠ নেলাগে — মই সোনব সঁফুবা, দেববো দুর্গম অসমলৈ আকৌ আহিম — আকৌ জনম লম। মই সিহঁতক জীবন্তে পুবি মাবিম। সিহঁতে মোক

এবার ফাঁটা দিব—মই দুবার আহিম — দুবার ফাঁচী দিব—মই দহবার আহিম! বগা-বঙালক নেখেদো মানে মই জনমে জনমে ডিঙিত চিপজরী লম (আমি মরব-আমি প্রেত হয়ে বাজসমাধি রক্ষা করব। কিন্তু আমি আবার আসব। আমি স্বর্গ চাইনা, বৈকুণ্ঠ চাই না - আমি সোনার ক্ষেত্র (সফুঁবা --পান সুপুরির ট্রে) দেবতাব দুর্গম অসমেই আবার ফিরে আসব, আবার জন্ম নেব। ওবা আমাকে হত্যা করবে। ওরা একবার ফাঁসি দেবে, আমি দ্বিতীয়বার আসব—দুবার ফাঁসি দেবে, আমি দশবার আসব। সাদা ফিরিঙ্গীদের না তাড়ানো পর্যন্ত আমি জনমে জনমে গলায ফাঁসীর দড়ি পবব)।

নটসূর্য ফণী শর্মা (১৯০৯ - ১৯৭০) অসম মঞ্চ ও ছায়াছবিব অদ্বিতীয় অভিনেতা, নির্দেশক ও সফল নাট্যকাব। সাবাজীবন ধরে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সংস্কৃতির সাধনা করেছেন, দুরাবোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ হয়েও লিখেছেন নাটক। তাব প্রিয় বন্ধু বিষ্ণু বাভার মত ফণী শর্মাও ছিলেন রূপতীর্থের একজন বন্ধনবিচ্ছিন্ন যাত্রী। সকল বন্ধনমুক্ত হয়ে সংস্কৃতির তপস্যাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। গণনাট্য আন্দোলনেব তিনি ছিলেন মহৎ শিল্পী। তিনি নাটক লিখেছেন, চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, অনুবাদও করেছেন অনেক নাটক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন অভিনয় শিল্পী — তাঁব অভিনয়দীপ্তিতে মুগ্ধ অগণিত মানুষের কাছে তিনি ছিলেন নটসূর্য। তার রচিত নাটকের মধ্যে স্মরণীয়--- ভোগজরা (ঐতিহাসিক), কিয়? (সামাজিক), নাগ-পাশ (সামাজিক), চিরাজ (সামাজিক), কলাবাজার (সামাজিক ব্যঙ্গ), এন ইন্সপেক্টর কলস (অনুবাদ)।

'কিয়?' (কেন?) সকল রসিক দর্শক ও সমালোচকদেব অতি প্রিয় নাটক। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এক নিষ্ঠুর নির্মম ছবি নাটকে ফুটেছে। খ্যাতিমান শিল্পী গীতিকার সাহিত্যিক কিন্তু অর্থ সম্পদহীন প্রদীপ ভূঞার বেদনাপূর্ণ জীবনালেখ্য নাটকে আছে। ধনী আইনজ্ঞ চোরাকারবাবীদের উকিল মিঃ বরুয়া মন্ত্রীর সম্মানার্থে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে যার পরিচালক প্রদীপ। সংবর্ধনা ভাষণও লিখে দিয়েছে প্রদীপ। কিন্তু তার ঘরে বিপদ। তার ছেলে অপরের ঘরের আগুন নেভাতে গিয়ে সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়ে মরণাপন্ন। কিন্তু প্রদীপ না থাকলে অনুষ্ঠান বন্ধ। তাই মিঃ বরুয়ার নির্দেশে তার অনুগত ডাক্তার বলে যে প্রদীপের ছেলে ঘুমোচ্ছে। সে ভালই আছে। প্রদীপের পরিচালনায় পূর্ণ অনুষ্ঠান চলছে এমন সময় প্রদীপের বন্ধু ও সহকর্মী—সুবোধ গাঙ্গুলী দৌড়ে এসে জানায় যে অনেক আগেই প্রদীপের ছেলের মৃত্যু হয়েছে। সুবোধ মঞ্চে গিয়ে সব বলে, অনুষ্ঠানে গোলমাল, পুলিশ সুবোধকে গ্রেপ্তার করে। প্রদীপ দর্শকদের প্রশ্ন করে—কিয় এনে হয়? ভগবানর এই বিনন্দীয়া সৃষ্টিত কিয় এনে হয়? পৃথিবীর মানব সমাজর মাজত এনে বিভিন্নতা কিয়? এঘরত জ্বলে সহস্র আলোক, লাখ লাখ ঘর অন্ধকার। এঘরত থাকে বিপুল সম্পদ, লাখ লাখ ঘরত দৈন্য। এ ঘরত থাকে অফুরন্ত আহার, কিন্তু লাখ লাখ ঘর শূন্য। কিয়? কিয় হয়? — কিয় এনে হয়? চিকিৎসা করাব নোয়ারি পথ্য খুওয়াব নোয়ারি, এদিনতে দুটাকৈ সন্তান হেরুওয়া হতভাগ্য দরিদ্র পিতার এই প্রশ্নর আপোনালোকে উত্তর দি থৈ যাওক। (কণকণর মরা শ দর্শকের ফালে হাত মেলি আওয়াই ধরি) কিয় এনে হয়? ... কিয়?..... কিয়?? ... কিয়???'

৪. সাম্প্রতিক পর্ব : আধুনিক জীবন হয়ে উঠেছে জটিল নিবিড় রহস্যমণ্ডিত। মানুষের চেতনায় লক্ষ কোটি তরঙ্গের ওঠাপড়া, সত্তায় ঘটছে প্রবল আন্দোলন। অন্যদিকে গোটা সমাজ ব্যবস্থা অন্যায় অত্যাচার শাসন-শোষণের প্রতিবাদে বিস্ফারিত হয়ে যাবে চূড়ান্ত মুহূর্তে। যেহেতু নাট্যকার সামাজিক জীব ও তীক্ষ্ণভাবে সমাজ সচেতন, নাটকেও

তার ছাপ পড়েছে গভীর ভাবে। "আজির যুগত নাট্যকারর ভূমিকা সমাজের পরা বিচ্ছিন্ন হয়। তেঁওর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর সক্রিয় আরু সহৃদয়পূর্ণ। সমসাময়িক সমাজ, দেশ আরু পৃথিবীর সৈতে তেঁওর সৃষ্টির সংযোগ নিকপকপীয়া। তেঁওর নাটকর ভিতরেদি প্রতিফলিত হৈছে যুগর মৌলিক স্বভাব, সমসাময়িক সংকট দুর্যোগ আরু বিপর্যয়"[৯] "আমার সমাজখনক শোষণ আরু দুর্নীতিয়ে থান্‌বান্‌ করিবলৈ অহরহ চেষ্টা চলাইছে। এই শোষণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি কেনেকৈ থিয় দিম। শোষণর শক্তিক আমি কেনেকৈ পরাজিত করিম? সমাজসচেতন নাট্যকারর এই ক্ষেত্রত কেনে ভূমিকা হোয়া উচিৎ? আবদুল মজিদর 'চোর', অরূপ চক্রবর্তীর 'আগমনি', অতুল বরদলৈর 'বৃক্ষর খোজ', মহেন্দ্র বরঠাকুরর 'আহত গুবির হাট', 'জন্ম', প্রফুল্ল বরার 'উপপথ'র অভিনয়ে আমার অন্তর গভীর ভাবে স্পর্শ করে আরু আমার কর্মপন্থা নির্ণয়ত ইঙ্গিত দিয়ে, বাখর দরে শোষণকারীয়ে আমার সমাজত যি সন্ত্রাসর সৃষ্টি করে তাক ফহিয়াই দেখুয়াইছে হিমেন্দ্র বরঠাকুর তেঁওর 'বাঘ' নাটকত।[১০] ..... "শ্রেণী সংগ্রাম আমার দেশতো প্রকট হৈ উঠিছে, অসমো পাছ পরি থকা নাই। এই শ্রেণী সংগ্রামে আমার নাট্যকার সকলক স্পর্শ করা নহলেন? নাট্য সাহিত্যর জরিয়তে সংহতির প্রয়োজনীয়তা আমি আটায়ে উপলব্ধি করো। অনৈক্যও এটা জাতীয় সমস্যা।' এই সমস্যার সমাধানের পথ কি? হাজার হাজার মানুষ পথ চাইছে। "এটা সময়ত আমার নাট্যকার সকলে অকুণ্ঠভাবে উদাত্তস্বরে তেঁওলোকর নাটকীয় প্লটত বাস্তবতার চেতনা সঞ্চারিত করিব লাগিব।"[১১]

সাম্প্রতিককালে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যে অ্যাবসার্ড চিন্তাধারার, অতিবাস্তব দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিশ্বচেতনার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা পড়ে অসমীয়া শিল্পীমন। জীবনের অবক্ষয়, সীমাহীন শূন্যতা, আর্তিনৈরাশ্যের বর্ণহীন স্বপ্ন, নেতিবাদের গহ্বরে আত্মার নিমজ্জন --এরাই অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণ। Absurdity is which is devoid of purpose Cut off from his religious metaphysical and transcendental roots, man is lost, all his actions become senseless, absurd (Eugene Ioneseo).[১২]

অতি আধুনিক অসমীয়া নাটকে এই আদর্শ ও দর্শন এসেছে, তবে পাশ্চাত্য জীবনে এ্যাবসার্ডিটি যে অনিবার্যতা নিয়ে এসেছে ভারতীয় সমাজ ও জীবনের সে ভাবে তা আসেনি এবং আশা সম্ভবও নয়।

অরুণ শর্মা (১৯৩২) রচিত নাটকগুলি অ্যাবসার্ড রীতির উদাহরণ। সংস্কৃতির উদার ক্ষেত্রে তাঁর চলাফেরা, প্রজ্ঞানিষিক্ত তাঁর ভাবনা এবং দার্শনিকতায় প্রকীর্ণ তাঁর মন। শিল্পী হিসাবেও তিনি অনেক উঁচু মাপের। প্রায় পঁচিশটা সফল বেতার নাটক লিখেছেন শ্রী শর্মা; তাঁর মঞ্চনাটকগুলিও উরুখা পঁজা, জিনাট (১৯৬২), ত্রিশঙ্কু, পুরুষ (১৯৬৪), শ্রী নিবারণ ভট্টাচার্য (১৯৬৭), কুকুরনেচীয়া মানুষ, আহার (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৮০, পত্রিকায় ১৯৭১) বুরঞ্জীপাঠ প্রভৃতি বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে।

'পুরুষ' নাটক থেকে অরুণ শর্মা প্রচলিত প্রথার অনুবর্তন না করে অন্যপথে চলেছেন। নাটকের বক্তব্যে এল নতুন প্রত্যয়, আঙ্গিকে সংযোজিত হল নতুন মাত্রা। 'পুরুষ' নাটকের পটভূমি সার্কাস—এক সুন্দরী উদ্ধত ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী হীরামণি এর পরিচালক। সে জন্তুদের খেলা দেখায় চাবুক দিয়ে। তার স্বামী সুকান্ত চলিহা একজন সাহিত্যিক—হীরামণি তাকে বিদ্রুপ করে ভয় দেখিয়ে সার্কাসে যোগ দিতে বলে রিং মাস্টার রূপে। জন্তু জানোয়ারকে চাবুক মারার মত সে স্বামীকে চাবুক দিয়েই বশে রাখতে চায়। শেষ পর্যন্ত সুকান্ত ভয়-সংকোচ কাটিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে। নাটকের বক্তব্য কী?

পৃথিবীটা যেন সার্কাস আর মানুষ খেলোয়াড। কিন্তু সব মানুষ এই প্রচলিত নিয়ম না মেনে জীবনের মানে তার রহস্য জানতে চাইলে আসে ট্র্যাজেডী। নাটকের বক্তব্য ফুটেছে ফটুকার কথায় যে ক্লাউন হয়ে লোক হাসায় আবার সূত্রধর হয়ে বিশ্লেষণ করে। 'পৃথিবীত জীবন নির্বহ করিবার বাবেহে ফটুকাই নানা ভাও উলিয়াই মানুহক হওঁবার লগীয়া হৈছে--বহুবাব তাও গ্রহণ করিব লগীয়া হৈছে।' একজন সমালোচক বলেছেন সুকান্তব ব্যর্থতা প্রকৃত পক্ষে পুরুষ মানুষের ট্র্যাজেডী যাদেব নাবীবা নিজেদেব ইচ্ছামত চালন কবতে চায়। নাটকে অংকদৃশ্যের বিভাগ নেই, দৃশ্য পবিবর্তন সূচিত হয়েছে বিশিষ্ট চবিত্রেব কথায়। নাট্য কাহিনীব উন্মোচনে একসপ্রেসনিস্টিক রীতি প্রযুক্ত।

'শ্রী নিবারণ ভট্টাচার্য' এক ব্যক্তির ট্র্যাজেডী যে তাব সমগ্র জীবন নাটক ও মঞ্চের উন্নয়নের জন্য ব্যয় কবলেও প্রতিদানে পেয়েছে ব্যর্থতা, হতাশা। তাব ঘবের দবজা বন্ধ, সে জানলা দিয়ে চলাফেরা কবে—এটা যেন প্রচলিত পথে না চলাব প্রতীক। তার অভ্যাস ঘোড়ায় চড়া যাতে তার মানসিক উত্তেজনা মুক্তি পায়। উনষাট বছরের নিবারণ ভট্টাচার্য শেষ চেষ্টা করবে সফল নাটক করে তার সম্মান পেতে। তাব শেষ (ত্রয়োদশ) নাটক দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ করে। অভিনয় রাত্রে যখন সে মাইকের সামনে সযত্নে লেখা প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে যায় প্রবল হতাশা ও গ্লানির মধ্যে সে দেখে ঘর ফাঁকা। তবু সে খালি হলেই বক্তৃতা দিয়ে যায়— তার সহকর্মীরা গৃহপবিজন দুঃখ বেদনায় আপ্লুত হয়। শেষ দৃশ্য ইয়োনেস্কোর 'দি চেয়ারস' নাটককে স্মবণ কবায়।

'আহার' অরুণশর্মার শ্রেষ্ঠ নাটকরূপে বিবেচিত। চার যুবক নবীন কমল নলিনী ও ধীবেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গ থেকে এক নারীর গলিত মৃতদেহ চুবি করে এনে অপেক্ষা করে নর্থবুক গেটের তলায় তাকে সমাহিত করার জন্য। এদের একজন কবি-প্রেমিক, দ্বিতীয় জন ব্যবসায়ী, তৃতীয় বিপ্লবী ও চতুর্থজন অপরিমিত মদ্যপ। মঞ্চে চারটে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে তারা অবিরাম গাঁজা খাচ্ছে, সঙ্গে বাদাম ভাজা। রাত্রি গভীর হয়, অতীত যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। এদের প্রত্যেকের জীবনে সেই নারী স্বতন্ত্রভাবে ফিরে আসে— প্রেয়সীরূপে পত্নীরূপে মাতৃরূপে ও পতিতারূপে। চার যুবকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই নারীর ছবি যে প্রত্যেকের জীবনে এনেছিল বিচিত্র আস্বাদ, যদিও ব্যর্থতা এসেছে সবক্ষেত্রেই। নীলিমা সুখের নীড় চেয়েও পায় না, অনিমা গৃহ কর্ত্রীরূপে ও সন্তানের জননীরূপে মূল্য পেতে চায় কিন্তু তাও হয় না, বিদ্রোহী ধীরেন তার মাকে পায় না—পুলিশের তাড়া খেয়ে পালায়, কলঙ্কিনী অসতী হীরামণিকে মৃত্যুর হাত থেকে কুড়ি বছর আগে নবীন বাঁচিয়েছিল। আজ হীরামণি শুধু দেহই বেচেনা। একদিন তার জীবনে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে—তাদের সন্তানকে নবীন নিজ ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একদিন এক যুবক আনন্দ করতে হীরামণির ঘরে আসে ও সে চলে যাবার পর তার কলেজ আইডেনটিটি কার্ড দেখে হীরামণি বোঝে এ তারই ছেলে। কিন্তু ওদের স্বপ্নের ঘোর কাটে। তারা ধুপ জ্বালিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য অনুলেপন করে সেই নারীকে সমাহিত করতে যাবে। তখনই এসে পড়ে পুলিস।

নাটকে নারী সত্তাকে বিভিন্নরূপে অনুসন্ধান অথবা অনুধ্যান করা হয়েছে। একই নারী সমাজের বিভিন্ন স্তরে ভিন্নতর মূর্তি পরিগ্রহ করে—কখনো সে রোমান্টিক প্রেয়সী, কখনো সে প্রিয়তমা গৃহবধূ, কখনো বা স্নেহময়ী মাতা আবার কখনো পতিতা মাত্র। তারা ভালবাসা ও অনুপ্রেরণার উৎস, জাগতিক আকর্ষণের কেন্দ্র, ত্যাগের প্রতীক ও দৈহিক কামনার ক্ষেত্র। অথবা নারীর শবদেহটি আমাদের অতীত পাপকর্মের প্রতীক ও ঢাকবার

প্রয়াস সত্ত্বেও অসহ্য দুর্গন্ধের মত তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু অতীতকে কখনো মুছে ফেলা যায় না, মহৎ রূপে তা আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ও তার পাপরূপ কদর্যরূপে প্রকট হয়। আঙ্গিকের দিক থেকেও আহার অ্যাবসার্ড নাটকের নিদর্শন—কাহিনীর আপাত বিচ্ছিন্নতা ও সংলাপের সংগতিহীনতা, ভাষার ব্যঞ্জনা, প্রতীকের ব্যবহার ইত্যাদিতে। আহার নামটিও প্রতীকী। নাট্যকার বলতে চেয়েছেন তাই হল খাদ্য বা আহার যা শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজন ও ক্ষুধা মেটায়। কখনো অতীত দিয়েছে সেই খাদ্য যা উত্তরকালকে বাঁচতে সাহায্য করে। কখনো নারী বিভিন্ন রূপে আহার দিয়েছে, পুষ্ট হয়েছে দেহ বা মন।

'চিয়ার' (চিৎকার) নাটক অনেকটা মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষের পট-ভূমিকায় লেখা। এক কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অমর বরুয়া পাশবিক ভাবে হত্যা করেছে তিন শ্রমিক নেতাকে। সে পণ্ডিত নেহেরুর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি ছিঁড়ে ফেলে সেই ফটোফ্রেমের মধ্য দিয়ে মঞ্চে ঢোকে। সে অস্থির চঞ্চল, উত্তেজিতভাবে কখনো ফোন করছে কখনো ধরছে। শ্রমিক ধর্মঘট নিয়ে আলোচনা করবার জন্য ডিরেক্টরদের ডিনার বাতিল করার আদেশ দেয়, সেক্রেটারীকে আবার সঙ্গে সঙ্গেই ডিরেক্টরদের বলে স্থানীয় হোটেলে ডিনারে আসতে। তার মনের এই অস্থিরতা উত্তেজনার কারণ সে তিনজন শ্রমিক নেতাকে খুন করিয়েছে এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আহূত ধর্মঘটকে বানচাল করতে চায়। হোটেলের ডিনারপার্টিতে পান ভোজন চলছে, কিন্তু অমর বরুয়া অত্যন্ত বিচলিত। সে ওই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষীকে ঘুষ নিয়ে নির্বাক করতে চায়, কিন্তু কৃতকার্য হয় না। বাহাদুর, বিস্ফোরক জিনিসে ভর্তি গাড়ীর চালক, কিছুতেই মাথা নত করবে না। সে ঐসব বিস্ফোরক জিনিস সমেত গাড়ী হোটেলের দরজায় ধাক্কা মারে—ডিনার পার্টি হৈ হল্লা লোকজন সমেত সব ধ্বংস হয়। নাটকে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটেছে। লেখক আরও দেখিয়েছেন যে অমর বরুয়ার মত মানুষ সর্বদাই বিবেকবর্জিত নীতিজ্ঞানহীন হয় না, পরিস্থিতি পরিবেশ তাদের অমানবিক করে তোলে। তাই বিবেকের দংশন তারা অনুভব করে। লেখক বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার এক যথাযথ চিত্র অঙ্কন করেছেন নাটকে—অন্যায় লোভ বিলাস প্রাচুর্য পাপ ব্যভিচারের যথার্থ ছবি নাটকে ফুটেছে।

অরুণ শর্মার 'উরুখা পঁজা' (ফুটো ছাদের কুড়ে ঘর) সর্বভারতীয় সংহতির কথা বলে। নাটকের নায়ক হেমন্ত তাদের মেসের নাম দিয়েছে 'ভারত তীর্থ'। তাতে থাকে হেমন্ত, করিম, সদানদ। সদানদ বলে—'ঠিক কৈছ করিম, আমার জাত এটা, unity in diversity. মই সদানন্দ শর্মা ব্রাহ্মণ, সি হেমন্ত বরুয়া শূদ্র, আরু এই করিম আলি মুছলমান। ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা সিন্ধু—এই ত্রিধারা লই 'ভারততীর্থ' আরু তিনটা জীবন-জুবারীরে এই উরুখা সেই ভারত তীর্থরেই ক্ষুদ্র সংস্করণ'।

'কুকুর নেচীয়া মানুহ' (নেকড়ে মানুষ) অনেকটা নেকড়ে বালক রামুর কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা। কিন্তু এর বক্তব্য সামাজিক। এটা একটি অবহেলিত গোষ্ঠীর মানুষের কথা যারা নির্যাতিত নিপীড়িত হয় প্রবলভাবে যদিও তাদের যোগ্যতা কম নয়। একজন বৈজ্ঞানিক এক রাজনীতিবিদের ছেলের সঙ্গে নেকড়ে বালককেও পালন করেন। নেকড়ে বালকের মেধা বুদ্ধি প্রবল। সে রিসার্চ প্রজেক্টে নিযুক্ত কিন্তু তার কৃতিত্ব নেয় রাজনীতিকের ছেলে। যে এভাবেই সব কেড়ে নেয় এমনকি তার প্রেমিকাকেও। নাট্যকার এই নাটকের মধ্য দিয়ে সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন।

'বুরঞ্জী পথ' (ইতিহাসেব শিক্ষা) একটি পরিবারের তিন পুরুষের কথা যাদের ক্ষমতার লোভ আকাশচুম্বী হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পদচ্যুত হয়। এতে জরুরী অবস্থার চিত্র ফোটানো হয়েছে। অরুণ শর্মার 'বাঘজাল' সমস্যাসঙ্কুল জীবনের প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে। বাস্তবতাবাদী নাটকের সুন্দর নিদর্শন এটি। প্রতিভাবান শিল্পী অরুণ শর্মা এখনও লিখে চলেছেন সগৌরবে। 'অদিতির আত্মকথা' নাটকও অরুণ শর্মা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন।

বসন্ত শইকীয়া অসমীয়া নাট্যসাহিত্যে এ্যাবসার্ড রীতির অন্যতম প্রবর্তক ও এক বিশিষ্ট লেখক। পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে পরিচিত। স্যামুয়েল বেকেট ইউজীন আয়নেস্কো প্রমুখ নাট্যকারদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তবে উদ্ভট নাট্যধারার অসংগত ভাবনার মধ্যেও তিনি জীবনের সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন—মানুষের জীবনের হাস্যকর আর বেদনাদায়ক অসঙ্গতি তাঁর নাটকের মূল উপজীব্য। বসন্ত শইকীয়ার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'চিতার জুই' মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৫ সালে। তারপর গুয়াহাটির কুমার ভাস্বর মন্দিরে ১৯৫৭ সালে 'মকরাজাল' আর ১৯৫৮ সালে 'চোর' মঞ্চস্থ হয়। এই সব নাটকের বিশেষত 'মকরাজাল'এর অভূতপূর্ব সাফল্য তাঁকে নাটকরচনায় অত্যন্ত প্রেরণা জোগায়। 'মানুহ' ১৯৮০ সালের অসম সাহিত্য সভার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার এনে দেয় বসন্ত শইকীয়াকে। 'এজন নায়কব মৃত্যু'ব প্রকাশকাল ১৯৮৯।

বসন্ত শইকীয়ার 'মৃগতৃষ্ণা' (১৯৭২) অভিনব রীতির নাটক। একজন সাধারণ মানুষের স্বপ্নের রূপ নাটকীয় তাৎপর্য পেয়েছে, তার অবচেতন মনের গভীরের কামনা-বাসনা প্রতিফলিত হয়েছে নাটকে। স্বপ্নের ঘটনার যেমন কোন যুক্তি শৃঙ্খলা সংহতি থাকে না এখানেও যেন সেরকম শিথিলভাবে অন্তঃশ্চৈতন্যের প্রবাহকে ধরা হয়েছে। দিগন্ত হাজরিকা পি ডবলিউ ডি অফিসের কেরানি, সাঁইত্রিশ বছর বয়স, অবিবাহিত। তার পরিচয় আছে মিস ইন্দিরা বরুয়ার সঙ্গে, সহকর্মী মি. চালিহা ও তার স্ত্রী অরুন্ধতী চালিহার সঙ্গে। শহরের বিখ্যাত ধনীকন্যা সুন্দরী যুবতী মিস উর্মিলা ফুকনের সঙ্গে তার পরিচয়ের ইচ্ছা আছে। তার অবচেতনের বাসনায় যেন জীবনের প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে আসে ইন্দিরা, অরুন্ধতী। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সে চুরি করে ধরা পড়ে কিন্তু আইনের ফাঁকে ছাড়াও পায়, উর্মিলার সঙ্গে তার বিয়েও হয়। কিন্তু সবই স্বপ্ন। সবই তার কল্পনার রঙে রঞ্জিত—সবই তার গোপন বাসনার সৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এক নির্মম চিত্রও ফুটে উঠেছে নাটকে।

শ্রীশইকীয়ার 'ভণ্ডুয়া রজা' (১৯৯০) ব্যঙ্গাত্মক রূপক নাটক। মধ্যযুগের পটভূমিকায় স্থাপিত এই নাটকে রাজার দম্ভ আত্মশ্লাঘা অবিবেচনা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য কিভাবে দেশের সর্বনাশ হয় সেকথা তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে বলা হয়েছে। 'নর্তকী' (১৯৮৯) এক অনন্য কাহিনী—প্রথম শ্রেণীর বেতার নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্র একজন নর্তকী—রূপযৌবনময়ী পূরবী চৌধুরী। তার প্রতি সবাই আকৃষ্ট। ধনী ঠিকাদার প্রশান্ত বরুয়া, রাজনীতিবিদ বৃকোদর হাজরিকা, ঔপন্যাসিক অরবিন্দ ফুকন, সন্ত্রাসবাদী প্রীতম কাকতি—সবাই পূরবীকে চায় এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। প্রীতম কাকতি গুলী করে হত্যা করে প্রশান্ত বরুয়া আর বৃকোদর হাজরিকাকে; এবং নিজেও পুলিশের গুলীতে মারা যায়। কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে পূরবীর সঙ্গে অরবিন্দর বিয়ে হয়। কিন্তু যে বিয়ে সুখের হয় না। তাদের জীবনে আর এক পুরুষ আসে—পঙ্কজ। ঈর্ষান্বিত অরবিন্দ আত্মহত্যা করে। নাটকের তৃতীয় পর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পূরবীর গভীর হৃদয়সত্তা

উন্মোচিত হয়। তার সঙ্গে পঙ্কজের বিবাহ স্থির হয়, কিন্তু শুরু হয় তার অন্তর্দ্বন্দ্ব। সে চিরন্তন ভারতীয় নারীর আদর্শ মানবে, না নতুন আদর্শহীন জীবনস্রোতে গা ভাসাবে? শেষ পর্যন্ত পূরবী গ্রহণ করে নারীত্বের পরম আদর্শকে। যে বলে—'মোর আজি প্রয়োজন হৈছে আত্মশুদ্ধির'। পূরবী তার প্রয়াত স্বামীর স্মৃতিকে অবলম্বন করেই বেঁচে থাকবে। নাটকে পূরবী বিরহ গভীর বোধে উদ্ভাসিত হয়েছে; এবং আঙ্গিকের বিচারেও এটি হয়েছে অসাধারণ সৃজনকর্ম।

সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে আরো বিশ্লেষণী মনোভাব সাম্প্রতিক নাট্যকারদের মধ্যে প্রবল। সমাজ সমস্যার গভীরে তাঁরা গেছেন এবং ভাববাদী দৃষ্টির বদলে বস্তুবাদী দৃষ্টি তাঁরা গ্রহণ করেছেন; নির্মোহ নির্মম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন; সংকটের বিচার করেছেন ও এক্সপেরিমেন্টের ফল পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

রত্ন ওজা পাঁচ দশকের মাঝখান থেকে লিখছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'গুলজার ক্লাব' একাংক, 'মুক্তি সপোন' প্রথম পূর্ণাঙ্গ। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় কুড়িটি নাটক লিখেছেন রত্ন ওজা। তাঁর প্রিয় নাট্যকার ইবসেন, জ্যোতিপ্রসাদ তাঁর প্রণম্য,' এবং শ্রীমন্ত শংকর তাঁর গুরুর গুরু। তাঁর নাটক সম্বন্ধে রত্ন ওজা বলেছেন—"মই নাটকর মাজেরে সর্বসাধারণ মানুহর সুখ-দুখ হাঁহি-অশ্রুর কথা কব খোজোঁ। সেই ফালর পরা মোর গাঁয়র, মোর দেশর মানুহেই মোর প্রেরণার উৎস। কি ক'ম কাকে ক'ম কেনেকৈ ক'ম—এয়ে হল মোর নাটরচনার আঁরর আন্তরিক আত্ম জিজ্ঞাসা।"[১৩] কোন কোন নাটকে তিনি ব্রেখটের এপিক থিয়েটার-এর রীতিকে গ্রহণ করেন। রত্ন ওজার নাটকে আছে স্বদেশের ইতিহাসের ভাবপ্রবাহ, দেশের মাটির বর্ণগন্ধ আর বিশ্বের আধুনিকতম নাটক ও মঞ্চকলার জ্ঞান। রত্ন ওজা অসমীয়া পথ নাটক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং একজন বড় নাট্যসমালোচকও।

মহেন্দ্র বরঠাকুর (১৯৩৫-২০০৪) আধুনিক অসমীয়া তথা ভারতীয় ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের এক অগ্রণী লেখক। তিরিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে তিনি নাটক লিখছেন। তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা উল্লেখ করতে পারি। তিনি প্রবলভাবে সমাজ-সচেতন। তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে সমাজের সমস্যা সংকটের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন এবং তার প্রতিকারের পথও নিরূপণ করেছেন : প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ তার অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হবে। তিনি মানবতাবাদী—মানুষের প্রতি ভালবাসায় তাঁর নাটক দীপ্ত হয়ে উঠেছে। মহেন্দ্র বরঠাকুর সচেতনভাবে রাজনীতি করেন না, কিন্তু রাজনৈতিক বোধ তাঁর প্রখর। অসমের রাজনীতি বা উগ্রপন্থী কার্যকলাপ নিয়ে তাঁর বক্তব্য তীক্ষ্ণ ও যুক্তিনিষ্ঠ। তিনি ব্যঙ্গেতেও নিপুণ—ব্যঙ্গের অস্ত্র দিয়ে তিনি অন্যায় পাপকে তীব্রভাবে আঘাত করেন ও সত্যকে উদ্ভাসিত করেন। মানুষের হৃদয়ও উন্মোচিত হয়েছে তাঁর নাটকে—মানবমনের দ্বন্দ্ব জটিলতা গভীর অন্তর্বিক্ষোভ সেখানে ধরা পড়ে। মহেন্দ্র বরঠাকুর প্রাচীন ইতিহাস বা কাহিনী থেকে উপাদান নিলেও তাকে আধুনিক করে তোলেন—বর্তমান সময় ভাবনা সেখানে প্রতিবিম্বিত হয়। শ্রীবরঠাকুরের নাটকের সংলাপ ঝকঝকে, গ্রন্থন ভাল, রূপের মধ্যে পরিপাট্য আছে। তাঁর নাটকে মঞ্চ সাফল্যের উপাদান আছে—তাই প্রযোজনার বিচারে মঞ্চে তাঁর প্রায় প্রতিটি নাটকই বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে।

মহেন্দ্র বরঠাকুরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'জন্ম' প্রগতি শিল্পী সংঘ অভিনয় করে ১৯৭২ সালে। 'বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাত সৎ হৈ থকাটা এটা অপরাধ'—এই কথাকে মূল উপপাদ্য

করে 'জন্ম' নাটক লেখা হয়েছে বলে নাট্যকার জানিয়েছেন। দুজন শিক্ষিত যুবক অজয় ও অবিনাশ সততার আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু প্রতি পদে সমাজের দুর্নীতি নীতিহীনতা ও আত্মসর্বস্ব মনোবৃত্তির সামনে তারা অসহায় হয়ে পড়ে। অস্ত্র না ধরলে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়, বন্দুকই আনতে পারে মুক্তি-এই ভাবনায় নতুন পথের নির্ণয়ে নাটক শেষ হয়। নাটকটির পরিচালক ধীরু ভূঞা যাঁর সুদক্ষ শিল্পিত প্রয়াসে 'জন্ম' বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

'পিতামহর শরশয্যা' (১৯৭৭) রূপকধর্মী নাটক যাতে অতীত জীবনের সঙ্গে বর্তমানের সাযুজ্য ঘটানো হয়েছে। মহাভারতের চরিত্র পিতামহ ভীষ্মকে বিংশ শতাব্দীর সমাজে স্থাপন করা হয়েছে। ত্যাগী বীর ভীষ্ম অত্যাচারী দুর্যোধনকে সিংহাসনে বসান, সেরকম বিয়াল্লিশের এক দেশভক্ত বিপ্লবী দামোদর হাজরিকা অত্যাচারী এক দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। পুরাণ আর বর্তমান এক হয়ে যায়- নতুন শাসকও সমান অত্যাচারী হয়ে ওঠে। এবার ক্ষোভ আর হতাশা নয়, প্রকৃত মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে হবে। মহাভারতের দৃশ্যসমূহ উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে দামোদর হাজরিকার জীবনের সামন্তরাল দৃশ্যের উপস্থাপনায় নাটকার সার্থকতা দেখিয়েছেন। পৌরাণিক যুগের সঙ্গে যেন আধুনিক যুগের চরিত্র ও রীতির কোন পার্থক্য নেই। নাটকের পরিচালক ইন্দ্রপ্রসাদ হাজরিকা। 'আহতগুরির নতুন বাট' সামাজিক নাটক ও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর দৃঢ় সংকল্প এতে ব্যক্ত হয়েছে। এক প্রবল ঝড় ও সাইক্লোনে আহতগুরি গ্রামের সুবৃহৎ বটগাছটি উপড়ে পড়ে যাতায়াতের একটিমাত্র পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। গ্রামের তরুণরা গাছটি কাটবে; কিন্তু ধূর্ত কাঠগোলার মালিক জীবন বরুয়া গায়ের মাতব্বর তার অনুগত ঘনশ্যাম পুরোহিত কেরানী ও মেম্বারকে বশ করে গাছটি তার গোলায় নিয়ে যেতে চায় কারণ এই দামী কাঠ বেচে সে বেশ টাকা পাবে। দুগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত, এমন সময়ে এক নারী অমলা এসে বলে যে যখন সে আর তার স্বামী সুখের নীড় গড়তে চেয়েছিল তখন এই জীবন বরুয়ার চক্রান্তে পর্যুদস্ত তার স্বামী এই গাছের ডালে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে এবং সেও চরম অত্যাচারিত হয়। আর এক বৃদ্ধ বৃকোদরও এদের দ্বারা বিশেষ ঘনশ্যাম কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিল, ঘনশ্যামের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়ায় বৃকোদরকে গাছে বেঁধে পুলিশ দিয়ে মার খাওয়ানো হয়েছিল। এইসব কথা যুবকদের উজ্জীবিত করে। তারা গাছ কেটে পথ পরিষ্কার করে এবং বদমাইশদের বিতাড়িত করে সুস্থ জীবন গড়ে তুলতে আগুয়ান হয়। তীব্র প্রবল বক্তব্য সমন্বিত, শিল্পময়, সুগ্রথিত এই নাটকটি মঞ্চে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। এই নাটক বিভিন্ন সংস্থা অভিনয় করেছে। ১৯৭৮-এর মে মাসে নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে উপস্থাপিত করে ঐকতান প্রবীণ অভিনেতা নীলু চক্রবর্তীর পরিচালনায়।

মহেন্দ্র বরঠাকুরের 'শরাগুরি চাপরি' (১৯৮৩) আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট নাটকরূপে পরিগণিত। অহম রাজা গদাধর সিংহের সময় কাহিনীর পটভূমি। সন্ত গায়ক মানবতাবাদী ধর্মসাধক আজান ফকিরের জীবন ও আদর্শ এতে প্রতিফলিত। ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক কলুষতার বিরুদ্ধে মানবমিলনের বাণী এখানে উচ্চারিত। নাটকের শেষ দৃশ্যটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তখন জয়া ও বৃদ্ধ বদরের মিলন ঘটে। সব শ্রেণীর দর্শকের কাছে নাটকটি আবেদন নিয়ে আসে। The play has all the elements for attracting the cross section of the audience who reacted very favourably বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কুলদা ভট্টাচার্যর পরিচালনায় কহিনুর থিয়েটার

নাটকটির অসাধারণ মঞ্চায়ন ঘটায়। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে আমাদের সমাজ জীবন ক্ষমতার লোভে কেমন বিপন্ন হয়ে পড়েছে তা সুন্দর রূপ পেয়েছে ১৯৮৫-র 'দধীচি' নাটকে। ভ্রাম্যমান থিয়েটার দলের অন্যতম মুকুন্দ থিয়েটারের এটা এক জনপ্রিয় প্রযোজনা, পরিচালক হেম ভট্টাচার্য।

'মুখ্যমন্ত্রী' রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নাটক। স্বাধীনতা পরবর্তী অসম তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থার রূপায়ণ এই নাটকটি। 'মুখ্যমন্ত্রী' নাটকে মুখ্যমন্ত্রী বলে কোন চরিত্র নেই। গাঁয়ে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী আসবে। প্রশাসন আমলা কর্মচারী ঠিকাদার সকলে ব্যস্ত কী করে জায়গাটাকে সুন্দর করা যায়, রাস্তাঘাট ভাল করা যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে এনে নিজের ক্ষমতা দেখাতে চাইছে রাজনৈতিক নেতা ও সকলেই ধান্দা করতে চায়। মানুষের অসহায়তা দুঃখকষ্ট—কোন দিকে এদের নজর নেই। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া গেল না, ডাকাত লুঠ করছে নারীর অলংকার, আসন্নপ্রসবা নারী অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর—কিন্তু কোন পথ নেই রাস্তা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য সবাই রাস্তা সারাচ্ছে, পথঘাট ঠিক করছে। আয়োজন করা হচ্ছে সুন্দর অনুষ্ঠানের। একজন আদর্শবাদী সৎ স্বাধীনতা সংগ্রামী এইসব মিথ্যাচারী ভ্রষ্ট শাসকদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়। হেঙুল থিয়েটার নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে, যে জন্য হেঙুল থিয়েটারের প্রযোজক পরিচালক অভিনেতা প্রশান্ত হাজরিকা বিশেষ অভিনন্দন লাভ করবেন। মহেন্দ্র বরঠাকুর ১৯৮৭-৮৮ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে সাহিত্যাচার্য অতুলচন্দ্র হাজরিকা পুরস্কার পেয়েছেন 'মুখ্যমন্ত্রী' নাটকের জন্য। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত।

'সম্রাট আরু সুন্দরী' ইতিহাস ও প্রচলিত আখ্যান কাহিনীর ওপর গড়ে ওঠা সার্থক নাটক। রাজপুত্র অশোকের ঔদ্ধত্য উগ্রতা ও ব্যভিচার; রূপযৌবনবতী তিষ্যার সঙ্গে তার বিবাহ; রাজা হবার পর অশোকের অত্যাচার, নারী-সম্ভোগ ও তিষ্যাকে পরিত্যাগ; কলিঙ্গ আক্রমণ ও মানুষের হাহাকার; শেষ পর্যন্ত অশোকের মানসিক পরিবর্তন ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ। ক্ষুব্ধ অপমানিত তিষ্যার সপত্নীপুত্র কুণালকে লাভ করার বাসনা ও বেদনার্ত পরিণতি—সব নিয়ে নাটকটি তীব্র আবেগময় দ্বন্দ্বসংকুল ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানবিক বোধেরও গভীর স্ফুরণ ঘটে নাটকে। কহিনুর থিয়েটার প্রযোজিত অতুল বরদলৈ পরিচালিত মহেন্দ্র বরঠাকুরের 'সম্রাট আরু সুন্দরী' এক অসাধারণ নাটকরূপে বিবেচিত হবে।

হেঙুল থিয়েটার প্রযোজিত 'কামরূপ কামাখ্যা' (১৯৮৮) পৌরাণিক নাটক। অবশ্য এর পটভূমিকায় অনেকটাই আছে ইতিহাস। ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে পুরাণ ও জনশ্রুতির বিচার করে তাকে যথার্থ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন নাট্যকার। প্রথমাংশে কামরূপের জন্মবৃত্তান্ত ও দ্বিতীয়ার্ধে কামাখ্যা মন্দিরের প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণিত হয়েছে শিল্পসম্মতভাবে। 'প্রাচীন কামরূপর ভূমিপুত্র কোন, জাতি-উপজাতির মহামিলনর সুমহান প্রক্রিয়া অসমত কাহানির পরা আরম্ভ হয়, এইবোর তাৎপর্যপূর্ণ কথা কলাসুলভভাবে নাটকখানত পরিস্ফুট হোয়ার উপরিও আজির অসমীয়াই জাতি-উপজাতির সম্প্রতিসূচক অবস্থানর প্রাচীন ঐতিহ্যলৈ সম্মান জনাবার বাবে উদ্বুদ্ধ হোয়ার ইঙ্গিত আছে' (দৈনিক অসম ২.১২.৯৯)। নাটকের পরিচালনায় ও নরকাসুরের ভূমিকায় আছেন প্রশান্ত হাজরিকা; সতী পার্বতী ও কাত্যায়নী হলেন বীণা বরা।

'বলিয়া হাতী' মহেন্দ্র বরঠাকুরের আর এক বিশিষ্ট রচনা যাতে বর্তমান সমাজ ও রাজনীতির ছবি সুন্দর অঙ্কিত হয়েছে। বিপথগামী যুবসম্প্রদায়ের কথাও বলা হয়েছে।

প্রাক্তন মন্ত্রীপুত্র দেবব্রত দাম্ভিক দুর্নীতিপরায়ণ। গ্রামের আদর্শবাদী শিক্ষক বিষ্ণুকিঙ্কর হাজরিকা দেবব্রতকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করেন নকল করার দায়ে। বাবার প্রভাবে দেবব্রত বাইরে থেকে পরীক্ষায় পাশ করে ফিরে আসে—সে এখন সবার ওপর প্রতিশোধ নেবে। সে একদিন বিষ্ণুকিঙ্করকেও অপমান করে ও তার পরিবারের প্রবল ক্ষতি করতে চায়, কিন্তু দুঃখ অভাবে জর্জরিত বিষ্ণুকিঙ্কর মাথা উঁচু রাখে। গাঁয়ের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তার সহায় হয়। ন্যায়-অন্যায় সৎ অসৎ দুই শক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মাস্টার কলিতা, গাঁয়ের সৎ যুবক অম্লান- এদের ওপর অত্যাচার করে দেবব্রত। অম্লানের বন্ধু কামাল বেঁচে থাকার তাগিদে দেবব্রতর সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু সৎ কামাল দেবব্রতর অসামাজিক কার্যকলাপ সহ্য করতে না পেরে পুলিশকে সব জানালে তাকে হত্যা করা হয়। দেবব্রতই হত্যাকাণ্ডের নায়ক। এদিকে বিষ্ণুকিঙ্করের অবসরের দিন এসেছে, ওপর মহলকে হাত করেছে দেবব্রত, সে চাকরিটা পাবে। কিন্তু সে পাপের শাস্তি পায়— কামালের হত্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী গগন শর্মা ও পাপরি শর্মার সাহায্যে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। নাটকটি প্রযোজনা করেছেন কহিনুর; পরিচালক মহানন্দ শর্মা যিনি বিষ্ণুকিঙ্করের ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন। অন্যান্য অভিনেতারা হলেন ভবেশ বরুয়া (দেবব্রত), পদ্ম বরা (কামাল), হিরেন মেধি (মাষ্টার কলিতা), রূপা বরুয়া (পাপরি শর্মা) প্রমুখ।

'পাগলা চাহাব' (পাগলা সাহেব) পারিবারিক পটভূমিকায় লেখা যাতে মদগর্বী মানুষের নিয়মনিষ্ঠা শৃঙ্খলাবক্ষার নামে দুঃসহ পীড়নের কথা বলা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তা সামাজিক অত্যাচারের প্রতীক হয়ে ওঠে। এক অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি কর্নেল মৃন্ময় চৌধুরী কেমনভাবে নিয়মশৃঙ্খলার নামে পরিবারে প্রবল দাপটে শাসন চালায়, সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে এবং কর্নেলের স্ত্রী আশালতা হৃদরোগে মারা যায় তা নাটকে কথিত হয়েছে। এদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় নন্দর সহজ সুন্দর আচরণে এদের ভয় কাটে, কর্নেলেরও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। নাটকের প্রয়োজক সংস্থা হেঙুল থিয়েটার, পরিচালকও নন্দর রূপকার প্রশান্ত হাজরিকা; আশালতার ভূমিকায় বীণা বরাও বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। সমাজ গঠনের মূল কথা হল নিজ পরিবারের শান্তি সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বজায় রাখা। নিজেকে ঠিকমত গড়ে তুলতে হবে, অর্জন করতে হবে মাহাত্ম্য, হতে হবে মহাত্মা—তবেই সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, অন্যায় অপরাধের নিবারণ করা সম্ভব হবে, অন্যায়কারী দুষ্কৃতীরাও হবে কুণ্ঠিত অবদমিত। হেঙুল থিয়েটার প্রযোজিত 'মহাত্মা' নাটকের এটাই মূল কথা। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিচারে নাটকটি অভিনবত্বের দাবি রাখে। 'যদুবংশ' (১৯৯০) নাটকে ভারতবর্ষের বর্তমান সময়ের রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচিত করা হয়েছে। 'আমার দেশখনত বর্তমান চলি থকা রাজনৈতিক ভণ্ডামীর এনে শ্লেষপূর্ণ আরু বুদ্ধিদীপ্ত উন্মেষণ সাম্প্রতিক কোন নাটকতে আমি দেখা পোয়া নাই।' হেঙুলর এই ব্যতিক্রমী নাটকখনে ভ্রাম্যমাণ নাট্যদলত এক নতুন মাত্রা সংযোজন করিব' (দৈনিক অসম—জিতেন শর্মা, ৭.১২.৯০)। দুর্নীতিপরায়ণ ক্ষমতালোভীদের অত্যাচারের ফলে রাজনীতির অপশাসনে সাধারণ মানুষ কীভাবে নিষ্পেষিত হয় ও প্রতিশোধ বাসনায় কেমন করে সংঘবদ্ধ হয় 'যদুবংশ' নাটকে তা বলা হয়েছে। নাটকে পুরোহিতের জটিল চরিত্র ফুটিয়েছেন সুরেন মহন্ত, পুরোহিতের পত্নীরূপে অসাধারণ অভিনয় করেছেন বীণা বরা। গদাধররূপে প্রশান্ত হাজরিকা ও ডি এস পি রূপে পবন ফুকনও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অযোগ্যতা ও দুর্নীতি এবং যুব সমাজের ক্ষোভ ও হতাশার ছবি সুন্দর ফুটেছে 'তেজাল ঘোরা' নাটকে।

মহেন্দ্র বরঠাকুর লিখেছেন অক্লান্ত। 'গুয়াহাটি ঃ গুয়াহাটি' নাটকে দেখানো হয়েছে উত্তর পূর্ব প্রান্তের এই বিখ্যাত শহরের অন্য এক পরিচয়। এখানে আসা এক গ্রাম্য দম্পতির কাছে গুয়াহাটি কোন রূপেতে ধরা পড়েছে নাটকে তা দেখানো হয়েছে। লেখকের অম্লমধুর তির্যক বোধের পরিচয় নাটকে পাই! 'ওভোত নাট' (ওলট পালট) একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটক। 'মাজ নিশার চিয়ার' (মধ্যরাত্রের আর্তনাদ) বর্তমান অসমের রাজনৈতিক অবস্থান, বিক্ষুব্ধদের উগ্রপন্থীদের অভ্যুত্থানের ওপর আধারিত। এই সব রাজনৈতিক কার্যকলাপে সাধারণ মানুষ নিপীড়িত হচ্ছে, দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। নাটকের বক্তব্য অত্যন্ত জরুরী এবং তা নাট্যকারের সৎ নির্ভীক মানসিকতার পরিচয় বহন করে। বোঝা গেল কেবল সামাজিক নয় রাজনৈতিক নাটকেও মহেন্দ্র বরঠাকুরের দক্ষতা।

কহিনূর থিয়েটারের বিংশতিতম নাট্যবর্ষে (১৯৯৫-৯৬) মহেন্দ্র বরঠাকুরের অসাধারণ উপহার রতন লহকর প্রযোজিত আব্দুল মজিদ পরিচালিত 'ডাইনীর প্রেম' ঃ আপোষহীন আদর্শবাদী যুবক বিদ্যুৎ—তার প্রবল বলিষ্ঠ ভাবনা নিয়ে নাটক গড়ে উঠেছে। পাশে আছে বন্ধু ডঃ প্রদ্যোৎকুমার চৌধুরী ও প্রিয় নারী রঞ্জিতা। আর তার জীবনে এল এক রহস্যময়ী নারী স্মিতা। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্যুতের জীবনে নেমে আসে ভয়ংকর বিপর্যয়—একদিকে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে তাকে অভিযুক্ত করা হয়; অন্যদিকে ভয়াবহ এডসের জীবাণু তার শরীরে পাওয়া যায়। আশার আলো ফোটে কিন্তু তা অত্যন্ত বেদনাময়। আদর্শবাদ, জীবনতৃষ্ণা ও নির্মম প্রতিবেশ সব মিলে গড়ে ওঠে এই তীব্র ঘাতপ্রতিঘাতময় নাটক। এতে অভিনয় করেছেন তপন দাস দিলীপরঞ্জন দত্ত মৃদুল বরুয়া সুরজিৎ বরা রতন লহকর মানী গগৈ চিমি গোস্বামী কৃষ্ণা প্রিয়দর্শিনী রীমা গোস্বামী প্রমুখ। সাতানব্বইতেও শ্রী বরঠাকুর সক্রিয়। তাঁর 'সবাপাতাব বসন্ত' তেজপুরে সপ্তবিংশতিম নটসূর্য ফণী শর্মা নাট সমারোহ উপলক্ষে বাণ থিয়েটার কর্তৃক মঞ্চস্থ হয় ৪ আগস্ট ১৯৯৭। তাঁর 'শিকলি' হাসি-কান্না আনন্দ দুঃখে উদ্বেল প্রায় প্রচলিত রীতির সামাজিক নাটক যা ৭ এর আগস্টে উপস্থাপিত হয়। নাট্যকারের সৃজন প্রতিভার দীপ্তিতে নাটকটি সমুদ্ভাসিত। মহেন্দ্র বরঠাকুরের সাম্প্রতিক নাটকগুলিও লিখিতভাবে বা অভিনয়ে অত্যন্ত বিশিষ্ট হয়েছে। তাঁর 'এমুঠি ৩ বার জিলিমিলি' (উপন্যাস—কুমার কিশোর, দল—থিয়েটার প্রাগজ্যোতিষ), 'জংঘল' (দল—মেঘদূত থিয়েটার), 'মহাবীর চিলারায়' (দল—কহিনুর থিয়েটার), 'ইসমাইল শেখর সন্ধানত' (উপন্যাস—হোমেন বরগোহাঞি, দল—বীণাপাণি থিয়েটার) প্রভৃতি। নতুন সহস্রাব্দেও তিনি সমভাবেই উজ্জ্বল উদ্ভাসিত।

বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা অসমের এক উজ্জ্বল পুরুষ। তিনি বড় মাপের শিল্পী ছিলেন। তিনি মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ এবং নৃত্যনিপুণ। বিষ্ণুপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এম এল এ হন। সাম্যবাদী, বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্য তিনি পুলিশের তাড়া খেয়ে কতবার লুকিয়ে থেকেছেন। তার বিচিত্র ও গভীর শিল্পবোধের জন্য বিষ্ণুপ্রসাদ কলাগুরু নামে অভিহিত হতেন। জীবিত অবস্থাতেই তিনি কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। এই অসাধারণ মানুষটিকে নিয়ে নাটক রচনা করতে মহেন্দ্র বরঠাকুরকে অনুরোধ করেছিলেন বিশিষ্ট নাট্যবক্তিত্ব রতন লহকর এবং সেইমত শ্রী বরঠাকুর লেখেন 'বিষ্ণুপ্রসাদ' সেটি কহিনুর থিয়েটার ১৯৯৯ ও ২০০০এ অতন্ত সফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে হেমন্ত দত্তর পরিচালনায়। এর সংগীত পরিচালক ছিলেন দশরথ দাস, কলা নির্দেশক আদ্য শর্মা এবং আলোকশিল্পী নির্মল

লহকর। অভিনয় শিল্পীরা হলেন পৃথ্বীরাজ রাভা, মহানন্দা শর্মা, মণিতা কাকতি, জানমনি তামুলী, মণি শইকীয়া, জুনুমনি দাস, রঞ্জুশ্রী বরা, দুলু বরদলৈ, কুন্তল গোস্বামী, পরমা কলিতা প্রমুখ। 'বিষ্ণুপ্রসাদ' নাটকটি প্রকাশিত হয় ১ জানুয়ারী ২০০০ যেটা নতুন সহস্রাব্দের অসমীয়া নাটকের জ্যোতির্ময় সূচনা করে।

উত্তম বরুয়া : আধুনিক কালের বিশিষ্ট নাট্যকার। অভিনয়ও করেন। তিনি প্রায় এগারোটা নাটক লিখেছেন যার মধ্যে বররজা ফুলেশ্বরী, বরমানুহর দোলা, জোরেঙার সতী প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। ঐতিহাসিক ও সামাজিক দু ধরনের নাটকই তিনি লিখেছেন। তাঁর প্রিয় নাট্যকার হলেন জ্যোতিপ্রসাদ ও ইবসেন। উত্তম বরুয়া বাস্তববাদী নাট্যকার। তাঁর নাটকের কাহিনী ও চরিত্রের ওপর বাস্তবের প্রভাব আছে। একজন যথার্থ নাট্যকার হতে গেলে কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ ও প্রবণতা থাকা দরকার বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে—

'নাট্যকার হবলৈ— এহাতে অধ্যয়ন আনহাতে পর্যবেক্ষণ, এ হাতে মঞ্চ শিল্পর জ্ঞান, আনহাতে জীবন সম্পর্কে জ্ঞান—এই সকলোখিনি গুণ লাগে বুলি ভাবোঁ। নাট্যকলা নজনাকৈ নাটক রচনা করা সম্ভব নহয় বুলি ভাবোঁ।[১৭]

প্রফুল্ল বরা : ১৯৬০ সালে প্রথম নাটক লেখেন 'পানী মেটেকা' - এটি একাংকিকা। শ্রী বরা প্রায় কুড়িটি একাঙ্কিকা, দশটি পূর্ণাঙ্গ নাটক ও ঐ পরিমাণেই রেডিও নাটক লিখেছেন। 'উপপথ' তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক বলে সমালোচক মনে করেন—সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা ও সম্মেলনে এই নাটক পুরস্কৃত ও অভিনন্দিত হয়েছে।

'সীমান্তর জুই' (সীমান্তের আগুন) প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক নিতান্তই মানসিক তাগিদে লেখা। ১৯৬২ সালে চীন যুদ্ধের সময় অসমে বিশেষ করে তেজপুরে মানুষের জীবনে যে বিপর্যয় ঘটে তাই লেখকের মনকে আলোড়িত করে। একদিকে জনগণের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ, অন্যদিকে এক শ্রেণীর মানুষের এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবার চেষ্টা —এই সব প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা নাট্যকার রূপায়িত করেছেন। ১৯৬৩ সালে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের মঞ্চ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে নাট্যকার পরবর্তী নাটকসমূহ লেখেন।

'উপপথ' নাটকে সমাজের অবহেলিত অনাদৃত লোকের কথা চিত্রিত যাদের লেখক রাজপথে আহ্বান করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন মানুষের অন্তরে আঘাত দিয়ে নিজের প্রাপ্য অধিকার অর্জন করতে। 'মৃত্যুঞ্জয়' নাটকে নাট্যকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেওয়া চাকরি না পাওয়া যুবকদের সামনে বাঁচার পথের নির্দেশ দিয়েছেন। 'বান' (বন্যা) নাটকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কালে নীতিহীন বিবেকহীন মানুষদের রূপ তুলে ধরেছেন—প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের সর্বনাশ করে এই রকম লোকেরাও সমানভাবেই ক্ষতিকর হয় সমাজের কাছে। নাটকে ব্রেখটীয় রীতি প্রযুক্ত হয়েছে সুন্দরভাবে। 'সাকো' হিন্দু মুসলমান মিলনের পটভূমিকায় লেখা। এই দেশে হিন্দু মুসলমান ভাইয়ের মত বাস করে, তাদের নিজেদের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি। কিন্তু শয়তানরা এতে ফাটল ধরাতে চায়, ভালবাসায় আগুন লাগাতে চায়। হয়ত তারা কিছুটা সফল হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেতে ন্যায় ধর্ম মানবিকতা। জয় হয় মানুষের।

প্রফুল্ল বরা মনে করেন যে ভাল নাটক লেখা এক মহান সামাজিক দায়িত্ব পালন করা। অসমে উপন্যাসিক গল্পকার কবি আছেন কিন্তু বড় নাট্যকারের অভাব। "অথচ সমাজত কিবা পরিবর্তন আনিবলৈ, নাট্য সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধিবলৈ নাট্য আন্দোলন গঢ়ি তুলিবর কারণে আমাক লাগে ভাল নাটক। বর্তমানে আমি বিচারোঁ এটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। কারণ মই ভাবোঁ রাজনৈতিক বিপ্লবে, বন্দুকর গুলীয়ে, শ্লোগানে আজি মানুহর

অন্তর জয় করি বিপ্লব কৰিবলৈ রাজপথলৈ মাতি নোয়ারে। যদি পারে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে, গীতব মাজেরে, নাটব মাজরেহে মানুহব অন্তর স্থায়ী ভাবে জয় করিব পারিব। সেয়েহে আমাক আজি বঙ্গতো ভাল নাট্যকাব লাগে। সেয়েহে আজি মই নাটক লিখিছোঁ, ভাল নাটক লিখিবলৈ চেষ্টা করি আহিছোঁ ঠিক এই একেই দায়িত্বর বাবেই।"[১৫]

হিমেন্দ্র কুমার বরঠাকুর : পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, অন্যদিকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, নাট্যরচনায বিশেষ দক্ষ। তাঁর নাটক সমাজের দর্পণ, জীবনের প্রতিচ্ছবি। দেশ জাতি কাল তাঁব নাটকেব পবিমণ্ডল বচনা করে। তাঁব 'বাঘ' বর্তমানকে আশ্চর্য এঁকেছে, গভীব ভাবনাব মধ্যে একটা ব্যঙ্গেব তীব্রতা নাটকে বিরল স্বাদ আনে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পটভূমিকায় লেখা হিমেন্দ্র ববঠাকুবের 'দ্বীপ' আধুনিক সময়েব এক বিশিষ্ট নাটক। বন্যায় ভযঙ্কর সর্বনাশা আবির্ভাব, চারপাশে ধ্বংস মৃত্যু, অভিজাত মানুষের বন্যার দৃশ্য উপভোগেব জন্য আউটিং, সন্তানহারা মায়ের মর্মছেঁড়া কান্না, সরকাব ও শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—নাটকে সুন্দর চিত্রিত হয়েছে। মনে হয় মানবজাতি শেষ ধ্বংসেব মুখোমুখি দাঁড়িয়েঃ প্রকৃতির নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কবতা মানুষের নির্মম ঔদাসীন্য যেন সভ্যতার অপমৃত্যু আসন্ন করে তোলে, এরই মধ্যে মানুষেরই সমবেদনা সহানুভূতি দীপশিখার মত অনির্বাণ জ্বলে। নাটকের আঙ্গিকও সুন্দব সুশিল্পিত।

অতুল বরদলৈ : ১৯৫৮ সাল থেকে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'বা-মাবলী' অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে। তিনি এ পর্যন্ত প্রায় সাতটা পূর্ণাঙ্গ নাটক ও পনেরোটা একাংকিকা লিখেছেন। তার পূর্ণাঙ্গ নাটক হল—বা-মাবলী, অক্লান্ত, খেলিমেলি, তেজে ধোয়া কামেং, এখন দুবাব লাগে, বীজাণু, প্রথম পর্যায়। তিনি নিয়তই পরীক্ষামূলক নাটক রচনা করেন এবং তা অতীব সাফলের সঙ্গেই রূপায়িত হয়।

অতুল বরদলৈ মনে করেন "নাটক বুলিলে কাহিনী, ঘটনা বা চরিত্রর প্রকাশ থাকে আরু তার যোগে দিয়েই বক্তব্য দাঙি ধরা যায়"।[১৬] তাঁর নিজের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। সমাজের পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত মানসিক অর্থনৈতিক সকল ধরনের সমস্যাই তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু।

অতুল বরদলৈ-এর 'তেজে ধোয়া কামেং' সর্বভারতীয় নাট্য সমারোহে পুরস্কৃত হয়। চীন-ভারত যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা এই নাটক বিপুল সমাদর পায়। 'বৃক্ষর খোজ' আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট নাটক হিসাবে পরিগণিত। অসমের গ্রামাঞ্চলের জীবনের নিখুঁত চিত্র এতে ফুটেছে, মৃত্তিকার গাঢ় রঙ লেগেছে এর অঙ্গে। মুলত জেলেরাই এর প্রধান চরিত্র। দরিদ্র জেলে ভোগাই একটা বড় মাছ ধরে ভাবে তার ভাগ্য বোধ হয় অনুকুল হবে। কিন্তু এই সমাজ শ্রমজীবীর শ্রমে লোভীলোলুপ ভয়ঙ্কর হাত থাবা বসায়। আসে চতুর ধূর্ত মহনদার যে ভোগাইকে প্রতারিত করে। উদ্বৃত্ত অর্থ দূরের কথা সামান্য কিছু পেয়েই খুশি থাকতে হয় দরিদ্র জেলেকে, ধনবান শক্তিশালী ও অসৎ মানুষরাই এভাবে সব অধিকার করে।

কী কী গুণ থাকলে একজন সত্যিকারের নাট্যকার হওয়া যায়? **'নাটক এখন লিখিবলৈ এজন নাট্যকারর প্রয়োজন হয়,—সমাজর পরিবেশ পরিস্থিতি আরু তার লগত জড়িত হৈ থকা লোক সকলর চরিত্র সম্পর্কে নিজর আদর্শ আরু অভিজ্ঞতারে বিশ্লেষণ করি সেই অনুপাতে এটা বিষয়বস্তু স্থির করি লৈ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিরে তাক প্রকাশ করিবার বাবে মঞ্চলৈ দৃষ্টি রাখি সংলাপ আরু কার্যর দ্বারা চরিত্র আরু সংঘাতর সৃষ্টি করার ক্ষমতা'**।[১৭]

শ্যামাপ্রসাদ শর্মা : (১৯৪৪) অসমীযা নাটকের ইতিহাসে এক তুলনাবিহীন নাম। প্রতিভাসম্পন্ন মানুষটি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভাব অনন্য স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি কথাশিল্পী, প্রবন্ধিক, গীতিকাব, ফিল্ম ও টেলিপ্লের লেখক, নাট্যকাব, নাট্যবিচালক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ড শর্মা নাট্যশাস্ত্রেও আশ্চর্য পারঙ্গম। তাঁব গবেষণাব বিষয ছিল - Development of Science Literature in Modern Indian Languages with special reference to Assamesse তাঁব দ্বিতীয় গবেষণাব বিষয হল - 'প্রাযোগিক মঞ্চ বিজ্ঞানব পবিপ্রেক্ষিতত আধুনিক অসমীয়া একাঙ্কিকাব উদ্ভবণ আরু ক্রমবিকাশ, একটি ভবিষ্যবৈজ্ঞানিক অধ্যযন'। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে সাধাবণ মানুষেব কাছে আনাব জন্য জনপ্রিয় অসমীযা বিজ্ঞানভিত্তিক নাটকেব ওপব তিনি কাজ কবছেন।

এব সঙ্গে লিখছেন নাটক এবং সেগুলি নাট্যগুণে সমৃদ্ধ ও মঞ্চে তাবা সাফল্য অর্জন করেছে। ড শর্মা মূলত বিজ্ঞান বিষয়ে নাটক লেখেন। এক্ষেত্রে তাঁব মত কৃতি মানুষ এদেশে নেই বললেই চলে। যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কাব, পবিবেশ দূষণ, বন্যাব প্রকোপ, জনবিস্ফোবণ, শিক্ষা সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষযেব ওপব তিনি নাটক লিখেছেন। বিজ্ঞানকে তিনি নাটকেব মধ্য দিযে জনপ্রিয কবতে চান। তাঁব উদ্দেশ্য একটি সুন্দব উজ্জ্বল পৃথিবী গঠন কবা যেখানে মানুষেব জীবন হবে সমৃদ্ধ সুখশান্তি পূর্ণ। তাঁব বচিত শতাধিক নাটকে ড শর্মাব এই মহৎ জীবনভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁব লেখা 'দেবতাব অন্য রূপ' (১৯৬৯) অসমীযায লেখা প্রথম যথার্থ বিজ্ঞান নাটক। তাঁব অজস্র নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট হল—'হে মঞ্চ বিদায' (৭৩), 'অসমাপ্ত বিচাব কাহিনী' (৭৭), 'ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে' (৭৯), 'কেতিযাবা বিস্ফোবণ' (৮৪), 'এ নিশাব নাট' (৮৪), 'আকণ্ঠ হলাহল', 'আর্ত অনুস্টুপ' (৮৯), 'মমতাব মহাকাব্য' (৯২), 'বিশ্বাস' (৯২), 'কীট' (৯৩), 'অস্তিত্বর সন্ধানরত অসতী' (৯২), 'আজিও অশ্বত্থামা' (৯৮), 'মিলিজুলি মিতিবালি' (৯৬), 'যুদ্ধ জারী আছে' (৯৯), 'শুভ সূত্রপাত' ইত্যাদি।

'কীট' ১৯৮৪-র ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনাব ওপব আধাবিত। 'মিলিজুলি মিতিবালি' পরিবেশ-বিষয়ক বেতার নাটক। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি—বিজ্ঞান-নাটক' গ্রন্থে চারটি বিজ্ঞান বিষয়ক নাটক সংকলিত—'বিশ্বাস' 'মমতাব মহাকাব্য' 'দোমোজা' (হতবুদ্ধি বা বিমূঢ় হওয়া), 'শুভ সূত্রপাত'। এদের বিষয় হল কুসংস্কার ও ধর্মের নামে অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণের কথা; বন্যাসংকট বৃক্ষচ্ছেদন ইত্যাদি সমস্যার জন্য দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন ও যথাযথ প্রয়োগ; পর্বত কিংবা ছোট টিলা ইত্যাদি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রামজীবনের পরিবেশ পরিস্থিতি রক্ষায় নারীদের উত্থান ও অংশগ্রহণ; জনবিস্ফোরণেব বিষয় ইত্যাদি। 'গণতন্ত্রর অন্ত্যেষ্টি' নাটক গণতন্ত্রের সংকট ও অত্যাচারী শাসকের হাতে গণতন্ত্রর বিনাশের কথা এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের জয়ের কথা বলা হয়েছে। প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব আদর্শের সংঘাত এবং যুক্তিনিষ্ঠ নতুন আদর্শের জয় ঘোষিত হয়েছে 'রবি রাজা বুধ মন্ত্রী' নাটকে যা প্রয়োজনাতেও বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। মানুষকে সুস্থ জীবনবোধ ও পরিপূর্ণ আদর্শের উপলব্ধি দেবার প্রেরণাতে রচিত হয়েছে 'হে মঞ্চ বিদায়'। শ্যামাপ্রসাদের প্রায় সব নাটকই মঞ্চে সফলতা অর্জন করেছে। তাঁর নাটক বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্যাকে বিচার করে, পারিবেশ পরিস্থিতিকে কলুষমুক্ত করতে চায় এবং তা জীবনকে সমাজকে সভ্যতাকে সুন্দর সমৃদ্ধ করার প্রয়াসী। তিনি যথার্থই এক বিজ্ঞানী-নাট্যকার।

আবদুল মজিদ : মঞ্চ চলচ্চিত্র, দূরদর্শনের পরিণত শিল্পী। তাঁর পরিচালিত 'চামেলি মেমসাহেব' আঞ্চলিক জাতীয় চিত্ররূপে পুরস্কৃত হয়েছে। 'চোর' তাঁর বিখ্যাত নাটক যা

অসম সাহিত্য সভার পুরস্কার লাভ করেছে। এই নাটকে তিনি থিয়েটারস্কোপ রীতি প্রয়োগ করেছেন এবং প্রসেনিয়াম মঞ্চের নিয়ম পরিহার করে অভিনেতার প্রেক্ষাগৃহ থেকে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। নাটকটিতে সমাজ ভাবনার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

অরূপ চক্রবর্তী : নিউ আর্টস প্লেয়ার্স গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক যে সংস্থা অসমের নাট্য আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছে। শ্রীচক্রবর্তী মঞ্চ ও বেতার নাটকের খ্যাতিমান শিল্পী। তার নিরীক্ষাধর্মী মন নাটক রচনায়ও একশো পেয়েছে। তাঁর 'মঞ্চত পঞ্চানন শর্মা' একটি পূর্ণাঙ্গ তাৎক্ষণিক অলিখিত নাটক যা অসম থিয়েটারে এক অনন্য পরীক্ষাধর্মী সফল শিল্প রূপে বিবেচিত। এক শিক্ষকের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের ওপর এটা আধারিত।

আলি হায়দর : এক তরুণ নাট্যপ্রতিভা যিনি প্রসেনিয়াম মঞ্চ ও অ্যারেনা মঞ্চর নাট্যরূপায়ণ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। নাট্য আন্দোলন নামক একটি নাট্যপত্রিকা তিনি সম্পাদনাও করতেন। তার একাঙ্ক ''জন্ম ক্রন্দন'' অসমীয়া একাঙ্ক নাট্যসাহিত্যে একটি উল্লেখ্য সংকলন। 'অহৈতুকী দেশপ্রেম' তীব্র ব্যঙ্গাত্মক নাটক। আলি হায়দর-এর 'এটা চোলার কাহিনী' (একটা জামার গল্প) উচ্চমানের নাটক। এক দরিদ্র দর্জি ও তার স্ত্রী কাপড় বোনে ও লোকের জামা-কাপড় তৈরি করে, কিন্তু তাদের কিছু নেই। ক্রমে সেই বস্ত্রখণ্ড যেন বিরাট হয়ে তাদের গ্রাস করে নেয়। তার 'কুপ্রথা'ও অত্যন্ত উল্লেখ্য নাটক।

''জন্ম ক্রন্দনত আলি হায়দরে যেন নতুন যুগর জন্মক্রন্দন শুনা পাইছে। নাটখনর প্রতীকী দিশ এটা আছে আরু কাহিনী উপস্থাপনত কিছুমান সামাজিক করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি নাট্যকার তেঁওর সমাজ সচেতন মনর পরিচয় দিছে।''

করুণা ডেকা : এসময়ের এক শক্তিশালী নাট্যকার। তিনি জীবনের গভীরে নিমজ্জিত হয়ে পরম সত্য আহরণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ভাবনাও তাঁর নাটকে নিবিড় হয়ে দেখা দেয়। অতীত ইতিহাসকে তিনি বর্তমান যুগের সঙ্গে অন্বিত করেন। তা এভাবেই নতুন বোধে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। তার বিশেষ উল্লেখ্য নাটক 'সরাইঘাট' যা মহান বীর ও দেশপ্রেমিক লাচিত বরফুকন-এর সংগ্রামী আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল বাদশাহ বিরাট সৈন্যদলকে পাঠান অসমকে দখল করতে। অহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহ সেনাপতি বা বরফুকন নিযুক্ত করেন তরুণ লাচিত-কে যিনি সরাইঘাটের যুদ্ধে মোগলদের পরাজিত করেন। লাচিত বরফুকনের দেশপ্রেম আদর্শনিষ্ঠা ও বীর্যবত্তাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে করুণা ডেকার 'সরাইঘাট'। নাটকটি প্রযোজনা করেছেন অসমের নতুন গড়ে ওঠা পরীক্ষাধর্মী থিয়েটার সীগাল এবং সফলভাবে পরিচালনা করেছেন সীগালের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও এন এস ডি-র স্নাতক প্রতিভাবান নাট্যকর্মী বাহারুল ইসলাম।

করুণা ডেকা রচিত 'উরুখা' শিল্পী জীবনের বেদনাকে তুলে ধরে নাটকের ভাষায়, 'উরুখা'ও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

রফিকুল হোছেইন (হোসেইন) মনে করেন যে নাটক হল বহুমাত্রিক শিল্প (Multi Dimentional Art Form)। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন জগত ও প্রকৃতিকে দেখা শিল্পের ধর্ম, নাটকেরও এবং যে নাটকে চিত্রধর্মিতা নেই নান্দনিক বিচারে তা অসম্পূর্ণ। রফিকুলের 'ধোঁয়া দৈবকী জলাশয়' (১৯৯৫) তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংকলন খাতে লেখকের সৃজনদক্ষতা প্রস্ফুটিত।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে অসমে বেশ কিছু ভাল নাটক আছে।

ঐশ্বর্য কাকতি লিখেছেন 'ইপাব সিপাব' যা তাঁব পবিচালনায তেজপুব চাদমাবীব শোণিতপুব শিল্পী সমাজ মঞ্চস্থ কবে। অসম নাট মহোৎসব আরু প্রতিযোগিতা ৮৫ ব স্মবকপত্রে এ নাটক সম্বন্ধে লেখা হয়েছে— 'ইপাব সিপাব' নাটকত প্রকাশ পাইছে সাম্প্রদাযিকতাব সংকীর্ণতাব উর্দ্ধত থকা এখন সমাজব প্রতিচ্ছবি। ধর্মব সবলতা আরু সম্প্রীতিব মেবপাকত কেতিযাবা সমাজত স্খলন আবম্ভ হয। কিন্তু বাম হাসিনাব দবে সচা প্রেমব পবিত্র সৌবভে আকৌ একতাব বান্ধোন কটকটীযা কবে। মইনামতী নদীয়ে সমযতে বখা সোণফুলীযা গাওঁব একতাব বান্ধোন হিন্দুমুছলমানব যুগমীযা সম্প্রীতি কতিযাও বিচ্ছিন্ন নহয। এই কুবি শতিকাত আমি কটকটাযা হওঁ আমি পাহবি যাও আমাব ভেদাভেদ, পাহবি যাও ধর্মব সংকীর্ণতা আরু সুন্দবব আলিয়েদি এযা আমাব যাত্রা আবম্ভ।

নেত্রকমল ভট্টাচার্য লেখেন 'মসজিদ মন্দিব', যে নাটক সম্বন্ধে এখানেই লেখা হয জাতি ধর্মব বং সানি কোনো শিশু পৃথিবীত ভূমিষ্ঠ নহয। জাতি ধর্ম বর্ণ এই সকলো সমাজব সৃষ্টি যুগে যুগে হিন্দু মুছলমানব মাজত সম্প্রীতি আরু একতা বিবাজমান। আমাক নামধব মছজিদ নালাগে। নাম নামাজ নালাগে। আল্লা ভগবান নালাগে। আমাক জাত নথকা এখন মানুহব সমাজ আরু এটা মন্দিব লাগে। আমি সকলোবে "ঈশ্বব আল্লা তেবে নাম গাম।" নাটকটি পবিচালনা কবেন শ্রী ভাবি শইকীযা। সম্প্রীতিব আদর্শভূমি অসমে এবকম আবো নাটক লেখা হযেছে যা অন্য ভাষাতেও গৃহীত হয়েছে। প্রায দুদশক আগে লেখা হযেছিল 'কাঠফুলা' (কাঠেব ফুল) লেখক সৈযদ আবদুল মালিক। নাটকটি একটি প্রেমকাহিনী যাব মধ্যে সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি ও মানবিকবোধেব কথা আছে। এটি হিন্দীতে রূপান্তবিত কবেছেন আনিশ বফি এবং গোবখপুব আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে তা সম্প্রচাবিত হয।

তরুণ নাট্যকাব **অমূল্য কাকতিব** 'এখন নাটক আরু' (একটি নাটক এবং) সাম্প্রদাযিকতাব বিরুদ্ধে প্রবল বক্তব্য বাখে। একদল ছেলে মেয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণে বাইবে এসে আটকে পড়েছে উত্তব ভাবতেব একটি স্টেশনে। তখন শুরু হয সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এবা এই ভযাবহ সংকটেব কথা বলে এবং মানবিকতাব বিষযটিও গভীব প্রত্যযেব সঙ্গে উচ্চাবিত হয। বোমা বিস্ফোবণে দাঙ্গায আঘাতে আক্রমণে পবিবেশে এই প্রশ্ন তীব্র হযে ওঠে—কেন এই অকাবণ সংঘর্ষ সংঘাত হিংসা বক্তপাত? সীগাল সংস্থাব প্রযোজনায অনুপ হাজবিকাব পবিচালনায নাটকটি মানুষেব উষ্ণ অভিনন্দন লাভ কবে। বাববি মসজিদ ভাঙ্গাব পটভূমিকায নাটকের আবেদন আবো জোরালো হযে ওঠে।

গণিতবিদ অধ্যাপক ড **সীতানাথ লহকর** নাটক বচনায ও পরিচালনায বিশেষ দক্ষতা দেখিযেছেন। প্রগতিশীল ভাবনাব তিনি শবিক এবং তাঁর নাটক এই আদর্শে দীপ্ত। তাঁর 'মহাযজ্ঞ' নাটকে সাম্প্রদায়িক সংকটের কথা বলা হয়েছে। নাট্যকার মনে কবেন যে রাজনৈতিক দলগুলিই দাঙ্গায় উস্কানি ও প্রবোচনা দেয় ও সাধাবণ মানুষ সেই ফাঁদে পড়ে বিপথগামী হয়। অসমের একটি অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানরা শান্তিতে বাস করত কিন্তু বাজনৈতিক দলগুলি তাদেব মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন কবতে চায় ভোটে জেতার জন্য। কিন্তু সৎ শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ও মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে। বাববি মসজিদ ভাঙার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাটকটির বক্তব্য আরো তীব্র হযে ওঠে। সমাহার নাট্যগোষ্ঠী 'মহাযজ্ঞ' অত্যন্ত সফলতাব সঙ্গে মঞ্চস্থ কবে। ড. লহকর আরো সফল নাটক লিখেছেন।

ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া (১৯৩২-২০০৩) ঃ পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তিনি উজ্জ্বল। চিত্র-পরিচালক রূপে তিনি দেশে বিদেশে সম্মানিত হয়েছেন, ছোটগল্পের জন্য তিনি সাহিত্য অ্যাকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। অসমের নাট্যজগতেও তিনি বিশেষভাবেই সক্রিয়। ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠীর হয়ে তিনি নাটক লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন। আঙ্গিকের চাকচিক্যকে পরিহার করে তিনি বিষয়বস্তুর ওপর বেশি জোর দেন এবং তা দ্বারা দর্শকদের মোহিত করেন। তাঁর গল্পের ওপর ভিত্তি করে বেশ কটি নাটক লিখেছেন। তাঁর 'দীনবন্ধু' একজন স্কুল শিক্ষকের ট্র্যাজিক পরিণতির পরিচয় তুলে ধরে যিনি অর্থের প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। 'গহ্বর'ও জনপ্রিয় হয়। তাঁর 'পুতলা নাচ' একাঙ্কটি আবেগে দ্বন্দ্বে উৎকণ্ঠায় অসামান্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। তাঁর 'গ্রহণ' গল্প অবলম্বনে 'রাহুগ্রাস' নাটক লেখা হয়েছে বাংলায় এবং সেটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৫. বাংলা ও অসমীয়া নাটক : পারস্পরিক সম্পর্ক

(১) সূচনা ঃ বাংলা নাটকের সঙ্গে অসমীয়া নাটকের যোগ দীর্ঘকালের। উনবিংশ শতাব্দী থেকে তা বহুলভাবে চলে আসছে। আধুনিক অর্থে অসমীয়া নাট্য আন্দোলন কয়েকজন অসমীয়া ছাত্রের দ্বারা কলকাতাতেই গড়ে উঠেছিল। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট 'অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধিনী সভা' জন্ম নেয় কলকাতাতে এবং এই গোষ্ঠী নাট্য সাধনায় ব্রতী হয়। এঁরা মঞ্চস্থ করেন 'ভ্রমরঙ্গ' যেটা বাংলা 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর অসমীয়া রূপান্তর। এরা শেক্সপীয়রের মূল নাটকের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তখনকার প্রচলিত রচনা 'ভ্রান্তি বিলাস'-কে। কলকাতার ৪৫ নং বেনিয়াটোলা স্ট্রিটে এর অভিনয় হয়। পরে হয় ভবানীচরণ দত্ত লেন ও মীর্জাপুর স্ট্রীটে। লক্ষীনাথ বেজবরুয়া, রমাকান্ত বরকাকতী প্রমুখ অভিনয়ে অংশ নেন।

(২) প্রথম পর্যায় ঃ অসমে নাট্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিরাও নাট্য রচনায় ও নাট্যাভিনয়ে ব্রতী হন। স্বরচিত মৌলিক নাটকের সঙ্গে বাংলা নাটককে তাঁরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা নাটক বহুল মাত্রায় অনূদিত অভিনীত হতে থাকে। "কলিকাতার রঙ্গমঞ্চত কোনো এখন নতুন নাট মেলা হোয়ার পিছতেই অসমত তার অনুবাদিত সংস্করণ মেলিবলৈ আমার শিল্পী সকলে খরখেদা লগাইছিল। এই দরেই বাংলার পরা অনুবাদিত বহু নাটক অভিনয় সেই সময়ত প্রচলন হৈছিল।"[১৮] ওই সময় অনূদিত রূপান্তরিত নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য - চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, নূরজাহান, মেবার পতন, রানা প্রতাপ, ভীষ্ম, আলমগীর, কালাপাহাড়, জনা, সীতা, কর্ণার্জুন, দেবলা দেবী, হিন্দুবীর, বাজীরাও, মোগল পাঠান, পৃথ্বীরাজ, রিজিয়া, ভাস্কর পণ্ডিত, অহল্যাবাঈ ইত্যাদি। সাজাহান ও আবন-এর ভূমিকায় জ্যোতিপ্রসাদ, চাণক্যর ভূমিকায় বোধনাথ পটঙ্গীয়া, ইন্দ্রেশ্বর বরঠাকুর, বরদাকান্ত শর্মা; রামের ভূমিকায় মানিকচন্দ্র চৌধুরী, ড: ললিত মোহন চৌধুরী; খিজির খাঁ-র ভূমিকায় জগৎচন্দ্র তেজবরুয়া; কালাপাহাড় রূপে ব্রজনাথ শর্মা, ড: কামিনীকান্ত দাস প্রমুখের "উৎকৃষ্ট অভিনয় আজিও দেখোঁতাসকলর চকুর আগত জল্‌জল্‌ পটপটৈহে জিলিকি আছে।"[১৯]

১৯২৫-১৯৩৫ সালের ভেতরে নাজিরা নাট্যমন্দির মঞ্চে অসংখ্য বাংলা নাটক অনুবাদ করে অভিনয় হয়। গুয়াহাটী শিল্পী সংঘ ১৯৪৯ সালে 'সাজাহান' করে ও তা সমগ্র অসমে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ১৯৩১ সাল থেকেই 'বীণাপানি নাট্য সমাজ'

বা 'চারিআলি বীণাপানি নাটসমাজ'-এর কাজ চলতে থাকে। ১৯৪২ সালে এই নাট্য সমাজ নিজস্ব ইঞ্জিনসহ জেনেরেটর দ্বারা বিজলীবাতি জ্বেলে নাটক করে। ১৯৬০ সালে এটা রিভলভিং স্টেজ হিসাবে রূপায়িত হয়। অসমে এটা দ্বিতীয় ঘূরণ মঞ্চ যদিও বিদ্যুৎচালিত ঘূরণ মঞ্চ রূপে প্রথম। এই ঘূরণ মঞ্চের অধিকাংশ কলকাতাতেই তৈরী। "স্থানীয় শিল্পী শ্রী ভদ্রকান্ত শইকীয়াই কলিকতার 'স্টার থিয়েটার'লৈ গৈ সেই মঞ্চর কারিকরী কিটিপকাটাপ আদির বিষয়ে ভাল দরে বুজি আহি এই ঘূরন মঞ্চতো প্রয়োগ করেহি।"[২০]

বাংলা নাটক অসমীয়াতে রূপান্তরিত হয়ে হয় তেজপুরে, গুয়াহাটিতে, বরপেটা, নলবাড়ীতে। মন্মথ রায়ের 'কারাগার' 'মীরকাশিম' প্রভৃতি খুব জনপ্রিয় হয়। কলকাতায় 'রিজিয়া' তখন হৈ হৈ করে চলছে, নামভূমিকায় তারাসুন্দরী। বরপেটাতেও মহাসমারোহে শুরু হল 'রিজিয়া', নামভূমিকায় প্রথমে করেন রামানন্দ চৌধুরী, পরে হরেন শর্মা। গোলক খাউণ্ডের 'বিয়াল্লিচ-পঞ্চল্লিচ' (১৯৫০) গিরিশচন্দ্রর 'প্রফুল্ল' নাটকের ধাঁচে অনেকটা গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন চোরাবাজারী, খাদ্যবস্তুর সংকট, যোগানদারদের দুর্নীতি ইত্যাদির পটভূমিকায় এই পাঁচ অঙ্কের নাটকে বীরেন্দ্র উকিল জাল জুয়াচুরী করে ভাইদের সর্বস্বান্ত করে ও এক ভাইকে জেলে পাঠায়। শেষপর্যন্ত স্ত্রী যমুনার পরামর্শে ও এক আকস্মিক মটর দুর্ঘটনায় পড়ে তার পরিবর্তন ঘটে। নাটকের কাহিনী ঘটনা চরিত্র অনেকটাই প্রফুল্ল-র মত।

(৩) দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকার ও অসমীয়া নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ক্ষীরোদপ্রসাদ গিরিশচন্দ্র প্রমুখের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক অসমীয়ায় কত রূপান্তরিত ও অভিনীত হয়েছে তার পরিমাপ করা কঠিন। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যের ওপর দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি নাটকের অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের গভীর প্রভাব আছে, বিশেষত ঐতিহাসিক নাটকের ওপর। অসমীয়ায় অনেক উচ্চমানের ঐতিহাসিক নাটক লেখা হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব ও মহিমার কথা স্মরণ করেছেন লেখকগণ আধুনিক ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় অসমীয়া নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করেছেন বাংলার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। গিরিশচন্দ্র, শচীন্দ্রলাল সেনগুপ্ত প্রমুখ লেখকগণও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছেন। "গিরিশচন্দ্র আরু দ্বিজেন্দ্রলালর বিশেষকৈ পাছর জনর কৃতকার্যতাই অসমীয়া নাট্যকার সকলক ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবলৈ প্রেরণা দিছিল।"[২৯]

অতুলচন্দ্র হাজরিকার 'কনৌজ কুঁয়রী' (১৯১৩), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯৪৭), দৈবচন্দ্র তালুকদারের 'ভাস্কর বর্মা' (১৯৫১) 'বামুনী কোঁয়র' (১৯২৮), নকুলচন্দ্র ভূঞার 'চন্দ্রকান্ত সিংহ' (১৯৩৯), 'বদন বরফুকন' (১৯২৭) দণ্ডিনাথ কলিতার 'সতীর তেজ' (১৯৩১), গণেশচন্দ্র গগৈর 'কাশ্মীর কুমারী', উমাকান্ত শর্মার 'শেষ পতাকা' (রচনা ১৯৩৪-৩৫, প্রকাশ ১৯৪৮) প্রভৃতি নাটকের ওপর দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাসের কথাকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব ও সমৃদ্ধিকে প্রকাশ করা, দেশের বেদনায় ব্যথিত হওয়া ও পরাধীন জাতিকে জাগ্রত করার আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ থেকেই অসমীয়ায় গৃহীত হয়েছে যা উপরের নাটকগুলির মধ্যে আছে। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কোথাও জাতির গ্লানি ভুলে তাকে জাগরণের নির্দেশ—

ক) বানা—দূবে চলে যাও মানসী। যুদ্ধে বাধা দিও না।

মানসী –ক্ষান্ত হৌন পিতা। সর্বনাশ যা হবাব হযেছে। সে সর্বনাশ আব নিজেব ভ্রাতবক্তে বঞ্জিত কববেন না। এ শোকেব সান্ত্বনা হত্যা নহে-এব সান্ত্বনা-আবাব মানুষ হওযা।

বানা—মানুষ হওযা - সে কিবকম কবে মানসী?

মানসী—শত্রু মিত্র জ্ঞান ভুলে গিযে, বিদ্বেষ বর্জন কবে। নিজেব কালিমা, দেশেব কালিমা বিশ্বপ্রেমে ধৌত কবে দিযে। গাও চাবণীগণ। সেই গান যা তোমাদেব শিখিযেছি - আবাব তোবা মানুষ হ।

(মেবাব পতন - দ্বিজেন্দ্রলাল)

চন্দ্রকান্ত—মই এতিযাই বুজিছো, ভালকিযে বুজিছো, আমাব কিহব দোষত, আমাব কত শত তপস্যাব স্বাধীন অসমক চিবদিনলৈ হেরুবালো। কেবল, কেবল অসমীযাব পবশ্রীকাতবতা আরু কন্দল। এতিযাও কোন কত আছা অসমীযা। শুনা, এবাব কান পাতি শুনা, তোমালোকব পবশ্রীকাতবতা আরু আত্মকন্দল বিসর্জন দিযা। অসমীযাই অকসমীযাক বিশ্বাস কবা, আদব কবা, আকোবালি ধবা। হতভাগ্য অসমীযা তোমালোকব দেশ যদি এতিযাও বাখিব খোঁজা, লুপ্ত স্বাধীনতা যদি উদ্ধাব কবিব খোঁজা, তেন্তে তেন্তে তোমালোক আকৌ মানুই হোবা, মানুহ হোবা, মানুহ হোবা।

(চন্দ্রকান্ত সিংহ—নকুলচন্দ্র ভূঞা, ৫/৯)

খ) শিবাজী—দেখেছি, অসহায জাতিব প্রতি শাসনেব নামে কি উপদ্রবই নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আর কেমন কবেই জাতিব প্রতিটি মানুষ মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিযে নীববে তাই সহ্য কবছে।

(গৈবিক পতাকা-শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১/২)

শিবাজী—চকুব আগতে দিখব লাগিছো শাসনব নামত দিনে বাতি কি নিদারুণ অত্যাচাব হব লাগিছে . এটা সভ্যজাতিব প্রাণশক্তি ইমান দুর্বল হৈ গৈছে যে তাকেই সিহঁতে বিধিলিপি বুলি নীববে সহ্য করি থাকে।

(ছত্রপতি শিবাজী—অতুলচন্দ্র হাজবিকা)

অতুলচন্দ্র হাজারিকার কনৌজ কুয়বী ও ছত্রপতি শিবাজীতে মেবাব পতন-এব প্রভাব প্রবল। গায়িকা সংযুক্তার চরিত্রে মেবাব পতন-এর মানসী ও সত্যবতীব ছাযা আছে। মানসীব মত সে যুদ্ধে যেতে চায। মানসীব মতই সে বলে—"মানুহে মানুহব ওপবত কিমান নির্দয ব্যবহার করিব পারে তাকো বুজি আহিম। মানুহে মানুহর বক্ত পান কবি কেনেকৈ মতলীযা হয় সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য চাই আহিম" (১/৪)

দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতন-এ সত্যবতী বলছে—"সামন্তগণ। তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজ। বানা যদি তোমাদেব যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হন, আমি তোমাদের সেনাপতি হব"। সংযুক্তা বলছে "বলা ভিল ছর্দার আরু রাজপুত বীর সকল। রাজপুত পুরুষব গাত তোমালোকক পরিচালনা করিবর শক্তি নাই। রাজপুত নারী সেই কাম করিব।" (৪/৫)

অতুলচন্দ্রর 'ছত্রপতি শিবাজী'র ওপব 'চন্দ্রগুপ্ত'র ভাব ও ভাষার প্রভাব উল্লেখ্য।

চাণক্য—চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত—গুরুদেব।

চাণক্য—উর্দ্ধে চাও দেখি। —কি দেখছো?

চন্দ্রগুপ্ত—আকাশ।

চাণক্য—কি বর্ণ?

চন্দ্রগুপ্ত—পাংশু বর্ণ।

চাণক্য—কি বুঝছো?

চন্দ্রগুপ্ত—ঝড় উঠবে।

চাণক্য—ঠিক! ঝড় উঠবে। আর সম্মুখে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি। কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

চন্দগুপ্ত—না।

চানক্য—অন্ধ। সেখানেও একটা ঝড় উঠবে। ..... আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখছি জানো?

চন্দ্রগুপ্ত—কি গুরুদেব।

চাণক্য—জলধি হতে জলধি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য—সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য! (চন্দ্রগুপ্ত ৩/৪)

আবার

ঔরংজীব—দিলির খা!

দিলির—জঁহাপনা!

ঔরংজীব—খিরিকিরে চাই পাঠিয়াচোন। সৌরা দূরৈত কি দেখিছো?

খিজির—নীল আকাশ।

ঔরংজীব—আরু কি দেখিছো?

দিলির—একো দেখা নাই জঁহাপনা।

ঔবংজীব—ভালকৈ চোয়া দিলির।

দিলির—বান্দার দৃষ্টিশক্তি এতিয়াও সিমান দুর্বল হোয়া নাই জঁহাপনা।

ঔরংজীব—ওহো, বিশ্বাস নহয়।

দিলির—জঁহাপনা!

ঔরংজীব—মূর্খ, সৌ অস্তগামী সূর্যর ওচরত সেই চপবা কি?

দিলির—এ চপরা সরু ডাবর জঁহাপনা।

ঔরংজীব—মূর্খ, চক্ষু মেলি চোয়া। দেখিবা—সেই সরু ডাবর চপরাই লাহে লাহে কলা আরু কলা হৈ তোমার অস্তগামী রাঙলী সূর্যক গ্রাস করি পেলালে।

দিলির—জাঁহাপনা!

ঔরংজীব—তুমি কৈছা ধুমুহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মই দিল্লীর বাদশাহ ঔরংজীবে কও—ধুমুহা আহিব, জরুর আহিব। এনে এটা ধুমুহা আহিব ধরিছে দিলির, যি তোমাক-মোক-সকলোকে গিলি থব। (ছত্রপতি শিবাজী ৫/৩)

রমেশচন্দ্র দত্তর 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' উপন্যাসের ঘটনা ইত্যাদিও গৃহীত হয়েছে "ছত্রপতি শিবাজী"তে।

যোরহাটের বিশিষ্ট নাট্যকার জনার্দন ঠাকুরের 'চাণক্য' নাটকটি ১৯৫৩ তে প্রকাশিত হয়। নাটকের কথাবস্তুর পরিকল্পনাতে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রভাব আছে। "রায়ে বর্ণভেদকে নাটকের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করি চাণক্যক বর্ণধর্মর সংরক্ষকরূপে থিয় করাইছে। অসমীয়া নাট্যকারে এই নাটকীয় উদ্দেশ্যটো বর্জন করিব পরা নাই। গ্রীক সৈন্যধ্যক্ষ এন্টিগোনাচর চেলিউকচ কন্যা হেলেনের প্রতি অনুরাগ ঐতিহাসিক সম্মত কথা

না হয়, বঙালী নাট্যকারর স্বকপোলকল্পিত কথা। অসমীয়া নাট্যকারেও সেইটো আংশিকভাবে গ্রহণ করিছে।"[২২]

দ্বিজেন্দ্রলালেব নাটকের ঐশ্বর্যময় ও নাট্যগুণ সমৃদ্ধ সংলাপ ও ভাষারীতি অসমীয়া নাটকে গৃহীত হয়েছে বহুল পরিমাণে।

দ্বিজেন্দ্রলাল কখনও উপমা বা ব্যতিরেক অলংকার ক্রমান্বয়ে ব্যবহাব করেছেন। যেমন—

ক) নিযতিব মত দুর্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুব। (চন্দ্রগুপ্ত ১/১)

খ) নির্মেঘ উষার চেয়ে নির্মল, বীণাব ঝঙ্কারেব চেযে সঙ্গীতময, ঈশ্বরের নামেব চেয়ে পবিত্র। (দুর্গাদাস ১/৬)

অসমীযা নাটকে পাই—

ক) হিমাদ্রীব হিমানী মালাব দবে শুভ্র, ভাগিবথীব বাবিধাবাব দবে স্বচ্ছ, অভ্রভেদী গগনের ধ্রুবতাবার দরে সত্য।

(কাশ্মীর কুমারী—গণেশচন্দ্র গগৈ ১/১)

খ) বজ্রর দবে অমোঘ শক্তিরে, দানবর দবে ভীষণ অত্যাচাবরে, মৃত্যুর দরে নির্মমতারে। (শেষ পতাকা—উমাকান্ত শর্মা ৫/৫)

দ্বিজেন্দ্রলাল তিনটি কাব্যিক বাক্যাংশকে পবপর সাজিয়ে তাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে গেছেন—

'যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য।

(সাজাহান ৩/৪)

অসমীয়া নাটকে পাই—

'এটা হিয়াভরা হুমুনীয়া, এটোপ তপত চকুলো, এটা করুণ বিনানি'।

(শেষ পতাকা ২/১)

অনুপ্রাসযুক্ত চারটি সমধর্মী বাক্যাংশ প্রয়োগ কবেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল—'আমি জানি-তরবারির ঝনৎকার, ভেরীর ভৈরব নিনাদ, অশ্বেব হ্রেষা, মৃত্যুর আর্তধ্বনি'। (মেবার পতন ১/১)

অসমীয়ায় দেখি—

'এখনি ফুটি ওঠা কবিতার ছন্দ, মৃদঙ্গর ধ্বনি, আনন্দর কল্লোল, সমুদ্রর হিল্লোল।' (ভাস্কর বর্মা ৩/৫)

বিস্ময় বা জিজ্ঞাসায় নাটকীয়তা এনেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল—

'চন্দ্রগুপ্ত? তুমি জীবিত না মৃত?' (চন্দ্রগুপ্ত ৪/৫)

'একি! আমি স্বর্গে না মর্ত্যে।' (চন্দ্রগুপ্ত ৪/৬)

অসমীয়া নাটকে পাই—

'কত মই? স্বর্গত নে মানবদেহত?' (বামুনী কোঁওর ৩/৪)

দ্বিজেন্দ্রলালে—

'একি আনন্দ। একি উৎসাহ। (মেবার পতন ১/৩)

অসমীয়ায়—

'ইকি উন্মাদনা জননী, ইকি আকর্ষণ'! (শেষ পতাকা ১/৩)

দ্বিজেন্দ্রলাল 'একটা' শব্দ ব্যবহার করে নাটকীয়তা আনতে চেয়েছেন—

'একটা দৈবশক্তির মত, একটা আকাশের বজ্র সম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। (মেবার পতন ১/৩)

অসমীয়া নাটকে—

'এটা মধুর সপোন দেখিছেলোঁ ..... কি থাকিল? এটা হিয়াভরা হুমুনীয়া, এটোপ তপত চকুলো, এটা করুণ বিননি।' (শেষ পতাকা ২/১)[২৩]

(৪) রবীন্দ্রনাথ ও অসমীয়া নাটক

অ. ভূমিকা

অসমীয়া নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় ও নিকট সংযোগ আছে। অসমীয়া শিল্পী ও স্রষ্টাদের সূক্ষ্ম সুকুমার সৌন্দর্যবোধ ও হৃদয়বৃত্তি রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে সমমর্মিতা অনুভব করেছিল। কবিরা তো বটেনই, অসমীয়া নাট্যকাররাও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন রবীন্দ্র নাটকের দ্বারা, রবীন্দ্রনাথের নাটক অসমীয়ায় অনূদিত হয়েছে এবং সেগুলি অভিনীতও হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে বাংলা ও অসমীয়া নাট্য সংস্কৃতির মধ্যে এক গভীর সংযোগ সাধিত হয়েছে।

আ. রবীন্দ্র নাটকের অসমীয়া অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটক অনূদিত হয়েছে অসমীয়ায় এবং কিছু অভিনয়ও হয়েছে। তবে তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। কারণ শিক্ষিত অসমীয়া মাত্রই বাংলায় রবীন্দ্রনাথ পড়তে পারেন ও বুঝতে পারেন সম্পূর্ণ ভাবে। কাজেই অনুবাদ ও অনুবাদের অভিনয়ের খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। অসমীয়ায় রবীন্দ্র অনূদিত নাটকগুলির বর্ণনাক্রমিক তালিকা দেওয়া হল—

বিদায় অভিশাপ	রত্নকান্ত বরকাকতী	১৯৬৪
বিসর্জন	অতুলচন্দ্র হাজরিকা	১৯৬৫
চিরকুমার সভা	সৈয়দ আবদুল মালিক	১৯৬৫
ডাকঘর	নির্মল প্রভা বরদলৈ	১৯৬৫
গান্ধারীর আবেদন	রত্নকান্ত বরকাকতী	১৯৬৪
কর্ণকুন্তী সংবাদ	রত্নকান্ত বরকাকতী	১৯৬৪
মুক্তধারা	নবকান্ত বরুয়া	১৯৬৩
নটীর পূজা	রাম গোস্বামী	১৯৬১
রাজা	মহেন্দ্র বরা	১৯৬৩
রক্তকরবী	কেশব মহন্ত	১৯৬৩
তপতী	অতুলচন্দ্র হাজরিকা	১৯৬১

অনুবাদের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে। 'তপতী'র ভূমিকায় অতুলচন্দ্র হাজরিকা লিখেছেন, "এই বছরটো (১৯৬১) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথর শতবার্ষিকীর বছর হিচাপে স্মরণীয়। এই বারর পঁচিছ বহাগ আছিল ভারতর কলা সাহিত্যর বুরঞ্জীত এটি বিশেষ পুণ্য দিন। সেই দিনত ভারতজুরি যি পবিত্র উছব আরম্ভ হৈছে আরু তাত নানা জনে আরু নানা অনুষ্ঠানে নানা বিধর বরঙনি আগবঢ়াইছে। কবিগুরুর রচনার আশিষ-নির্মালী লৈ প্রতিটো ভারতীয় ভাষাই নিজক সমৃদ্ধ করিবলৈ প্রয়াস করিছে। গুরুদেবর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি এই সুগন্ধি ফুলপাহ আমার মরমর ভাষা-জননীর বেদীত অর্পণ করা হল।"

'নটীর পূজা'র অনুবাদক রাম গোস্বামী 'লেখকর কবলগীয়া'য় বলেছেন—"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরর নটীর পূজা অসমীয়ালৈ অনুবাদ করার হেঁপাহ মোর বহুত দিনর। ছাত্র

অবস্থাত কলিকতাত থকা সময়ত বন্ধু নবকান্ত বরুয়ার যোগেদি শান্তিনিকেতনর লগত মোর এক মধুর সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছিল। কবিগুরুর নৃত্যনাট্যই মোক অভিভূত করিছিল। বন্ধুসকলর উদগণি পাই রাইজর আগত নটীর পূজার অসমীয়া ভাঙনী ডাঙি ধরিলো। কবিগুরুর নটীর পূজার ভিতরেদি যে শিল্পী-সুলভ দক্ষতা ফুটি ওলাইছিল, সেই দক্ষতাব প্রতিভা অসমীয়া ভাঙনির মাজেদি প্রকাশ পালে যে নাই করে নোয়ারিলো।"

ই. অসমীয়া নাটকে রবীন্দ্রপ্রভাব

অসমীয়া নাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও প্রেরণা বিশেষভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশিষ্ট অসমীয়া কবি ও রবীন্দ্র অনুবাদক রত্নকান্ত বরকাকতী অসমীয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে মহান স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ খুব স্বাভাবিকভাবেই অসমীযা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সূর্যেব মত কিরণ বিকিরণ করেছেন। তাতে আলোকিত হয়েছে উদ্ভাসিত হয়েছে সাহিত্য সংস্কৃতি। শ্রীবরকাকতীর মতে 'রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলার নন তিনি ভারতবর্ষের, না, তিনি সমগ্র পৃথিবীব' (Rabindranath is not of Bengal alone, he is of India, nay of the world).[২৪] রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনা, অধ্যাত্মবোধ, মানবিকতা, অনুপম প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি অসমীয়া নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছে এবং অসমীয়া নাট্য সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখা গেছে।

লক্ষীনাথ বেজবরুয়ার একমাত্র পৌরাণিক ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটক 'কচ আরু দেবযানী'র (১৯১১) ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে ভালমতই। কাহিনী ও তার বিন্যাস দুক্ষেত্রে এক। তবে "রবি ঠাকুরের কচে দেবযানীর অভিশাপ শুনি দেবযানীক আশীর্বাদ করি তেওঁর মনর উদারতা আরু মহনুভবতার পরিচয় দিলে। কিন্তু বেজবরুয়ার কচ প্রতিশোধ পরায়ণ, দেবযানীর অভিশাপর উত্তরত তেওঁ অভিশাপে বেহে দিলে।"[২৫] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখার মত বেজবরুয়ার লেখা রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। "রবি ঠাকুরর কাব্যত ভাষা-সাহিত্যর যি মধুমিলন, বেজবরুযার সাহিত্যত তার অভাব।"[২৬]

জ্যোতিপ্রসাদের 'শোণিত কুঁয়রী'-তে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পাওয়া যায় বক্তব্যেব ভাবে ও বিশেষত গীতিধর্মী প্রকাশে।[২৭]

রত্নকান্ত বরকাকতী কবি এবং তাঁর কবিতার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গভীর ও আন্তরিক। তাঁর 'আলাপ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'র প্রভাব আছে। 'আলাপ'-এর কবি বৈরাগী-র চরিত্র ফাল্গুনীর কবিশেখরের মত। 'আলাপ'-এর কথোপকথন ফাল্গুনীকে স্মরণ করায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের একটা বিশেষ অংশ অসমীয়া নাটকে রূপ পেয়েছে—

কাব্যস্বাদী ঃ ভাই তোমার কথা বিলাক মই নু বুজিলেও বাজি গৈছে হে।

কবি বৈরাগী ঃ গৈছেনে বাজি? কেনি?.....

কাব্যস্বাদী ঃ (কান লৈ দেখুয়াই) কানর ভিতরে দি সোমাই (বুক লৈ দেখুয়াই) ইয়াত বাজিছে হি।"

রবীন্দ্রনাথের 'বোঝবার নয় বাজবার' তত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণব কবির 'কালের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'র কথাও এখানে ব্যক্ত।

পাবর্তীপ্রসাদ বরুয়া ছেলেবেলা থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চা করতেন। কলকাতায় কলেজে পড়বার সময় জোড়াসাঁকোয় অনুষ্ঠান দেখতে যেতেন অতি আগ্রহে। "রবীন্দ্রনাথর নৃত্যগীত চাই আরু বিশেষকৈ তেওঁর নটরাজর নৃত্য দেখি বর মুগ্ধ হৈছিল।

এই ছোৱা সময়ত গীত লেখিছিল। রবীন্দ্র সংগীতর সুর-চানেকিরে তেওঁ দু হাজাব মান গীত গাব পরা হৈছিলগৈ।"[২৮]

পার্বতিপ্রসাদ বরুয়া-র লখিমী' (গীতিনাট) রবীন্দ্রনাথের ঋতু নাটকের ঢঙে লেখা। শরতের স্থিতি, প্রকৃতির আনন্দ, তার চলে যাওয়া, হেমন্ত লক্ষ্মীর আগমন---নাচে গানে ব্যক্ত। এর গানগুলো অনেকাংশেই রাবীন্দ্রিক। পার্বতিপ্রসাদের 'সোণর সোলেঙ' নাটকের বক্তব্যে ও গানে রবীন্দ্রপ্রভাব আছে। "কিন্তু রবীন্দ্রনাথর 'শাবদোৎসব'র দবে এই নাটর কোনো গভীর তত্ত্ব নিহিত নাই। শরতর বিদায়, হেমন্তর আগমন আরু পথারর সোনালী লখিমীর আবির্ভাবেই নাটকখন ব বিষয়বস্তু। তেওঁর 'সোণর সোলেঙ' (রচনা চতুর্থ দশকত, প্রকাশ ১৯৫৬) নাটত মানবর সুখ আরু আনন্দর অন্বেষণক রূপকর সহায়ত ব্যক্ত করিছে। সুখ অন্তরর বস্তু। বাহিরত বিচাবিলে তাক পোয়া না যায়। মরিস মেটারলিঙ্কের 'ব্লু-বার্ড'র দরে অথবা রবীন্দ্রনাথর ক্ষেপাই পরশ পাথব বিচরার দরে 'সেনর সোলেঙ' (সুখর প্রতীক) বিচরা বরাগীয়ে আন্তরেতে সোণর সোলেঙের উপস্থিতি উপলব্ধি করিছে।"[২৯]

প্রসন্নলাল চৌধুরীর নাটকে গানের সুন্দর প্রয়োগ আছে এবং সেই গানগুলি অনেক সময়ই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করায়। যেমন 'নীলাম্বর' নাটকের গান--

"এই সুন্দর এই মনোহর
এই উজ্জ্বল ধরণী
নব পরিমল, শত শত দল
গন্ধ বিধুর ধরণী" (১ অঙ্ক ১ম দৃশ্য)
বা
"ঘনে ঘনে কাঁপে হিয়ার তন্ত্রী
আহিছে মিলন দিন
আকুল চিত্ত করিছে নৃত্য
বাজে কি নবীন বীণ"। (১/১)

কিংবা 'অপেশ্বরী' নাটকের গান---

"উৎসব মুখরিত নন্দন সন্ধ্যা
আহাঁ ফুলি যৌবন-রজনীগন্ধা

আহাঁ শারদ সুধাকর কিরণে
আহাঁ গভীর নীলিম নীল বরণে
আহাঁ নবীন ফাগুণ মধু মন্দির অনিলে" (১/১)
বা
"তরুণ বীণার করুণ গীতি
অশ্রু নদীর সুরত উটি
দূর গগণর পারত বিনায়
ইকি বিদায় সুর।"

এই গানগুলির ভাব রীতি এবং অনেক ক্ষেত্রে শব্দ বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ। কীর্তিনাথ বরদলৈ ও মুক্তিনাথ বরদলৈ পিতাপুত্রর রচনা 'বাসন্তীর অভিষেক' 'লুইত

কোয়র' 'সুর বিজয়' 'মেঘাবলী' অসমীয়া নাট্য সাহিত্যে নতুন ধরনের রচনা। "অসমের সুর, তাল, নৈ-পর্বত, আকাশ-বতাহ আরু মাহ-ঋতু সকলোকে দেব-দেবী নাইবা মানব-মানবীর সাজ পিন্ধাই তেওঁলোকক একেটি স্ব-কল্পিত কাহিনীর নায়ক-নায়িকারূপে চিত্রিত করিছে। 'দেশের মাটি, দেশের জল... ধন্য হউক, ধন্য হউক'—এয়ে নাট্যকার দুজনর উদ্দেশ্য।"[৩০] বরদলৈ পিতাপুত্রর প্রথম রচনা 'বাসন্তীর অভিষেক'-এ ঋতুর ভিতরে শ্রেষ্ঠতম মধুরতম বসন্তকে কল্পনা করা হয়েছে ও তাকে সকল ঋতুর মধ্যে রানী রূপে অভিষিক্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঋতু নাটকের আদর্শে গড়ে উঠেছে এই নাটক।

নাটকে প্রভাবিত হওয়া ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্নভাবে স্মরণ করেছেন অসমীয়া নাট্যকাররা। যেমন বসন্ত শইকীয়া রচিত 'মৃগতৃষ্ণা' নাটকে দিগন্ত উর্মিলাকে বলছে— "তোমাক কন্যার সাজেরে অপরূপা দেখাইছে উর্মি, রবীঠাকুরর ভাষারে কবর মন গৈছে-- হে মোর বন্যা তুমি অনন্যা আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা"।

জ্যোতিপ্রসাদ শইকীয়ার অনাতার বা বেতার নাটক 'বশিষ্ঠাশ্রম'-এ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। 'সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনগুখানি', 'সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ' ইত্যাদি পংক্তি যথাযথ উদ্ধৃত হয়েছে নাটকের অন্যতম চরিত্র আলোকের মুখে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এবং তাঁর নাটক নিয়ে অনেক গ্রন্থ প্রবন্ধাদি অসমীয়া ভাষায় রচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য খ্যাতিমান নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা সত্যপ্রসাদ বরুয়া রচিত 'নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৫)। এতে রবীন্দ্রনাটকের সুন্দর আলোচনা আছে। বইটি সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ্য এই যে আলোচনার আগেই দু তিনটি শব্দে লেখক প্রতিটি নাটকের মর্মবস্তুকে অসাধারণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন—সীমা অসীমর দ্বন্দ্ব ঃ নলিনী, জননী অমৃতময়ী ঃ বিসর্জন, নতুন নারীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঃ চিত্রাঙ্গদা, ধর্ম ন হয় তত্ত্ব মাথোন ঃ মালিনী, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নাট্যরূপ ঃ রাজা, যন্ত্রর উর্ধ্বত প্রাণর উল্লাস ঃ মুক্তধারা, মায়া আবরণ খহি পরিল ঃ চণ্ডালিকা, প্রাণ চাঞ্চল্যর সন্ধান ঃ তাসের দেশ, পাপ আরু প্রেম ঃ শ্যামা ইত্যাদি।

ঈ. অসমীয়ায় রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়

অসমীয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটক অভিনীত হয়েছে এবং শিল্পবিচারে সেগুলি বেশ উচ্চমানের। রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যেই মূলত রবীন্দ্রনাথের নাটক অসমীয়ায় অভিনীত হয়। সে অভিনয়ের ধারা আজও বহমান।

রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষে আকাশবাণী গুয়াহাটি কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয় রবীন্দ্রনাটক। ১৯৬১-র ৭ মে প্রচারিত হয় 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', ৯ মে সম্প্রচারিত 'শেষের কবিতা'। ন্যাশনাল প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসাবে অভিনীত হয় 'ডাকঘর' ১১ মে ১৯৬১, এটি প্রযোজনা করেন নারায়ণ বেজবরুয়া।

মঞ্চ নাটকও বেশ কটি অভিনীত হয়। ধিঙ সাহিত্য সভার উদ্যোগে রবীন্দ্রশতবর্ষে উপলক্ষ্যে হয় 'ডাকঘর' ৮ মে ১৯৬১। তিনসুকিয়ায় হয় 'মুক্তধারা'। নিউ আর্ট প্লেয়ার্স সোসাইটির প্রযোজনায় অল্পবয়সী ছেলেরা করে 'ডাকঘর' রিজার্ভ পুলিশ কমপাউন্ডে ৯মে। মিলন নাথ, দুর্লভ গগৈ, গোপাল বসুমাতরি প্রমুখ ভাল অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত হন। নিউ আর্ট প্লেয়ার্সের শিল্পীদের 'চণ্ডালিকা-ও বিশেষ খ্যাতি পায়। 'ডাকঘর' দক্ষিণ শালমারাতে হয় হাই স্কুল হলে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। 'মুকুট' নাটকেরও একাধিক অভিনয় হয়। তিনসুকিয়ায় তিনদিন ধরে যে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয় সেখানে ১০.৫.৬১-তে হয় 'মুকুট'। নাটকটি অনুবাদ করেন সমরেন শইকিয়া। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে সম্মানিত হন

শশী হাজারিকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে অসম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হোলিরাম ডেকা। 'মুকুট' নাটকের আর একটি সুন্দর অভিনয় করে ডিগবয়তে ডিগবয় বয়েজ হাইস্কুলের ছেলেরা।

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে রবীন্দ্র নাটকের বিশেষ উল্লেখ্য অভিনয় হল—'রক্তকরবী'। গুয়াহাটি গণনাট্য শাখা রক্তকরবীর অভিনয় করে ১৯৬১-র জুন মাসে। পরবর্তীকালে রক্তকরবীর আরো অভিনয় হয়।

পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় হয় বেশ কিছু। রবীন্দ্রনাথের ১২৫ জন্মবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাটক অভিনীত হয়। গুয়াহাটি দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয় 'সূক্ষবিচার'।

১৯৮৫-র ৮-মে ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার নাট্য সমাবেশে কলকাতায় রবীন্দ্র নাটকের যে অনুষ্ঠান হয় তাতে 'চিত্রাঙ্গদা'র অংশ বিশেষ পরিবেশিত হয় অসমীয়ায়। চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে ছিলেন লক্ষ্মী মুখার্জী। "অসমীয়ায় লক্ষ্মী মুখার্জীর চিত্রাঙ্গদা আন্তরিক।"[৩১] ১৯৮৬ জানুয়ারিতে সঙ্গীত কলা মন্দির রবীন্দ্রনাথের ১২৫ জন্মবর্ষ উপলক্ষে 'জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক নাটক' নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করে যেখানে অসমীয়ায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' উপস্থাপিত হয়। সঞ্জয় চাকমা প্রমুখ অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখান।

মহাবোধি সোসাইটি হলে আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মদিনে অভিনীত হয় 'স্ত্রীর পত্র'। রবীন্দ্রনাথের ঐ নামের ছোটগল্পকে এক সংলাপী নাটিকায় রূপান্তরিত করা হয় ও তা মঞ্চস্থ হয়।

অসমীয়ায় রূপান্তরিত গীত নৃত্যাদিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। উদীচীতে ১৯৮৫-র ৮-মে অনুষ্ঠিত নাট্য সমাবেশে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত ঋতুনৃত্যনাট্যে অসমীয়ায় পরিবেশিত সঙ্গীত ও নৃত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একই ধরনের গীতিনাট্য পরিবেশিত হয় কলকাতা ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনে ২২ জুলাই ১৯৮৬। লক্ষীনাথ বেজবরুয়ার পঞ্চাশৎ প্রয়াণ বর্ষ উপলক্ষে কলকাতায় যে নাট্যসভা হয় তাতে অসমীয়ায় অনুবাদিত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিতা সহযোগে গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হল—'কেশব মহন্ত, মহেন্দ্র বরা অনূদিত অসমীয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা অবলম্বনে গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন উর্মি মিত্র ও রুমনি মিত্র।[৩২] যুগান্তর পত্রিকার মতে 'অসমীয়ায় রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা নিয়ে ঋতুগীতিনাট্য উপভোগ্য হয়।"[৩৩] নন্দিতা ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের "সুয়োরানীর সাধ' একক নাটকরূপে পরিবেশন করেন অসমীয়ায় যা বিশেষ প্রশংসা পায়।

(৫) শরৎচন্দ্র ও অসমীয়া নাটক

শরৎচন্দ্রের অনেক নাটক গৃহীত হয়েছে অসমীয়ায়। শরৎচন্দ্রের সামাজিক ভাবনা ও বক্তব্য বিভিন্নভাবে অসমীয়া সিনেমা ও নাটককে অনুপ্রাণিত করেছে। লক্ষ্মীধর শর্মার বিভিন্ন নাটকে বিশেষত 'নির্মলা'য় যে বাল্য বিবাহ ও বালবিধবার সমস্যা, জাতিভেদ প্রথার প্রতিপত্তি, সমাজপতিদের ব্যভিচার, ব্রাহ্মণ বিধবার করুণ অবস্থা চিত্রিত হয়েছে তা শরৎচন্দ্রকে অনিবার্যভাবে মনে করায়।

লক্ষ্মীকান্ত দত্তর 'সংসার চিত্র' (১৯৩৬) নাটকে পারিবারিক জীবনের সংঘাত ও অশান্তির চিত্র আঁকা হয়েছে-এতে পিতার প্রথম পক্ষের সৎ চরিত্রবান পুত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের মদ্যপ পুত্রের দ্বন্দ্ব 'বৈকুণ্ঠের উইল'কে মনে করিয়ে দেয়।

কখনো কখনো বড মঞ্চও শবৎচন্দ্রেব কাহিনী-সম্পূর্ণ বক্তব্য নিয়েই নাটক করেছে। যেমন 'সরুবোযারি' (ছোট বৌ) প্রায 'বিন্দুব ছেলে' উপন্যাসের রূপান্তব। স্বামী উপন্যাস 'সৌদামিনী' রূপে অভিনীত হয কলকাতায় ২২ অক্টোবর ১৯৮৬ সালে।

৬. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও অসমীয়া নাটক

ক. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক অসমীয়ায়

কলকাতাব নাটকের ভাব-ভাবনা অসমীয়া নাটককে প্রথমাবধিই প্রভাবিত করে আসছে - নাটক প্রযোজনা, অভিনযরীতি, মঞ্চস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে। ১৯৫৫ সালে কলকাতায 'শ্যামলী' অভিনয হচ্ছিল মহাসমাবোহে। রংপুর জ্যোতিসঙ্ঘ সেই নাটক তাব পবই অসমীযায অভিনয় করে। 'এই বছরর (১৯৬৬) ছেপ্টেম্বর মাহত যিদিনা মাথোন যোবহাটেব জিলা পুঁথি ভরালত অসমর প্রথম থিয়েটারস্কোপ 'চোর' নামক নাট অভিনয নিবেদন করিছিল মিলিত শিল্পী সমাজে। নাটকতকৈ আকর্ষণীয় আছিল প্রযোগ শৈলী। বঙ্গদেশত শ্রী রাসবিহারী ছবকারে মাত্র দু বছর আগতে প্রবর্তন করা থিয়েটাবস্কোপ পদ্ধতির আৰ্হিরে মিলিত শিল্পীসমাজে অসমত প্রথমাবলৈ এই নাটখন নিবেদন করিবলৈ সাহসেবে আগবাঢ়ি আহিছিল''।[৩৪]

অসম নটসূর্য ফণী শর্মা বাংলার নাটক ও চিত্র, শিল্পী ও স্রষ্টাদের সঙ্গে গভীর পরিচিত ছিলেন। তিনি কলকাতায় এসে শিশির ভাদুড়ী অহীন্দ্র চৌধুরী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের অভিনয় দিনের পর দিন দেখেছেন ও তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। যদিও তাঁর অভিনয়বীতিতে এব অনুকরণ ছিল না। তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সেখানে ফুটে উঠত। তাঁব স্মৃতিমূলক রচনা 'রং-বিরং'-এ বাংলা নাট্যলোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগের পবিচয পাওয়া যায়। ফণী শর্মার বিভিন্ন নাটকে বাংলার উল্লেখ ও প্রভাব পাওয়া যায়। যেমন তাঁর 'চিরাজ' নাটকে কৌতুকের ঢঙে বাংলা গানেব প্রযোগ আছে। তাঁর 'এন ইনসপেক্টর কলছ' বিদেশী অনুবাদ হলেও অজিত গঙ্গোপাধ্যাযের বাংলায় 'থানা থেকে আসছি'র অনুরূপ। এব চরিত্ররাও যেন বাঙালী, নামগুলোও বাংলা নাটকের—চন্দ্রমাধব, শীলা, অমিয়, রমা ইত্যাদি। বাংলা 'আজকাল' নাটক তিনি অসমীয়ায় রূপান্তর করেন। ''বাংলা গণনাট্যের 'আজকাল' নাটকেব তিনি নিজে যে অসমীয়া অ্যাডপটেশন করেন 'এ মুঠি চাউল' নাম দিয়ে তাতে তিনি এক নতুন প্রাণাবেগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। সেখানে প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছিলাম। দেখেছিলাম কি সার্থকভাবে তিনি এই ভূয়া স্বাধীনতার আমলে আর্থিক সংকটের ছবি তুলে ধরেছিলেন।''[৩৫]

তাঁর অন্তিম শয্যায় শায়িত হয়ে নটসূর্য উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কথা বলে চলেছেন। এলোমেলো কথা, বিশৃঙ্খল কথা! প্রলাপ বাক্য! না। নাট্যপ্রাণ মহাশিল্পী জীবন-মরণের সীমানায় দাঁড়িয়ে ভোলেন নি নাটককে, তাঁর প্রাণের সম্পদকে। তাই প্রলাপবাক্য পরিণত হয় নাট্য সংলাপে। কখনো তিনি বলতেন তাঁর 'কিয়?' নাটকের প্রদীপেব সেই আশ্চর্য সংলাপ— ''কিন্তু কিয় এনে হয়?'' একো একোবার তেওঁ 'চাজাহান' (সাজাহান) নাটকর সংলাপ আবৃত্তি করিবলৈ ধরে, ''মোক এবার দুর্গর বহিরলৈ লৈ যাব নোয়াবনে জাহানারা?— মাত্র এবার, এই রুগীয়া জীর্ণ দেহারে, শুভ্র কেশেরে যদি মোর প্রজাবৃন্দর সমুখত এবার থিয় দিব পারোঁ, সিহঁতর মিলিত জয়ধ্বনিত শত ঔরংজেবর শির মাটির ধূলিত মিহলি হৈ যাব''।[৩৬]

অতি আধুনিক অসমীয়া নাট্যকাররা বাংলা নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন প্রবলভাবে। প্রখ্যাত নাট্যকার অরুণ শর্মার নাটকের ওপর বাংলার প্রভাব আছে। তাঁর

'আহার' বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' নাটক অবলম্বনেই রচিত। শ্মশানের পটভূমিকায় কটি পুরুষ ও একটি মৃত নারীকে নিয়ে নাটক গড়ে উঠেছে। তবে বাদল সরকারের কাহিনীকে প্রায় গ্রহণ করলেও 'আহার'-এর গাঁথুনিতে আরো দৃঢ়তা আর জোর আছে। বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' ছাড়া 'আহার'-এর একটি চরিত্রের মুখে একটি সুন্দর কবিতা দেওয়া হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব বসুর একটা কবিতার অনুবাদ।

'আহার'-এর অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র কমল বলছে--

"রাত্রি প্রেয়সী মোর, প্রসন্ন হোবা, নিদ্রা নিদিবা; তোমার মনত আছে রাত্রি, আমার মিলনর অনুষ্ঠান? সেই নগ্নতাব শপথ, যৌতুকর বিনিময়? তুমি মোক দিছিলা তোমার জোন, অনেক জোন, আরু অনেক তরা, তরা ভরা আকাশ, অনন্ত জুইর নিঃশ্বাস পরা অন্ধকার। আরু বিশাল দেশ মহাদেশ জনতাময নির্জনতা আরু অনিদ্রার তীব্র মধুর উন্মাদনা, আরু মই তোমাক দিছিলোঁ মোর প্রেম আরু প্রাণ, মোর আত্মার নির্যাস, সত্তার সৌরভ"।

বুদ্ধদেব বসুর 'রাত্রি'—

"রাত্রি, প্রেয়সী আমার, প্রসন্ন হও, নিদ্রা দিয়ো না।

তোমার মনে আছে রাত্রি, আমাদের মিলনের অনুষ্ঠান?

সেই নগ্নতার শপথ, স্তব্ধতার শপথ, যৌতুকের বিনিময়?

তুমি আমাকে দিয়েছিলে তোমার চাঁদ, অনেক চাঁদ। আরো অনেক তারা, তারা-ভরা আকাশ, জ্বলন্ত আগুনের নিঃশ্বাস-ফেলা অন্ধকার। আর বিশাল দেশ, মহাদেশ, জনতাময় নির্জনতা, আর অনিদ্রার তীব্র মধুর উন্মাদনা।

আর আমি তোমাকে দিয়েছিলাম আমার প্রেম, আমার প্রাণ আমার আত্মার নির্যাস, সত্তার সৌরভ।"

বাংলা নাটক অসমীয়ায় অনুবাদ হয়ে চলেছে সম্প্রতিকালেও। বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' নাটক অনুবাদ করেছেন অরুণ শর্মা ১৯৭৫ সালে।

বাদল সরকারের বিভিন্ন নাটক অসমীয়ায় অনূদিত অভিনীত হয়ে চলেছে। "এলি আহমেদর উদ্যোগত গঢ় লোবা স্থানীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠান রংচরাই যোয়া ২৬ আরু ২৭ নভেম্বর (১৯৭৫) তারিখে রবীন্দ্রভবনত প্রযোজনা করিলে গোলাঘাটর গীতবিতান নাট্যগোষ্ঠীয়ে পরিবেশন করা বীরেন শর্মা অনূদিত বাদল সরকার রচিত নাট 'বাকী ইতিহাস'। নাটখানি পরিচালনা করিছিল শিবপ্রসাদ ঠাকুরে।"[৩৭]

বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোঁরা' (অনুবাদ-দ্বিজেন্দ্র নাথ শর্মা) তেজপুরের নবগঠিত সম্রাট নাট্যশালা অভিনয় করে ১৯৮৫-র এপ্রিলে। বাদল সরকারের আরো নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।

উৎপল দত্তর বিভিন্ন নাটক অসমীয়ায় অনূদিত হয়েছে, অভিনীত হয়েছে। উৎপল দত্তর 'রাতের অতিথি'র অসমীয়া রূপান্তর 'নিশার অতিথি' জনপ্রিয় হয়। এই নাটকের একটি অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নটসূর্য ফণী শর্মার ষোড়শ স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাণ থিয়েটারের উদ্যোগে এই নাটকের অভিনয় হয় তেজপুরে জেলা পুথিভরাল প্রেক্ষাগৃহে ৩১ জুলাই ১৯৮৬। নাটকটি অনুবাদ করেন প্রণব বড়া যিনি নাটকটি পরিচালনাও করেন। উৎপল দত্ত ছিলেন ফণী শর্মার নিকটজন। 'মণিরাম দেওয়ান' নাটকের চিত্ররূপে তিনি হলর ইদ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন, নামভূমিকায় নটসূর্য ফণি শর্মা। উৎপল দত্তর সঙ্গে একটা সুন্দর সাক্ষাৎকার বোরোয় অসমীয়ায় 'প্রকাশ' পত্রিকায় (অক্টোবর ১৯৮১) এই সাক্ষাৎকারে নাটক সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা আছে।

মনোজ মিত্রর 'বাঞ্ছারামের বাগান' অসমীয়ায় অনূদিত হয়েছে ও অভিনীত হয়েছে অনেকবার। অনুবাদ করেছেন ধ্রুবজিৎ কিশোর চৌধুরী। 'রূপকার' পত্রিকায় লেখা হয়েছে সুন্দর বিবরণ—

"যোয়া ৭ আরু ৮ জুলাই তারিখে গোয়ালপাড়া সংগম নাট্যগোষ্ঠীর সৌজন্যত গোয়ালপারা চহরব অন্যতম প্রাচীন নাট্যগৃহ 'অসম' ক্লাব'র মঞ্চত পরিবেশন করা হয় এখনি ব্যংগ নাটিকা 'বাঞ্ছারামর বাগান'। মনোজ মিত্রর 'সাজানো বাগান' নামব আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটখানির অসমীয়া অভিযোজনা 'বাঞ্ছারামর বাগান'। নাটখানির অসমীয়া রূপান্তর আরু পরিচালনা আছিল ধ্রুবজিৎ কিশোর চৌধুরীর। চরিত্রায়ণ সংলাপর বাচনিত পরিচালক উত্তীর্ণ হৈছে বুলিব পারি। পোহর, শব্দ, সঙ্গীত, আরু চরিত্রসমূহর ভারসাম্য রক্ষা করাত পরিচালক কৃতকার্য হৈছে।"[৩৮]

এই নাটক ২০.১০.৮০ তারিখে 'সমঙ্গল' নাট্যগোষ্ঠী তেজপুর জেলা পুথিভরাল প্রেক্ষাগৃহে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন দিলীপ শর্মা 'গিনিপিগ' নামে ও 'ভাবীকাল' তা রূপায়িত করে ১৯৮১ সেপ্টেম্বরে। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'মারীচ সংবাদ' ভাবীকাল কর্তৃক পথনাটিকা রূপে অভিনীত হয়।

বাংলা উপন্যাস অসমীয়াতে নাট্যরূপ পেয়েছে। অন্য ভাষা থেকে অনূদিত বাংলা নাটকও অসমীয়ায় গৃহীত হয়েছে। জরাসন্ধর 'লৌহকপাট' উপন্যাসের অন্তর্গত মল্লিকার কাহিনী অবলম্বনে নাটক লেখা হয়। অসমীয়ায় নাট্যরূপ দিয়েছেন রজনীকান্ত শর্মা 'মল্লিকা' (১৯৯৬ শক) নাম দিয়ে। নাটকের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন "বিখ্যাত বাঙলা কথা সাহিত্যিক জরাসন্ধর 'লৌহকপাট'ত সন্নিবিষ্ট 'মল্লিকা' কাহিনীটো পঢ়ি অভিভূত হৈ পরিছিলো। এই কাহিনীরেই নাট্যরূপ কলিকতা মহানগরীর স্থায়ী মঞ্চত ছশ নিশাতকৈও অধিক কাল হল চলি আছে। মল্লিকা কাহিনীর মর্মস্পর্শী আবেদনেই পাঠকর মনত আন্দোলিত করে। যেয়ে মূল কাহিনীর সামগ্রিক আবেদন অটুট রাখি অসমর পটভূমিত ইয়াক সজাই উলিয়াবলৈ যথাসাধ্য চেষ্টা করা হৈছে।"

'ফিঙ্গার প্রিন্ট' নাটকটি অনুবাদ করেন তচ্চদ্দুক ইউচুফ। অসমর বিভিন্ন স্থানে এটি অভিনীত হয়। মূল ভূমিকায় অংশ নেন ও পরিচালনা করেন অনুবাদক। তিনি 'নাট্যকারর সন্ধানত দুটি চরিত্র' অসমীয়ায় অনুবাদ করেন। ডঃ ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া বাংলা 'থানা থেকে আসছি' অনুবাদ করেন 'থানার পরা আহিছো', সব নাটকই অসমের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় হয় ও বিপুল জনসমাদর লাভ করে।

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত ব্যঙ্গরসাত্মক বাংলা নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গ' অসমীয়ায় রূপায়িত হয় ১৯৮৬-র আগস্টে মাধবচন্দ্র দাস প্রেক্ষাগৃহে। সমালোচক লিখছেন "পুরণি যদিও নাটকখনে আধুনিক আবেদন হেরুওবা নাই। কারণ ই হল সমসাময়িক যুগর নাট্যপ্রতিভা শম্ভু মিত্রর অর্থলিপ্সু নগরীয়া মধ্যবিত্তক গভীরভাবে লক্ষ্য করার ফলশ্রুতি! এতিয়াও সেই মধ্যবিত্তর প্রমূল্যর পরিবর্তন নাই হোয়া কারণে 'কাঞ্চনরঙ্গ' এইটো দশকতহে লিখা যেন লাগে। এইখিনিতেই মহান নাট্যকরের কৃতিত্ব।"[৩৯] নাটকে সুন্দর অভিনয় করেছেন টিলমিজুর রহমান (গৃহকর্তা), মধুমিতা তালুকদার (গৃহকর্ত্রী), ডঃ ইয়াকুব আলি (ভোলা), সুরভি বরা, ডঃ দীপেন দত্ত, ইভা শইকীয়া গোহাই, অনন্ত শইকীয়া, প্রদীপ নাথ প্রমুখ।

'মারীচ সংবাদ' অসমীয়াতে হয় দেরগাঁওর বাপুজী মন্দিরের নাট্যকর্মীদের উদ্যোগে আগস্ট ১৯৮৬-তে। "নাট্যাভিনয়ক বিনোদনর মাধ্যমমাত্র করি রখার সলনি সমাজ

পরিবর্তনর আহিলা স্বরূপে বঞ্চিত, শোষিত জনর কণ্ঠ মঞ্চত প্রতিধ্বনিত করার মানসেরে বাপুজী মন্দিরে 'মারীচ সংবাদ' মঞ্চস্থ করি বর প্রশংসনীয় কাম করিছে। ... সঙ্গীত এই নাটকর এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তপন ফুকন, প্রবীণ বরঠাকুর আদি শিল্পী সকলর গীত, নৃত্য আর পশ্চাৎ সঙ্গীত সেই নিশার (২৩.৮.৮৩) নাট্যাভিনয়র অন্যতম মুখ্য আকর্ষণ আছিল।"[৪০] অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান অকন গোস্বামী (রামায়ণের রাবণ), প্রতাপ কন্দলী (মহাজন), নিত্যেন ঠাকুর (বাল্মীকি), সপোন জ্যোতি ঠাকুর (ওস্তাদ), পুলিন বিহারী বরঠাকুর (কালনেমী)।

চিররঞ্জন্ দাস রচিত 'ভিয়েতনাম' অসমীয়া ভাষায় অভিনয় করে কালচারাল ফোরাম। এটা বিশেষ খ্যাতি পায়।

অসমীয়া ভাষার বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতায় বাংলা নাটক রূপান্তরিত করে অভিনীত হয়েছে। 'চন্দ্র সিং টেরন' একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রযোজনা ও পরিচালনায় পুরস্কার পায় রাধারমণ ঘোষের 'শতাব্দীর পদাবলী'। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় প্রবীর দত্তর 'স্ফিংক্স' শম্ভু গুপ্তর 'আসামী ঈশ্বর হাজির' রতন কুমার ঘোষের 'অমৃতস্য পুত্রা' 'সম্রাট' 'সিঁড়ি', 'শেষ বিচার' প্রভৃতি অনূদিত রূপে অভিনীত হয়েছে এবং সম্মান অর্জন করেছে।

১৯৮৬-র এপ্রিলে নামরূপ ফার্টিলাইজার ক্লাব পরিচালিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় কিংশুক ক্রীড়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, মরিয়নী, তাদের নাটক 'লাচ বিপনি'। পরিচালনায় ও অভিনয়ে পুরস্কার পায় ঐ দলেরই প্রদীপ কুমার বড়া ও তরুণ শইকীয়া।

অসমীয়া নাট্য প্রবন্ধর ক্ষেত্রেও বাংলাকে ভুলে থাকেন নি অসমীয়া শিল্পী লেখকরা। 'আহার' নাটকের ভূমিকায় উদ্ভট অথবা অস্বাভাবিক নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে অরুণ শর্মা লিখেছেন—"বেতার জগৎ আলোচনীত ডঃ অজিত কুমার ঘোষর এটি প্রবন্ধ বহুলভাবে, ভাষান্তর মাত্র করি, প্রায় হুবহু ইয়াত উত্থাপিত হৈছে।" সত্যপ্রসাদ বরুয়ার 'বারটোলট্ ব্রেখট' আলোচনা গ্রন্থটি কোনো কোনো জায়গায় বাংলা আলোচনাকে মনে করায় এবং গ্রন্থপঞ্জীতে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ব্রেখট ও তাঁর থিয়েটার' বইয়ের উল্লেখ আছে। 'রূপকার' পত্রিকায় ১৯৭৬-৭৭ এর কটি সংখ্যায় বেরোয় সঞ্জয় গুহঠাকুরতা রচিত 'মঞ্চ সজ্জার খুঁটিনাটি' যেটা তাঁর বাংলা রচনার রূপান্তর।

কলকাতার মঞ্চের সঙ্গে অসমীয়া নাট্যভাবনার যোগ নিবিড়। কলকাতার পেশাদার মঞ্চে যে সব নাটক হয় অসমীয়া মঞ্চে তার প্রতিফলন দেখা যায়। দু এক বছরের নাটক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলেই দেখা যাবে বাংলার সঙ্গে অসমীয়ার সম্পর্ক কত নিকট। ১৯৮৪-৮৫-র দিকে তাকানো যাক। কলকাতার পেশাদার নাটক 'নাগপাশ' অসমীয়ায় রূপান্তর করেছেন হেমন্ত দত্ত 'কলঙ্ক তিলক' নামে ও কহিনুর থিয়েটার তা অভিনয় করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজদ্রোহী' ঐ নামেই অনুবাদ করেছেন পবিত্র কুমার ডেকা ও রূপায়িত করেছেন কহিনূর থিয়েটার। 'বিলকিস বেগম' রূপায়িত করেছেন মহেন্দ্র বরঠাকুর ও মঞ্চস্থ করেছেন আবাহন থিয়েটার। 'অমর কন্টক' দুটি দল করেছেন। যার একটি নাম 'দেবী সন্ন্যাসিনী' করেছেন কহিনুর থিয়েটার। উৎপল দত্তর 'অজেয় ভিয়েতনাম' মঞ্চে এনেছেন নটরাজ থিয়েটার। মনোজ মিত্রর নাটকও নিয়মিত হচ্ছে। স্বপন দাসের বেশ কটি নাটক অসমীয়ায় অভিনীত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানব প্রত্যয়ের বাণী উচ্চারিত হয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর 'দুঃসময়' নাটকে। এটি অসমীয়ায় সগৌরবে অভিনীত হয়েছে। সমাহার নাট্যগোষ্ঠীর পূর্ব-

ভারত নাট সমারোহ উপলক্ষে 'দুঃসময়' মঞ্চস্থ হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১২-১০-৯৮ এ। অসমীয়া অভিযোজনা ও পবিচালনা ঃ শ্রীর্হরিপ্রসাদ বরুয়া, প্রযোজনা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ যোরহাট শাখা।

খ. সাম্প্রতিক অসমীয়া নাটক বাংলায়

বাংলা নাটক অসমীয়ায় যেভাবে নিজের স্থান কবে নিয়েছে অসমীয়া নাটক সেই পরিমাণে বাংলায গৃহীত হয়নি। যদিও অসমে বঙ্গভাষী নাট্যকর্মীরা অসমীয়া নাট্যচর্চায় উল্লেখ্য অংশ গ্রহণ করেছেন এবং অসমীয়া নাট্যশিল্পীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অসমীয়া নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। গণনাট্য সঙ্ঘের কার্যকলাপ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করা যায়। অবশ্য প্রথম দিকে অসমীয়া নাটক বাংলায় খুব বেশি অনূদিত বা অভিনীত হয়নি। তার অন্যতম কারণ প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় সোজাসুজি ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে বাংলায় নাটক প্রভৃতি অনূদিত হয় ও অভিনীতও হয়। অসমীয়া বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার নাটক সেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। দ্বিতীয়ত, অসমীয়া নাটক খুব বেশি মুদ্রিত না হওয়ায় তা পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, ক্রমে দিল্লী, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি থেকে প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থা প্রায়শ কলকাতায় আসতে শুরু করে, কলকাতার নাট্যামোদী মানুষ সেসব অঞ্চলের নাটক দেখে উৎসাহিত হয়ে তাদের অনুবাদ ও অভিনয়ে ব্রতী হন; কিন্তু অসম থেকে সেরকম নাট্যসংস্থা বিশেষ আসেনা, এলেও সেরকম প্রচার লাভ করে না। ফলে বাংলার নাট্যামোদী মানুষ অসমীয়া নাটকের রসাস্বাদনে অনেকটাই বঞ্চিত হয় এবং অনুবাদ ও অভিনয় স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। যদিও সম্প্রতিকালে বাংলায় অসমীয়া নাটকের চর্চা হচ্ছে ভালমত। এখন অসমীয়া নাটক বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে মঞ্চস্থ হচ্ছে। অসমীয়া নাট্যসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদকে আস্বাদন করতে চাইছেন বাংলার রসিকজন।

পদ্ম বরা বেশ কটি একাঙ্ক লিখেছেন অসমীয়া ভাষায়। তাঁর 'মঞ্চরূপা' সংকলনের 'অসুখ' 'ভূত' ও 'পুরস্কার' বাংলায় অনুবাদ করেছেন সমীর দাশগুপ্ত। তাঁব 'বন্দোমতরম' নাটকটি 'শ্রীসমীর দাশগুপ্তর লগত যুগ্মভাবে অসমীয়া আরু বঙলা-দুটা ভাষাত লিখা'', একথা জানিয়েছেন পদ্ম বরা তাঁর 'মঞ্চরূপা'র ভূমিকায়।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া বেশ কয়েকটি নাটক লিখেছেন। তাঁর 'গদাধর রাজা' ১৯১৮ সালে লেখা এবং সম্ভবত অসমীয়ায় লেখা প্রথম একাঙ্ক। এটি বাংলায় অনূদিত, উপস্থপিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলি সহজ সরস আন্তরিক যা জীবনের দ্যুতিতে ঝলমল করে। তাঁর 'পাচনী' গল্প নাট্যরূপে পরিবেশিত হয় বাংলায় শিলংবাসী রাখাল ভট্টাচার্যর উদ্যোগে। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার পঞ্চাশতম মৃত্যুবর্ষ স্মরণে এক নাট্যসভার আয়োজন করেছিল ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়া ২১ জুন ১৯৮৭ কলকাতায়। আলোচনায় সঙ্গীতে অভিনয়ে অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা পায়। এই অনুষ্ঠানে লক্ষ্মীনাথের গল্প অবলম্বনে 'জলদেবী' একসংলাপী নাটকরূপে পরিবেশিত হয়। এ প্রসঙ্গে বাংলার কটি পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হল—

"অসমীয়া নাটক বাংলায়

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার পঞ্চাশৎ প্রয়াণ বর্ষ উপলক্ষে ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়া এক নাট্যসভার আয়োজন করে ২১ জুন উদীচীতে। বাংলা ও অসমীয়া নাটকের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীদিলীপ কুমার মিত্র। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা অবলম্বনে ঋতু গীতিনাট্য অসমীয়ায় পরিবেশিত হয়। শিল্পীরা হলেন শ্রীমতী উর্মি মিত্র ও

রুমনি মিত্র। গানগুলির অনুবাদক ছিলেন শ্রীকেশব মহন্ত শ্রীরত্নকান্ত বরকাকতি শ্রী মহেন্দ্র বরা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের অপর পর্যায়ে বাংলায় চারটি অসমীয়া নাটকের অভিনয়। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'জলদেবী'তে (গল্পের নাট্যরূপ) নারীমনের সূক্ষ্ম সুকুমার টানাপোড়েন সুন্দর রোমান্টিক রূপ পেয়েছে অভিনয়ে। শিল্পী শ্রীমতী নবনীতা রায়। ফণী-শর্মার 'কিয় ?' নাটকে সমাজ সচেতন জীবননিষ্ঠ অথচ দরিদ্র অসহায় শিল্পীর দুঃখবেদনার রূপায়ণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সব্যসাচী বসু। 'পিয়লি ফুকন' নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশপ্রেমিক শহীদের জীবনের শেষ পর্যায় সুন্দর রূপায়িত করেন কৃষ্ণেন্দু দে। অরুণ শর্মার 'শ্রীনিবারণ ভট্টাচার্য' এক অবহেলিত প্রত্যাখ্যাত অথচ সংবেদনশীল নাট্যশিল্পীর বেদনা যন্ত্রণা আর্তির রূপায়ণ - -শিল্পী ছিলেন শ্রীদিলীপ মিত্র। বাংলা ও অসমীয়া নাটক তথা জীবনের নিবিড় ঐক্য ও মিলনের ছবি সার্থক ফুটে উঠেছে এই অনুষ্ঠানে"।[৪২]

"লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার পঞ্চাশতম প্রয়াণ বর্ষ উপলক্ষে ড্রামা একাডেমী ইণ্ডিয়া উদীচীতে এক নাট্যসভার আয়োজন করেন। এই সভায় দিলীপ কুমার মিত্র বাংলা ও অসমীয়া নাটকের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। কেশব মহন্ত, মহেন্দ্র বরা অনূদিত অসমীয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা অবলম্বনে গীতিআলেখ্য পরিবেশন করেন উর্মি মিত্র ও রুমনি মিত্র। এছাড়াও অসমীয়া নাটকের অংশবিশেষ বাংলায় মঞ্চস্থ হয়। লক্ষ্মীকান্ত বেজবরুয়ার 'জলদেবী', ফণী শর্মার 'কিয় ?', অরুণ শর্মা রচিত 'শ্রীনিবারণ ভট্টাচার্য'তে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন নবনীতা রায়, সব্যসাচী বসু, কৃষ্ণেন্দু দে প্রমুখ।"[৪৩]

প্রান্তিক সংস্থা আয়োজিত সাহিত্যসভায় একসংলাপী 'জলদেবী' পরিবেশন করেন ইন্দ্রাণী গুপ্ত যেখানে দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যবিদ্ উপস্থিত ছিলেন। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ বেলেঘাটা আমরা সবাই আয়োজিত সারস্বত সন্ধ্যায় ঐ সংস্থার গ্রন্থাগার ভবনে 'জলদেবী' অভিনয় করেন মৌসুমী সরকার।

নাট্যকার অভিনেতা ফণী শর্মা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার অনশ্বর পরিচয় রেখে গেছেন। ফণী শর্মা অসমীয়া ও বাংলা নাট্যক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় নাম। বাংলা, অসমীয়া নাট্যভাবনার মেলবন্ধনে তাঁর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর নাটকে বাংলার প্রভাব অপরিসীম, বাঙলার জীবন ও চরিত্র তাঁর নাটকে রূপ পেয়েছে; অন্যদিকে তাঁর নাটক ও নাট্যপ্রবন্ধগুলি বাংলায় বিশেষ সমাদৃত। আগেই বলা হয়েছে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া স্মরণসভায় এবং আমরা সবাই সংস্থার সারস্বত সন্ধ্যায় 'কিয় ?' অভিনীত হয়। ঐ সারস্বত সন্ধ্যায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'জলদেবী' অভিনয়ের কথাও বলা হয়েছে। প্রখ্যাত নাট্যকার অধ্যাপক নিরূপ মিত্র 'কিয় ?' ও 'জলদেবী' প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমরা সবাই আয়োজিত সারস্বত সন্ধ্যায় ড. দিলীপ কুমার মিত্র অনূদিত দুটি শ্রুতি-লেখ অভিনয় করলেন শ্রীসব্যসাচী বসু ও শ্রীমতী মৌসুমী সরকার। 'কিয় ?' (কেন) নাটকের আংশিক রূপায়ণে সব্যসাচী একজন শিল্পীর বেদনা ও বঞ্চনার ছবি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে পরিবেশন করলেন। মৌসুমীর একক অভিনয়ে একটি কুমারীর গভীরতর ভালবাসার অনুভব চমৎকার রূপ পেল। অসমীয়া সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় অল্প তাঁরা ড. মিত্রর অনূদিত নাট্যাংশগুলি শুনে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় লাভে উন্মুখ হবেন নিশ্চয়। ড. মিত্র যে কুশলী দক্ষতায় প্রতিবেশী সাহিত্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে চলেছেন সে জন্য তাঁকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি"।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী সৌরভ কুমার চলিহা-র 'দুপরীয়া' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'সিহতেও পাহার বগালে' (তারাও পাহাড়ে চড়ল) একটি অসমান্য মিষ্টি প্রেমের গল্প। এই গল্পটিকে নাটকে রূপায়িত করেছেন পূর্ণশ্রী মিত্র (ও দিলীপ মিত্র) 'পাহাড় নক্ষত্র ভালবাসা' নামে। সঙ্গীত কলামন্দির আয়োজিত নাট্যসম্মেলনে এটি উপস্থাপিত হয় ২৫.৮.৮৪-তে কলামন্দিরে। দৈনিক বসুমতীতে লেখা হল—"সৌরভ কুমার চলিহার মূল অসমীয়া গল্প সিহতেও পাহার বগালে অবলম্বনে বাংলা নাট্যরূপ 'পাহাড় নক্ষত্র ভালবাসা'। নাট্যরূপ দিয়েছেন পূর্ণশ্রী মিত্র ও দিলীপ কুমার মিত্র। দুটি চরিত্র পুরুষ ও নারী, অভিনয় করলেন সব্যসাচী বসু ও শুক্তিসিতা ভট্টাচার্য। তাদের সহযোগিতা করলেন শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, পুষ্পল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু দে ও সুতপা ভট্টাচার্য"। (দৈনিক বসুমতী ১৩.৯.৮৪)। এই নাটকটি 'ও থিয়েটার থিয়েটার' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। সাহিত্য একাডেমী আয়োজিত আঞ্চলিক অনুবাদ কর্মশালায় (Regional workshop on literary Translation) তারাও পাহাড় চড়ল, বাংলা নাট্যরূপটি অসমীয়া ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে বাঙ্গালী শিল্পীদের দ্বারা মঞ্চস্থ হয় ১৬.১.১৯৮৮-তে সল্টলেক স্টেডিয়ামে অসমীয়া ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সামনে। পত্রিকায় লেখা হল—"সম্প্রতি সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত আঞ্চলিক সাহিত্য-অনুবাদ কর্মশালায় ড্রামা অকাদেমি ইন্ডিয়া তিনটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপস্থাপিত করে। অসমীয়ায় সৌরভ কুমার চলিহার গীতিধর্মী নাট্যকাহিনী 'সিহতেও পাহার বগালে' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন জীবেশ ভট্টাচার্য ও কন্যাকুমারী মাহিন্দার, পরিচালনায় ড. দীপক চন্দ্র পোদ্দার"।[88] বিশেষ উল্লেখ্য এই যে অসমীয়া গল্পটি বাংলায় নাট্যরূপায়িত হয়, আবার সেই নাট্যরূপ হিন্দীতে ভাষান্তরিত হয়ে গুজরাতী ও হিন্দী শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত হয় ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রেক্ষাগৃহে ২৫.৪.১৯৮৭-তে বিভিন্ন ভাষাভাষী দর্শকদের সামনে ঃ নাট্যরূপ ও অনুবাদ পূর্ণশ্রী মিত্র ও শ্রীমতী প্রেমলতা, অভিনয়ে দীনেশ ঠককর ও মমতা মিশ্র, পরিচালক ড. দীপক চন্দ্র পোদ্দার।

অগ্রণী অসমীয়া নাট্যকার অরুণ শর্মার 'আহার' আধুনিক অসমীয়া এ্যাবসার্ড নাটকের বিশিষ্ট নিদর্শন। এর বিশিষ্ট অংশ একাঙ্করূপে অনুবাদ করেন দেবব্রত রায়চৌধুরী ও সেটি 'ভারতীয় একাঙ্ক গুচ্ছ' (১৯৮৫) নাট্যসংকলনগ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়। বাংলার বিশিষ্ট নাট্যকার অমল রায় সহযোগী শিল্পীদের নিয়ে নাটকটি পরিবেশন করেন সাফল্যের সঙ্গে। অরুণ শর্মার 'কুকুরনেচীয়া মানুষ' আকাশবাণী কলকাতা বাংলায় সম্প্রচারিত করে। 'শ্রীনিবারণ ভট্টাচার্য' নাটকের অংশবিশেষ বাংলায় অনূদিত ও অভিনীত হয় ১৯৮৭-তে, রূপকার দিলীপ মিত্র—একথা আগেই বলা হয়েছে। হিমেন্দ্রকুমার বরঠাকুর রচিত 'দ্বীপ' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী বলেছেন—'শ্রী হিমেন্দ্রকুমার বরঠাকুরর 'দ্বীপ'র প্লট অদ্ভুত আরু এইখনর জরিয়তে চরকার আরু সমাজর যি সমালোচনা প্রকাশ করা হৈছে সি কৌশলপূর্ণ। এই গহীন নাটিকার কেন্দ্রীয় চরিত্র আধ-পাগলা বুঢ়া সর্বহারা আরু বিদ্রোহীর প্রতীক হৈয়ো মানবীয় গুণরে সমৃদ্ধ।" এই নাটকের গুরুদাস ভট্টাচার্য কৃত বাংলা অনুবাদ বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন চেন্নাইতে ১৯৮৩ সালে। পরিচালিকা সুদীপা বসু। কলকাতাতেও এই নাটক অভিনীত হয়েছে।

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয় ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার 'গ্রহণ' গল্প অবলম্বনে 'রাহুগ্রাস' নাটকটি মঞ্চস্থ করে ৫ এপ্রিল ১৯৮৭ গিরিশ মঞ্চে। অনূদিত গল্পটি নাটকে রূপায়িত করেছেন তৃপ্তি মিত্র। নির্দেশনার দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। নাটকটি

সম্বন্ধে 'দেশ' পত্রিকার মতামত উদ্ধৃত হল—''বার্ধক্য যা অধিকাংশের জীবনে এক যন্ত্রণাময় অধ্যায়, নিঃসঙ্গতা ও অবহেলা যার ফলশ্রুতি, তাই নিয়েই আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়ের নাটক 'রাহুগ্রাস'।

মূল কাহিনীকার অসমীয়া সাহিত্যিক শ্রী ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া, নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় স্বয়ং তৃপ্তি মিত্র।

অবসরপ্রাপ্ত কলেজ অধ্যাপক নীরেন। স্ত্রী গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। ছেলে অতুল, মেয়ে গীতা আর ভৃত্য ভোলাকে নিয়ে তাঁর সংসার। জীবন সায়াহ্নে এসে, নীরেন আজ উপলব্ধি করেন নিজের সন্তানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে কত ব্যবধান এসে গেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আজ তিনি অবজ্ঞা আর বিরক্তির পাত্র। কিন্তু প্রশ্নও জাগে নীরেনের মনে, এরজন্য দায়ী কি শুধু পরবর্তী প্রজন্ম, নাকি তিনি নিজেও? আগাগোড়া নাটকটিতে ঘটনার বিন্যাসে বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ রয়েছে। বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গতা ও বঞ্চনার রূপটি গোটা নাটক পরিস্ফুট দৃশ্যাবলীর মাধ্যমে। যেমন, পাশের ঘরে বাবার উপস্থিতিকে পাত্তা না দিয়ে উচ্চগ্রামে পাশ্চাত্য সঙ্গীত বাজিয়ে গীতা আর অতুলের প্রেমে মশগুল থাকা, আবার প্রেমে ব্যর্থ এই দুই ভাই-বোনের বাবার মানসিক পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে, বাড়ি ছেড়ে যাওয়া। তবে পরিচালকের দাবি অনুযায়ী শিল্পীরা সচেষ্ট থাকলেও দুয়েকজন ছাড়া, আর কাউকেই তেমন স্বচ্ছন্দ মনে হয় না। অধ্যাপক নীরেনের চরিত্রে আলো গুপ্তর অভিনয়ে সুসংবদ্ধতার একটু অভাব থেকে যাওয়ায়, নাটকের গতি কিছুটা মন্থর হয়ে যায়।

এরই মধ্যে গীতারূপী ঋতা চক্রবর্তী ও ভোলারূপী সুব্রত আচার্য যথেষ্ট সপ্রতিভ। নীরেনের কল্পনার দৃশ্যে, ক্ষীণ আলোকে মঞ্চের এক কোণে, তাঁর মৃতা স্ত্রীর আবির্ভাব সূক্ষ্ম রুচির পরিচায়ক। এই চরিত্রে মুক্তি চক্রবর্তীকে ভালো লাগে। নেপথ্য চরিত্র অনুর গানটি স্ব-কণ্ঠে হলেই ভালো হত। রূপসজ্জা, মঞ্চ পরিকল্পনা (খালেদ চৌধুরী), আবহ সঙ্গীত (তড়িৎ ভট্টাচার্য) ও আলোর ব্যবহার (জয় সেন) প্রশংসনীয়।''[৪৫]

১৯৯৪ সালে তিনটি অসমীয়া নাটক বাংলায় উপস্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান কালচারাল ফোরাম, প্রয়াগ নাট্য সংস্থা এবং বিচয়ন সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে। তিনটি নাটক হল ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার 'পুতুল নাচ', মহেন্দ্র বরঠাকুরের 'শরাগুরি চাপরি' অনুপ্রাণিত 'আজান ফকির' এবং নগাঁও নাট্য সমাজের 'পিয়লি ফুকন'। গণশক্তি পত্রিকার ১.১১.৯৪ সংখ্যায় এই নাটক তিনটির সমালোচনা প্রকাশিত হয় যাতে এদের প্রয়াসকে আন্তরিক সাধুবাদ জানানো হয়।

অপর একটি পত্রিকার লেখা হয়—''সম্প্রতি প্রয়াগ নাট্য সংস্থা, ইন্ডিয়ান কালচারাল ফোরাম ও বিচয়ন সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ৩টি অসমীয়া নাটক বাংলায় উপস্থাপিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৯৪-তে। প্রথম নাটক ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার 'পুতুল নাচ', বাংলায় অনুবাদ করেছেন গুরুদাস ভট্টাচার্য। অভিনয়ে অংশ নেন সমর বিশ্বাস, কাকলি মজুমদার, গৌতম চক্রবর্তী, শেখর ঘোষাল, দুর্গা দত্ত। সহযোগিতায় পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী বীরেন্দ্র মৃধা স্বপন বর কার্তিক হাজরা। দ্বিতীয় নাটক মহেন্দ্র বরঠাকুর অনুপ্রাণিত ড. দিলীপ কুমার মিত্র রচিত 'আজান ফকির'। বিশেষ উল্লেখ্য এই যে এই নাটকে অংশ নিয়েছেন কেবল মহিলা শিল্পীগণ যাদের মধ্যে সোনা রায়, শ্যামলী দাস ও সঞ্চিতা হোড়ের নাম বিশেষ উল্লেখ্য। নাট্যরূপায়ণে সহযোগী শিল্পীরা হচ্ছেন গোপা চক্রবর্তী, মাহমুদা খাতুন, অনামিকা বেরা, সীমা ঘোষ, ইন্দিরা চক্রবর্তী, বন্দনা পাঠক। বাংলা ও অসমের জীবনচর্চা

ও সাহিত্য সাধনার মেল বন্ধনে বিশেষ সাহায্য করবে এই জাতীয় অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাই। বিশেষ অভিনন্দন জানাই পরিচালক দিলীপ কুমার মিত্রকে যিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় নাট্যচর্চায় রত এবং বাংলার সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষদের কাছাকাছি এনে দিতে সচেষ্ট।

এই পর্যায়ের তৃতীয় নাটক নগাঁও নাট্য সমাজের 'পিয়লি ফুকন'। দেশপ্রেমিক পিয়লি ফুকনের লড়াই ও ফাঁসীতে মৃত্যুবরণের আবেগ-সঞ্চিত কাহিনীর রূপায়ণে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন স্বপন দাস। নর্তকীর ভূমিকায় গার্গী দাসও অসামান্য। প্রয়াগ নাট্য সংস্থার এই প্রযোজনা রসিক মহলে সমাদৃত হয়।"[৪৬]

বিশিষ্ট কবি কথাশিল্পী নবকান্ত বরুয়ার ৭৩তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয় ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৯ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের বেসমেন্ট হলে। এই উপলক্ষে ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন আয়োজিত হয় যাতে কবিতা গান নাটক ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। দুটি অসমীয়া নাটক বাংলায় পরিবেশিত হয়। পত্রিকায় লেখা হয়—"নবকান্ত বরুয়ার নাটক 'বেলিফুল আরু গোলাপ' এক অনন্য সৃষ্টি। জওহরলাল নেহরুর প্রয়াণে এই সুন্দর নাটকটি রচিত হয়েছিল যাতে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের নবীন প্রাণের জাগরণ ও উদ্দীপনের কথা বলা হয়েছে। নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন দিলীপ কুমার মিত্র এবং একক ভাবে পরিবেশন করেছেন সংঘমিত্রা দাস। অতুলানন্দ গোস্বামীর গল্প 'অকলে অকলে'-তে এক বৃদ্ধ মানুষের অসহায় বেদনার কথা রূপ পেয়েছে যার একক নিঃসঙ্গতা আরো বেদনামথিত হয়েছিল পুত্রকন্যাদের নিস্পৃহ অবহেলায়। গল্পটিকে একক নাটকে সাজিয়েছেন পূর্ণশ্রী মিত্র এবং শিল্পময়তায় তাকে প্রকাশ করেছেন পীতম ভট্টাচার্য।"[৪৭] (নতুন খবর ১৩.২.১৯৯৯)। অতুলানন্দ গোস্বামীর নাট্যরূপায়িত এই কাহিনী পীতম ভট্টাচার্য আবার পরিবেশন করেন লিটল ম্যাগাজিন মেলা '৯৯ উপলক্ষে আয়োজিত সর্বভারতীয় নাটক বিষয়ক সেমিনার ও নাট্যানুষ্ঠানের আসরে। নবকান্ত বরুয়ার 'বেলিফুল আরু গোলাপ' নাটকটি বাংলায় আবার অভিনয় করেন সংঘমিত্রা দাস নেহরুর জন্মদিনে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে নভেম্বর ২০০০ সালে। বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা এই নাটক দেখে বিশেষভাবে উজ্জীবিত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম সাউথ ক্যালকাটা গার্লস হাই স্কুল।

বাগুইআটি কৃষ্টি সংসদের উদ্যোগে ২৫ জুন রবিবার ২০০০ আধুনিক ভারতীয় নাটকের ওপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যাতে ছিল নাটক ও আলোচনা। আধুনিক ভারতীয় নাটক নিয়ে আলোচনা করেন দিলীপ কুমার মিত্র এবং তিনটি নাটক উপস্থাপিত হয়। মহেন্দ্র বরঠাকুরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং মানবিক মূল্যবোধের নাটক 'শরাগুরি চাপরি' বাংলায় সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন ধীমান ভট্টাচার্য। নাটকের বিশেষ বিশেষ অংশ তাপস দাসের পরিচালনায় এসো নাটক শিখি সংস্থার শিল্পীরা অভিনয় করেন। নাটকে লালন ফকিরের গানও সন্নিবেশিত হয়। অভিনয়ে অংশ নেন সুদীপ চক্রবর্তী মনোজ সমাদ্দার অতীন্দ্রপ্রসাদ সানা ভাস্কর মজুমদার এবং সুজাতা নাহা রায়। বক্তব্যের গভীরতা সম্যক পরিস্ফুট করেছেন শিল্পীরা। নিপুণ অভিনয়ে, যথাযথ আবহে এবং নিপুণ সঙ্গীত প্রয়োগে অনন্য সৃজনরূপ পরিগ্রহ করেছে 'শরাগুরি চাপরি'। এভাবেই অসমীয়া নাটক বাংলায় গৃহীত হয়েছে অনুরাগে ও শ্রদ্ধায়।

সূত্ৰ পৰিচিতি

১ 'ঊনবিংশ শতাব্দীৰ শেষফালে অসমীয়া ডেকাসকলে কলিকতাত উচ্চ শিক্ষা লওঁতে বঙলা নাট আৰু অভিনয় দেখি সেই আদৰ্শত অসমীয়া নাট আৰু অভিনয় কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে। তেওঁলোকৰ আৰু অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত অসমৰ প্ৰধান নগৰ কেইখানমানত যোৱা শতিকাৰ শেষ দশকৰ অল্প আগে পিছে কলিকাতাৰ ৰঙ্গমঞ্চৰ সহজ অনুকৰণত ৰঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়'।—
অসমীয়া নাট্যসাহিত্য, সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, পৃঃ ১২০, গুৱাহাটি, ১৯৮৩।

২ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জিলিঙনি, ড° হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য, পৃ° ৩২০ ৩২১।

৩ Indian Literature (April-Sept 1958) Sahitya Akademi (article Assamese Drama Birendra Kumar Bhattacharya p 77) New Delhi 1958

৪ Enact (Jan -Feb 78) Ed Rajinder Paul (article-Contemporary Assamese Theatre Satya Prasad Barua) New Delhi 1978

৫ এপিক থিয়েটাৰ, উৎপল দত্ত সম্পাদিত (প্ৰবন্ধ— আসামেৰ গণনাট্য আন্দোলন প্ৰসঙ্গে, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পৃঃ ৬ ৭) কলকাতা, ফেব্ৰুয়াৰি ১৯৭৯।

৬ তদেৱ, পৃঃ ৮

৭ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ অভিলেখ, ড° নগেন্দ্ৰ শইকীয়া সম্পাদিত (প্ৰবন্ধ যোৱা পঁচিশ বছৰৰ অসমীয়া নাটকৰ ধাৰা, ডঃ শৈলেন ভৰালী, পৃঃ ২৭৩), জোৰহাট ১৯৭৭।

৮ Enact Ed Raj er Paul (article-Trends in Post War Assamese Drama Sailen Bharali) New Delhi Jan-Feb 1978

৯ বঙালী বিচিত্ৰা, অসম সাহিত্য সভা (প্ৰবন্ধ আধুনিক নাটক শ্ৰীৰাম গোস্বামী পৃ ৩৩), জোৰহাট, ১৯৭৮।

১০ তদেৱ, পৃঃ ৩৮।

১১ তদেৱ, পৃঃ ৩৮ ৩৯।

১২ The Theatre of the Absurd Martin Esslin A Pelican Book 1968

১৩ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ অভিলেখ, ডঃ নগেন্দ্ৰ শইকীয়া সম্পাদিত (প্ৰবন্ধ যোৱা পঁচিশ বছৰৰ অসমীয়া নাটক, ডঃ শৈলেন ভৰালী, পৃ° ২৬০ ২৬১), জোৰহাট, ১৯৭৭।

১৪ তদেৱ, পৃঃ ২৬৩।

১৫ তদেৱ, পৃঃ ২৬৪ ২৬৫।

১৬ তদেৱ, পৃঃ ২৬৯।

১৭ তদেৱ, পৃঃ ২৭০।

১৮ মঞ্চলেখা, অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা, পৃঃ ৯৫, গুৱাহাটি ১৯৬৭।

১৯ তদেৱ, পৃঃ ১১৩।

২০ তদেৱ, পৃঃ ৪৫১।

২১ অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা, ডঃ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, ১৫বৰ্ষ ২ সংখ্যা, পৃঃ ৮২, জোৰহাট।

২২ অসমীয়া নাট্য সাহিত্য, সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, পৃঃ ২০৬, গুৱাহাটি, ১৯৮৩।

২৩ দ্ৰষ্টব্য-বিশ্বভাৰতী পত্ৰিকা-শ্ৰাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ (প্ৰবন্ধ— দ্বিজেন্দ্ৰলাল ৰায় ও আধুনিক অসমীয়া নাটক, জীৱন চৌধুৰী)

২৪ Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebrations Vol II, Ed-Santosh Chandra Sengupta (Articl bindranath and Assamese Literature, Ratna Kanta Barkakati, p 72).

২৫ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জিলিঙনি, ডঃ হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য, পৃঃ ১৮৯, গুৱাহাটি, ১৯৭৮।

২৬ তদেৱ, পৃঃ ১৯০।

২৭ In Lyrical dramas also Rabindranath's influence is to be seen in Sonit Kauwari (Princess of Sonitpur) Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebrations Vol II Ed S C Sengupta (Article-Rabindranath and Assamese Literature Ratna Kanta Barkakati p 81) Santiniketan

২৮ পার্বতিপ্রসাদ বরুয়া রচনাবলী, অসম সাহিত্য সভা, পৃঃ ১৪, জোরহাট, ১৯৮১।

২৯ অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, পৃঃ ৩৮৫—৩৮৬, গুয়াহাটি, ১৯৮১।

৩০ অসমীয়া নাট্য সাহিত্য, সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, পৃঃ ৪০৬ গুয়াহাটি ১৯৮৩।

৩১ যুগান্তর, কলকাতা, ২২ ৭ ৮৫।

৩২ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৩ ৮ ৮৭।

৩৩ যুগান্তর, কলকাতা, ২৭ ৭ ৮৭।

৩৪ মধুলেখা, অতুলচন্দ্র হাজরিকা, পৃঃ ৩৭৮, ১৯৬৭।

৩৫ এপিক থিয়েটার, উৎপল দত্ত সম্পাদিত চতুর্বর্ষ সংখ্যা (প্রবন্ধ—আসামের নটসূর্য ফণী শর্মা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পৃঃ ৫৩), কলকাতা।

৩৬ ফণী শর্মা রচনাবলী, অসম প্রকাশন পরিষদ (প্রবন্ধ—নটসূর্য ফণী শর্মা, চন্দ্রধর গোস্বামী, পৃঃ ৩৭), গৌহাটি, ১৯৭৬।

৩৭ রূপকার, অমিতাভ বরুয়া সম্পাদিত, গুয়াহাটি, জানুয়ারী ১৯৭৬।

৩৮ তদেব, আগষ্ট, ১৯৮২।

৩৯ তদেব, অক্টোবর, ১৯৮৬।

৪০ তদেব, অক্টোবর, ১৯৮৬।

৪১ অসমীয়া একাঙ্ক গুচ্ছ ও পিযলি ফুকন, ড প্রফুল দত্ত গোস্বামী সম্পাদিত, অনুবাদ গুরুদাস ভট্টাচার্য, অনুবাদ প্রসঙ্গে, নয়াদিল্লী, ১৯৮১।

৪২ পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ৩ ৭ ১৯৮৭

৪৩ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৩ ৮, ১৯৮৭

৪৪ বর্তমান, কলকাতা, ১৯ ০ ৮৮

৪৫ দেশ, কলকাতা, ২৫ ৭ ১৯৮৭

৪৬ প্রযাগ নাট্য পত্রিকা, কলকাতা, শারদীয় ১৪০১

৪৭ নতুন খবর কলকাতা ১০ ২ ১৯৯৯

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক গুজরাতী নাটক

১ সূচনা পর্ব

প্রকৃত আধুনিক অর্থে গুজরাতী নাটকের সূত্রপাত ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তিনটি অনুপ্রেরণায় প্রচলিত লোকশিল্প ভবাই এর বিরুদ্ধ মানসিকতা ও নতুনত্বের সৃষ্টির বাসনা, আধুনিক মঞ্চের উদ্ভব সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের বিশেষ চর্চা। গুজরাতীতে প্রথম নাটক হল এরিস্টোফেনিসের প্লুটাস অবলম্বনে দলপতরামের 'লক্ষ্মী (১৮৫১)। গ্রীক সম্পদের দেবতা প্লুটাস অন্ধ, তাই লক্ষ্মীও অন্ধ। সে দুর্জনের ঘরে গেলে দুর্জন ধনবান হয়। বৈদ্য ধন্বন্তরী লক্ষ্মীর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলে সে সজ্জনের ঘরে যায় ও ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। দলপতরামের মিথ্যাভিমান (১৮৭১) গুজরাতী সাহিত্যে প্রথম প্রহসন। জীবরাম ভট্ট রাতকানা ও আপন অন্ধত্ব লুকোবার জন্য মিথ্যাভিমানী জীবরাম দম্ভপূর্ণ আচরণ করে। পরিণতি যথাযথ।

শুরু হয় নর্মদ যুগ। **কবি নর্মদ** (১৮৩৩ ১৮৮৬) রচিত রামজানকীনাটক' (১৮৯১) এ যুগের বিশিষ্ট রচনা। সাত অংকে পঁয়ত্রিশ দৃশ্যে সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী লেখা এই নাটক অবশ্য খুব উঁচুমানের নয়। 'বালকৃষ্ণ বিজয় নাটক' (১৯৮৬) রঙ্গমঞ্চের উপযোগী হলেও এর সাহিত্যিক মূল্য কম। 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬৯) প্রথম গুজরাতী ঐতিহাসিক নাটক — টডের 'রাজস্থান' থেকে বিষয়বস্তু গৃহীত। এতে উদয়পুর রাজদুহিতা কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডী বর্ণিত।

'গুজরাতী নাটকের জনক' **রণছোড়ভাই উদয়রাম দভে** (১৮৩৭ ১৯২৩) ১৮টি নাটক লেখেন। তার নাট্যকৃতি সাহিত্যে এবং অভিনয়েও। 'হরিশচন্দ্র নাটক' গান্ধীজীকে বাল্যকালে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে বক্তব্য নিয়ে লেখা মদালসা অণে ঋতুধ্বজ' প্রথম গুজরাতী নাটক যাতে ভবাই সংস্কৃতি ও ইংরাজী রীতির মিশ্রণ আছে। রণছোড়ভাই এর 'জয়কুমারী বিজয় বিবাহ সমস্যার ওপর লেখা (অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করা সামাজিক সমস্যাও আছে।) গরীব মারাবার মেয়ে জয়কুমারীর সঙ্গে ধনপতি সুখলালের ছেলে প্রাণলালের হৃদয় সম্পর্ক গড়ে উঠলেও মিলন সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত এক প্রগতিশীল সংস্কারবাদী দম্পতির সাহায্যে তাদের মিলন হয়। 'ললিত দুঃখদর্শক' গুজরাতী ভাষায় প্রথম দুঃখান্ত নাটক। ললিতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে নন্দকুমারের যে বদমাইশ, লম্পট। নন্দকুমার প্রিয়ংবদা নামে এক বারাঙ্গনার জালে ফাঁসে ও ললিতার ওপর অসহ্য অত্যাচার করে। শেষ পর্যন্ত নন্দকুমার নিহত হয় এবং ললিতাও বদমাইশের পাল্লায় পড়ে অধঃপতনের পথে যায়। তার বাবা মা তাকে পিশাচ জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন ও অসহ্য দুঃখবেদনার সে প্রাণত্যাগ করে। এ সময়ের অন্যান্য নাট্যকার হলেন মণিলাল নমুভাই দ্বিবেদী ('কান্তা', 'নৃসিংহাবতার') মধুরচরাম বলরচরাম হোরা ('নৃসিংহ নাটক') হরিলালধ্রুব, নওলরাম পণ্ডুয়া, ভীমরাজ ভোলানাথ, গণপতরাম রাজারাম ভট্ট, নওলরাম লক্ষ্মীরাম পণ্ডুয়া। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গুজরাতী স্নাতক

নগীনদাস তুলসীদাস মরফতিয়া রচিত 'গুলাব' (১৮৬২) প্রথম গুজরাতী সামাজি নাটক এবং মৌলিকও। এটি ইংরেজী আদর্শে রচিত। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত নায়ক ভো লের সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, গুলাবের সঙ্গে তার প্রণয় ও আন্তর্জাতিক ভাবনায় তার স্থাপন — নাটকের বক্তব্য নবচেতনায় সমৃদ্ধ।

নানালাল দলপতরাম কবি (১৮৭৭-১৯৪৬) বারটি নাটক লেখেন। তাঁর সব নাটক ভাবনা প্রধান ও তাতে এপিক ড্রামার লক্ষণ আছে।[১]

জীবনের বাস্তবতা তাঁর নাটকে পাওয়া যায় না, বরং আদর্শবাদ মহৎ ভাবনার প্রকাশ সেখানে আছে। তাঁর লিরিকাল ভাবপ্রধান পৌরাণিক নাটক হল 'রাজর্ষি ভরত' (১৯২২) ও 'বিশ্বগীতা' (১৯২৭), ঐতিহাসিক নাটক 'জাহাঙ্গীর নূরজাহান' ও 'শাহনশাহ আকবরশাহ', সামাজিক নাটক 'ইন্দুকুমার' 'জয়াঅনে জয়ন্ত' প্রভৃতি। 'বিশ্বগীতা' কার্যকারণবদ্ধ কাহিনী ঘটনা বা চরিত্র প্রধান নয়, এতে আ রস একাগ্রতা বা ভাব একাগ্রতা। সমগ্র নাটকের উপদেষ্টা রূপে আছেন যোগর্ষি পতঞ্জলি যিনি ব্রহ্মান্ড ও সংসারের অন্তর্গত সত্য জানতে চান এবং শেষপর্যন্ত যা জেনেছেন তা হল চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ যোগঃ।

প্রাক আধুনিক যুগের খ্যাতিমান পুরুষ সমাজসংস্কারক নীতিপরায়ণ **রমনভাই নীলকণ্ঠ**-র 'রাইনো পর্বত' (রাই হল পর্বত) বিশিষ্ট হয়েছিল। গুজরাতের রাজা রত্নদীপ দেবকে হত্যা করে পর্বত রায় রাজা হয়। রত্নদীপের পত্নী অমৃতদেবী ছেলেকে নিয়ে চলে যায় ও ছদ্মবেশে থাকে — ছেলের নাম হয় রাই। সে বড় হয়ে পর্বত রায়কে হত্যা করে পিতৃহত্যার বদলা নেয় ও বিভিন্ন ঘটনার পর রাজা হয়।

২. প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব

১৯৩০ এর সময় থেকে গুজরাতী নাটকে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার ঐতিহাসিক আন্দোলন তীব্র দুর্বার হয় ১৯৩০-এ। ১৯৩০ এর ১২ই মার্চ গান্ধীজীর ঐতিহাসিক অভিযান শুরু হয়। সারা দেশ উৎসাহ উন্মাদনায় উদীপ্ত হয়ে ওঠে, লক্ষ বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ধ্বনি সমুদ্রতরঙ্গের মত আছড়ে পড়ে সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। গুজরাতী শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকাররা গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন — কে এম মুনসী, রমনলাল দেশাই, রসিক লাল পারিখ, চন্দ্রবদন মেহতা, উমাশংকর জোশী, গুলাবদাস ব্রোকার, জয়ন্তী দালাল প্রমুখের রচনা বিশেষত নাটক আশ্চর্য দ্যুতিতে ঝলসে ওঠে। সেখানে ঝংকৃত হয় বিচিত্র বিস্ময়কর রাগিনী, স্বাধীনতার দুর্বার বাসনা অধিকার অর্জনের সংগ্রাম, নারী জাগরণ ও নারীর স্বাতন্ত্র, শোষিত নিপীড়িত মানুষের বিদ্রোহ, হরিজন উদ্ধার, মাদক দ্রব্যাদি বর্জন, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি। 'গান্ধী যুগের সাহিত্যের বিশেষত নাট্যসাহিত্যের বিষয় ছিল শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মাদক বর্জনের প্রয়াস ও সমাজ থেকে অসাম্যের দূরীকরণ।[৩] ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্বাধীনতার লড়াই, জনগণের জাগরণ, নীচু তলার মানুষের অধিকার অর্জনের প্রয়াস, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, নবীনের প্রতি আকর্ষণ এবং সর্বোপরি মানবতার জয়গান। ত্রিশোর্ধ গুজরাতী নাট্যকারদের রচনায় এই ভাবনাগুলি প্রবল মাত্রায় প্রত্যক্ষ হয় এবং গুজরাতী নাটকে নতুন যুগের তথা আধুনিকতার সৃষ্টি করে।

বাণিজ্যিক মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে গুজরাতে সৌখীন ও পরীক্ষামূলক রঙ্গমঞ্চের আত্মপ্রকাশ ঘটে এ সময় থেকেই। '১৯৩০ এর পর থেকে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের

ক্রমবর্ধমান দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে শৌখীন মঞ্চগুলির অভ্যুদয়ের সূচনা দেখা গেল। স্কুল কলেজের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের মূখ্য প্রমোদ অঙ্গ হিসাবে এবং বোম্বাই, আমেদাবাদ, সুরাট, বরোদা ইত্যাদি শহরে উদীয়মান সুরুচি সম্পন্ন সৌখীন নাট্যগোষ্ঠীর সফল আন্দোলনের ফলেই এর বিকাশ ঘটতে লাগল'।[৪]

নাটকের আঙ্গিকগত পরিবর্তন বিভিন্ন ভাবে দেখা দিয়েছে এ সময় থেকেই। একাংকর গৌরবময় বিকাশ ঘটল এ সময়ে। 'একান্ত অপরিহার্য এমন অল্প সংখ্যক চরিত্র নিয়ে নাটকের পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক উদ্দেশ্যমূলক ধারাবর্ষণ আর এ্যাকশনে পুরো টিমওয়ার্ক'[৫] নিয়েই যে এসময়ে একাংক আশ্চর্য বিকশিত হল তা নয়, তা নূতন জীবনভাবনায় ঋদ্ধ হল। **রসিক লাল ছোটালাল পারিখ** এর 'মৈনা গুর্জরী' (রচনা ১৯৩০, প্রথম অভিনয় ১৯৩২) সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় চেতনায়, নারীত্বের মহিমায়, মানবিক সংবেদনার গভীরতায় ও অঙ্গিক নৈপুণ্যে দোসরহীন অনন্য।

সারা ভারতের ভাবনার সঙ্গে সমতা রেখে ত্রিশের দশকে গুজরাতে প্রগতি লেখক সংঘের উদ্ভব হয় যা চূড়ান্ত রূপ পায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কার্যবিধিতে। কবিতায় কাহিনীতে নাটকে গণচেতনা প্রগতিশীল বিপ্লবী ভাবনা প্রকাশিত হতে থাকে। ত্রিশের প্রথমেই অধ্যাপক বি. কে. ঠাকুর রাশিয়ান নাটক অনুবাদ করলেন 'Squaring the circle' — নাট্য আন্দোলনে এল প্রেরণা। যশবন্ত ঠাকুর, দীনা গান্ধীর মত নতুন চেতনার মানুষ এগিয়ে এলেন গণনাট্য চর্চায়। গুজরাতী গণনাট্য সংঘের বিশিষ্টতা উল্লেখ করে গুলাবদাস ব্রোকার বললেন — "That movement was inspired by an ideal and was composed of serous minded men and women - - Jashwant Thakur and Dina Gandhi being the most prominent among them - fanatically devoted to the work in hand, however mistaken or misguided they may otherwise have been. Their training was superb and their selections sound. They adopted plays from Ibsen and Priestly, Lorca and Gorky and put up serious original plays like 'Alla Bali' and 'Dhumraser'[৬].

গুজরাতী প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন 'সাহিত্য ও প্রগতি' নামে প্রগতিশীল লেখার প্রথম সংকলন বার করে ১৯৪০-এ। ১৯৪৪-এ কবি নর্মদ-এর জয়ন্তী উৎসবে নর্মদের জীবনী নাটক লেখেন চন্দ্রবদন মেহতা যা গুজরাতী গণনাট্য সংঘ অভিনয় করে। কবি স্বপ্নাষ্ট ও ভোগীলাল গান্ধীর সম্পাদনায় ১৯৪৪-এ 'সাহিত্য ও সংস্কার' নামে যে প্রগতিশীল পত্রিকা বেরোয় তাতে নাটক উল্লেখ্য ভূমিকা পায়। এই সময়ই গুণবন্ত রায় আচারিয়া লেখেন 'আল্লা বেলি' যাতে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের অধীনে রাজ্যসমূহের জনগণের শোচনীয় দুর্দশা ১৮৫৭র বিদ্রোহের পটভূমিকায় দুঃসাহসিক ভাবে আঁকা হয়। আই পি টি এ গুজরাত বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে এই নাটকের সগৌরব অভিনয় করে। C. C. Mehta and K. M. Munshi were the pioneers of the New Theatre in Gujrat.[৭]

কানহাইয়ালাল মানেকলাল মুনশী (১৮৮৭-১৯৭১) সর্বতোমুখী প্রতিভাবান সাহিত্যস্রষ্টা। উপন্যাস গল্প ইতিহাস তিনি সার্থক রচনা করেছেন, নাট্যরচনায় তিনি অতিশয় দক্ষ। শুধু ইংরেজীতে নয় আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনীতি সমাজনীতি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুনসীজী এক অবিস্মরণীয় নাম। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "আধুনিক ভারবর্ষের এক মহত্তম লেখক রূপে কে এম মুনসী বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছেন। ভারবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের তিনি অগ্রণী ভূমিকায় অধিষ্ঠিত

এবং গুজরাতী সাহিত্যের বর্তমান যুগকে কানহাইয়ালাল মুনসীর যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়''।[৮]

মুনশীজী পৌরাণিক সামাজিক ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটকে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় অতীত ফুটেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে আধুনিক ভাবের স্ফুরণ দেখা যায়। তার প্রথম পৌরাণিক সংকলন ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় যাতে চারটি নাটক আছে। –– 'পুরন্দর পবাজয়' 'অবিভক্ত আত্মা' 'তর্পণ' ও 'পুত্র সমোবডী'। প্রথম নাটকে চ্যবন ঋষির সঙ্গে সুকন্যার বিবাহ প্রসঙ্গ কথিত। চ্যবনের তেজস্বিতা, ইন্দ্রের অভিশাপ ও চ্যবনের বৃদ্ধ দশা প্রাপ্তি, সুকন্যার সঙ্গে চ্যবনের বিবাহ, যৌবনবতী সুকন্যার বৃদ্ধ জরাগ্রস্থ চ্যবনের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ও অশ্বিনীকে আহ্বান তাকে নিয়ে যাবার জন্য, সুকন্যার অনুতাপ ও ভারতীয় নারীত্বের মহিমায় সতীত্বে আস্থা স্থাপন, চ্যবনের জয়, পুরঞ্জয়ের পরাজয়, চ্যবনের পুনর্যৌবন প্রাপ্তি এই নাটকের বিষয়। 'পুত্র সমোবডী' কচ দেবযানী ও যযাতির কাহিনীতে স্বাদেশিকতার মন্ত্রবানী সঞ্চারিত। শুক্রাচার্য 'সঞ্জীবনী মন্ত্র' শোনাচ্ছেন কচকে — মৃত্যুপথ যাত্রীদের প্রাণদানের জন্য ভীত হয়ো না, পিছু হটো না, সরে দাঁড়িয়ো না, লড়াই করো — জয় অথবা পরাজয় — তা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে জাগানোর মন্ত্র। চারভাগে বিভক্ত 'লোপামুদ্রা' (প্রথম ভাগ উপন্যাস পরের তিন ভাগ নাটক, ১৯৩৩-৩৪) আর্য-অনার্যের যুদ্ধ সংঘাতের পটভূমিকায় বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার বিশেষ করে অচ্ছুত-শুদ্রদের সঙ্গে — মিলনের কথা বলা হয়েছে। এই লেখা গান্ধীজীর হরিজন সমস্যা ও অচ্ছুতোদ্ধারের ভাবনার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত।

মুনশীজীর প্রথম সামাজিক নাটক 'কাকানী-শশী' (কাকার শশী) আধুনিক নারীদের তথাকথিত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার ওপর ব্যঙ্গ। শশী ছেলে বেলা থেকে অনাথ, মনোহরলাল কাকা নামে জনৈক ব্যক্তি তাকে বড় করে। উকীল কুন্দনলালের পত্নী বিধুমুখী, ফৌজদার জ্যোতিরামের প্রেমিকা শিবগৌরী, প্রতিবেশিনী গঙ্গাবেন প্রমুখের সহযোগিতায় শশী স্ত্রী-স্বাধীনতা নারী জাগরণ সংঘ প্রভৃতিতে কাজ করে। শশীর বাকচাতুর্য দেহসৌন্দর্য দেখে উকীল কুন্দনলাল ও কবি গৌরীশংকর আকৃষ্ট হয়, শিবগৌরীর পতি ইন্দ্রজিৎও তাকে নিয়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু শশী তাদের সকলকে বোকা বানায়। সে সবাইকে বাদ দিয়ে মনোহরকে বিয়ে করে 'কাকার শশী' হয়ে যায়। 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (১৯৩১) তথাকথিত গান্ধীবাদীদের নীচতা হীনতার বর্ণনা। 'পীড়াগ্রস্থ প্রফেসর' (১৯৩৪) তাঁরই 'স্নেহসম্ভ্রম' উপন্যাসের নাট্যরূপ। প্রফেসর প্রীতলাল আপন অসুস্থ চিররুগ্ণ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বসুন্ধরা নামে এক বিবাহিতা নারীর সঙ্গে প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করে ও তাকে নিয়ে পালাতে চায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বসুন্ধরা তার ভুল বুঝে স্বামীর কাছে ফেরে, প্রফেসর বোকা বনে যায়। এই নাটকে মুনসীজী উচ্চবিত্ত সমাজের ছবি এঁকেছেন ও বলতে চেয়েছেন যে ব্যক্তিগত কামনা বাসনার চেয়ে কর্তব্য অধিকতর মূল্যবান।

১৯৩৪ সালে মুনশীজীর তিন সামাজিক নাটকের এক সংকলন প্রকাশিত হয় যাতে 'বাবা শেঠনু স্বাতন্ত্র্য', 'আজ্ঞাংকিত' ও 'বেখরার জন' আছে। প্রথমটিতে বাবা শেঠ ও তার স্ত্রী রেবার মধ্যের বিসংবাদ সংঘর্ষের চিত্রকে অনেকটা হালকাভাবে দেখানো হয়েছে। 'আজ্ঞাংকিত' তে নারী জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণিত। বিধবা কাশীবা তার দুই মেয়ে সবিতা ও কমলার বিয়ে ঠিক করে যথাক্রমে শেঠ হরকিষণ দাসের ভাইপো ধীরজলাল ও গোমস্তা জোইতার সঙ্গে। প্রৌঢ় শেঠজী কাশীবাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে নিজে সবিতাকে বিয়ে করে ও আজ্ঞানুবর্তী ভাইপো ধীরজলালের সঙ্গে কমলার বিয়ে দেয়। এই

অসম বিবাহে ক্ষুব্ধ বেদনার্ত সবিতা ঘর ছেড়ে চলে যায় ও বারাঙ্গনা হয়ে যায়। একদিন শেঠজী নৈশ অভিসারে তার ঘরে আসে। সবিতা শেঠজীকে তীব্র তিরস্কার করে। শেঠজী অত্যন্ত মর্মপীড়ায় ভোগে ও তার মৃত্যু হয়। শেষে সবিতা জোইতাকে আপন করে নেয়। 'রেখবাব প্রাণ'-এ আধুনিক নারীর স্বাধীন ভাবনা ও বিবাহের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। 'ডঃ মধুবিকা' (১৯৪৮) নাটকে আধুনিক যুগের তথাকথিত শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের বিকৃত মানসিকতার ছবি এঁকেছেন ও বলেছেন যে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরেই দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করে। এইভাবে মুনসীজীর নাটক আধুনিক ভাবনায় দীপ্ত হয়েছে যদিও চিরন্তন আর্দশের মহিমাও তিনি গ্রহণ করেছেন সুন্দর ভাবে।

চন্দ্রবদন চিমনলাল মেহতা (১৯০১ - ১৯৯১) আধুনিক গুজরাতী নাটকের বিশিষ্টতম পুরুষ। তিনি ১৯২০ থেকে গুজরাতী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি গুজরাতী অপেশাদারী মঞ্চের আবপ্তকর্তা, এবং অবিরল প্রয়াসের দ্বারা গুজরাতী ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের দোষত্রুটি দূর করে তাকে বাস্তব সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলেছেন। অভিনয় ও মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফল তাঁর নাটক। সর্ববিধ নাটক লিখলেও সামাজিক নাটকেই তিনি দক্ষ, মানজীবনের বিচিত্র জটিল সমস্যা সংকটের উপস্থাপন তাঁর নাটকে সার্থক দেখা যায়। ১৯৭১ এ তিনি অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান।

ত্রিশের সূচনাতেই লেখা 'আগ গাড়ী' (রেলগাড়ী) গুজরাতী ভাষার প্রথম যথার্থবাদী নাটক যা অভিনেয়তার গুণে সমৃদ্ধ। গুজরাতী নাটকে এই প্রথম নিম্নস্তরের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ পূর্ণরূপ বা মূল্য নিয়ে এল। ব্রিটিশ শাসনে রেলবিভাগের অন্যায় অত্যাচার লেখক স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে। তখন রেলওয়েতে সাদা চামড়ার লোকেরা কালো চামড়া ভারতবাসীদের অবহেলা অপমান ঘৃণা করত। ব্রিটিশ অফিসাররা নির্মম অত্যাচার করত নিগার ইন্ডিয়ানদের ওপর, এছাড়া ছিল বর্ণানুযায়ী বেতন বৈষম্য — একই কাজ করে সাদা মানুষ কালোর থেকে বেশী মাইনে পেত; অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন এর অভাবিত উন্মাদনা ও অভূতপূর্ব শক্তিলাভ, — নাটকে দুয়েরই ছবি আছে। নাটকের নায়ক গরীব ফায়ারম্যান বাধরজী একদিনেই যার জীবন ও সংসার তছনছ হয়ে যায়। বার ঘন্টা ডিউটির পর ক্লান্ত শ্রান্ত বাধরজী ঘরে আসা মাত্র হুকুম এল যে লাট সাহেবের স্পেশাল ট্রেনের সঙ্গে তাকে যেতে হবে। তার স্ত্রী রূখী ও বন্ধুদের নিষেধ সত্ত্বেও সে যায় কারণ না গেলে তার চাকরী থাকবে না। তার সঙ্গে ড্রাইভার হল জোনস — মদ্যপ বদমায়েশ চরিত্রহীন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান জোনস অন্য কাউকে বিশেষত ভারতীয়দের সহ্য করতে পারে না। পুরোনো শত্রুতার কারণে জোনস অসহায় বাধরজীকে খুন করে। ঐ সময় গাড়ির সিগন্যাল দিতে আসা বাধজীর ছেলে নারাণজীকে সাপে কাটে। এবং ঐ গাড়িতে বাধরজীর গরু কাটা পড়ে। এই নাটক বিষাদের কালো ছায়ার ঢাকা। নাটকে পদদলিত লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি লেখকের সুগভীর সহানুভূতি আছে। ব্রিটিশের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ আছে, এবং উজ্জ্বল চিত্রণ আছে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী মানুষদের যারা জনগণকে জাগায় এবং যাদের ভয়ে ব্রিটিশ শাসক তটস্থ থাকে কারণ তারা লাটসাহেবের গাড়ী উড়িয়ে দিতে পারে।

. চন্দ্রবদন মেহতার 'অখো' (১৯২৭) গুজরাতীতে প্রথম সার্থক জীবনী নাটক। দুঅংকের এই নাটকে গুজরাতের বেদান্তী কবি অখো-র মহৎ জীবনচিত্র অঙ্কিত। তাঁর দ্বিতীয় জীবনী নাটক 'নর্মদ' (১৯৩৭) কবি নর্মদের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সামাজিক জীবনের ছবি। বীর নর্মদ প্রাচীনতা স্থবিরতার বিনাশ চান, সঙ্গে

সঙ্গে চান নবীনতার প্রতিষ্ঠা। প্রগতিশীল ভাবনার জন্য নর্মদ সারাজীবন বিভিন্ন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেছেন। গুজরাত গণনাট্য সংঘ দেশের বিভিন্ন স্থানে এই নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। 'নাগা বাবা' (১৯৩৭) ভিখারীদের জীবন নিয়ে লেখা। 'শিখরিনী' তে (১৯৪৭) সন্তানহীন দম্পতি ধবল ও শিখরিনীর বেদনা যন্ত্রণা চিত্রিত। 'পাঁজরাপোল' (১৯৪৭) প্রহসনে বিবাহ সমস্যার বিষয় আলোচিত — বিবাহিত-অবিবাহিত সধবা-বিধবা বিভিন্ন ধরনের প্রেমিকরা পাঁজরাপোল তৈরী করেছে তাদের বাসস্থানকে।

চন্দ্রবদন মেহতার 'সীতা' (১৯৪৩) উচ্চমানের নাটক যাতে সীতার কারুণ্যমূর্তি প্রকাশিত। এই ছোট দুই অংকের নাটকে আছে রামায়ণের উত্তরকান্ডের কথা যেখানে রাম সীতাকে পরিত্যাগ করেছে ও সীতা বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে। শেষে অশ্বমেধ যজ্ঞের পর বিহ্বল রামের কাছে সীতার আগমন ঘটে ও রাজধর্মের নিয়মানুসারে রাম সীতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ভগ্নহৃদয় সীতা মাতা ধরিত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে। রামের ব্যাকুল আর্তনাদ ভাসে, লবকুশ আকুল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। লেখকের প্রাণবান শৈলী, উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃজন, রঙ্গমঞ্চীয় কুশলতা ও বিন্যাস নাটকটিকে সাহিত্য হিসাবে সুন্দর ও অভিনেয় রূপে আকর্ষণীয় করেছে।

চন্দ্রবদন রঙ্গমঞ্চ ও কলাসাধনা বিষয়ে দুটি নাটক লিখেছেন যা গুজরাতী সাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে আছে। 'ধরা গুর্জরী' (১৯৪৪) নাটকের প্রধান বিষয় রঙ্গমঞ্চর পুনরুদ্ধার ও নতুন রঙ্গমঞ্চের নির্মাণ। এর নায়ক ওঝা গুর্জর যে রঙ্গমঞ্চের উন্নয়নের জন্য সব দিয়েছে। তার প্রেরণা হল ধরা। নাট্যকার বলেছেন যে শিল্পীদের অনন্য সাধনা ও প্রবল নিষ্ঠা না থাকলে শিল্পকলার বিকাশ সম্ভব নয়। 'আরাধনা' (১৯৪৮) নাটকে কলাসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত।

'মাঝম রাত' (১৯৫৫) নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট ও তা থেকে পরিত্রাণের পথ বলা হয়েছে। সুধন্বা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। তার মেয়ে সন্ধ্যা দরিদ্র সঞ্জয়কে চায়। তার ছেলে ললিতের বিয়ে হবে বড়লোকের মেয়ে মন্দার সঙ্গে যার বাবা ললিতাকে ঘর জামাই করতে চায়। স্ত্রী কুন্দনের অত্যধিক ফ্যাসান ও অলংকার প্রিয়তার জন্য আর্থিক সংকটে পড়া সুধন্বা তার বাড়ি মন্দার বাবাকে বেচে দেয়। এমন সময় তার গ্রামবাসী ছোট ভাই বিনায়ক আসে যে তার বৌদিকে অনাবশ্যক খরচের জন্য তিরস্কার করে, মন্দার দম্ভকেও নিন্দা করে। তার বুদ্ধিতে ললিত ঘরজামাই হওয়া থেকে বাঁচে এবং সুধন্বার গোটা পরিবার সুখশান্তিতে জীবন কাটাতে গ্রামে আসে। 'সোনা বাটকডী' (১৯৫৫) নাটকে ব্যবসায়িক নাটক গোষ্ঠীর মালিকের ক্রূর স্বার্থপরতা ও বিকৃত মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। 'হোহোলিকা' (১৯৫৭) গুজরাতী 'লোক ভবাই' এর আধুনিক সংস্করণ। এর শৈলী-শিল্প ভবাই 'বেশ' এর অনুসরণ। ভবাই-এর বিশিষ্ট লক্ষণ সমূহ এতে বিদ্যমান — সুদৃঢ় বিষয়বস্তুর অভাব, সমকালীন সমাজ জীবনের বিবিধ প্রসঙ্গে উপস্থাপনা, হাস্যরসের প্রাবল্য প্রভৃতি। প্রস্তাবনায় নাটকের আরম্ভ। তারপর নৃত্য গীত সংগীত সংলাপ এবং অভিনয়রীতির মনোমুগ্ধকর সামঞ্জস্যে নাটক চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌছয়। এটা বেশ আকর্ষণীয় প্রযোজনা হয়।

কৃষ্ণলাল শ্রীধরাণী (১৯১১-১৯৬০) সাংবাদিক কবি নাট্যকার রূপে বিশিষ্ট। বিভিন্ন গ্রন্থ লিখেছেন। মেবারের মহারানী পদ্মিনী ও আলাউদ্দীন খিলজীর ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে নাটক লিখেছেন 'পদ্মিনী' (১৯৩৪)। 'মোরনা ইন্ডা' (১৯৩৪ ময়ূরের ডিম) বিষয়

নিরূপণ, চরিত্রাংকন এবং বিচার ও তাত্ত্বিকতার দৃষ্টিতে ইবসেন ও অসকার ওয়াইল্ডের সমস্যা নাটকের ধারায় নির্মিত। এর প্রধান চরিত্র ডঃ অভিজিৎ আধুনিক জ্ঞানচেতনায় সমৃদ্ধ। সে আশ্রমের জিজ্ঞাসু ছাত্রদের কাছে রসশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র ধর্ম তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করে। অন্যদিকে তীরথ আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সে যেন প্রকৃতি দেবীর সন্তান, সে নৈসর্গিক জীবনের উপাসক। দুয়ের দ্বন্দ্ব নাটকে আছে।

গুজরাতীতে প্রতীক নাটকের সূচনা শ্রীধরাণীর 'বডলী' নাটক থেকে। ১৯৩১ সালে নাসিক জেলে এটি রচিত হয়। এটি দীর্ঘ একাংক কাব্যনাটক এবং 'লোক ভবাই'-এর লক্ষণ এতে আছে। এতে মুর্গী কোকিল তোতা ময়না কাক ময়ূর হাঁস পাখী ইত্যাদি নাটকের চরিত্র হিসাবে এসেছে। তার সঙ্গে কিরণ তারা চন্দ্র বাদল সমীর ইত্যাদির মানবীকরণ হয়েছে ও সবাই কথা বলেছে। গোয়ালা গোয়ালিনী ছোট বাচ্চা মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। বরগদ বা বটগাছ এদের সংরক্ষণ সংবর্ধন করে পিতামহের মত। নীচে জন্মানো ভেন্ডী তার মহত্ত্বকে ঈর্ষ্যা করে। কিন্তু অন্য সবাই তাকে সম্মান শ্রদ্ধা করে। এক প্রচণ্ড ঝড়ে বটগাছ উপড়ে পড়ে। তাতে ভেন্ডী হাসে কিন্তু সবাই কাঁদে। বৈতালিকের বিহ্বল বেদনার বাণী ঝঙ্কৃত হয়। শ্রীধরণীর 'বীজলী' (১৯৪৬) প্রতীকাত্মক নাটক যাতে বিজলি মেঘ ইত্যাদির সাহায্যে কবি ও তাঁর কৃতিত্বকে ব্যক্ত করা হয়েছে।

সুবিখ্যাত উপন্যাসকার **রমনলাল বসন্তলাল দেশাই** এর 'শংকিত হৃদয়' (১৯২৫) মূলতঃ বঙ্গমঞ্চের জন্য লেখা। চিদঘন চন্দ্রিকাকে বিয়ে করতে চায় না কারণ সে কুঞ্জের পত্নী বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট। এতে চন্দ্রিকা 'শংকিত হৃদয়'। কুঞ্জ ও চন্দ্রিকার সামনে চিদঘন বিলাসকে প্রেম নিবেদন করতে গেলে ক্রুদ্ধ কুঞ্জ বিলাসকে নদীতে ফেলে দেয়। দুঃখদগ্ধ চিদঘন সর্পদংশনে অন্ধ হয়ে যায়। চন্দ্রিকা গোপনরূপে তাকে সেবা করতে থাকে। শেষকালে চিদঘন তাকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে তার উদার মনকে; বিলাসের বিরহে ব্যথিত কুঞ্জ শেষ পর্যন্ত বিলাসকে খুঁজে পায়। মিলনে নাটকের শেষ হয়। নাটকটি গুজরাতী মঞ্চে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। 'গ্রামসেবা' (১৯৫৪) গ্রাম সেবা ও গ্রামোদ্ধারের ভাবনা নিয়ে লেখা। শহরবাসী ভরত ও সনাতন গাঁয়ে যায় সেবার জন্য। গাঁয়ের লোক তাদের ভালবাসায় শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে। এতে তারা নিজেদের জীবনের সার্থকতা অনুভব করে। গ্রামবাসীদের সরলতা ও সহৃদয়তার চিত্রও লেখক তুলে ধরেছেন।

উমাশংকর জোশী (১৯১১-১৯৮৮) আধুনিক কালের এক শ্রদ্ধেয় মানুষ যিনি কবিতা গল্প প্রবন্ধ নাটক সর্ববিষয়ে আপন প্রতিভার দীপ্ত পরিচয় রেখেছেন। তিনি সুপন্ডিত অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদও বটেন। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান 'নিশীথ' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ১৯৩২ এ বীজাপুর জেলে নাটক লিখতে শুরু করেন। একাংক নাটকের সফল রচয়িতা হিসাবে গুজরাতী সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর একাংক সংকলনদ্বয় হল — 'সাপনা ভারা' (এক ঝাঁক সাপ) ও 'শহীদ'। শকুন্তলা এবং উত্তররামচরিতের অনুবাদও করেছেন। পরীক্ষামূলক কাব্যনাটিকাও বেশ কিছু লিখেছেন। উমাশংকরের রচনায় তিনি গুজরাত তথা ভারতীয় জীবনের সহজ সাধারণ ছবি এঁকেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ সামাজিক সমস্যা ও মানবতার সংকট তথা বিশ্বচেতনার দ্বন্দ্ব তাঁর নাটকে পাওয়া যায়।

তার বিখ্যাত 'সাপনা ভারা' নাটকের দুনিয়া গুজরাতী গ্রাম্য জীবন। এতে গুজরাতী লোকভাষার সফল প্রয়োগ আছে। 'হবেলী' একাংক গ্রাম্য জীবনের চিত্র পাই। উড়নচন্ডী

ভবঘুরে কেশব রাজনীতি করে। সবাই তার ওপর বিরক্ত, বিশেষত তার সম্পর্কিত কাকা ভূধর। কেশবের দুঃখিনী মাকেও ভূধর অপমান করে। এমন সময় খবর আসে কেশব মন্ত্রী হয়েছে। গ্রামের লোকের মানসিকতা পাল্টে যায়, একেবারে যেন বদলে যায় ভূধর। কিন্তু কেশবের দুঃখিনী মা আগের মতই থাকে — তার উদাসীনতায় ঘা খেয়ে থমকে যায় ধূর্ত ভূধর। 'গুঞ্জ' শিশুভাবনের ওপর ভিত্তি করে লেখা। বাবা-মার সাহচর্য শিশুসন্তানরা পায় না। কিন্তু সেই শিশুরা বাবা-মার মত বড়দের মত আচরণ করে। নাটকে সমাজের ছবি অন্যদিকে শিশুমনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। মহাভারত ও পুরাণ কথাকে আশ্রয় করে উমাশংকর কিছু আসাধারণ কাব্যনাটক রচনা করেছেন তাদের মধ্যে বিশিষ্ট হল — 'গান্ধারী' 'কর্ণকৃষ্ণ' প্রভৃতি।

বটুভাই উমরবডিয়া (১৮৯৯ ১৯৫০) গুজরাতীতে একাংকরচনার অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি ইংরেজ নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একাংক রচনা করেন। ১৯২২ এ বটুভাই 'লোমহর্ষিণী' নামে গুজরাতীতে প্রথম লঘুনাটক লেখেন। তাঁর লঘুনাটকের প্রথম সংগ্রহ 'মৎসগন্ধা অণে গাঙ্গেয় অণে বীজা নাটকো' ১৯২৫ এ প্রকাশিত হয়। একে, প্রকৃত পক্ষে, প্রথম গুজরাতী একাংক সংগ্রহ বলা যায়।

বটুভাই এর দৃষ্টি প্রৌঢ় সাহিত্যকারের দৃষ্টি। তিনি মনে করেন নাটক ক্ষণিক আনন্দ দানের বিষয় নয়, স্থায়ী আবেগ ও গম্ভীর ভাবনার প্রকাশের বড় মাধ্যম। তবে তাঁর নাটকের অভিনয়োপযোগিতা কম। পাঁচ দৃশ্যে বিভক্ত একাংক 'হংসা' লেখকের জীবনবোধের, চরিত্রায়ণ দক্ষতা ও মনস্তাত্ত্বিক চেতনার পরিচয় বহন করে। স্থির শান্ত পবিত্র স্বভাব মেয়ে হংসা স্বামী নরেশকে গভীরভাবে ভালবাসলেও স্বামীর ভালবাসা সে পায় না। নরেশ তার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ যদিও অন্য মেয়েদের ওপর তার টান বেশি। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে হংসা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। সহসার নরেশের ডায়েরি চোখে পড়ে যাতে নরেশের অদ্ভুত মানসিকতার পরিচয় আছে -- সে হংসাকে গভীরভাবে ভালবাসলেও এক অদ্ভুত বাহ্যিক বিরক্তি ও ক্রোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে হংসাকে সে কথা বলতে গিয়ে। হংসা কি কোনদিন তার মন বুঝবে না? হংসা বোঝে স্বামীর মন, দুজনের মিলন হয়।

যশবন্ত পন্ড্যা (১৯০৬-১৯৫০) শিশুনাটক, লঘুনাটক বিশেষত একাংক রচনায় পারদর্শী। একাংকর তিনি অন্যাতম পথিকৃৎ। সহজ হালকা শৈলী ও সুগঠিত নাট্যরচনা তাঁর বৈশিষ্ট্য, এবং আন্তরিক জীবন বোধের পরিচয় তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। 'অ-সৌ-কুমারী' (অখন্ড সৌভাগ্যবতী কুমারী) অমিল বিবাহের সমস্যা নিয়ে লেখা। লেখক বলেছেন যে বিবাহিত জীবনে অমিল কেবল আয়ু বা শরীরকে নয়, মন ও আত্মাকেও পীড়িত করে। যশবন্ত পন্ড্যার অপর নাটক 'পড়দা পাছল'ও (পরদার পেছনে) সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা। 'ত্রিবেণী' ও 'ঘরদীবডি' (ঘরের দীপ) ছেলেদের বিখ্যাত নাটক। 'মদনমন্দির' এবং 'শরত না ঘোড়া' (১৯৪৩) বিশিষ্ট একাংক সংগ্রহ।

কর্ষনদাস মানেক ছিলেন কবি গল্পলেখক পত্রকার নাট্যকার। 'আলবেল' তার বিখ্যাত কবিতা সংকলন। 'মালিনী' ও 'সিন্ধুনী প্রেম কথা' গল্প সংকলন। 'খুদা হাফিজ' বিখ্যাত একাংক গ্রন্থ। কৌতুক ও হাস্যব্যঙ্গ তাঁর রচনায় আছে। তার সঙ্গে আছে সমাজ-সচেতনতা। 'খুদা হাফিজ' তিন দৃশ্যের ব্যঙ্গাত্মক নাটিকা। শীলার সঙ্গে বিখ্যাত লেখক বিভাবসুর বিবাহ স্থির। ভাবী লেখক স্বামীকে চমকে দিতে শীলা এক পত্রিকা আয়োজিত গল্প প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় মধুবালা মেহতা ছদ্মনামে। বিভাবসুও ঐ প্রতিযোগিতায়

বিচারকদের অভিনন্দন জানিয়ে গল্প পাঠায়। কিন্তু পুরস্কার পায় শীলা, বিভাবসুর স্থান অনেক নীচে। বিভাবসু এবার বিচারকদের নিন্দা করে ও বলে যে মধুবালা মেয়ে বলেই পুরস্কাব পেয়েছে। তাকে সব কথা জানানো হলে বিভাবসু চুপ করে যায়। শীলা লেখক বিভাবসুর সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ক্রুদ্ধ হয় ও তাকে বিদায় দেয়। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, পুরুষের অহংবোধ ও নীচতা এবং শেষ পর্যন্ত নারীর চেতনার জাগরণ — এই নাটকে পাওয়া যায়।

গুজরাতী রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিচারধাবার নাটকে আধুনিকতার মূল্য ও মহিমা পাওযা যায়। **পুরুষোত্তমদাস বিক্রমদাস** রচিত 'ন্যায়' (১৯৩১) নাটকে ইংরেজশাসনের ন্যায়ের স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। এঁর 'সালিয়া পাছল' (গরাদের পেছনে অর্থাৎ জেলে, ১৯৩৬) গান্ধীবাদী আন্দোলনেব পটভূমিকায গ্রাম জীবনের ছবি।

গুজরাতেব বিশিষ্ট মানুষ **ইন্দুলাল যাজ্ঞিক** (১৮৯২-১৯৭২) রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্‌ঘাটনে দক্ষ। তাঁর 'রণ সংগ্রাম' (১৯৩৮) এ রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকটকেও তুলে ধরা হয়েছে। 'শোভারামণী সর্দারী' (১৯৩৮) নাটকও আর্থিক শোষণেব চিত্র — সুরত নবসারী জেলার ক্ষেত মজুরদের দারিদ্র ও অসহায়তায় নগ্ন ছবি ফুটেছে, কংগ্রেস শাসননীতির তীব্র সমালোচনাও আছে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রাষ্ট্রীয় চেতনার প্রকাশ **জুগতরাম ভাই দভে** রচিত 'প্রহ্লাদ' যে নাটকে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সিদ্ধান্তর তাত্ত্বিক আলোচনা আছে। প্রহ্লাদ চরিত্রের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ প্রয়োজনীযতা, অনিবার্যতা ও সফলতার নিরূপণ করা হয়েছে। নাটকটি মঞ্চেও বিশেষ সফল হয়।

রশ্মি পঞ্চোলীর 'ভারত ছোড়ো' নাটকে বিয়াল্লিশের উত্তাল সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইংরেজ-এর অত্যাচার, ভারতীয়দের প্রতিরোধ, জনতার জাগবণ, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম আত্মত্যাগ প্রভৃতি ভাবনাও মূর্ত হয়েছে। নাটকে এক চরিত্র প্রকাশ সমাজবাদী, শ্যাম সাম্যবাদী, ইংরেজ ফৌজের অফিসার, কংগ্রেসী নেতা গুলাব— এদের মাধ্যমে যুগচিত্র ধরা পরেছে।

অস্পৃশ্যতার সমস্যা নিয়ে **মশালচী** দুটো নাটক লিখেছেন -- "ঢেচনু কোই ধনী ন থী" (মেথরের কেউ মালিক নেই) এবং 'ভুলায়েলা মাড়ু' (ভুলে যাওয়া লোক)। ১৯৩৪ এ প্রকাশিত নাটক দুটিতে হরিজনদের দুরবস্থা ও তাদের উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে।

বাবুভাই বৈদ্য-র 'এ আবাজো' সৌরাষ্ট্র কলা কেন্দ্রের রঙ্গমঞ্চীয় প্রয়োগের জন্য লেখা। মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী, হরিজন যুবক যুবতী, জনসেবকদের চরিত্র এতে আছে। ভাঙ্গীদের হরতাল নাটকের বিষয়। নাটকে দেখানো হয়েছে কিভাবে তথাকথিত দেশসেবকরা আপন স্বার্থপূরণার্থে হরিজনদের নাচায়, আবার মৌকামত তাদের ধোকা দেয়। কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে হরিজনদের জাগরণ হচ্ছে, তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। প্রজাতন্ত্রে সর্বেসর্বা তারাই আপন ভাগ্য স্থির করবে — এই যুগসত্যকে নাট্যকাব তুলে ধরেছেন।

রসিকলাল ছোটালাল পারিখ (১৮৯৭-১৯৮২) পন্ডিত সাহিত্যিক এবং ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ববিদ্। গান্ধীজীর ভাবনায় দীক্ষিত। নাট্যশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারীও তিনি। রসিকলাল পারিখ এর 'মৈনা গুর্জরী' আধুনিক কালের গুজরাতী নাটকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। প্রাচীন গরবা ও ভবাই রীতিতে বিন্যস্ত এক অসাধারণ লোককাহিনীকে পঞ্চদৃশ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। ১৯৩২ এ প্রথম অভিনীত হয়। তবে ১৯৫২ তে গুজরাত বিদ্যা

সভার নটমন্ডল কর্তৃক এর অভিনয় বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ভবাই রীতিতে সঙ্গীত-নৃত্য-কথন-অভিনয়ের মাধ্যমে রূপায়িত এই নাটক বিপুল অভিনন্দন পায়। নাটকের কাহিনী চমৎকার। দিল্লীর বাদশাহ ছাউনী ফেলেছে, সবাই দেখতে আসবে। প্রাণোচ্ছল যৌবনতী গুজরী মেয়েরাও যাবে সেই অবাক কান্ড দেখতে মাথায় দৈ এর হাঁড়ি নিয়ে মোগলরা তাদের সতীত্ব নেবে? না। প্রত্যেক মেয়ের কাছে থাকবে ছুরি ও বিষভরা ডিবে--সতীর কৌটো। সবাই যায় কিন্তু ময়নার মন ভারী কেননা আসার সময় শ্বাশুড়ী খুব বকেছে আর সে বিষ ও ছুরি আনতে ভুলেছে। ময়না একা আমগাছের তলায় বসে। এমন সময় শাহজাদা আসে ও ময়নাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে খেতে বলে। ময়না প্রবলক্রোধে বলে — 'কি তু ন জানিয়ো অকেলী মেবে গুজর চডে নও লাখ বে'। — একা আমি নইরে রাজা, সঙ্গে আমার ন লাখ ভাই এবং সে শাহজাদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শাহজাদা তাকে ধরে ছাউনীতে নিয়ে আসে। কিন্তু ময়নাকে অপমান করে সাধ্য কি তার! এক দৈবশক্তি ময়নার উপর ভর করে — তার সারা অঙ্গে এক জ্যোতি। শাহজাদা ভীত চমকিত। এদিকে নলাখ গুর্জর সেনা শত্রুদের আক্রমণ করে ময়নাকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু তাকে কি গ্রহণ করবে সমাজ! তার শ্বাশুড়ীও ময়নাকে কলংকিনী মনে করে। ময়না আবার উদ্ভাসিত হয় দিব্য মহিমায়, সবাই তার ক্ষমা চায়। সে মহাশক্তি রূপে দাঁড়িয়ে থাকে, তার পেছনে অন্য মেয়েরা খঞ্জর হাতে যোগিনীর মত দাঁড়ায়। ময়নার ভূমিকায় দীনা পাঠকের অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রাণসুখ নায়কের অভিনয়ও চমৎকার হয়েছিল। রসিকলালের আর এক নাটক 'শর্বিলক' সংস্কৃত নাটকের উপর ভিত্তি করে লেখা। মনে হয় যেন প্রচলিত নীতি নিয়ম ব্যবস্থা বা এসটাব্লিসমেন্টের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নাটকটি লেখা।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব

উত্তর স্বাধীনতা পর্বের গুজরাতী নাটকে সমাজের রূপায়ণ তীব্র হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা মানুষের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে পারেনি। সমাজের সর্বস্তরে অন্যায় দুর্নীতি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। ভ্রষ্ট নীতিহীন অপদার্থ শাসকগোষ্ঠী প্রত্যাশিত সুখশান্তির আনয়নে ব্যর্থ হয়েছে। দুঃখ দারিদ্র অভাব অভিযোগ আঘাত যন্ত্রণা মানুষের অস্তিত্ব সংকটপূর্ণ করে তুলেছে, প্রাত্যহিক জীবনচর্যা হয়েছে অভিশপ্ত। সার্বিক সংকট, অর্থনৈতিক সামাজিক দুরবস্থা, মূল্যবোধের বিনাশ স্বাধীনতা পরবর্তী গুজরাতী নাটকে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। Lack of visible signs of progress, continuing poverty and misery, repeated failure of crops, the slow fading away of national ardour and the triumph of the mercenary and mendacious in public life caused a colossal frustration which began to corrode the whole fabric of life from within and soon it began to show signs of fast overtaking disintegration.[৯]

কবিতা ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত নাট্যকাররা এ বিষয়ে অবহিত। Like their contemporary poets, the dramatists also continued to parade their sorrow.[10]

রক্তমেঘের মধ্যে উদিত স্বাধীনতার সূর্য সেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় কিরণ দেয়নি যা ছিল কাম্য। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, প্রত্যাশা পূর্ণ না হবার ক্ষোভ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল। যে নাট্যকাররা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন তাদের কলম এখন নতুন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। দীনা গান্ধীর 'তালাবন্দী লোক ভবাই' এর (১৯৪৯)

প্রতিপাদ্য বিষয় হল কাপড় ও তৈজস পত্রের কালোবাজার, কিউপ্রথা, মূল্যবৃদ্ধি, গৃহসমস্যা, বাক স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ, হরতাল ইত্যাদি। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক 'আক্কলনা দুশমন'-এ (বুদ্ধির শত্রু, খুব বোকা) সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ও আশাভঙ্গের বেদনার ছবি এঁকে বলেছেন যে শাসনকর্তাদের অপদার্থতা ও বুদ্ধিহীনতা এর জন্য দায়ী। যশবন্ত ঠাকুর-এর 'জনতা জাগে ছে' (১৯৫৩) জনতার জাগরণ ও পঞ্চায়েতী রাজ্যস্থাপনের কথা। এই রাজনৈতিক নাটকে আকাল, কৃষক জমিদার দ্বন্দ্ব ও কৃষক জীবনের সংকট, সাম্যবাদী আদর্শের কথা বলা হয়েছে।

জয়ন্তী দলাল (১৯০৯-১৯৭০) স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন ও দেশকর্মীরূপে বিশিষ্ট হন। উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ লিখেছেন, অনুবাদও করেছেন। একাংক রচনায় বিশেষ দক্ষ ও বিশিষ্ট একাংকীকার রূপে পরিগণিত হয়ে আছেন। যথার্থ জীবন ও তার বিবিধ সমস্যার সূক্ষ্ম উপলব্ধি ও তার শিল্পময় অভিব্যক্তি জয়ন্তী দলালের নাটকের বিশেষত্ব। উমাশংকর যোশী গ্রাম জীবনের পটভূমিকায় নাটক লিখেছেন, জয়ন্তী দলালের চিত্রিত জীবন শহরের, এবং ব্যঙ্গ বক্রোক্তি পরিহাসের দ্বারা সামাজিক জীবনের সত্যকে প্রকাশ করেছেন। করুণরস সৃজনেও তিনি দক্ষ। তাঁর প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থ 'যবনিকা' (১৯৪১) 'অবতরণ' (১৯৪৯), 'প্রবেশ বীজো' (১৯৫০), 'ত্রিজোপ্রবেশ' (১৯৫৩), 'চৌথী প্রবেশ' ইত্যাদি।

দুঅংকের নাটক 'অবতরণ' এ আজকের যুগের আর্থিক ও সামাজিক বিষমতার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এই সংসারে মানবতার মূল্য কমে যাচ্ছে। জীবন হচ্ছে কুৎসিত বিকৃত। জগত এত ভয়াবহ হয়েছে যে মাতৃগর্ভস্থ সন্তানও এখানে জন্ম নিতে অস্বীকার করে। 'সোই নু নাকু' (ছুচের ডগা) একাংক দেখানো হয়েছে অর্থবান ব্যবসায়ীরা ন্যায় নীতি ধর্ম মানবতাকে বিসর্জন দিয়ে অর্থসংগ্রহ করে, জগতে তারা খ্যাতি পায়। কিন্তু শেষ বিচারে তাদের সত্য স্বরূপ ধরা পড়ে। শিল্পপতি শেঠ নন্দনন্দন মারা গেছে, শোকসভায় বলা হচ্ছে তিনি দানবীর সংগ্রামী আদর্শবাদী। কিন্তু চিত্রগুপ্তর দরবারে শোষিত নিপীড়িত মানুষ ও অসহায় নারী নন্দনন্দনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে ও তার যথার্থ পরিচয় উন্মোচিত হয়।

গুলাবদাস ব্রোকার অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ১৯৩০-৩২-এ এবং ১৬ মাস জেল খাটেন। প্রায় দুডজন বই লিখেছেন যার মধ্যে আছে এগারটি গল্প সংগ্রহ, অনেকগুলি একাংক ও পূর্ণাঙ্গ, কবিতা, প্রবন্ধ সংগ্রহ ইত্যাদি। 'একাংকী' নামে একটি নাটকের পত্রিকা ও নাট্যত্রৈমাসিক 'গুজরাতী নাট্য' সম্পাদনা করেছেন। সমাজ সচেতনতা, জীবনানুরাগ ও মানবসত্তার উন্মীলন তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য। নিটোল আঙ্গিক ও ভাষারীতির তীক্ষ্ণতা তার বক্তব্যকে মর্মশশী করে।

'ধূম্রসের' (৫ । কুন্ডলী ১ .৮) এগার দৃশ্যে বিন্যস্ত পূর্ণাঙ্গ নাটক তার ঐ নামের ছোট গল্পের ওপর ভিত্তি করে লেখা। ধনসুখলাল মেহতার সহযোগিতায় এটি লেখেন। বাংলাদেশের পটভূমিকায় এটি রচিত। 'মননা ভূত' (মনের ভূত ১৯৬৮)মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও জটিলতা নিয়ে লেখা তিন অংকের নাটক। ইবসেনের 'গোস্টস' অনুবাদ করেন 'ভূতওয়াল' নামে। তাঁর একাংক সংকলন গ্রন্থ 'জ্বলন্ত অগ্নি' গুজরাতী একাংকর ইতিহাসে গৌরবময় সংকলন। 'ব্রোকারণা প্রতিনিধি একাংকীয়ো' তাঁর প্রতিনিস্থানীয় একাংকর সংকলন। 'গুজরাতীনা একাংকী' নাম গুজরাতী একাংক সংকলনের ভূমিকায় গুজরাতী একাংকর বৈশিষ্ট্য, তার ইতিহাস, মূল্যায়ন নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

'ইতিহাসের এক পাতা' একাংকে জাতীয়তাবাদেব মহৎ প্রকাশ। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বন্দী বিপ্লবী যুবক বসন্তকে পুলিস জেরা করছে, ভয় দেখাচ্ছে, তাকে প্রলুব্ধ করছে বিপ্লবীদের গোপন খবব জানতে। কিন্তু দেশমাতৃকার বেদিমূলে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বসন্তর কাছে ক্ষুদ্র লোভলালসা ভয় মিথ্যা। পুলিশ নিয়ে আসে বসন্তর হৃদয়ের সম্পদ প্রেয়সী সরলাকে এবং বলে যে বসন্ত স্বীকারোক্তি না দিলে তার ফাঁসী হবে। উদ্বিগ্ন ব্যাকুল সরলা কান্নাভারা কণ্ঠে বসন্তকে অনুরোধ করে সব বলতে। কিন্তু বসন্তর মধ্যে জেগে ওঠে আগুন জ্বলা মন — বিপ্লব দয়িতার একি পরিচয়! সে বলে — 'আমি একে চিনি না। এ জাল। এই নামের আর এক নারীকে আমি চিনি। তাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি, তাব জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। এ সে নয়, সে অন্য মেয়ে, একেবারে আলাদা। কিন্তু সে তো .... সে তো আর ..... নেই (গলাবুজে আসে), সে মরে গেছে'। গুলাবদাসের 'মা' একাংক মাতৃহৃদয়ের ক্রোধ ক্ষোভ প্রকাশিত। অভিজাত রমণী রাজবাই অল্পবয়সে স্বামীকে হারিয়ে পুত্রকে প্রাণ দিয়ে বড় করে, তার বিবাহ দেয়। কিন্তু পুত্র মায়ের মহিমাকে অস্বীকার করতে চাইলে মাকে ছোট করতে চাইলে তেজস্বিনী মা তার প্রাণের থেকেও প্রিয় পুত্রকে নির্মম ভাবে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করে।

চুনীলাল মডিয়া (১৯২২-১৯৬৮) সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ছাত্রকাল থেকেই। অজস্র গল্প কবিতা উপন্যাস লিখেছেন। 'শূন্য শেষ' 'হুঁ নে মারী বহু' (আমি ও আমার বৌ) প্রভৃতি তিনটি পূর্ণাঙ্গ লিখেছেন। তাঁর একাংক সংকলন হল — 'রক্ততিলক', 'রঙ্গদা', বিষবিমোচন'। উমাশংকর যোশীর নাটকে উত্তর গুজরাতের মানুষদের জীবন আঁকা হয়েছে ঐ অঞ্চলের লোকভাষার মাধ্যমে। চুনীলালের পটভূমি পরিবেশ সৌরাষ্ট্র। তিনি সৌরঠী বা সৌরাষ্ট্র ভাষায় লিখিত নাটকে সৌরাষ্ট্র প্রদেশের মানবজীবনকে চিত্রিত করেছেন — এদের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনা রংবেরং ভাবনা লোক সবই বিধৃত হয়েছে। অবশ্য মহৎ ও ব্যাপক জীবনও তাঁর নাটকে এসেছে। কল্পিত ঐতিহাসিক নাটক 'সম্রাট শ্রেণিক' এ একদিকে ঘটনার ঘনঘটা গভীর তীব্র বিসর্পিলতা অন্যদিকে মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বিস্ময় উন্মোচিত। সামাজিক জীবরের চিত্র ফুটেছে 'গটু না মা' তে।

প্রবীন নাট্যকাররা লিখে চলেছেন আজও। **'দর্শক'** (মনুভাই পঞ্চোলি) মূলত ঔপন্যাসিক। 'ইউলিসিস' উপন্যাস লিখে একাডেমী পুরস্কার পান। নাটক লিখেছেন অনেক। সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক রচনায় দক্ষ। 'পরিত্রাণ' বিশিষ্ট পৌরাণিক নাটক।

প্রাগজী যমনাদাস ডোসা একজন সফল ও অতি জনপ্রিয় নাট্যকার। তিনি পূর্ণাঙ্গ একাংক বেতার সব ধরনের নাটক লিখেছেন, এবং পেশাদার অপেশাদার ক্ষেত্র সর্বত্রই খ্যাতি অর্জন করেছেন। সহজভাবে জীবনের ছবি আঁকতে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। তিনি 'গুজরাতী নাট্য'র সম্পাদনা করেছেন এবং 'গুজরাতী নাট্য মন্ডল'-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেক নাটক লিখেছেন যাদের মধ্যে উল্লেখ্য 'সমাজনাম বাহেন' (সমাজের গতি, ১৯৫০), 'ঘরানো দিভো' (ঘরের দীপ), 'মঙ্গলমন্দির' (১৯৫৫), 'ছোরু কাছোরু' (যোগ্য অযোগ্য সন্তান ১৯৫৫), 'সহকার্না দীভা' (সহযোগিতার দীপ ১৯৫৮), 'মনামী মায়া অণে জেভি চুম তেভি' (১৯৬০)। বিভিন্ন একাংক সংকলন হল 'পুস্পকুঞ্জ' (১৯৩৪) 'চরণ রজ' (পায়ের ধুলো, ১৯৪৪)। ছোরু কাছোরু, যা বিপথে চলে যাওয়া এক ছেলেকে নিয়ে লেখা নাটক, রাশিয়াতে অভিনীত হয়।

প্রবোধ জোশী (১৯২৮) অন্তত কুড়িটি পূর্ণাঙ্গ ও পাঁচশতাধিক একাংক নাটক লিখেছেন। নাট্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অপরিসীম, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ রসিকজনের চিত্ত অনায়াসেই জয় করেছেন তিনি। তার নাটকগুলো শতবার নয়, সহস্রবার

অভিনীত হয়েছে। 'কদম মিলাকে চলো', 'মাফ করজো আ নাটক নহি থায়' প্রভৃতি বহুল অভিনীত নাটক। সহজ জীবন চেতনা, সুস্থ পরিচ্ছন্ন মানসিকতা, কল্যাণময় আদর্শবোধ তাঁর নাটককে এত আকর্ষনিয় করেছে। 'পত্তানী জোড়' (১৯৫৫) নাটকটি গুজরাতী ভাষায় জনপ্রিয়তম নাটক। সহজ সুরেব সেন্টিমেন্টাল এই নাটকটি অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে। পরিবারের বৃদ্ধ কর্তাকে নিয়ে নাটক যাকে সবাই অবহেলা অবজ্ঞা করে, ছেলে ছেলের বউ সবাই। কিন্তু পরিবারে যখন চরম বিপর্যয় আসে সে ই পরিবারকে রক্ষা করে। এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়। 'আজ এ নাটক নহি থায়' অনেক দিন আগের লেখা। নাটকের আয়োজন চলছে এমন সময় এক চরিত্র বলে যে এ নাটক হবে না কারণ এটা জীবনের নাটক নয়। কবতে হবে জীবনেব নাটক মানুষের নাটক। জীবন ও শিল্পের একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা নাটকে আছে।

'তিন বন্দব' (তিনটি বাঁদব) একাংক প্রতিযোগীদের অতি প্রিয় নাটক। এক হস্টেল ঘবে একটা খুন হয়েছে। সেখানে তিনজন ছেলে-মেয়ে থাকে নয়না (সে দেখতে পায় না) . শ্রবণ (শুনতে পায় না), সুভাষ (কথা বলতে পারে না)। কিন্তু তারা খুনটা বুঝতে পেরেছে। খুন হয়েছে গোবিন্দ, খুন করেছে অতুল। এরা তিন জনে সমবেত প্রয়াসে পরস্পরের সহযোগিতায় হত্যাকারীকে ধরল। মহাজনদের কথায যে তিন বাঁদরের কথাবলা হয়েছে তারই আদর্শময় রূপায়ণ এই নাটক। ১৯৬৭ তে ভারতীয় বিদ্যাভবনে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। আজ পর্যন্ত এই নাটক বিভিন্ন ভাষায় সগৌরবে অভিনয় হয়েছে। 'আম্বে আয়া মোর' (আম গাছে বোল এসেছে) সামাজিক নাটক। ফ্যাকটারি-মালিক গোপাল তার মেয়ে গীতার বিয়ে ঠিক করে রমনলালের বিদেশ প্রত্যাগত ছেলে অজিতের সঙ্গে, কারণ বিশেষত হল রমনলাল আফ্রিকায় অনেক টাকা করেছে ও সে টাকা গোপালের কারবারে লাগাতে পারে। অথচ গীতা বিয়ে করতে চায় আদর্শবাদী ও সমাজসেবক সুধীরকে। আর এক প্রেমিক জুটিও আসে। শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়।

শিবকুমার জোষী (১৯১৬-১৯৮৮) স্বাধীনতা পরবর্তী গুজরাতী নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর প্রতিভার দীপ্ত স্বাক্ষর আছে — আড়াই শতাধিক গল্প, কুড়িটি উপন্যাস, প্রায় তিরিশটি পূর্ণাঙ্গ ও পঞ্চাশটি একাংক তার সৃজনক্ষমতার পরিচয় বহন করে। নাট্যগুরু জয়শংকর সুন্দরীর কাছে তিনি অভিনয় শিক্ষা করেছেন। নাট্যপরিচালক রূপেও তিনি খ্যাতিমান। শিবকুমার কলকাতায় থাকতেন, বাঙ্গালী মানসিকতার সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ, তিনি জাতীয় চেতনার ও ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতিরূপ। তিনি সমাজকে তাঁর নাটকের উপজীব্য করেছেন, সামাজিক মানুষের জীবনচিত্রণে তার অপরিসীম দক্ষতা। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের সামাজিক অর্থনৈতিক সংকট তাঁর নাটকে এসেছে। ক্লান্ত বিষন্ন মানবতার আর্তনাদ তাঁর নাটকে শোনা গেলেও এক প্রসন্নতা ও মাধুর্যের পরিমন্ডল সৃজনেই তাঁর মনের আকুলতা বেশী। শিবকুমারভাই মূলত মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের রূপকার — 'শহর মে রহনেবালে মধ্যমবর্গ কে স্ত্রী-পুরুষ কী আশা আকাঙ্খা, সংযোগ, দ্বন্দ্ব আদি শিবকুমার জোশী কী রচনায়ো কে কথানক কী বিষয়বস্তু হোতে হ্যয় ঔর উনহে উয়ে বড়ী গহরাই তথা ইমানদারী সে প্রস্তুত করতে হ্যয়'[১১]। জীবনের অস্থিরতা উত্তেজনা জ্বালা যন্ত্রণা দাহ-র মধ্যে শিবকুমার অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজছেন, অন্বেষণ করেছেন বেঁচে থাকার সার্থকতা। এবং অবক্ষয় ভাঙনের মধ্যেই তিনি জীবনের শেষ দেখেননি — একটা কল্যাণ ভাবনা পূর্ণতার বাণী পূর্ণতার মন্ত্র বারংবার উচ্চারিত হয়েছে তার রচনায়।

শিবকুমার জোষী শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' এর নাট্যরূপান্তর দিয়ে যাত্রা সুরু করেন ১৯৫২ তে। এটা জয়শংকর সুন্দরীর পরিচালনায় অভিনয়ও হয় যাতে বিরাজবৌ করেন দীনা পাঠক, নীলাম্বর-কৈলাশ পণ্ড্যা, এবং পীতাম্বর করেন শিবকুমার জোষী। তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক 'সুমঙ্গলা' (১৯৫৫) বৃদ্ধ বিবাহের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যার কথা ব্যক্ত করে। তার সঙ্গে আছে মনোবিজ্ঞানিক ভাবনার জটিলতাব রূপায়ণ। পুত্র গৌতম বিলেত গেলে বিপত্নীক সদগুন রায় বিয়ে করে বিমলাকে। দীর্ঘ কাল পর ফিরে আসা গৌতম বিমাতা ও সৎবোনকে দেখে পিতার কামলোলুপতায় ক্ষুব্ধ হলেও বিধবা বোন লীলার বোঝানোয় শান্ত হয়। কিন্তু পিতাপুত্রের মনোমালিন্য বয়েই যায়। মৃত মায়ের জন্য ব্যকুল গৌতম রাতে মাকে স্বপ্ন দেখে চেঁচালে বিমলা বাৎসল্য-পূর্ণভাবে তার হাত ধরে যে দৃশ্য দেখে সদগুণ রায় সন্দেহে জ্বলে ওঠে। জটিল অসহ্য পরিস্থিতিতে বিমলা গৃহত্যাগে উদ্যত হলে মঙ্গলময়ী লীলার সাহায্যে সকলেব মনে সদভাবে জাগে ও গৌতমের সঙ্গে রসিকার বিবাহ হয়। নাটকের নায়িকা লীলা মঙ্গলময়ী তাই নাটকের নাম সুমঙ্গলা। 'দুর্বাংকুর' (১৯৫৭) নাটকে পৌরাণিক বিষয়ে আধুনিক ভাবনা সঞ্চার কবা হয়েছে। ঋষিকন্যা এন্দ্রীর প্রবল প্রেমকামনা ও তার পরিণতি নিয়ে এটি লেখা। 'দেবদাস' (১৯৫৯) অনুবাদের পর লেখেন সুবর্ণরেখা' (১৯৬১) যা একাডেমী পুরস্কার পায় ১৯৬৪ সালে। চার অংকের নাটক 'সুবর্ণরেখা'র স্থান কলকাতা দার্জিলিং, কাল দ্বিতীয় যুদ্ধের অব্যাহতির পরবর্তী সময়, কুশীলব বাঙ্গলী সমাজেরই লোকজন। এক উচ্চ অভিজাত দেশপ্রেমিক পরিবারের মেয়ে সুবর্ণবেখা ভালবাসত আদর্শবাদী সংগ্রামী শেষাদ্রিকে। শেষাদ্রি জেলে যায় ও যেখানে বামপন্থী আদর্শবাদে মানুষের সান্নিধ্যে এসে সেই দলে যোগ দেয়। এদিকে বিশ্বের পরিস্থিতি পালটাচ্ছে। রাশিয়া মিত্র শক্তির সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, তাই বামপন্থীরাও ইংরেজদের সমর্থন পায়। শেষাদ্রিও ইংরেজকে সমর্থন করে। তার এই পরিবর্তনে সুবর্ণরেখা ও তার বাবা মা সকলেই অখুশী। সুবর্ণরেখার সঙ্গে অভিজিতের বিয়ে হয়ে যায়। জেলমুক্ত শেষাদ্রি সুবর্ণরেখার কাছে ফিরে আসে। নেশার ঝোঁকে শেষাদ্রি এক হোটেলে এক নারীর সঙ্গে মিলিত হয়। শেষাদ্রি ভাবে সেই নারী সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা সন্তান সম্ভাবিত হলে শেষাদ্রি বলে যে সে সন্তান তার। ক্ষুব্ধ বিব্রত অভিজিৎ সুবর্ণরেখাকে নিয়ে দার্জিলিং আসে কিন্তু তার মনে সন্দেহ অবিশ্বাস। সেখানেও শেষাদ্রি সুবর্ণরেখার ওপর দাবি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সুবর্ণরেখা তীব্র প্রতিবাদ করে ক্রোধে চিৎকার করে। সেদিন হোটেলের সেই মেয়ে শেষাদ্রিরই দলের এক মেয়ে। সুবর্ণরেখা অভিজিতের স্ত্রী, তার সন্তানের জননী। উত্তেজিত ক্রুদ্ধ সুবর্ণরেখা শেষাদ্রিকে জানোয়ারের মত তাড়িয়ে দেয়। শেষাদ্রি তার ভুল বোঝে, সে আত্মহত্যা করে। ঘটনার ঘনঘটা, চরিত্রচিত্রণের গভীরতা ও উপস্থাপনায় নাটকীয়তায় 'সুবর্ণরেখা' উল্লেখ্য, যদিও নাটকের বক্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধা থেকে যায়।

শিবকুমারের 'সাপ উতারা' (১৯৬৭) মধুর রসের নাটক। গুজরাতের নতুন হিল স্টেশনে সাপ উতারার নব নির্মিত হলিডে হোমে আসে উজ্জ্বল আনন্দপরায়ণ দম্পতি রিতেশ ও স্মিতা। সেখানে আসে বিশিষ্ট দেশ সেবক সোমনাথ ভট্ট। এবং আরও এসে উপস্থিত হয় পরিচিত সমাজসেবিকা গোদাবরী। সোমমাথ ও গোদাবরী দুজনেই গান্ধীজীর শিষ্য ও পরস্পর সহকর্মী ছিল। এক সময় তাদের মনেও ভালবাসার রঙ ধরেছিল — কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের সরিয়ে দেয়। সাপ উতারার মোহময় পরিবেশ, প্রেমপরায়ণ নবীন দম্পতির সাহচর্য বিশেষত স্মিতার প্রয়াস আবার তাদের কাছাকাছি

আনে। নাটকে কিছুটা রাজনীতির প্রসঙ্গ বিশেষত মহারাষ্ট্র গুজরাতের সমস্যার প্রসঙ্গ থাকলেও তা পরিবেশকে বিতর্কিত করেনি।

'সন্ধিকাল' (১৯৬৭) বোম্বাই-এর শহরতলীর মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। বাবা মা প্রাচীনতায় বিশ্বাসী, বিদেশ প্রত্যাগত ব্যবসায়ী ছেলে মার্কিন সহয়োগিতায় নতুন বাণিজ্য গড়ে তুলতে চায়, তার স্ত্রী দর্শনের অধ্যাপিকা। এছাড়া আছে মেয়ে জামাই ও পুত্রবধুর পরিচিত এক দম্পতি যাকে বলে সোসাইটি কাপল। এটা দুই পুরুষের রুচি ও মূল্যবোধের সংঘাতের নাটক। বাবা প্রাচীনপন্থী হলেও ছেলের রীতিনীতি বোঝাবার চেষ্ট করে, কিন্তু ধর্মভীরু সংস্কার- লালিত মায়ের মন মানতে পারে না নীতিধর্মহীনতা। পুত্রবধূ এই দুই পুরুষের মধ্যে সেতুবন্ধ। তার স্বামী সব ব্যাপারে আধুনিক হলেও স্ত্রীর ব্যাপারে নয় যাকে সম্পূর্ণ নিজের করে রাখতে চায়। তাই পুত্রবধূর দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেড়ে যায়। এই ভাবে এক আধুনিক পরিবারের দ্বন্দ্বসংঘাতে ও সংকট নাটকে ধরা পড়েছে গভীর সমবেদনায় ও শিল্পময়তায়।

আধুনিক উচ্চবর্গীয় সমাজজীবনের রূপচ্ছবি 'কহত কবীরা' তে (১৯৭১) পাই। এতে আছে ধনবান সমাজের উচুতলার মানুষ রাজা যে রূপাযৌবন অন্বেষণ করে; আছে রাণী পদ্মাবতী যে সাজ সজ্জায় রূপচর্চায় অনন্ত যৌবনকে ধরে রাখতে চায়, যে কিছু না বুঝেই কলারসিক ও পয়সায় সব শিল্পীদের কিনে নেয় এবং সে স্বামীর প্রতি উদাসীন; আছে এদের দুরন্ত যৌবনবতী মেয়ে নীলম; আছে পদ্মাবতীর অগ্রজ শ্যামা যে শান্ত স্থির সেবাময়ী নারী ও যে রাজার কামনাকে প্রত্যাখ্যান করে শান্ত নম্রতায়; আছে চাকর বেয়ারা চুন্নীরাম যে নাটকের সূত্রধার বিবেকও। নাটকের শেষে রানী ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করে, নিঃসঙ্গ রাজা শেষের প্রহর গোনে, নীলমও যেন জীবনযৌবনের তরঙ্গে অনুদ্দেশ ভেসে যায়। জীবনের ক্ষণিকত্ব অসারতা বিষয়ক কবীরের একটি শ্লোকে নাটকের মূলতত্ত্ব ব্যক্ত।

শিবকুমারের 'নীল আকাশ লিলি ধরা' বা 'নিরুপমা ও নিরুপমা' (১৯৭৫) একসংলাপী নাটক। সুন্দরী শিক্ষিতা নৃত্যগীতনিপুণা ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী নিরুপমা তার জীবনের প্যাটার্ন স্থির কঠিন রেখায় নির্ণয় করতে চায়। সে বিয়ে করবে না, স্বামীর দাসত্ব করবে না, চার দেয়ালের বন্ধন মানবে না, জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে আস্বাদন ও অনুভব করবে বলে সন্তানের জন্ম দিয়ে জীবনকে নিঃশেষ করবে না। সে প্রত্যাখ্যান করে ধনবান রশ্মি কান্তকে, একজন শিক্ষাবিদকেও। অতি অল্পলেখাপড়া জানা সামান্য কর্মরত যুবক মনোতোষকে সে গ্রহণ করে কারণ সে তার বুকে কাঁপন তুলেছে। কিন্তু মনোতোষও নিরুপমাকে ঘরে বাঁধতে চায়, শাসনে সংযত করতে চায়, তার সন্তান চায়। চলে আসে নিরুপমা কারণ সে নারীত্বের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিলেও বন্ধন শৃঙ্খল চায় না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বোঝে যে নারীত্বের পূর্ণতা ও সার্থকতা মাতৃত্বে। পার্বতীর জীবন সার্থক হয়েছিল যখন সে মহাদেবকে পায় ও জননী হয়। নিরুপমার চরিত্রচিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন পল্লবী মেহতা।

তারপরও লিখেছেন শিবকুমার জোষী। আধুনিক শিল্প ও জীবনভাবনা তাঁকে ছুয়ে যায় নিবিড় ভাবে। 'মাশংকরণী এ্যয়সী ত্যায়সী' (কে গ্রাহ্য করে মাশংকর বা উমাশংকরকে ১৯৮২) নাটক আধুনিক কালে বোম্বেতে যে সব নাটক হচ্ছে তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ। সফল বিফল সেই সব অনুবাদ নিয়ে মাতামাতি হয় কিন্তু মাশংকরের মত প্রকৃত গুজরাতী সাহিত্যের প্রতিনিধি অবহেলিত হচ্ছেন। 'অমরঅমরমর' (১৯৮২) নাটকে

শিবকুমার জীবনের বজ্রকঠিন অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষের চরম বাসনার বিফলতার এক নিরাবেগ বর্ণনা করেছেন। নাটকে প্রকৃতপক্ষে মানুষের অমরতার আকাংখার ব্যর্থতা অংকিত। রানী বজ্রেশ্বরী ও তার ছেলে শ্বেতকেতু দুজনেই প্রতিযোগিতা করেছে অমরত্বের প্রত্যাশায়। অমৃত ফল পাওয়া নিয়েও তাদের তিক্ততা তীব্রতা। কিন্তু কেউ অমর হবে না — এটাই বিশ্ববিধান।

৪. সাম্প্রতিক পর্ব

আধুনিক কাল জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে পার্সপেকটিভ, পালটে যাচ্ছে জীবনের মানে, অস্তিত্বের নানা মহলে সুরু হচ্ছে অচেনা অনালেকিত ভাবনার চলাফেরা, চেতনার গভীর গহনে ঘটছে অলৌকিক বিস্ফোরণ। এখন অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত। সামাজিক নীতি নিয়ম চিরায়তর বাধন ছিন্ন করে নূতনতর বিধানে বিন্যাসরত। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নিত্য পরিবর্তনশীল। বর্তমানের জটিল মানসিকতা, জীবনের সার্বিক মূল্যবোধের বিনাশ, চৈতন্যের অতল হাহাকার গুজরাতী নাট্যকারদের সংবদেনশীল শিল্পীচিত্তকে গভীর প্রভাবিত করেছে ও নাটকে তারই প্রকাশ ঘটেছে। নাচকের ভাষায়ও তাঁরা নতুন মাত্রা সংযোজন করতে চাইলেন। "এই দশকে একগুচ্ছ নাট্যশিল্পকুশলী তরুণ নাট্যকার গুজরাতী ভাষায় নাটক লিখতে সচেষ্ট হন। তাঁরা দেখিয়েছেন কিভাবে ভাষাকে ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে নাটকে ব্যবহার করতে হয়। তাঁরা দেখিয়েছেন সংলাপে কথ্যভাষার প্রয়োগ করে নাট্য সাহিত্যের দুটি অভীষ্টই একসঙ্গে পূরণ করা সম্ভব। সুচিন্তিত শব্দের ব্যবহারে নাটকের গতি বাড়ায়, সেই গতি ধাপে ধাপে নাটককে চরম পরিণতির দিকে ধাবিত করায়।"[১২]

অতি আধুনিক গুজরাতী নাটকে এল প্রতীকী চেতনা, এ্যাবসার্ডিটি অধিবাস্তব তত্ত্ব — শূন্যতা বিচ্ছিন্নতার দর্শন। তার বোধে দুঃখবাদ যন্ত্রণা নির্লিপ্তি, রূপে ঘটনা বিরলতা প্রতীকমুখ্যতা ইঙ্গিতের অশনি সংকেত। লাভশংকর ঠাকর, সুভাষ শাহ, চিনু মোদী, মুকুন্দ পারিখ, আদিল মনসুরী, সীতাংশু যশচন্দ্র, রঘুবীর চৌধুরী, হসমুখ বরাডি, মধু রায় প্রমুখ তরুণ নাট্যকাররা গুজরাতী নাটকে এই নূতনতর জীবনচেতনা ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য সঞ্চার করলেন : এই গোষ্ঠীই গুজরাতী নবনাট্য আন্দোলনের স্রষ্টা। প্রাচীন ভাবনা সংস্কার রীতিনীতি অতিক্রম করে নতুন নাট্যরীতির প্রবর্তক হিসাবে এরা বন্দিত।

সাম্প্রতিক গুজরাতী থিয়েটার সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য —

ক) নবীন নাট্যকার এখন নতুন থিয়েটার-ফর্মের সন্ধানে রত।

খ) তাঁরা সন্ধান করছেন থিয়েটারের উপযুক্ত নির্ভুল শব্দমালা। সচেতনভাবে খুঁজে দেখছেন কী ধরনের শব্দ প্রয়োগে নাট্যকলার উন্নতিসাধন সম্ভব।

গ) তাদের কাছে রঙ্গমঞ্চের নকশা বা আকৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা চার দেওয়ালে ঘেরা মঞ্চ হতে পারে, মুক্তাঙ্গন বা বৃত্তাকার মঞ্চও। তারা চান বাধাধরা গন্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে — যাকে বলা যাবে 'ফ্রি থিয়েটার'।

ঘ) নাট্যে অর্ন্তলীন ঘটনা প্রবাহ অথবা নাট্যের পরিভাষায় যাকে বলা যায় নাট্যক্রিয়া — তাও নাট্যকারদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁরা দাবী করেন একটি উৎকৃষ্ট মানের থিয়েটার — সর্বক্ষণই গতিময়। নিজের গতিপথ সে নিজেই আবিষ্কার করে যা দৃশ্যমান হতে পারে, কখনও অর্ধ দৃশ্যমান কখনও বা অদৃশ্যই থাকতে পারে।

আধুনিকতার সৃষ্টিলগ্নে ভাব ও রূপের নবীন সৃজন 'আকণ্ঠ সবরমতী'র কথাও উল্লেখ করতেই হবে যারা আধুনিকতার বিশেষ প্রবক্তা।

১৯৬৭ সালে পাঁচটা গুজরাতী নাটকের সংকলন প্রকাশিত হয় 'মেক বিলীভ'। এ্যাবসার্ড ধরণের প্রতীক ধর্মী এই 'পাঁচ জে নাটকো' গুজরাতী নাট্যসাহিত্যে নতুনত্ব সঞ্চার করে। পাঁচজন লেখক ও তাদের নাটক হল — লাভশংকর ঠাকর (অসত্যকুমার একাগ্রণী ধরপাকড় — অসত্যকুমার একাগ্রর ধরপাকড়), সুভাষ শাহ (বাহরণা পোলান — বাইরের শূন্যতা), মুকুন্দ পারিখ (হুঁ চোরস ইন্ডা অনে গোল কবরো — আমি চৌকো ডিম ও গোল কবর), চিনু মোদী (ডায়লনা পংখীয়ো — ডায়ালের পাখী), এবং আদিল মনসূরী (পেনিসিলনি কবর অনে মীনবত্তি — পেনিসল কবর ও মোমবাতি)।

লাভশংকর ঠাকর (১৯৩৫) অগ্রণী নাট্যকার যিনি গুজরাতী নাটককে নূতনতর প্রত্যয়ে সংস্থিত করতে চেয়েছেন। তাঁর নাটক রচনার প্রেরণা সম্বন্ধে তিনি বলেন "অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, বিশ্ববিধানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, আমার কাছে এক প্রবল কৌতূহলের বিষয়। আমি তা নিয়ে দর্শন করতে চাই না। কিন্তু স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ও বোধগম্য ভাবে উপলব্ধি করতে চাই। নাটকের মধ্য দিয়েই এই অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়ে উপনীত হতে আমি ইচ্ছুক। আমার মনে হয় নাট্যমাধ্যম ছাড়া এই সত্যের উপলব্ধি আমার সম্ভব নয়। আমি বিশ্বকে জানি না, মানুষকে চিনি না, এমন কি আমার সত্তাও আমার অপরিচিত। নাটক দিয়েই আমি সেসব সামান্য বুঝতে পারি। সেজন্যই আমার নাট্যচর্চা"[১৩]।

'এক উন্দর অনে যদুনাথ' (একটা ইঁদুর ও যদুনাথ) প্রতীকাশ্রয়ী নাটক, এ্যাবসার্ডিটির ভাব আছে। একটা জঙ্গল, দুজন জঙ্গলবাসী অপেক্ষা করছে — একজনের লম্বা দাড়ি আরেকজনের হাতে থলি। ওপরে এক উন্দরিউ বা ইঁদুর কল পাশে আগুন জ্বলছে। এরা যদুনাথের কথা বলছে তার জন্য অপেক্ষা করছে, জানতে চাইছে — যদুনাথ কোথায় আছ তুমি : এই দাড়ির ভেতরে, এই জঙ্গলে, এই কাঠ বা এই আগুনে। যদুনাথ আসবে ও তাদের জন্য কুঁড়ে ঘর করে দেবে। কিন্তু যদুনাথ আসে না। নাটকের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। ওই লোক দুটো কি বর্তমান মানব সভ্যতার প্রতীক? দাড়ি যেন মডার্ন কালচার যা বেড়েই চলেছে। আর থলিও আধুনিকতার এক বিশেষ রূপ। যদুনাথ কে? গোডোর প্রতিরূপ সে কি সভ্যতা অথবা পরম প্রাপ্তির প্রত্যাশা? যদুনাথ শেষ পর্যন্ত আসে না কিন্তু ইঁদুর কলের মধ্যেই যেন সে আছে, তাতে এই লোকেরাও আবদ্ধ — মানবসভ্যতা যেন আবদ্ধ হয়ে পড়েছে ওখানে। নাটকের সহযোগী লেখক হলেন সুভাষ শাহ।

'বৃক্ষ' নাটকে গভীর ভাবদ্যোতনায় দেখানো হয়েছে এক সংবেদনশীল প্রাণ কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হয়, মানুষ হয়ে যায় বৃক্ষ। নাটকের পটভূমি গ্রামীণ। ঝড় জল হচ্ছে, বাড়ির ছোট মেয়ে নাচছে গাইছে সেই ঝড় জলে। তার বাবাও আসে, সেও খুশী। হঠাৎ দেখা গেল বাবা সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, নড়া নেই, চড়া নেই, নির্বাক নিথর। সকলে অস্থির ব্যাকুল, বৃদ্ধ দাদাজী ব্যাকুল, স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ে, মেয়েও কেমন বিমূঢ়। ডাক্তার আসে, রোগ ধরতে পারে না। ওঝা এসেও মন্ত্রতন্ত্র পড়ে। .... ক্রমশ লোকটা গাছ হয়ে যায় তার গায়ে লতা পাতা বেরোয়। সয়ে যায় সবায়ের — বাবা স্ত্রী সবাই। কেবল তার ছোট মেয়ে ভাবে বাবার কথা, বৃক্ষ পিতার বুকে কান পেতে শোনে সে সুর ঝংকার। নিষ্পাপ পবিত্র শিশু সেও তো প্রকৃতির অংশ। প্রচার হয়। কাগজ ইত্যাদি থেকে লোক আসে। স্ত্রী ও বাবা টাকা পায়, গাছের সামনে সুন্দর ভঙ্গীতে স্ত্রী ছবি তোলে। ......

বাড়িতে স্থানাভাব। অতএব নতুন বাড়ি করতে গাছটাকে কাটতে হবে। কিন্তু মেয়ে কিছুতেই কাটতে দেবে না বাবাকে। তাকে জড়িয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু কুড়ুলের ঘায়ে তাকে কাটা হয়। নিষ্ঠুর নির্মম যুগে মানবচেতনার বিনাশের করুণ চিত্র এই নাটক।

'পীলু গুলাব' (হলদে গোলাপ) প্রথমে একাংক ছিল পরে পূর্ণাঙ্গ হয় 'পীলু গুলাব অনে হু'। নাটকের প্রধান চরিত্র মাধবী বিখ্যাত অভিনেত্রী — সে পঁচিশ বছর মঞ্চে নাটক করেছে, কিন্তু বাস্তবজীবনের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছে না। সে বিয়ে করে, কিন্তু তার জীবনের গভীর আবেগ নিবিড় অনুভূতির প্রকাশও যেন সাজানো গোছানো হয়ে যায়। সে কি সবসময় অভিনয় করছে ঘরে ও বাইরে, তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও কি অস্বাভাবিক, তাও কি অভিনয়! সে বিমূঢ় নির্বাক নিস্পন্দ হয়, তার জীবনের স্পন্দনও থেমে যায়। গুজরাতী মঞ্চের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী দামিনী মেহতা এই চরিত্রের আবেগ ব্যাকুলতা বেদনাকে মর্মস্পর্শী করে প্রকাশ করেছেন তাঁর অভিনয়ে।

'মনসুখলাল মজীঠিয়া' এক সংবেদনশীল গভীর প্রাণের বিনাশের চিত্র। সৎ ধর্মপ্রাণ মনসুখলাল মজীঠিয়া স্ত্রী অনসূয়া পুত্র হিরেনকে নিয়ে সুখে সংসার কাটায়। হঠাৎ কি যেন বিপর্যয় ঘটে। কাগজে বেরোয় এক ব্যক্তি এক নারীকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে, তারও নাম মনসুখলাল মজীঠিয়া। এক ধর্ষণকারী হত্যাকারীর সঙ্গে তার নাম মিলে যাওয়ায় শিউরে ওঠে সে, যেন সেই হত্যাকারী। বিমূঢ় উন্মত্ত মনসুখলাল ভুলতে চায় তার নাম, তা মুছে ফেলতে চায় সব জায়গা থেকে। তার হাতদুটো অবিশ্রান্ত কাঁপতে থাকে। স্ত্রী পুত্র চিন্তিত হয়, মনস্তত্ত্ববিদ্ শল্যচিকিৎসকরা পরীক্ষা করে, কিন্তু কিছু হয় না। আস্তে আস্তে মনসুখলালের হাত পা গলে যেতে থাকে, সে ক্রমশ ছোট হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত একটা পিন্ডে পরিণত হয়। তার পরিবারও তার সম্বন্ধে নির্মমভাবে উদাসীন হয়ে পড়ে। অবশেষে মনসুখলাল মজীঠিয়া নিঃশেষ হয়ে যায়। এক নিষ্ঠুর নির্মম ক্রূর প্রতিবেশে এক সহৃদয় মহৎ সংবেদনশীল প্রাণের বিনাশ হয়।

মুকুন্দ পরীখ (১৯৩৪) অ্যাবসার্ড ধর্মী নাটক রচনায় দক্ষ। 'হুঁ চোরস ইন্ডো অনে গোল কবরো' (আমি চৌকো ডিম ও গোল কবর) তাঁর বিশিষ্ট নাটক। 'মোক্ষ' একাংক সংকলনও প্রতীকের মাধ্যমে জীবনের সত্যকে ব্যক্ত করতে চায়। 'মোক্ষ' নাটকে মানুষের পরমের সাধনা রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত। এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে হাতপা বাঁধা পুরুষ (মুমুক্ষু) যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কোন অলক্ষ্য থেকে শব্দ ভেসে আসে যা তাকে অপেক্ষা করতে বলে এক লক্ষ বছর। তার প্রয়োজন তিতিক্ষা ধৈর্য। ওখানে কোথাও ওপারে যাওয়ার স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়ি আছে, কিন্তু পুরুষ তা ধরতে পারে না। সেই শব্দ বলে কর্মই তাকে মুক্তি দেবে। আসে নারী (মুমুক্ষা), তার দেহেও বন্ধন। সে পুরুষের ক্লীবতা ভীরুতাকে আঘাত করে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ তাদের আপ্রাণ প্রয়াসে বাঁধন থেকে দুয়ারহীন ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টা করে, সিঁড়ি চড়ে ওপরে যায়, তার প্রান্তেই বাইরের পথ। দুজনে স্বর্গের সন্ধান পায়।

সুভাষ শাহ (১৯৪১) আধুনিক নাট্য আন্দোলনের এক বিশিষ্ট শরিক। প্রতীকাশ্রয়ী রূপকধর্মী নাট্যরচনায় তিনি দক্ষ, এ্যাবসার্ড দর্শনেরও অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর 'বাহারণা পোলান'-এ (বাইরের শূন্যতা) মানুষের ক্লান্তি বেদনার সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ণতার বাসনা ও প্রাপ্তির ব্যর্থতাও চিত্রিত। মধ্যরাত্রি, চারপাশ নির্জন রাস্তার ধার। বেঞ্চে চাদর ঢেকে শুয়ে আছে 'ক', এক বৃদ্ধ বসে বিড়ি খাচ্ছে। 'অ' এল, সে তার বাড়ি খুঁজছে, বাড়ির নম্বর

স্বপ্নে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও। 'ব' আসে ও বলে যে সে বাড়ি যাবে না। তার বুক শূন্য খালি, সেখানেও কিছু নেই। তাছাড়া গান্ধী বুদ্ধ সবাই বাড়ি খুজছে, কেউ পায়নি। বৃদ্ধ তাব সন্তান 'অ'র কাছে আসে ও নিয়ে যায় 'ক'র কাছে, সেও তার সন্তান। 'ক' কে জাগানো হয় সে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এরা তিনজন সেই চাদরে ঢেকে দেয় নিজেদের।

'সুমনলাল টি দভে' নাটকের প্রধান চরিত্র এক আদর্শবাদী শিক্ষক যিনি গান্ধীজীর নীতি ও আদর্শে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ঐ রকম সৎ ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের টিকে থাকা অসম্ভব। তাই শেষ পর্যন্ত তাকেও জীবন দিতে হয়।

চিনু মোদী (১৯৩৯) গুজরাতী নবনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ। তার 'ডায়লনা পংখীয়ো' প্রতীকাশ্রয়ী রচনার বিশিষ্ট নিদর্শন। 'নভল শাহ হিরজি' (১৯৭৪) সামাজিক নাটক, লোককথার ওপর ভিত্তি করে লেখা এবং এতে সঙ্গীত নৃত্য ও কথনরীতির প্রয়োগ ঘটেছে সার্থকভাবে। গুজরাত রাজ্য সঙ্গীত নৃত্য অ্যাকাডেমির প্রতিযোগিতায় এটা প্রথম হয়। 'ঢোলিডো' নাটকের জন্য চিনু মোদী সারা দেশে বিপুল খ্যাতি পেয়েছেন। গ্রামীন নিম্নবর্ণেব মানুস ভলা ভগত কাহিনীব প্রধান চরিত্র। সে গান গায় ঢোল বাজায়, উচ্চশ্রেনীর মানুষরা তাকে অবহেলা অত্যাচার করে, সে সব সয়েও বেঁচে থাকে অনেকটা গুজরাতের প্রাচীন কবি নরসি মেহতার মত। তাকে অবলম্বন করে লেখক সমাজজীবনের একটা সুন্দর ছবি এঁকেছেন। একটা বিদেশী কাহিনীর প্রভাব থাকলেও (Fiddler on the Roof) চিনু মোদী তাঁর নাটককে সম্পূর্ণ নতুন করেই সৃষ্টি করেছেন। 'ক্লীন বোল্ড' (১৯৮০) লেখা জীবনের পাওয়া বা পরিপূর্ণতা নিয়ে যা আনে বিকৃতি। মানুষের এটাও এক ট্রাজেডি - - পাওয়ার বেদনা।

শ্রীকান্ত শাহ পরীক্ষামূলক নাটক রচনায় দক্ষ। মানুষই তার অন্বিষ্ট, মানবজীবনের হাস্যকর অসংগতিতে তিনি তুলে ধরেছেন যা কখনো ফ্যানটাসী হয়ে ওঠে যদিও তার ভিত্তি কঠিন বাস্তবতা; নরনারীর গভীর জটিল গূঢ়েষ সম্পর্কের অন্বেষণেও তিনি তৎপর। 'তিরাড' (ফাটল) গুজরাতী নাট্য সহিত্যের ইতিহাসে এক দুঃসাহসিক সংযোজন। নরনারীর সম্পর্ক বিশেষতঃ স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা, যৌন জীবনের এক জ্বালাভরা দুঃসহ চিত্র নাটকে আছে। নিখিল ইন্দু স্বামীস্ত্রী কিন্তু ছবছর পরেও তাদের সন্তান হয়নি। ডাক্তারের রিপোর্ট অনুযায়ী নিখিলই সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম। কিন্তু নিখিল ইন্দুকে সবসময় পীড়ন করে কারণ তার জন্যই নাকি এদের সন্তান হচ্ছে না। ইন্দুর বোন সুরভির সঙ্গে নিখিলের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু একদিন ইন্দু জানায় সে মা হতে চলেছে। সে হয়ত অন্যায় করেছে কিন্তু মাতৃত্বের জন্য ও তার নারীত্বের সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্যই এই পাপ। ইন্দু নিখিল- সুরভিকে প্রশয় দেয় এতে হয়ত তার পাপের কিছুটা স্খালন হবে। শেষকালে সবাই ঘরে ফেরে — নিখিল ইন্দু তাদের সন্তানকে নিয়ে, সুরভি শুরু করবে যেখানে ছিল বা আছে সেখান থেকে। 'অনে হুঁ' (এবং আমি) একাংক সংকলনের অন্তগত '৪৬ ক্রোমোজোমস' মানবযন্ত্রণার শিল্পরূপ এক সুররিয়ালিষ্ট নাটক। নাট্যকার মনে করেন যে মানব জীবনে যন্ত্রণার বৈচিত্র্য ব্যাপকতা সীমাহীন। সুখের সীমা আছে অবসান আছে, দুঃখের নেই — কারণ মানুষের চেতনায় নতুন অদ্ভুত আরো দুঃখ আঘাত হানে। দুঃখই মানুষের মুক্তির পথ, মানব অস্তিত্বের প্রকাশ, পৃথিবার গভীর উপলব্ধি। বর্তমান নাটকের স্থান ডাক্তারের চেম্বার। ডাক্তার বসে। প্রথম রোগী আসে যার শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে ও তাতে একটা পাখীও বাসা বেধেছে যে সব

অংশ স্পর্শ করলে বা বাতাসে আন্দোলিত হলে রোগী অসহ্য কষ্ট পায়। ডাক্তারের নির্দেশ নিষ্ঠুর নির্মম নার্স তাকে কঠিন ভাবে ধরে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়। ডাক্তার তার শরীরের গাছপালা নাড়াচোড়া করলে ও একটা পাতা ছিঁড়লে রোগী যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যায়। আসে দ্বিতীয় রোগী যে প্রতিমুহূর্তে অসহ্য ভাব অনুভব করে শরীরে যা বেড়েই চলেছে। একটা শিশু জন্মালে বা কোথাও বাড়ি তৈরী হলে তার ওপর সেই চাপ পড়ে। একজন বলেছে সে অত্যন্ত সেনসিটিভ এবং সভ্যতার ভার বহন করে সে চলেছে। ডাক্তাব বলে অপারেশন করে তার শরীরের হাড় বাদ নিতে হবে। এক রোগিনী আসে সে খুব বেশি লেখাপড়া করে ভাষাতত্ত্বে ডক্টরেট পেয়েছে কিন্তু তার মুখের ভাষা পালটে গেছে অদ্ভুত হয়ে গেছে, কেউ বুঝতে পারে না। ডাক্তার তাকে জোরে চড় মারে ও নার্সকে বলে তাকে শক দিতে স্টিম প্রেসার দিতে। চতুর্থ রোগী আসে সে শুনতে পায় চার পাশের অদ্ভুত স্বর আর্তনাদ। সে শুনতে পায় জামা থেকে তুলোর কান্না, চেয়ার টেবিল থেকে কাঠের আর্তনাদ, ঘরের মেঝে থেকে পৃথিবীর ব্যাকুলতা, জুতো থেকে পশুর কান্না, গ্রামের জল থেকে নদীর কান্না। সহৃদয় ডাক্তার এদের সবাইয়ের চিকিৎসা করবে। কিন্তু নিষ্ঠুর নির্মম নার্স (সে যান্ত্রিক সভ্যতার ভয়ঙ্কর সমাজ ব্যবস্থার প্রতিমূর্তি) চায় না ডাক্তার এদের ভাল করুক, সবায়ের রোগ যন্ত্রণা দূর করুক। সে ডাক্তারকে গুলি করে। শ্রীকান্ত শাহ-র অপর এক বিশিষ্ট একাংক সংকলন গ্রন্থের নাম 'কেনভাস পরণা চহেরা' (ক্যানভাসে মুখ)।

নব্যরীতির লেখক **আদিল মনসূরী** কবিতা রচনায়ও পারঙ্গম। নাট্য সাহিত্যে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং নুতন ভাবনার প্রবর্তন করেছেন। তাঁর 'পেনিসলনী কবব অনে মীনবত্তি' (পেনিসল কবর ও মোমবাতি) আধুনিক সময়ের বিশিষ্ট রচনা। কবর খানায় এক বৃদ্ধ কবর খুড়ছে নাম অস্তি। সেখানে আসে তার বন্ধু আর এক বৃদ্ধ বামজী। এরা দুজন অনেক বিষয়ে কথা বলছে — নতুন ব্র্যান্ডের বিড়ি, ছোলা, সিগারেট, কুকুর ইত্যাদি নিয়ে। এরা দুজনেই কবরে যেতে চায়। টস হয়, একজন জেতে, সে কবরে যাবে। এখন সময় আর এক বৃদ্ধ আসে সে প্রথম থেকেই কবরের পিছনে ছিল ও সারাক্ষণ পেনিসল কাটছিল। সে বলে যে সেই কবরে যাবার অধিকারী কারণ সে চিরকাল জ্ঞানের চর্চা করেছে, পেনিসল কেটে কেটে ছোট করাতে তা প্রমাণিত হয়েছে। সে কতকাল ধরে পেনিসল কাটছে, চুল সাদা হয়ে গেছে। দেহ শীর্ণ। সে জ্ঞানী সম্মানিত, সেই কবরে যাবে। অস্তি ও বামজী রাজী হয়। সে এদের হাতে মোমবাতি দেয় তা জ্ঞানের প্রতীক। এবং পেনিসল হাতে সে কবরে নামে।

মহীউদ্দীন মনসূরী নাট্যরচনায় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটকের চরিত্রায়ণের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'না' তাঁর বিখ্যাত নাটক, 'ক্যানসার' বিশিষ্ট একাংক সংগ্রাহ ১৯৭৪ এ প্রকাশিত হয়। 'ক্যানসার' পারিবারিক সামাজিক নাটক, মানবহৃয়ের গভীর সত্তার উন্মোচন এতো আছে। তিমির ও প্রতিমার মেয়ে কিরণের বি. এ পরীক্ষার ফল বেরোবে বলে এরা অধীর অপেক্ষা করছে বিশেষত তিমির, যে মেয়েকে আরো পড়াবে বড় করবে। এমন সময় আসে প্রকাশ যাকে দেখে প্রতিমা বিচলিত হয় ও তাকে চলে যেতে বলে। প্রকাশ আমেরিকায় ক্যানসার সারাতে যাওয়ার আগে তার মনকে কুরে কুরে খাওয়া এক যন্ত্রণার কথা বলে যেতে চায়। তিমির জোর করে সে কথা বলতে। প্রকাশ এক নির্মম ভয়ংকর কথা বলে। প্রকাশ বলে যে কিরণ তার মেয়ে। তিমির সন্তানের জন্য ব্যাকুল হলে সন্তানহীনা প্রতিমা বাধ্য হয় প্রকাশের সঙ্গে মিলিত হতে না হলে তিমির

প্রতিমাকে ছেড়ে যাবে। সন্তানকামনায়, নিজেকে বাঁচাতে, তিমিরকে শাস্তি দিতে প্রতিমা বাধ্য হয়েছে ও কাজ করতে। প্রকাশ চলে যায়। তিমিরের বুক জ্বলে যায়, সে আত্মহত্যা করবে, সে প্রতিমা দুজনেই মরবে। প্রতিমা ও তিমির চায়ে বিষ মিশিয়ে খাবে, এমন সময়ে কিরণের ফোন আসে সে ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করেছে। এরা নিথর হয়ে যায়।

সিতাংশু যশশ্চন্দ্র (১৯৪১) সুপণ্ডিত অধ্যাপক, খ্যাতিমান কবিও বটেন। সাহিত্য অ্যাকাডেমির এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার এর প্রধান সম্পাদক রূপে কাজও করেছেন। নাট্যকার সিতাংশু যশশ্চন্দ্র জীবনের অর্থ অন্বেষণ করেছেন এবং খুঁজে পেয়েছেন নাট্যভাষা যা দিয়ে মানুষের ভাবনাকে গভীর ব্যক্ত করা যায়। তিনি বলেছেন — My own efforts are in the direction of a wider, more subtle and more satisfying relation of the new drama with the wholeness of the performing arts of Gujrat. Only by relating my experiments with the totality of the folk (as well as literary) performing arts, do I hope to make theatre a major and shared experience of Gujrati speaking people. [১৪]

'আ মানস মাদ্রাসী লাগেছে' (লোকটাকে দেখে মনে হয় মাদ্রাসী) নাটকে তাঁকে বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান দিয়েছে। নাটকে সামাজিক সমস্যা সংকট আছে, মহৎ আদর্শের রূপায়ণ প্রয়াস আছে, আঙ্গিকের বৈচিত্র্য আছে। শিল্পের ভাষা খোঁজার প্রয়াস আছে। এক ছোট শহরে এক লোক আসে। তার ভাবভঙ্গী কাজকর্ম অদ্ভুত। তার কথাও বিচিত্র, ভারী শব্দ সংস্কৃত শব্দও সে ব্যবহার করে। লোকে মনে করে সে মাদরাসী কারণ দক্ষিণ ভারতের ভাষার মত তার কথাবার্তা যা তাদের কাছে জটিল দুর্বোধ্য লাগে। সে কিন্তু এদের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়, এদের কল্যাণকর কাজে অংশ নিতে চায়, সামাজিক অন্যায় দূর করতে চায়। সে সন্ন্যাসীর মত পোশাক পরে — যেন বিবেকানন্দ। ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে মিশে সেই মাদরাসী চেতনার গভীর থেকে আসা উপলব্ধিতে অনুভব করে তার শৈশব ভাষা তার মাতৃভাষা — গুজরাতী। লোকেরা যখন তাকে গ্রহন করছে সে চলে যায় সেই শহর থেকে।

'গ্রহণ' নাটকের মধ্যে নাটক ও কবিতা মিশ্রণের সার্থক প্রয়াস আছে। 'বৈশাখী কোয়েল' টমাস হার্ডির একটি গল্প (Day after the Fair) অবলম্বনে লেখা। শিল্পপতি বিক্রমের স্ত্রী অলকা। কিন্তু তাদের ভালবাসার জীবনে যেন ক্লান্তি অবসাদ এসেছে বিশেষতঃ স্বামীর উপেক্ষায়। তাদের পরিবারে আছে এক তরুণী রতন যে গ্রামের মেলায় আসা অভয়কে দেখে মুগ্ধ হয়। তাদের মধ্যে ভালবাসা জমে ওঠে। অলকার মনও জেগে ওঠে। পরিস্থিতি জটিল হয়। রতন প্রেমিককে চিঠি লিখলে সে তা পড়তে পারেনা। অলকা পড়ে ও চিঠি লিখে দেয় — তার মনের কথা। শেষ পর্যন্ত বিক্রমের মনের পরিবর্তন ঘটে। মিলনে নাটক শেষ হয়।

"লেডী লাল কুয়র" নাটকটির প্রেরণাও বিদেশী রচনা (এডওয়ার্ড দ্য ফিলিপ্পি-র Fillumena Matungrano) যদিও নাটকটি প্রায় মৌলিক হয়ে উঠেছে। এক ভদ্রলোকের রক্ষিতা এক নারী ধূর্ত ও চতুর এবং সে সামাজিক মর্যাদা চায়। সে সেই ধনী ব্যক্তিকে বলে যে সে মরণাপন্ন ও মৃত্যুর আগে স্ত্রীর মর্যাদা চায়। সে ব্যক্তি অন্য মেয়েকে বিয়ে করবে স্থির করলেও কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে কিছুটা মুক্তি পাবার জন্য রাজী হয়। কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রী-র 'অসুখ' সেরে যায় ও বৈধ অধিকার দাবি করে। ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ বিমূঢ় হলেও শেষ পর্যন্ত সব মেনে নিতে বাধ্য হয়।

'কেম মাকনজী ক্যোয়া চল্যা আমে আমথা ভাইনে ত্যয়া চল্যা' (কি মাকনজী কোথায় যাচ্ছ, আমি আমথা ভাইয়ের বাড়ি যাচ্ছি) নাটকে পরীক্ষামূলক ভাবে গুজরাতী নাট্য প্রয়োগ- শিল্পের বিভিন্ন ধারা ও রীতিকে আনা হয়েছে। তাঁর শেষ দিকের নাটক 'ছবিলি রামতি ছানুমানু' (মেয়েটার গোপন কথা) কমেডি রচনা — বিজলি ও তার প্রেমিক সুমনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। যার কাছে বিজলী চাকরী করে বিজলী একদা তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। বিজলী কিন্তু সুমনকে ভালবাসে। বিজলী তার প্রাক্তন প্রনয়ীর কাছে যায় সম্পর্ক ছিন্ন করতে ও জানাতে যে সে সুমনকেই বিয়ে করবে। সুমন বিজলীকে ভুল বোঝে, সে তাকে অনুসরণ করে। ঘটনা জটিল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সব জটিলতার অবসান হয়, মিলনে নাটক শেষ হয়। অরবিন্দ যোশী পরিচালিত এই নাটক বিশেষ খ্যাতি পায়।

রঘুবীর চৌধুরী (১৯৩৮) বিশিষ্ট কথাশিল্পী পন্ডিত অধ্যাপক। অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। আধুনিক কালের খ্যাতিমান নাট্যকারও বটেন। তিনি ট্র্যাডিশনকে সংস্কারের বন্ধন থেকে ছিন্ন করে নতুনতর প্রত্যয়ে সংস্থিত করেছেন, আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তার মধ্যে পাই। 'ঝুলতা মিনারা' (১৯৭০) 'অশোকবন' (১৯৭০), 'সিকান্দার সাহানী' (১৯৭৯) 'ডিম লাইট' (পাঁচটা একাংক সংকলন), 'ত্রিজো পুরুষ' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত নাট্য গ্রন্থ। 'বাচিকম' নাট্যচর্চা কেন্দ্রের তিনি প্রাণপুরুষ। 'ডিম লাইট' নাটক গ্রাম জীবনের পটভূমিকায় লেখা। একজন লোক দরকারে রাস্তা থেকে লাইট নেওয়ায় শুরু হল গন্ডগোল। কলহ, ঝঞ্ঝাট, ইলেকট্রিক কোম্পানীর লোকের টাকা খাওয়া ইত্যাদির অবসানে যখন আলো জ্বলল তা অত্যন্ত ম্লান আলো — ডিম লাইট। এটা বর্তমান সমাজের ব্যঙ্গ, সবই যেন 'ডিম' হয়ে গেছে। গুজরাতের লৌকিক ভাষা প্রচলিত বাকরীতির সুন্দর প্রয়োগ আছে নাটকে।

১৯৭০ এ প্রকাশিত 'আশোক বন' রঘুবীর চৌধুরীর বিশিষ্টতার পরিচয় বহন করে। বিদ্যুৎ ও কামিনী স্বামী-স্ত্রী হলেও পরস্পরের প্রতি প্রেমহীন। অত্যন্ত ধনবান বিদ্যুৎ জলাধারাকে ভালবাসেও তাকে জোর করে পেতে চায় যদিও জলাধারার আকর্ষণ অনিলের প্রতি। বিদ্যুৎ সমুদ্রের ধারে এক অপরূপ সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেছে 'অশোক বন'। তার অনুরোধে জলধারা সেখানে আসে কিন্তু বিদ্যুতের প্রতি তার ভালবাসা নেই। সেখানে অনিল আসে। বিদ্যুৎ বলে যে জলধারা চাইলে তার সঙ্গে যাবে। কিন্তু জলধারা অনিলের চোখে সেই ভাবধারা সেই আমন্ত্রণ দেখে না। অনিল আর তাকে তেমন আকর্ষণ করে না। নিঃসঙ্গ বেদনার্ত জলধারা অশোক বন থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনিলও লাফায়। কিছু পরে দেখা অনিল জলধারার দেহ বহন করে আনছে। অনিল বলে সে মরেনি। কিন্তু কামিনী বলে সে জলধারার মৃতদেহ বইন করে আনছে।

কামিনী — হবে এনা শবনে সা মাটে লই যাওছে?

অনিল — না এ বচি গইছে। এটলেকে আমে বন্নে বচি গেয়াছিএ। তেআনি ঝুনি আদতনে লিধে। খনিক নির্ণয়ণা বলথি এ ডুবি ন সকি। আতো হুঁ এনে উপাড়িলে বহার লাবিও তে পছি বেভান থঈ গই।

কামিনী — অনিল কুমার এ বেভান নথি থঈ গই। তমার হাথমা তো এনু শবছে মাত্র শব।

(অনিল যাইছে। কামিনী উভী উভী জোঈ রহেছে)

কামিনী — এখন এর শবদেহকে কেন নিয়ে যাবে?

অনিল — না এ বেঁচে গেছে। মানে আমরা দুজনে বেঁচে গেছি পুরোণো অভ্যাসের জন্য। পলক নির্ণয় করে ও ডুবতে পারল না। আমি ওকে তুলে বাইরে আনলাম তারপর ও অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কামিনী — অনিল কুমার, ও অজ্ঞান হয়নি। আপনার হাতে তো ওর মৃতদেহ আছে। মাত্র মৃতদেহ।

(অনিল যাচ্ছে। কামিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দিকে দেখছে)।

এই নাটকে রঘুবীর চৌধুরীর প্রাচীন ভাবনার আধুনিকীকরণ করতে চেষ্টা করেছেন। রামায়ণ আধুনিক কালে এলে কি হবে তাই যেন বলা হয়েছে। নাটকের দ্বন্দ্ব মূলত মনস্তাত্ত্বিক। লাভশংকর ঠাকুর বলেছেন — 'যারা গুজরাতী নাটকে ভাল গদ্য পড়তে চান তাদের এই নাটক পড়া অবশ্য উচিত।'

বিনায়ক পুরোহিত বর্তমান সমাজব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে নাটক লিখেছেন। তার 'স্টিলফ্রেম' বোম্বাই দিল্লী কলকাতাতে অভিনয় হয়। প্রকাশ কাল ১৯৮১। যে চতুষ্কোণ — পুঁজিপতি রাজনীতিবিদ কুলাক ও আমলাতন্ত্র — দেশকে ধ্বংস করছে তারই একটার অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের নির্মম রূপ এখানে পাই। নাটক এক আই সি এস অফিসারের কথা যে তার দাসীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সে আবার অফিসারের পুত্রের প্রণয়িনী। পদ্মা সন্তানবতী হয়। কিন্তু সে সন্তানের হত্যা চায় না, মা হতে চায়। অতএব তাকে মরতে হল। অফিসার এক শোচনীয় পরিণতির দিকে যায় ও তার পুত্রের মুখে বিপ্লবের কথা শোনা যায়। নাটক হিসাবে এটি বিতর্কিত।

মহেশ দভের 'মনে দৃশ্য দেখায় ছে' (আমি দৃশ্য দেখছি) সংকলনে অ্যাবসার্ড ধরনের নাটকআছে যে নাটকগুলো আধুনিক নাট্য আন্দোলনের বিকাশ অনেকটা সহায়ক হয়েছে।

হসমুখ বারাডি (১৯৩৮) বক্তব্য ও বাচন উভয় ক্ষেত্রেই প্রথাবদ্ধতাকে আঘাত করেছেন, ছিন্ন করেছেন। এবিষকে তিনি অতি আধুনিকও বটেন। প্রফেশনাল থিয়েটারের সেকস্ বা মিস্ট্রি প্লে এবং সত্তরের গুজরাতী বুদ্ধিজীবীদের এ্যাবসার্ডিটি — কোনটাই তিনি নেননি। তবে মানুষ ও সমাজই তাঁর নাটকের বিষয় এবং জটিল দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানবজীবন ও তার গভীর অনুভবই তাঁর নাটকে বারবার এসেছে। আঙ্গিকের বৈচিত্র্যও তাঁর বৈশিষ্ট্য — মাইম কোরাস কেরিওগ্রাফি নৃত্যছন্দ ইত্যাদি। দুঅংকের 'কালো কমলো' (১৯৭৪) মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে। 'পছি রোহাজি বোলিয়া'-য় (পরে রোহাজি বললেন, ১৯৭৯) মানুষ যেন রোবটে পরিণত হয়েছে। 'জশুমতী কংকুবতী' (১৯৮০)তে বাক্তি মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন, এবং বিভিন্ন শিথিল কাহিনীকে সঙ্গীত ও কবিতায় গ্রন্থন এর বৈশিষ্ট্য। মিথের সুন্দর প্রয়োগ আছে। এটি দর্পণের প্রয়োজনায় সফল হয়। হসমুখ রমণভাই নীলকণ্ঠ-র সপ্তাংক 'রাইনো পর্বত'কে তিন অংকে রূপ দেন।

হসমুখ বারাডি-র 'জনার্দন যোশেফ' (১৯৮০) পরীক্ষামূলক নাটকে ক্ষীণ গল্পের আড়ালে ধনতান্ত্রিক ও ব্যুরোক্রাট সমাজব্যবস্থার ছবি আঁকা। এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী কাজ করে এক বিরাট সংস্থায় যারা তার আবিষ্কারকে কিনে নিয়ে আপনাদের স্বার্থে ব্যবহার করে এবং পরিণামে বিজ্ঞান সাধকের যে আত্মসমর্পণ ঘটে তা মৃত্যুই। নাটকে পৌরাণিক প্রসঙ্গও এসেছে — রাজা পরীক্ষিৎ-এর তক্ষকের দংশনে মৃত্যু ও জন্মেজয়ের নাগযজ্ঞের কিছুটা ছায়াসম্পাত ঘটেছে বর্তমান কালের প্রেক্ষপটে। আমেদাবাদ ধূর্জটি ট্রুপের প্রযোজনায় হিমাংশু ত্রিবেদীর পরিচালনায় নাটকটি বিশেষ সফল হয়।

বারাডির 'যোশেফ কে নো মুকদ্দমো' (যোশেফ কে-র বিচার) নাটকের ভিত্তি কাফকার 'ট্রায়াল' যদিও তাকে প্রায় নতুন করে নির্মাণ করেছেন লেখত। এই অদ্ভুত ও অবাস্তব জগতে মানুষ মুক্তি খুঁজছে; কিন্তু সরকারি বিধি কানুন এবং মানুষেরই তৈরি প্রতিষ্ঠান তার প্রতিবন্ধকতা করে — নাটকে তাই বলা হয়েছে। সেন্সর বোর্ড এই নাটকের কিছু বক্তব্যকে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করেছে; যেমন — 'আইনের বই আবার কী? পাতায় পাতায় নগ্ন পুরুষ নারীর ছবি' (পনে পনে নগ্ন স্ত্রী-পুরুষণা চিত্র) ইত্যাদি।

মধু রায় (মধুসূদন বল্লভদাস ঠাকর ১৯৪২) কেবল নাট্যকারই নন, ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার রূপেও প্রতিষ্ঠিত। হিন্দী উর্দু বাংলা গুজরাতী ও ইংরেজীতে তাঁর সমান অধিকার। তিনি স্টেজ ক্র্যাফেটর প্রশিক্ষণের জন্য আট মাস হনলুলুতে ছিলেন, দীর্ঘজীবন কেটেছে ইউরোপ ও আমেরিকায়। একাংক পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সবধরনের নাটক রচনায় তিনি পারদর্শী। পরীক্ষামূলক নাটকরচনায় দক্ষ, প্রচলিত রীতির পেশাদারী মঞ্চের সফল নাটকও তিনি লিখেছেন। 'আকণ্ঠ সবরমতী'র উজ্জ্বল আবেগময় মননশীল যুবকটি আজ গুজরাতী মঞ্চের সোনালী নাম।

তাঁর 'খেলান্দো' বিদেশী (Sleuth) অনুসরণ হলেও প্রায় মৌলিক এবং কয়েকশত রজনী অভিনয় হয়। ফ্রীডরিশ ডুরেনমার্টের রচনা অবলম্বনে 'সরত' (সর্ত)ও জনপ্রিয় হয়। 'মাই ফেয়ার লেডী'র ওপর ভিত্তি করে লেখা 'সন্ত রঙ্গিলী' গুজরাতী মঞ্চের দর্শকদের অত্যন্ত প্রিয় নাটক। একাংক নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তিনি। স্মরণীয় তাঁর 'বিশ্ব' নাটকটি যেখানে মানবহৃদয়ের গভীরতম স্তরের বিস্ফোরণ দেখানো হয়েছে। মূলত প্রেমপ্রবৃত্তির এক প্রবল অসংবরণীয় বিকারগ্রস্ত উল্লাস মানব হৃদয়ের গোপন গভীর পথে চলাফেরা করে চেতনায় যে দাবদাহ রচনা করে নাটকে তাই পাই।

'কোই পণ এক ফুলনু নাম বোলো তো' (আমাকে একটা ফুলের নাম বল) নাটকে মানব মনের জটিল গহন অরণ্যে নাট্যকারের পদসঞ্চার, জীবনের রহস্য বিস্ময়কে তিনি উন্মোচিত করেছেন। এবং ঋদ্ধ আঙ্গিকে ও গ্রন্থন নৈপুণ্যে তাকে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করেছেন। একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে — প্রেম ভালবাসা নিয়ে জীবনের কঠিন জটিল সমস্যা। আকস্মাৎ কামিনী (যে কান্তার অভিনয় করেছিল) সামনের সারিতে বসা একজন দর্শককে (শেখর খোসলা) হত্যাকরে। বিচার শুরু হয়। বিচারকের (সম্ভবত নাটকের মধ্যের লেখক) অদৃশ্য কণ্ঠ অভিনেতাদের প্রশ্ন করে চলে হত্যার কারণ জানার জন্য। অভিনেতারা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কোন কথা বলে না, কিন্তু প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে তাদের ভাবনা ব্যক্ত করে এবং সকলের জীবনের অপ্রকাশিত ঘটনাগুলোও প্রকাশিত হয় — যা পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি কামনা বাসনা ঈর্ষ্যা দ্বন্দ্বের জটিল কাহিনী। বিভিন্ন ফ্ল্যাশব্যাকে স্পষ্ট হয় প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রত্যাশী অভিনেত্রী কামিনী এক লোভী ভাই (সুন্দর দেশাই) নিষ্ঠুর মা ও স্বার্থপর প্রেমিক (যে ঐ দলের অভিনেতাও — জগন্নাথ পাঠক) দ্বারা পর্যুদস্ত। মুক্তি পেয়ে সে বড়লোক ব্যবসায়ী শেখর খোসলার সঙ্গে নিজের প্রেম সম্পর্ক কল্পনা করে। নাট্যকার কেশবের আচরণ ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ প্রতারিত হয় কামিনী। কেশব তাকে বলে শেখরের কথা যার মুঠোয় সে পড়েছে ও যার হাত থেকে মুক্তি চায়। কামিনী শেখরকে অভিনয় দেখতে আমন্ত্রণ জানায় ও তাকে গুলি করে হত্যা করে। অন্যতম কারণ বোধ করি এই মিথ্যা বন্ধন থেকেও সে মুক্তি চায়, অথবা শেখরের ওপর আপন ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এর ফলে কেশবেরও শত্রুনিধন হবে এবং কামিনীকে সে

অধিকার করতে পারবে। যদিও কামিনীর সঙ্গে কেশবের সম্পর্ক রহস্যাবৃতই থেকে যায়। নাটকের শেষে অবরুদ্ধ কামিনীর মানসিকতা কৌতুক বেদনাময় সংলাপে ধরা পড়েছে —

কামিনী (কোর্টের নকল করে) . শেখর খোসলা -- শেখর খোসলা শেখর খোসলা হলফ পড় হলফ পড়। হ্যাঁ সম্পূর্ণ সত্য বলবে, সত্য ছাড়া আর কিছু নয়। মিথ্যা বললে জেল হবে। তুমি বাদী কামিনী দেশাইকে চেনো? জবাব দাও হ্যাঁ কিংবা না। চোনো না, চোনো না? যার স্বপ্ন রাত্রির শীতল প্রহরে উষ্ণ ওম এনে দেয়, তাকে চোনো না? যাকে তুমি ভীরু প্রেমিক ভয় দেখানো ভাই আর হীন স্বভাব মায়ের বন্ধন থেকে ছিনিয়ে এনেছো তাকে চেনো না? আমি কিন্তু তোমাকে জানি। আমি তোমার চম্পক বনে আমার নীড় তৈরি করেছি, তোমার তীক্ষ্ণ প্রবল নিঃশ্বাসে জীবনের উষ্ণ উচ্ছ্বাস পেয়েছি, তোমার সম্মোহক বলিষ্ঠ বাহু ধরে তোমাকে আমি আকাশ থেকে ছিনিয়ে এনে আমার হাতে ধরেছি। তোমার চুম্বিত নয়ন কই? তোমার গর্বিত গ্রীবা কোথায় গেল? চুপ করে আছ কেন? জবাব দাও, আমার সঙ্গে কথা বলো, কথা বলো —!

'কুমারনী আগাশী' (কুমারের ছাতে) নাটকও রহস্যমণ্ডিত -- এক মৃত্যুর মাধ্যমে মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসন্ধান ও সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করে। এখানে ফ্ল্যাশব্যাক প্রথার প্রয়োগ আছে। কুমার নামে এক ছাত্র ছাদের ওপর থেকে পড়ে মারা যায়। এটা হত্যা না আত্মহত্যা? কুমারের বড় ভাই কুমারের রুমমেট বিপিনকে এজন্য দায়ী করে। কিন্তু বিপিন অদ্ভুত চমকপ্রদ কথা বলে। কুমারের দুর্বার আকর্ষণ ছিল তার বড়ভাইয়ের স্ত্রী নিশার প্রতি এবং নিশাও সমভাবে কুমারকে চাইত। কিন্তু আবেগের চূড়ান্ত মুহূর্তে কুমার সব কিছুর ওপর আকর্ষণ হারায় ও প্রকাশ্যে নিশার অবহেলা উদাসীন্য সইতে না পেরে সে আত্মহত্যা করে। নিশাও এই বক্তব্য সমর্থন করে। সকলেই শিহরিত। তখন কুমার আসে। কিন্তু কেউ তো তাকে চায় না। তার প্রয়োজন নেই। সে বেঁচে থাকলে সমাজ কুৎসা রচনা করবে কি করে? নিশা তার অপদার্থ স্বামীকে কি করে আঘাত করবে? কি করে বিপিন মহত্তের মর্যাদা পাবে ও গল্প বলে যাবে? তাই কুমারের দ্বিতীয় মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে সমাজের সান্ধ্য আসরের কুৎসা গল্পের জন্য। মধু রায়ের 'পানকোর নাকে যাকে' (পান কোরের মোড়ে গিয়ে), 'চতুষ্কোণ (Guerney's Love Letter অবলম্বনে লেখা) ভাল নাটক। 'অশ্বত্থামা' মহাভারতের কাহিনী নির্ভর অসাধারণ নাটক। তাঁর উপন্যাস নির্ভর (কিম্বলস র‍্যাভেনউড) 'দ্য সুটেবল ব্রাইড' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আধুনিক গুজরাতের প্রচলিত রীতি ও ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ এক অদ্ভুত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। যৌন বিষয়ক সস্তা কমেডি অথবা রহস্য কাহিনীই আজ পেশাদার মঞ্চের উপজীব্য। প্রতিভাবান শিল্পীদের রচনা থাকলেও ঐ মঞ্চ পরিচালকরা অধিকাংশ সময়েই বিদেশী ফিল্ম অথবা অন্যান্য ভাষার নাটক অনুবাদ করে কাহিনী নির্বাচন করেছেন। এই সব পেশাদার মঞ্চ সম্বন্ধে লাভশংকর ঠাকর বলেছেন — It mostly offers sex-comedy to tickle the audience whose sex instinict is already deadened. It also offers sentimental, sensational and melodramatic plays. The spectator .... is offered plays which present crude emotions in an equally crude expression.[১৫]

এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ কোথায়? সুস্থ সবল জীবনাদর্শকে আনতে হবে মঞ্চে,

জনগণের মনের গভীরে পৌঁছতে হবে এবং সেজন্য লোকশিল্পের কাছে যেতে হবে। It is the placing of our theatre in the centre of our performing arts, our folk traditions, which will liberate it ultimately from the dirty little tricks of the heirs of the seth owner of the 'juni rangabhoomi' era. A new relationship has to be established between the economics (and sociology) of theatre and play writing. Free from the crippling weight of the realistic sets and over bearing light and music, the actor will be able to add the total richness of his body and mind to the new play of an immediate tomorrow. The director will also be free to be less of an electrician and sound engineer and more of a discoverer of the sound and sense of Gujrati speech and the physio - psychological potentiality of region.[১৬] তরুণ প্রতিভাবান গুজরাতী নাট্যকার নাট্যপরিচালক নাট্যকর্মীরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং সর্বাধিক প্রতিকূলতার বাধাকে ঠেলে ফেলে সুস্থ সুন্দর ও শিল্পিত নাট্যালোক সৃজনে তারা তৎপর।

ওপরের কথাগুলো বলেছিলেন সিতাংশু যশশ্চন্দ্র বেশ কবছর আগে। আজ নব্য গুজরাতী স্রষ্টা শিল্পীরা এগিয়ে আসছেন নতুন ভাবনা নিয়ে। সাম্প্রদায়িকতা আজকের এক ভয়াবহ সঙ্কট যার চিত্রণ ঘটেছে গুজরাতী নাটকে। অভিজাত যোশীর 'মর্মভেদ' সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও পরিণামে মিলনের কথা। উত্তম গদার 'সতভরা' নাটকে বিভেদ বিদ্বেষ হত্যা নয়, এই সব ব্যাধিকে নির্মূল করার জন্য মানবশক্তির প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। দিলীপ গণাত্রার 'জোডকা' (যমজ) সম্প্রীতির সুন্দর নাটক।

এখন নাটক লিখছেন দক্ষা ঠককর ('কমপিউটার কনট্রোলড ড্রেনেজ সিসটেম'—যার বিষয় রাজনীতিবিদদের পয়সা কামানো), শৈলেশ দভে ('কর্মক্ষেত্র'—সামাজিক দায়িত্বকর্তব্য ও নিজ নিরাপত্তার দ্বন্দ্ব), বজ্রক্রান্ত জাবেরী ('বিচারা জননো বেশ'—এক বেচারার নাটক), ভূপেন খখখর ('মজিলা মণিলাল'—মধ্যবিত্ত নীতিবোধকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে), অতীশ কাপডিয়া ('এক বীজ নে গমতা রহিয়ে'—আমরা যেন সবাইকে ভালবাসি)। নবীন লেখক সৌম্য জোষী-র 'রমী লো নে ইয়ার' (আরে খেলে নাও ইয়ার) নাটকে দেখানো হয়েছে এক ক্যান্সার হাসপাতালের মুমূর্ষু রোগী অন্যদের কেমন করে প্রেরণা দেয় আনন্দ দেয়। 'ধরিত্রীপুত্র' সর্দার পটেলের জীবনের ওপর আধারিত।

গুজরাতীতে নাট্যব্যক্তিত্বেও কম নেই। নিমেষ দেশাই, ভরত দভে, সুভাষ শাহ, রাজু বরোট, কান্তি মডিয়া, অরবিন্দ জোশী, সরিতা জোশী, শৈলেশ দভে, প্রবীণ পন্ডা, পঙ্কজ পটেল, ভার্গব ঠক্কর, নিসর্গ ত্রিবেদী, লতেশ শাহ, মহেন্দ্র জোশী, পরেশ রাবল, উপেন্দ্র ত্রিবেদী, জয়শ্রী পারিখ, ডায়না রাবল, পদ্মারাণী, মিনাল পটেল, গোপী দেশাই আজও সক্রিয়। তবু যেন গুজরাতী নাটক নতুন পথে যেতে পারছে না। অগভীর যৌনাত্মক হাসির নাটক, রহস্যকাহিনী, অথবা বিদেশী ফিল্ম বা কাহিনীর চাপে গুজরাতের নাট্যপ্রতিভা বিকশিত হচ্ছে না। আবেগময় অথবা অতিনাটকীয় ভাবনা যথার্থ শিল্পের রূপায়ণে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু এই প্রজন্ম হার স্বীকার করতে চাইছে না, এগিয়ে আসছে নতুন শিল্প সম্ভার নিয়ে—এটাই আশার কথা।

৫. বাংলা ও গুজরাতী নাটক ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক

(১) সূচনা ঃ

গুজরাতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক নিকট ও নিবিড়। দীর্ঘদিন ধরে এই দুই প্রদেশের মানুষ কাছাকাছি এসেছে, পরস্পরকে বেঁধেছে ভালবাসার বন্ধনে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী এই দুই মহামানব বাংলা ও গুজরাতের মিলনে মহান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শিল্প সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে এই মিলনের বাণী অপরূপ বিকশিত হয়েছে। এই পারস্পরিক নৈকট্য ও সম্পর্ক নাট্য সাহিত্যে বিশেষভাবেই দেখা যায়।

(২) প্রথম পর্যায়

গুজরাতী ঐতিহাসিক নাটকের স্বল্পতা আছে একথা জানিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণলাল ঝাবেরী প্রমুখ সমালোচক। তাই বাংলার ইতিহাস ·পুরাণাশ্রিত নাটকের কথা গুজরাতের শিল্পীরা বিশেষভাবে ভেবেছেন। নারায়ণ হেমচন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' নাটকের অনুবাদ করেন। এই নাটকের কবিতার অনুবাদ করেছেন কবি শ্রী নরসিংহ রাও দ্বিবেদিয়া। 'আজও অশ্রুমতী-কে গুজরাতী সাহিত্যের এক সর্বোত্তম নাটক রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।'[১৭] 'দেবলা দেবী' অনুবাদ করেছিলেন ভীমরাও গোলনাথ ত্রিবেদী। এই অনুবাদও বিশেষ মর্যাদা পায়।

(৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও গুজরাতী নাটক

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক গুজরাতে বেশ জনপ্রিয়। তাঁর অধিকাংশ নাটক গুজরাতীতে অনূদিত হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন গুজরাতী নাট্যকারদের। আমেদাবাদের 'দর্পণ' প্রভৃতি সংস্থা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাটক উপস্থাপিত করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট অনুবাদগুলির উল্লেখ করা যায় —

ভীষ্ম — মাধবলাল দলসুখরাম কোঠারী ১৯১৯
গুপ্তানো বর (বঙ্গনারী) — ভীখাভাই পুরুষোত্তম ব্যাস ১৯২৫
মেবাড় পতন — চুনীলাল ত্রিপাঠী ১৯২০
পাষাণী — রমনিকলাল কিষণলাল মেহতা ১৯২৬
পেলেপার (পরপারে) — সকরলাল মগনলাল কাপাডিয়া ১৯২১
রাণো প্রতাপ (প্রতাপসিংহ) — ঝাবেরচাঁদ মেঘানী
শাহজাহান — ঝাবেরচাঁদ মেঘানী
সীতা — চুনীলাল মুলজীভাই ত্রিপাঠী

দ্বিজেন্দ্রলালের মত কিছু নাটক গুজরাতীতে লেখা হয়েছে। এগুলোকে অবশ্য প্রভাবিত বললে ঠিক বলা হয় না। তবে অনুপ্রেরণা ছিল বলা যায়। গৌরীশংকর বৈরাটী বাংলা ভাষা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি বাংলা শিখে নেন সুন্দরভাবে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'উলুপী' নাটক তিনি অনুবাদ করেন 'গঙ্গাশাপ' নামে। 'দুর্গাদাস' 'সিরাজদ্দৌলা' 'পৃথ্বীরাজ' প্রভৃতি নাটক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখকে স্মরণ করায়। কবি নানালালের 'জাহাঙ্গীর-নূরজাহান' প্রভৃতি নাটকও তার বক্তব্য ও রূপায়ণে বাংলা নাটকের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চন্দ্রবদন মেহতার 'সীতা' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অনুভব করা যায়। সীতার কারুণ্য মূর্তি ও রামের চারিত্রধর্ম এ দুয়ের ওপর বাংলার প্রভাব আছে। নাটকের ভূমিকায় চন্দ্রবদন মেহতা জানিয়েছেন যে ভারত বিখ্যাত অভিনেতা শিশির ভাদুড়ীর 'সীতা' নাটকের অভিনয় দেখে তিনি বিমুগ্ধ হন ও নাটক লেখার প্রেরণা পান।

(৪) রবীন্দ্রনাথ ও গুজরাতী নাটক

অ. ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথকে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছেন গুজরাতের শিল্পী ও লেখকগণ, রবীন্দ্রনাথকে অর্পণ করেছেন পরম মর্যাদা। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে গুজরাতের বরেণ্য লেখক উমাশংকর জোশী বলেছেন — "পৃথিবীর কাছে কালিদাসের পর ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় লেখকদের কাছে তিনি এক মহত্তম শিল্পী ও ভারতীয় আদর্শর প্রতীক। এদের কাছে তিনি ক্ষণিক প্রেরণা নন চিরকালের গোমুখী উৎস, সাময়িক উন্মাদনা নন হিমালয় শৃঙ্গের মত মহান।"[১৮] প্রখ্যাত নাট্যকার শিবকুমার জোষী নাট্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ এক মহান নাট্যকার। তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন মঞ্চকে। তৈরী করেছেন নতুন থিয়েটার যাকে বলা যায় মুক্ত মঞ্চ। পেশাদারী মঞ্চের কৃত্রিমতা আর জটিলতাকে পরিহার করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর নাটকে যবনিকা নেই, বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা নেই, সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে কবিত্ব ও সঙ্গীত। ফাল্গুনী নাটকে তিনি বলেছেন যে চিত্রপটের থেকে চিত্তপটেই তার বেশী অনুরাগ যেখানে সুরের তুলি বুলিয়ে তিনি ছবি জাগাতে চেয়েছেন। বক্তব্যের দিক থেকেও তিনি আধুনিক, তিনি চিরনবীন। তাঁর নাটকের আদর্শকে বলা যায় ইউনিভার্সাল — সব দেশে সব কালে তার সমান আবেদন। রাজা, মুক্তধারা, রক্তকরবী প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের সব নাটকই বিশ্বজনীন ও সর্বকালিক আবেদনে পূর্ণ।"[১৯]

আ. রবীন্দ্রনাটকের গুজরাতী অনুবাদ

বাংলা নাটক গুজরাতীতে নাট্য সাহিত্যকে বিশেষ ভারেই অনুপ্রোণিত করেছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথমেই মনে পড়ে। মূলত গান্ধীজীর প্রয়াসেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গুজরাতের প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গুজরাতীতে রবীন্দ্র নাটকের প্রথম অনুবাদ করেন মহাদেব দেশাই যিনি ছিলেন গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ। মহাদেব দেশাই নরহরি পারিখের সহযোগিতায় অনুবাদ করেন 'চিত্রাঙ্গদা অণে বিদায় অভিশাপ' ১৯১৫ সালে। ১৯২৪ এ গিরিধারী কৃপালিনী অচলায়তন অনুবাদ করেন। ভূমিকায় স্বামী আনন্দ বলেছেন — "এতে ভারতবর্ষকে কাছে পাওয়া যায়। এই বই অচলায়তনের মত স্থবির হিন্দু সমাজের সামনে লাল আলোর মত জ্বলছে এবং সচেতন করে দেয় সনাতনী ভাবনার মানুষদের।"[২০] ১৯৩২ এ 'রাজা'র অনুবাদ করেন স্বামী সেবানন্দ যিনি নাটকের এক দীর্ঘ সুন্দর দার্শনিক ভূমিকায় লিখেছেন যে পাঠকের আধ্যাত্মিক বিকাশ না হলে সেই নাটকের গভীর অর্থ বোঝা যাবে না। একজন মহৎ কবিই এরকম নাটক লিখতে পারেন। উপনিষদ ও বিভিন্ন ধর্ম সাধনার অতি সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে এই নাটকে।[২১]

গুজরাতীতে অনুদিত রবীন্দ্রনাটকের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল —

অচলায়তন — গিরিধারী কৃপালিনী ১৯২৪
বিসর্জন — নগীনদাস পারিখ
বিসর্জন — বাচুভাই শুক্ল
বে বালে নাটকো — কর্ষণদাস মানেক ১৯২৪
বৈকুণ্ঠনো পোথো — রমনলাল সোনী
চন্ডালিকা — বাচুভাই শুক্ল ১৯৪১
চার একাংকী — চন্দ্রকান্ত মেহ্‌তা ১৯৩২

শাস্তি > সজা
শেষের রাত্রি > মাসী
শ্যামা
ফাল্গুনী

} রেডিও নাট্য রূপান্তর

চিরকুমার সভা — রমনলাল সোনী ২য় সং ১৯৫৫
চিরকুমার সভা (কৌমার অসম্ভবম) — হকুমত দেশাই ১৯৬০
চিত্রা — কুসুমাকর ১৯৯১
চিত্রা অনে মালিনী — নটবরলাল ফকির ভাই শেঠ।
চিত্রাঙ্গদা অনে বিদায় অভিশাপ — মহাদেব দেশাই ও নরহরি পারিখ ১৯১৫
ডাকঘর — নগীনদাস পারিখ
ডাকঘর — মঞ্জুলাল যমনাদাস দভে ১৯১৬
একাংকী নাটকো — রমনিকলাল জয়চাঁদ দলাল ১৯৫০

চিত্রা
সন্ন্যাসী
রাজা রাণী
মালিনী
রথযাত্রা
বলিদান

হাস্যকৌতুক অণে ব্যঙ্গকৌতুক — রমণলাল সোনী ১৯৪৫
কচ অণে দেবযানী — জীবনলাল অমরশী মেহ্‌তা
লক্ষীণী পরীক্ষা — নগীন দাস পারিখ ১৯৩২

গৃহপ্রবেশ
লক্ষীণী পরীক্ষা
মফতিয়া জলপানি (বিনিপয়সার ভোজ)
অন্ত্যেষ্টি সৎকার

মালিনী — নরসিং রামভাই ভক্ত ১৯২৪
মুক্তধারা — কর্ষণদাস মানেক ১৯২২
মুক্তধারা — ন্‌হনালাল নাথভাই শাহ ১৯২২
নটীনী পূজা — নগীনদাস পারিখ ১৯৬১
রক্তকরবী — চন্দ্রকান্ত করুণাশংকর ভট্ট
রাজা (অন্ধারা রঙ্গমহেলনো রাজা) — স্বামী সেবানন্দ ১৯৩২

রাজা ও রাণী — ঝাবেরচাঁদ মেঘানী
সতী — নগীনদাস পারেখ ১৯৪৮
(এতে আছে শ্রী রবীন্দ্রনাথনা পাঁচ সংবাদ কাব্যের রূপান্তর
বিদায় অভিশাপ
গান্ধারীনু আবেদন
সতী
নরকবাস
কর্ণকুন্তী সংবাদ)
তাসের দেশ — পিনাকিন ত্রিবেদী ১৯৩৩

ই. গুজরাতী নাটকে রবীন্দ্রপ্রভাব

রবীন্দ্রনাথ গুজরাতী নাট্য শিল্পকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন বিভিন্ন ভাবে সাহিত্য ও প্রয়োগগত দুপ্রকারেই। গুজরাতী নাট্য সাহিত্যের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশ কিছু দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনা, অতীত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, আঙ্গিকের বিস্ময় গুজরাতী নাটকে দেখা গেছে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গুজরাতী সাহিত্যে যতটা গুজরাতী মানসিকতায় তার থেকে অনেক বেশী।[২২] তবু নাটকে রবীন্দ্রপ্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

উমাশংকর যোশী মহৎ কবি ও শিল্পী। তিনি রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগী ছিলেন। বিশেষতঃ 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থটি তাঁর অতীব প্রিয়। ছাত্রাবস্থায় সবরমতীর তীরে বসে তিনি নিজের আনন্দেই আবৃত্তি করতেন 'প্রাচীন সাহিত্য'।[২৩] রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন কথানির্ভর নাট্যকাব্যগুলি উমাশংকরকে মুগ্ধ করেছিল তাদের বক্তব্যে ও অঙ্গিক বিন্যাসে। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কয়েকটি কাব্য সংলাপ বা কাব্য নাটিকা রচনা করেন। এগুলি 'প্রাচীনা' গ্রন্থের অন্তর্গত। চারের দশকে এগুলি রচিত হয়। 'কর্ণকৃষ্ণ' (১৯৪০), 'গান্ধারী' (১৯৪৩) '১৯মা দিবসনু প্রভাত' (১৯৪২, ১৯ দিনের প্রভাত, ১৮ দিনের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পর দিনের ঘটনা), 'বাল রাহুল' (১৯৪২, বুদ্ধ-আনন্দ সংলাপ), 'রতি মদন' (১৯৪৩) প্রভৃতি পাঠককে অনিবর্যভাবে মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের কথা। উমাশংকর জোষী নিজেই এই স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২৪]

বিশিষ্ট লেখক **কৃষ্ণলাল শ্রীধরাণী** শান্তিনিদেতনের ছাত্র ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রভাবনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। শ্রীধরাণীকে গুজরাতীতে প্রতীকবাদী নাটকের প্রথম লেখক রূপে অভিহিত করা হয়। তাঁর 'বডলো' (১৯৩১ বটগাছ), 'মোরণা ইন্ডা' (১৯৩৪), 'সোনা পরী' প্রভৃতি প্রতীকাত্মক নাটকের সঙ্গে পাশ্চাত্য নাটকারদের রচনার সাদৃশ্য আছে, রবীন্দ্র প্রভাব তাতে পাওয়া য়ায় বিশেষ ভাবে।[২৫] বিশেষত প্রকৃতি চেতনা, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সান্নিধ্য, সুন্দরের রূপায়ণ, কাব্যময় প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদিতে এই নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ হয়ে উঠেছে।

সনাতন বুচ কচ - দেবযানীর কথা নিয়ে লিখেছেন তিনি অঙ্কের পৌরাণিক নাটক 'সঞ্জীবন' (১৯৩৫) যার ওপর রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' নাট্যকাব্যর প্রভাব আছে। নাট্য সমালোচক মহেশ চোকসী এবিষয়ে বলেছেন —

"ঠাগোরনু 'বিদায় অভিশাপ' তেম জ কান্ত নু 'দেবযানী' এম বে কবিয়োনী কৃতিয়ো বাঞ্ছা পন্থী, আ বিলক্ষণ স্ত্রী পাত্রণে ন্যায় আপরা তথা তেনে 'প্রণয়' থী পর এবী

লোকোত্তর নাযিকা তরীকে মূলওয়ালী নেমথী সনাতন বুচ 'সঞ্জীবন' (১৯৩৫) দ্বারা নাট্য প্রয়াস আদরে ছে অনে এমাঁ নবদশ পূর্বে নী কল্পনা কামে লগাড়ে ছে।''[২৬]

কখনো কখনো গুজরাতী নাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ তার আবেদনকে বাড়িয়ে দেয়। যেমন গুজরাতী সাহিত্য মন্ডল শ্রীকান্ত শাহ রচিত 'এক টিপু সুবজনু' নাটকের মধ্যে রবীন্দ্র কবিতার প্রয়োগ ঘটায় ও তার বক্তব্যকে আরো গভীর করে তোলে। ''নাটকে রবীন্দ্রনাথের মাকে আমার পড়ে না মনে' কবিতার আদর্শ প্রয়োগ (অনুবাদ ঝাবেরচাঁদ মেঘানী) নাটকটির আবেদন বাড়িয়ে দেয়।''[২৭]

বিশ্বগীতা, রাজর্ষি ভরত, কুরুক্ষেত্র, ইন্দুকুমার প্রভৃতির রচয়িতা **নানালাল দলপত রাম কবি** র নাটকসমূহ প্রতীকী ও কাব্যধর্মী, তাদের ভাষা অলংকারময়, সঙ্গীতও সুন্দর। গুজরাতী নাটকে নতুন রীতি তিনি আনতে চেয়েছিলেন যা হয়ত রাবীন্দ্রিক এবং তাঁর নাটকের দর্শককে তিনি প্রত্যক্ষ মঞ্চ নয়, অন্তরলোকের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন। 'কিন্তু নানালাল কখনো রবীন্দ্রনাথের স্তরে পৌঁছতে পারেন নি গীতিময় নাটক নিয়ে, কারণ তাঁর সৃষ্ট কোন চরিত্রই পূর্ণতা পায়নি', একথা জানিয়েছেন শিবকুমার জোষী।[২৮]

ঈ. গুজরাতীতে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়

গুজরাতে রবীন্দ্রনাথের নাটক বেশ জনপ্রিয়, বিশষত নৃত্য নাটক ইত্যাদি। শান্তিনিকেতন কালচার হ্যাড এ গ্রেট ইমপ্যাক্ট অন গুজরাট।[২৯ক] সঙ্গীত নৃত্য নাট্যানুষ্ঠান শান্তিনিকেতনী রীতিতে গুজরাতে প্রচলিত হয়। পাশ্চাত্য আদর্শ প্রভাবিত বোম্বে কালচার ও পার্সী সংস্কৃতি ও জীবন চর্যা যখন গুজরাতকে আচ্ছন্ন করতে চাইছিল তখন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসেন নতুন প্রাণ নতুন প্রত্যয়। রবীন্দ্রনাটক গুজরাতে বহুল সমাদৃত হয়। শান্তিনিকেতনের ছাত্র বাচুভাই শুক্ল শান্তিনিকেতনী রীতিতে নৃত্যনাটক গুজরাতে জনপ্রিয় করেন। পেশাদার অপেশাদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিভিন্নস্থানে রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে।

গুজরাতীতে 'ফাল্গুনী' নাটকের এক অভিনয় ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে। ১৯৩১ এ বোম্বাইয়ের শহরতলী ভিলে পার্লেতে অবস্থিত পিউপিলস ওন স্কুল-এর ছাত্র-ছাত্রীরা গুজরাতীতে 'ফাল্গুনী' অভিনয় করে। শান্তিনিকেতন-এর অধ্যাপক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জাহাঙ্গীর জীবাজি উকিল এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিনিকেতনের আদর্শে। 'ফাল্গুনী' বসন্তের নাটক এবং নাটকের সূচনায় বসন্তকে আহ্বান করা হচ্ছে এই মর্মে 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' এই গানটি গাওয়া হয়। দুটি মেয়ে বরণডালায় ফুল নিয়ে নাচের ছন্দে ফুল ছড়াতে ছড়াতে মঞ্চের ওপর দিয়ে যায়। একটি মেয়ে কোকিলা এবং অপরজন ইন্দিরা যে ত্রয়োদশী কন্যাটি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হন। এই ঘটনার সুন্দর মনোগ্রাহী বিবরণ দিয়েছেন সাগরময় ঘোষ 'দেশ' পত্রিকায় (৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪)।

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় 'দর্পণ' অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মৃণালিনী সারাভাই পরিচালিত আমেদাবাদের এই নৃত্যনাট্য সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাটকের অনেক সফল প্রযোজনা করেছেন। 'চিত্রাঙ্গদা' করেন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। এটি বিশেষ প্রশংসিত হয়। রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে 'তাসের দেশ' নৃত্যনাটকের রূপায়ন করেন 'দর্পণ', কথাকলি রীতিতে এর পরিবেশন এক অভিনবত্ব সৃষ্টি করে। 'ভারতনাট্যম' রীতিতে গ্রথিত 'ভানুসিংহের পদাবলী' এক অভিনব প্রযোজনা। সমালোচক লিখেছেন শ্রীমতী মৃণালিনী সারাভাই-এর পরীক্ষামূলক রবীন্দ্র-ব্যালে দুটি আঙ্গিক ও বক্তব্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'ভানুসিংহের পদাবলী' তে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব গীতিসমূহ চমৎকার কৃষ্ণলীলা

নৃত্যের রূপ পেয়েছে যাকে সুন্দর ভারতনাট্যম রীতিতে পরিবেশন করা হয়। Choreography is admirable, the entrances and exists keep up an excitement, even though, in the nature of such lyrical poems, there is not much plot. The music is admirable too.[২৯] তুলনায় 'তাসের দেশ' কম মনোগ্রাহী বলে সমালোচক মনে করেন যদিও রাজসভার রীতিনীতি ও প্রচলিত ধারানুবর্তনের প্রতি মার্জিত ব্যঙ্গ এতে পাই এবং শ্রীমতী সারাভাই-এর অপরূপ করিওগ্রাফী এতে আছে। চথুন্নি পানিক্করের নৃত্য ও অভিনয় বলিষ্ঠ ও প্রাণস্পন্দিত। সারা দেশের রসিক ও বিদগ্ধ জন মৃণালিনীর প্রযোজনাকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানান। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মতামত দেওয়া হল — Mrinalini's choreography dovetailed the dramatic and dance sequences in fine array and she had made a studious attempt to break new ground in these dance-dramas. A student of Santiniketan and having learnt at Tagore's feet, she has taken to the poet's works in a spirit of dedication.[৩০] দর্পণ-এর 'চণ্ডালিকা' এক বিশেষ উল্লেখ্য প্রযোজনা। সমাজবোধ ও শিল্পময়তা দুদিক থেকেই 'চণ্ডালিকা' বিস্ময় হয়ে উঠেছে। চন্ডালিকা প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। গুজরাতের এক দূর নিভৃত অতি সামান্য গ্রামে দর্পণ-এর 'চণ্ডালিকা' অভিনীত হচ্ছেল যার দর্শক মূলত ব্রাত্য অন্ত্যজ নারীরা। নাটক শেষ হবার পর সেই সামান্য নারীরা শিল্পীদের কাছে এলেন অশ্রুসজল চোখে। তাঁরা অভিভূত আবেগমথিত কারণ তাঁদের মনের কথা জীবনের কথা এত আন্তরিক ভাবে মর্মস্পর্শী ভাবে নাটকে ব্যক্ত হয়েছে। অন্ত্যজ অনভিজাত ব্রাত্য মানুষ বিশেষত নারীরা যাতে মর্যাদা পায় সম্মানে অধিষ্ঠিত হয় সেজন্য এই নাটকটা মঞ্চস্থ করেছেন শ্রীমতী মৃণালিনী সারাভাই — তাঁর মনে ছিল ভারতবর্ষের নীচুতলার মানুষদের ওপর বর্ণহিন্দুদের ভয়ংকর অত্যাচার ও পীড়নের প্রসঙ্গ।

সামাজিক ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মৃণালিনী চণ্ডালিকার এক আন্তরিক গভীর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন — "কালের চলার পথে আমরাও কখনো কখনো হরিজন হয়ে উঠি যখন আমাদের পরিবার কিংবা সমাজ আমাদের বর্জন করে কিংবা আমাদের অস্তিত্বই আমাদের পরিহার করে। জীবন নাটকে প্রতিটি মানুষের একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার প্রকাশই চন্ডালিকা"।[৩১] বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় ও রূপসৃজনের চমৎকারিত্বে চন্ডালিকা পৃথিবীর রসিকজনের স্বীকৃতি পেয়েছে।

১৯৮৭ মে মাসে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দিল্লীতে যে রবীন্দ্র নাট্যোৎসব হয় তাতে আমেদবাদের 'দর্পণ' রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে নৃত্যনাট্য উপস্থাপিত করে মৃণালিনীর দক্ষ পরিচালনায়। পত্রিকার মতামত এ বিষয়ে উল্লেখ করা যায় —

"মৃণালিনী রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণকে নৃত্যচঞ্চল করে তুলেছেন

আমেদাবাদের দর্পণ মৃণালিনী সারাভাই-এর সুদক্ষ পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' রূপায়িত করেন। যদিও একই বিষয় নিয়ে নরেন্দ্র শর্মা আগেই কাজ করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। মৃণালিনীর উপস্থাপনাও ছিল সমান কল্পনা- সমৃদ্ধ ও উচ্চমানের। তাঁর ভাবনা প্রশংসনীয় এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে ঘটনাবলী রূপায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ব্যক্ত করতে যার থেকে তিনি পংক্তিগুলিকে ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করে গেছেন। অস্পৃশ্যতা, ভারতবর্ষের মেয়েদের শোচনীয় দুরবস্থা, মানুষে-মানুষে দেশে-দেশে সংঘাত, ঐক্য, জাতীয় সংহতি ও

মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত শিল্পসম্মত ভাবে উপস্থাপিত করেছেন তিনি।[৩২]

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে আই. এন. টি 'চিরকুমার সভা'র হকুমত দেশাইকৃত অনুবাদ 'কৌমার অসম্ভবম' অভিনয় করে। পরিচালনায় ছিলেন প্রবীণ জোশী। উজ্জ্বল ঝকঝকে হাস্যরসপূর্ণ এই নাটকটি সকলের মনোরঞ্জন করে। অজিত দেশাই, প্রবীণ জোশী, হংসু মেহতা, অরবিন্দ জোশী, তরলা ঠক্কর, লীলা মেহতা, জ্যোতি পারিখ, নিবেদিতা ঠক্কর প্রমুখ সুন্দর অভিনয় করেন।

ঐ বর্ষে বরোদায় 'ক্ষুধিত পাষাণ' এর অভিনয় জনপ্রিয় হয়। গুজরাতীতে রবীন্দ্র নাটক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৮৫ সালে লন্ডনে ট্যাগোরিয়ানদের উদ্যোগে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য উপস্থাপিত হয় গুজরাতীতে রবীন্দ্র সঙ্গীত সহ। প্রত্যক্ষদর্শী এর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন — "চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যটি সকলের মনোহরণ করল। অভিনয়, নৃত্য, সুর, পোষাক, মঞ্চসজ্জা সব কিছুতেই সর্তকতা খুবই প্রশংসনীয়। .... চিত্রাঙ্গদার ভাষা আগাগোড়াই গুজরাতীতে অনুবাদ। গানের ভাষা ঠিক চলতি গুজরাতী হয়নি, একটু সংস্কৃত ঘেঁষা না করে উপায়ও ছিল না। কিন্তু আমাদের উপভোগ্যতা ছিল অব্যাহত। সুর আমাদের চেনা, অভিনয় ভঙ্গি পরিচিত। নাচের দলের মধ্যে লিনেট হেগ নামে একটি ইংরেজ মেয়ে ছিল। বেশ ভালো লেগেছিল। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের গুজরাতী ভার্সনটি রবীন্দ্রভবনে সংগ্রহ করে রাখবার যোগ্য"।[৩৩] নাটকটি অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, নৃত্যশিক্ষক গৈরিকা গুপ্ত, সঙ্গীতে মায়া সেন; সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন মায়া সেন।

১৯৮৬ তে রবীন্দ্রনাথের ১২৫ জন্মবর্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুজরাতীতে রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ হয়। কলামন্দির মঞ্চে 'রক্তকরবী' পরিবেশিত হয় ১৫ জানুয়ারী ১৯৮৬। মহাবোধি সোসাইটি হলে 'বির্সজন' -এর অংশ বিশেষ পরিবেশিত হয় ৮ মে, ১৯৮৬, শিল্পীরা ছিলেন গুজরাতী সাহিত্য মন্ডলের অভিনেতৃবর্গ — আরতি গণাত্রা, মুকুল দেশাই, অজয় পডিয়া, আনন্দী গণাত্রা প্রমুখ। ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার নাট্য সম্মেলনে (১৯৮৭) দুটি গুজরাতী নাটক অভিনীত হয় কলকাতায়। 'চিত্রাঙ্গদা'র একক অভিনয়ে অংশ নেন অনুরাধা ঢোডকিয়া। "গুজরাতী কন্যা অনুরাধা ঢোডকিয়ার চিত্রাঙ্গদা হয়েছিল ভারী সুন্দর।"[৩৪] রথের রশি অভিনীত হয় 'মহাকালনী রথ' নামে। এবং শিল্পীরা "গুজরাতীতে রথের রশির বক্তব্য দর্শক চিত্তে মুদ্রিত করে দেয়।"[৩৫] বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা জনক দভে রবীন্দ্রনাট্যচর্চায় উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে তাঁর পরিচালনায় গুজরাতীতে মঞ্চস্থ হয় 'রক্তকরবী' (নন্দিনী) যাতে তিনি রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেন। নন্দিনীর ভূমিকাভিনেত্রী ছিলেন বৃন্দা ত্রিবেদী। রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে তাঁর যতীন বিশেষ সমাদৃত হয় এবং এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য জনক দভে গুজরাত সঙ্গীত নৃত্যনাট্য অ্যাকাডেমি কর্তৃক সম্মানিত হন।

গুজরাতীতে রবীন্দ্র নাট্য-চর্চা নিয়মিত হয়ে চলেছে। আমেদাবাদের নাট্যসংস্থা 'সপ্তসিন্ধু' অত্যন্ত সফলভাবে মঞ্চস্থ করে 'মুক্তধারা'। অনুবাদ করেছেন কর্ষণদাস মানেক, পরিচালক ভরত দভে। সমালোচকের মতে —

"বৈজ্ঞানিক এবং তকনীকী বিকাশ কে অমানবীয় হস্তেমাল কা বিরোধ করণে বালা য়হ নাটক গান্ধীবাদ সে প্রভাবিত হ্যয়। নাটকে বাইরের স্বতন্ত্রতার সঙ্গে অন্তরচেতনার মুক্তির কথা বলা হয়েছে। 'মুক্তধারা' অপণে কথ্য রূপ, সন্দেশ ঔর আস্বাদ কী দৃষ্টি সে

পুরী তরহ এক ভারতীয় নাটক হ্যয়। নির্দেশক নে ইসে কিসী খাস লোকশৈলী মে বাঁধনে কে বজায়ে বিবিধ ভারতীয় লোকরঙ্গকে রচনাত্মক উপযোগ দ্বারা অসরদার বনানে কো কোশীশ কী। সঙ্গীত সংযোজন ঔর পরিধান নিরূপণ মে ভী নির্দেশক নে ক্ষেত্রীয়তা/প্রাদেশিকতা কে বন্ধন স্বীকার নহী কিয়ে।" ভারত দভে ময়ঙ্ক ওঝা হিরেণ ত্রিবেদী সলিল মেহতা সুভাষ ভট্ট ভদ্রেশ ত্রিবেদী ও গায়ত্রী জোষী অভিনয় নৃত্য এবং সঙ্গ ীতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এতে সঙ্গীতের যথাযথ ও নাটকীয় প্রয়োগ বিশেষ স্মরণীয়। (জয়দেব তনেজা, জনসত্তা, দিল্লী, ৩০.১০.১৯৮৫)

ঝাবেরচাঁদ মেঘানী গুজরাতী ভাষার এক বিশিষ্ট কবি। তিনি কলকাতায় ছিলেন বেশ কিছুদিন এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল। কবি মেঘানীর স্মরণে গুজরাতী ভাষায় সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় যার মধ্যে বিশিষ্ট ছিল 'অভিসার' নৃত্য, পরিচালক শীলা মেহতা। পত্রিকায় লেখা হয় —

The poet Zaverchand Meghani had a special connexion with Calcutta. He spent four years in Calcutta (1917-21) and was influenced by Rabindranath Tagore. He had translated and transcreated a number of Tagore works and published a collection under the tittle "Rabindra Beena". Gurudev had invited him to Santiniketan in 1941 to deliver five lectures on folk literature. Abhisar a dance-drama in Kathak by Shila Mehta based on the story of courtesan Vasavadatta and Buddhist monk Upagupta, translated by Meghani from Gurudev's lyrical work stood out for its slick presentation, with imaginative choreography, flawless execution of the Kathak idiom, brief cameos of six seasons, creating visuals of miniature, paintings, bathed in a soft glow by the lighting wizard Tapas Sen.

— (Sunil Kothari
The Statement 9-6-1996).

গুজরাতী সাহিত্য মন্ডল এবং শিবকুমার জোষী স্মারক নিধির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাট্য বিষয়ক এক মহতী সভার আয়োজন করা হয় ২৪-১০-১৯৯৯। সভায় রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা এবং নাটক পরিবেশন করা হয় যাতে অংশ নিয়েছিলেন বাংলা ও গুজরাতের বিভিন্ন শিল্পীরা। সমাবেশে ভারতীয় তথা গুজরাতী নাট্য সাহিত্য চর্চায় দক্ষতার জন্য দিলীপ কুমার মিত্রকে শিবকুমার জোষী সম্মান পুরস্কার অর্পণ করা হয়। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা অর্চনা বন্দোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের শরৎলক্ষ্মীর আহ্বান গীতি দিয়ে। মৈত্রী দত্ত রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের 'সুয়োরাণীর সাধ' এককভাবে সুন্দর পরিবেশন করেন গুজরাতীতে পূর্ণিমা প্যাটেল। 'অভিসার' গুজরাতীতে উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষ দেখান দিলীপ গণাত্রা ও অনুরাধা আভলানি। রবীন্দ্রভাবাশ্রিত কুন্দনিকা কাপাডিয়ার গুজরাতী গল্পের একক নাট্যরূপ বাংলায় সার্থক রূপায়িত করেন শর্মিলা বসু। বাংলা ও গুজরাতীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান ও নাটকের পরিবেশনায় বিস্ময়কর কোলাজ নির্মাণ করেন পীতম ভট্টাচার্য, জিগনা শাহ, যাদবজী মাভাডিয়া, সরলা আশার, নলিনী পারেখ, অভীক বসু, বিম্বদল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কানুভাই ভালরিয়া। "রবীন্দ্রনাথের আবেদন যে সর্বজনীন এবং রবীন্দ্রনাথের নাটককে অবলম্বন করে ভারতবাসীদের হৃদয়কে যে একসূত্রে গ্রথিত করা যায় সেদিন

আবার তা প্রমাণিত হল" (নতুন খবর, ৬.১১.১৯৯৯)। কুন্দনিকা কাপাডিয়ার রবীন্দ্রভাবাশ্রিত গল্পের নাট্যরূপ 'যেতে নাহি দিব' অন্য অনুষ্ঠানে পুনরায় পরিবেশন করেছেন অর্চনা বন্দোপাধ্যায় যাতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের নিপুণ প্রয়োগ ছিল।

৫. শরৎচন্দ্র ও গুজরাতী নাটক

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গুজরাতী নাট্য সাহিত্যের সম্পর্ক গভীর ও নিবিড়, জীবনের সঙ্গে ও। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গুজরাতীদের এত আত্মীয়তা হয়ে গেছে যে তাঁরা শরৎচন্দ্রকে বাইরের লেখক বলে মনে করেন না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব গুজরাতীতে প্রবল। তাঁর নাটকও সমাদৃত হয়েছে গভীর ভাবে। বিশেষ উল্লেখ্য মহাত্মা গান্ধীই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গুজরাতী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই ও তার বন্ধু নরহরি পারিখ গান্ধীজীর নির্দেশে শরৎ অনুবাদে ব্রতী হন।

সম্ভবত শরৎচন্দ্রের প্রথম নাটক গুজরাতীতে অনুবাদ করেন রমনলাল দেশাই — 'অলকা' (ষোড়শী) অনূদিত হয় ১৯৩৯ এ। প্রখ্যাত লেখক শিবকুমার জোষী তাঁর নাট্য অভিযান শুরু করেন 'বিরাজ বৌ' এর অনুবাদ (বাংলা নাট্যরূপ-কানাই বসু) দিয়ে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। এই নাটক অভিনীতও হয় মর্যাদা সহকারে। এই সময় থেকেই এর অভিনয় হয়। নাটকের পরিচালনায় ছিলেন প্রবাদ প্রতিম জয়শংকর সুন্দরী, অভিনয়ে অংশ নেন বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ— দীনা পাঠক (বিরাজ), কৈলাশ পণ্ড্যা (নীলাম্বর), শিবকুমার জোষী (পীতাম্বর) প্রমুখ। আমেদাবাদে হয় 'বিরাজ বৌ' এর অন্তঃ পঞ্চাশটি অভিনয়। শিবকুমার জোষী 'দেবদাস'ও (১৯৫৯) নাট্য রূপায়িত করেন এবং এই নাটকও বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। বোম্বাই-এ দেবদাস-এর সফল পরিচালনায় ছিলেন জয়ন্ত ভট্ট। আকাশবাণী আমেদাবাদ থেকে 'দেবদাস' সম্প্রসারিত হয়, পরিচালক ছিলেন শিবকুমার জোষী যিনি দেবদাস চরিত্রে অভিনয়ও করেন।

পঞ্চাশের প্রথম দিকে শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'র অভিনয় বিশেষ প্রশংসা পায়। অনুবাদ করেন শ্রী প্রবোধ চোকসী। প্রযোজক আমেদাবাদের বিখ্যাত নাট্য সংস্থা 'রঙ্গ মন্ডল'। নাটকে যাদবের ভূমিকায় অভিনয় করেন শিবকুমার জোষী, বিন্দু হলেন উষা মলজি, এবং অমূল্যকে রূপ দেন অশ্বিন মেহতা যিনি পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতিমান হন। কলকাতাতেও এর অভিনয় হয়। গুজরাতের 'নটমন্ডল' মঞ্চস্থ করে 'বিজয়া'। পরিচালক জয়শংকর সুন্দরী। আমেদাবাদে ১৯৫৬ সালে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সমাগত সুধীবৃন্দের সামনে এর অভিনয় বিশেষ সুখ্যাতি হয়। ছয়ের দশকেই অভিনয় হয় দেবদাসের অভিনব নাট্যরূপান্তর 'এক হতো দেবদাস' (এক ছিল দেবদাস)। দিল্লীতে যুব উৎসব উপলক্ষে এর অভিনয় হয়। পরিচালনায় ছিলেন কেতন মেহতা।

১৯৭৬ সালে শরৎ জন্মশতবর্ষে দর্পণ আমেদাবাদে অভিনয় করে 'নিষ্কৃতি'। অনুবাদ করেন প্রফুল্ল ঠক্কর। দর্পণ-এর খ্যাতিমান শিল্পীদের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় হয়। সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের দুটি উপন্যাস অভিনব রূপে নাট্যকারে পরিবেশিত হয়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের 'নতুন দা' অংশটি একক অভিনয়ে রূপায়িত হয়, রূপান্তর করেন এম বি দেশাই ও রূপায়িত করেন মুকুল দেশাই। 'স্বামী' উপন্যাস এক চারিত্রিক নাটক রূপে উপস্থাপিত হয়। সৌদামিনীর মুখ দিয়ে নাট্যকাহিনী ব্যক্ত করা হয়, এবং তাকে কেন্দ্র করে নাট্যমুহূর্তে গড়ে ওঠে। সৌদামিনীর যন্ত্রণা বেদনা আর্তি ব্যকুলতা চমৎকার ফুটে ওঠে আরতি গণাত্রার অভিনয়ে।

উপন্যাসের মতন প্রবল গভীর না হলেও গুজরাতী নাটকের ওপরও শরৎচন্দ্রের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক রমনলাল দেশাই-এর উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে গভীরভাবে। 'শংকিত হৃদয়' প্রভৃতি নাটকের ওপরও শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে। কে. এম. মুন্‌শী-র 'আজ্ঞাংকিত' নাটক নারীর জীবনের করুণ চিত্র আঁকা হয়েছে। অসম বিবাহের পরিণতিতে মেয়ের জীবনের বেদনা, এবং সমাজ পরিস্থিতিতে নারীদের পতিতা হয়ে যাওয়ার কথা এ নাটকে আছে — 'য়হ স্থিতি শরদবাবুকে উপন্যাসো কা স্মরণ করাতী হ্যয়'।[৩৬] কে এম মুন্‌শী-র 'পীড়াগ্রস্ত প্রফেসর'ও শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' ও অন্যান্য উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রকে মনে করায়।

প্রখ্যাত নাট্যকার শিবকুমার জোষীর শিল্প সাধনার প্রেরণা হলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের নাট্যরূপায়ন দিয়ে তাঁর জয়যাত্রা শুরু এবং বিভিন্ন শরত নাটকের রূপায়নে ও প্রযোজনায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন রচনায় শরৎচন্দ্রের প্রভাব ও প্রেরণা আছে। সমালোচক বলেছেন — 'অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক শিবকুমার জোষী তাঁর উপন্যাস ও নাটকে শরৎচন্দ্রের মত অনেক চরিত্র চিত্রণ করেছেন ও পরিবেশ অঙ্কন করেছেন'।[৩৭] শিবকুমারের 'সুমঙ্গলা' নাটকে আছে এই ভাব ও নারীর মর্যাদা কখন। শিবকুমারে 'সোনল ছায়' যেটী বাংলায় ও গুজরাতীতে নাট্যরূপায়িত হয়েছে তাতে প্রায় সবটাই কলকাতার পটভূমি পরিবেশ এবং নায়িকা এক বাঙালী মেয়ে যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে মনে করায় ও এবং নায়কও আশা করেছে শরৎচন্দ্রের রচনার ললিতা বা বিরাজের মত কোন মেয়ে তার জীবনে আসবে।

৬. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও গুজরাতী নাটক

ক. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক গুজরাতীতে

ছয়ের দশক থেকে বাংলা নাটক নতুন করে গৃহীত হতে থাকে গুজরাতীতে। ব্যবসায়িক মঞ্চের বাইরে সৃজনশীল শক্তি ও পেশাদারী দক্ষতা নিয়ে যে সব বাঙ্গলার নাট্যকাররা এগিয়ে এসে বঙ্গ নাট্যলোককে সমৃদ্ধ করছিলেন গুজরাতী নাট্য স্রষ্টারা তাঁদের গ্রহণ করেন। তরুণ রায়ের 'রজনীগন্ধা' গুজরাতীতে অনুবাদ করেন বিশিষ্ট অনুবাদক শ্রীকান্ত ত্রিবেদী এবং তা অভিনীত হয়। আমেদাবাদের 'দর্পণ' এর প্রথম অভিনয় করে ১৯৬৭ সালে ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় এ নাটক মঞ্চস্থ হয়। নায়িকার ভূমিকায় দামিনী মেহতার অভিনয় অত্যন্ত উচ্চমানের হয়। ভানু ভাই নায়ক এর অধ্যাপকও ভাল হয়। জ্যোতিবেন ভালরিয়া 'রজনীগন্ধা'র অনুবাদ করেন এবং গুজরাতী সাহিত্য মন্ডল তা মঞ্চস্থ করে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। তরুণ রায়ের 'ধৃতরাষ্ট্র' অনুবাদ করেছেন জ্যোতি ভালরিয়া।

তরুণ রায়ের 'নিশাচর' রূপান্তরিত করেন শ্রীকান্ত ত্রিবেদী (১৯৬৯) এবং আমেদাবাদের নট মন্ডল এই নাটক মঞ্চস্থ করে। পরিচালনায় ছিলেন অনসূয়া সূতরিয়া। এর আগেই মন্মথ রায়ের 'জীবনটাই নাটক' অনূদিত হয় 'জীবন এজ নাটক' (১৯৫৭) নামে। সুন্দর অনুবাদ করেছেন শ্রীকান্ত ত্রিবেদী, ভূমিকা লিখেছেন নিরুভাই দেশাই। ভূমিকায় নাটকের খুব প্রশংসা করা হয়েছে, নাটকের বক্তব্য ও আঙ্গিক সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং বলা হয়েছে গুজরাতের সঙ্গে বাংলার একত্বর কথা — "জীবন এজ নাটক মা ধন্ধাদারী [প্রফেশানাল] কম্পানীওনী অবদশানু [খারাপদশা] যে চিত্রণ ছে তে পণ আপ্রদেশনে [এই প্রদেশে] অপরিচিত নথী। অমুককালে গুজরাত মা ধন্ধাদারী

কোম্পানীও মোটা প্রমান মা চালতি হতি। আর্থিক দুর্দশা তেমনে পাইমালীনা [সর্বনাশ] পণথে দোরে নিয়ে গঈ। আ দুর্দশা কেবিছে তে আ নাটকমা দর্শাবাইউঁছে'' [দেখানো হয়েছে]।

মন্মথ রায়ের 'কুকুব বেড়াল' একাংক প্রহসনটি গুজবাতীতে অনুবাদ করেন জ্যোতি ভালরিয়া এবং সেটা কলকাতায় অভিনয় হয় ১৯৮৫ সালে। অভিনয়ে অংশ নেন পল্লবী মেহতা, শিবকুমার জোষী ও এম দেশাই।

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' গুজরাতীতে অনুবাদ করেন শ্রীকান্ত ত্রিবেদী। বিশ্বরঙ্গমঞ্চ দিবস উপলক্ষ্যে এটি বরোদায় অভিনয় হয় ২৯ মে ১৯৬৫। এই নাটকের অনুবাদ করেন টোপন খেলানী, সর্বভারতীয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার এর কলকাতা শাখা এই নাটকের অভিনয় করে মাদ্রাজ বিহার কলকাতা বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে। নির্দেশনায় ছিলেন কনু ঠক্‌কর। কিরণ মৈত্রর 'চীস' অনুবাদ করেছেন শ্রীকান্ত ত্রিবেদী এবং যশবন্ত কেলকারের পরিচালনায় বরোদার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগ অভিনয় করে।

একদা বাংলা মঞ্চে পার্থপ্রতিম চৌধুরী রচিত 'ফিংগার প্রিন্ট' নাটকটি জনপ্রিয হয়। এটি গুজরাতীতে অনুবাদ করেন শ্রীকান্ত ত্রিবেদী। বিশ্বরঙ্গমঞ্চ দিবস উপলক্ষে এই নাটক অভিনীত হয় ১৯৬৫ সালে বরোদায়। প্রযোজক সংস্থার নাম 'ত্রিবেণী', নির্দেশক মার্তন্ড ভট্ট, অভিনয়ে মার্তন্ড ভট্ট (হীরেন), উর্মিলা ভট্ট (নীলাক্ষি) প্রমুখ।

ছয়ের দশকে গুজরাতীতে অনূদিত হয় মাইকেল মধুসুদন দত্তর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকদ্বয় 'বুঢটী ঘোড়ী লাল লগাম অণে জোশুঁ সভ্যতা কহেছে' নামে। ১৯৬৩ তে নাটক দুটি অনুবাদ করেন বাচুভাই শুক্ল। উৎপল দত্তব 'মেঘ' গুজরাতীতে অনুবাদ করেন শ্রীকান্ত ত্রিবেদী 'গগনে মেঘ ছবায়ো' নামে।

বাদল সরকারের নাটক সারা ভারতে খ্যাতি পেয়েছে। গুজরাতী নাট্য আন্দোলনের তিনি সঙ্গী হয়েছেন। এবং ইন্দ্রজিৎ (অনে ইন্দ্রজিৎ পণ) অভিনয় করেন থিয়েটার ইউনিট। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' প্রবীণ যোশীর পরিচালনায় অভিনয করে আই এন টি। (১৯৬৫-৬৬); 'পাগলা ঘোড়া' বোম্বেতে মঞ্চস্থ হয় লতেশ শাহ্-র পরিচালনায়। প্রযোজনা আই. এন. টি। সাতের দশকে পরীক্ষামূলক নাটক হিসাবে 'এবম ইন্দ্রজিৎ' মঞ্চস্থ করে গুজরাত কলেজের নাটক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। 'বল্লভপুরের রূপকথা' (বল্লভপুরনী রূপকথা) গুরজারাতীতে অনুবাদ করেছেন জ্যোতি ভালরিয়া এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বাংলা ও গুজরাতী নাট্য সম্মেলনে' উপলক্ষে তা শ্রুতিনাটক রূপে পঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। ''নাট্যাংশটি আবেগময়। গুজরাতী ভাষাজ্ঞান না থাকলেও পাঠের গুণে শুনতে ভাল লাগে।''[৩৮] 'বল্লভপুরনী রূপকথা' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ তে।

বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' গুজরাতীতে অনুবাদ করেন অধ্যাপক ভোলাভাই প্যাটেল। ১৯৮২ সালে এটি প্রকাশিত হয়। বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' গুজরাতীতে অনুবাদ করেন শিবকুমার জোষী 'নবু ধান' নামে ১৯৮১ তে। ন্যাশানাল বুক ট্রাস্টের আদান প্রদান সিরিজের মহা পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়ে এটি প্রকাশিত হয়। নাটকের পরিচয় বলা হয়েছে —

বঙ্গালমা জ্যারে বিজন ভট্টাচার্যনু নাটক 'নবান্ন' রঙ্গমঞ্চ পর ভজবায়ু হেতু ত্যারে ত্যানা নাট্য আন্দোলননে নবী দিশা মলী হতী।'' (চতুর্থ প্রচ্ছদ)

বাংলার বিশিষ্ট কবি ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতীকনিবিড় ব্যঞ্জনাঢ্য নাটক 'প্রাণের প্রহরী' গুজরাতীতে মঞ্চস্থ হয়েছে শ্রুতিনাটক রূপে। ১৯৮৫ তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসনে নাটকটি ঈষৎ সংক্ষেপিত রূপে পরিবেশন করেন গুজরাতী সাহিত্য মন্ডলের শিল্পীরা। 'আজকাল' পত্রিকা লিখছেন — "গুজরাতীতে প্রাণের প্রহরী-র নাট্যরূপ দেন মধুভাই দেশাই। সম্পূর্ণ গুজরাতী ভাষায় নাটকটি পরিবেশিত হলেও ভাষা না বোঝার বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, তা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেদিন।"[৩৯] আনন্দলোক লেখে — "সবচেয়ে ভালো লাগলো, গুজরাতী ভাষায়, সুনীলের নাটক, প্রাণের প্রহরী-র অংশ বিশেষের অভিনয় দেখে।"[৪০] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিভিন্ন কবিতা অবলম্বনে 'দর্শন' সংলাপ কাব্যে রূপান্তরিত করা হয়। গুজরাতীতে অনুবাদ করেন শিবকুমার জোষী। এই নাটিকার সুন্দর অভিনয়ও হয়। "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা অবলম্বনে সংলাপ-নাটিকা 'দর্শন'-এর অভিনয়ে অপরিসীম দক্ষতা দেখান বিশিষ্ট গুজরাতী অভিনেত্রী পল্লবী মেহতা ও বরেণ্য গুজরাতী সাহিত্যিক স্রষ্টা শিবকুমার জোষী। নর-নারীর সহজ অথচ রহস্যময় প্রেমের গভীর অনুভব তাঁদের অভিনয়ে মূর্ত হয়।"[৪১]

খ. সাম্প্রতিক গুজরাতী নাটক বাংলায়

গুজরাতী থেকে বাংলায় অনুবাদ বা অভিনয়ের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। প্রভাবিত নাটক নেই বললেই চলে। তবু যে পরিমাণ গুজরাতী নাটক বাংলায় গৃহীত হয়েছে তা গভীর ও মর্যাদাপূর্ণ।

শিবকুমার জোষীর 'প্রসন্ন দাম্পত্য' নাটক বাংলায় অনূদিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে 'কলকাতা' পত্রিকায় (২য় বর্ষ ১০-১১ সংখ্যা)। শিবকুমারের আবেগময় প্রজ্ঞা নিষিক্ত উপন্যাস 'সোনল ছায়' বাংলায় অনুবাদ করেন গৌরী ধর্মপাল। এই উপন্যাসকে নাটকে রূপ দেন পূর্ণশ্রী মিত্র এবং তা অভিনীত হল কলকাতায় (ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫)। 'সোনালী ছায়া'র এই অভিনয় রসিকজনের কাছে সমাদৃত হয়। পত্রিকায় মতামত উল্লেখ করা যায়। দৈনিক বসুমতী লিখেছেন — "শিবকুমার জোষীর 'সোনল ছায়' রূপায়িত করেন ডঃ মানব লাহিড়ী, পুস্পল মুখোপাধ্যায়, সব্যসাচী বসু, শক্তিসিতা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু দে ও তপসী ভট্টাচার্য। এক বাঙালী মেয়ের সঙ্গে দুই গুজরাটী যুবকের রাগ অনুরাগ মিলন-বিরহের কাহিনী আশ্চর্য মহিমায় ফুটেছে নাটকে।"[৪২] দেশ পত্রিকার মতে এই নাটকে "সুষ্ঠু পরিকল্পনার ছাপ ছিল।"[৪৩] নাটকটি 'অনুবাদ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

শিবকুমার জোষীর 'চতুষ্কোণ' এক অভিনব আঙ্গিকের কাহিনী। চারটি চরিত্রের চিঠির মধ্য দিয়ে কৌতুকধর্মী প্রেমের গল্পটি গড়ে উঠেছে। 'চতুষ্কোণ' কে বাংলা নাটকে রূপায়িত করেন দিলীপ কুমার মিত্র এবং দিলীপ গণাত্রার পরিচালনায় ড্রামা একাডেমী ইন্ডিয়ার শিল্পীরা পরিবেশন করেন ১৯৮৬ র কলকাতা বইমেলায় শ্রতি নাটক রূপে। 'চতুষ্কোণ' নাটকটি পরেও অজস্রবার অভিনীত হয়েছে। দুটি প্রয়োজনার বিশেষ উল্লেখ করা যায়। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শিক্ষকরা এটি অভিনয় করেন ১৯৯৮ তে। ১৯৯৯র জানুয়ারীতে আবার তাঁরা এটি মঞ্চস্থ করেন। পত্রিকায় লেখা হয় — "গুজরাতী গল্পকার শিবকুমার জোষীর কৌতুক রসাশ্রিত কাহিনী 'চতুষ্কোণ' নাট্যরূপে পরিবেশেন করেন ড্রামা একাডেমীর শিল্পীরা। দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ভাস্বর মুখোপাধ্যায়, অন্যন্যা তরফদার, মৌসুমী পোদ্দার সরকার, শুভ্রা বৈশ্য, অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায় — সকলেই সফল শিল্পী"

(নতুন খবর ১৩.২.১৯৯১)। কুমারেশ চক্রবর্তী এবং সুভাষ চন্দ্র দত্ত ছিলেন সহযোগী। 'চতুষ্কোণ' একাধিকবার পরিবেশন করেছে সৃজন সংস্থা, বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। সহযোগী শিল্পীরা হলেন শর্মিলা বসু, পিউলি বন্দ্যোপাধ্যায়ে, ভাস্কর বসু প্রমুখ। ২০০০ সালে এটি বাংলা অ্যাকাডেমিতে শ্রুতি নাটকরূপে উপস্থাপিত হয়।

উমাশংকর যোশীর 'নটীশূন্যম' একাংটি বাংলায় অনুবাদ করেন বোম্বানা বিশ্বনাথম। নাটকটি 'সংলাপ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গুজরাতের প্রথম যুগের গল্পকার মলয়ানিল-এর ছোটগল্প 'গোয়ালিনী' কে নাট্যরূপ দেন ডঃ দীপক চন্দ্র পোদ্দার। নাটকটি 'ভারতীয় একাংক গুচ্ছ' সংকলনের অন্তগর্ত।

নবীন নাট্যকার মধু রায়-এর 'বিষ' নাটকটি বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় 'কলকাতা' পত্রিকায় গুজরাতী সংখ্যায় (২য় বর্ষ ১০ ১১ সংখ্যা)। মধু রায়ের 'সরল' গল্পটি এক চারিত্রিক নাটকে পর্যবসিত করা হয় এবং বাংলা গুজরাতী নাট্য সম্মেলনে কলকাতায় তা পরিবেশিত হয় পঁচাশিতে।

গুজরাতের নিরীক্ষামূলক নাটকের খ্যাতিমান লেখক শ্রীকান্ত শাহ্ বাংলায় বিশেষ সমাদৃত হয়েছেন। তার 'অনে হুঁ' (এবং আমি) একাংক সংকলনের অন্তগর্ত '৪৬ ক্রোমোজোম্‌স' বাংলায় অনুবাদ করেন দিলীপ কুমার মিত্র এবং নাটকটি ১৯৮৪র শূদ্রক শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। শ্রীকান্ত শাহর 'একান্তনি আডোয়াড' (একান্তর কাছাকাছি) এম. বি. দেশাই বাংলায় অনুবাদ করেন এবং এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় কলকাতায়। বিশেষ উল্লেখ্য এই যে গুজরাতী নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেন এক গুজরাতীভাষী মানুষ ও এই বাংলা অভিনয়ে অংশ নেন গুজরাতী অভিনেতারা।

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত একটি গুজরাতী পত্রিকায় লেখা হয়—"শ্রীকান্ত শাহ লিখিত নাটক 'একান্তনী আড়োয়াড' নো মধুভাই দেশাইএ করেলো বঙ্গালী অনুবাদ মুকুল দেশাই অনে মহেশ ভোরাএ সুন্দর রীতে ভজব্যো হতো। দর্শএ আ নাটক রসপূর্বক মান্য, গুজরাতী নাটকনো এক গুজরাতী এ করেলো বঙ্গালী অনুবাদ, গুজরাতী কলাকারো বঙ্গালী দর্শকো সমক্ষ রজু করে এ বাত সহুনে স্পর্শী গই"।[৪৪] নাটকের পরিচালক দিলীপ গণাত্রা।

শ্রীকান্ত শাহর আর এক পরীক্ষামূলক নাটক 'তুষার তপোধন' বাংলায় অনুবাদ করেন এম. দেশাই ও কৃষ্ণেন্দু দে এবং এটি বাংলায় উপস্থাপিত করেন কৃষ্ণেন্দু দে ১৯৮৬ তে।

দুর্গেশ শুক্লর একটি নাটকের ভাব অবলম্বনে বাংলায় নাটক 'উত্তরণ'। এক ভিক্ষুণী ও এক শ্রমণের মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব যন্ত্রণা ক্ষোভ ও তার থেকে পরম বোধে উত্তীর্ণ হবার কাহিনী এতে কথিত। প্রয়াগ নাট্য সংস্থা অনুষ্ঠিত নাট্য সভায় এটি পরিবেশিত হয় সৃজনী মঞ্চে। এই নাটক বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপিত করেছেন অমল রায় ও বন্দনা রায়। সব্যসাচী বসু মীনাক্ষী চক্রবর্তী এবং অন্যান্যরাও করেছেন। নাটক লিখেছেন দিলীপ কুমার মিত্র।

"ত্রেপ্পান সিং চাওড়া জীবেছে' রমেশ পারেখ রচিত একাংক নাটক। এটি বাংলায় অভিনীত হয় কলকাতায় ১৯৮৫ র ১২ অক্টোবর। সমালোচকের মতে এই নাটক "কৌতুক ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে জীবনের চিরায়ত মূল্যবোধকে বিচার করে। বাংলায় সুন্দর অভিনয় হয়েছে।"[৪৫]

যশবন্ত পন্ড্যা রচিত 'ওস কো মোতী' গুজরাতী একাঙ্ক বাংলায় 'শিশির মুক্তা' নামে অভিনয় হয় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবন মঞ্চে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। পরিচালক ছিলেন দেবাশিস রায়চৌধুরী যাঁর সঙ্গে অভিনয়ে অংশ নেন অরুণিতা মজুমদার ও গৌরী রায়। বর্ষা অডালচা রচিত 'আওয়াজোনু ঘর' (শব্দের ঘর) গল্পের মধ্যে এক প্রবীণা নারীর স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে জীবনের গভীর অনুভব সুন্দর আবেগময় রূপ পেয়েছে। এর নাট্যরূপ দেওয়া হয় যেটি একক অভিনয়ে আন্তরিক কথনে তুলে ধরেন সুনন্দা বিশ্বাস ১৯৯৯ জানুয়ারিতে। এর একাধিক মঞ্চন হয়।

লাভশংকর ঠকর রচিত 'বৃক্ষ' গভীর মানবিক মূল্যবোধের নাটক। এটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন দিলীপ কুমার মিত্র ও দিলীপ গণাত্রা। নাটকটি বাংলায় একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে। সর্বদমন সোমের পরিচালনায় 'বৃক্ষ' উপস্থাপিত হয় গিরিশ মঞ্চে ১৯৯৯ তে। প্রযোজনা দৌবারিক। সন্ধানী কাঁচড়াপাড়া বিভিন্ন স্থানে 'বৃক্ষ' মঞ্চস্থ করে, পরিচালক অনুপ রায়। অন্যান্য সংস্থাও এটি করেছে।

সুদর্শন দেশাই-এর একটি গুজরাতী গল্পের ভাবনা নিয়ে ডঃ সোমনাথ মিত্র লিখেছেন 'আহ্বান' যাতে এক মেয়ের অসহায় বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটি ২০০০ সালে শারদীয় অভিনয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি শ্রুতি নাটকরূপে উপস্থাপিত হয়। নাটকে অংশ নেন সুদীপ্ত সেন, মল্লিকা দাস ও বর্ণালী রায় যাঁরা অভিনয়-দক্ষতায় নাটককে প্রাণবন্ত করে তেলেন।

এভাবেই গড়ে উঠেছে বাংলার সঙ্গে গুজরাতের অচ্ছেদ্য যোগসূত্রের বন্ধন।

সূত্র পরিচিতি

১. গন্ধক্ষত, অনন্তরায় রাবল, পৃঃ ১৪৪, গুজরাত, ১৯৪৯

২. Gandhian Era in Gujrati Literature. D. J. Thakore. p. 7. Rajkot. 1955

৩. "In the Gandhian Era the form of literature and the main themes of drama were resistance against administration. introduction of prohibition and removal of inequaitity" in the society. — Ibid, p. 29.

৪. গুজরাতী একাঙ্ক নাটকগুচ্ছ, এ এম রাবল সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃঃ IX, নতুন দিল্লী, ১৯৭৪।

৫. তদেব, পৃঃ X.

৬. Modern Gujrati Literature, Gulabdas Broker, p. 109. United Asia.

৭. Enact, Ed. R. Paul (Guest Editorial, Goverdhan Panchal and Bakul Tripathi). March-April, 1979. New Delhi.

৮. "K. M. Munshi is universally recognised as one of the greatest writers of Modern India. as he has been in the fore-front of Indian political and cultural life .... and the present age of Gujrati literature can very well be described as the Age of Kanhailal Munshi. "— Language and Literature of Modern India, S. K. Chatterjee, p. 244. calcutta, 1963.

৯. Indian Literature since Independence. ed. K. R. Srinivasa Iyenger (article — Gujrati. Suresh Joshi, p. 72). New Delhi, 1973.

১০. Ibid. p. 74.

১১. নাটক, অনামিকা, পৃঃ ৮, নভেম্বর, ১৯৭৬।

১২. সুন্দরম, রজত জয়ন্তী স্মারক পত্র (প্রবন্ধ - গুজরাতী থিয়েটার, শিবকুমার যোশী, পৃঃ ১) কলিকাতা।

১৩. Enact. Ed. R. Paul (acrticle — The Playwright Interviewed. Labhshankar Thakar). New Delhi, March-April, 1979.

১৪. Enact, Ed. R. Paul (Towards a New Theatre. Sitanshu Yashaschandra). New Delhi, March-April, 1979.

১৫. Enact, Ed. R. Paul, Labhshankar Interviewed. New Delhi. March-April, 1979.

১৬. Enact, Ed. R. Paul (acrticle — Towards a New Theatre. Sitanshu Yashaschandra), New Delhi. March-April. 1979.

১৭. গুজরাতী সাহিত্যনী বিকাশ রেখা, ডঃ ধীরভাই প্যাটেল, পৃঃ ৫০, সুরাট, ১৯৫৭।

১৮. Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebrations. Vol-II. Ed. S. C. Sengupta (article — Rabindranath and Gujrati Literature, Umashankar Joshi, p. 40). Santiniketan.

১৯. অনুবাদ পত্রিকা, বৈশম্পায়ন ঘোষাল সম্পাদিত, পৃঃ ৫৯, কলিকাতা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭

২০. অচলায়তন, অনুবাদ গিরিধারী কৃপালিনী (ভূমিকা - স্বামী আনন্দ)

২১. অন্ধরা রঙ্গমহেলনো রাজা (রাজা) অনুবাদ স্বামী সেবানন্দ, ভূমিকা, আমেদাবাদ, ১৯৩২।

২২. "Tagores infulence has been more on the mind of Gujrat than its literature" — Umashankar Joshi. Rabindranath and Gujrati Literature, p. 40, (article in the book Rabindranath Togore Birth Centenary Celebration. Ed S. C. Sengupta). Santiniketan.

২৩. Ibid, p. 45.

২৪. Ibid. p. 45.

২৫. "Krishanlal Sridharani made a promising debut with the Vadlo. Mor-nan Indan and Padmini wherein he tried to follow the footsteps of masters like Togore, Ibsen and Maeterlinck" — Gujrati Drama. Anantrai Raval, p. 88, in Indian Literature, Sahitya Akademi. April-Sept. 1958. New Delhi.

২৬. গুজরাতী নাট্য সাহিত্যনো উদ্ভব অনে বিকাশ, মহেশ চোকসী, পৃঃ ৩৩৫, আমেদাবাদ, ১৯৬৫।

২৭. পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৭৯-৮৬।

২৮. Drama, Shiv Kumar Joshi, P.

২৯. (ক) Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebrations. Vol-2. Ed. S. C. Sengupta (article — Rabindranath and Gujrati Literature. K M. Munshi. p. 49), Santiniketan.

২৯. natya, Tagore Issue (article — Dance dramas of Tagore. Dr. Charles Fabri p. 15), New Delhi.

৩০. দর্পণ, প্রচার পত্র, আমেদাবাদ, ১৯৬১

৩১. Enact. Ed. R. Paul Sept.-Oct. 1982, New Delhi.

৩২. The Hindustan Times. New Delhi. 25.5.87.

৩৩. দেশ, কলিকাতা, (প্রবন্ধ — লন্ডনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব, ভবতোষ দত্ত) ৩১.৮.৮৫।

৩৪. যুগান্তর, কলিকাতা, ৫.৬.৮৭

৩৫. তদেব।

৩৬ হিন্দী ঔর গুজরাতী নাট্যসাহিত্য কা তুলনাত্মক অধ্যয়ন, ডঃ রণবীর উপাধ্যায়, পৃঃ ২২৪, দিল্লী, ১৯৬৬।

৩৭ A very popular writer like Shiv Kumar Joshi has given many character sketches approximating Sarat Chandra and his envirorment in his novels and plays Saratchendra at a Distance Raghuveer Choudhury, p 15 article in the book The Golden Book of Saratchandra Calcutta 1977

৩৮ দেশ, কলিকাতা, ৬ ৪ ৮৫

৩৯ আজকাল, কলিকাতা, ৯ ৭ ৮৫

৪০ আনন্দলোক, কলিকাতা, ২৮ ১২ ৮৫

৪১ দৈনিক বসুমতী, কলিকাতা, ১১ ২ ৮৫

৪২ তদেব।

৪৩ দেশ, কলিকাতা, ৬ ৪ ৮৫

৪৪ জন্মভূমি প্রবাসী, বোম্বাই, ১৫ ৫ ৮৫

৪৫ আজকাল, কলিকাতা, ২৬ ১১ ৮৫

চতুর্থ অধ্যায়
আধুনিক হিন্দী নাটক

১. সূচনা পর্ব

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাব ও রীতিকে অতিক্রম করে হিন্দী নাট্যসাহিত্যকে নতুন যুগে নিয়ে এলেন **ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র** (১৮৫০-১৮৮৫) যাকে প্রকৃতিপক্ষে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের জনক বলা হয়। কবিতা প্রবন্ধ নাটক সব বিষয়ে তিনি দক্ষ, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতা অপরিসীম। তাঁর সামনে হিন্দী নাটকের কোন আদর্শ ছিল না তবু ভিন্নতর ভাবনা মনে রেখে গভীরতম শিল্প বোধে উদবুদ্ধ হয়ে তিনি নাটক সৃষ্টি করেছেন। নাটক কে ক্ষেত্র মে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র কে হিন্দী কী কোই উল্লেখনীয় পরম্পরা নহি মিলী। উন্হীনে অংগ্রেজী ঔর বংগলা কী নবীনতাওঁ সে প্রেরণা গ্রহণ কর হিন্দী মে ভী নয়ে ঢঙ্গ কে নাটক লিখনে কা উপক্রম কিয়া।[১] এ প্রসঙ্গে আরো স্মরণীয়, পারসী থিয়েট্রিকাল কোম্পানীর কুরুচিপূর্ণ নাট্যপ্রদর্শনীর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র সুরুচিপূর্ণ শিল্প সম্মত নাটক রচনায় ও তার প্রয়োজনায় ব্রতী হন ও এ ব্যাপারে অসাধারণ সাফল্য ও গৌরব অর্জন করেন।

ভারতেন্দুর প্রথম নাটক 'রত্নাবলী' সংস্কৃত থেকে অনূদিত, দ্বিতীয় নাটক 'বিদ্যাসুন্দর' বাংলা থেকে, তৃতীয় 'পাখন্ড বিড়ম্বন' (১৮৭২) কৃষ্ণ মিশ্র রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়'-এর তৃতীয় অঙ্কের অনুবাদ — এতে ধর্মের নামে যে ব্যাভিচার ভন্ডামী চলে তার ওপর আঘাত। ভারতেন্দুর প্রথম মৌলিক নাটক 'বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি' (১৮৭৩) উচ্চ মার্গের প্রহসন এবং তথাকথিত ধার্মিক ও পুরোহিতদের লোভলালসার ওপর তীব্র আক্রমণ। 'ধনঞ্জয় বিজয়' (১৮৭৩) মহাভারতের বিরাট-পর্ব অবলম্বনে ব্যায়োগ নাটক। ভারতেন্দুজীর 'সত্য হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫) তাঁর বিশেষ খ্যাতিমান নাটক। এর ভিত্তি ক্ষেমেশ্বর-এর 'চন্ড কৌশিক' ও রামচন্দ্রর 'সত্য হরিশ্চন্দ্র' নাটক হলেও এটা মৌলিকতার মর্যাদা পেতে পারে। নাটকে হরিশ্চন্দ্রর সত্যবাদিতা দানশীলতা ও ধর্মপরায়ণতার সুন্দর চিহ্ন আছে। এতে হরিশ্চন্দ্রের মানসিক বেদনা যন্ত্রণা সুন্দর ফুটেছে। বস্তু বিন্যাসে ঔৎসুক্য ও কৌতুহল বিদ্যমান। নাটকে করুণরসের প্রবাহ মনকে আপ্লুত করে। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রর মৌলিক নাটকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'চন্দ্রাবলী' (১৮৭৬) ভক্ত বৈষ্ণব শিল্পীর নিবিড় কৃষ্ণ প্রেমের পরিচয় বহন করে। চন্দ্রাবলীর প্রেম বিরহ ব্যাকুলতা ও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনই এর বিষয়। আঙ্গিকের দিক থেকে এতে রাসলীলার ঢঙ পাওয়া যায়, ভাবের দিক থেকে ভক্ত শিল্পীর নিষ্কাম হরিভক্তি ও পরমতত্ত্বের প্রকাশ আছে। 'ভারত দুর্দশা' (১৮৮০) ভারতের জাগরণ ও দেশের অধঃপতনের চিত্র। অপেরার ঢঙে লেখা 'ভারতজননী' (১৮৭৭) কিরণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত মাতা'র প্রায় অনুবাদ। 'ভারত ভূমি ঔর ভারত সন্তান কী দুর্দশা দিখানা' এই নাটকের উদ্দেশ্য। ভারত মাতা ও তার অসহায় সন্তানরা রাণী ভিকটোরিয়ার কাছে আবেদন জানাল 'একবার আপ দয়া কর ইন অনাথ ভারত সন্তানো কে প্রতি আপনা কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপণ কীজিয়ে কারণ আপ সর্বশক্তিমান

ঔর পরম কারুণিক হ্যয়, আপ প্রচ্ছন্ন ভেষ সে দরিদ্রো কা দুখ দূর করতী হুই সমস্ত নগর মে বিচরণ করতে হ্যয়'। শেষ পর্যন্ত ভারত মাতা জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। 'অন্ধের নগরী' (১৮৮১) গ্রামজীবনের পটভূমিকায় লোকরীতির ঢঙে প্রহসন। গ্রামীন জীবনের বিভিন্ন কৌতুককর ভাবনার চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ চেতনার প্রকাশ এতে আছে। নাটকটি বর্তমান কালেও অভিনীত হচ্ছে ও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করছে। মৌলিক ঐতিহাসিক নাটক 'নীল দেবী'তে (১৮৮১) দেশচেতনা পরাধীনতার জ্বালা স্বাধীনতার বাসনা প্রকাশিত তার সঙ্গে সঙ্গে নারীত্বের মহৎ আদর্শ প্রতিপাদিত। আবদুল শরীফ নীচ কৌশলে সুর পঞ্জাব নরেশ সূর্যদেবকে বন্দী করে ও বীররাজা মাথা উঁচু করে মৃত্যুবরণ করে। তার পত্নী নীল দেবী নর্তকীর ছদ্মবেশে আবদুল শরীফের দরবারে প্রবেশ করে ও তাকে হত্যা করে স্বামী হত্যার বদলা নেয় ও সহমরণে যায়। ভারতেন্দুর নাটকের মূল্যায়নে ডঃ সন্তোষ গার্গী বলেছেন—

সরাহনীয় বাত যহ হ্যয় কি উনকী নাট্যকলা রঙ্গমঞ্চ পরমপরা সে কটী হুই নহী হ্যয়। উনকে নাটকেঁ যে উচ্চ কোটি কী সাহিত্যিকতা হ্যয় ঔর রঙ্গমঞ্চীয়তা ভী হ্যয়। উন্হীনে উন নাটকো কী রচনা মূলতঃ রঙ্গমঞ্চ কে হী লিয়ে কী থী। উনকী প্রেরণা তথা প্রোৎসাহন সে কই অন্য লেখকো নে হিন্দী মে নাট্যরচনা কী, কই নাট্য মন্ডলিয়ো কী স্থাপনা হুই ঔর হিন্দী জগত সর্বপ্রথম প্রশস্ত রূপ সে নাটক এবং রঙ্গমঞ্চ কী ওর আকৃষ্ট হুয়া'।[২]

ভারতেন্দু যুগের অন্যান্য নাট্যকার হলেন প্রতাপ নারায়ণ মিশ্র (ভারত দুর্দশা, কলি কৌতুক), বালকৃষ্ণ ভট্ট (রেল কা বিকট খেল, বাল বিবাহ), লালা শ্রীনিবাস দাস (রণধীর প্রেমমোহিনী, তপ্তা সংবরণ), রাধাচরণ গোস্বামী (সতী চন্দ্রাবলী, তন মন ধন গোসাঁইজী কে অর্পণ), রাধাকৃষ্ণ দাস (দুখিনী বালা, রাণী পদ্মাবতী), বলদেব মিশ্র (মীরাবাঈ, নন্দবিদা), তোতারাম শর্মা (বিবাহ বিড়ম্বন), অম্বিকা দত্ত ব্যাস (ললিতা) প্রমুখ। এই সব নাটকের অধিকাংশের বিষয়বস্তু প্রেম, সমাজ সংস্কার তথা দেশ প্রেম; পরিবেশ চরিত্রচিত্রণ বাকরীতিতে তৎকালীন জীবনের ছাপ আছে।

ভারতেন্দু কাল ও প্রসাদ কালের মধ্যে (বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশক) কিছু নাটক লেখা হয়েছে যেগুলো উচু মানের না হলেও নাট্যধারাকে বহতা রেখেছে। উল্লেখ্য নাট্যকার হলেন—বদ্রীনাথ ভট্ট (চুঙ্গীকী উম্মীদবারী), রাধেশ্যাম মিশ্র (কৌসল কী মেম্বরী), সুদর্শন (অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট), জে পি শ্রীবস্তব (মার মার কর হকীম), মিশ্রবন্ধু (নেত্রোন্মীলন) প্রমুখ। আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল ভারতেন্দু পরবর্তী এই সব নাটকের মধ্যে বিশেষ কোন উল্লেখ্য দিক বা মৌলিকতা খুঁজে পান নি।[৩] সমালোচক এই নাট্যকালকে যথার্থ সন্ধিকাল বলে উল্লেখ করেছেন, 'যহ কাল বিশেষ রূপ সে ভাবুকতা ঔর বুদ্ধিবাদ কা সন্ধিকাল বনা।'[৪]

হিন্দী নাটকের বিকাশে দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয় **জয়শঙ্কর প্রসাদ** (১৮৮৯-১৯৩৭) এর আবির্ভাবে। তিনি ভারতেন্দুর মত এক যুগের স্রষ্টা। ভারতেন্দু রীতিতে নাট্যরচনা শুরু করে প্রসাদ অবিলম্বেই স্বীয় নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্বারা হিন্দী নাট্য সাহিত্যে নতুন রীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয় সূক্ষ্ম দৃষ্টি বিশাল কল্পনাশক্তি ও গভীর নাট্য প্রতিভা তাঁর সৃষ্টিকে করেছে অসামান্য।

১৯১০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত জয়শঙ্কর প্রসাদ লিখেছেন ১৩টি নাটক— সজ্জন, কল্যাণী পরিণয়, করুণালয়, প্রায়শ্চিত্ত, রাজ্যশ্রী, বিশাখ, অজাতশত্রু, জন্মেজয় কা নাগযজ্ঞ, কামনা, স্কন্দগুপ্ত, এক ঘুঁট, চন্দ্রগুপ্ত ও ধ্রুবস্বামিনী। এদের মধ্যে প্রথম একাংক

জাতীয় চারটি ভারতেন্দু যুগের রীতির দ্বারা প্রভাবিত, সংস্কৃত নাটকের প্রভাবও প্রবল, এবং পারসী প্রভাবমুক্ত নাটক 'বিশাখ' (১৯২১)। ইংরাজী নাট্যাদর্শ ক্রমশঃ প্রভাবিত করতে সুরু করেছে প্রসাদকে। 'অজাতশত্রু' (১৯২২) নাটকে প্রসাদ আশ্বস্থ হয়েছেন। 'জনমেজয় কা নাগযজ্ঞ' (১৯২৬) মহাভারত কথাশ্রিত। পৌরাণিক এই নাটকের বিষয় জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ — নাগজাতির বিদ্রোহ, জনমেজয়ের যুদ্ধ যাত্রা, আর্য ও অনার্যর (নাগজাতি) সংঘাত এবং শেষে মিত্রভাবে তাদের অবস্থান। এই মিলনে লেখক সমকালীন ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান মিলনের কথা বলেছেন, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষের সম্পর্কও আঁকা হয়েছে নাটকে। 'কামনা' প্রতীকবাদী রূপক নাটক যার প্রধান বিষয় জীবনে সুখশান্তির অন্বেষণ। চাষ করে ফসল ফলায় চরকা কাটে এমন এক শান্তিপূর্ণ জাতির মধ্যে পরদেশী মানুষ বিলাস ও তার স্ত্রী এসে লোভে লালসায় ঈর্ষা বিদ্বেষে মদ্যপান ব্যভিচারে আগুন জ্বালিয়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত বিবেকের কথায় আবার সবাই শান্ত স্থির হয়। তাড়ান হয় বিলাস ও লালসাকে। নাটকে গান্ধীজীর আদর্শের প্রতিফলন পাওয়া যায়। 'যহ সময় ভারতমে মহাত্মাজীকে উপদেশো দ্বারা নবজাগরণ কা যুগ থা, জিসমে রুই কা ওটনা, চরখা কাতনা, কৃষিকার্য মে হাথ বঢ়ানা আবশ্যক কার্যক্রম মানা জাতা থা। ত্যাগ ঔর তপস্যা সংযম ঔর পরিশ্রম কা মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ দিখাই পড়তা থা'।[৬]

'স্কন্দগুপ্ত' (১৯২৮) ও 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯৩১) ইতিহাসের সুবিখ্যাত কাহিনীকে অবলম্বন করে লেখা নাটক যাতে প্রসাদজীর প্রতিভা চূড়ান্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে সার্থকভাবে। দুইটি নাটকের মধ্যে তুলনায় 'স্কন্দগুপ্ত' উন্নততর বলে সমালোচক মনে করেন, কারণ চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাকৃত শিথিল দীর্ঘায়ত (চন্দ্রগুপ্তর চতুর্থ অংকে ষোলটা দৃশ্য), বস্তু যোজনা অবিন্যস্ত, নায়িকা সুচিত্রিত নয় এবং স্কন্দগুপ্তর ঘটনায় আরোহ অবরোহ ও নাটকীয়তা বেশী।

জয়শঙ্কর প্রসাদের শেষ নাটক 'ধ্রুবস্বামিনী' (১৯৩৩) বিষয় ও আংগিকে পূর্বরচনা থেকে ব্যতিক্রম। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত বড় ছেলে রামগুপ্ত অপদার্থ বলে ছোট চন্দ্রগুপ্তকে যুবরাজ করতে চান কিন্তু সে দাদাকেই সেই মর্যাদা দেয়। পরমা সুন্দরী ধ্রুবস্বামিনীর সঙ্গে একারণেই রামগুপ্তর বিবাহ হয়। শক আক্রমণ হলে অপদার্থ বিলাসী রামগুপ্ত সংকট সমাধানে ধ্রুবস্বামিনীকে শকরাজার হাতে সমর্পন করতে চায়। বীর সাহসী চন্দ্রগুপ্ত নারীবেশ ধরে ধ্রুবস্বামিনীর সঙ্গে শকরাজার কাছে যায় ও তাকে হত্যা করে। এক ক্রুদ্ধ সামন্ত অপদার্থ রামগুপ্তকে হত্যা করে ও পুরোহিতের শাস্ত্র বিহিত সম্মতিতে চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে ধ্রুবস্বামিনীর বিবাহ হয়। নাটকের কটা বিষয় বিশেষ উল্লেখ্য — এর বস্তুবিন্যাস পূর্ববর্তী কাহিনী থেকে ভিন্ন, এর কথাসূত্র একটি ফলে কাহিনী দৃঢ় সুগঠিত, আঙ্গিক সুবিন্যস্ত, ভাষা সহজ স্বাভাবিক, বক্তব্য জোরালো — স্ত্রী বা বিধবার পুনর্বিবাহ।

প্রসাদজীর নাটকে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাট্যকলার সমন্বয় ঘটেছে। চরিত্রের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু গভীর ও গম্ভীর। দেশকাল ইতিহাস চেতনা তাঁর নাটকে আছে, সঙ্গে সঙ্গে আছে জীবন অনুধ্যান। তাঁর নাটকের ভাষাও বিষয়ের মত গম্ভীর মর্যাদাপূর্ণ এবং তা কাব্যিকাতায় সমৃদ্ধ। তার ত্রুটিও চোখে পড়ে। 'প্রসাদকে নাটকো কে বিষয় মে য়হ আম শিকায়ত হ্যয় কী উনকে নাটক ভাষা শৈলী কী দূরহতা ঔর কবিত্বপূর্ণতা, ভাবো এবং বিচারো কী রহস্যাত্মকতা এবং দার্শনিকতা তথা দৃশ্য-যোজনা কী জটিলতা, স্বগত ঔর গীতোঁ কী ভরমার আদি দোষোঁ কে কারণ অভিনেয় নহী হ্যয়।[৭]

কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি জয়শংকর প্রসাদের আছে এবং অনেক সময় তা তীব্র সমালোচনার কারণও হয়েছে, তথাপি হিন্দীনাটক সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসাদজী চিরকালীন মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

২. প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব

"কল্প কথা ও রাজারাজড়াদের প্রেম কাহিনীর যুগ শেষ হয়ে গেছে। বাস্তবের প্রকাশ না থাকলে এখন সাহিত্য মূল্যহীন। এখন চাই খাঁটি রক্ত মাংসের মানুষের কথা। আমাদের কাছে সেটাই প্রগতিশীল যা আমাদের কাজের প্রেরণা ও শক্তি দেয়; আজ মানুষকে এরকম ক্লীব ও অধঃপতিত অবস্থায় এনেছে; যে সব ভাবগত বস্তুগত কারণ সে সব বিচার করতে শেখায়, এবং শেষ পর্যন্ত এই সব কারণ দূর করে আমাদের মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। .... সুন্দরের ধারণাও পালটাচ্ছে। সুন্দর বাগানে বসে পাখীদের গান শুনতে শুনতে একজন বড়লোক স্বর্গসুখ পায়, দরিদ্র বুদ্ধিমান লোক বোঝে যে এই সম্পদ ঐশ্বর্য শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত এবং এগুলো অত্যন্ত ঘৃণ্য। .... সাহিত্য আমাদের কেবল আনন্দ দেবে না, বরং তা সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের সামনে অগ্নিবাহী অগ্রদূত দেখা দেবে।

আমরা সেই সাহিত্যকেই প্রগতিশীল বলব যা মননশীল যা আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগায় এবং সুন্দরেরও; যা সৃজনশীল এবং জীবনের বাস্তবতার স্পর্শে সমুজ্জ্বল, যা আমাদের অনুপ্রাণিত করে, আমাদের আচ্ছন্ন না করে রেখে কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে, এবং তা আমাদের তথাকথিত বৌদ্ধিকতায় আবৃত করবে না কেননা সেটা স্থবিরতারই সামান্তর।"[৮] (প্রেমচন্দ)

বর্তমান শতাব্দীর তিনের দশক থেকে হিন্দী নাট্য সাহিত্যে যে বিশিষ্ট প্রবণতা পরিলক্ষিত হল তা নিঃসন্দেহে 'আধুনিক'। প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতার সুরু হয় এখান থেকেই। নূতনতর ভাবনায় আন্দোলিত হচ্ছে সমকালীন মানুষের চেতনা -- গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, স্বাধীনতার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছে মানুষের মনে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠেছে জাগ্রত জনতা, মিথ্যা ধর্মের মোহ ও চক্রান্ত কারীর অপকৌশল ছিন্নভিন্ন করে হিন্দু মুসলমান মিলনসূত্রে গ্রথিত করেছে আপনাদের হৃদয়, পুরাতন স্থবির মূল্যবোধ ধ্যান-ধারণা পালটে যাচ্ছে, নারী জাতির মূল্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষ অর্জন করতে চলেছে আপনাদের অধিকারঃ এইসব নবীন প্রগতিশীল ভাবনাই আধুনিক যার কথা বললেন প্রেমচন্দ্র, স্মরণ করিয়ে দিলেন শিল্পীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১৯৩০ এর পূর্ববর্তী সাহিত্যে ও বিশেষত নাট্য সাহিত্যে এর প্রতিফলন পড়ে। হরিকৃষ্ণ প্রেমী, সেঠ গোবিন্দদাস, গোবিন্দবল্লভ পন্ত, বৃন্দাবন লাল বর্মা প্রমুখের নাটকে প্রসাদের গভীরতর প্রভাব পাওয়া সত্ত্বেও পাওয়া যায় আধুনিকতার লক্ষণ যা স্বদেশচেতনা ও সমাজ ভাবনায় উজ্জ্বল উদভাসিত এবং যা গান্ধীজীর আদর্শদ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ও উদ্দীপ্ত। বলা যায় লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র ভুবনেশ্বর প্রসাদ উপেন্দ্রনাথ অশব রামকুমার বর্মা প্রমুখ নাট্যকাররা হিন্দী নাট্য সাহিত্যে নূতনতার প্রবর্তন করেন, সুরু হয় আধুনিক যুগ। লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র পূর্বযুগের ভাবালুতা আবেগবাহুল্যকে বাদ দিয়ে আনতে চাইলেন বস্তুবাদ, বিচারবুদ্ধি ও বৌদ্ধিক অভিব্যক্তি। উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক আনলেন সাইকোলজিকাল প্রবলেম বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তার বিশ্লেষণ। ডঃ রামকুমার বর্মা আধুনিক অর্থে হিন্দী একাংক রচনা করলেন, ভুবনেশ্বর প্রসাদ তাতে আনলেন সমাজের তীব্র সংকট ও জটিলতা। এই সব গোষ্ঠীর নবীন নাট্যকারদের কাছে 'মুখ্য সমস্যা প্রসাদ কৃত নাটকোঁ কী ভাবুকতা সে হিন্দী নাটকো কো মুক্ত করনা থা। প্রসাদ কে বিরোধ মে

নয়ে নাট্যকারোঁ কো পশ্চিম কে সমস্যানাটকোঁ কী শৈলী সে কাফী সুবিধা মিল গই থী। এই ভাবে ১৯৩০ এর পরে 'জো রচনাত্মক সংঘর্ষ ছিড়া উহ পুনরুত্থানবাদ ঔর ভাবুকতা কা বিরোধ মে সমস্যা নাটক, বুদ্ধিবাদ ফ্রয়েডবাদ ঔর নগ্ন যথার্থবাদ কো প্রতিষ্ঠিত করনে কা লক্ষ্য সামনে রখকর চলা।' যদিও বলতে হবে জয়শংকর প্রসাদই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন প্রাচীনতার বিরুদ্ধে যখন ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্রবাণী উচ্চারণ করলেন, সামাজিক ভাবনার বলিষ্ঠ উপস্থাপনা ঘটালেন এবং প্রাচীন রীতিনীতিকে প্রবল আঘাত করলেন নারীর অধিকার প্রতিপন্নে ও বিবাহিত নারীর পুনরায় বিবাহের কঠিন অধিকার প্রতিষ্ঠায়।

অনুবাদ নাটকের প্রসার এই সময়ে ঘটে এবং সে সব নাটক অনূদিত হয় যারা প্রবলভাবে সমাজচেতনা গভীর ভাবে জীবননিষ্ঠ ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় যারা বিশিষ্ট এবং হিন্দী নাটকের তারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। গলসওয়ার্দির জাস্টিস স্ট্রাইফ ও দি সিলভার বকস এর এর অনুবাদ করেন প্রেমচাদ ন্যায় হড়তাল (১৯৩০) ও চান্দী কী ডিব্বিয়া (১৯৩০) নামে। রোমা রোলাঁর বিখ্যাত নাটক The 14th of July ঠাকুর রাজবাহাদুর সিংহ অনুবাদ করেন ১৯৩২ সালে বিনাশ কী ঘড়ী নামে। টলস্টয়ের The First Distiller And Light shines in Darkness The Living Corpse or Redemption নাটক ক্ষেমানন্দ রাহুত অনুবাদ করেছেন 'কলবার কী করতূত অন্ধেরে মে উজালা' ও 'জিন্দালাশ' নামে। জার্মান নাট্যকার লেসিং-এর Natan der Weise অনূদিত হয়েছে 'নাতন' (১৯৩২) নামে আবুল ফজল দ্বারা। ইবসেনের The Pillars of Society & Dolls House অনুবাদ করেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র সমাজ কে স্তম্ভ ও গুড়িয়া ঘর (১৯৩৮) নামে। ২য় নাটকটি খিলৌনা ঘর (১৯৩৩) নামে ও অনূদিত হয় অনুবাদক বিশ্বমোহন কুমার সিংহ। জন মেসফিল্ডের Tragedy of Man উমা লেহক অনুবাদ করেন ১৯২৯ এ নাম বিপতা' যাতে ঘরোয়া পরিস্থিতির যথাযথ চিত্র পাওয়া যায়।

ত্রিশের শেষে হিন্দীতে আসা প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলন পত্তন হয় চল্লিশের সূচনায় গণনাট্য সংঘের প্রেরণায়। সজ্জাদ জহীরের বীমার হিন্দী উর্দুভাষী মানুষের কাছে সমাদর পায়। উত্তরপ্রদেশের প্রগতিশীল 'গ্রুপ থিয়েটার' পরে আই পি টি এর সঙ্গে মেশে। এম মহমুদুজ্জেফর এর হিন্দী নাটক 'দি সাইটাডেল' ভারতের শনিক শ্রেণার সামাজিক রাজনৈতিক সংকটের চিত্র। প্রেমচন্দের কফন' প্রভৃতি ছোট গল্প নাটবাহিত হয়। তরুণ ছাত্র রাজেন্দ্র সিং গণনাটক লেখেন। ক্রমশ গয়া ভাগলপুর পাটনা মজফরপুর দ্বারভাঙ্গা রাচি প্রভৃতি স্থানে প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপিত হয়। লোকগীতি ও নৃত্যের সঙ্গে নাটকে আসে নতুন চেতনা। উত্তরবিহারের দুর্ভিক্ষ মহামারী নিয়ে চন্দ্রদেও গুপ্ত লেখেন কুইনিন কি টিকিয়া', মজুতদার চোরাকারবারী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতার পক্ষে নাটক লেখেন ধনঞ্জয় ঝা (বিজয়যাত্রা, কিষাণকর্তব্য মহাপাপ) ও অন্যান্য লেখক।

হরিকৃষ্ণ প্রেমী (১৯০৮ ১৯৭৪) গান্ধীজীর স্বাধীনতা অন্দোলন ও হিন্দু মুসলমান একতা আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাটক লিখেছেন। জয়শংকর প্রসাদ ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগে গিয়ে দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন হরিকৃষ্ণ প্রেমী মোগল যুগে গিয়ে হিন্দু মুসলমান একতার স্বপ্ন দেখেছেন। প্রেমী মূলত এক কবি এবং তার নাটকের মঞ্চ মূল্য অপেক্ষা পাঠ্যমূল্য বেশী, ভাষা দীর্ঘ উপদেশাত্মক ও সাহিত্যিক, এবং তাকে প্রচলিত কথ্য ঢঙে প্রকাশ করা ও কঠিন, প্রায় নাটকে ঔৎসুক্য ও আকর্ষন কম। প্রেমীর প্রথম নাটক অংকদৃশ্যরহিত গীতিনাট্য 'স্বর্ণবিহান' (১৯৩০) গান্ধীজীর আদর্শযায়ী সত্য অহিংসা প্রেমের প্রতিপাদন। 'স্বপ্নভঙ্গ' (১৯৪০) হিন্দু মুসলমান একতার প্রতীক দারার সঙ্গে ঔরংজেবের সংঘাত, দারার মৃত্যু, শাজাহানের বন্দীত্ব প্রভৃতি এঁকেছে।

'বন্ধন' (১৯৪১) গলসওয়ার্দির জাস্টিস দ্বারা প্রভাবিত। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' (১৯৫৫) মধ্যযুগের ইতিহাসিক রাজনৈতিক পটভূমিকায় দুই দাবা খেলোয়াড় রত্নসিংহ ও মহবুব খাঁর মৈত্রীর মাধ্যমে হিন্দু মুসলমান একতার চিত্র। 'রক্তদান' ও 'শীশদান' (১৯৬২) নাটক ১৮৫৭র মহাবিপ্লবের রূপচিত্র।

সেঠ গোবিন্দদাস (১৮৯৬-১৯৭৪) একদিকে আদর্শবাদী দেশসেবক অন্যদিকে সুখ্যাত সাহিত্যিক। নাটকের ক্ষেত্রে সেঠজীর অবদান বহুমুখী — পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক রাজনৈতিক একাংক তিনি লিখেছেন। প্রায় ৪০টি পূর্ণাঙ্গ ও ৭০টি একাংকর তিনি রচয়িতা। দেশ ও সমাজ সেবা তাঁর নাটকের মূল উদ্দেশ্য। এক উন্নত আদর্শের প্রকাশ তার নাটকে পাওয়া যায় তাই তা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ ও অভিনয়ের উপযোগী। তিনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ঘটনাকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখবার প্রয়াসী। অবশ্য তাঁর নাটকে গভীরতা কম, বস্তু বিন্যাস শিথিল, সংলাপ দীর্ঘ, নাট্যগতি ব্যর্থ। উল্লেখ্য নাটক হল — হর্ষ (১৯৩৫), সেবাপথ (১৯৪০), মহাত্মা গান্ধী (১৯৫১) রাম সে গান্ধী (১৯৪৯), রহীম (১৯৫৫), বিজয় বেলি (১৯৬৩) প্রভৃতি। **গোবিন্দবল্লভ পন্ত** ঐতিহাসিক পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক লিখেছেন তার মধ্যে কখনও এসেছে সমকালীন রাজনৈতিক সংঘর্ষ, কখনও সামাজিক আন্দোলন। পন্তজী কল্পনাপ্রবণ লেখক, ইতিহাসের তথ্যকে সজীব করতে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। 'অন্তঃপুর কা ছিদ্র' (১৯৪০) বৎসরাজ উদয়নকে নায়ক করে লেখা ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনার বিস্তার ঘটিয়ে তৎকালীন জনজীবন ও রাজপরিবারের সজীব চিত্র এঁকেছেন। 'অংগুর কী বেটী' (১৯৩৭) মদিরাপানের নিদারুণ চিত্র।

আধুনিক যুগের প্রথম যথার্থ নাট্যকার **লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র** (১৯০৩-১৯৮৭) এক প্রবল দুরন্ত প্রতিবাদ নিয়ে হিন্দী নাটকের অভিনয় জগতে আবির্ভূত হন। তিনি তীব্র আক্রমণ করেছেন ঠিক আগের যুগের নাটকের অকারণ আবেগ আকুলতাকে যে ভাবনাগুলো চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও জয়শংকর প্রসাদের মধ্যে এবং সে কারনে তিনি রায় ও প্রসাদের নাটককে ছিন্নভিন্ন করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন — "জো কুছ ইনে- গিনে হমারে ইধর প্রকাশিত হুয়ে হ্যয় সব মে দুর্ভাগ্যবশ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কে আদর্শ মানকর লেখকোঁ নে কাগজ রংগা হ্যয়। জিস যুগ মে য়ুরোপ কে নাটককার শেকসপীয়র কে নাটকো কো মনোবিজ্ঞান ঔর যথার্থ কে প্রতিকূল কহকর এক নয়া রাস্তা নিকাল রহে থে, বৌদ্ধিক অভিব্যক্তি ঔর মনোবৈজ্ঞানিক মীমাংসা কা উহ রাস্তা জিস পর ইবসন সে লে কর ইস যুগ কে শ্রেষ্ঠ নাটককার চলতে রহে হ্যয় ঔর চলতে হী রহেঙ্গে —— ইসী যুগ মে শেকসপীয়র কে অনুকরণ পর হমারে দেশ মে ভাবুকতা কী এব গন্দী প্রবৃত্তি ফ্যেল গয়ী ঔর উস গন্দী প্রবৃত্তিকে সব সে বড় প্রতিনিধি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হুয়ে'। শ্রীমিশ্রর মতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সাধারণের উপযোগী সব আছে - প্রেম হত্যা ঘৃণা সুখ দুঃখ ত্যাগ বীরতা। কিন্তু তাঁর সমস্ত সৃষ্টি মিথ্যা ও অসম্ভবের ওপর দাঁড়িয়ে। মানব চরিত্রে তিনি কেবল দেখেছেন দেবতা বা রাক্ষস —— আলো বা অন্ধকার। 'উনকা সম্পূর্ণ সাহিত্য শব্দোঁ ঔর বাক্যোঁ কা সাহিত্য হ্যয়, উহ জীবন কে সাথ কহী ভী মেল নহী খাতা।[১০]

জয়শংকর প্রসাদের বিরুদ্ধেও তাঁর অভিযোগ প্রবল। তিনি বলেছেন যে 'ইতিহাস কে গড়ে মুর্দে উখাড়নে কা কাম ইস যুগ কে সাহিত্য মে বাঞ্ছনীয় নহী'[১১] তবু তাঁর এই দৃঢ় অভিমতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নাটক কেন লিখলেন তা জানাতে গিয়ে

বললেন যে 'প্রসাদ কে নাটকো কী প্রতিক্রিয়া মে মুঝে অপনী প্রতিজ্ঞা তোড়নী পড়ী। প্রসাদ কে নাটকো সে ভারতীয় সংস্কৃতি ঔর জাতীয়জীবন দর্শন কী জো হানি মুঝে দিখাই পড়ী ভাবী পীড়ী কে পথভ্রষ্ট হোনে কী আশংকা মেরে ভীতর উপজনে লগী উসকে নিরাকরণ কে লিয়ে মুঝে এসে নাটক রচনে পড়ে জিন মে হমারী সংস্কৃতি ঔর জীবন দর্শন কা উহ সত্য ঝলক উঠে জো কালিদাস ঔর ভাস কে নাটকো মে পহলে হী নিরূপিত হুয়া।'

তাই লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র নিজেকে বুদ্ধিবাদী বলেছেন, মনে করেছেন কল্পনা নয় বাস্তবই সাহিত্যের বিষয়, তিনি প্রবলেম প্লে বা সমস্যা নাটক লিখতে ব্রতী হয়েছেন। জীবনের জটিলতা মনের ভাঙ্গন, নরনারীর হৃদয়ের তীব্র দ্বন্দ্ব সংক্ষোভ গূঢ় গ্রহণ জটিল যৌন মনস্তত্ত্ব এদের বিচার বিশ্লেষণ রূপায়ন তার নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে এবং যুক্তি বুদ্ধি দিয়েই তিনি তার বক্তব্যকে প্রতিপাদিত করতে চেয়েছেন। অবশ্য মিশ্রজীর সাফল্য সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা অনেক প্রশ্ন রয়ে যায়। তার প্রথম নাটক 'সন্ন্যাসী'তে (১৯২৯) নরনারীর বিচিত্র জটিল সম্পর্ক চিত্রিত তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের চক্রান্ত, রাউলাট অ্যাক্ট, পঞ্জাব হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয় এসেছে। 'রাক্ষস কা মন্দির' (১৯৩১) এক বারাঙ্গনা আসগরীকে অবলম্বন করে সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে। 'মুক্তি কা রহস্য' (১৯৩২) নরনারীর তীব্র জটিল বিস্ফোরক সম্পর্ক তুলে ধরে। উমাশংকর সহৃদয় দেশ প্রেমিক। সে দেশের ডাকে উচ্চ সরকারী কাজ ছেড়ে জেলে যায়। তার প্রতি প্রবল আগ্রহে আশাদেবী উমাশংকরকে স্বামী রূপে পেতে চায় ও তার স্ত্রীকে বিষ দেয়। বিষ দিতে সাহায্য করে উমাশংকরের বন্ধু ডঃ ত্রিভুবননারায়ণ যে আশাদেবীর এই অন্যায় কাজের অনুচিত লাভ ওঠাতে তাকে ভোগ করে। অপমানিত আশাদেবী আত্মহত্যা করবার জন্য বিষ খায়, এবং ডাক্তারের জন্যেই বেঁচে যায়। অনুতপ্ত ত্রিভুবননারায়ণ আশাদেবীর ক্ষমা চায় ও পায় এবং তারা ক্রমশ পরস্পরের প্রতি আরো অনুরক্ত হয়। উমাশংকর স্ত্রীর মৃত্যুর কথা জেনে এবং আশাদেবীর সঙ্গে ত্রিভুবননারায়ণের অবৈধ সম্পর্কের কথা জেনে সাংঘাতিক বিতৃষ্ণায় আত্মহত্যা করতে যায়। কিন্তু আশাদেবীর আগ্রহে ও পুত্র মনোহরের ভালবাসায় সে আত্মনিধন থেকে বিরত হয়। 'সিন্দুর কি হোলী' (১৯৩৪) নাটকে মুরারীলাল ম্যাজিস্ট্রেট আট হাজার টাকার জন্য আপন বন্ধুকে হত্যা করে ও তার পুত্র মনোজশংকরকে মানুষ করে। সে অর্থের থেকেও বেশি ব্যয় করে। সে এমন একজন লোকের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা উৎকোচ নেয় যে তার সম্পত্তির অংশীদার রজনীকান্তকে হত্যা করে তার সম্পদ গ্রাস করে। রজনীকান্তর সঙ্গে নিকট সম্পর্কিত ম্যাজিস্ট্রেট-কন্যা চন্দ্রকলা মৃত রজনীকান্তর হাত থেকে সিঁদুর পরে। সে অবিবাহিতা থেকে পিতার থেকে দূরে সরে যায়। মনোজশংকরও জানতে পারে তার পিতার মৃত্যু রহস্য।

'গরুড়ধ্বজ' (১৯৪৬) ঐতিহাসিক নাটকে বিদিশার শুংগ সেনাপতি বিক্রমমিত্র তেজ প্রতাপ সাহস সততা ও ন্যায়ের মূর্ত প্রকাশ। সে নায়ক হলেও অধিক গৌরব পেয়েছে রাষ্ট্রধ্বজ (গরুড়ধ্বজ) যার মান রক্ষার জন্য গুপ্ত রাজ্যের বড় বড় রাজা সেনাপতি ও যোদ্ধা তাঁদের প্রাণ দিয়েছেন। ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগের আনয়নকারী এই গরুড়ধ্বজ কেবল রাষ্ট্রপতাকা নয়, রাষ্ট্রপ্রতীকরূপে আমাদের গৌরবের দ্যোতক হয়ে আছে। 'নারদ কে বীণা' (১৯৪৬) প্রাগৈতিহাসিক কালের ঘটনা নিয়ে লেখা। আর্যদের আগমন, আর্য-অনার্য সংঘাত ও পরিণামে সমন্বয় ইত্যাদি নাটকে আছে। 'বৎসরাজ' (১৯৫০) নাটক মিশ্রজী লিখলেন কারণ ভাস কালিদাস প্রমুখ মহাকবিরা এই চরিত্র নিয়ে নাটক লিখলেও ভারতীয় জনতন্ত্রকে ইস পুণ্য অবসর পর ভারতীয় সাহিত্য ঔর কলা কে মাধ্যম সে

ভারতীয় সংস্কৃতি কা নিরুপন আজকে লেখক কা সবসে পহলা ধর্ম হ্যয়।'[১২] বৎসরাজ উদয়ন বিষয়ক ঘটনাকে লেখক মানবীয় মনোবৈজ্ঞানিক ও বৌদ্ধিক রূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। 'দশাশ্বমেধ' (১৯৫০) লেখকের মতে এক সংস্কৃতি প্রধান ঐতিহাসিক নাটক। তরুণ বীরসেন নাগ আপন মহিমা ও বীর্যবত্তা দ্বারা কুষাণ রাজকন্যা কৌমুদীকে জয় করে ও আপন সংকল্পানুযায়ী কাশীর গঙ্গা তীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করে যেখানে ভবিষ্যতে অশ্বমেধের পরম্পরা চলে। 'বিতস্তা কী লহরে' (১৯৫৩) নাটকের বিষয় আলেকজান্ডারের (নাট্যকারের মত অলিকসুন্দর) নেতৃত্বে বিতস্তাব তীরে যবন সেনাব উপস্থিতি, রাতের অন্ধকারে যবন সেনার নদী পারের প্রয়াস, দেশ প্রেমিক বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ ও শেষ পর্যন্ত সন্ধি। নাটকে কল্পনার আধিক্য আছে। এই নাটকের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে।

উদয়শংকর ভট্ট (১৮৯৮-১৯৬৬) কেবল নাটক লিখে নয় কাব্য উপন্যাস নিবন্ধ লিখেও হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। পুরাণ ইতিহাস রাজনীতি সমাজ সব বিষয়ে তিনি নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটক রাষ্ট্রীয় চেতনার দ্বারা অনেকাংশে উজ্জ্বল। তাঁর চরিত্ররা প্রায় সর্বদাই যুগজীবনের প্রতিনিধি যারা চারিত্রিক বিশেষতার সঙ্গে যুগ বিশেষতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

উদয়শংকরের প্রথম নাটক 'চিত্তরঞ্জন দাস' অসহযোগ আন্দোলনের কালে চিত্তরঞ্জনের জীবন নিয়ে লেখা। এই নাটকে সম্ভবতঃ ভট্টজী অভিনয় করেছিলেন। দ্বিতীয় নাটক 'বিক্রমাদিত্য' (১৯৩৩) যাতে বিক্রমাদিত্যকে আর্দশ রাজা ও ভাই রূপে আঁকা হয়েছে। 'দাহর অথবা সিন্ধ পতন (১৯৩৩) নাটকে সিন্ধপতনের কারণ রূপে দেশদ্রোহিতার কথা বলা হয়েছে। 'কমলা'য় (১৯৩০) অসমবয়স্ক বিবাহের কুফল দেখানো হয়েছে। 'ক্রান্তিকারী' (১৯৫৩)তে স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় বিপ্লবের রক্তবাণী উচ্চারিত। পুলিশ অফিসার মনোহর তার একদা সহপাঠী বন্ধু বর্তমানে সংগ্রামী বিপ্লবী দিবাকরকে ধরিয়ে দিতে চায় পদোন্নতির বাসনায়। মনোহরের স্ত্রী বীণা বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। বীণা শেষকালে তার স্বামীকে হত্যা করে ও মনোহরের বুকের রক্তে রুমাল ভিজিয়ে বলে — আমি আমার স্বামীকে নয় দেশের শত্রুকে হত্যা করেছি (মায়নে সোতে হুয়ে অপনে পতি কী নহী, দেশ কে শত্রু কী হত্যা কর দী')। বিপ্লবের আদর্শ এই নাটকে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে অসহযোগ আন্দোলনে শত্রুদের সঙ্গে সত্য স্নেহ ও অহিংসার ব্যবহার করার নির্দেশ, সেখানে বিপ্লবীদের নিয়ম হল — 'ক্রান্তিকারিয়োঁ কে সামনে ন কোই ভাই হ্যয় না বহিন, ন পিতা, ন মাতা, ন কোই সম্বন্ধী'। রক্তপাতে বিশ্বাসী দলের নেতা নিজেদের নীতি ব্যাখ্যা করেছে — 'যহ আগ পর চলনে কা মার্গ হ্যয়। স্নেহ, প্রেম নাম কী কোই চীজ নহী হ্যয়। সংযম ব্রহ্মচর্য কর্তব্য ঔর দেশপ্রেম, শত্রুয়ো সে মাতৃভূমি কা উদ্ধার।..... ইসকো অপনে দলকে লিয়ে লোহে কে আদমী চাহিয়ে। যহ মহাভারত কা যুদ্ধ হ্যয়। কর্তব্য কে লিয়ে হমে যুদ্ধ করনা হ্যয়, চাহে কোই ভী হী।'

উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী। নাটক উপন্যাস ছোটগল্প কবিতা — সব জায়গায় আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। নাট্যকার রূপে সবিশেষ খ্যাতিমান, বলা ভাল তিনি আধুনিকতার অন্যতম ঋত্বিকও বটেন। আধুনিক দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ জটিল মানসিকতার নিপুণ উদঘাটন করেছেন তিনি নাটকে। তাঁর নাটক মঞ্চ অভিনয়েরও বিশেষ উপযোগী। জয়দেব তনেজা বলেছেন — অশ্‌ক হিন্দীকে প্রথম আধুনিক নাটককার হ্যয় জিনকে নাটকো মে রঙ্গমঞ্চ কী স্পষ্ট দিখাই দেতী হ্যয়।[১৩]

অশ্‌কের প্রথম নাটক 'জয় পরাজয়' (১৯৩৭) ঐতিহাসিক রচনা প্রধানতঃ মেবার যুবরাজ চন্দ্রর মাধ্যমে গৌরব ও আদর্শকে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় নাটক 'স্বর্গ কী ঝলক' (১৯৩৯) এক প্রবল সমাজ সমস্যার চিত্র — বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা নারীকে কর্তব্যপরায়ণ প্রেমময়ী না করে কলহপরায়ণ সংসারবিমুখ করে। আধুনিক লেখাপড়াজানা শ্রীমতী রাজেন্দ্র অসুস্থ পুত্রকে ফেলে পার্টিতে যায়। এরা কি পুরুষের জীবনে স্বর্গের ঝলক আনতে পারে? নাট্যকার নারীদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যক্তিত্ব চান, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা চান না।

'কয়েদ ঔর উড়ান' (১৯৫০) নাটকদ্বয়েও নারী সমস্যার চিত্র, পরিবার ও সমাজে নারীর স্থিতি, এবং নারীত্বের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার রূপ নির্ণয় করা হয়েছে। 'কয়েদ' এ অপ্‌পী (অপরাজিতা) স্বামী প্রাণনাথের নিষ্প্রাণ নির্জীব ঘরে থাকলেও সেই গৃহবন্ধন সে মানতে পারে না। সে প্রকৃত ভালবাসার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু অকাম্য এই বাধন থেকে তার মুক্তি নেই। 'উড়ান'-এর নায়িকা মায়া; শংকরের আদিম পৌরুষের উন্মাদনা, মদনের অভিলাষ প্রয়োগ প্রয়াস, ভীরু রমেশের বাস্তবতা বর্জিত কল্পনা — কোন কিছুই মানবে না মায়া। সে মুক্ত স্বাধীন জীবন বরণ করে।

'ছঠা বেটা' (১৯৪০) এক স্বপ্ন নাটক যেটা অশ্‌কজীর কথায় সত্য ঘটনাশ্রিত। এটা এক পিতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন কামনার কাহিনী। ছয় পুত্রের পিতা বসন্তলাল আপন পুত্রদের উপেক্ষায় অত্যন্ত মর্মাহত। একদিন সে স্বপ্নে লটারীর টাকা পায় ও পুত্ররা তাকে ভালবাসা দেখাতে সুরু করে। টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার সেই অবহেলা অপমান। তার মনে পড়ে যষ্ঠপুত্র দয়াল চন্দর কথা যে ছেলেবেলায় ঘর থেকে চলে গিয়েছিল। বাবার দুঃখের দিনে সে ফিরে আসে। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। বসন্তলাল তার ঘরের চৌকীতে শুয়ে, পাশে লটারীর টিকিট।

'অলগ অলগ রাস্তে' (১৯৫৪) বিবাহিত জীবনের সমস্যা বিশেষত স্ত্রীর দুঃখবেদনার মর্মান্তিক চিত্র। দুবোনের বড়, রাজীব বিয়ে হয় অধ্যাপকের সঙ্গে যে সতী সাধ্বী রাজীকে ছেড়ে আর এক মেয়েকে নিয়ে থাকে। ছোট বোন তেজস্বিনী রাণীর স্বামী ত্রিলোক অত্যন্ত লোভী — বিয়েতে বাড়ি গাড়ি যৌতুক না পাওয়ায় সেও রানীকে উপেক্ষা করে। দুবোন ফিরে আসে, রাজীকে তার শ্বশুর নিতে এলে ভাইবোনের আপত্তি সত্ত্বেও সে যায়। ত্রিলোককে রানীর বাবা সব যৌতুকই দেবে যত অসুবিধা তার হোক না কেন, কিন্তু রানী যাবে না ঐ লোভী লোলুপ স্বামীর ঘর। ক্রুদ্ধ বাবা তাকে তাড়িয়ে দেবে ঘর থেকে। রানী নিজেই বেরিয়ে যায়।

'অঞ্জী দিদি' (১৯৫৫)তে মানবতাবোধ বর্জিত কঠোর অনুশাসনের দুঃখময় ফল দেখানো হয়েছে। অঞ্জী দিদির কঠিন শাসনে উকীল স্বামী ইন্দ্রনারায়ণ পুত্র নীরজ সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত। অঞ্জীদিদির ভাই শ্রীপত এসে অনিয়ম বিশৃঙ্খলায় সব ওলট পালট করে দেয়। ইন্দ্রনারায়ণ ও নীরজ অনিয়ন্ত্রিত উদ্দাম হয়ে ওঠে। আহত বেদনার্ত অঞ্জী দিদি আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কুড়ি বছর পর। অঞ্জী দিদির মানসিকতা যেন সম্পূর্ণ এসে বসেছে পুত্রবধূ অনিমার ওপর, কিংবা এটাই কালচক্র। সেও কঠিন নিয়ম চালায় এবং সে সতর্কও। শ্রীপত আবার আসে কিন্তু তার অনিয়ম তার চলে না।

অশ্‌ক অনেক একাংক লিখেছেন। তাঁর একাংক সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখ্য 'দেবতাঁও কি ছায়া মে', 'তুফান সে পহলে', 'চরাবাহে', 'পর্দা উঠাও পর্দা গিরাও' প্রভৃতি।

ত্রিশের কাল আরো বিশেষ স্মরণীয় যে আধুনিক বিশিষ্ট নাট্যরীতি একাংক এসময়েই সৃষ্টি হতে থাকে। একাংক নাটক আধুনিক মননের ফসল। তিনের দশকে আধুনিক অর্থে

একাংকর আবির্ভাবও হিন্দী নাটকে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটিয়েছে। ছায়াবাদী কাব্যধারার বিশিষ্ট কবি **ডঃ রামকুমার বর্মাকে** (১৯০৫-১৯৯০) আধুনিক অর্থে হিন্দী একাংকর প্রথম লেখক বলা যায়। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম একাংক 'বাদল কী মৃত্যু' রচনা করেন এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর ব্যাপী সাধনায় একাংক সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তিতে তাঁর নাটক সমৃদ্ধ, জীবনের ঐকান্তিক পরিচয় সেখানে পাওয়া যায়। রামকুমার সমাজচেতন তাই বিবিধ সামাজিক সমস্যা তাঁর নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে, তার সঙ্গে আছে আর্দশচেতনা। 'উনকে সভী সামাজিক নাটকোঁ মে জীবন বাস্তবিকতা কে সাথ জীবন কা আর্দশ ভী ব্যঞ্জিত হ্যয়।'[১৪] ডঃ বর্মা ঐতিহাসিক নাটকে অতীতের রহস্যাচ্ছন্ন সৌন্দর্যলোক উদ্ভাসিত করেছেন এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত জটিলতাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁক একাংক সংকলনের মধ্যে স্মরণীয় রেশমী টাই (১৯৪১), চারুমিত্রা (১৯৪২), শিবাজী (১৯৪৪), সপ্তকিরণ (১৯৪৭), ইন্দ্রধনুষ (১৯৫৬), পৃথ্বীরাজ কী আখেঁ (১৯৬৩), ময়ূর পঙ্খ (১৯৬৪) প্রভৃতি।

ভুবনেশ্বর প্রসাদ (১৯১০-১৯৫৫) এই পর্ব ও পর্যায়ের বিশিষ্ট নাম। তাঁর একাংক সংকলন 'কারবাঁ' (১৯৩৫) সম্ভবত প্রথম হিন্দী একাংক সংগ্রহ ও এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অগ্রণী। ভুবনেশ্বরের ওপর পাশ্চাত্য নাট্যকলার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। যেমন 'কারবাঁ'র ওপর বার্নার্ড শর প্রভাব স্পষ্ট। তবু ভুবনেশ্বরের রচনায় মৌলিকতা প্রধান — ভারতীয় জীবনের ন্যায় নীতি আদর্শবাদ তাঁর রচনায় গভীর ছায়া ফেলেছে। স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ, হৃদয় ভাবনার দ্বন্দ্ব সংঘাত, মধ্যবিত্ত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতা বেদনার রূপকার তিনি। ভুবনেশ্বরের নাটরের ভাবনায় সর্বত্র একটা বুদ্ধিমত্তা বা মননশীতার ছাপ আছে। 'উষব' ন্যাচারালিস্টিক নাটক — প্রকৃতিবাদী এই নাটকে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রভাবিত উচ্চবিত্ত জীবনের আড়ম্বর ও জাঁকজমকের অন্তরালে শূন্যগর্ভ রিক্ততার ছবি। 'স্ট্রাইক'ও ন্যাচারালিস্টিক, এতে স্বামী স্ত্রীর সর্ম্পক, স্বামীকে স্ত্রীর উপেক্ষা, পুরুষ জীবনের শূন্যতা ইত্যাদি ধরা পড়েছে। ভুবনেশ্বরের অন্যান্য একাঙ্ক — শ্যামা, এক সাম্যহীন সাম্যবাদী, প্রতিভা কা বিবাহ, লটারি, উপসংহার প্রভৃতি।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব

স্বাধীনতার পর হিন্দী নাটক নূতনতর ভাবনায় ও রীতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতার পরই সর্বপ্রথম হিন্দী ভাষায় সৃজনাত্মক প্রতিভা নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আগের সময়ে অধিকাংশ নাটকই পাঠ্যরূপে রচিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণ হিন্দী ভাষায় কোন নিজস্ব রঙ্গমঞ্চই ছিল না। সেসব নাটকের সাহিত্যমূল্য থাকলেও নাট্যমূল্য তাদের বেশি নয়। লেখকরা নাটক লেখাকে মনে করতেন যেন সংলাপে লেখা গল্প। অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিলেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ও অনেকাংশে প্রসাদ। পরবর্তী নাট্যকারদের নাটক — যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রর সমস্যামূলক নাটক, হরিকৃষ্ণ প্রেমী ও বৃন্দাবনলাল বর্মার ঐতিহাসিক নাটক, সেঠ গোবিন্দলাল ও উদয়শংকর ভট্টের সাংস্কৃতিক নাটক — প্রায়ই সবই যেন সংলাপে লেখা উপন্যাস। পরে এই ধারায় কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটান উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক।

স্বাধীনতার পরই অবস্থা পালটায়। রঙ্গমঞ্চের অবস্থার উন্নতি হয়। অনেক নতুন দল গড়ে ওঠে। নতুন নতুন সৃজনশীল কল্পনাপ্রবণ নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা হিন্দীভাষী প্রদেশের অনেক শহরে এগিয়ে এলেন। বিশেষ করে দিল্লী কলকাতা বোম্বাইতে নতুনরীতির নাট্যপ্রযোজনার বিকাশ ঘটল।

বঙ্গমঞ্চের মানোন্নয়ন, মঞ্চ শিল্পীদের প্রতিভার বিকাশ দেখে শক্তিশালী লেখকরা বঙ্গ মঞ্চের দিকে আকৃষ্ট হলেন। তার ফলে হিন্দী নাটক সমকালীন সত্যকে সমগ্র শক্তি দিয়ে ও সার্থকভাবে ব্যক্ত করার উপযোগী নাট্যভাষার অনুসন্ধান করতে লাগল তাতে বঙ্গমঞ্চের ক্ষমতা যেমন বাড়ল, তেমনি নাটকেরও।

এই সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্প্রতি আরো একটি তত্ত্ব যুক্ত হয়েছে। এই তত্ত্ব যে কোন সৃজনাত্মক ক্ষেত্রের অন্যতম ভিত্তি স্বরূপ – ঐতিহ্যের অনুসন্ধান। বঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বঙ্গমঞ্চ অভিব্যক্তির অন্য ব্যক্তিপ্রধান রূপগুলি থেকে একেবারেই আলাদা। বঙ্গমঞ্চের সামনে সমবেত দর্শকমন্ডলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আদান প্রদান ঘটে এবং তার ফলে দর্শক সম্প্রদায় অনিবার্যভাবে সৃজনাত্মক হয়ে ওঠে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত নাট্যকার ও অভিনেতা কোন না কোন স্তরে দর্শকমন্ডলীর পরম্পরাগত সাংবের পরিমন্ডলের সঙ্গে কোন গভীর সম্পর্ক ও একাত্মতা রচনা করতে না পারেন ততক্ষণ তাদের সৃষ্টি কর্ম কোন গভীর সার্থকতার স্তরে পৌঁছুতে পারে না।'[১৫]

স্বাধীনতা পরবর্তী হিন্দী নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সমালোচকের মতামত উল্লেখ্য —

'ইন নাটককারোঁ কে সমক্ষ জমিদারী উন্মূলন, ভূমি সুধার কে বিভিন্ন রূপ সংযুক্ত পরিবার কা টুটনা, নারী শিক্ষা, পরম্পরা ঔর প্রগতিবাদী বর্গ কা সংঘর্ষ আর্থিক বিষমতায়ে এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায়ে উভর কর আয়ী থী। সমাজ মে ব্যাপ্ত বেকারী ঔর নির্ধনতা নে ধার্মিক প্রতিমানো কো নিস্সার সা কর দিয়া হ্যয। অন্ধবিশ্বাস, ছুআছুত, ছোটে বড়ে কা সংঘর্ষ আদি সমাজ কী জড়ে অন্দর হী অন্দর খোদ রহে হ্যয। সংযুক্ত আধুনিক শিক্ষা কে কারণ জঁহা টুটু রহে হ্যয, উহা যুবকো মে স্বাবলম্বন কী ভাবনা কো ভী বঢা রহে হ্যয। চারো ওর কে শৈক্ষণিক বাতাবরণ সে নিবাধার পরম্পরায়ে টুট রহী হ্যয। আর্থিক বিষমতা বর্গ সংঘর্ষ কা বীজ বপন কর রহী হ্যয ঔর নাটককার ইস সবকে বীচ সে অপনী অনুভূতি যাত্রা তয কর রহা হ্যয। আজ কা নাটককার বর্তমান কে স্বরো কো চারো ওর সে বটোর কর সমাজ কে সমক্ষ বিভিন্ন তৌর তরীকো সে প্রস্তুত কর রহা হ্যয। বর্তমান কা অভিব্যক্তি হী উসকা অভিপ্রেত হ্যয তাকি জন জীবন কী সমস্যায়ো কা রূপ উজাগর হো ঔর হম উনকে নিরাকরন হেতু সচেত হো।'[১৬]

উত্তর স্বাধীনতা কালে হিন্দী বঙ্গমঞ্চের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই পথসন্ধানের চেষ্টা যে সব হিন্দী নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট ধরা পড়ে তাদের মধ্যে অগ্রণী হলেন জগদীশচন্দ্র মাথুর ও মোহন রাকেশ। অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীরা হলেন ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ লাল, বিষ্ণু প্রভাকর, বিনোদ রস্তোগী, রমেশ মেহতা প্রমুখ।

জগদীশচন্দ্র মাথুর (১৯১৭ ১৯৭৮) লিখেছেন কম কিন্তু গুণগত বিচারে তা বিশিষ্ট। তার সামাজিক নাটকে বিশেষভাবে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা, মিথ্যাচার অন্তঃসার শূন্যতা ও নৈতিক অধঃপতনের ছবি আছে। ঐতিহাসিক নাটকগুলি গভীর দার্শনিক প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ যেখানে সৃষ্টি সাধনা, স্রষ্টার মানসদ্বন্দ্ব ও জটিলতা বর্হিজগতের সঙ্গে অন্তর জগতের সংঘাত ও তার থেকে জাত অস্থিরতার নানাধিক অভিব্যক্তি পাওয়া যায়।

শ্রী মাথুর চোদ্দ বছর বয়সে লেখেন 'শিবাজী' (১৯৩০)। দ্বিতীয় নাটক 'মেরী বাসুরী' (১৯৩৬) একাংক। 'ভোর কা তারা' একাংক সমুহে (১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ এ লেখা) তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় একাংক সংকলন 'ও মেরে সপনে'র প্রকাশকাল ১৯৫৩। 'ভোর কা তারা'র অন্তর্গত 'রীঢ কী হড্ডী' (মেরুদন্ড) একাংকে

বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়ে দেখানোর অপমানকর প্রথাকে আঘাত করা হয়েছে ও তার সঙ্গে সঙ্গে নারীত্বের তীব্র উৎসারণ ঘটেছে। আধুনিক কালে সিনেমা কি ভাবে যুবকদের প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত করে 'ও মেরে সপনে' একাংক প্রহসনে তারই চিত্র।

'কোনার্ক' (১৯৫১) ত্রয়োদশ শতকের কলিঙ্গকে নিয়ে তিন অংকের ঐতিহাসিক নাটক। কলিঙ্গরাজ নরসিংহদেবের নির্দেশে কোনার্ক সূর্যমন্দির নির্মিত হচ্ছে সুদক্ষ শিল্পী বিশুর নেতৃত্বে। মন্দির প্রায় শেষ কিন্তু তার চূড়ায় ত্রিপটধর স্থাপন করা যাচ্ছে না। এক নবীন তেজস্বী শিল্পী ধর্মপদ আসে ও আশ্চর্য কুশলতায় সে কাজে ব্রতী হয়। সে রাজাকে বলে তার অমাত্য চালুক্যর জনগণের ওপর অত্যাচারের কথা যা থেকে শিল্পীরাও রেহাই পায়নি। চালুক্য বিদ্রোহ করে, রাজা তাকে দমন করতে যায়। মন্দিরের দায়িত্ব ধর্মপদের, যে অস্ত্রাঘাতে আহত হয়, তার গলার মালা দেখে বিশু জানতে পারে এক নির্মম সত্য — ধর্মপদ প্রকৃত পক্ষে তার যৌবনকালীন প্রেমের ফল তার পরিত্যক্ত প্রণয়িনীর পুত্র। সে ধর্মপদকে বাঁচাবার চেষ্টা করেও পারে না। উন্মত্ত ক্রোধে সে মন্দির ভাঙতে যায় — এক বিশাল মূর্তি চালুক্যর ওপর পড়ে ও সে মারা যায়। এই নাটকে শিল্পের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন নাট্যকার। শিল্পীর অন্তরের দ্বন্দ্বও ধরা পড়েছে। এসেছে জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত। তার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসও চিত্রায়িত হয়েছে।

'পহেলা রাজা' (১৯৬৯) আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট নাটক। আর্য আগমনের অব্যবহিত পরবর্তী কাল। আর্যদের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসীদের (হরপ্পা সভ্যতার) সংঘাত লেগেছে। আর্যরা যথার্থ শাসন ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠায় তৎপর। অঙ্গপুত্র বেন ব্রহ্মাবর্তের (হরিয়ানা পঞ্জাবের সরস্বতী প্রদেশ) শাসক — সে উদ্ধত অত্যাচারী। দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য মুনিরা তাকে মানলেও তারা তাকে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রপূত কুশ প্রহারে হত্যা করে। কিন্তু একজন শাসক চাই। মুনিরা বেনের দক্ষিণ জঙ্ঘা মন্থন করলে এক খর্বাকৃতি ভয়ংকর কালো ক্রূর লাল চোখের এক ব্যক্তির জন্ম হয় — সে নিষাদ। দক্ষিণবাহু মন্থন করে জাত হল ইন্দ্রের মত রূপবান অস্ত্র অলংকার সজ্জিত এক তেজস্বী পুরুষ — সে পৃথু। (নিষাদ সম্ভবত বেনের ঔরসজাত কোন অনার্য নারীর পুত্র, পৃথু আর্য নারীর) পৃথু হল রাজা। শুক্রাচার্য প্রমুখ মুনিরা সর্ত করালেন যে পৃথু বেদের নীতি কার্যকর করবে, সমদৃষ্টিতে প্রজাশাসন করবে, ব্রাহ্মণদের কোন দন্ড দেওয়া যাবে না। পৃথুর বিবাহ হল অর্চনার সঙ্গে, যদিও অনার্য নারী উর্বী-ই তার সব। সহসা দেশে অন্ন ও জলাভাব দেখা দিল। পৃথু জানল ধরিত্রী লুকিয়ে রেখেছে সে সব। ধরিত্রী জানাল যে তাকে সম্মান করলে, ভূমিকর্ষণ করলে জলসেচে ধরণীকে সিক্ত করলে আবার সে শস্যবহুল হবে। পৃথু আরো কিছু বোঝে — আর্যরা মৃত্তিকা দগ্ধ করছে, অরণ্য সম্পদ বিনাশ করেছে, অনার্যদের নগর জনপদ ধ্বংস করেছে। আর্যদের প্রথম রাজা পৃথু ধরিত্রীকে শস্যপূর্ণ করবে, শুষ্ক মাটিতে জলসেচ করবে, বাঁচাবে মানুষকে। কিন্তু ব্রাহ্মণরাও সক্রিয় —তারা আর্যব্রাহ্মণদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে, অনার্যদের উৎখাত করবে, তাই পৃথুর সঙ্গে অনার্যদের সংঘাত তারা চায়। পৃথুর একক বিষণ্ণ ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে — "আমি আদি রাজা পৃথু ..... আর্যদের প্রথম রাজা ..... লোকে বলবে পৃথু ছিল অবতার। কিন্তু এই মুখোশের আড়ালে পরিশ্রমের স্বেদলিপ্ত মুখ, এর কথা কে জানবে? ..... হে পরমব্রহ্ম। আমি জানি শক্তি তোমার নয় আমার। তবু তোমার কাছে হাত পেতে আছি। আমার দৃষ্টিকে অন্তরীক্ষ থেকে সরিয়ে দাও। পৃথিবীর বুকে আমাকে খুঁজতে দাও তাকে, যে আমার সহচরী ছিল, আমার প্রাণ ছিল, আর ....আর .... ছিল

আমার মা। উর্বী মা মা। যুগযুগান্তরের অভিনয় এই বাণী প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সত্রধার ও নটীর কণ্ঠে শোনা গেল অথর্ববেদের পৃথিবী সূক্ত।

মোহন রাকেশ (১৯২৫-১৯৭২) আধুনিক হিন্দী নাট্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা রূপে বন্দিত। ছোট গল্প নিয়ে 'নই কহানী' আন্দোলনে তার ভূমিকা স্থির নিশ্চিত, উপন্যাসেও তিনি দক্ষ। কিন্তু নাটকই তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশমাধ্যম। তিনি অতীতের প্রেক্ষাপটে নাটককে স্থাপন করে দ্রষ্টার অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তির হৃদয়ের সংঘাত সমসাময়িক জীবন ও ভাবনাকে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে আধুনিক মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা দাহ, হৃদয়ের অসহ্য স্মৃতি, বর্তমান সমাজে মানসিকতার তীব্র জটিল ঘূর্ণাবর্তে মূল্যবোধের বিনাশ নৈতিকতার বিপর্যয় এবং কখনো ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানকে চিত্রিত করেছেন। মোহন রাকেশের নাটকের ভাষা সহজ স্বচ্ছন্দ প্রবল ভাবগত এবং আশ্চর্য দ্যুতিময়, আবার বাস্তব রীতির যথাযথ অনুবর্তন প্রতীকের ব্যঞ্জনা এবং ন্যাচারালিস্টিক কনভেনশন-এর সার্থক প্রয়োগ রাকেশকে মহত্তম শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে।

'আষাঢ়কা এক দিন' (১৯৫৮) মোহন রাকেশের প্রথম বিশিষ্ট নাটক যার জন্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। মহাকবি কালিদাসের জীবনের এক কিংবদন্তিমূলক ঘটনা নাটকের ভিত্তি। কালিদাস গ্রাম্য মেয়ে মল্লিকাকে ভালবাসে এবং তার কবিত্বের উৎস ঐ অঞ্চলের অপরূপ প্রকৃতি ও পরিবেশ, এবং মল্লিকা। রাজা লোক পাঠান কালিদাসকে নিয়ে যেতে, সভাকবি করতে। তার অনিচ্ছা থাকলেও মল্লিকার আগ্রহে কালিদাস যায়। দ্বিতীয় অঙ্কে কালিদাস কাশ্মীরের শাসক নিযুক্ত হওয়ায় মহিষী রাজকন্যা প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরীকে নিয়ে সেখানে যাচ্ছে। পথে সেগ্রাম পড়ে। কবিপত্নী দেখবে সেই গ্রামকে পরিবেশকে যেখানে কালিদাসের কবিত্ব বিকশিত হয়, আর দেখবে মল্লিকাকে। সে মল্লিকাকে বলে — তুমহে ঔর তুমহারে ঘর কো দেখনা চাহতী হুঁ। উনহোনে বহুত বার ইসঘর কী ঔর তুমহরী চর্চা কী হ্যয়। জিন দিনো 'মেঘদূত' লিখে রহে থে উন দিনো প্রায় যহাঁ কা স্মরণ কিয়া করতে থে। প্রিয়ঙ্গু মল্লিকাকে সাহায্য করতে কিছু দিতে চায় মল্লিকার অভিমানী মন আহত বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। তৃতীয় অঙ্কে মল্লিকার অবস্থা দুঃসহ হয়েছে। তার মা মারা গেছে, সে বাধ্য হয় বিলোমকে বিয়ে করতে যাকে সে এতকাল অবহেলা উপেক্ষা করেছে। কালিদাস কাশ্মীর থেকে আসে। মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়। কালিদাস বলে যে মল্লিকাই তার সৃষ্টির উৎস, আর এই বাতাবরণ তার প্রেরণা। সে যা লিখেছে তা এখানকারই সঞ্চয় — জো কুছ লিখা হ্যয় উহ যহা কে জীবন কা হী সঞ্চয় থা। 'কুমার সম্ভব' কী পৃষ্ঠভূমি যহ হিমালয় হ্যয় ঔর তপস্বিনী উমা তুম হো। 'মেঘদূত' কে যক্ষ কী পীড়া মেরী পীড়া হ্যয় ঔর বিরহ - বিমর্দিতা যক্ষিণী তুম হো — যদ্যপি ম্যয়নে স্বয়ং যহা হোনে ঔর তুমহে নগর মে দেখনে কী কল্পনা কী। 'অভিজ্ঞান শাকুন্তল' মে শকুন্তলা কে রূপ মে তুমহী মেরে সামনে থী। কিন্তু মল্লিকার বেদনাদীর্ণ জীবনের পরিচয় জেনে কালিদাস বিমূঢ়। সে নিঃশব্দে চলে যায়। মল্লিকা তার শিশুকে আকড়ে ধরে, বিদ্যুৎ ঝলসে যায় আকাশের গায়ে, শোনা যায় মেঘের গর্জন।

'লহরোঁ কে রাজহংস' (১৯৬৩) অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য কাহিনী আশ্রিত। শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্ব, জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখ ও আত্মিক আনন্দর দ্বন্দ্ব এবং মানুষের পরম পাওয়ার কথা নাটকে আছে। কপিলাবস্তুর রাজকুমার নন্দর পত্নী সুন্দরী আপন মহলে কামোৎসবের আয়োজন রত, অন্য দিকে বুদ্ধপত্নী যশোধারা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করবে। সুন্দরী তীব্র ব্যঙ্গ করে যশোধারাকে যার অক্ষমতার জন্যই বুদ্ধ হয়েছে সিদ্ধার্থ। নন্দর দ্বারে

ভিক্ষার্থী বৃদ্ধ ফিরে যায় কারণ নন্দ সুন্দরীর প্রসাধনরত। বেদনাহত নন্দকে সুন্দরী অনুমতি দেয় বৃদ্ধের কাছে যেতে। নন্দ ফিরে আসে মুণ্ডিত মস্তকে বুদ্ধমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে। সুন্দরী ক্রুদ্ধ কঠিন, সে স্বীকার করেনা নন্দর দৌর্বল্যকে। নন্দ চলে যায়। সুন্দরীর ধারণা ছিল নন্দ কিছুতেই তার রূপ সৌন্দর্যের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না তাই নন্দর ভিক্ষু বেশ তাকে প্রবল আহত করে। নাটকে নন্দর সংশয়গ্রস্ত মানসিকতা সুন্দরীর তীব্র ব্যক্তিত্ব চমৎকার ফুটেছে। নাটকের নামকরণ সুন্দর। রাজহংস যেন প্রতীক হয় — প্রমোদ পুষ্করিনীতে তাদের বিচরণ, এক দীর্ঘ কালো ছায়ায় (বুদ্ধের) তাদের আচ্ছন্ন হওয়া, তাদের ভয় দোদুল্যমানতা এবং শেষ পর্যন্ত উধাও হয়ে যাওয়া — এতে নন্দের মানসিকতা প্রতিফলিত, এবং তার সঙ্গে সমস্ত নাটকের ভাবনাও প্রতীকায়িত। নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন সলিল সরকার এবং ও পি রানা।

'আধে অধুরে' (১৯৬৯) সমকালীন এক পরিবার তথা সমাজ জীবনের মূল্যবোধের বিনাশ, আশাভঙ্গের বেদনা ও নৈরাশ্যক্ষুব্ধ হাহাকারের ছবি। নাটকের প্রধান চরিত্র চল্লিশের কাছাকাছি চাকুরীরতা যৌবনের শেষ চমকে দীপ্ত সাবিত্রী যে জীবনের সব আশাভঙ্গের বেদনায় ক্লান্ত বিষন্ন। স্বামী মহেন্দ্রনাথ কর্মহীন অসহায় বিপর্যস্ত — সংসারে সে অপ্রয়োজনীয়। এদের বড় মেয়ে কুড়ি বছরের বিন্নী ভালবেসে মনোজকে বিয়ে করেও চলে আসে বাবা মার কাছে কারণ তার সুখশান্তি নেই। এদের একুশ বছরের ছেলে অশোক বেকার ও জগতের ওপর তিক্ত বিদ্বেষযুক্ত। ছোট মেয়ে বারো তেরোবয়সের কিন্নী উদ্ধত অসভ্য। সাবিত্রী স্বামীকে সহ্য করতে পারে না কারণ সে অযোগ্য অপদার্থ। সাবিত্রীর জীবনের সব স্বপ্ন খান খান হয়ে ভেঙে গেছে। সে সন্ধান করে গোটা মানুষের। পূর্ণ মানুষের। সে বাড়িতে ডাকে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পুরুষকে (মহেন্দ্রনাথ ও তিন পুরুষ চরিত্রে একই অভিনেতা অভিনয় করে) যারা তার ছেলেকে চাকরি দেবে, সংসারকে প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। সাবিত্রী তাদের সঙ্গে মেশে কিন্তু দুঃখ বেদনা প্রত্যাখান নিয়ে ফিরে আসে। স্ত্রীর অবহেলায় নিঃস্ব রিক্ত মহেন্দ্রনাথ যায় জুনেজার (চতুর্থ পুরুষ) কাছে যে, সাবিত্রীর মতে ব্যবসার নামে মহেন্দ্রনাথকে শেষ করেছে। বড় চাকুরীয়া সিংহানিয়ার (দ্বিতীয় পুরুষ) অসভ্যতায় ঔদ্ধত্যে ইডিয়সিতে ছেলেমেয়েরা ক্রুদ্ধ বিরক্ত। সাবিত্রী তার প্রতি সহৃদয় সংবেদশীল জগমোহনের (তৃতীয় পুরুষ) সঙ্গে চলে যেতে চায় সুখের জন্য কিন্তু বুদ্ধিমান জগমোহন তা অসম্ভব জেনে ফিরিয়ে দেয় সাবত্রীকে। নাটকের শেষে জুনেজা আসে ও বলে যে সবিত্রীর তেজ প্রতাপ, অকারণ স্বপ্ন দেখা, পূর্ণ মানুষের বৃথা অন্বেষণের জন্য মহেন্দ্রনাথের এই অব্যবস্থা। সাবিত্রীরও। মহেন্দ্রর বদলে যে কোন লোককে বিয়ে করলে একই অবস্থা হত। সাবিত্রী খুঁজছে 'এক পুরে আদমী' একটা গোটা মানুষ। তার কাছে জীবনের মানে হল এক সঙ্গে অনেক হয়ে অনেক পেয়ে বাঁচা যেটা কোন একজনের মধ্যে না পেয়ে সে রিক্ততা অনুভব করে। সে বলে, 'তুমহারে লিয়ে জীনে কা মতলব রহা হ্যয় — কিতনা কুছ এক সাথ হোকর, কিতনা কুছ এক সাথ পাকর ঔর কিতনা কুছ এক সাথ ওঢ়কর (নিয়ে, জড়িয়ে) জীনা। উহ উতনা কুছ কভী তুমহে কিসী এক জগহ ন মিল পাতা, ইসলিয়ে জিস কিসি কে সাথ ভী জিন্দগী শুরু করতী, তুম হমেশা ইতনী হী খালী, ইতনী হী বেচৈন (ব্যাকুল, অসহায়) বনী রহতী'। সাবিত্রী তার মুঠোয় সব কিছু আকড়াতে চাইত কিন্তু সবই পড়ে যেত। ব্যথিত পর্যুদস্ত সাবিত্রী যন্ত্রণায় চীৎকার করে বলে যে সব পুরুষই এক যদিও আলাদা মুখোশ পরে আছে। 'সব-কে-সব ... সব-কে-সব ...এক-সে। বিলকুল এক-সে হ্যয় আপ লোগ। অলগ অলগ মুখৌট, পর চেহরা?

চেহরা সবকা এক হৈ।' আবার ফিরে আসে মহেন্দ্রনাথ শরীরে যেন প্রাণ নেই ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া। এক বিষণ্ণ অন্ধকারে ডুবে যায় মঞ্চ।

ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ লাল (১৯২৫ ১৯৮৭) আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। তিনি মনে করেন রঙ্গমঞ্চ বাদে নাটকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তার নাটক রঙ্গমঞ্চের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা স্ফুরিত ও অনুপ্রাণিত। ড লাল মানবহৃদয়ের ভাষ্যকার — মানবমনের বিচিত্র অনুভূতি হৃদয়ের নিবিড় স্পন্দন তার নাটকে প্রস্ফুটিত। তিনি মানব মনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপকারও বটেন। তার নাটকের অপর বৈশিষ্ট্য সমাজ সমস্যার তীক্ষ্ণ নির্মোহ বিশ্লেষণ। নাট্যাঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষায়ও তিনি সফল 'খুলে মঞ্চ কা নাটক' বা মুক্তাঙ্গন অভিনয়রীতির উপযোগী নাটক তিনি রচনা করেছেন।

'অন্ধা কুয়া' (১৯৫৫) ভারতীয় গ্রামের অর্থনৈতিক সামাজিক ও মানবিক সংকট স্মরণরসাত্মক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অশিক্ষিত বর্বর ভগৌতী, তার পত্নী সূকা সূকার প্রেমিক ইন্দরের জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। সাদা ক্যাকটাস (১৯৫৯) নাটকে চিত্রকর অরবিন্দ তার স্ত্রী সুজাতাকে অবহেলায় পরিত্যাগ করে আধুনিক সুন্দরী শিল্পী আনন্দার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়। অরবিন্দর ধারণা সাদা ক্যাকটাসের সান্নিধ্যেও যেমন পুরুষ ক্যাকটাস শুষ্ক নিষ্প্রাণ হয়ে যায় তেমনি স্ত্রীর সান্নিধ্যে তার শিল্প নির্জীব হয়ে যাবে। তারা বিয়ে করে না তাদের প্রেম আধ্যাত্মিক। এদিকে সুজাতা নিজেকে গড়ে তুলে পূর্ণভাবে ও কবি লেখক দিবাকরকে বিবাহ করে অন্যদিকে আনন্দা মারাত্মক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে শুকিয়ে যায়। পুরুষ নারীর সম্পর্ক শিল্পের স্বাধীনতা ব্যক্তি হৃদয়ের দ্বন্দ্ব নাটকে পরিস্ফুট এবং অরবিন্দর মিথ্যা জীবনধারণা অবাস্তবের স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতি পাররশ্যতাও চিত্রিত। নাটক তোতা ময়না' লোককথার ওপর আধারিত নাটক যেখানে স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্রিত। কালিদাস পুরস্কার প্রাপ্ত রাজরানী (১৯৬২) সমালোচকের মতে 'হিন্দী মে আধুনিক নাট্য লেখন কা সূচক হ্যয়।'[৭] এক সহৃদয়া মধুরস্বভাবা নারী কুন্তল (যে প্রকৃতই রাজরানী) ও তার স্বামী দেবদেবকে নিয়ে লেখা এই নাটক পারিবারিক সামাজিক জীবনের ছবি

কলংকী, সূর্যমুখ, মিস্টার অভিমন্যু, এক সত্য হরিশচন্দ্র উত্তরযুদ্ধ প্রভৃতি নাটকে ড লাল মিথের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। নবম দশম শতকের পটভূমিকায় 'কলংকী (১৯৬৯) নাটকের তদানীন্তন লোকচেতনা ধর্মভয় অন্ধবিশ্বাস আধুনিক যুগেও বিদ্যমান, এর রাজনৈতিক জটিলতা ও আবর্তন যেন বর্তমানের। 'মি. অভিমন্যু' (১৯৭১) পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনীর আদলে আধুনিক নাটক — জটিল নির্মম প্রতিকূল পরিস্থিতির আবর্তে পতিত এক মানুষের ট্র্যাজেডি। সৎ আদর্শবাদী রাজন কালেকটর, কিন্তু তার চারপাশে দুর্নীতির জাল পাপের পসরা। সরকারের প্রিয়পাত্র মন্ত্রীদের বন্ধু হলেও সে বড় ব্যবসায়ী কাজারিওয়ালের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা নেবেই কারণ সে মূলত এক ক্রিমিন্যাল। ধুরন্ধর নেতা গয়াদত্তও সরকারের নিজস্ব লোক, সেই ধূর্ত বদমায়েশকেও রাজন শিক্ষা দেবে। রাজনের প্রিয়তমা স্ত্রীও চারপাশে লোভের হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়, রাজনের বাবাকেও প্রলুব্ধ করে। আর আছে সৎ মানবিক গুণ সম্পন্ন শ্রমিকনেতা আত্মন যে বোধহয় রাজনের সহধর্মী, সে প্রতিবারই গয়াদত্তর কাছে ভোটে হারে। চারপাশের পরিবেশ রাজনকে ঘিরে ফেলে, বৃত্ত সংকুচিত হতে থাকে, লোভ প্রলোভন চাকুরী উন্নতি ভয় ভীতি শাসন তাকে বেষ্টন করে প্রবলভাবে, গয়া দত্ত হত্যা করে আত্মনকে কিন্তু হত্যাপরাধ চাপবে রাজনের ওপর যদি না সে সবকিছু মেনে নেয় ও তদনুযায়ী কাজ করে।

রাজন অসহায় ক্লান্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, হারায় প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শেষ পর্যন্ত সে আত্মসমর্পণ করে। যেন এক অগ্নিশিখা নির্বাপিত হয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায় সমুদ্যত বজ্র। নাট্যকার কেবল রাজনের ব্যক্তিসত্তাকেই আঁকেননি, যে সব সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিসটেম তার ভয়াল বন্ধনে গ্রাস করে সব কিছু তার কথাও বলেছেন। আত্মন ও গয়া দত্তব চিত্রণে লেখকের শিল্পকৌশল ও মনস্তাত্ত্বিক গভীর উপলব্ধি ফুটেছে— আত্মন হল রাজনের সৎ বিবেক ও গয়া দত্ত অসৎ প্রবৃত্তির প্রতিরূপ, গয়া দত্ত হত্যা করল আত্মনকে যা প্রকৃতপক্ষে রাজনের মহৎ সত্তার বিনাশ।

লক্ষ্মীনারায়ণ লালের নতুন ভাবের নাটক 'রাম কী লড়াই' লীলা নাটকের ভিত্তিতে রচিত যাতে রাম চরিতের ধনুষ যজ্ঞের সমানান্তর নীচ জাতির রামগুলামের সঙ্গে উচ্চ জাতির বিমলার প্রেম ও স্বয়ংবরের মাধ্যমে সমকালীন গ্রামীণ জীবন এবং স্বাধীনতা থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির কলুষিত চিত্রটি তুলে ধরেছেন। এই নাটকে সীতা হল জনতা — ভারতমাতা এবং রাবণ ভ্রষ্ট নেতা। জীবন ও সমাজ হল ধনুক এবং রাম জীবিত সত্তা। আমাদের সমগ্র জীবন ও পরিবেশকে কলুষিত বিনষ্ট করেছে যে শক্তি সে হল 'ত্রিভুজ রাক্ষস যার তিনটে বাহু হল জমিদার বেনে ও নেতা।' যতদিন না সবথেকে নীচের মানুষ রামগুলাম নিজের রামকে (সত্তাকে) চিনতে না পেরে নিজেদের যথার্থ স্বাধীনতার জন্য লড়াই না করবে ততদিন তাকে গোলাম থাকতে হবে।

বিষ্ণু প্রভাকর সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তবে নাটকেই তার ক্ষমতার বিশেষতম পরিচয় পাওয়া যায়। মানবচরিত্রের গভীরে তিনি অবগাহন করেছেন — মনোবৈজ্ঞানিক ভাবনার প্রকাশে তিনি দক্ষ। বিষ্ণু প্রভাকর সাধারণ জীবনকে নাটকের বিষয় করেছেন এবং তাতে 'উচ্চ প্রবুদ্ধ মানবতা'র নির্মাণ করেছেন। প্রভাকরজীর শিল্পী ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'সৌম্য স্বভাব তথা জীবনকে প্রতি আস্থাবাদী দৃষ্টিকোণ' এবং এক আদর্শবাদী ভাবনা এই আস্থার মূলে বিদ্যমান।

'নব প্রভাত' (১৯৫২) অশোককালীন ঐতিহাসিক নাটক। 'চন্দ্রহার' (১৯৫২) গবন-এর নাটকীকরণ। 'ডাকটর' (১৯৫৮) মনোবৈজ্ঞানিক নাটক — নায়িকা ডঃ অনিলার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রণ। একদিকে চিকিৎসক রূপে তার কর্তব্যবোধ অন্যদিকে বিবাহিত জীবনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা। শেষ পর্যন্ত কর্তব্যের জয় হয়। 'হোরী' (১৯৫৫) প্রেমচন্দর গোদান উপন্যাসের নাট্যরূপ। এতে দুঃখ দারিদ্র পীড়িত ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন চিত্র ফুটেছে। হরি এইরকম এক চাষী যে রোদ বৃষ্টি শীতে আপ্রাণ চেষ্টা করে ফসল ফলায় কিন্তু বিনিময়ে পায় দারিদ্র অনাহার। তার মেয়ের বিয়ে দিতে হয় এক বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে। নিজের একটা গরু পালার সাধ তার জীবনে পূর্ণ হল না, তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী পন্ডিতকে গোদানের জন্য সওয়া টাকা দেয়। এক মহৎ উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপ 'হোরী'।

'দেবী' (১৯৬৫) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর বাংলা উপন্যাস 'দেবী'র নাট্যরূপ। এটা বিষ্ণু প্রভাকরের এক বিশিষ্টতম রচনা, হিন্দী নাট্যসাহিত্যেরও এক অমূল্য সম্পদ। কালীকিংকরের দুই পুত্র তারাচাদ ও উমাপ্রসাদ। উমাপ্রসাদের স্ত্রী দয়াময়ী তারাপ্রসাদের বাবা শিশুপুত্র অমূল্যকে খুব ভালবাসে। বাড়িতে চলছে উৎসব অয়োজন দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে। কালীকিংকর প্রত্যাদেশ পায় সে দয়াময়ীই 'দেবী' এবং তার পূজা করতে হবে। দয়াময়ীকে দেবীরূপ নিতে হয়, লোকে আসে তার প্রসাদ ও অনুগ্রহ নিতে, নাহয় রোগশোকের প্রতিকার নিতে। দয়াময়ী অস্থির ব্যাকুল হয় এই দেবীত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি

পেতে। অমূল্য ভয়াবহ রোগাক্রান্ত হয়। কোন চিকিৎসা নয়, কালীকিংকর তাকে রেখে দেয় দেবীর কাছে একমাত্র সেই পারে অমূল্যকে বাঁচাতে। অসহায় কাতর রক্তক্ষরিত হৃদয় দয়াময়ী ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা করে কিন্তু অমূল্য মারা যায়। 'দেবী'ও আত্মবিনাশ ঘটায়।

অনেক উচ্চমানের একাংক লিখেছেন প্রভাকরজী। 'সড়ক' ড্রামাটিক মনোলগ বা এক সংলাপী নাটক। এক নারী এর নায়িকা তার উক্তিতে তার জীবনানুভূতি হৃদয় বেদনা তীব্র রূপ পেয়েছে। সে দূর প্রসারিত রাস্তার সঙ্গে তার জীবনের সাধর্ম্য অনুভব করে; পথের ঘটনা দুর্ঘটনা উদ্দমতা স্তব্ধতা রক্তপাত তীব্র বেদনা সত্ত্বেও পথ স্থির। নারীও তাই আঘাত বেদনা লাঞ্ছনা অপমান সয়েও বেঁচে আছে। পঞ্চ দৃশ্যের 'মীনা কঁহা হৈ' ক্রাইম ধরনের নাটক, যদি সমাজ চেতনা ও মনোবিশ্লেষণ এতে চমৎকার।-অপুত্রক ও দরিদ্র **পরেশ** ও তার স্ত্রী তাদের পালিত কন্যা মীনাকে গভীর ভালবাসলেও তাকে খাবার দিতে না পেরে **নরেশ** মীনাকে ক্রুদ্ধভাবে প্রহার করে ও সে মারা যায়। নরেশ মীনার দেহ মাটিতে পুতে রাখে ও পুলিশে খবর দেয়। নরেশের মনের বেদনা যন্ত্রণা দহন চমৎকার ফুটেছে নাটকে। সাসপেন্স বা নাট্যোৎকণ্ঠা সৃজনেও লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'মা' নাটক নারী চরিত্রের গভীর মর্মস্পর্শী উদ্ভাসন। স্বামীর ভালবাসা, চিকিৎসকের প্রয়াস ও চিকিৎসক পত্নী কমলার আন্তরিক যত্ন ভালবাসা সত্ত্বে মনীষী মানসিক রোগ ও জ্বালায় ক্লিষ্ট হচ্ছে। তার মা বাল্যকালে তাকে ছেড়ে এক ডাক্তারের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। পরের দয়া ও ভালবাসায় মনীষী বড় হয়েছে এবং স্নেহময়ী কমলার জন্যই তার ভাল বিয়ে হয়েছে। সে আরো বিচলিত কারণ তার কলংকিনী মা তার কাছে আসতে চায় - হয়ত তার সংসারের ভাঙ্গন ধরবে। এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময় আনন্দে সে জানতে পারে কমলাই তার মা।

বিনোদ রস্তোগী (১৯২৩) আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। তিনি মনে করেন যে 'নাটক জনজীবন কো প্রভাবিত এবং আন্দোলিত করনে কা সবলতম সাধন হ্যয়।'[১৮] তার নাটকের বিষয় প্রগতিশীল এবং এতে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের 'ঝূঠী মান্যতায়োঁ পর ব্যঙ্গ কসা জাতা হ্যয়।'[১৯] যদিও অতি নাটকীয়তা আকস্মিকতা চরিত্রচিত্রণের অস্বাভাবিকতা তার নাটকে আছে।

'আজাদী কে বাদ' (১৯৪৯) নাটকে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামাজিক জীবনের তীক্ষ্ণ চিত্র। পনেরো আগস্টের পর সারা শহর আলোয় উদ্ভাসিত, অন্যদিকে অসংখ্য শরণার্থী যাদের ঘরের দীপশিখা নিভে গেছে পঞ্জাবের হত্যাকান্ডে যদিও আলোর অভাব নেই কারণ অনেকের ঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে তখনো। দেশে চলছে একদিকে সেঠ সাহুকারদের শোষণ অত্যাচার অন্যদিকে দরিদ্র অসহায় মানুষের বেদনা। মিলমালিক সেঠের কারখানা বন্ধের প্রয়াস, শ্রমিক নেতা অজীতের বাধাদান, অজীতের বোন কান্তার প্রতি সেঠের পুত্র রমেশের অনুরাগ, সেঠকন্যারও পিতার বিরোধী মনোভাব, ক্রুদ্ধ সেঠের অজীতকে মারার প্রয়াস, দুর্ভাগ্যবশত তার কারখানায় অগ্নিকান্ড ও চোরাই জিনিষ উদ্ধার, সেঠের সর্বনাশ, অজীতের মৃত্যু, সেঠের অনুতাপ — সব নাটকীয় রীতিতে উপস্থাপিত। 'নয়ে হাথ' (১৯৫৮) নাটকের নামেই প্রতিপন্ন যে এটা বিকাশোন্মুখ ভারতীয় জীবন ও নয়া সামাজিক চেতনার চিত্রণ। নাটকের নায়ক মহেন্দ্র, তার বোন শালিনী নায়িকা। মালা ও তার কাকা বিজয়প্রতাপ সৎ চরিত্র, অন্যদিকে মালার বাবা অজয়প্রতাপ ও তার স্ত্রী মাধুরী খল চরিত্র — এদের দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং প্রেম প্রীতি ঘৃণাবিদ্বেষের টানা পোড়েনে নাটক এগিয়ে চলে এবং শেষ পর্যন্ত সততার আদর্শ প্রতিপন্ন হয় ও অসতের হৃদয় পরিবর্তিত হয়।

'বরফ কী মিনার' সামাজিক পারিবারিক নাটক — জীবনের সুখ-দুঃখ হাসিকান্নার সহজ চিত্রণ। নাটকের নায়িকা বেবী যার ব্যক্তিগত ভাবনাবাসনাগুলো তার মার প্রবল কর্তৃত্বের কাছে নষ্ট হয়ে গেছে আরো অনেকের মতো। ঐ মায়েরই এক বিকলাংগ ভাই বেবীকে প্ররোচিত করে তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে যেতে যা সে শেষ পর্যন্ত করে।

রমেশ মেহতা (১৯২৩) হাস্যরসাত্মক নাটকরচনাতেই খ্যাত হয়েছেন। সমাজের অন্যায় অসঙ্গতিকে তিনি ব্যঙ্গকৌতুকে জর্জরিত করেছেন, লোভলালসা মিথ্যাচার প্রভৃতি মানবচরিত্রের বিবিধ প্রবৃত্তিকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। 'আন্ডার সেক্রেটারি' নাটকের প্রস্তাবনায় 'ইয়ে মেরে প্রহসন' শিরোনামায় তার প্রহসনের লক্ষ্য সম্বন্ধে বলেছেন — 'ম্যয় সমঝতা হুঁ আজকে মানব কো গুদগুদা কর হসানা ঔর উসে হসতে রখনা জনসেবা হ্যয়, দেশ সেবা হ্যয়, রাষ্ট্র সেবা হ্যয়, কহিয়ে বিশ্ব সেবা হ্যয়।' তার প্রায় কুড়িটি নাটকই রসিক দর্শকদের ভালবাসা পেয়েছে। যদিও রমেশ মেহতার নাটক সম্বন্ধে অভিযোগও অনেক--তাঁর বক্তব্যে দার্শনিকতা একেবারে নেই, হাস্যরস লঘু তরল, আঙ্গিক বাধাধরা ও কটা ফরমুলায় আবদ্ধ। তাঁর উল্লেখ্য নাটক হল — অপরাধী কৌন (১৯৫২), উলঝন (১৯৫৪), আন্ডার সেক্রেটারী (১৯৫৮), ঢোঙ্গ (১৯৫৭) রোটী ঔর বেটী (১৯৬০) ক্যা মুসীবত হ্যয় (১৯৬১) প্রভৃতি। টিভির জন্য লিখেছেন —পয়সা বোলতা হ্যয় (১৯৭১)।

রমেশ মেহতার খ্যাতি দূরপ্রসারিত করেছে কৌতুক ব্যঙ্গের নাটক 'আন্ডার সেক্রেটারি'। মানুষের সম্মানমোহ, মিথ্যা অভিজাত্যবোধকে ব্যঙ্গকৌতুকে তুলে ধরা হয়েছে। চাঁদ নারায়ণের পত্নী সরোজ ঝামেলায় পড়েছে কারণ তার বান্ধবী পুষ্পা তার স্বামী মিঃ বর্মাকে নিয়ে আসছে সে একজন ডাইরেকটর। সম্মান রক্ষায় উদগ্র সরোজ স্বামীকে করে আন্ডার সেক্রেটারী ও ভাড়া করা দামী জিনিষপত্র দিয়ে ঘর সাজায়। সাহেব মেমসাহেব বলানোর ও আদবকায়দা শেখানোর ঠেলায় চাকর পালালে চাঁদনারায়ণকে হতে হয় চাকর ও তার বন্ধুকে হতে হয় বাড়ির মালিক। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সব রহস্য খুলে গেল— চাঁদনারায়ণ একজন অ্যাসিস্টেন্ট ক্লার্ক ও মিঃ বর্মা একজন সামান্য বস্ত্রবিক্রেতা মাত্র।

'ঢোঙ্গ' নাটকে মানুষের লোভলালসা প্রবৃত্তির হীনতাকে হাস্যরসে সিক্ত করা হয়েছে। অর্থলোভী চতুর গঙ্গাধরের পুত্র নরেশ ও কন্যা নীলা প্রেম করছে চন্দ্রা ও প্রেমের সঙ্গে। চন্দ্রা ও প্রেমের বাবা-মার সম্মতি ছাড়াই তাদের সঙ্গে নরেশ ও লীলার বিয়ে ঠিক হয়। গঙ্গাধর দু দম্পতির জন্য অলংকার গড়ায়। কিন্তু ক্রমশঃ পরিচয়ে জানা গেল যে প্রেম প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রার চলে যাওয়া স্বামী প্রেমস্বরূপ। তারা দুজনের অলংকার নিয়ে পালায়। অপমানিত হলেও গঙ্গাধর সগর্বে বলে যে ওটা আদৌ সোনার ছিল না।

'পয়সা বোলতা হ্যয়' পয়সার মহিমা চিত্রণের সঙ্গে মানুষের লোভ নীচতার পরিচয় তুলে ধরে। দুই বেকার ছেলে সিনেমাপাগল সুরেশ ও উমেশকে নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীয়া রাধেগোপালের সংসার কোনভাবে চলে। দাসী তারা ঘরের সব কাজ করে, তার গাঁয়ের লোক পঞ্চু আসে যে খাবার বিনিময়ে সারাদিন কাটে, তারও অপমানের শেষ নেই। সুরেশ পঞ্চুকে মারে কেননা সে সুরেশের থেকেও কম দামে বাজার থেকে জিনিস আনে। একদিন খবর আসে পঞ্চু লটারীতে এক লাখ পচাঁত্তর হাজার টাকা পেয়েছে। তাকে প্যান্ট কোট পরিয়ে বাড়ির মালিক করে সোফায় বসানো হয়, সুরেশ হয় তার চাকর, বাড়ির সবাই তার সঙ্গে প্রভুর মত ব্যবহার করে। কিন্তু হায় ভাগ্য। খবর আসে পঞ্চুর নাম লটারীতে ওঠেনি। সবাই তাকে মেরে বার করে দেয়। কিন্তু না। সে সত্যিই টাকা

পেয়েছে। এবার তারা পঞ্চুকে নিয়ে চলে যায়। রাধেগোপাল ও তার স্ত্রী পুত্র বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ভীষ্ম সাহনী (১৯১৫-২০০৩) বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিজীবী রূপে সম্মানিত। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি প্রবল ভাবে সমাজমনস্ক, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা ও গভীর শ্রদ্ধা করেন এরাই রচনা করবে নতুন ইতিহাস। এই মানবিক প্রত্যয় তাঁর রচনাকে বিশিষ্ট মূল্য দিয়েছে। সাহনীর বিখ্যাত 'হানুস' নাটক এক শ্রমজীবী মানুষের ছবি। চেকোশ্লোভাকিয়ার এই শিল্পী শহরে টাওয়ার ক্লক তৈরির জন্য জীবন ব্যয় করেছে, সর্ব দুঃখ বরণ করেছে। কিন্তু সে লোভের বা ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। সে যাতে অন্য কোথাও এরকম ঘড়ি না করতে পারে সে জন্য তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে পেয়েছে চরম পরিণতি। শাসক গোষ্ঠী ও গীর্জার নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও তারা শ্রেণীস্বার্থে এক হয় ও অত্যাচার করে হানুশ ও অন্যান্য মানুষের ওপর।

'কবীরা খড়া বাজার মে' সাম্প্রতিক কালের এক বিশিষ্ট রচনা। কবীর সমাজপ্রবাহের কেন্দ্রে ছিলেন, হিন্দু মুসলমান ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতাকে প্রবলভাবে আঘাত করেছেন, জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করেছেন, শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষকে মূল্য দিয়েছেন। এই সমাজ- সচেতনতা, মানবিক প্রত্যয়, বিদ্রোহী চেতনা নিয়ে কবীর সমকালের লোক হয়েও চিরকালের; বর্তমান সময়েও তাঁর মত মানুষের বড় বেশী দরকার। নাটকে মহৎ জীবনের এই পরিচয় সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ললিত সহগল মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে বেশ কটা নাটক লিখেছেন — বরদান, তমসা, তীন ফরিস্তে, কাগজ কী দীবার, মৃচ্ছকটিকম ইত্যাদি। 'হত্যা এক আকার কী' (১৯৬৭) তাঁকে বিরল খ্যাতি এনে দেয়। আঙ্গিক বৈচিত্র্যে ও বক্তব্যের অসামান্যতায় নাটকটি অভিনব। নাটকের কাল ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী বিকাল। স্থান একটা আন্ডার গ্রাউন্ড ঘর। সেখানে চারজনে এসেছে গান্ধীজীকে হত্যার জন্য। সময় আর নেই। কিন্তু চতুর্থ যুবক অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয় কারণ এই হত্যাটা অন্যায় মনে হচ্ছে — সে সবাইকে বলে ব্যাপারটা আবার বিবেচনা করতে। সকলেই ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত। প্রথম ব্যক্তি হয় সরকারী উকিল, দ্বিতীয় সরকারী সাক্ষী, তৃতীয় বিচারক, চতুর্থকে বলা হয় অভিযুক্ত (গান্ধীজী) ও তার উকীল হতে। একে একে অভিযোগ পেশ করা হয় — গান্ধীজীর ভ্রান্ত অহিংসা নীতি, ইংরেজ তোষন, দেশের সমস্ত সংগ্রামী বীরদের বিরোধিতা, মুসলিম তোষণ ইত্যাদি। শান্ত প্রসন্ন মূর্তিতে কল্যাণবোধে উদ্দীপ্ত অভিযুক্ত সব প্রশ্নের উত্তর দেয়, প্রতিপন্ন করে আপন কর্মের সামর্থ্য। কিন্তু রক্ত পিপাসু হত্যাকারীরা সে কথা শুনবে না, তারা গান্ধীজীর হত্যা চায়, দেওয়া হয় গুলি করে হত্যা করার দন্ড। ঘড়িতে বাজল পাঁচটা পাঁচ। তিনটে গুলির শব্দ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় বাতাসকে, শোনা যায় বেদনার্ত স্বর — হায় রাম। পৃথিবী কেঁপে ওঠে থরথর করে, আকাশ বিস্ফারিত হয়ে যায়, চারপাশ লক্ষ লক্ষ নরনারীর করুণ ক্রন্দনে ভরে ওঠে। যুবকের মুখে বিচিত্র অভিব্যক্তি। সে ক্রমশঃ স্থির হয়, নেপথ্যের দিকে চেয়ে বলে — "তুমহারা খ্যাল হ্যয়, দোস্ত, তুমনে উসে মার দিয়া হ্যয়? - নহী দোস্ত নহী। তুমনে এক আকার কী হত্যা কী হ্যয় — হাড়মাস মে ভরে এক আকার কী। জানতে হো, সন ১৯ মে উসনে আপনে এক ভাষণ মে কেয়া কহা হ্যয়? — উসনে কহা থা — 'মেরী মৃত্যু হিন্দু মুসলমান দোনো কো এক করনে কে প্রযত্ন মে হী হো?' হ্যয় ন কমাল! ইস সময় তো উসকো অন্তরঙ্গ খুশী সে নাচ রহা হোগা, মূর্খ"!

নাটকের প্রকাশভঙ্গী চমৎকার, বিষয়বস্তু গভীরভাবে মনকে স্পর্শ করে। সামগ্রিক ভাবে নাটকের আবেদন অসাধারণ। তবে সওয়াল - জবাবের মধ্য দিয়ে তীব্র দ্বন্দ্বময় নাটকীয়তা ফোটেনি, গান্ধীজীর বিরুদ্ধ-বাদীদের প্রশ্ন অভিযোগ খুব জোরালো নয়, উত্তরও অনেকটাই অগভীর। গান্ধীজীর প্রতি লেখকের পক্ষপাত সুস্পষ্ট হওয়ায় নাটক জমে নি। তবু অভিনব প্রয়াসের জন্য নাটকটি সবিশেষ মূল্যবান।

হিন্দীতে কাব্য নাটক লেখায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন শিল্পীরা। **মহাকবি সুমিত্রানন্দন পন্ত** (১৯০০-১৯৭৭) রচিত 'রজতশিখর' (১৯৪১) দুটি কাব্য নাটিকার সংকলন যাতে প্রকৃতি অনুধ্যান, জীবনের গভীর অনুভব, মানবতার প্রকাশ আছে। **নিরালার** 'পঞ্চবটী প্রসঙ্গ' রামায়ণ অবলম্বন রচিত। **সিয়ারামশরন গুপ্তর** 'উন্মুক্ত', মৈথিলীশরণের 'অনঘ' 'সাকেত' প্রভৃতি উচ্চমানের গীতিনাট্য। উদয়শংকর ভট্ট-র 'মৎস্যগন্ধা' ভগবতীচরণ বর্মার 'তারা', জানকীবল্লভ শাস্ত্রীর 'উর্মিলা' প্রভৃতিও বিশিষ্ট কাব্য নাটক। **কবি সচ্চিদানন্দ বাৎস্যায়ন অজ্ঞেয়**র 'বসন্ত' প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে মানবহৃদয়ের ও সুন্দর প্রকাশ আছে, দেখানো হয়েছে দুঃখবেদনা সত্ত্বেও মানুষের জীবনপ্রেমই জয়ী হয়। **সিদ্ধনাথ কুমার**ও লিখেছেন সুন্দর একাংক।

ধর্মবীর ভারতী (১৯২৬-১৯৯৭) আধুনিক কালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। কবি গল্পকার সাংবাদিক ধর্মবীর ভারতী কিছু অসাধারণ কাব্যনাটক লিখেছেন। সভ্যতার শেষ মুহূর্তে তার ধ্বংস এবং নতুন প্রাণের আবির্ভাব — এই সুন্দর বক্তব্য আশ্চর্য কাব্যিকতা ও শিল্প কুশলতায় বর্ণিত হয়েছে রেডিও একাংক 'সৃষ্টি কা আখিরী আদমী'তে। ধর্মবীর ভারতীর 'অন্ধা যুগ' ১৯৫৫তে রচিত ও ১৯৬৩ তে অভিনীত হয় (আলকাজী পরিচালিত ও ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা প্রযোজিত)। সমুন্নত কবিত্বময় দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ শিল্পগুণান্বিত এই নাটক সহৃদয় সংবেদশীল চিত্তকে গভীর মথিত করে। নাটকে মহাভারতের যুদ্ধের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজাত প্রবল হতাশা ভয়াবহ বিনাশ সর্বনাশা বিপর্যয়কে তুলে ধরা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ সন্ধ্যা থেকে প্রভাস তীর্থে কৃষ্ণের মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে ঘটনা ব্যাপ্ত। নেপথ্যভাষণ শঙ্খধ্বনি মঙ্গলাচরণ দিয়ে কাহিনী শুরু হবার পর নর্তক ঘোষণা করে সে 'যুদ্ধোপরান্ত য়হ অন্ধা যুগ অবতরিত হুয়া'। এখন স্থিতি মানসিকতা আত্মা সবই বিকৃত। কৃষ্ণ ভবিষ্যতের রক্ষক কিন্তু তিনিও যেন অন্ধ পথভ্রষ্ট। প্রথম অংকের সূত্রপাত কৌরব নগরীতে যেখানে শূন্য প্রাসাদে মৃত্যুর শীতলতা, যে সুসজ্জিতা সিন্দুরবতী কৌরব নারীরা সুরভিত বায়ুতরঙ্গের মত অপরূপ ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াত তারা আজ বৈধব্যে রিক্ত নিঃশেষিত। হঠাৎ দেখা যায় লক্ষ লক্ষ হিংস্র শকুনি আকাশ ঢেকে ছুটে চলেছে কুরুক্ষেত্রের দিকে। নির্বাক ধৃতরাষ্ট শীর্ণা গান্ধারী শেষ সংবাদের জন্য শংকায় অপেক্ষমান। দ্বিতীয় অংক। কৌরবদের কেউ বেঁচে নেই — শেষ হী রহা এক ভী জীবিত কৌরব বীর। অরণ্যে অশ্বত্থামা উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরাজিত দুর্যোধন লুকিয়ে আছে সরোবরে, তার মাথায় ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নোংরা জল। তৃতীয় অংকে যুদ্ধের শেষ খবর এসেছে ধৃতরাষ্ট্রর কাছে, গান্ধারী নিশ্চল প্রস্তরের মত বসে। খবর আসে দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুর্যোধন ভীমের কাছে পরাজিত। এক ভয়াবহ অতিপ্রাকৃত পরিবেশ মঞ্চে রচিত হয় — অন্ধকার ঢেকেছে চার পাশ, শৃগালের কান্না ভাসে, কাকের কর্কশস্বর পেচার বিকট চিৎকার শোনা যায়। উন্মত্ত হত্যা বাসনায় অশ্বত্থামা ছুটে যায় নিদ্রিত পাণ্ডব শিবিরের দিকে। চতুর্থ অংকে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাচ্ছে কীভাবে অশ্বত্থামা পিতার মৃত্যুর নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে। গান্ধারী আশীর্বাদ করে অশ্বত্থামাকে। অর্জুন ধেয়ে আসে অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। দুজনেই নিক্ষেপ করে ব্রহ্মাস্ত্র — ভয়ংকর শব্দে তীব্র প্রবল আলোয়

রূপে ওঠে পৃথিবী। ধ্বংসের এই ভয়াবহ রূপ দেখে চিৎকার করে ওঠেন ব্যাসদেব, অনুরোধ করেন অস্ত্র সংবরণ করতে। কৃষ্ণ চেষ্টা করেন রক্ষা করতে। পঞ্চম অঙ্কে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হয়। কিন্তু পান্ডব- রাজ্যে শান্তি সৌন্দর্য আনন্দ নেই, কেবল ভয় আতঙ্ক অন্ধকার। এদিকে এক ব্যাধ ভুলবশত কৃষ্ণকে হত্যা করে। কৃষ্ণ মৃত্যুর সময়ে সকলের পাপ ও বেদনা গ্রহণ করেন। ভবিষ্যতের বাণী ঘোষিত হয় যে মানুষই বাঁচাবে মানবজাতিকে তার মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারে, নবনব সৃষ্টিতে, সাহসে, প্রেম ও ভালবাসায়।

৪. সাম্প্রতিক পর্ব

দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিলতর হচ্ছে, তীব্রতর হচ্ছে সমস্যা সংকট। আর আছে রাজনৈতিক অস্থিরতা উন্মাদনা। নাটকে তার রূপায়ন ঘটছে। অন্যদিকে মানবহৃদয়ের গভীরতার বোধ সেখানে ফুটে উঠছে। আর দেখা যাচ্ছে নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা, অস্থিরতা ও ভাঙ্গন, যৌন সম্পর্কের নিরাবরণ নির্মোহ চিত্রায়ন। সমাজে যেন স্থিরতা নেই, সর্বস্তরে ভাঙন দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও ভাঙ্গছে -- মানবহৃদয় লক্ষ কোটি তরঙ্গের ওঠাপড়ায় নিত্য উদ্বেল। সাম্প্রতিক হিন্দী নাটকে অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রতিফলন পড়েছে। তবে তার গভীরতা প্রচণ্ডতা বা ব্যাপকতা কতটা তা বিচার্য। তেমনি ভাবে সামাজিক সমস্যাদি থাকলেও সেই নির্মোহ বিশ্লেষণ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বোধহয় ক্ষেত্রে ততটা নেই যা দিয়ে সমস্যার অন্তে উপনীত হওয়া যায়।

সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে একটা বিষয় প্রধানত চোখে পড়ে যে হিন্দী সামাজিক রাজনৈতিক নাটক যা লেখা হচ্ছে তা প্রধানত ব্যঙ্গাত্মক। 'পিছলে চার পাঁচ বর্ষসে হিন্দী নাটক ঔর রঙ্গমঞ্চ পর দৃষ্টিপাত করনে সে এক আশ্চর্যজনক তথ্য যহ সামনে আতা হ্যয় কি ইস বীচ স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে ঔর তথাকথিত আভিজাত্য সৌন্দর্য বোধকে গম্ভীর নাটকোঁ কী অপেক্ষা সামাজিক ঔর বিশেষত রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নাটকো কী ভরমার রহী হ্যয়। .... যহ বতানা কি অপনে নিহিত স্বার্থো কী পূর্তি কে লিয়ে সত্তা, অর্থ-তন্ত্র ঔর ধর্ম কী জবরদস্ত তাকতে কিস প্রকার সদিয়োঁ সে সংযুক্ত হোকর আম আদমী কো লুটনে-খসোটনে ঔর উল্লু বনানে মে লগী রহী হ্যয় — ব্যঙ্গ নাটক কা পহলা সরোকার হ্যয়। সামান্য জন কী দয়নীয় স্থিতি ঔর ত্রাসদ নিয়তি কে লিয়ে জিম্মেদার তাকতো কে বহুরূপী চেহারোঁ কো বেনকার করনা ঔর জনতা মে আত্মবিশ্বাস এবং আক্রোশ প্যয়দা করকে অন্যায় ঔর শোষন কী শক্তিয়োঁ কো বিরুদ্ধ লড়নে কে লিয়ে তৈয়ার করনা আজকে সহী, প্রাসঙ্গিক ঔর সার্থক নাটক ঐতিহাসিক উত্তরদায়িত্ব হ্যয়। হমারা আজকে রঙ্গমঞ্চ অপনী ইস মহত্বপূর্ণ ভূমিকা ঔর বুনিয়াদী জিম্মেদারী সে কতরাকর আগে নহী নিকল সকতা।[২০]

জ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রী (১৯৩৫) নাট্যকার অভিনেতা নির্দেশক ও পরিচালক রূপে স্মরণীয়। সামাজিক রাজনৈতিক বক্তব্যের তীব্রতা তাঁর মধ্যে আছে এবং আঙ্গিকের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ তাঁর নাটক দেখা যায়। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল - নেফা কী এক শাম, মাটী জাগী রে, বতন কী আবরু, ইতবার জিন্দাবাদ (একাংক সংকলন), চিরাগ জ্বল উঠা (ঐতিহাসিক নাটক), শুতুরমুর্গ, অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

জ্ঞানদেবের প্রথম নাটক 'নেফা কী এক শাম' চীন আক্রমণের পটভূমিকায় লেখা — নেফার এক গ্রামের মানুষরা কীভাবে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তার ছবি আঁকা হয়েছে। এই নাটকের অনেক অভিনয় হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পুরস্কার পেয়েছে।

'শুতুরমুর্গ' (১৯৬৮) এক প্রয়োগবাদী নাটক — আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর তীব্র ব্যঙ্গ। বড় বড় নির্মাণ যোজনা, বিভিন্ন সমস্যা এড়িয়ে কমিটি গঠন, দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার প্রভৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। রাজা এভাবেই শাসন করে যার রাজচিহ্ন হল শুতুরমুর্গ বা উটপাখী যে তার মুখ বালিতে গুঁজে রেখে ভাবে যে পেছনের ছুটে আসা শত্রু তাকে দেখতে পাচ্ছে না। অথবা এটাও তার কৌশল। ক্রুর ধূর্ত হীন রাজা ক্ষমতা বজায় রাখতে বিরোধীদের মন্ত্রী সভায় ঢোকায়, বিরোধীলাল হয় সুরোধীলাল। কিন্তু প্রজাদের বিক্ষোভ চূড়ান্ত হলে মামুলীরামের মত লোকও সচেতন হয়। পরিস্থিতি সামলাতে রাজা যুদ্ধের কথা বলে যার মোকাবিলা করতে হবে, প্রজাদের অপেক্ষা করতে হবে। স্বর্ণছত্রের নীচে সে সোনার 'শুতুরপ্রতিমা' স্থাপন করতে চায় যা সব সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজার সব অন্যায় চাতুরী ধরা পড়ে। নাটকের নামকরণ প্রতীকী, চরিত্রায়ণও তাই। নাটকে ব্রেখটীয় রীতিরও প্রয়োগ আছে।

'অনুষ্ঠান' নাটকে আধুনিক সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে দুর্নীতি অরাজকতার বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপ রাখা হযেছে, যদিও পরিণতিতে হিংসা রক্তপাতের ব্যর্থতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। প্রেমিক স্বামী পুত্র ও ভাই হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী ও তদনুযায়ী কাজ করে। তাদের প্রেমিকা স্ত্রী মা ও বোন (একই অভিনেত্রী) বাধা দেয়, বোঝায়। তারা কিন্তু নিজেদের মতে স্থির থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশ ও ধ্বংসের দ্বারা তাদের আদর্শের ব্যর্থতা বোঝে। নাট্যকার নরনারী তথা আধুনিক মানুষের সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান ফারাকের কথাও বলেছেন। তাঁর 'দঙ্গা' সাম্প্রদায়িক সঙ্কট ও মিলনের নাটক।

ডঃ শংকর শেষ (১৯৩৩-১৯৮১) অকালপ্রয়াত না হলে হিন্দী নাটককে আরো সমৃদ্ধ করতে পারতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী মানবিক। সমাজ জীবনের জটিল নির্মম আবর্তে নিষ্পেষিত মানুষের হৃদয়বেদনা জ্বালাযন্ত্রণা তিনি ব্যক্ত করেছেন। সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা সংকট তিনি তুলে ধরেছেন এবং তার মুখোমুখী দাঁড়ানো মানুষ বারংবার তাঁর নাটকে এসেছে। আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি করেছেন। চলচ্চিত্রের কাহিনী রচয়িতা হিসাবেও তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য — বিন বাতি কে দীপ, বন্ধন অপনে অপনে, এক আউর দ্রোণাচার্য, ফন্দী, রক্তবীজ, অক্টোপাস প্রভৃতি।

সহজ সাধারণ নাটক 'বিন বাতী কে দীপ' (১৯৭১) যাতে এক আর্দশ স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে যে নিজের লেখা স্বামীর নামে প্রকাশ করে। 'এক আউর দ্রোণাচার্য' (১৯৭৮) নিষ্ঠুর দুর্নীতিপরায়ণ সমাজে এক শিক্ষাবিদের নিষ্ফল প্রতিরোধের কথা। অধ্যাপক অরবিন্দ এ যুগের দ্রোণাচার্য — মনে সততা নিষ্ঠা থাকলেও পরিবেশের চাপে ও লোভে বিভ্রান্ত হয়। কলেজ প্রেসিডেন্টের ছেলে রাজকুমার পরীক্ষায় টুকলেও অরবিন্দ কিছু বলে না কারণ তাকে প্রিন্সিপ্যালের পদ দেওয়া হয়, কিন্তু একই অপরাধে অভিযুক্ত চাঁদুকে কলেজ থেকে তাড়ায় যদিও সে নিরপরাধ। রাজকুমার অনুরাধা নামে কলেজছাত্রীকে (যে চাঁদুর প্রেমিকা) ধর্ষণ করতে যায়। অনুরাধা তার বিচার প্রত্যাশী। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাকে একদিকে লোভ দেখায় অন্যদিকে কলেজের টাকা চুরির মামলায় ফাঁসাবার ভয় দেখায়। ফলে অরবিন্দ নীরব থাকে, অনুরাধা আত্মহত্যা করে। প্রেসিডেন্টকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে তাকে পাহাড় থেকে ফেলে হত্যার অভিযোগে অরবিন্দ অভিযুক্ত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট নিজেই ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেছে। সব ঘটনার সাক্ষী চাঁদু। সে কি অরবিন্দকে বাঁচাবে? আদালতে চাঁদু অরবিন্দর নপুংসক সত্তার পরিচয় দেয় এবং হত্যাপরাধ সম্বন্ধে দ্ব্যর্থক উত্তর দেয়। অরবিন্দ কী করবে? সে যে দ্রোণাচার্য। 'পরিস্থিতি

ও বিবেকের চাবুকের আঘাতে জর্জরিত। ইতিহাসের স্রোতে কাঠের মত ভেসে যাওয়া, বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত পচাগলা দ্রোণাচার্য। ব্যবস্থার লাইটহাউস থেকে নিশানা চাওয়া ভাঙ্গা জাহাজের মত দ্রোণাচার্য।'

ডঃ শেষের পরীক্ষামূলক নাটক 'ফন্দী' পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা নির্ণয়, অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষের দুঃখবেদনার চিত্র এবং সহৃদয় হত্যা' বা mercy killing প্রসঙ্গ। ট্রাক-ড্রাইভার ফন্দী তার অসুস্থ বাবাকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। সে আর পারে না। নিরুপায় হয়ে সে বাবাকে মেরে ফেলে কারণ সে আর বাবার কষ্ট সইতে পারে না। কিন্তু আইনের হাত এড়াতে পারে না। এক উকীল তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কিন্তু আইন কঠিন নির্মম। নাট্যকার শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান করেন নি, যদিও পাঠকচিত্তকে তা ব্যথিত করে গভীর ভাবে।

'রক্তবীজ' দুটি ঘটনার গ্রন্থন যার মূল বিষয় হল আত্মোন্নয়ন ও স্বার্থের জন্য মানুষের মানুষকে শোষণ। প্রথমটিতে স্বামী তার স্ত্রীকে বসের শয্যায় ঠেলে পাঠায় চাকরীর উন্নতির জন্য। দ্বিতীয়টিতে এক বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসক তার অধীনস্থ বিজ্ঞানীর মূল্যবান আবিষ্কারকে নিজের বলে চালায়। লোভের পরিণতি বোধ হয় সর্বদা সুখদায়ক হয় না, অনেক ক্ষেত্রেই আসে ট্র্যাজেডি।

'অক্টোপাস' নাটকে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শোষণ করা ও শোষিত হওয়ার ধারাবাহিক চিত্রটি নাট্যকার তুলে ধরেছেন। নাট্যকারের ভাষায় — অক্টোপাস নাটক কী রচনা মে মেরা মূল উদ্দেশ্য সমাজ মে ব্যাপ্ত ইস্তেমাল করনে ঔর ইস্তেমাল হোনে কি স্থিতি কো স্পষ্ট করনা থা। এক বড়া আদমী, এক ছোটা আদমী ঔর এক স্ত্রী কে দ্বারা মৈংনে অপনী উস অনুভূতি কো দো ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায়ো কে মাধ্যম মে অকটোপাস সে প্রস্তুত কিয়া হ্যয়।'

মনি মধুকর (১৯৪২) আধুনিক কালের এক অত্যন্ত বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ও নাট্যকার। তিনি নাটকে সমসাময়িক বিষয় উপস্থাপিত করেন এবং সামাজিক সমস্যা সমূহ সেখানে প্রাধান্য পায়। আঙ্গিকের বৈচিত্র্য তাঁর নাটকে আছে — সহজ আকর্ষণীয় সংলাপ, লোকরীতির ব্যবহার, ফ্যানটাসি বা অদ্ভুত রসের প্রয়োগ নাটককে অদ্ভুত ও চমৎকার করেছে।

মনি মধুকরের 'রসগন্ধর্ব' (১৯৭৫) আঙ্গিকের বিবিধ বৈচিত্র্য ও চাতুর্যে জীবন ও সমাজের বিভিন্ন প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করে। এটা আধুনিক রূপক, উদ্ভট আখ্যান, ডকুমেন্টারী, রাজনৈতিক ব্যঙ্গ সবই হতে পারে। নাটকে চারজন আজীবন বন্দীর বেদনা দুঃখ ও বহির্জগতের জন্য তাদের কামনা প্রকাশিত হয়। সহসা তারা যেন বদমায়েশ জেল ঘুঘুতে পরিণত হয়। হঠাৎ একদিন এক লোকের নির্দেশে তারা নাটক করতে শুরু করে, তারা চারজন হয় ছুতোর দরজি রাজমিস্ত্রি ও যাদুকর। তারা একটা পুতুল তৈরী করে যে নারী মূর্তিটি প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর তাদের পরিত্যাগ করে। এর পর এক অপ্সরা হঠাৎ বলে যে জেলের বন্দী ও প্রহরীরা সবাই অভিশপ্ত হয়ে এখানে আছে। এরা সবাই আকাশের দিকে ওড়ার চেষ্টা করছে এমন সময় পরিচালক এসে এদের থামায় ও নাটক শেষ হয়।

'বুলবুল সরায়' (১৯৭৬) তে সর্বনাশের বা ভয়ংকর জরুরী পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়ানো কয়েক জন মানুষের মানসিক অনুভূতিকে বিচার করেছেন। এতেও লোক কাহিনী ও কল্পকথা আছে। 'দুলারীবাই' (১৯৭৮) মূলতঃ সঙ্গীত বহুল এক লোক কথার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে। দুলারীবাই এক বিচিত্র নারী, সে অন্বেষণ করছে জীবনের সুখ

সমৃদ্ধি। সে অত্যন্ত কৃপণ ও যেন তেন প্রকারেন অর্থলাভ করতে চায়। তার একজোড়া পুরোনো জুতো আছে যা তার সম্পদ। এর বিনিময়ে সে অনেক কিছু পেতে চায় কিন্তু পায় না। সে তার স্বপ্নের নায়ককে লাভ করে কিন্তু বিয়ের পর জানতে পারে সে কাল্লু ভাঁড় ছাড়া আর কেউ নয়।

'ইকতারে কী আঁখ (১৯৮০) কবীরের মহৎ জীবন নিয়ে লেখা, তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র যুগ ও সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মনীতির উপস্থাপনা নাটকে আছে। লেখকের কৌতুক ব্যঙ্গ-পরায়ণতাও নাটকে আছে। মনি মধুকরের শেষ দিকের নাটক 'খেলা পোলমপুর' (১৯৭৯) তার অন্যান্য নাটকের মতই লোককথা সঙ্গীত রঙ্গব্যঙ্গ ও কিছুটা উদ্ভটত্বের সমন্বয়ে গঠিত। প্রবল অত্যাচারী শাসক (লক্ষী শাহ), নিষ্ক্রিয় নির্বোধ সমর্থক (জালিম), অত্যাচারিত শোষিত মানুষ (সমরু) — মূলত এদের নিয়ে নাটক যাতে অত্যাচার দুঃখ বেদনা, প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা। বিশিষ্ট নাট্যকার **মুদ্রারাক্ষস** (১৯৩১) নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করে চলেছেন। বক্তব্য উপস্থাপনে তিনি দুঃসাহসিক। আধুনিক সময়ের সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা, নরনারীর মধ্যকার জটিল সম্পর্ক প্রভৃতি তার নাটকে পাই। 'মরজীবা' (জীবন্ত মৃত ১৯৬২) এক বেকার ব্যর্থ যুবকের কথা যে হতাশার চূড়ান্ত প্রান্তে গিয়ে সপরিবারে আত্মহত্যা করতে গেলে তার স্ত্রী পুত্র মারা যায় কিন্তু সে বেঁচে ওঠে। এবং শেষ পর্যন্ত এক রাজনৈতিক নেতার স্বার্থের প্রয়োজনে তাকে মরবার কথা বললে সে ক্রোধে ঘৃণায় জর্জরিত হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতির ওপর তীব্র ব্যঙ্গ এটা।

মুদ্রারাক্ষসের অপর নাটক 'ইয়োর্স ফেথফুলি' তে (১৯৭২) আধুনিক যান্ত্রিক নিয়ম - নিগড় বদ্ধ জীবনের নিষ্প্রাণতা ও লক্ষ্যহীনতার প্রকাশ আছে। আধুনিক শাসন-ব্যর্থতার পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়। গঠনরীতিতে অ্যাবসার্ডিটি ও এক্সপ্রেসানিস্টিক রীতির কিছু প্রকাশ আছে। 'তিলচটটা' (১৯৭৩ আরশোলা) নাটক স্ত্রী পুরুষের কাম সম্বন্ধ বা যৌন সম্বন্ধের মনোবিজ্ঞানসম্মত ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। যদিও এখানে প্রতীকের ব্যবহার দুরূহ ও জটিল হয়ে উঠেছে। গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হয়েছে — 'তিলচটটা বহুচর্চিত ও বহুপ্রশংসিত নাটক হ্যয় জিসমে স্ত্রী পুরুষ কে সম্বন্ধো কী নির্মম চীড়ফাড় কে সাথ সাথ আজ কে মৌজুদা সামাজিক, আর্থিক ও রাজনীতির ক্রুর দবাবো কে নীচে পিসতে ঔর করাহতে হুয়ে মানব কী চীখ কো ভী পকড়নে কা প্রয়াস কিয়া গয়া হ্যয়।' নাটকে এক আহত বিপ্লবী (দেব) স্ত্রীর (কেশী) সঙ্গেই আছে যদি স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষদের সম্পর্কও আছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ক্লান্তি নিঃসঙ্গতা বিরক্তি বিদ্বেষ প্রবল হয়ে ওঠে, তবে স্বামীই বোধহয় বেশী অসহায়। এক আরশোলা (যা প্রতীকী) তাকে তাড়া করে। নাটকে স্বপ্ন দৃশ্য আছে। দেব স্বপ্ন দেখে বনেতে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে ও তাকে হত্যা করছে। কেশীও স্বপ্ন দেখে যেন সে ইতর প্রাণীর জন্ম দিয়েছে। নাটকের শেষে স্বামী অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খায়। 'তেন্দুয়া' নাটক-ও অনেকটা এই ভাবের।

'আলা অফসর' গোগোলের 'গভর্মেন্ট ইনসপেকটর' নাটকের ওপর ভিত্তি করে লেখা নতুন ধরনের নাটক। এতে নৌটংকী শৈলীর সার্থক প্রয়োগ আছে। কাহিনী পরিচিত হলেও আঙ্গিকনৈপুণ্যে রচনা চমৎকারিত্বে কৌতুক উজ্জ্বল ভাবনায় ও চরিত্রচিত্রনে 'আলা অফসর' বিশেষ স্মরণীয়।

সর্বেশ্বরদয়াল সক্সেনা (১৯২৭-১৯৮৩) গল্প কবিতা লিখেছেন, সাংবাদিক রূপেও বিশিষ্ট। তবে নাটকেই বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন। 'বকরী' (১৯৭৪) নাটক অসহায় দরিদ্র

. ৢয়েব এক্সপ্লয়টেশন এবং আপন আপন লোভ ও স্বার্থের জন্য প্রতাবকদেব প্রয়াস ও .হ পুরুষদেব (গান্ধীজী) নামে সেই কদর্যতাকে আবো বাড়িয়ে তোলাব দ্বাবা প্রকৃতপক্ষে ভাবতবর্ষেব জনগনেব এক অসহায় করুণ চিত্র প্রকাশিত। এক গ্রাম্য স্ত্রীলোকেব ছাগলকে ,রি করে প্রতাবকবা দেবতা রূপে স্থাপন করে লোকদেব প্রতাবণা করে। পুলিশ তাদেব সহায়। এব সঙ্গে যুক্ত হয় বাজনীতি। সব মিলে শোষণ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সচেতন ,শক্তিব দ্বাবা সাধাবণ মানুষেব সমবেত চেষ্টায এই অন্যায়কাবী ও শোষণকাবীবা পরাজিত হয।

'অব গবীবী হটাও' নাটকে ও সামাজিক ও বাজনৈতিক ভাবনা তীব্র হয়েছে। গবীবী হটানোব নামে যখন সাধাবণ মানুষেব ওপব প্রবল অত্যাচাব হয নাবীব ওপব লাঞ্ছনা হ, তখন ঘটে প্রতিবাদ প্রতিবোধ। সমবেত মানুষেব ঐক্যবদ্ধ ও সশস্ত্র লড়াইয়েব দ্বাবাই এই অত্যাচাবেব অবসান ঘটবে। লোক নাট্যিকেব প্রয়োগ নাটকে আছে প্রকৃতপক্ষে লোকবীতিব নাচ গানেব প্রয়োগ নাটককে আবো আবেদন শীল করেছে।

বৃজমোহন শাহ সম্প্রতিকালেব এক বিশিষ্ট নাট্যকাব ও পবিচালক রূপে সম্মানিত। '.ত স্বার্থেব জন্য সমাজেব সর্বস্তবেব মানুষেব লোভলালসা নীচতা, বদ্ধিজীবীদেব স্বরূপ এবং বিশ্ববিদ্যালয শিক্ষা ও বেকাবত্বেব মধ্যে ত্রিশঙ্কুব মত অসহায দোদুল্যমান যুব সম্প্রদাযেব চিত্র এঁকেছেন ত্রিশঙ্কু' (১৯৭৩) নাটকে। ধ্রুপদী নাট্যশৈলী, লোক নাটক, এ্যাবসার্ড বীতি ও ব্রেখটীয পদ্ধতিব প্রয়োগে ত্রিশঙ্কু' অভিনব শিল্পময হয়েছে। বৃজমোহনেব 'যুদ্ধমন যুদ্ধেব ভযাবহ ও অমানবিক পবিণাম ব্যক্ত করে। 'শহ যে মাত' জীবনেব নিঃসঙ্গতা নির্জনতা ব্যর্থতাকে তুলে ধবা হয়েছে এক অবসব প্রাপ্ত বৃদ্ধ সার্মবিক অফিসাবেব মধ্য দিয়ে।

বমেশ বকসী (১৯৩৬) কথা শিল্পী রূপে খ্যাত, বেডিও নাটকও লিখেছেন অনেক। তাব প্রথম মঞ্চ নাটক 'দেবযানী কা কহনা হ্যয' দুঃসাহসিক বক্তব্যে প্রবল আলোড়ন ''ছে। নবনাবীব পাবস্পবিক সম্পর্ক বিশেষত যৌন সম্পর্কেব মাত্রা ও পবিণাম তিনি বর্ণনা করেছেন সাহসিকতায। তীব্র আবেগময সংবেদনশীল মানসিক অনুভূতি সম্পন্ন দেবযানী গুপ্ত বাবা মাব নিষেধ অমান্য করে চলে যায সাধন ব্যানার্জীব ফ্ল্যাটে যেখানে বিয়ে না করেও তাবা স্বামী-স্ত্রীব মত থাকবে তিন দিন। দেবযানী নিজেদেব নিয়ে পবীক্ষা কবতে চায, কিংবা বলা ভাল নিজেকে নিয়ে। তাদেব নৈকট্যেব সর্ম্পক, যৌন বিষয়েব খোলাখুলি আলোচনা ও বিচাব পাঠক দর্শককে ক্ষণে ক্ষণে চমকে দেয। কিন্তু পবিণাম হয শূন্যতা — দেবযানীব বেদনা ক্রোধ বিক্ততায আছড়ে পড়ে।

বমেশ বকসীব পবেব নাটক তীসবা হাথী' (১৯৭৫) দেখিয়েছে কিভাবে প্রথা ও প্রাচীন মূল্যবোধেব চাপে বর্তমান প্রজন্ম বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাঁব 'বামাচাব' নাটকও জীবন সমাজ চিন্তায তীব্র প্রচন্ড।

দযাপ্রকাশ সিনহা (১৯৩৫) তাব নাটকে আধুনিক সমাজেব সমস্যা সংকটেব ছবি এঁকেছেন, জীবনকে সত্যকে তুলে ধবতে চেয়েছেন। সমাজ ও জীবনেব অনৈক্য অসংগতিকে তিনি তীব্র আঘাত করেছেন এবং তাঁব ব্যঙ্গ হয়েছে তিক্ত নির্মম। 'ইতিহাস চক্র' (১৯৭২) অনেকটাই সামাজিক বাজনৈতিক প্রতীকাত্মক ব্যঙ্গ নাটক। এতে সমকালীন ভাবতবর্ষেব শাসন ব্যবস্থাব রূপই ফোটেনি, যেন বিশ্বপবিস্থিতি ধবা পড়েছে, এবং উভয ক্ষেত্রেই বাজশক্তি ও ধনশক্তিব শাসন শোষনে অসহায সাধাবণ মানুষেব অসহ্য বেদনা-যন্ত্রণা তুলে ধবা হয়েছে। 'ওহ আমেবিকা'য (১৯৭২) কালানুক্রমে বিদেশী ও পাশ্চাত্য

কুশিক্ষার বিষময় ফল দেখানো হয়েছে। নাটকের শেষাংশে দেখানো হয়েছে তথাকথিত মার্কিনী শিল্পসভ্যতা তার গাঁজাচরস এলএসডি মারজুয়ানা অবাধ যৌনতা বা সেক্স রেভলিউশন নিয়ে কীভাবে ভারতীয় মানুষকে কদর্যভাবে প্রভাবিত করেছে।

'সাদর আপকা' আধুনিক এক পরিবারের চিত্র যেখানে পরিবারে সকলেই কেমন পথভ্রষ্ট। সকলেই অস্থির, দ্বিধাগ্রস্ত, সুস্থ জীবন থেকে অনেক দূরে। এমন কি মা পর্যন্ত মেয়ের প্রেমিক কিংবা বন্ধুপত্রের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। আধুনিক সভ্য জীবনের এক নির্মম চিত্র নাটকে ফুটেছে।

সুশীল কুমার সিংহ হিন্দী নাট্যক্ষেত্রে এসেছেন রাজনৈতিক স্যাটায়ার 'সিংহাসন খালী হ্যয়' (১৯৭৪) নিয়ে। এই নাটকে মানব সভ্যতার ক্রমিক বিন্যাসের মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাঙাগড়া, ক্ষমতার লড়াই, মিথ্যা প্রতারণা, অন্যায় অবিচার, ভোট, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও সাম্রাজ্যলিপ্সার কলুষিত ইতিহাসের ছবি দেখিয়েছেন। খালি সিংহাসনের জন্য যোগ্য মানুষের সন্ধান থেকে সুরু করে ক্ষমতালোলুপ মানুষের নীচতার প্রকাশ এখানো আছে।

'চার ইয়ারোঁ কি য়ার' সামাজিক নাটক যাতে অন্যদের সাহায্যে নারীদের পতিহত্যার বিষয়টি সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। এই সব 'পতিঘাতিনী ভয়ংকর নারী'দের মন কেউ বিচার করে না ও তাদের জীবনের ট্র্যাজেডিও কারুর চোখে পড়ে না। প্রাণোচ্ছল তরুণী বিন্দিয়া অনেক স্বপ্ন দেখলেও বিয়ে হয় বয়স্ক স্কুল-শিক্ষক সীতারামের সঙ্গে যে পুরুষত্বহীনও। সীতারামের বন্ধু জীবন বিন্দিয়ার কাছে আসে, সঙ্গে তিন বন্ধুও থাকে। সীতারাম সব জানতে পারে। পরিণামে বিন্দিয়া তাকে হত্যা করে অন্যদের সঙ্গে যৌনমিলনের জন্য নয়, ঘৃণায় ও বিদ্বেষে। যুক্তিতর্ক দিয়ে এই সমস্যা বিচার করতে চেয়েছেন নাট্যকার। সুশীল কুমারের পরের নাটক 'নাগপাশ' সমসাময়িক সমাজনীতির রাজনীতির সুন্দর প্রতিচ্ছবি।

গিরিরাজ কিশোর (১৯৩৭) পারিবারিক সামাজিক দুধরনের নাটক লেখায় দক্ষ। 'নরমেধ' (১৯৭১) এক অবহেলিতা বিবাহিতা নারীর মনোবেদনার চিত্র। স্ত্রী তারা আপন স্বামীর উপেক্ষা অবহেলায় পুরোনো প্রেমিকের কথা ভাবে। স্বামী ইন্দ্র সে কথা বুঝতে পেরে স্ত্রীর কাছে আসতে চায় কিন্তু আর তা হয় না। তারার ছেলে যে মেয়েকে বিয়ে করতে চায় সে তার প্রেমিকেরই সন্তান। তারা তা চায় না কারণ এতে তার লজ্জাই প্রকাশ পাবে। 'প্রজা কী রহনে দো' নাটকে মহাভারতের যুদ্ধর ভয়াবহতা থেকে আধুনিক রাজনীতির কদর্যতা ও যুদ্ধনীতির অমানবিকতার কথা বলেছেন। 'বাদশাহ্ গুলাম বেগম' নাটকে ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রব্যাপী সমস্যা সংকট ও কৌতুককর দিককে অনেকটা অ্যাবসার্ড ঢঙে তুলে ধরেছেন।

কাশীনাথ সিং গল্পের সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। নাটকীয় আবেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টিতে তিনি দক্ষ। 'ঘোয়াস' (১৯৮২) সীমান্ত অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে লেখা যারা সন্দেহ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে বাস করে, তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শত্রুকে খোঁজে। যার উপস্থিতি সর্বদা বোঝা যায় কিন্তু যাকে কখনো ধরা যায় না। 'আপনা মোর্চা' (১৯৭২) ছাত্র আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে লেখা — ছাত্রদের ক্রোধ উন্মাদনা ধ্বংস প্রবণতাকে বিচার করতে চেয়েছেন এবং দেশনেতাদের প্রকৃত রূপও তুলে ধরতে চেয়েছেন।

বলরাজ পণ্ডিত is trying to make a theatrical language of gestures and the spoken word [২১] এবং বক্তব্যের ক্ষেত্রেও তিনি সমাজ সচেতন। তার বক্তব্য প্রথম রূপ পায় 'পাঁচবা সওয়ার' নাটকে। 'লোগ উদাসী' অর্থভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় দরিদ্র মানুষদের কথা যাদের সত্তা, স্বপ্নকামনা মূল্যহীন হয়ে পড়ে কারণ অর্থই একমাত্র নিয়ামক

শক্তি। একটি মেয়ে একজনকে ভালবাসলেও বিয়ে করতে বাধ্য হয় এক স্থূল কুদর্শন ধনবান ব্যক্তিকে যে দরিদ্রদের ওপর শোষণ চালায় ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। 'জনানে দাঁত কা হসপাতাল' নাটকে অনেকটা লঘু ঢঙে সমাজ বিষয়ের ছবি ... ভারতীয় জীবন ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন বড় লোকদের কথা বলা হয়েছে।

রামকথার আধুনিক ব্যাখ্যা কথাশিল্পী **নরেন্দ্র কোহলীর** 'শম্বুক কী হত্যা' যাতে সমকালীন জীবন এবং সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ব্যাপ্ত অনিয়ম, লালফিতাশাহী, ভ্রষ্টাচার ও বিসংগতির কথা বলেছেন।

শরদ যোশীর 'অন্ধো কা হাথী' সমকালীন ভারতবর্ষের ভ্রষ্ট রাজনীতি ও নিষ্প্রাণ প্রশাসনের উদ্ঘাটন। পাঁচ অন্ধর অসম্পূর্ণ হাতী দেখার মত আধুনিক নেতারা দেশের প্রবল সমস্যাকে উপলব্ধি না করে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সম্পূর্ণ সত্য তাদের কাছে ধরা পড়ে না। এরা সূত্রধারকে হত্যা করে কারণ সে বারবার প্রশ্ন করে সত্য জানতে চায়। কিন্তু সে বেঁচে ওঠে সব সময় কারণ যুগে যুগে তাকে প্রশ্ন করতে হয়, জানতে হয়, জানতে হয় অনেক কিছু।

এক থা গাধা ওর্ফ অলাদাদ খাঁ' নাটকে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ তীব্র হয়ে উঠেছে। অলাদাদের মৃত্যু হওয়ায় নবাব তার শবদেহ বহন করতে চায় যাতে তার মহত্ত্ব বাড়বে। জনগণও এখবরে বিস্মিত। কিন্তু সঠিক খবর আসে অলাদাদ আসলে গাধা। নবাব তো আর গাধাকে বইতে পারে না। নবাবের মর্যাদা রক্ষার জন্য এক কর্তব্য পরায়ণ নিরপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

রমেশ উপাধ্যায়-এর 'পেপার ওয়েট' নাটকের চরিত্রগুলো আমাদের পরিচিত — দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ, মানবতাবোধহীন বড় ব্যবসায়ী, ঠুঁটো শাসক ও আইন শৃঙ্খলার শোষক, চরিত্রহীন অফিস বস এবং মহিলাকর্মী যারা বেঁচে থাকতে বাধ্য হয় ওপরওলার বর্বরতা মেনে নিতে। নাটকের বিভিন্ন উপাখ্যানকে বেঁধেছে একটা ঘটনা নায়িকার ভাই একটা পেপারওয়েট চুরি করেছে যা দিয়ে সে তার বোনের বসের মাথা ফাটাবে। নাটকের চরিত্র সজীব, সংলাপ জীবন্ত, ঘটনা স্বাভাবিক।

হমীদুল্লা (১৯৩৮) বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য রচনায় পারদর্শী, অভিনয়ও করেছেন। তার 'উলঝী আকৃতিয়াঁ' তিন ব্যঙ্গ নাটকের সংকলন — সময় সন্দর্ভ, এক ঔর যুদ্ধ ও উলঝী আকৃতিয়াঁ। নাটক তিনটিতে দেখানো হয়েছে — বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে আমরা কীভাবে আমাদের অস্তিত্বকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমাদের আর্থিক রাজনীতিক সংস্থাসমূহের প্রকৃত রূপ কী, আর আমরা সবাই যেন দাবাখেলার গুটির মত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অপরের হাতে যন্ত্রের মত হয়ে গেছি।

'খ্যাল ভরমালী' রাজস্থানের বিশিষ্ট নাট্যরীতি খেয়াল-এর জয়পুরী শৈলীতে রচিত প্রয়োগধর্মী নাটক। সামন্তযুগে রাজস্থানে নারীদের ওপর যে অত্যাচার চলত তার ছবি আঁকা হয়েছে এবং সেই পটভূমিতে সাম্প্রতিক নারীদের স্বাতন্ত্র্যের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থপরিচয়ে লেখা হয়েছে — 'খ্যাল ভরমালী' কী কথা রাজস্থান মে সামন্তী কাল সে নারী কে শোষণ, উসকে অর্ন্তমন কী বেদনা ঔর বর্গ সংঘর্ষ কা এক জীবন্ত দস্তাবেজ জিসকে আইনে মে আজকে চর্চিত বিষয় নারী স্বাতন্ত্র কো ভী দেখা জা সকতা হ্যয়।

মহিলা নাট্যকাররা দীর্ঘদিন ধরে নাটক লিখে হিন্দী নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছেন। কমলাদেবী সাহিত্যরত্ন (সমাজ কো বদলো), বিদ্যাবতী মালবিকা (অর্চনা), বিমলা রেণা (আহেঁ ঔর মুস্কান), শান্তা কুমারী জৈন (দুসরা কিনারা), রজনী পাণিকর (ভূমিজা), সোমা বীরা (সাথী হাথ বঢ়ানা) প্রমুখ নাট্যকাররা বিশেষ শ্রদ্ধেয়।

মৃদলা গর্গ (১৯৩৮) বিশিষ্ট মহিলা গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর 'এক ঔর আজনবী' (১৯৭৮) নাটকটির বক্তব্য ও প্রকাশ ভঙ্গী বিতর্ক তুলেছে বহুল পরিমানে। এক সংবেদনশীল বুদ্ধিমতী নারীর বেঁচে থাকার যন্ত্রণা এতে রূপায়িত যে একদিকে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের বাসনা অন্যদিকে সামাজিক নীতিনিয়ম ও বিধিনিষেধের বেড়ি এই দুয়ের মধ্যে ক্লিষ্ট হচ্ছে। নারী স্বাধীনতার সপক্ষে লেখনী ধারণ করেছেন লেখিকা। শনি পদলোভী উপরওয়ালার তোষণকারী জগমোহনকে বিয়ে করে যখন ইন্দর শাহ্ আমেরিকায় যায় তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখে গিয়ে। শনির দাম্পত্য জীবন কাটছে। কিন্তু ইন্দর আবার ফিরে আসে জগমোহনের ওপরওয়ালা হয়ে। আনন্দিত শনি ইন্দরকে আহ্বান করে ঘরে, তাকে আহার আপ্যায়ণে তৃপ্ত করে। জগমোহন ট্রেন ধরতে যায়, শয্যার আহ্বান জেগে থাকে কিন্তু আর শনি সে পর্যন্ত যাবে না। চলে যায় ইন্দর। শনি ফেরে আপন চেতনায়। এই নাটকের অনেক সফল প্রযোজনা হয়েছে, উল্লেখ্য কাজ করেছেন বলরাজ পণ্ডিত কীর্তি জৈন প্রমুখ।

মৃদুলা গর্গ-এর 'তুম লোট আও' (১৯৮৩) এক মধ্যবিত্ত ভারতীয়র উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোভ লালসা পাশ্চাত্য জীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণকে নাটকায়িত করে যার সঙ্গে আছে দেশীয় বোধ ও ভাবনার সঙ্গে সংঘর্ষ। এটা চলচ্চিত্রেরও রূপ পাচ্ছে।

মন্নু ভাণ্ডারী (১৯৩১) সাম্প্রতিক কালের এক বিশিষ্ট লেখিকা। তিনি প্রবল মাত্রায় সমাজ সচেতন এবং পারিবারিক জীবন ভাবনা থেকে অগ্নিগর্ভযুগ ও কালচেতনায় তার উদবর্তন ঘটেছে। মন্নু ভাণ্ডারী 'বিনা দীবারো কে ঘর' (১৯৬৫) নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনে স্ত্রী পুরুষের ভঙ্গুর সম্বন্ধকে এঁকেছেন। শোভা তার এক মিত্র জয়ন্তর সাহায্যে কলেজ প্রিন্সিপ্যালের কাজ পায়, তাতে স্বামী ঈর্য্যান্বিত ক্রুদ্ধ। সে শোভাকে নানাভাবে আঘাত দেয় অপমান করে। অন্য চাকরীর আশায় চাকরী ছেড়ে কিছু না পেলে জয়ন্তর গোপন চেষ্টায় তার চাকরী হয়। বন্ধুরা অজিতকে ব্যঙ্গ করে, অজিত-শোভা সম্পর্ক জটিল হয়। অজিত শোভাকে তীব্র অপমান করলে শোভা তার সন্তানকে নিয়ে চলে যেতে চায়, কিন্তু অজিতের কথায় সে একাই যাবে এদের ছেড়ে। সে বলে — 'তো ম্যয় অকেলী হী চলী জাউঙ্গী, জহাঁ মায়নে আপনে ভীতর কী পত্নী কো মারা হ্যয়, ওহী অপনে ভীতর মা কী ভী মার দুংগী।'

মন্নু ভাণ্ডারীর স্বরচিত উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে লেখা নাটক 'মহাভোজ' বর্তমান সময়ের এক অগ্নিময় দলিল। বেলচীর ট্র্যাজিক ঘটনার ওপরই এটা লেখা। জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, রাজনৈতিক কদর্যতা, নিরবচ্ছিন্ন শোষণ কিভাবে গ্রাম ভারতকে শোচনীয় পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, দারিদ্র অনাহার মৃত্যুর ভয়াবহতায় নিঃশেষিত হচ্ছে অসহায় অনুন্নত মানুষ নাটকে সেই সব ছবি আঁকা হয়েছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে মহেশ এসেছে Caste and Class Conflict in Rural India বিষয় নিয়ে গবেষণার কাজে। সে শোষণের পীড়নের ভয়াবহ রূপ দেখে, দেখে কুৎসিত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রথা, দেখে রাজনীতির কুটিল আবর্ত যাতে সমাজ ন্যায়নীতি মানবতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এর পরিণামে নিহত হয় রাজনৈতিক দাবার বড়ে বিশু, তার বাবার বেদনা তীব্র হয়। গ্রামবাসীরা ক্ষোভে যন্ত্রণায় অস্থির হয়, আগুনের মত জ্বলে ওঠে বিন্দা, পরিবেশ পরিস্থিতিতে পুলিশ অফিসার সাকসেনাও যেন পালটে যেতে থাকে। অত্যাচার পীড়নের রূপ দেখে ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা উপলব্ধি করে মহেশ শোষিত নিপীড়িত মানুষগুলোর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয়। শেষাংশে প্রধান ব্যক্তিরা পান

ভ জনের মহাভোজে মত হয়, এবং মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর কণ্ঠে অচেতন অননুকরণীয় ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে — যাই হোক শেষ পর্যন্ত বিপদ এড়ানো গেছে।

ডঃ কুসুম কুমার (১৯৩৯) সমকালীন অস্থির বেদনার্মথিত মধ্যবিত্ত জীবন, বিকৃত ব্যভিচারগ্রস্ত সমাজ, নিষ্ঠুর নিষ্প্রাণ শাসন যন্ত্রের রূপায়ণে আধুনিক ধনতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রেরই একটা চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। তার 'সুনো শেফালী' 'রাবণ লীলা' 'দিল্লী উঁচা সুনতী হ্যয়' প্রভৃতি নাটক যুগসত্যেরই প্রতিভাস হয়ে উঠেছে। 'সুনো শেফালী'র (১৯৭৯) নায়িকা শেফালী লেখাপড়া জানা সংবেদনশীল তরুণ হরিজন মেয়ে। সত্যমের দাক্ষিণ্যের ছেলে বকুলের প্রতি সে অনুরক্ত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বকুলের সঙ্গে দীনহীনা শেফালীর বিয়ে দিয়ে সত্যমের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করতে চায় যাতে বকুলের আপত্তি ও এরূপ বিয়ের সে প্রতিবাদ করে। পরন্তু বকুল তার ছোট বোন করুণাকে বিবাহ করে শেফালীর প্রতিবাদকে নিষ্ফল করে দেয়। এই সামাজিক ব্যবস্থা ও শাসন থেকে মুক্তি চেয়েছিল বলেই শেফালীকে পরাজয় বরণ করতে হল। নাটকে এক বিষণ্ণ অন্ধকারময় পরিবেশে পর্দা নামে — শেফালী কী আখ বন্দ হ্যয়। গলে মে কুছ সকর বহ জানে কী পীড়া মহসুস করতী হুই খড়ী হ্যয়'। ও নেপথ্য থেকে আওয়াজ আসে — কাযরো কে মরণ অধ্যায় ইসী তরহ হর রোজ খুলতে হর রোজ বন্দ হোতে হ্যয়।

রাবণ লীলায় যেন ঐতিহ্য ও নীতিকে ভাঙতে চেয়েছেন নাট্যকার। তাই নাটক রামলীলা না হয়ে হয় রাবণ লীলা পঞ্চবটী বনে রাবণ এলে সীতা স্বেচ্ছায় ধরা দেয় ও গলে হিন্দী সিনেমার গান গাইতে শুরু করে রাবণের কাছে ভীরু রামকে পরাজয় স্বীকার করতে হয় এবং বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনে মহাঐশ্বর্যশালী রাবণ (তথা রাবণ চরিত্রের রূপদানকারী অভিনেতা) কটা টাকার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। মহান ঐতিহ্যের পটভূমিকায় নাট্যকার আধুনিক জীবনের শূন্যতা নীতিহীনতাকে তুলে ধরেছেন।

লালফিতার ফাঁস ও আমলাতান্ত্রিকতার নাগপাশ সাধারণ মানুষের জীবনে কী করুণ অসহায়তার সৃষ্টি করে লেখিকা দেখিয়েছেন 'দিল্লী উঁচা সুনতী হ্যয়' (দিল্লী কানে শুনতে পায় না) নাটকে। এক বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার শেষ জীবনটা কাটাবে তার স্বপ্নের শৈশবের গাঁয়ে অখণ্ড শান্তিতে স্ত্রী ও স্বামী পরিত্যক্ত অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে। একমাত্র ভরসা তার সারা জীবনের পেনশন। হঠাৎ মাধো সিংহের পেনশন বন্ধ হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে জানা যায় সরকারী খাতায় সে মৃত বলে ঘোষিত। পেনশান বিভাগ থেকে বলা হয় যে সে যে জীবিত সেই প্রমাণপত্র দাখিল করতে। তারপর শুরু হল এক ভয়ংকর দুঃখের অধ্যায়। ডাক্তার সম্ভবত ভয়ে তাকে সার্টিফিকেটই দিল না। হাসপাতাল থেকে তার বেঁচে থাকার সার্টিফিকেটই পাওয়া গেল, কিন্তু আর এক ঝামেলা। সরকারী খাতায় ওর নাম মাধো সিং-এর বদলে মাধব সিং লেখা হয়ে গেছে। আবার পেনশন আটকালো। দিল্লীতে সে ছোটাছুটি করল। এক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করল কিন্তু অসার উপদেশ ছাড়া আর কিছু পেল না। বাড়িতে রান্না খাওয়া বন্ধ। তার হতভাগিনী মেয়ে নিজেকে বোঝা ভেবে আত্মহত্যা করে। মাধো সিংহ একদম ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পেনশনের ড্রাফট আসে কিন্তু তখন মাধো সিংহ মারা গেছে। রেজিস্ট্রি ফিরে যায়। বর্তমান প্রশাসন এত নিষ্ঠুর অন্ধ যে তারা ফেব্রুয়ারিতে পেনসন নিতে আসা মানুষকে বলে সে জানুয়ারীতে জীবিত ছিল তার প্রমাণ দিতে।

ডঃ প্রতিভা অগ্রবাল (১৯৩০) হিন্দী নাটকের ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় নাম। নাটকের প্রতি তার অনুরাগ অপরিসীম এবং বাল্যকাল থেকেই তিনি নাটক চর্চা করেছেন।

অসংখ্য নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন, পরিচালনার দায়ভারও বহন করেছেন অগণিতবার। অনুবাদের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অনুবাদের মাধ্যমে তিনি আধুনিক হিন্দী নাট্য সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। পাশ্চাত্য নাটক অনুবাদের মধ্যে স্মরণীয় — ইবসেনের 'এ্যান এনিমি অফ দি পিপল' অবলম্বনে 'জনতা কা শত্রু', পিরানদেল্লোর 'রাইট ইউ আর ইফ ইউ থিংক সো' অবলম্বনে 'মনমানে কী বাত', আর্থার মিলারের 'অল মাই সনস' অবলম্বনে 'মেরে বচ্চে', সার্ত্রেরের 'ক্রাইম পার্সন্যাল' থেকে 'অভিশপ্ত' ইত্যাদি। গুজরাতী থেকে অনুবাদ করেছেন শিবকুমার জোষীর 'সাপ উতারা', লাভশংকর ঠাকরের 'মনসুখলাল মর্জীঠিয়া', মধু রায়ের 'কুমার কী ছাত পর্'। বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' 'ঘরবাহার', ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রজনীগন্ধা', উৎপল দত্তর 'টীন কী তলবার', বাদল সরকারের 'এবম ইন্দজিত' 'পাগলা ঘোড়া' 'বাম শ্যাম জদু' 'সারী রাত' 'বড়ী বুআজী' 'যদি এক বার ফির' ইত্যাদি। কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপও দিয়েছেন — প্রেমচন্দের 'গোদান', ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'ময়লা আচল', অমৃতলাল নাগরের 'সুহাগ কে নূপুর' (নগরবধূ নামে)। বাংলায় অনুবাদ করেছেন জ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রীর 'শুতুর মুর্গ', মোহন রাকেশের 'আধে অধুরে', জগদীশচন্দ্র মাথুরের 'পহেলা রাজা' (শেষ দুটি শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে)। হিন্দী তথা বাংলা ভারতীয় নাট্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ডঃ প্রতিভা আগরওয়ালের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হবে।

সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে **মৃণাল পান্ডে** (১৯৪৬) বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। সিরিও কমিক ঢঙ্গে লেখা তাঁর নাটক সমসাময়িক জীবনের কঠিন সত্যের শিল্পিত প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। অনেকটা ব্রেখটীয় রীতিতে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারে একটা শিল্পমূর্তি তিনি নির্মাণ করেন যাতে জীবন সত্য কখনো কৌতুক তারল্যে কখনো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে কখনো নির্বেদ গাম্ভীর্যে প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই লোককথা বা প্রচলিত কাহিনীকে তিনি ব্যবহার করেন যাতে সমসাময়িক নির্মম নিষ্ঠুর সমাজের ভাবনা অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করে। আশা করি কালের বিবর্তনে তিনি আরো স্থিতধী আরো গভীর আরো ঐকান্তিক হয়ে উঠবেন।

মৃণাল পান্ডের প্রথম নাটক 'মৌজুদা হালাত কো দেখতে হুয়ে' (বর্তমান পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে) সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের সমাজ রাজনীতির দর্পণ হয়ে উঠেছে। জাতকের কাহিনীর সমান কথা এখানে আছে সমান্তরাল ভাবে। যেমন মূল কাহিনীতে তিন গ্রাম্য বদমায়েশ স্বর্ণরাশি পেয়েছে ও তা শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস করেছে — নাটকে তা ভোটে রূপান্তরিত হয়েছে। মূল কাহিনীতে এক তরুণী বধূ গুন্ডাদের পায়ে ধরতে বাধ্য হয় ও পরে স্বামীর কাছে প্রতিবাদ করলে স্বামী তাকে সান্ত্বনা দেয় যে সে সময়ে স্বামীর নীরবতাই ঠিক কাজ হয়েছে এই যুক্তিতে যে মৌজুদা হালাত কো দেখতে হুয়ে অর্থাৎ সে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েছে। এর সঙ্গে লেখিকা তুলনা করেছেন জরুরী অবস্থার পরবর্তীকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষত লেখকদের যারা এভাবেই সেই দিনগুলোতে তাদের নীরবতার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছে।

মৃণাল পান্ডের 'যো রাম রচি রাখা উর্ফ কিসসা মন্না সেঠকা' (১৯৮০, যা রাম বা ভগবান নির্দিষ্ট করে রেখেছে অথবা মন্না সেঠের কাহিনী) বিজয়দান দেথার রাজস্থানী লোককথার ওপর ভিত্তি করে লেখা উচ্চমানের নাটক। এক ধনী পুত্রর বিপ্লব চেতনা ও সাধারণ মানুষদের পক্ষে লড়াই করবার এক অবাস্তব ও রোমান্টিক ভাবনার ওপর তীব্র ব্যঙ্গ যদিও একটা পজিটিভ বক্তব্য ও সত্য উপনীত করবার ইঙ্গিতও আছে। রামলাল ধন্না সেঠের ছেলে শ্যামলাল মন্না সেঠ অর্থ সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে থেকেও এক যন্ত্রণায় অস্থির

কারণ সাধারণ দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে সে সহমর্মিতা অনুভব করে ও তাদের সঙ্গে সে এক হতে চায়। সে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলে, 'শ্রমিকদের জীবনই যথার্থ জীবন এবং আমাদের মত ধনী ব্যক্তিরা বিষাক্ত দাঁত বসিয়েছে তাদের উপার্জনের ওপর'। একটা কিছু করার তাগিদে শাসন যন্ত্রকে নড়াবার উদ্দেশ্যে মন্না সেঠ চুরি করে চোরাই মালে ঘর ভরায় কিন্তু তা বিফলে যায়। সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে কিন্তু মৃতের স্ত্রী সাবিত্রী তাকে আনন্দই জানায় কারণ মদ্যপ অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। মন্না সেঠ রাজপ্রাসাদে ঢুকে রাজাকে বার করে এনে মারে কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেই ঘটনাও তার সপক্ষে যায়। রাজা তাকে উষ্ণীষ দিলে সে তাতে পদাঘাত করে কিন্তু আগেই তার মধ্যে মোসাহেব মরা সাপ ঢুকিয়ে রেখেছিল যাতে মনে হল সর্বজ্ঞ মন্নারাম রাজাকে বাঁচাতে ওটা চূর্ণ করেছে। রাজা মন্নারামকে রাজত্ব ও রাজকন্যা দেবেই, মন্নারামের কটুবাক্যে তার ওপর ওদের আস্থা বেড়ে যায়। মূল কাহিনীতে মন্না রাজকন্যাকে বিয়ে করে। কিন্তু এখানে বিপরীত ঘটে। বিপ্লবী সাজতে সাজতে মন্না সত্যি সচেতন বিপ্লবী হয়ে ওঠে। সম্পদ ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে লড়াইয়ের হাস্যকর দিক সে উপলব্ধি করে। সে সব পরিত্যাগ করে চলে যায় জনতার মাঝখানে সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি 'উপ উপ মুসাহব'। সে এত দিনে যথার্থ উপলব্ধি করে জীবনের মানে সংগ্রামের তাৎপর্য। নাটকের কাহিনী সুন্দর, অঙ্গিকও অসাধারণ, সঙ্গীতের এত চমৎকার প্রয়োগও কম দেখা যায়। কিন্তু নাটকটির ত্রুটি এখানে যে লেখিকার বিপ্লব সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারনা নেই, এবং সাধারণ মানুষের ভূমিকাকে লেখিকা অবহেলা করেছেন। লেখিকার অসাধারণ সৃজন নৈপুণ্যর সঙ্গে বিপ্লবী জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক প্রত্যয় মিলিত হলে নাটকটা এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় সাহিত্যকর্ম রূপে বিবেচিত হত। যদিও এই নাটকের গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করতেই হবে।

সুরেন্দ্র বর্মা (১৯৪২) সম্প্রতিকালের নাট্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেতে পারেন। জয়শঙ্কর প্রসাদ থেকে মোহন রাকেশ পর্যন্ত হিন্দী নাটকের যে উজ্জ্বল ধারা সুরেন্দ্র বর্মা তাতে গৌরবময় সংযোজন। সুরেন্দ্র বর্মা প্রেম ও হৃদয় ভাবনার মহৎ শিল্পী। প্রেম মনস্তত্ত্বের অতল রহস্যের উন্মোচন তার নাটকে পাওয়া যায়। প্রসাদ ও রাকেশের উত্তর সাধক এই শিল্পী সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন — 'নাট্য ঔর কাব্যকে রাগাত্মক সূত্র, সম্বন্ধ, আন্তরিক জটিলতা, রূমানিয়ত, ভাবাত্মক ঔর সংবেদনাপূর্ণ বাতাবরণ প্রসাদ ঔর রাকেশ মে ভী মিলতা হ্যয় ঔর অব উসী প্রকার কী সৃষ্টি কা এক অঙ্গ সুরেন্দ্র বর্মা ভী লগতে হ্যয়। বস্তুত জলদী হী উনকে নাটকোঁ সে এক প্রকার কী অন্তরংগতা স্থাপিত হো জাতী হ্যয় ঔর উয়ে আধুনিক মানবীয় সংবেদনায়োঁ কা চিত্রকার অন্তরজগত কে নাট্যকার লগনে লগতে হ্যয় — উহাঁ রসাত্মক অনুভূতি ঔর দ্বন্দ্বাত্মক জটিলতা ধুলমিল জাতী হ্যয়, এক সুসংস্কৃত-সা লেকিন আধুনিক বাতাবরন আপকো ঘেরনে লাগতা হ্যয়'।[২২]

অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় আধুনিক সংবেদনা সঞ্চারিত করে চরিত্রের চিত্তদাহ জ্বালা যন্ত্রণা সুতীব্র হৃদয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন 'তিন নাটক' গ্রন্থে। প্রথম নাটক 'সেতুবন্ধ'র নায়িকা চন্দ্রগুপ্ত-দুহিতা প্রভাবতীর মানস যন্ত্রণা অসহ্য রূপ পেয়েছে। চন্দ্রগুপ্তর সভাকবি কালিদাস ও প্রভাবতী পরস্পরের প্রতি গভীর আকৃষ্ট হলেও আপন স্বার্থে রাজ্যের স্বার্থে চন্দ্রগুপ্ত শিল্পসাহিত্যে অনুরাগিনী কন্যার বিবাহ দেয় রূঢ় বর্বর রাজা রুদ্রসেনের সঙ্গে। বিষণ্ণ ব্যথিত প্রভাবতী অনন্ত কান্না বুকে চেপে স্বামীর ঘরে আসে, সঙ্গে কালিদাসের স্বহস্তে লেখা 'মেঘদূত' যার যক্ষযক্ষিণীর বেদনা কালিদাস-প্রভাবতীর বেদনা।

নাটকের শেষে কালিদাস ও রুদ্রসেন মারা গেছে, জেগে আছে প্রভাবতীর বুকের বেদনা। সেতুবন্ধ রচয়িতা পুত্র চতুর সেনের প্রশ্নের মুখোমুখী দাড়িয়ে সে আত্মবিশ্লেষণ করছে।

নায়ক খলনায়ক বিদূষক এ কৌতুক চরিত্র কপিঞ্জলের কথা যে বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করে ক্লান্ত অপমানিত। কিন্তু প্রকৃত রাজবিদূষক তাকে বোঝায় জীবনের তাৎপর্য মানুষকে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করতে হবে সত্য ও মিথ্যায় মিশ্রিত কারুর কারুর জীবনে মিথ্যাই হয় সত্য, এবং একই মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকা নেয় যেমন দুষ্মন্ত তপোবনে নায়ক, শকুন্তলাকে তাড়ানর সময় খলনায়ক ও শকুন্তলার পদপ্রান্তে ক্ষমা চাইবার সময় বিদূষক। জীবনের অনিবার্যকে মেনে নেয় কপিঞ্জল।

তৃতীয় নাটক 'দ্রৌপদী'তে পৌরাণিক নামকরনের মধ্য দিয়ে সমকালীন ব্যক্তির দ্বিধাবিদীর্ণ মানসিকতা ও বিভাজিত ব্যক্তিত্বের অভিশাপকে তুলে ধরেছেন নাটকের প্রধান চরিত্র মনমোহনের মধ্য দিয়ে যে এক ব্যবসায়িক কোম্পানীর অফিসার এবং যে পতি পিতা প্রেমিক অফিসার ও অধীনস্থ কর্মচারীরূপে নিজের অস্তিত্বকে খণ্ডিত করে নিজেই সঙ্গে দ্বন্দ্বলিপ্ত হয়েছে।

স্ত্রী পুরুষের প্রেম, যৌন জীবনের জটিল সম্পর্ক ও তার সূক্ষ্ম গহন বিশ্লেষণ রাকেশের 'আধেআধুরে' থেকে বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে। অতি আধুনিক কালে তা প্রবল হচ্ছে। সুরেন্দ্র বর্মার 'সূর্য কী অন্তিম কিরণ সে সূর্য কী পহলী কিরণ তক' (১৯৭৫) নাটকে তা তীব্র প্রবল। নারী পুরুষের সম্বন্ধ ও তাদের কাম সম্বন্ধীয় সমস্যা মানবজাতির প্রচীনতম থেকে আধুনিকতম জটিল সমস্যা। এটা মনোবিজ্ঞানের এক জটিল দুরূহ অধ্যায়ও। প্রাচীন ভারতে কোন কোন ক্ষেত্রে রীতি ছিল যে রাজা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হলে রানী এক রাত্রির জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বামী করতে পারবে। মল্লরাজ্যের রাজা ওক্কাক পুত্রহীন। সাধারণ ঘর থেকে আসা শিলবতী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে রাজাকে। নিয়োগ দ্বারা রানীর পুত্রলাভ কেউ চায় না কারণ এতে রাজার অক্ষমতা প্রকাশ পাবে। এবং অনুগত রানীও মেনে নিয়েছে সব কিছু। কিন্তু অমাত্যবর্গ পুরোহিত — যারা রাজ্য চালায় — রাজ্যের স্বার্থে নারীকে সেই কার্যে প্রবৃত্ত করে। রাত্রিবেলায় রাজা একক যন্ত্রণায় অস্থির, রানী যায় তার ক্ষণিক স্বামীর ঘরে। চমকে ওঠে শিলবতী। ঐ পুরুষ তার বাল্য সহচর প্রতোষ যে তাকে বিয়ে করতে পারেনি রাজা ও রাজ্যের জন্য। সকাল বেলায় রানী ফেরে মিলন ও সম্ভোগের পূর্ণ আনন্দ নিয়ে। রানী ঘোষণা করে যে নিয়ম রক্ষা করতে সে একাজ আরো করবে। সকলেই স্তম্ভিত বিমূঢ়। এক অত্যন্ত প্রবল দুরন্ত ঘটনা ও গতিবেগ নাটকে সঞ্চারিত হয়েছে। নরনারীর সম্পর্কের জটিলতাকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপে তীব্র ভয়ংকর রূপে প্রকাশ করেছেন নাট্যকার যদিও কবিত্বময় ভাষারীতি ও সৌন্দর্যময় প্রকাশভঙ্গী তাকে আশ্চর্য আবেদনময় করেছে।

সুরেন্দ বর্মার 'আঠবা সর্গ' (অষ্টম সর্গ ১৯৭৬) কুমারসম্ভবের ওপর ভিত্তি করে লেখা। কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে শিবপার্বতীর যে বিলাস ক্রীড়া ও শৃঙ্গারের বর্ণনা আছে তা সমালোকদের কাছে রুচিহীন মনে হয়েছে। এই নাটকে সুরেন্দ্র বর্মা কুমারসম্ভবের অসম্পূর্ণতা ও তার রুচিহীনতার বিষয়টি অত্যন্ত শিল্পময় করে তুলে ধরেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন, শিল্পীর স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের সমস্যা, রাজকীয় অনুশাসন প্রভৃতি প্রসঙ্গও উপস্থাপিত হয়েছে।

অতীত জীবনের আলো-অন্ধকারচ্ছন্ন পৃষ্ঠা থেকে কঠিন প্রত্যক্ষ বাস্তবে অবতীর্ণ হয়েছেন 'নীদ কিউ রাত ভর নহী আতী' একাংক গুচ্ছে যেখানে আধুনিক মানুষ তার জ্বালা

যন্ত্রণা চিত্তদাহ অস্থিব ব্যাকুলতা নিয়ে এসেছে। এই নাটকগুলো প্রকৃতপক্ষে আধুনিক জটিল দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ যন্ত্রণাময় উষব জীবনেব প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

সুবেন্দ্র বর্মাব শেষ দিকেব নাটক 'হসন অলী ভূসন ছলী' (ছোট সৈয়দ বড সৈয়দ) মোগল সাম্রাজেব শেষ সময়েব পটভূমিকায় স্থাপিত। বড ক্যানভাসে ছবি আঁকা হয়েছে। বাজনৈতিক সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যাব কপ ফুটে উঠেছে মধ্যযুগেব পটভূমিকায়। এবপব লিখেছেন 'শকুন্তলা কী অঙ্গুঠী', 'এক দুনি এক'। কায়েদ এ হয়াত তিন অঙ্কেব নাটক। মির্জা গালিবেব জীবনেব ঐতিহাসিকতা নিয়ে লেখা সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক যুগপুরুষেব বহুবিধ মানসিক উত্তেজনা উপলব্ধি কবাব প্রয়াস গালিবেব সহকর্মী সাথী পবিবাব এমন কি নিজেব সঙ্গে সম্পর্কেব কথাও গভীব প্রভাবে উচ্চাবিত।

মোহন মহর্ষি (১৯৪০) ভাবতবর্ষেব বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব। তাব 'আইনস্টাইন' বিপুল খ্যাতি অর্জন কবেছে এটি কেবল জীবনী নাটক নয় দার্শনিকতত্ত্বেও সমৃদ্ধ। তিনি অনুবাদে দক্ষ ও অন্তত ৭৫টি নাটকেব সফল নির্দেশক। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুবস্কাব পেয়েছেন পবিচালনাব জন্য।

স্বদেশ দীপক (১৯৪২) হিন্দীতেই লেখেন যদিও তাব মাতৃভাষা পঞ্জাবী। তিনি ছোটগল্পকাব ও ঔপন্যাসিক, যদিও নাটক বচনায় বিশেষ পাবদর্শিতা দেখিয়েছেন তাব গল্পেব ওপব ভিত্তি কবে অনেক টেলিফিল্মও হয়েছে। তাব বিশিষ্ট নাটক হল 'কোর্ট মার্শাল' (১৯৯১), 'জলতা হুযা বথ' (১৯৯৭), 'সব সে উদাস কবিতা' (১৯৯৮), 'কাল কোঠবি' (২০০০)। 'কোর্ট মার্শাল' তাঁকে বিশেষ ভাবে খ্যাতিমান কবে। যাবা দেশেব সুবক্ষাব কাজে নিযুক্ত সেই সেনাবাহিনীব মধ্যেও যে জাতপাত শ্রেণী বৈষম্য আজও ভাইবাসেব মতো ছডিয়ে আছে সে কথাই এই নাটকে বলা হয়েছে। নাটকটি নাট্যামোদীদেব দ্বাবা আন্তবিকভাবে গৃহীত হয়েছে এবং সাবা ভাবতে অভিনীত হয়েছে। তাঁব অন্যান্য সব নাটক এমন জনপ্রিয়তা পায়নি। 'কাল কোঠাবি' নাটক সফল ভাবে মঞ্চস্থ কবেছে অস্মিতা দিল্লী, পবিচালক — অববিন্দ গৌড।

প্রবীণ ও নবীন নাট্যকাবদেব বচনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে আজকেব হিন্দী নাট্যসহিত্য। **কৃষ্ণ বলদেব বৈদ**-এব 'ভুখ আগ হ্যয' তুলে ধবে ক্ষুধাব জ্বালা এবং আজকেব প্রযোজকবা এই নাটকটিব প্রতি বিশেষ নজব দিচ্ছেন। নিযমিত নাটক লিখেছেন **বিভাংশু বৈভব** ("মন্থন' 'বাবুজী' —মিথিলেশ্ববেব কাহিনী নির্ভব), **উর্মিল কুমার থপলিযান** ('হবিশ্চন্দ্রব কী লড়াই', 'ভৌবী কথা'), **ললিত মোহন থপলিযান** ('অলগ অলগ বাহে,' 'অন্ধাকৌন', 'ইন্তহান কী তৈযাবী', 'জিস দিন বোব আযা'), **বিনোদ বর্মা** (খেলাঘব), **বিনোদ শাহী** ('ঝুট পুবান') প্রমুখ। **না গ বোডস** নাটক বচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন — তিনি বহুল চর্চিত হচ্ছেন। তাব 'থ্যাঙ্কিউ বাবা লোচনদাস' অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'বীহড' অপবাধীদেব নিযে লেখা এবং 'আতঙ্ক'ব ওপব সম্ভবত প্রথম নাটক। **অলকা সরাওগী** (১৯৬০) বচিত 'আট ডিসেম্বব উন্নীসশো বানবে' সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি ও মানব মিলনেব কথা বলে। **ইন্দ্রজিৎ ভাটিয়ার** 'অগ্নিখণ্ড' নাটক 'সমসাময়িক সামাজিক আর্থিক ঔব বাজনৈতিক বিষংগতিযো কী পডতাল কী গযী হ্যয'। **মুরলীধর আস্থানা** 'যযাতি ঃ প্রশ্ন চিহ্ন' নাটকে আজকেব 'ভৌতিকবাদী সভ্যতা ও ভোগসংস্কৃতি'তে আকণ্ঠ ডুবে থাকাব বিড়ম্বনা দেখিযেছেন। প্রতিযোগিতায পুবস্কৃত হযেছে বিনোদ শাস্ত্রীব 'এক হত্যা কী হত্যো', বাকেশের 'বামলীলা প্রভৃতি। উর্দু ও হিন্দীতে আবদুল বিসমিল্লাহ-ব 'দো পৈসে কী জন্নত' (দুপযসার স্বর্গ) ব্যাঙ্গকৌতুকেব মধ্য দিযে মানুষেব লোভ নীচতা নির্বুদ্ধিতাকে তুলে ধবে,

শিশুদের জন্য রচিত হলেও এটা সবার নাটক। হিন্দীতে আরো অজস্র নাটক রচিত ও অভিনীত হচ্ছে। এভাবেই সমৃদ্ধ হচ্ছে হিন্দী নাটক।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নাট্যব্যক্তিত্ব **অসগর ওয়াজহত** (১৯৪৬) নাটক রচনায় অত্যন্ত দক্ষতা দেখিয়েছেন। সমাজবোধই তাঁর চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবমিলনের গভীর বোধ তাঁর শিল্পে গভীর নিবিড় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রখর সমাজভাবনার সঙ্গে নিখুঁত অঙ্গিকের সমন্বয় তার নাটককে অনন্য করেছে। তার 'সবসে সস্তা গোস্ত' নাটক দেখা যায় মঞ্চে দুই কল্পিত মন্দির ও মসজিদে মাংস এসে পড়ে। হিন্দুরা ভাবে এটা গরুর মাংস ও মুসসমানরা মনে করে এটা শূকরের মাংস। তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। কিন্তু শেষে দেখা যায় ওটা গরু বা শূকরের মাংস নয়, ওটা নরমাংস। তখন সবাই খুব আশ্বস্ত হয় কারণ নরহত্যা বা নরমাংসই তো সব থেকে সাধারণ ও সস্তা। ওয়াজহতের 'জিস লাহোর নহী দেখা ও জন্যাঈ নই' এক অসাধারণ নাট্যকৃতি। ভারত ভাগের পর লাহোর থেকে এক মুসলমান পরিবার লাহোর এলে এক হিন্দু বৃদ্ধার বাড়িতে তাদের সরকারের পক্ষ থেকে রাখা হয়। বৃদ্ধা তাদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে এবং মুসলমান পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। যদিও বৃদ্ধার ছেলে লাহোর ছেড়ে চলে গেছে ও তার কোন খবর নেই, তাই বৃদ্ধার মনে গভীর দুঃখ। সে এদের শিশুকন্যাকে ভালবাসে আঁকড়ে ধরে। বৃদ্ধা দেওয়ালী পালন করতে চাইলে সবাই আন্তরিক সহাযোগিতা করে। ক্রমে বৃদ্ধা মারা যায় ও মৌলবীদের পরামর্শে তাকে হিন্দু রীতি অনুযায়ী নদীর তীরে দাহ করা হয়। নাটক বিভিন্ন কবির কবিতা নিপুণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৯০ সালে ও বিপুলভাবে সমাদৃত হয়।

জাভেদ আখতার-এর 'দূর দেশ কী কথা' নাটক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহৎ বাণী উচ্চারণ করে। ধর্মীয় মৌলবাদের দুঃসহরূপ লেখক দেখিয়েছেন এবং তার বিপ্রতীপে মানবিকতার গভীর বোধ প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে জড়ালে পরিণাম ভাল হয় না — এই সত্যও ব্যক্ত হয়েছে। পরভেজ আখতারের পরিচালনায় আই পি টি এ এই নাটকের বহুল অভিনয় করে।

সফদর হাশমী (১৯৫৪-১৯৮৯) পথ নাটকের বিশিষ্টতম শিল্পী। উৎপল দত্ত তাঁকে হিন্দী পথ নাটিকার জনকরূপে উল্লেখ করেছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় অবলম্বনে তিনি নাটক লিখেছেন ও অভিনয় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিই তাঁর ভাবনা চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রাজনীতিই তাঁর শিল্প বোধের উৎসমূলে বিদ্যমান। হাশমী আই পি টি এ-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সাম্যবাদী আদর্শেই তিনি সমাজটকে নতুন ভাবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে জননাট্য মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন যে সংস্থায় তাদের নাটক নিত্য অভিনীত হত। হাশমীর নাটকগুলি হল — অপহরণ ভাইচারেকা, অব চাক্কা জাম, আওরত, মেশিন, মোটেরাম কা সত্যাগ্রহ (প্রেমচন্দের কাহিনী অবলম্বনে) রাজা কা বাজা, হল্লাবোল, হত্যারে প্রভৃতি। তাঁর সব নাটক হিন্দী ও অন্যান্য ভযায় অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে। 'হল্লা বোল' নাকি চলকালীন তিনি শাসক শ্রেণীর দুষ্কৃতীদের হাতে মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং ২রা জানুয়ারী ১৯৮৯ তিনি মারা যান। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে যারা ভারত ক্রোধে ক্ষোভে গর্জন করে ওঠে। সত্যিই 'হাশমী থাকবে আমাদের চেতনার গভীরে আলোকবর্তিকা হয়ে' (আননায়ুধ, জানুয়ারী ১৯৮৯)।

হবীব তনবীর (১৯২৩) সম্প্রাতিক হিন্দুস্তানী থিয়েটারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ যিনি জীবৎকালেই যেন প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছেন। নাট্যপ্রয়োজনার ক্ষেত্রে সারা দেশে তিনি যে বিপুল জনসমাদর লাভ করেছেন তার সীমা-পরিসীমা নেই। মূলত লোক নাট্যরীতির ক্ষেত্রেই তার নাম করা হয়। লোকসংস্কৃতি নিয়ে তনবীর দীর্ঘদিন চর্চা করেছেন। লোকসংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত জীবনের অস্তিত্বের অভিজ্ঞান। লোকনাটকের মধ্যেও শিল্পরসগত মূল্য, সামাজিক, ঐতিহাসিক মূল্য, নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বগত মূল্য ভাষাতত্ত্বগত মূল্য ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফোক থিয়েটার প্রকৃতপক্ষে পুরাতন লোকঐতিহ্যের নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে চলমান কালের প্রবাহে সজীব ও ক্রম সম্প্রসারিত হয়। হবীর তনবীর এভাবেই লোকনাটকের গভীরতাকে উপলব্ধি করেছেন ও তাকে প্রকাশ করেছেন। মূলত ছত্তিশগড়ী ভাবনা আদর্শ ও শিল্পসৃজন তার লোকনাটককে বিরল মর্যাদা দিয়েছে।

মহৎ শিল্পের প্রবক্তা হবীর তনবীর মানুষের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী। তিনি বামপন্থী আদর্শের সমর্থকও বটেন। তাঁর জন্ম রায়পুরে, সেখান থেকে স্কুলের পাঠ সমাপন করে মরিস কলেজ নাগপুরে বিদ্যাচর্চা করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুদিন ছিলেন। ১৯৪৫এ তিনি বোম্বাই যান এবং IPTA ও PWAর সঙ্গে যুক্ত হন। বামপন্থী ভাব নিয়ে মৌলিক সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতেন। এবং নিজ গ্রামে ফিরে তিনি ছত্তিশগড়ী সঙ্গীত ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন। এ সব তাঁর নাট্যভাবনাকে গঠন করেছে। তাঁকে বলা যায় নতুন নাট্যরীতির প্রবক্তা। তিনি ও তার স্ত্রী মনিকা মিশ্র ১৯৫৯ সালে নির্মাণ করেন 'নয়া থিয়েটার' যে নাট্যসংস্থা ঘরে বাইরে আধুনিক ও ক্লাসিক ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

হবীব তনবীর তিরিশটার বেশী নাটক লিখেছেন। তাঁর প্রথম উল্লেখ্য নাটক 'আগ্রা বাজার' (১৯৫৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্দু কবি নাজির আকবরবাদী-র সাহিত্যকর্ম এবং তদানীন্তন সময়ের ওপর ভিত্তি করে লেখা। আকবরবাদী সাধারণ মানুষ ও তাদের নিত্য জীবনচর্যা নিয়ে লিখতেন এবং তাঁর কবিতার রীতি ও আঙ্গিক অভিজাত সমাজের সাহিত্যভাবনার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করত। Javed Malik জানিয়েছেন যে 'In Agra Bazar, two major emphases that characterize Tanvir's work in the theatre — one, an artistic and ideological predilection for the plebeian, popular culture, and two, a penchant for employing music and poetry in plays not as superfluous embellishment but, much like Brecht, as an integral part of the action — had their first and one of the finest expression (Theatre India — November, ২০০০). 'মিট্টি কি গাড়ী' (১৯৫৮, কুদসিয়া জাইদী-র শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম'এর হিন্দুস্থানী অনুবাদ) নাটকে তনবীর কয়েকজন ছত্তিশগড়ী লোকশিল্পীকে নিয়েছেন এবং লোকমঞ্চের ঐতিহ্য ও রীতি ব্যবহার করেছেন। ১৯৭৪এ 'গাঁও কা নাম সসুরাল মোর নাম দামাদ' (ছত্তিশগড়ীতে ফোক ইমপ্রোভাইজেশন-এর কোলাজ) বিস্ময়কর নাটক — 'নাচ' রেপের্টরীতে শতাধিক লোকশিল্পী নিয়ে কাজ করতে করতে লোক-কৌতুক নাট্যকাহিনী একটি মঞ্চরূপে গ্রথিত হয়। নাটকটি বিপুল সমাদর লাভ করে। ১৯৭৫এ 'চরণদাস চোর' (বিজয়দন দেতা-র রাজস্থানী লোককাহিনীর ওপর আধারিত কথার হাবির তনবীর কৃত ছত্তিশগড়ী রূপায়ণ) তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। অসগর ওয়াজহতের লেখা 'জিস লাহোর নহী দেখা ও জম্মাঈ নহী' নাটকের মঞ্চায়নে তনবীর বিস্ময়কর কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা যেমন গভীর প্রত্যয়ে উচ্চারিত হয়েছে, তার রূপায়ণও আশ্চর্য শিল্পরূপ নির্মাণ করেছে। এখনও

তনবীব নাটক করে চলেছেন। বয়সের ভার তাকে হয়ত ক্লান্ত করেছে তবু তিনি অনন্য অনতিক্রম্য। ২০০২ সালেও তিনি নাটক করে চলেছেন। সম্প্রতি কেরালায় অনুষ্ঠিত শেক্সপীয়ব নাট্য উৎসবে তাব রূপান্তরিত ও পরিচালিত শেক্সপীয়রের A Midsummer Night's Dream (কামদেও কো আপনা বসন্ত ঋতু কা সপনা) তাঁর প্রতিভাকে বিচ্ছুরিত করে।

৫. বাংলা ও হিন্দী নাটক ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক

(১) সূচনা

বাংলার সঙ্গে হিন্দীর সম্পর্কের বিস্ময়কর নৈকট্য গভীরতা আছে। এই দুই ভাষা সাহিত্যেব মধ্যে যে ভাবের মিলন, যে আত্মাব সাধর্ম্য, যে রূপের সমতা গড়ে উঠেছে তা সাধারণতঃ দুই স্বতন্ত্র ভিন্ন গোষ্ঠীর সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে দেখা যায় না। মধ্যযুগ থেকে বাংলা ও হিন্দীব মধ্যে যে প্রীতি ও মিলনের গভীর প্রত্যয় গড়ে উঠেছে তা উত্তরোত্তব হয়েছে সংহত সুদৃঢ় সুনিবিড়। আধুনিক যুগের সূচনা থেকেই সাহিত্য বিশেষত নাট্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলা হিন্দীর ঐক্যের বন্ধন আরো দৃঢ় হয়েছে। পাবস্পরিক আদান-প্রদান ও ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দুই ভাষার নাট্য সাহিত্য নিজেদেব আবো সমৃদ্ধ আরো ঐশ্বর্যময় করেছে।

(২) প্রথম পর্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দীতে নাটকের বিকাশ ঘটে। "হিন্দী কো নবজাগরণ কী চেতনা বাংলা নাটক এবং রঙ্গমঞ্চ সে প্রাপ্ত হুই।" [২৩] মহান নাট্যকার ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রব নাটকের প্রেরণা বাংলা নাটক। "হরিশ্চন্দ্রনে সবসে পহলে 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' কা বাংলা সে হিন্দী মে অনুবাদ করকে সংবত ১৯২৫ মে প্রকাশিত কিয়া" [১৪] ভারতেন্দুর 'ভারত জননী'ও বাংলার প্রেরণায় লেখা। এযুগের রামকৃষ্ণ বর্মা, রাধাচরণ গোস্বামী, রাধাকৃষ্ণ দাস প্রমুখ নাট্যকাররাও বাংলার দ্বারা প্রভাবিত। "প্রত্যক্ষ রূপ সে বাংলা সাহিত্য সে অনুপ্রাণিত" হয়েছিলেন প্রথম পর্বের হিন্দী নাট্যকাররা।

এর অব্যবহিত পরের যুগের হিন্দী নাটকও বাংলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকাররা অনূদিত হয়েছেন এবং হিন্দী নাটক-এ তাঁদের প্রভাবও পড়েছে। হিন্দী নাট্য সাহিত্যেও যাঁর প্রভাব ও প্রেরণা সবিশেষ তিনি হলেন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। জয়শঙ্কর প্রসাদ ও তদানীন্তন নাট্যকার থেকে সুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত।

(৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও হিন্দী নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হিন্দী নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। একদিকে শিল্পকলার চরম ঔৎকর্ষ অন্যদিকে গভীর ভাবের স্ফুরণ দ্বিজেন্দ্রলালকে বরণীয় করেছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবোধের সুতীব্র প্রকাশ। হিন্দী নাট্য সাহিত্যের ওপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব গভীর। "রায় কী তরহ য়হা ভী রাষ্ট্রীয়তা কা তাৎপর্য হিন্দুত্ব কা আগ্রহ হ্যয়। ইন নাটকোঁ মে ভী ভাবুকতা কা আধিক্য মিলতা হ্যয় জিসকে পরিণাম স্বরূপ গীতোঁ কী ওর বিশেষ রুচি প্রকট হুই হ্যয়। ভাষা মে প্রবাহ এবং আলঙ্কারিকতা হ্যয়। এসী ভাষা কা সংস্কৃতনিষ্ঠ হোনা পর্যাপ্ত স্বাভাবিক হ্যয়। পাত্রোঁ মে আবশ্যকতানুসার অন্তর্দ্বন্দ্ব

করনে কা ভী প্রয়াস কিয়া হ্যয। বায কী নাবী ভাবনা কো আপনানে কা প্রযত্ন কিয়া গয়া। এক তরফ জহা উহ মমতা এবং স্নেহ কী জীবন্ত মূর্তি হ্যয দুসরে তরফ উহ মহত্ত্বাকাঙ্ক্ষা সে পূর্ণ সমস্ত ঘটনা চক্র সূত্রধারিণী হ্যয। [২১]

অনুবাদের মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দী নাট্যসাহিত্যে এনেছেন নতুন সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। তাব অনেক নাটক একাধিকবার অনূদিত হয়েছে অনুবাদের অজস্র সংস্করণ হয়েছে দ্বিজেন্দ্র অনুবাদকেদের মধ্যে রূপনারায়ণ পান্ডেয়র নাম সবিশেষ উল্লেখ্য, রামচন্দ্র বর্মা, কমল প্রমুখের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের অনূদিত নাটকের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল

আনন্দ বিদায	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	
ভীষ্ম	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	১৯১৮
ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা	গিরিধর শর্মা	
ভাবত বমণী (বঙ্গনাবী)	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	১৯১৯
চন্দ্রগুপ্ত	কমল	
চন্দ্রগুপ্ত	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	
চন্দ্রগুপ্ত	সূর্যনারায়ণ দীক্ষিত ও শিবনারায়ণ শুক্লা	১৯১৮
দুর্গাদাস	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	১৯১৬
দুর্গাদাস	দ্বারিকানাথ মৈত্র	১৯৮৬ বি
দুর্গাদাস	কমল	১৯৫৬
মেবাব পতন	বামচন্দ্র বর্মা	১৯১৭
মেবাব পতন	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	
পাষাণী	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	১৯২০
পুনর্জন্ম (সূমকে ঘব ধূম)	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	
অহল্যা	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	১৯৬১
নূবজহাঁ	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	
পবপাবে (উসপাব)	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	১৯১৭
পবপাবে (মেবী আশা)	শিবরামদাস গুপ্ত	১৯২৮
বাণা প্রতাপসিংহ	বামচন্দ্র বর্মা	১৯১৭
বাণা প্রতাপসিংহ	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়	
শাহজহাঁ	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয	১৯১৭
সিংহল বিজয	বামচন্দ্র বর্মা	১০২০
সীতা	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়	১৯১৮
সুহবাব রুস্তম	মুন্শী অজমেবী	১৯২৫
তাবাবাঈ	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়	
তাবাবাঈ	কমল	
ত্র্যহস্পর্শ (মূর্খ মন্ডলী)	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়	

দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দী নাটককে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন গভীরভাবে। তিনি পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করেছেন, আপন সৃজন ক্ষমতা দিয়ে তাকে করে তুলেছেন বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং হিন্দী (ও অন্যান্য ভারতীয়) নাট্যসাহিত্য তা থেকে প্রেরণা পেয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলেছে। হিন্দীতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রভাব এসেছে বিভিন্ন প্রকারে —

ক) ভারতীয় আদর্শের প্রকাশ

খ) প্রাচীন বীর ও শ্রদ্ধেয় মানুষদের উদ্ভাসিত করা

গ) জাতীয়তাবোধের প্রবল উচ্চারণ

ঘ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ঙ) নারীর মহিমা ব্যক্ত করা

চ) কল্পনাপ্রবণতা ও ভাবগভীরতা

ছ) নাটকের অঙ্ক দৃশ্য বিভাগে পরিবর্তন আনা

জ) নান্দী প্রস্তাবনা ইত্যাদি প্রাচীন রীতির বিলোপ

ঝ) ভাষাকে উচ্ছ্বসিত আবেগময় করে তোলা

ঞ) সংলাপ রীতির নতুনত্ব আনা

ট) সংস্কৃত-এর বৈদিক নির্বোধ বিদূষকের পরিবর্তে পাশ্চাত্য নাটকের মত প্রাজ্ঞ বিদূষকের আবির্ভাব ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব সামান্য পড়েছে এই নাট্যকারদের ওপর —

পরমেশ্বর মিশ্র (রূপবতী নাটক), নরোত্তম দাস ও গুপ্ত বন্ধু (মহারাণা প্রতাপ), হরিদাস মাণিক (স যোগিতা হরণ যা পৃথীরাজ পান্ডবপুত্র যা যুধিষ্ঠির), ভঁবরলাল সোনা (বীরকুমার ছত্রসাল), আনন্দিপ্রসাদ শ্রীবাস্তব (অছুত)। বাংলা নাটকের বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গীর প্রভাব এদের ওপর কিছু পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে বেশ কয়েকজন নাট্যকারের ওপর। চন্দ্ররাজ ভণ্ডারীর সিদ্ধার্থকুমার যা মহাত্মা বুদ্ধ', 'সম্রাট অশোক' প্রভৃতি নাটকের চরিত্রচিত্রণ ভাষা কাহিনী গ্রন্থন ইত্যাদিতে দ্বিজেন্দ্র প্রভাব আছে। নাট্যকার 'সম্রাট অশোক এর সমর্পণ পত্রে লিখেছেন — জিস মহানুভব কে আদর্শ গ্রন্থরত্নো কা অধ্যয়ন কর লেখক নে নাট্যকলা কা কুছ জ্ঞান প্রাপ্ত কিযা, উনহী প্রসিদ্ধ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কী স্বর্গীয় আত্মা কী পবিত্র স্মৃতি মে যহ তুচ্ছ কৃতি ভক্তিপূর্বক সমর্পিত হুয।'

জিনেশ্বর প্রসাদ 'মাযল' রচিত 'ভারত গৌরব অর্থাৎ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত' প্রায় সম্পূর্ণই দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অনুকরণ। লোকনাথ সিলাকারী 'বীরজ্যোতি' বাংলা শাহজাহান নাটকের ওপর ভিত্তি করে লেখা। ভূমিকাযও একথা লেখক স্বীকার করেছেন। লালা ছোটেলাল লঘুর নাটক 'বীর দুর্গাদাস'-এর উৎসও প্রেরণা দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস'। ডঃ সুবর্ণসিংহ বর্মা আনন্দর লেখা 'ছত্রপতি শিবাজী', 'বীর দুর্গাদাস' প্রভৃতির ওপর বাংলা প্রভাব প্রবল। দুর্গাদাস গুপ্তর 'মহামাযা' নাটকে গভীর প্রেরণা দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস'। শিবরামদাস গুপ্তর আদর্শ হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর 'দেশ কা দুর্দিন' সম্পূর্ণ প্রভাবিত হযেছে 'মেবার পতন' নাটকের দ্বারা।

জযশংকর প্রসাদের আগমনের পর হিন্দী নাট্য সাহিত্যে নতুন যুগের সূত্রপাত হয। "বস্তুতঃ হিন্দী মে ইস অধ্যায় কা প্রারম্ভ দ্বিজেন্দ্রলাল রায কী প্রেরণা-স্বরূপ হুয়া।"[২৩] প্রসাদ প্রভাবিত হযেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের দ্বারা। সমালোচক বলেছেন —

"বঙ্গলা মে বাবু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে ঐতিহাসিক নাটকোঁ কা বিশেষ প্রচলন হুয়া। উনহোনে অঙ্গরেজী ঢংগ পর এক নয়া মার্গ প্রস্তুত কিয়া হ্যয। উনকা 'চন্দ্রগুপ্ত' তো বহুৎ হী প্রসিদ্ধ হায়। প্রসাদ জী ইস ওর বঢ়ে ঔর ঐতিহাসিক নাটকোঁ কে প্রস্তুত করনে কা কার্য আরম্ভ কিয়া।"[২৭]

প্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের মত প্রাচীন ভারতকেই তাঁর নাটকের উপজীব্য করেছিলেন. 'চন্দ্রগুপ্ত' 'স্কন্দগুপ্ত' প্রভৃতি চরিত্র অবলম্বনে তার নাটক গড়ে উঠেছে। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। বক্তব্য ও কাহিনী বিন্যাসে প্রসাদ গ্রহণ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলালকে, রূপায়ণেও সেইরূপ। সংলাপের কোন কোন জায়গায় ভাষার সম্পূর্ণ অনুকরণ আছে।

যেমন --

সেকেন্দর —

সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ। দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। (চন্দ্রগুপ্ত)

মাতৃগুপ্ত —সবেরে সূর্য কী কিরণে উসে চুমনে কো লোটতী থী, সন্ধ্যা মেঁ শীতল চাঁদনী উসে আপনী চাদর সে ঢঁক দেতী থী। (স্কন্দগুপ্ত)

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার এক রীতি নিয়েছেন প্রসাদ তা হল কোন চরিত্রের ব্যবহৃত বাক্যাংশ নিয়ে অন্য চরিত্রের প্রবেশ ও সংলাপ। যেমন ঃ

শর্বনাগ — দেখ সামনে সোনে কী সংসার খড়া হৈ। (রামা কা প্রবেশ)

রামা — পামর সোনে কী লঙ্কা রাখ হো গঈ। (স্কন্দগুপ্ত)

এবং

শায়েস্তা — ভারতের সম্রাট বাদশাহ গাজী আলমগীর। (অবগুণ্ঠিতা জাহানারার প্রবেশ)

জাহানারা — মিথ্যা কথা। ভারতের সম্রাট ঔরঙ্গজীব নয়। ভারতের সম্রাট শাহানশাহ সাজাহান।

(শাজাহান)

দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপের আর এক রীতি প্রশ্নকারীর বাক্য ধরেই উত্তরদাতার সংলাপকথন। যেমন ঃ

স্কন্দগুপ্ত — উহ ভী কিস লিয়ে?

গর্গদত্ত — কিস লিয়ে? ত্রস্ত প্রজা কী রক্ষা কে লিয়ে, সতীত্ব কে সম্মান কে লিয়ে, দেবতা ব্রাহ্মণ ঔর গৌ কী মর্যাদা মে বিশ্বাস কে লিয়ে ....। (স্কন্দগুপ্ত)

এবং

নন্দ — কি অপরাধে?

চাণক্য — ব্রহ্মহত্যার অপরাধে। ব্রাহ্মণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার অপরাধে। ব্রাহ্মণকে অপমান করার অপরাধে। (চন্দ্রগুপ্ত)

জয়শংকর প্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবে সংস্কৃত রীতির নান্দীপ্রস্তাবনা ইত্যাদি বাদ দিলেন। ঔদরিক ব্রাহ্মণ বিদূষকের পরিবর্তে দ্বিজেন্দ্রীয় বিদূষক আনলেন, যেমন 'স্কন্দগুপ্ত' নাটকের মুদ্গল শাজাহানের দিলদারের প্রতিচ্ছবি যেন। কিন্তু একথা বলতেই হবে যে

প্রসাদে বাংলার অনুপ্রেরণা থাকলেও প্রসাদজীর রচনায় স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা অক্ষুন্ন আছে। তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন বাংলা থেকে কিন্তু আপন ক্ষমতা ও প্রতিভায় তাকে উজ্জ্বল অপরূপ করে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। তিনি কখনোই অনুকারক নন, তিনি সৃজনশীল শিল্পী মৌলিক স্রষ্টা।[২৮]

ঘটল আর এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। হিন্দী নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবল প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করলেন নাট্যকার লক্ষীনারায়ণ মিশ্র। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার ত্রুটি বিচ্যুতির কথা তিনি বললেন এবং তাঁর সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে হিন্দী নাটককে মুক্ত করতে চাইলেন। 'মুক্তি কা রহস্য' (১৯৩২) নাটকের ভূমিকায় তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। ''যা কিছু সামান্য নাটক আমাদের প্রকাশিত হয়েছে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের সবকটির লেখক দ্বিজেন্দ্রলালকে আদর্শ মেনে তাদের কাগজে দাগ টেনেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাটকে বাংলার শেকসপীয়র হতে চেয়েছিলেন এবং বাঙ্গালী সমালোচকদের ভয়ংকর ভাবুকতা ও শোচনীয় বিচারহীনতার জন্য কিছু সময়ের জন্য সেই পদ পেয়েও গেছেন। সে যুগের য়ুরোপের নাট্যকারগণ শেকসপীয়রের নাটককে মনোবিজ্ঞান ও বাস্তবতার প্রতিকূল বিবেচনা করে নতুন পথ বার করছিলেন, বৌদ্ধিক অভিব্যক্তি ও মনোবৈজ্ঞানিক মীমাংসার সেই রাস্তা দিয়ে ইবসেন থেকে সুরু করে এই যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররা চলেছিলেন ও এখনও চলছেন — সেই যুগেই শেকসপীয়রের অনুসরণ করে ভাবুকতার এক নিম্নপ্রবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ে এবং ওই প্রবৃত্তির সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। .... দ্বিজেন্দ্রের সমস্ত সৃষ্টি মিথ্যা ও অসম্ভবকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। মনুষ্য চরিত্রের মধ্যে তিনি কেবল দৈবী প্রবৃত্তি বা রাক্ষস প্রবৃত্তি দেখেছেন -- হয় আলো না হয় অন্ধকার। .... হিন্দী নাটকের দ্বিজেন্দ্রলালের মত বানানো ভাষা ও বানানো ভাব, সুখ দুঃখ প্রেম ঘৃণা জয় ও পরাজয়ের মিথ্যা চিত্র আঁকা হয়েছে। হিন্দী নাটকে যতদিন না দ্বিজেন্দ্রর প্রভাব সম্পূর্ণ দূর হয়, ততদিন আমাদের সাহিত্যে ভাল নাটক লেখা হবে না।''

কিন্তু বুদ্ধিবাদ ও মনোবিজ্ঞানের সাধনা সত্ত্বেও লক্ষীনারায়ণ মিশ্র প্রাচীন প্রভাব থেকে সর্বাংশে মুক্ত হতে পারে নি, দ্বিজেন্দ্রলালের কথা মনে পড়িয়ে দেয় তাঁর নাটক কোন কোন সময়ে। মিশ্রজীর এই সতর্ককা সত্ত্বেও পরের নাট্যকারদের রচনায়ও দ্বিজেন্দ্রর প্রভাব আছে। যেমন হরিকৃষ্ণ প্রেমীর নাটকে —'' শ্রী হরিকৃষ্ণ প্রেমী ইস প্রভাব সে সবসে অধিক প্রভাবিত হুয়ে''।[২৯] মধ্যযুগের পটভূমি গ্রহণ, হিন্দী মুসলমান ঐক্য প্রয়াস, জাতীয়তাবোধের প্রকাশ, কাব্যময় ভাষারীতি প্রভৃতিতে দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি গ্রহণ করেছেন। আধুনিক কালের নাট্যকার ডঃ রামকুমার বর্মার 'ঔরঙ্গজেব কী আখিরী রাত' একাংকের ওপর শাহজাহানের গভীর প্রভাব আছে। আজও দ্বিজেন্দ্রলাল অপরাজেয়। নাটক ও অভিনয় দুক্ষেত্রেই তিনি প্রবল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অভিনয় করে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক এবং বিভিন্ন বৎসরে তাঁর প্রায় সব নাটকই অভিনীত হয়েছে। অন্য কোন হিন্দী নাট্যকারদের কাছে এই সৌভাগ্য পরম কাম্য। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য নাট্য সমারোহ উপলক্ষে রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় অনুদিত বিলায়ত জাফরী নির্দেশিত 'শাজাহান' নাটক ১৯৮৭এ মঞ্চস্থ হয়ে আলোড়ন ফেলে। আজও দ্বিজেন্দ্রলাল নিয়মিত মঞ্চস্থ হন।

(৪) রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী নাটক

অ. ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিন্দী নাট্যসাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় লিখেছেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণই ভারতীয়। ভারতবর্ষের চেতনা তাঁর মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। সংস্কৃতের সম্মানীয়া দুহিতা হিন্দী সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার সহোদরা বাংলায় অন্তর-বাহিরের এক গভীরতম সম্পর্ক আছে। রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যও তাই হিন্দীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকই হিন্দীতে অগণিতবার অনূদিত হয়েছে, হিন্দী নাট্যসাহিত্যের ওপর তাঁর প্রবল প্রভাব ও আন্তরিক অনুপ্রেরণা আছে, এবং হিন্দী মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটক পেয়েছে সম্মানের আসন। হিন্দী ও বাংলার আত্মার বন্ধন রবীন্দ্রনাথের নাটককে অবলম্বন করে সুদৃঢ়, উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

আ. রবীন্দ্রনাটকের হিন্দী অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের সব নাটকই হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন নাটক হিন্দীতে আট দশবারও অনূদিত হয়েছে। যতদূর জানা যায় অন্যান্য ভাষার মধ্যে হিন্দীতেই রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রথম অনুবাদ করা হয়। গোপালরাম গহমরী ১৮৯৫ সালে 'চিত্রাঙ্গদা' অনুবাদ করেন যা ভারতীয় ভাষায় সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাটকের অনুবাদ। রবীন্দ্রনাট্যানুবাদে বিশেষ উল্লেখ্য শ্রদ্ধেয় ধন্য কুমার জৈন এর নাম যিনি আঠাশ খন্ডে প্রধান রবীন্দ্র সাহিত্য অনুবাদ করেন যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাটকও ছিল। রাজেশ দীক্ষিত, ওমপ্রকাশ গুপ্ত, জ্বালাপ্রসাদ কেশব, শংকরদেব বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

হিন্দীতে রবীন্দ্র অনূদিত নাটকের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

অচলায়তন যা বিপ্লব	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়	১৯২৫
অরূপরতন	রাজেশ দীক্ষিত	১৯৬১
বিসর্জন	ক) মুরারদাস আগরওয়াল	১৯২৪
	খ) গোপেশ্বর মেহরা	১৯২২
	গ) নিরজা	১৯২৪
	ঘ) রামচন্দ্র শুক্ল	১৯২৪
	ঙ) ভারতীয় প্রকাশন মন্ডল	
	চ) ধন্যকুমার জৈন	
	ছ) পি. সি. ওঝা	১৯৬৬
	জ) ওমপ্রকাশ গুপ্ত	১৯৫৭
বাঁসুরী	ক) ধন্যকুমার জৈন	
	খ) রাজেশ দীক্ষিত	১৯৬৪
	গ) জ্বালাপ্রসাদ কেশর	১৯৬১
	ঘ) সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার	
বিদায় অভিশাপ	ক) রাজেশ দীক্ষিত	১৯৬৬
	খ) শংকরদেব বিদ্যালঙ্কার	১৯৬২
বাল্মীকি প্রতিভা	রাজেশ দীক্ষিত	১৯৬৬

ব্যঙ্গ কৌতুক	ক) মহাদেব সাহা	১৯৫৬
	খ) এলাহাবাদ ইন্ডিয়ান প্রেস	১৯২৪
বৈকুণ্ঠেব খাতা	ক) ধন্যকুমাব জৈন	
	খ) ওম প্রকাশ গুপ্ত	১৯৫৭
গোবা	জীবনলাল গুপ্ত	
চণ্ডালিকা	ক) বামচন্দ্র শ্রীবাস্তব	১৯৪০
	খ) রাধেশ্যাম পুবোহিত	১৯৫৬
	গ) রাজেশ দীক্ষিত	১৯৪৬
চিত্রাঙ্গদা	ক) গোপালরাম গহমবি	১৮৯৫
	খ) নববত্ন	১৯০৯
	গ) গিবিধব শর্মা	১৯১৯
	ঘ) মুন্সী আজমেরি	১৯২৮
	ঙ) রাজেশ দীক্ষিত	১৯৫৬
	চ) শ্যামসুন্দর খত্রী	
	ছ) শংকরদেব বিদ্যালঙ্কাব	১৯৬২
	জ) ওমপ্রকাশ গুপ্ত	১৯৫৭
চিবকুমার সভা	ক) নাথুরাম প্রেমী বোম্বাই	১৯২৮
	খ) রাজেশ দীক্ষিত	১৯৬২
	গ) ভাবতভূষণ অগ্রবাল	১৯৬১
ডাকঘব	ক) রামচন্দ্র ও প্রভাসচন্দ্র নন্দী	১৯২০
	খ) নযন দত্ত সহগল এন্ড সন্স	১৯৪৯
	গ) রাধেশ্যাম পুবোহিত	১৯৫৮
	ঘ) বাজেশ দীক্ষিত	১৯৬১
	ঙ) শ্যাসুন্দর খত্রী	
গান্ধাবীর আবেদন	ক) ধন্যকুমাব জৈন	
	খ) শংকরদেব বিদ্যালঙ্কার	১৯৬২
হাস্যকৌতুক	রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়	
কর্ণ কুন্তী-সংবাদ	ক) ধন্যকুমাব জৈন	
	খ) শ্যামসুন্দর খত্রী	
	গ) ওমপ্রকাশ গুপ্ত	১৯৫৭
	ঘ) শংকবদেব বিদ্যালঙ্কার	
কালেব যাত্রা	ধন্যকুমার জৈন	
কালমৃগযা	রাজেশ দীক্ষিত	
কাবুলিওয়ালা	বিষ্ণু প্রভাকর	
লক্ষ্মীব পরীক্ষা	শ্যামসুন্দর খত্রী	
মুক্তধাবা	ক) ধর্মেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী	১৯২৫
	খ) রামচরণ	১৯২৫
	গ) রাজেশ দীক্ষিত	১৯৬৪
	ঘ) ওমপ্রকাশ গুপ্ত	১৯৫৭
	ঙ) ধন্যকুমার জৈন	

মুকুট	ক) জনার্দন ঝা	১৯২২
নটীর পূজা	ক) ভগবতীপ্রসাদ চন্দোলা	১৯৩৯
	খ) আগ্রা সাহিত্য রত্ন ভান্ডার	১৯৫৩
	গ) রাজেশ দীক্ষিত	১৯৬২
	ঘ) শ্যামসুন্দর খত্রী	
প্রকৃতির প্রতিশোধ	ক) ধন্যকুমার জৈন	
	খ) সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার	
ফাল্গুনী	রাজেশ দীক্ষিত	১৯৬৪
রক্তকরবী	ক) রাজেশ দীক্ষিত	১৯৫৮
	খ) হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী	১৯৫৮
	গ) জ্বালাপ্রসাদ কেশব	১৯৬১
রাজা	ক) রাজেশ দীক্ষিত	
	খ) এস. এইচ বাৎস্যায়ন	১৯৬৬
রাজা ও রানী	ক) মুরারীদাস অগ্রবাল	১৯২৬
	খ) রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়	১৯৩৩
	গ) ওমপ্রকাশ গুপ্ত	১৯৫৭
শারদোৎসব	রাজেশ দীক্ষিত	
শ্যামা	রাজেশ দীক্ষিত	১৯৬৬
তপতী	ধন্য কুমার জৈন	
তপস্বিনী	রাজেশ দীক্ষিত	
তাসের দেশ	ভারতভূষণ অগ্রবাল	

ই. হিন্দী নাটকে রবীন্দ্র প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ হিন্দী নাট্যসাহিত্যকে প্রভাবিত ও অনুপ্রণিত করেছেন গভীরভাবে। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাব ও বিষয় তার ভাবনায় এনেছে নিবিড় ছায়া, রবীন্দ্র নাটকের আঙ্গিক হিন্দীনাটকের শিল্পরূপকে আরো সমৃদ্ধ ও বিকশিত করেছে। প্রতীকী বা রূপকধর্মী নাটক, ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের নবীন প্রকাশ, প্রকৃতি চেতনা ইত্যাদি রবীন্দ্রনাটকের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলো হিন্দী নাট্যসাহিত্যে গৃহীত হয়েছে; অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য, গীতিময়তা, গীতি ও নৃত্যনাট্য, সংলাপ শৈলী, ব্যঞ্জনাঢ্য ভাষা ইত্যাদি হিন্দী নাট্যসাহিত্যেকে করেছে অনুপ্রাণিত। জয়শংকর প্রসাদ, মৈথিলীশরণ গুপ্ত, সুমিত্রানন্দন পন্ত, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা, সিয়ারামশরণ গুপ্ত, ভগবতীচরণ বর্মা, জানকীবল্লভ শাস্ত্রী, রামকুমার বর্মা, রামধরী সিংহ দিনকর, হংসকুমার তিওয়ারী, উদয়শংকর ভট্ট প্রমুখ খ্যাতিমান স্রষ্টারা বিভিন্ন ভাবে রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। হিন্দী প্রতীক নাটকের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। "রবীন্দ্রনাথ টেগোর কে 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী'কে হিন্দী অনুবাদ সে হিন্দীমে প্রতীক-নাটকো কী শৈলী পর প্রভাব পড়া।"[৩০] সমালোচক বলেছেন যে হিন্দী প্রতীক নাট্যরূপে পাশ্চাত্য লেখকের প্রেরণা থাকলেও 'ইস ক্ষেত্র মে হিন্দীনাট্যকারোঁ পর সবসে অধিক প্রভাব রবীন্দ্রনাথ টেগোর কা পড়া।"[৩১] জয়শংকর প্রসাদের 'এক ঘুঁট', 'কমলা', 'করুণালয়', সুমিত্রানন্দন পন্ত-এর 'জ্যোৎস্না' 'রজত শিখর', মৈথিলীশরণ গুপ্তর 'অনঘ',

নিরালা র 'পঞ্চবটী প্রসঙ্গ', জানকীবল্লভ শাস্ত্রীর 'বাসন্তী' প্রভৃতি নাটকের কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনার প্রভাব আছে হিন্দী নাট্যসাহিত্যে। এক্ষেত্রে সুমিত্রানন্দন পন্থ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর কাব্যনাটক 'জ্যোৎস্না', 'রজত শিখর' প্রভৃতিতে এই প্রভাব স্পষ্ট। ছটি কাব্যনাটিকার সংকলন 'রজত শিখর' এর 'শরদ চেতনা' প্রকৃতিসৌন্দর্যের কল্পনাপ্রধান রূপক। হেমন্ত শীত বসন্ত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু শরতকে অভিবাদন করে যে পৃথিবীতে এসে সুখশান্তি বিকশিত করে দেয়। প্রকৃতির ভাব ও রূপ দুক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। যেমন গ্রীষ্মের গান —

তরুণ তপন বীর,
উগ্ররূপ, প্রচন্ড ত্রিনয়ণ সা
নিদাঘ গভীর।
ধূলি সে ধূসর জটা ঘন
মৌন বচন, মুদে বিলোচন,
রুদ্ধ শ্বাস, সুখদ তৃণাসন
বস্ত্র বিরত শরীর।
রুদ্র চক্ষু করাল অম্বর ....।

এ ছাড়া আকাশের গানে আছে 'নিঃস্বর চরণা।'
বর্ষার গানে আছে 'নীলাঞ্জন নয়না'।

'রজত শিখর' কাব্য নাটিকায় রূপকের মাধ্যমে জীবনের উর্ধ্বায়ন এবং পার্থিব ক্ষেত্রে সঞ্চরণের দ্বন্দ্ব, এবং দুয়ের সমন্বয়। এর ভাব ও ভাষা রবীন্দ্রনাথকে মনে করায়। এর 'নিঃস্বর নুপুর বজা', 'তড়িত চকিত' প্রভৃতি উল্লেখ্য। 'উত্তর শতী' কাব্য নাটকে দেখানো হয়েছে সভ্যতার ইতিহাসে বিশ শতকের ভূমিকা—প্রথমে সংঘর্ষ সংগ্রাম, পরে সমন্বয়। এতে আছে—

দক্ষিণ কর পীযুষ পাত্র স্মিত
বাম হস্ত বিষ জ্বাল বিকম্পিত — যা রবীন্দ্রনাথেরই অনুরূপ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবন তার মহিমা মর্যাদা দ্বন্দ্ব সংক্ষোভ নিয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায়। রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন কাব্য নাটিকা বা সংলাপ ধর্মী কাব্য বা গীতি নাটিকা। হিন্দীতে তার প্রভাব আছে। "রবীন্দ্রনাথকে 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'বিদায় অভিশাপ' মে দীর্ঘ বার্তালাপ রামায়ণ, মহাভারত এবং স্বতন্ত্র কথানকো কে আধার পর রচে হ্যয়। নিরালজী কী 'পঞ্চবটী প্রসঙ্গ', পন্ত কী 'জ্যোৎস্না', প্রসাদ কী 'করুণালয়', উদয়শংকর ভট্ট কী 'মৎস্যগন্ধ্যা', ভগবতীচরণ বর্মা কী 'তারা', সিয়ারামশরণ গুপ্ত কী 'কৃষ্ণা' উসী গীতিনাট্য পরম্পরা মে আতী হ্যয়।"[৩২]

হংসকুমার তিওয়ারীর এক দৃশ্যের নাটক 'কচ-দেবযানী' রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর সংগীত রূপক 'মিলন যামিনীর' অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার'। রামধারী সিংহ দিনকর-এর 'রশ্মি রথী' সাত সর্গের নাট্যধর্মী কাব্য — কর্ণের জীবন নিয়ে লেখা। এর পঞ্চম সর্গ কর্ণ ও কুন্তীর কথা ঃ বক্তব্য, রীতি, প্রকীশভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' এর মত, এবং সর্গটিও যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম উর্মিলা চরিত্রের বেদনা [illegible] কথা [illegible] কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধে। পৃথ্বীনাথ শর্মার উর্মিলা [illegible] উর্মিলা অনিবার্যভাবে স্মরণ করায় রবীন্দ্রনাথকে। [illegible] ভূমিকায় লিখেছেন কাব্যের উপেক্ষিতা র "উর্মিলা [illegible] প্রয়াস কিয়া। লক্ষ্মণ কে বিয়োগ মে পরিত্যক্তা উর্মিলা নে কিস সংযম [illegible] সাথ ১৪ বর্ষ কা লম্বা অবধি কো কাটা তথা অপনে অপূর্ব [illegible] কা মুগ্ধ করনে বালা যহী 'উর্মিলা' কা বিষয় হ্যয়।

রবীন্দ্রনাথের দুই নারী [illegible] হিন্দী নাটকে [illegible] 'পঞ্চবটী প্রসঙ্গ' কাব্যনাটিকায় লিখলেন --

দেব দানবো নে মিল
মথকর সমন্দর কো নিকালে থে চৌদহ রত্ন
সুনতী হুঁ
রম্ভা ঔর রমা ইযে দো নারিয়োঁ ভী নিকলী থী

এবং সেই কামনাময়ী নারীকে দেখে ছুট যাতা ধ্যান ঋষি মুনিয়ো কা।

রবীন্দ্রনাথের আঙ্গিক প্রভাব বিস্তার করেছে হিন্দী নাটকের ওপর আধুনিক অর্থে যাকে প্রথম একাঙ্ক (প্রসাদের 'এক ঘূঁট') বলে সমালোচক মনে করেন তার ওপর রবীন্দ্র প্রভাব আছে। "এক ঘূঁট হিন্দী কা পহলা একাংকী হ্যয় জিসকী সৃজন প্রেরণা রবীন্দ্র সে গ্রহণ কী গঈ"[৩৩]।

হিন্দীতে গীতিনাট্যের প্রবর্তন রবীন্দ্র প্রেরণাতেই হয়। "রবীন্দ্র সে অনুপ্রাণিত হোকর প্রসাদ নে 'করুণালয়' দ্বারা হিন্দী গীতি নাট্য পরম্পরা কা প্রবর্তন কিয়া। বাস্তব মে ইস ধারা কো উদয়শংকর ভট্ট নে সমৃদ্ধ কিয়া, উনহে ইস ক্ষেত্র মে অসাধারণ সফলতা এবং প্রসিদ্ধি মিলি।"[৩৪] নিরালার 'পঞ্চবটী প্রসঙ্গ' পন্থের 'জ্যোৎস্না', ভগবতীচরণ বমার 'তারা', সিয়ারামশরণের 'কৃষত্র' প্রভৃতি যে 'উসী গীতিনাট্য পরম্পরা কে অন্তর্গত হ্যয়', সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

সংলাপরীতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে হিন্দী নাটকে। যেমন -

দুর্যোধন — প্রণমি চরণে তাত।
ধৃতরাষ্ট্র -- ওরে দুরাশয়
অভিষ্ট হয়েছে সিদ্ধ?
দুর্যোধন — লভিয়াছি জয়।
ধৃতরাষ্ট্র — এখন হয়েছে সুখী?
দুর্যোধন — হয়েছি বিজয়ী।

সমালোচক লিখছেন, "রবীন্দ্রনাথ কী উপর্যুক্ত শৈলী সে প্রভাবিত হোকর উসীকে অনুকরণ পর আধুনিক হিন্দী কাব্য মে ইস প্রকার কী শৈলী মে অনেক কবিতায়েঁ দেখী জাতী হ্যয়। হরিশ্চন্দ্র এবং শৈব্যা কা শ্মশান কা বার্তালাপ দ্রষ্টব্য হ্যয় --

হরিশ্চন্দ্র — শৈব্যে! শৈব্যে!!
শৈব্যা — নাথ হুয়া কেয়া
হরিশ্চন্দ্র — রোহিত নে ভী ছোড় দিয়া
হম দুর্দৈব পীড়িতো সে কেয়া উসনে ভী মুহ
মোড় লিয়া।"[৩৫]

বালকৃষ্ণ শর্মা নবীন (এক কহানী — কঙ্কুম নবীন), রামকুমার বর্মা (একলব্য) প্রমুখের নাটকে এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের প্রভাব হিন্দীতে আছে। কবির নাট্যকাব্য 'গান্ধারীর আবেদন' এর ছন্দ ও ভাব হিন্দী নাট্যধর্মী কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দিন —' ইত্যাদি।

মৈথিলীশরণ গুপ্ত লিখছেন —

'যদি ধন মাগে এক কার্পটিক ঠিক হ্যায়,
দে দো কুছ, ধন সে বড়া হ্যায় মূল্য জন কা'। ইত্যাদি (সিদ্ধরাজ)।

সিয়ারামশরণ গুপ্তের 'দূর্বাদল', নিরালার 'ছত্রপতি শিবাজী কা পত্র' ইত্যাদিতেও এইরূপ দেখতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতময় প্রকাশভঙ্গী হিন্দী কবিতা ও নাটকের রূপকে প্রভাবিত করেছে। "রবীন্দ্র কে গীতোঁকী তাল-বিদ্যা সে হিন্দী কে আধুনিক অধিকাংশ কবি প্রভাবিত হুয়ে। কুছ কবিয়োঁ নে তো তালকে সাথ রাগিনী তক কা পাল্লা পকড়া"।[৩৬] জয়শংকর প্রসাদের নাটকে রাগের নাম নির্দেশ, তালবদ্ধ গীতের রূপ, নোটেশন দেওয়া রবীন্দ্র প্রভাবেই হয়েছে। সুমিত্রানন্দন পন্তের 'জ্যোৎস্না' কাব্যনাটকেও এর প্রভাব আছে। যেমন নীচের গান চৌতালে সুন্দর গাওয়া যায়—

জগ জীবন নিত নব নব
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ উৎসব।
জীবন শাশ্বত বসন্ত
অগণিত কলি কুসুম বৃন্ত। (জ্যোৎস্না, দৃশ্য তিন)
বা
রজত কিরণ রজত কিরণ
পুলকিত তল, চপল চরণ!
তড়িত চকিত চল চিত বন,
তুহিন শুভ্র স্মিতি বিতরণ। (জ্যোৎস্না, দৃশ্য দুই)

নীচের পংক্তিগুলো দাদরায় সুন্দর গাওয়া যায় —

অলস পলক সঘন অলক,
শ্যামল ছবি ছায়া।
স্বপ্নিল মন তন্দ্রিত তল,
শিথিল বসন ভায়া (জ্যোৎস্না, দৃশ্য তিন)

শুধু সুর বা তালের সঙ্গেই নয়, ভাষার দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এদের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

রবীন্দ্র নাটকের দৃশ্যান্তর অনেক সময় বোঝানো হয়েছে স্থানের নামকরণ দ্বারা। যেমন অচলায়তন নাটকে আছে অচলায়তনের গৃহ, পাহাড়, মাঠ, দর্ভক পল্লী ইত্যাদি। মৈথিলীশরণের নাটক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। "গুপ্তজী নে 'অনঘ' কো দৃশ্য মে ন বিভাজিত কর রবীন্দ্রনাথ টেগোর কে 'অচলায়তন' কী শৈলী পর স্থানো কে নামানুসার নির্দিষ্ট কিয়া হ্যায়। দৃশ্যো কে নাম হ্যায় — অরণ্য, চৌপাল, উদ্যান, বটচ্ছায়া, মঘ কা ঘর, চবুতরা"[৩৭] ইত্যাদি। সিয়ারামশরণ গুপ্তের 'উন্মুক্ত' গীতিনাট্যের স্থান তথা দৃশ্য নির্দেশও এইরকম।

ঈ. হিন্দীতে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় ঃ

রবীন্দ্রনাথের কত নাটক কতবার হিন্দীতে অভিনীত হয়েছে তার পরিমাপ কেউ করেনি তবে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষেই তার নাটকগুলি মঞ্চে উপস্থাপিত হয় এবং পরবর্তীকালে হিন্দীতে রবীন্দ্র নাট্যপ্রযোজনার মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অপেশাদারী নাট্য সংস্থা যেমন রবীন্দ্রনাটক রূপায়িত করে, তেমনি পেশাদারী ভাবেও এর প্রযোজনা হয়েছে অনেক। হিন্দীতে রবীন্দ্র নাটক কেবল বাংলায় বা ভারতে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাদৃত হয়েছে। কিছু রবীন্দ্র প্রযোজনার উল্লেখ করা হল।

দিল্লীর আই পি টি এ প্রযোজনা করে 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে গণনাট্য সংঘের এই প্রযোজনায় অবশ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক বোধই বড় হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন জায়গায় এর অভিনয় হয়। সাতের দশকে (১৯৭৬) 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করে বোম্বের 'নাট্যশিল্পী'। পরিচালনায় ছিলেন সুদর্শন শর্মা যিনি অধ্যাপকের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন। রাকা ভাদুড়ী নন্দিনীর রূপায়ণে দক্ষতা দেখান।

রবীন্দ্রনাথের ১২৫ জন্ম জয়ন্তীতে 'রক্তকরবী' অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন 'সঙ্গীত কলা মন্দির'। পরিচালনায় ছিলেন কুমার রায়। রাজার ভূমিকায় প্রতাপ জয়সয়াল ও নন্দিনীর ভূমিকায় উমা মেহতা বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তাঁরাই নাটককে চরম সিদ্ধির পথে নিয়ে যান। বিশুর চরিত্রে অশোক সিং দর্শকের মর্মস্পর্শ করেন। একটি পত্রিকার মতামত এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় –

''সঙ্গীত কলা মন্দির-এর 'লাল কনের' অর্থাৎ রক্তকরবী একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। হিন্দিতে নাটকটি মূলানুগ অনুবাদ করেছেন হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী, পরিচালনায় দায়িত্বে ছিলেন কুমার রায়, সঙ্গীত নির্দেশক সুভাষ চৌধুরী। সম্প্রতি এটি মঞ্চস্থ হয় কলামন্দিরে। নাটকের প্রধান সম্পদ অভিনয়। প্রতাপ জয়সয়ালের গম্ভীর আবেগময় কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠেছিল নেপথ্যচারী রাজার অন্তর্লোক যা কখনো নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর, কখনো কোমল বিষণ্ণ। উমা মেহতা যক্ষপুরীর নন্দিনীর মতই নাটকে এনেছেন প্রাণের প্রাবল্য, আলোর উজ্জ্বলতা। উমার অভিনয় নাটকে একটা ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে। বন্ধু শর্মা জোরালো তীব্র কণ্ঠস্বরে ক্রূর নির্মম সর্দারকে তুলে ধরেন। অশোক সিং-এর বিশুর কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত মনকে ছুঁয়ে যায় যদিও তাঁর অভিনয় রীতিতে কিছুটা ফিল্মী নায়কের ছাপ এসে গেছে। অরুণ মিত্রর অধ্যাপক যথাযথ। মুখিয়া চরিত্রের খলতা কপটতা রমাশংকর ধরে সুন্দর ফুটিয়েছেন. তবে তাঁর ভঙ্গীতে কিছুটা একঘেয়েমি এনেছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন হরিশংকর দাস, ইন্দ্রা কোঠারী, রাজকুমার জৈন, আশুতোষ সিংহ, বিজয় জোশী, কৈলাশ শর্মা, সুন্দর ঝা প্রমুখ''।[৩৮]

এলাহাবাদ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপন সমিতির উদ্যোগে বেশ কটি রবীন্দ্র নাটক প্রযোজিত হয় তার মধ্যে দুটি ছিল হিন্দীতে — 'পুরস্কার' (ব্যালে) ও 'তাস নগরী'। দুটি নাটকই অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়। পরিচালনায় ছিলেন অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' হিন্দীতে উপস্থাপিত করে দুঃসাহসের পরিচয় দেন প্রয়াগ রঙ্গ মঞ্চ। নাট্যরূপ দেন জীবনলাল গুপ্ত। পরিচালনায় ছিলেন সত্যব্রত সিনহা যিনি গোরার ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। এলাহাবাদ মঞ্চের বিশিষ্ট শিল্পী দেশী সেঠী চমৎকার রূপায়িত করেন আনন্দময়ীকে। জীবনলাল গুপ্ত (বিনয়), রামচন্দ্র গুপ্ত (কৃষ্ণ দয়াল), ডি. এস.

[illegible] (পারেখ নাথ) [illegible] সেন (সুচরিতা) সুনীতি ওবেবয় (ললিতা) প্রমুখ সকল [illegible] [illegible] অভিনয় হয়েছে

[illegible] নামে নাটকায়িত করেন কমলেশ্বব। ১৯৬১ তে এটি [illegible] সঙ্গে যুক্ত [illegible] থিযেটাব গ্রুপ দিল্লী। পবিচালনায ছিলেন শিবেন্দ্র সিনহা [illegible] সুন্দর অভিনয করেন বাজেশ্বব নাথ ও প্রতিমা বৈষ্ণব [illegible] সংঘাতময গভীর ভাবদ্যোতিক নাটকেব রূপায়ণে [illegible] পবিচয দিয়েছেন শিল্পীরা।

নাট্যটি দিল্লী দূরদর্শন থেকেও সম্প্রসাবিত হয ১৯৭১ সালে। দিল্লী দূবদর্শন থেকে সম্প্রসাবিত হয়েছে হিন্দীতে ববীন্দ্রনাটক বেশ কিছু। ১৯৬৭ তে 'গুপ্তধন' 'বাসমণিব ছেলে (বাসমণি কা বেটা), দৃষ্টিদান' খ্যাতি পায।

বোম্বাই এব লিটল ব্যালে ট্রুপ উপস্থাপিত কবেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' ১৯৬১ব নভেম্বব এ। সমালোচক বলেছেন – ক্ষুধিত পাষাণেব এক মুহূর্তও নীবস মনে হয না, দৃশ্যেব পব দৃশ্য দ্রুত পবিবর্তিত হয, সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায ভাবনা ও মানসিকতা, প্রেতায়িত মূর্তি ও বহু পূর্বেই মৃত নবনাবীবা ঘুবে বেড়ায পবিত্যক্ত ও নির্জন প্রাসাদে অতীত [illegible] ঐশ্বর্যসমাবোহ প্রেমপ্রীতি যন্ত্রনাদাহ নিয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সাজসজ্জা বৈচিত্রময ও চমৎকাব হলেও সর্বত্র যথাযথ হযনি, সঙ্গীত পবিচালক কৃতিত্বেব পবিচয দিয়েছেন। সামান্য কিছু পবিবর্তন কবে নিলে শ্রীমতী ওলবর্ধন এই গল্পটিকে আধুনিক উচ্চমানেব ব্যালেতে পবিণত কবতে পাববেন।"[৩৯]

ববীন্দ্রনাথেব ১২৫ জন্মবর্ষে দিল্লীতে সঙ্গীত নাটক অকাডেমী ববীন্দ্র নাট্যোৎসবেব আযোজন কবে (৮ ১৬ মে, ১৯৮৭) সেখানে কলকাতাব সংস্কৃতি সাগব হিন্দীতে উপস্থাপিত কবে "ক্ষুধিত পাষাণ" শ্যামানন্দ জালানেব পবিচালনায। নাটক অনুবাদ কবেছেন কৌশিক দত্ত শর্মা। নাটকে নাচেব সুন্দব প্রযোগ আছে, ববীন্দ্রনাথেব বিভিন্ন কবিতাও ব্যবহৃত হযেছে। ভাল অভিনয কবেছেন শ্যামানন্দ জালান, বাজাবাম যাজ্ঞিক প্রমুখ। অরুণ শর্মাব কবিতা পাঠও সুন্দব। দেবযানী চৌধুবী ও অনিল সাহাব সেট এবং তাপস সেনেব আলো বহস্যময প্রাসাদেব অলৌকিক পবিবেশ নির্মাণে সহাযক হয। তবে অনুবাদেব ত্রুটি কথকেব অতি ব্যবহাব সূত্রধাবেব বাবংবাব উপস্থিতি প্রভৃতি নাটককে যথার্থ শিল্পবসোত্তীর্ণ কবাব পথে কিছুটা বাধাব সৃষ্টি কবেছে বলে মনে কবেন নেমিচাঁদ জৈন অলকা বঘুবংশী প্রমুখ সমালোচক।[৪০]

'কাবুলিওযালা'ব একাধিক অভিনয় হয। ১৯৬১ ব আগেই বোম্বেব জুহু আর্টস থিযেটাব উপস্থাপিত কবেন এই নাটকটি। বলবাজ সাহনী কাবুলিওযালাব ভূমিকায় অভিনয কবে বিশেষ সম্মান অর্জন কবেন। ১৯৭৭এ সুলতানপুবে এই নাটক অভিনীত হয় ডঃ বমাকান্ত বর্মাব নির্দেশনায নৃত্যনাট্য রূপে। নিশি (কাবুলিওযালা), দিব্যা (মিনি), প্রতিভা (সহেলী ও বুডি নানী) প্রমুখ সুন্দব অভিনয কবেন। নৃত্য নির্দেশক শোভা বর্মা।

ববীন্দ্র জন্মশতবর্ষে কলিকাতাব বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা 'অনামিকা' পবিবেশন কবেন 'ঘব ঔব বহাব'। ববীন্দ্রনাথেব 'ঘবে বাইবে' উপন্যাসকে হিন্দীতে সুন্দব নাট্যরূপ দেন প্রতিভা অগ্রওযাল। আত্মকথন ও বর্ণনামূলক এই কাহিনী দ্বন্দ্বে উৎকণ্ঠায গতিতে এবং চবিত্রেব যথাযথ প্রকাশে সার্থক মঞ্চোপযোগী কবেছেন শ্রীমতী অগ্রবাল যিনি বিমলাব ভূমিকায উচ্চমানেব অভিনয়ও কবেন। নিখিলেশকে রূপ দেন বদ্রীপ্রসাদ তেওযাবী। সন্দীপ কবেন শ্যামানন্দ জালান যিনি নাটকটি পবিচালনা কবেন। কলকাতা ও দিল্লীতে এই নাটকেব মঞ্চাযন বিশেষ খ্যাতি পায়।

'মুক্তধারা' অনুবাদ করেছেন কবি ভারতভূষণ অগ্রবাল। ১৯৭৭এ এর অভিনয় হয় ভূপালে ও অন্যান্য স্থানে। পরিচালনায় ছিলেন [illegible] প্রযোজক [illegible]। শিল্পী অভিনয়ে অংশ নেন সুভাষ গুপ্ত (বিভূতি) [illegible] (ধনঞ্জয়) [illegible] (অভিজিৎ) বেদপ্রকাশ (অধ্যাপক)। এই প্রযোজনা [illegible] সমাদৃত হয়।

মধ্যপ্রদেশ কলা পরিষদ এবং সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিভাগ দ্বারা আয়োজিত রঙ্গ প্রশিক্ষণ শিবির দ্বারা উপস্থাপিত হয় 'মুক্তধারা'। নির্দেশক [illegible] কৌল।

'চণ্ডালিকা' বিভিন্ন সংস্থা অভিনয় করেছে বিভিন্ন স্থানে। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নৃত্যশিল্পী বৈজয়ন্তীমালা এটি মঞ্চস্থ করেন। কলকাতার রবীন্দ্র সদনে 'চণ্ডালিকা' অভিনীত হয়। সমালোচকের মতামত উল্লেখ্য — 'বৈজয়ন্তীমালা প্রযোজনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা। অনুষ্ঠানের আগে এক সাংবাদিক বৈঠকে শিল্পী বলেছেন — চণ্ডালিকা প্রযোজনার স্বপ্ন তার অনেকদিনের এবং দীর্ঘ আড়াই বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম আছে এই প্রযোজনার পিছনে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শৃঙ্খলমুক্তিতেই রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব। আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রথাসিদ্ধ রূপায়ণে পণ্ডিত রবিশংকরের নৈপুণ্য। তাই বোধ হয়, যথাস্থানে রবিশংকরের আবহসঙ্গীত প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের মেজাজের সঙ্গে খাপ খায়নি। আবেগ মুহূর্তে সেতার ও বাঁশীতে বেহাগ, দরবারী, ভৈরবী প্রভৃতি রাগের ব্যবহার atmoshpere সৃষ্টি করলেও সমবেত লোকনৃত্যের এফেক্ট মিউজিক এফেক্ট আনতে পারেনি।

নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন বৈজয়ন্তীমালা — শিল্পী হিসাবে যাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ভারতনাট্যমের আঙ্গিক-এ তিনি নৃত্য পরিবেশন করেছেন। হৃদয় চাঞ্চল্য বোঝাতে দ্রুতলয়ে অথবা বেদনার মুহূর্তে বিলম্বিত লয়ে তিনি যখনই আবির্ভূত হয়েছেন তখনই দর্শক অভিভূত হয়েছে তাঁর নমনীয় দেহভঙ্গীমায়। কিন্তু লোকনৃত্যের আঙ্গিকে যখনই তাঁর সঙ্গীশিল্পীরা সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেছেন, তখনই দর্শকগণ বিরক্তি বোধ করেছেন।

নৃত্যনাট্যে আলোক নিয়ন্ত্রণের দাযিত্ব ছিল তাপস সেনের। তাঁর কাজ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।. এম আর আচরেকারের দৃশ্যসজ্জা শিল্প সম্মত।'[৪১]

লখনৌর ঝংকার 'চণ্ডালিকা'র সুন্দর মঞ্চায়ন করে ১৯৭১ সালে। প্রকৃতির ভূমিকায় ঋতু চ্যাটার্জী ও মা-র ভূমিকায় মঞ্জুলা চতুর্বেদীর নৃত্যাভিনয় সুন্দর। কেশব নারায়ণের আনন্দও বেশ ভাল। এ. নন্দী দইওয়ালা রূপে সজীব উচ্ছল যিনি পরিচালনায়ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

কলিকাতার 'সুরমন্দির' চণ্ডালিকা উপস্থাপিত করে দিল্লীতে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। রূপান্তর করেন হংসকুমার তেওয়ারী, নৃত্য পরিচালনায় বালকৃষ্ণ মেনন, সঙ্গীতে সন্তোষ সেনগুপ্ত যিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। দিল্লীর তালকাটোরা গার্ডেনের মুক্তমঞ্চে এর রূপায়ন সর্বজনবন্দিত হয়। পরবর্তীকালেও এর অভিনয় হয়েছে। ১৯৮৪ তে লখনৌতে এর মঞ্চায়নও বিশেষ সমাদৃত হয়। এর হিন্দী রেকর্ড বেরোয় ১৯৮৩ সালে।

দিল্লীর 'গীতাঞ্জলি' বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চণ্ডালিকার উপস্থাপনায় শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। প্রথম অভিনয় হয় ১৯৮২র ২৫শে বৈশাখ দিল্লীর কামানি অডিটোরিয়ামে। এই নাটক ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপিত হয়, তাছাড়া জার্মান, প্যারিস, লন্ডন, বার্মিংহাম প্রভৃতি স্থানেও এর মঞ্চায়ন ঘটে।

'শান্তিনিকেতনাঙ্গন' সংস্থা হিন্দীতে চণ্ডালিকা করে খ্যাত হয়েছেন বন্না সিংহ ও প্রসেনজিৎ সিংহের পরিচালনায়।

'তপতী'র অভিনয় করে দক্ষিণভারত হিন্দী প্রচার সভা ১৯৬৯ তে মাদরাজের রসিক রঞ্জনী সভা হলে।

গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য বিশেষ খ্যাতি পায়। পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমতী গিরীশ রস্তোগী ও শ্রীমতী শান্তি সিংহ। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় ছিলেন আশালতা গুপ্ত ও পুনম শ্রীবাস্তব যাদের "মর্মস্পর্শী অভিনয় কী স্মৃতি লোগোঁ কে মন মে অভী ভী বনী হুই হ্যয়।"[৪২]

দিল্লীর প্রখ্যাত সংস্থা 'উমঙ্গ' পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থের অন্তর্গত কাহিনীর নাট্যরূপ 'পুপুদি চান্দা মামা কে দেশ মে'। নাট্যরূপ যুগিত নওলপুরি, পরিচালনায় রেখা জৈন। একটি সুন্দর রুচিবান শিল্পসম্মত প্রযোজনা উপহার দেবার জন্য পরিচালিকা অবশ্যই সাধুবাদ পাবেন। পুপুদিকে নিয়ে রেখা জৈন আর একটি সুন্দর নাটক লিখেছেন "পুপু পরিয়োঁ কে দেশ মে'। রবীন্দ্র অবির্ভাবের ১২৫ বর্ষ স্মরণে মিহিজাম বিহারের প্রগতি কলা কেন্দ্র মঞ্চস্থ করে 'নিষ্কৃতি' কবিতার নাট্যরূপ। রচনা বংশী মুখোপাধ্যায়, অভিনয়ে অংশ নেন কে. বি. শর্মা, এস. মিশ্র, ভোলানাথ পাঠক, পি এন মূর্তি, দেবযানী মজুমদার, মলয়া সরকার প্রমুখ। কলকাতা ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার প্রযোজনায় 'চিত্রাঙ্গদা' একক রূপে উপস্থাপিত করেন শিখা শ্রীবাস্তব। ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনে 'রক্তকরবী' পরিবেশনায় দক্ষতা দেখান কলামন্দির-এর শিল্পীরা। 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' উপস্থাপিত করেন হিন্দী নাট্য সমিতির জি. এন. দাস ও বিভাবাণী। ভুবনেশ্বরে রবীন্দ্রনাট্য সম্মেলনে দীনেশ রায় মঞ্চস্থ করেন 'বিনি পয়সার ভোজ'।

দিল্লীর শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ হিন্দীতে 'শ্যামা' উপস্থাপিত করেন। লন্ডনে দি ট্যাগোরিয়ান সংস্থার উদ্যোগে এটি অভিনীত হয় ২৫ মে ১৯৮৬ লন্ডনে। পরিচালনায় ছিলেন যোগ সুন্দর।

রবীন্দ্র নাটক অনূদিত ও অভিনীত হয় বিপুল বৈভবে। আগেই বলা হয়েছে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে দিল্লী আই পি টি এ 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করে। তাদের মতে 'রক্তকরবী' একটি উচ্চমানের নাটক, যথার্থই এর বক্তব্য অনেক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এটা সংগ্রামের নাটক যে লড়াইয়ের পরিণামে সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের পতন হয় এবং বন্ধনমুক্ত শিকলছেঁড়া প্রাণের জয় ঘোষিত হয়। এই প্রযোজনা বিপুল আলোড়ন ফেলে। নাটকটি অনুবাদ করছেন দেবু চক্রবর্তী যিনি পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেন, সহ-পরিচালক ছিলেন পরেশ দাস। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন মহেন্দ্রানী (নন্দিনী), দেবু চক্রবর্তী/পরেশ দাস (রাজা), জেমিনী চৌবে—পরে দূরদর্শনের নিয়মিত শিল্পী (সর্দার), শকুন্তলা সাকসেনা — পরে দূরদর্শন ও মঞ্চের বিশিষ্ট শিল্পী (চন্দ্রা)। মোড়ল করেছিলেন ঘাসিরাম নামক এক আদর্শনিষ্ঠ মানুষ এক টাঙ্গাওয়ালা যিনি মীরাটে সারাদিন টাঙ্গা চালিয়ে সন্ধ্যাবেলায় দিল্লীতে এসে রিহার্সাল করতেন ও রাতে আবার মীরাটে ফিরতেন। 'রক্তকরবী' অভিনীত হয় দিল্লী আগ্রা ও অন্যান্য স্থানে।

ষাটের দশকেই আই পি টি এ করে 'খ্যাতি কি বিড়ম্বনা'। অনুবাদ করেন পরেশ দাস, এটিও বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয়। 'বৈকুণ্ঠ কা পোথা' (বৈকুণ্ঠের খাতা) অনুবাদ করেন পরেশ দাস ও ওম টিংরা; নাটকটি তৎকালীন লিঙ্ক রোডে অবস্থিত 'পন্থ হল'-এ অভিনীত হত। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে অভিনয় হয়। চলে প্রায় চার মাস।

বাল্মীকি বন্দ্যোপাধ্যায় নৃত্যগীতপারদর্শী এক বিশিষ্ট মানুষ যাঁর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে। হিন্দীতে রবীন্দ্রনাথ অনূদিত ও প্রযোজিত হচ্ছে বিপুল পরিমানে ও সারা দেশ জুড়ে। ছয়ের দশকেই দিল্লীর এন টি জি আলোড়ন ফেলে 'নষ্টনীড়' মঞ্চস্থ করে। উত্তরপ্রদেশ বায়বেরিলির পীযুষ ও শাস্ত্রীয় দ্বারা প্রস্তুত হয় 'ডাকঘর' যার নির্দেশনায় ছিলেন মমতা মালিক। অভিনয়ে ছিলেন রামকৃষ্ণ, মোনিকা দত্ত, মঞ্জু দত্ত, ভানু মুখার্জি, রাম দত্ত, শিবসাগর প্রমুখ। মধ্যপ্রদেশ কলা পরিষদ ও সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক কল্যাণ এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত রঙ্গ প্রশিক্ষণ দ্বারা প্রস্তুত হয় 'মুক্তধারা'। অনুবাদ করেছেন ভারতভূষণ আগরওয়াল, নির্দেশনায় দায়িত্বে ছিলেন বংশী কৌল। ১৯৭৬ এ এটি প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন জ্যোৎস্না বিনোদ দীক্ষিত, বিবেক দত্ত বা অজয় জৈন, সুধীর মিশ্র, প্রদীপ ... অবধূত অনিল সকসেনা, দয়াশংকর সিংহ প্রমুখ। বিবাদী দিল্লী 'গোরা' দুরূহ ... হলেও সাফল্য অর্জন করে। এর রূপান্তর করেছেন গীতাঞ্জলি শ্রী। ঘর ও বা'হর'ও হিন্দীতে রূপান্তর করেছেন গীতাঞ্জলি শ্রী। অনুরাধা কপুর এর পরিচালনায় কসৌলী আর্ট থিয়েটার দিল্লী এটি মঞ্চস্থ করে নয়ের দশকের গোড়ার দিকে। 'শাস্তি' গল্প ... নাটকে রূপান্তর করেন ত্রিপুরারী শর্মা এবং তার নির্দেশনায় কসৌলী আর্ট সেন্টার ... মঞ্চস্থ করে ১৯৯২ এ। অনামিকা হকসর পরিচালিত 'ডাকঘর' এক উল্লেখ্য প্রযোজনা। ভোপালের 'দোস্ত' সংস্থা অজ্ঞেয় অনূদিত 'রাজা' উপস্থাপিত করে ... নব্বই-এর ডিসেম্বরে। পরিচালক অলোক চ্যাটার্জী। লখনৌতে দীপশ্রী মোহন বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রনাটক হিন্দীতে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁদের সংস্থা 'গাতা চল' বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনায়। ১৯৮৪ সালে তারা করেন 'তাসের দেশ'। অনুবাদ করেছেন দীপশ্রী মোহন, উপস্থাপিত করেছেন ভারতেন্দু নাট্য অ্যাকাডেমি, পরিচালনায় ছিলেন রাজ বিসরিয়া ও যুগল কিশোর। ১৯৮৬ সালে প্রদর্শিত হয় 'বিসর্জন'। অমিত্রাক্ষরে অনুবাদ করেছেন দীপশ্রী মোহন এবং অভিনীত হয় রবীন্দ্রালয় ও লখনৌ সঙ্গীত নাটক একাডেমীর নাট্যোৎসবে। 'নটীর পূজা'ও শ্রীমতী দীপশ্রী অনুবাদ করেন এবং দিল্লীর কামানী রঙ্গমঞ্চে নৃত্যনাট্যরূপে মঞ্চস্থ হয় ১৯৮৯ সালে। 'বাসবদত্তা' তিনি রূপান্তর করেন এবং এটি অভিনীত হয় লখনৌ রবীন্দ্রালয়ে ১৯৯০ সালে। শ্রীমতী দীপশ্রী মোহন এর সব কটি রবীন্দ্র প্রযোজনাই মঞ্চে বিপুল সাফল্য অর্জন করে ও দর্শকমন্ডলী কর্তৃক অভিনন্দিত হয়।

এলাহাবাদে রবীন্দ্রনাটক হিন্দীতে প্রযোজিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। 'চারুলতা' নাট্যরূপে উপস্থাপিত হয় Three As (Allahabad Arts Association) এর উদ্যোগে। পরিচালক শরণবলী শ্রীবাস্তব। অজস্র মঞ্চায়ন হয়েছে এই নাটকের। এলাহাবাদে আরও কটি রবীন্দ্রনাটক প্রযোজিত হয়েছে।

এলাহাবাদের রূপকথা গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে 'ডাকঘর' ১৯৯১ সালে। অনুবাদ করেছেন অসীম মুখার্জি, পরিচালক পরিমল দত্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন অসীম মুখার্জি, সঞ্জীব কশালকর, জয়ন্ত ঘোষ, সুভাষ হেড, কল্যাণ ঘোষ, দেবী মালবীয়, অঞ্জন চ্যাটার্জি কুমারী শুভম ত্রিপাঠী প্রমুখ। প্রেরণা ছিলেন কল্যাণ ঘোষ। 'চিত্রা' মকরন্দ দেশপান্ডের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় ১৯৯৭ এ পৃথ্বী থিয়েটারে। এটা এক উল্লেখ্য প্রযোজনা। নাটকে চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় অভিনয় করেন সঞ্জনা কাপুর। সেট ও কসটিউমের দায়িত্ব পালন করেন অজয় মৈত্র। এরা কেবল নাটকের জন্যেই নাটক করেন নি, নাট্যকার ও নাটকের

গভীর ভাবনার কথা তারা বিশেষ ভাবে মনে করেছেন — Tagore's special inclination towards powerful female protagonists can hardly be refuted — in fact he was a feminist and wielded his pen to prove the centrality of the women's role. His heroes were often lacking in strength to achieve equality with the heroines পরিচালক আরও মনে করেন যে একশো বছর পরও চিত্রাঙ্গদার ভাবনা প্রাসঙ্গিক। The same issue have spring up new. Many a woman of to day might share the same predicament It is the great Indian war between purusha and prakriti. The play is essentially about sexuality or the way nature animates the male and female being" (Mid-day Mumbai 6.8.1997)

সম্প্রতি ২০০০-এ কলকাতায় অঞ্জনা শ্রীবাস্তব একক ভাবে পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথের 'সুয়োরাণীরে সাধ' গল্পের মৈত্রী দত্ত কৃত একক নাট্যরূপ। অনুবাদক শ্যামল গুপ্ত।

বিহার স্কুল অফ মিউজিক এন্ড ড্রামা-র রেপেরটরী কোম্পানী মজঃফরপুর শাখা রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি নাটক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করে হিন্দীতে। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী অনূদিত 'ডাকঘর' ড. মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৯-তে। মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যরূপায়িত ও পরিচালিত 'মালঞ্চ' (১৯৯২) বিশেষ খ্যাতি পায়। হাজারীপ্রসাদের অনূদিত 'রক্তকরবী' হয় উৎপল কুমারের পরিচালনায়, নন্দিনী করেন মুকুল। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের রাত্রি'কে হিন্দীতে অনুবাদ করেন উৎপল কুমার যার পরিচালনায় এটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৯৩ সালে। পরিবর্তিত নাম 'অন্তিম রাত্রি' যাতে অভিনয়ে অংশ নেন মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় (মামী), সুবীর রায় (যতীন), শিল্পা (মণি), মোনালিসা (সই), রমেশ রত্নাকর (ডাক্তার), রঞ্জিত কেশরী। সৌমেন বেরা (শ্বশুর), বিনোদ ভারতী/ভারতী রাজ (চাকর)। নাটকগুলি বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয় এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

জামশেদপুরের দীপক চট্টোপাধ্যায় এবং শশীরাজ যাদব রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নাট্যরূপায়ণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'কঙ্কাল' ও 'পোস্টমাস্টার'—রবীন্দ্রনাথের দুটি গল্প হিন্দীতে তাঁদের করা নাটক রূপে মঞ্চস্থ হয়েছে অর্চনা অভিনয় দ্বারা। দুটিই দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করে।

৫. শরৎচন্দ্র ও হিন্দী নাটক

হিন্দী সাহিত্যে শরৎচন্দ্র পেয়েছেন বিশেষ সম্মানের আসন। বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও হিন্দীভাষী মানুষের কাছে তাঁর আবেদন কম নয়। "আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের বই হিন্দীতে বাঙ্গলার চেয়ে বেশী বিক্রী হয়েছে", একথা জানিয়েছেন প্রখ্যাত হিন্দী লেখক মম্মথনাথ গুপ্ত।[৪৩] হিন্দী উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর, হিন্দী নাটকেও তা আছে বহুল পরিমাণে। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ নারীচরিত্রে চিত্রণে তাঁর অসামান্য সার্থকতা। "সাহিত্যে তিনি বেশ্যা ও কুলটাদের উচ্চস্থান দিয়ে তৎকালীন সামাজিক মূল্যবোধের সামনে বারবার প্রশ্নচিহ্ন রেখেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন সতীত্বই নারীত্ব নয়"।[৪৪] তাঁর সাহিত্যে নারীরা পেয়েছে নতুন মূল্য ও মর্যাদা। "শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রে যে আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিত্ব ত্যাগের মাধ্যামে সামাজিক অন্যায়গুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিশিখার মত জ্বলতে থাকে এবং উচ্চাঙ্গের শিল্পরুচির দ্যোতকরূপে প্রতিভাত হয়"[৪৫] তার প্রভাব পড়েছে হিন্দী সাহিত্যে। যৌথ পরিবারকে

ঠিকিয়ে রাখা, ভাই-ভাইয়ের ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করা, দেওর বৌদির পবিত্র সম্পর্ককে মহিমামণ্ডিত করা নীচুতলার মানুষকে মূল্য দেওয়া শরৎ সাহিত্যের এই সব ভাবনার ছাপও পড়েছে হিন্দী নাটকে।

হিন্দীতে শরৎ - নাটকের অনুবাদ

শরৎচন্দ্রের তাঁর উপন্যাসের যে তিনটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন নিজেই, সেগুলো হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। তার আরো কিছু রচনা হিন্দীতে নাট্যরূপ পেয়েছে। অনেক রূপান্তরিত নাটক অভিনীত হয়েছে কিন্তু তার সব মুদ্রিত হয়নি। শরৎচন্দ্রের অনূদিত নাটকের তালিকা দেওয়া হল

বিজয়া	ওমপ্রকাশ গুপ্ত	১৯৫৯
দেবদাস	ওঙ্কার শরদ	১৯৬২
দেবদাস	রামসিংহ আজাদ	১৯৭৫
হরিলক্ষ্মী (দূরদর্শন নাটক)	বিষ্ণু প্রভাকর	
রমা	ওমাপ্রকাশ গুপ্ত	১৯৫৯
ষোড়শী	ওমাপ্রকাশ গুপ্ত	১৯৫৯
ষোড়শী	ধন্য কুমার জৈন	
দেনা পাওনা	প্রতিভা অগ্রওয়াল	
সুনন্দা (শ্রীকান্ত ৩য় পর্বের এক ঘটনা নিয়ে)	বিষ্ণু প্রভাকর	১৯৭৭

হিন্দী নাটকে শরৎ-প্রভাব

শরৎ হিন্দী নাট্য সাহিত্যকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করেছেন। ভগবতী প্রসাদ বাজপেয়ীর নাটকের ওপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে — বিশেষ করে তাঁর নারীভাবনার ওপর। তাঁর 'ছলনা' (১৯৩৯) নাটক এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। নাটকের নামকরণ হয়েছে নায়িকা ছলনার নামে, শরৎচন্দ্রের 'শুভদা' উপন্যাসেরও বিশিষ্ট নারী চরিত্র হল ছলনা। বাজপেয়ীজীর নাটকে কল্পনা, কামনা, চম্পী প্রমুখ নারীচরিত্রের দ্বন্দ্বসংঘাত চিত্তদাহ মনোবেদনা আছে। কিন্তু সবার মধ্যেই নারীত্বের মহিমা ও মর্যাদা ফুটে ওঠে। "আধুনিক জীবনকে আকর্ষণ বিকর্ষণ মে লিপ্ত বাজপেয়ীজীকে নারী পাত্রোঁ মে এক এসী অন্তঃধারা মিলতী হ্যয় জিসকে শরৎ কী প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট দিখাই দেতী হ্যয়। ইসলিয়ে শরৎ কে নারী পাত্রোঁ কী তরহ য়হাঁ ভী উদারতা, সহনশীলতা এবং আত্মবলিদান কী ভাবনা মিলতী হ্যয়"।[৪৬]

বিধবা নারীর দুঃখবেদনার চিত্রণ, বৌদি - দেওরের মহৎ সম্পর্কের ভাবনা শরৎসাহিত্যে বিশেষ রূপ পেয়েছে। হিন্দী নাটকে তার প্রকাশ পাওয়া যায়। ভিখারী ঠাকুর-এর নাটকে বাংলার প্রেরণা আছে, তাঁর 'ভাই বিরোধ য়া ভাবী বিলাপ' (১৯৩৭) নাটকে শরৎভাবনার অনুরূপতা আছে। শিবরামদাস গুপ্ত বাংলার গভীর অনুরাগী, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিশেষ প্রেরণা। শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের কথাও বারংবার মনে পড়িয়ে দেয় তাঁর নাটকের নায়িকারা। যেমন 'মেরী আশা' (১৯৫০) নাটকের মুন্নী, সে পতিতা নারী হলেও স্বভাবে দেবীর মত এক মহৎ স্বভাবের নারী। মুন্নী যেন চন্দ্রমুখী প্রমুখের দোসর।

বিশ্বম্ভরনাথ শর্মা কৌশিক এর রচনায় শরৎচন্দ্রের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। তাঁর 'হিন্দু বিধবা' (১৯৫৩) নাটকে বিধবা নারীদের দুঃখময় জীবন কথা, তার সমাধানের পথ তথাকথিত অসতী নারীর মহিমা ইত্যাদি প্রসঙ্গের যে চিত্রণ আছে তা শরৎচন্দ্রকে অনিবার্যভাবে মনে পড়ায়।

রৌশনারা চৌধুরী মস্তানার 'দেবর ভাবী' (১৯৬৫) নাটকও শরৎচন্দ্রকে স্মরণ করায়। এতে দেখানো হয়েছে বিধবা মনোরমার দুঃখময় জীবনের কথা। পরিবারে সবাই তাকে কষ্ট দেয় কিন্তু তার দেওর প্রদীপ তাকে বোঝে ও সম্মান করে সেজন্য স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পরে তার জয় হয় ও সবাই নিজেদের অন্যায়ের জন্য অনুতাপ করে রমেশ মেহতার 'ফৈসলা' (১৯৫৬) নাটকেও বিধবা নারীদের জীবনের কথা আছে শরৎ মানসিকতায়।

শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং প্রভাবিত করেছেন বরেণ্য স্রষ্টা বিষ্ণু প্রভাকরকে। প্রভাকরজী শরৎচন্দ্রের অসামান্য জীবনী উপন্যাস লিখেছেন 'আওয়ারা মসীহা'। শরৎচন্দ্রের একাধিক কাহিনীর তিনি চমৎকার নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর নাটকে শরৎচন্দ্রের প্রভাব পাওয়া যায়। ৫ দৃশ্যের ছোট নাটক 'বিভাজন' শরৎচন্দ্রের মত ভাই ভাইয়ের ভালবাসা, দেওর বৌদির ভালবাসা নিয়ে মনোগ্রাহী নাটক। বিষ্ণু প্রভাকর লিখেছেন যে শরৎচন্দ্রের মতে সতীত্বে ও নারীত্ব এক নয়। মা' নাটকের মধ্যে এই বক্তব্যের প্রতিবাদন আছে যে তথাকথিত সতীত্বের থেকে নারীত্বের মূল্য অনেক বেশী। নাটকের একটি সংলাপ উল্লেখ করা যায় —

মনীষী ঔর মেরী মাঁ ক্যা থী। সতী সাধ্বী

কমলা তুমহারী মা ন সতী থী ন সাধ্বী, উহ্ এক স্ত্রী থী। এক এসী স্ত্রী জো সতী হোনেকা ঢোঙ্গ ন রচ সকী।

রামনরেশ ত্রিপাঠীর সাহিত্যিক বিকাশ কলকাতায় হয়। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং তার নাটক ইত্যাদি ওপর বাংলার প্রভাব আছে। তিনি নিজেই বলেছেন – "সবসে পহলা প্রভাব তো মেরে উপর বঙ্গলা সাহিত্য কা পড়া। উসসে ভী বঙ্কিম মুঝে সর্বাধিক প্রিয় লগতে হ্যয়। তব রবীন্দ্র কা উদয় হো রহা থা। উনকে প্রভাব ভী মেরে উপর হ্যয়। শরৎ কে প্রভাব ভী ম্যয় ইনকার নহী কর সকতা। শরৎ ঔর বঙ্কিম মে কলা কী দৃষ্টি সে শরৎ শ্রেষ্ঠ হ্যয়, পরন্তু বঙ্কিম কা স্থান বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ কে কারণ শরৎ সে উচা হ্যয়।"[৪৭] রামনরেশ ত্রিপাঠীর 'কন্যা কা তপোবন' (১৯৫৪) 'জয়ন্ত' প্রভৃতি নাটকের ওপর বঙ্কিম শরৎ প্রমুখের প্রভাব আছে। আজকের হিন্দী নাটকে যে দায়মুক্ত সংস্কারমুক্ত তীক্ষ্ণ ঋজু নারীত্বের প্রকাশ আছে, তার সূচনা শরৎচন্দ্রে।

হিন্দীতে শরৎ-নাটকের অভিনয়

শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু নাটক হিন্দীতে অভিনীত হয়েছে মহাসমারোহে। 'দেবদাস' নাটকাকারে রূপায়িত করেন ওঙ্কার শরদ ১৯৬২ সালে এবং তা অভিনীত হয়। 'দেবদাস' কে আবার নাটকে রূপ দেন রামসিংহ আজাদ এবং বারাণসীর 'সংরচনা' সংস্থা এই নাটক মঞ্চস্থ করে মুরারীলাল মেহতা স্মারক প্রেক্ষাগৃহে ১৯৭৫ এর জানুয়ারিতে।

শরৎ জন্মশতবর্ষে উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনীত হয় তাদের মধ্যে 'দেনা পাওনা' বা 'ষোড়শী' বিশেষ উল্লেখ্য। অনামিকা প্রযোজনা করে 'দেনা পাওনা'। নাট্যরূপ দেন ডঃ প্রতিভা অগ্রওয়াল, প্রদীপ অরোড়া অভিনয় করেন জীবনানন্দর ভূমিকায়, বিনীতা

পলিন হন ষোড়শী। ডঃ অগ্রওয়াল পরিচালিত এই নাটকের রূপায়ণ রসিকজনের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

'ষোড়শী'র সুন্দর মঞ্চায়ন ঘটায় 'নট লোক' নাট্যসংস্থা। প্যারেমোহন সহায় এর পরিচালনায় ১৯৭৭ সালে পাটনায় এর অভিনয় বিশেষ খ্যাতি পায়। বোম্বাই এর নাট্যশিল্পী' সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেন 'ভৈরবী' (ষোড়শী)। নির্দেশনায় ছিলেন সুদর্শন শর্মা। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন সুরেশ ফাতর্পেকর (নির্মল), দিবাকর জটার (জীবানন্দ), পদ্মা রাধ (ষোড়শী) প্রমুখ। দিল্লী আর্ট থিয়েটার 'ষোড়শী' নাটক অভিনয় করে। ওলশন কপুরের নির্দেশনায় এটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

'বিন্দুর ছেলে' (বিন্দু কা বেটা) হিন্দীতে রূপায়িত করেন প্রভাত কুমার ঘোষ ও চন্দ্রবিহারী লাল। বারাণসীর প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'শ্রীনাট্যম' ১৯৬১ সালে এই নাটক সফলভাবে মঞ্চস্থ করেন। দিল্লীতেও 'বিন্দু কা বেটা' র অভিনয় হয়। বিষ্ণু প্রভাকর কৃত 'রবিলক্ষ্মী' দূরদর্শন-এ সম্প্রসারিত হয়। তাঁর নাট্যকৃত 'অভয়া ও দূরদর্শনে রূপায়িত হয়েছে। পাঁচের দশকে লণ্ডন স্কুল অব ড্রামার ছাত্রী সাদিক শরণ শরৎ নাট্য প্রযোজনার বিশেষ দক্ষতা দেখান। তাঁর পরিচালিত দুটি নাটক বিশেষ খ্যাতি পায় 'বিরাজ বৌ' ও রামের সুমতি'। নাটকের অভিনয় ও পরিচালনায় দক্ষতার ছাপ ছিল। এলাহাবাদে নাটক দুটি মঞ্চস্থ হয়। শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' অভিনয় করেছেন থিয়েটার সেন্টার। অনুবাদ করেছেন উদয় খান্না। অভিনয়ে ছিলেন গীতা সিং (বিজয়া), প্রতাপ শর্মা (নরেন্দ্র), মনোহর লাল (রাম বিহারী), বিমল কুমার (বিলাস), প্রতিকণা (নলিনী), চিমনলাল (দয়াল) ইত্যাদি।

১৯৮৬ তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত শরৎ নাট্য সম্মেলন উপলক্ষে দুটি শরৎ নাটক পরিবেশিত হয়। 'রমা' অনুবাদ ওমপ্রকাশ গুপ্ত) উপস্থাপিত করেন জি এন দাস, মেখলা বসু, শিবনাথ পাণ্ডেয়। 'বিরাজ বৌ' উপস্থাপনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান সঙ্গীত কলা মন্দিরের শিল্পীরা। 'স্ক্রীন' পত্রিকায় লেখা হয় 'বিরাজ বহু কী হিন্দী প্রস্তুতি কা সঙ্গীত কলা মন্দির কে শ্রী প্রতাপ জয়সয়াল ঔর উমা মেহতা নে। ইনকী সশক্ত ভাবাভিব্যক্তি ঔর ভাবপূর্ণ আবাজ প্রশংসনীয় থী।"[৬৮]

শরৎচন্দ্রর 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে' হিন্দীতে নাট্যরূপায়িত করেছেন দীপক চট্টোপাধ্যায় ও শশীরাজ যাদব এবং জামশেদপুরের 'অর্চনা অভিনয় সংস্থা তাদের মঞ্চস্থ করে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। বিহার স্কুল অফ মিউজিক এণ্ড ড্রামা করে 'মহেশ' (১৯৮১) —অনুবাদ যাদব পাণ্ডে এবং 'অভাগিন কা স্বর্গ' (১৯৯৫), দুটিরই পরিচালক উৎপল কুমার।

৬. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও হিন্দী নাটক

ক সাম্প্রতিক বাংলা নাটক হিন্দীতে

বাদল সরকার হিন্দী নাট্যক্ষেত্রে এক উল্লেখ্য নাম। বাদল সরকার যে গৌরব ও মর্যাদায় হিন্দীতে গৃহীত হয়েছেন সাম্প্রতিক বাংলাভাষী অন্য নাট্যকার তা বিশেষ হননি। তার প্রায় সব নাটক হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়েছে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা অভিনীত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে ড প্রতিভা অগ্রওয়াল নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে যিনি বাদল সরকারের সর্বাধিক নাটক অনুবাদ করেছেন। বাদল সরকারের সর্বভারতীয় খ্যাতির মূলে আছে বহুরূপী ও অনামিকার অবদান। ডঃ অগ্রওয়াল প্রকৃতপক্ষে বাংলা ও হিন্দীর হাতে

মিলনের রক্তরাখী পরিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিবিধ কার্যাবিধির দ্বারা। বাদল সরকারের অনূদিত নাট্যাবলীর বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল —

আবু হোসেন (অবু হসন)	প্রতিভা অগ্রওয়াল	১৯৭৪
বাকি ইতিহাস	নেমিচাঁদ জৈন	১৯৬৯
বল্লভপুরের রূপকথা (বল্লভপুর কী রূপকথা)	প্রতিভা অগ্রওয়াল	১৯৭৬
বড় পিসীমা (বড়ী বুআজী)	প্রতিভা অগ্রওয়াল	১৯৭৭
ভোমা	থিয়েটার ওয়ার্কশপের নজন সদস্য	১৯৮০
এবং ইন্দ্রজিৎ (এবম ইন্দ্রজিৎ)	প্রতিভা অগ্রওয়াল	১৯৬৯
কবি কাহিনী		
মিছিল (জুলুস)	য়ামা শ্রফ	১৯৭৮
পাগলা ঘোড়া (পগলা ঘোড়া)	প্রতিভা অগ্রওয়াল	১৯৭৪
রাম শ্যাম যদু	প্রতিভা অগ্রওয়াল	১৯৭৬
সাগিনা মাহাতো	য়ামা শ্রফ	১৯৭৯
সলিউশন এক্স	য়ামা শ্রফ	১৯৭৯
সারা রাত্তির (সারী রাত)	প্রতিভা অগ্রওয়াল	১৯৭৭
শেষ নেই (অন্ত নহী)	রতি বার্থোলোমিউ রামগোপাল বজাজ	১৯৭৬
স্পার্টাকুস (আদি বিদ্রোহী স্পার্টাকাস)	রতি বার্থোলোমিউ	১৯৮০
ত্রিংশ শতাব্দী	বীরেন্দ্র সকসেনা	
যদি আর একবার (যদি এক বার ফির সে)	প্রতিভা অগ্রওয়াল	১৯৮২

বাদল সরকারের প্রায় সব নাটক হিন্দীতে অভিনীত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষেই তাদের মঞ্চায়ন ঘটেছে এবং অভিনীত হয়েছে অগণিত বার। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন কলকাতার 'অনামিকা'। ১৯৬৮ সালে অনামিকা অভিনয় করে 'এবম ইন্দ্রজিৎ' যেটি অন্য ভারতীয় ভাষায় বাদল সরকারের সম্ভবত প্রথম রূপায়ণ এবং এটাই বাদল সরকারের সারা ভারতে প্রচারিত হবার সফল সূচনা। অনামিকা আরো অভিনয় করে 'পগলা ঘোড়া' 'সারী রাত' 'বড়ী বুআজী' ইত্যাদি। বোম্বাই এর 'থিয়েটার ইউনিট' সত্যদেব দুবের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন 'এবম ইন্দ্রজিৎ' 'পগলা ঘোড়া' 'সারী রাত' ইত্যাদি।

এম. কে. রায়নার পরিচালনায় 'জুলুস'-এর অসংখ্য অভিনয় হয় মূলত দিল্লীতে ১৯৭৭ থেকে। ১৯৭৭এ গোয়ালিয়ারের আর্টিস্ট কম্বাইন যে রঙ্গশিবিরের আয়োজন করে মধ্যপ্রদেশ কলা পরিষদ-এর সহযোগিতায় সেখানে বংশী কৌল-এর নির্দেশনায় 'জুলুস'-এর সফল মঞ্চায়ন হয়। বিকানীরের 'রঙ্গভারতী' অনেক অভিনয় করে 'জুলুস'-এর বাগীশ কুমার সিংহর পরিচালনায়।

'এবম ইন্দ্রজিত' করে নাগপুর ঔরঙ্গাবাদের 'নাট্যরঙ্গ', পরিচালনায় আলোক চৌধুরী ও জয়শ্রী গডসে। লখনৌ এর ভারতেন্দু নাট্যকেন্দ্র এই নাটক উপস্থাপিত করে বলবাজ

পণ্ডিতের পরিচালনায় ১৯৭৭এ। সাগর-এর প্রয়োগ নাট্যসংস্থা প্রকাশ হর্দীকর এর নির্দেশনায় এর রূপায়ণ ঘটায় ১৯৭১এ।

'বাকী ইতিহাস' অভিনয় হয় অনেক। মহারাষ্ট্র রাজ্য নাট্য মহোৎসবে একে সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করে রসিকাশ্রয়, (পরিচালক রাম জাধব) ১৯৭১ সালে। রায়পুরের হস্তাক্ষর' সংস্থাও এর অভিনয় করে ঐ সময়েই। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্র সংস্থা ১৯৭৭ এর ৯ জানুয়ারী 'বাকী ইতিহাস' উপস্থাপিত করে, পরিচালনায় ছিলেন বীতা খন্না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এটাই বোধহয় প্রথম নাটক। বোম্বাই এর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার এই নাটক মঞ্চস্থ করে, নির্দেশনায় ছিলেন দিনেশ ঠাকুর। ১৯৭৭এর ফেব্রুয়ারিতে এই নাটকের অভিনয় হয়। গোয়ালিয়রের নাট্যায়ন এই নাটকের অভিনয় করে সাতাত্তরে, পরিচালক পুরুষোত্তম অগ্রবাল।

'বল্লভপুরকী রূপকথা' অভিনীত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। পাটনার কলাসঙ্গম এই নাটকের অভিনয়-এ পারদর্শিতা দেখায়, পরিচালক সতীশ আনন্দ যিনি নাটকটি অনুবাদ করেছেন। রায়পুরের সমতা নাট্যসংস্থা সাফল্যের সঙ্গে এর রূপায়ণ ঘটায়।

বাদল সরকারের অন্যান্য নাটকও অগণিত অভিনয় হয়েছে। 'যদি একবার ফির সে' অভিনয় করে কলকাতার সর্জনা। অনুবাদ উমা গুপ্তা, নির্দেশনায় শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালা। 'রাম শ্যাম যদু' অভিনয় করে চণ্ডীগড়ের সত্যশ্রী স্টেজ আর্টস। দেরাদুনের 'কলা মঞ্চ' অভিনয় করে 'বড়ী বুআজী' টি. কে. অগ্রবাল ও উত্তর চচরা-র পরিচালনায়। 'কবি কহানী' (অনুবাদ অশোক ভট্টাচার্য্য) ১৯৮৪ সালে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করে সঙ্গীত কলা মন্দির, পরিচালনায় ছিলেন প্রতাপ জয়সওয়াল।

বাদল সরকারের প্রভাব এভাবেই নাট্য সাহিত্যে পড়েছে। তাঁর প্রভাব পড়েছে ভাব ও আঙ্গিকে। কিছুটা অ্যাবসার্ড বা প্রতীকী ভাবনা, প্রকাশ ভঙ্গীতে কাব্যিকতা, এবং অভিনয় এ 'থার্ড থিয়েটার' রীতির প্রয়োগ — এভাবেই বাদল সরকার এসেছেন হিন্দীতে। জ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রী-র 'অনুষ্ঠান' নাটকের ওপর 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর প্রভাব আছে। নাটকের নামহীন চারটি চরিত্র বিশ্ববিধানের কথা বলে এবং একটি নারী চরিত্র — যে রূপ দেয় মা বোন স্ত্রী ও মেয়েকে — সবাইকে হিংসার পথ পরিত্যাগ করতে বলে। ভাব ও আঙ্গিক দুদিক থেকেই এই নাটকের প্রেরণা 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও অন্য নাটক।

দিশান্তর-এর পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী নাটক 'হিরোশিমা'। নিউক্লিয়ার ওয়েপন ও রেডিও অ্যাকটিভিটি কীভাবে মানব জাতিকে পঙ্গু ও ধ্বংস করে এই নাটকে সেই কথাই বলা হয়েছে। ইব্রাহিম আলকাজীর পরিচালনায় এটি রূপায়িত হয়। এই নাটকের ওপর বাদল সরকারের 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকের সম্পূর্ণ প্রভাব আছে। 'বাকী ইতিহাস'কেও তা স্মরণ করায়।

বাদল সরকারের অভিনয় রীতি (থার্ড থিয়েটার) অনুসরণে হিন্দীতে অনেক নাটক সম্প্রতিকালে রচিত বা অভিনীত হয়েছে। যেমন অরবিন্দ কুমারের 'বল রে মছলী কিতনা পানী'। এই সব নাটকের বক্তব্যে সমাজ রাজনীতির অর্থনীতির ওপর ব্যঙ্গ ও আঘাত, অন্যদিকে ফিজিকাল এ্যাকটিং দ্বারা কটা চরিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন মঞ্চসজ্জা করা বা স্টেজ প্রপ নির্মাণ করা — এসব মূলত বাদল সরকারের প্রভাব।

বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' হিন্দীতে রূপায়িত হয় 'অন্তিম অভিলাষ' নামে। তাঁর 'নবান্ন' অনুবাদ করেছেন চন্দ্র অগ্নিহোত্রী। বিশিষ্ট নট নাট্যকার নাট্যনির্দেশক চিত্রাভিনেতা উৎপল দত্ত হিন্দী সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় নাম, হিন্দী নাট্যজগতেও তিনি গৃহীত হয়েছেন সম্মানে। তাঁর বিভিন্ন নাটক হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে এবং অভিনীতও হয়েছে।

উৎপল দত্তর 'ফেরারী ফৌজ' অনুবাদ করেন অমর আলুওয়া... ও সুনীল দত্ত 'চিংগারি' (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) নামে। নবযুগ কলা কেন্দ্র দিল্লী এর অভি... ১৯৭০এ। এই নাটক 'ফরার ফৌজ' নামে অনুবাদ করেন মহেশ প্রসাদ জয়সয়াল। যুবক কল্যাণ পরি... তত্ত্বাবধানে মিহির চ্যাটার্জি ও বিবেক দত্ত ঝার পরিচালনায় 'ফরার ফৌজ' ... সাযোগে সঙ্গে উপস্থাপিত হয় সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গমঞ্চে ১৯৭০ সালে। সাগরে... 'প্রয়োগ' এর সুন্দর অভিনয় করে।

উৎপল দত্তর 'ছায়ানট' হিন্দীতে অনুবাদ করেন কৃষ্ণ কুমার এবং কলকাতার পদা... এই নাটকের সফল মঞ্চায়ন ঘটায়। রাজধানীর বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা এল টি জি 'ছায়া... উপস্থাপিত করে দিল্লীতে ১৯৭৫ সালে। পরিচালনায় ছিলেন বৃজমোহন শাহ। 'অ... ভিয়েতনাম' অনুবাদ করেন ভৈরব প্রসাদ গুপ্ত ১৯৮০ তে। 'টিনের তলোয়ার' অনু... করেন প্রতিভা অগ্রওয়াল ১৯৮০ তে, পরিবর্তিত নাম 'টীন কী তলবার'। এর সুন্দর মুখবন্ধ লিখেছেন পি এল দেশপাণ্ডে। সঙ্গীত নাটক একাডেমী দিল্লী ও পঞ্জাবের সঙ্গ... নাটক অ্যাকাডেমির উদ্যোগে 'টীন কী তলওয়ার' চণ্ডীগড়ে মঞ্চস্থ হয়। রূপান্তর ও পরিচালনা করেন রমেশ মনচন্দা। সঙ্গীত প্রয়োগে কাজল ঘোষ। 'নিশাচর' অনুবাদ করে... স্বপন চক্রবর্তী ও রাম প্রসাদ সুন্দ্রিয়াল, বাতায়ন সংস্থার উদ্যোগে এর অভিনয় হ... দেরাদুনে ১৯৭১ সালে। ইতিহাসের কাঠগড়ায়' হিন্দীতে অনুবাদ করেন শিবনাথ পাণ্ডে... 'ইতিহাস কে কঠঘরে মে' নামে। রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয় হিন্দী নাট্য বিভাগের উদ্যোগে এটি উপস্থাপিত হয় কলকাতায় জি এন দাসের পরিচালনায়। শিবনাথ পাণ্ডেয় অনূদিত ও নির্দেশিত 'কঙ্গো কে জেল মে' (কঙ্গোর কারাগারে) নুক্কড় বা পথ নাটক রূপে অভিনী... হয় কলকাতায় যাতে অংশ নেন সোমদত্ত চতুর্বেদী, আশুতোষ দরবেশ, অরুণ কুমার সি... ও অনুবাদক। এলাহাবাদে উৎপল দত্তর বেশ কটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে হিন্দীতে। 'অঙ্গার' প্রযোজিত হয় ১৯৫৯ এ এলাবাদের বিখ্যাত মানুষ অনুকূল চন্দ্র ব্যানার্জীর প্রয়োগে। নাটকটি আলোড়ন ফেলে এলাহাবাদে। 'হাঁড়ি ফাটবে' অনূদিত হয় 'ভাণ্ডা ফুটেগা' নামে অনুবাদ করেন মুরারী জীবন ভট্টাচার্য, পরিচালনা করেন শরণবলী শ্রীবাস্তব। 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' অনুবাদ ও পরিচালনা করেছেন এলাহাবাদের অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ মনীশ দেব, অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান আর এক অসাধারণ নট বিপিন ট্যাণ্ডন। 'রাইফেল' অনুবাদ করেছেন মুরারী ভট্টাচার্য। লখনৌতে এটি অভিনীত হয়।

উৎপল দত্ত-র 'লেনিন' নাটক 'লেনিন কা সংগ্রাম' নামে হিন্দীতে অভিনীত হয় ১৯৮৬-তে ব্রেখটিয়ন মিরর সংস্থার উদ্যোগে অমিতাভ দাশগুপ্তর সুদক্ষ পরিচালনায়। নাটক অনুবাদ করেছেন নূর জহীর যিনি আকুলিনার ভূমিকায় সার্থক। লেনিন করেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। দিল্লীর তরুণ নাট্য পরিচালক বাপী বোস অসামান্য দক্ষতায় উপস্থপিত করেন 'দিল্লী চলো', প্রযোজনা—ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা রেপের্টরি ১৯৯৭-র ২৫ অক্টোবর। হিন্দীতে অনুবাদ করেন কল্পনা ভওয়াল, সঙ্গীত প্রয়োগে কাজল ঘোষ। 'তুরুপের তাস' হিন্দী মঞ্চায়নেও বাপী বোস সার্থক। বাপীর আর এক সফল প্রযোজনা চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'নটী বিনোদিনী'র হিন্দী রূপান্তর।

উৎপল দত্তর তিনটি নাটক চমৎকার অনুবাদ করেছেন সান্ত্বনা নিগম যে গ্রন্থটি ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। রূপান্তর অত্যন্ত সুন্দর ও সমৃদ্ধ।

তরুণ রায়ের বেশ কিছু নাটক হিন্দীতে অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে। 'রজনীগন্ধা' অনুবাদ করেন প্রতিভা অগ্রওয়াল ১৯৬৬ তে। কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা 'অঙ্গীকার'

কলকাতায় ও অন্যান্য স্থানে এর অভিনয় করে। বারাণসীতে শ্রীনাট্যম দ্বারা আয়োজিত নাট্য সমারোহ' উপলক্ষে এই নাটকের অভিনয় দেখে 'নটরঙ্গ' লেখেন — "আশা চৌধুরী কী ভূমিকা মে শ্রীমতী সুশীলা সহগল নে অত্যন্ত স্বাভাবিক তথা প্রভাবপূর্ণ অভিনয় কিয়া।.......... অঙ্গীকার নে অভিনয় তথা সংযোজন দোনো পক্ষ পর সমান রূপ সে ধ্যান দিয়া হ্যয়।"[৪৯] নাটকের পরিচালক কৃষ্ণ কুমার। 'এক পেয়ালা কফি' উপস্থাপিত করে সঙ্গীত কলা মন্দির ১৯৬৬ সালে, পরিচালনায় ছিলেন বদ্রীপ্রসাদ তেওয়ারী যিনি নাটকটি অনুবাদ করেছেন ছেদীলাল গুপ্তর সঙ্গে। 'পরাজিত নায়ক' অনুবাদ করেছেন শ্যামা জৈন।

মনোজ মিত্র হিন্দীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন। তার 'সাজানো বাগান' অনুবাদ করেছেন সান্ত্বনা নিগম 'বাগিয়া বাঞ্ছারাম কী' নামে। মনোজের 'গল্প হেকিমসাহেব' অভিযানে আর এক বিস্ময়কর প্রযোজনা। এই নাটক দিল্লীর অভিযান ১৯৮১ তে প্রথম অভিনয় করে রাজিন্দর নাথের সুযোগ্য পরিচালনায়। এই নাটক 'সাবাস বাঞ্ছারাম' নামে অভিনয় করেছে কলকাতার 'অঙ্গীকার' কৃষ্ণ কুমারের পরিচালনায়। এলাহাবাদের 'রূপকথা' ১৯৮৪ তে মঞ্চস্থ করে 'বাঞ্ছারাম কী বগিয়া'। অনুবাদক মুরারী ভট্টাচার্য ও শিবমঙ্গল প্রসাদ, নির্দেশনায় পরিমল দত্ত, বাঞ্ছার ভূমিকায় শরণগৌ শ্রীবাস্তব। 'কেনারাম বেচারাম' এই নামেই হিন্দীতে করে অঙ্গীকার। এই নাটক 'খরিদোরাম বিকাউমল' (রূপান্তর পরেশ দাস) নামে দিল্লী দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয় ১৯৮২ তে। 'রাজদর্শন' দিল্লীতে হয় 'নন্দরাজা মস্ত হ্যয়' নামে ১৯৮৩ তে। অনুবাদ অশোক ভট্টাচার্য, পরিচালনা রণজিত কাপুর, প্রযোজক সংস্থা অগ্রদূত। 'পরবাস' রূপায়িত হয় 'এক অকেলা শহরমে' নামে মধ্যপ্রদেশ এ। অনুবাদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রযোজনা সমতা, রায়পুর। 'কাক চরিত্র'ও হিন্দীতে অভিনয় করেছে বিভিন্ন সংস্থা।

বোম্বাই-এর আই. পি. টি এ 'রাজদর্শন' নাটকের সুন্দর অভিনয় করে ১৯৮৬ তে। অনুবাদ ও গীত রচনা করেন রমেশ রাজহংস ও রাজেন্দ্র মেহরা। পরিচালক রমেশ রাজহংস। অভিনয়ে অংশ নেন অঞ্জন শ্রীবাস্তব, মুস্তাক খান, সুধীর পাণ্ডে, প্রভা মিশ্র, রঞ্জনা গাউড প্রমুখ শিল্পীরা।

অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'মারীচ সংবাদ' হিন্দীতে অনুবাদ করেন পরেশ দাস ও এস. এম. মেহদী 'মারীচ কী কহানী' নামে। মারীচ সংবাদ ১৯৭৬ এ জয়পুরে মঞ্চস্থ হয় অরুণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। এই নাটক লখনৌ ভারতেন্দু নাটক অ্যাকাডেমির ছাত্র ছাত্রীরা করেন ১৯৮৯ তে রাজ বিসারিয়ার পরিচালনায়। 'ক্ষেতু বাগদী ও গোপাল কাহার' অনুবাদ করেছেন সরলা মহেশ্বরী যেটা 'কমল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'জগন্নাথ' অনুবাদ করেছেন অরুণ মহেশ্বরী।

ভানু ভারতী 'চমকু' নামে একটি নাটক লেখেন যার সঙ্গে জগন্নাথের গভীর সাদৃশ্য আছে। অরুণ মুখোপাধ্যায় আ কিউ-এর কাহিনীর নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন 'জগন্নাথ' নাটকে, ভানু ভারতী 'চন্দ্রমা সিং ওর্ফে চমকু'র বিষয় ও রীতি নিয়েছেন 'জগন্নাথ' থেকে।

চিররঞ্জন দাসের বিভিন্ন নাটক হিন্দীতে অভিনীত হয়েছে। 'ভিয়েতনাম' (১৯৬৫) হিন্দী স্বাধীনতা কাগজে মুদ্রিত হয় ও বিহার গণনাট্য সংঘ অভিনয় করে। 'জুলিয়াস ফুচিক' করে দুর্গের পিপলস থিয়েটার, অনুবাদ প্রাণকুমার মৈত্র। 'ফেরার' অনেক জায়গায় হয়েছে, অনুবাদ ও অভিনয়ে শ্রী লছমী প্রসাদ। 'তুমি আমি সবাই' করে মজঃফরপুরের চতুরঙ্গ গোষ্ঠী। 'পালাবদল' করে বঙ্গীয় নাট্য সমাজ (দিল্লী), অনুবাদ ও পরিচালনা — জ্যোতিরিন্দ্র চক্রবর্তী।

দেবাশিস মজুমদারের 'দান সাগব' বাংলা থেকে হিন্দীতে পুনরনুবাদ করেছেন মিলন রায় এবং কুলটিব খাপছাড়া ১৯৮৩ তে এর অভিনয় করেছে। 'অমিতাক্ষর' অনুবাদ করেছেন 'তাম্রপত্র' নামে সান্ত্বনা নিগম এবং রাজিন্দর নাথের পরিচালনায় অভিযান (দিল্লী) এই নাটকের অভিনয় করেছে। কলকাতার 'সর্জনা' সংস্থাও শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালার পরিচালনায় এর সফল মঞ্চায়ন করে। 'ঈশাবাস্য' অনুবাদ করেছেন সান্ত্বনা নিগম এবং অভিযান এটি উপস্থাপিত করে রাজিন্দর নাথের পরিচালনায়। তাঁর অন্যান্য নাটকও অনূদিত হয়েছে। যেমন 'স্বপ্নসন্ততি' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। তাঁর 'অমিতাক্ষর' বা 'তাম্রপত্র' এন. এস. ডি র পাঠ্য তালিকার অন্তর্গত হয়েছে।

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র'র 'কাঞ্চনরঙ্গ' হিন্দীতে অনুবাদ করেন নেমিচাঁদ জৈন এবং এই নাটকের অসংখ্য অভিনয় হয়। কলকাতার অনামিকা ও সঙ্গীত কলা মন্দির, কানপুরের দি অ্যামবাসাডার্স প্রভৃতি সংস্থা এর অভিনয় করে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' অনুবাদ করেন সান্ত্বনা নিগম এবং সত্যদেব দুবের পরিচালনায় এর সুন্দর রূপায়ণ ঘটে। তাঁর 'আলিবাবা' প্রথম মঞ্চস্থ হিন্দীতে হয় রাজেন্দ্রনাথের পরিচালনায়।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' (দো পুরুষ) অনুবাদ করেন হংসকুমার তেওয়ারী। জরাসন্ধর 'ন্যায়দন্ড' অনুবাদ করেন ওঙ্কার শরদ ১৯৮৯ তে যেটি প্রথমে এলাহাবাদ বেতার কেন্দ্র থেকে পরে অখিল ভারতীয় নাট্য কার্যক্রমে সম্প্রচারিত হয়। সন্তোষকুমার ঘোষের 'অজাতক' হিন্দীতে অনুবাদ করেন পরেশ দাস ও ওম ধীংরা। 'অজাতক' উপস্থাপিত করে দিল্লীর এল. টি. জি. ১৯৭৯ এ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রাণের প্রহরী' হিন্দীতে অনুবাদ করেন ডঃ রণজিৎকুমার সাহা 'গিরবী রখী মৌত' নামে। সুনীলের বিভিন্ন কবিতা কাব্য-সংলাপে 'নশ্বর' নামে সাজান হয় ও সংগীত কলা মন্দির আয়োজিত নাট্যোৎসব অভিনীত হয় ১৯৮৪ তে। "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা অবলম্বনে 'নশ্বর', হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন প্রতাপ জয়সওয়াল। অভিনয়ে অংশ নেন অশোক সিং ও সোনালী মেহতা। আনুষ্ঠানটিকে দর্শকরা অভিনন্দিত করেন। দুই শিল্পীর কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে"। [৫০]

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ উপলক্ষে 'নীলদর্পণ' হিন্দীতে অভিনীত হয় এলাহাবাদে। অনুবাদক মহাদেব সাহা, নির্দেশক অবধেশ চন্দ্র, প্রযোজক সংস্থা রঙ্গশিল্পী, এলাহাবাদ। এই নাটকের মঞ্চায়ন সফল হয়। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'পূর্ণগ্রাস' হিন্দীতে 'বস্তি' নামে রূপায়িত হয়ে বোম্বাই গণনাট্য সংঘ কর্তৃক নিয়মিত অভিনীত হয় ১৯৪৯-৫০ এ। অনুবাদক বলরাজ সাহনী। 'কেউ দায়ী নয়' ও 'সীমান্তের ডাক' আকাশবাণী থেকে হিন্দীতে সম্প্রচারিত হয়। 'কেউ দায়ী নয়' (একাঙ্ক) হিন্দীতে অনুবাদ করেন প্রতাপ জয়সওয়াল ও প্রয়াগ আয়োজিত নাট্যোৎসবে অভিনীত হয় কলকাতায় ১৯৮৬ তে। "অভিনয়ে ছিলেন শিখা শ্রীবাস্তব এবং তাকে সহযোগিতা করেন দিলীপ মিত্র। আহত নারীর মর্মবেদনার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন শিখা তাঁর যথাযথ উচ্চারণ, যতি বিরাম, সচেতন অভিনয় ক্ষমতার দ্বারা।"[৫১]

অনল গুপ্তর কৃষক বিদ্রোহ ও জমির লড়াইয়ের নাটক 'রক্তের রঙ' চঞ্চলকুমার হিন্দীতে অনুবাদ করেন 'লাল তরাই' নামে ১৯৭০ সালে। নাটকটি বেনারসে পথ নাটক রূপে অভিনয় করে 'জন কলা মঞ্চ' সত্তরের প্রথম দিকে। পরবর্তী কালে দিল্লীতে 'জন সংস্কৃতি' এর অভিনয় করে। অনল গুপ্তর 'ওরা দুজন' হিন্দীতে অভিনীত হয়। অমিতাভ গুপ্তর 'হিমালয়ের থেকেও ভারী' অনুবাদ করেন উদয়নারায়ণ সিং 'হিমালয় সে ভারী'

(১৯৭৩) নামে এবং আর আর সি জামালপুর এর অভিনয় করে জামালপুর, সিমলা, রামনগর প্রভৃতি স্থানে। সত্রাজিৎ মজুমদারের নির্বাচন বয়কটের ওপর নাটক 'শুয়োরের খোঁয়াড়' অনুবাদ করেন কাঞ্চনকুমার 'শূয়ার বাড়া' নামে ও আমুখ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অলক রায়চৌধুরীর 'সংগ্রাম' হিন্দীতে অনুবাদ করেন কাঞ্চনকুমার ও পঞ্জাব থেকে প্রকাশিত 'বহস' পত্রিকায় (১৯৮৩) প্রকাশিত হয়। মণ্টো র 'টোবাটেক সিং' বাংলায় নাট্যরূপে অভিনীত হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা' হিন্দীতে উপস্থাপিত করে পদাতিক শ্যামানন্দ জালানের পরিচালনায় ১৯৭৯ সালে। কলকাতা দিল্লী প্রভৃতি স্থানে এর অভিনয় হয়। এই প্রযোজনা বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। দিল্লীর অভিযানও এই নাটক মঞ্চস্থ করে বিশিষ্ট পরিচালক রাজিন্দর নাথের নির্দেশনায় ১৯৭৯ সালে। মহাশ্বেতী দেবীর 'রুদালী' ও 'মুক্তি' করেছে বঙ্গকর্মী, পরিচালক — প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব উষা গাঙ্গুলী।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রচিত 'দুঃসময়' এক অত্যন্ত স্মরণীয় নাটক যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবমিলনের কথা গভীর প্রত্যয়ে উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'দুঃসময়' হয়ে উঠেছে কালের দলিল। নাটকটি হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন উমা জয়সওয়াল; অভিনয় নাট্যসংস্থার উদ্যোগে 'দুঃসময়' বেশ কয়েকবার মঞ্চস্থ হয়েছে বিশিষ্ট নাট্যবিদ প্রতাপ জয়সওয়ালের নির্দেশনায় ২০০০ সাল থেকে। বর্তমান প্রতিবেদকের একটি সমালোচনা এখানে দেওয়া হল।

"সাম্প্রদায়িকতা এ সময়ের এক ভয়াবহ সমস্যা যা সভ্যতাকে ক্লিষ্ট পীড়িত করে। রুদ্ধ করে ইতিহাসের অগ্রগতিকে। আসলে ধর্ম এক জন্মগত সংস্কার, এক সহজাত প্রবৃত্তি যা মানুষ রক্তের মধ্যে বহন করে আনে। এই জন্মে জীবের মধ্যে যেন সেই প্রাবন্ধ সংস্কার বিদ্যমান থাকে। তা ছাড়া বাল্যকাল থেকেই মানুষের মধ্যে সঞ্চার করে দেওয়া হয় নিজ ধর্মের বোধ, যাকে সে একমাত্র সত্য বলে মনে করে। ধর্মের নামে মানুষ প্রবৃত্তির পারবশ্যতা মেনে নেয়, ধর্মের মহিমা মহত্বের অনুভবকে পরিহার করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ পারস্পরিক মিলন ও ঐক্যবোধকে বড় করে তোলে নিজেদের জীবনে। কিন্তু বিভিন্ন কারণেই তাদের মধ্যে দেখা দেয় ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতিগত বিভেদ বিচ্ছিন্নতা। ধর্মের নামে আজন্মলালিত সংস্কারকে প্রকট করে তোলা হয়। ব্যাপকক্ষেত্রে এর মধ্যে থাকে অন্য প্ররোচনা। বিদেশি শক্তির চক্রান্ত, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ষড়যন্ত্র, সংখ্যাগরিষ্ঠের দাপট ও বৈষম্যমূলক আচরণ, সংখ্যালঘুদের প্রকৃত বা কখনও কাল্পনিক ভীতি ও ক্ষোভ, রাষ্ট্রযন্ত্রের ঔদাসীন্য বা অক্ষমতা, চতুর ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের ধর্মকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার, ইতিহাসের অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংযোগ পরিস্থিতিকে আরও বিষাক্ত করে তোলে। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার এই রূপ কখনও প্রকট হয়, বিভেদ বিচ্ছিন্নতা প্রবল হয়ে দেখা দেয়, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মিলনকে বিস্মৃত হয়ে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র শাণিত করে — তখন শত্রু দূরে দাঁড়িয়ে হাসে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'দুঃসময়' নাটকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের এই ভয়াল ছবি ফুটেছে — লুটপাট অগ্নিসংযোগ ধর্ষণ পীড়ন হত্যা অস্তিত্বকে সঙ্কটময় ও জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকাও হয় নিরপেক্ষ পীড়নকারীর। যদিও তার মধ্যে কিছু সৎ সচেতন মানুষ এই বর্বরতাকে প্রতিহত করতে প্রয়াসী হয়, প্রসারিত করে দেয় হৃদয়ের দ্বার; নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী কর্তব্যপরায়ণ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সচেষ্ট হয় এই অন্যায় ও

পাপকে রুখতে; আর সেই কলুষ তামস পরিবেশে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভালবাসার ফুল ফোটে, প্রাণের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। 'অভিনয়' নাট্যসংস্থা এই বক্তব্য সমন্বিত 'দুঃসময়' নাটকটি হিন্দিতে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করে এই শৈল্পিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করল। নাটকটি অনুবাদ করেছেন উমা জয়সওয়াল, পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন হিন্দি রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট অভিনেতা ও পরিচালক প্রতাপ জয়সওয়াল।

'দুঃসময়' নাটকের কাহিনী এরকম। শহরে দাঙ্গা লেগেছে স্টেশনে ট্রেন আসে। প্লাটফর্মের আলো নেভানো। আলো অন্ধকারের ভয় পাওয়া পরিবেশে একদল গুন্ডা বদমায়েশ অস্ত্র হাতে ট্রেনের লোকজনদের টেনে নামাচ্ছে, লুঠপাট করছে, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে। এক বৃদ্ধ আহত ব্যক্তি রক্তাক্ত অবস্থায় মঞ্চে প্রবেশ করে, জল চায়। গুণ্ডারা তাকে লাথি মেরে চলে যায়। আর এক যুবক, কবীর, উদভ্রান্ত হয়ে মঞ্চে আসে, সে বৃদ্ধকে জল দিতে পারে না, বৃদ্ধ মারা যায়। অসহায় কবীর গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচতে পালায়। সে আসে তার শিক্ষকের বাড়িতে। এই আর্দশবাদী মাষ্টারজি তাঁর মেধাবী ছাত্র কবীরকে সন্তানের মতো ভালবাসেন। ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠাই তাঁর ব্রত, রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ তাঁর আদর্শ। শিক্ষক-কন্যা কণিকার সঙ্গে কবীরের একটা হৃদয়ের সম্পর্কও গড়ে ওঠে। সরকারি দপ্তরে জেলাশাসক উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত, দাঙ্গা থামাবার জন্য তাঁর আন্তরিক চেষ্টা। কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা চক্র তার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। শিক্ষকের বাড়ি এক মুসলমান যুবক আছে শুনে ফোনে তাদের শাসানো হয়। এদের বিপদে ফেলবে না বলে কাউকে না বলে কবীর চলে যায়। মাস্টারজি উদ্বিগ্ন। রাতের থমথমে পরিবেশে কবীর স্টেশনে এসেছে, উদ্বিগ্ন কণিকাও তার খোঁজে এখানে আসে। কণিকা তার সঙ্গে যাবে, কিন্তু কবীর রাজি নয়, সে বলে অন্যদের ভাবনার কথা সির্ফ তুমহারে ঔর মেরে শোচনেমে কুছ নেহি হোগা। হামারে শোচনে কে বাদ ভি রহতো কা বহুত কুছ শোচনা বাকী রহে যাতা হ্যয়।

কণিকা কথা বলে না। কবীর একাই চলে যাচ্ছে। কিন্তু ঘোষণা করা হয় যে বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামার জন্য আপ ডাউন সব ট্রেন বাতিল হয়েছে। কবীরের যাওয়া হয় না। তারা হেঁটে যায় — ওরা দু'জনে সিল্যুয়েটে মানব-মানবীর প্রতীক হয়। যদিও এই প্রযোজনায় আছে কবীর চলে যাচ্ছে ও নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ কণিকা একা মঞ্চে বেদনায় নিবিড় হয়ে বসে। এটাও পরিচালকের মৌলিক ভাবনার প্রকাশ। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাপীড়িত ভারতবর্ষের ছবি এই নাটকে ফুটেছে, দেখানো হয়েছে গুন্ডা-বদমায়েশ রাজনৈতিক নেতা প্রমোটার ইত্যাদি কিভাবে দাঙ্গা বাধায় পুলিশের সহযোগে, যাকে প্রতিহত করতে পারে না সৎ প্রশাসক কিংবা বিবেকবান মানুষ। বিহার বা উত্তরপ্রদেশের নাম করলেও গোটা দেশের এই চিত্র অঙ্কন করেছেন নাট্যকার; সেটি যেন তাঁর সেকেন্ড সেল্ফ। মন্ত্রী যে কথা বলতে কুণ্ঠিত, তাকে গভীর সততায় ও অন্তরিকতায় ব্যক্ত করেছেন নাট্যকার। রাজনীতিবিদ বুদ্ধদেবকে অতিক্রম করে গেছেন সহৃদয় সংবেদনশীল নাট্যকার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তবে নাটকটির কিছু অপূর্ণতা আছে। বক্তব্য দানা বাঁধেনি, নাট্যমুহূর্তে ঠিক মতো তৈরি হলেও পরক্ষণেই ভেঙে পড়ে, পরিণতিতেও অস্পষ্টতা থেকে যায়। তবু বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সমস্যাকে উপলব্ধি ও প্রকাশের চেষ্টা, তীক্ষ্ণ নিরপেক্ষ বিচার ও বিশ্লেষণ, কবীর ও কণিকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদর্শনিষ্ঠা ও রুচিময়তা এবং সর্বোপরি লেখকের আন্তরিকতা 'দুঃসময়'-কে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

নাটকের মঞ্চ দুটি ভাগে বিন্যস্ত। সামনের দিকে বা ডাউন স্টেজে মঞ্চের এক অংশ এবং পেছনের দিকে বা আপ-স্টেজে বেশ উঁচুতে আর এক অংশ, যা কখনও প্ল্যাটফর্ম কখনও আবার ঘরের আসবাব, কখনও বা অফিস হিসেবে ব্যবহৃত। দুটি পর্যায়কে একই সঙ্গে ব্যবহারে পরিচালক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রথম দৃশ্যে আপ স্টেজে প্ল্যাটফর্ম, আলো জ্বলা সিগন্যাল, ট্রেনের আলো ও শব্দ যথাযথ স্টেশনের পরিবেশ নির্মাণ করে এবং ওপরের সঙ্গে নিচেও গুন্ডাদের আনাগোনা, চিৎকার, নারীর ওপর অন্যাচার, বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনা একসঙ্গে চলে। মাস্টারজির ঘরেও নিচে ড্রইংরুম ও ওপরে কিছু মঞ্চসজ্জা এবং যাতায়াতের পথ। জেলাশাসকের অফিসে ওপরে জেলাশাসক ও নিচে পুলিশ জনতা ইত্যাদি। হয়তো মঞ্চ বিন্যাস সবসময়ে সুকুমার পরিমার্জিত হয়নি। তবু কলামন্দির বেসমেন্টের ছোট পরিসরকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছেন পরিচালক। মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন সমীর সরকার। জয় সেনের আলোর প্রয়োগ ভালই, চরিত্রের ভাব ভাবনার প্রকাশে আলো চেয়েছে সহযোগ করতে এবং তা বেশ কিছুটা সাফল্যও পেয়েছে। তবে আলো প্রক্ষেপণে আরও সতর্ক হতে হবে। নূপুর গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গীত ওঠানামার, তীব্র নাটকীয় মুহূর্তেও তার রাগাশ্রিত সুর নাটকে অন্য মাত্রা আনে।

নাটকের রূপায়ণে শিল্পীরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত দুটি বিষয় উল্লেখের দাবি, রাখে। প্রথমত, শিল্পীরা অনেকেই নবাগত — এই প্রথম তাঁরা মঞ্চে এলেন ও কৃতিত্বের পরিচয় রাখলেন। দ্বিতীয়ত, অনেক বাংলা ভাষী শিল্পী অভিনয় করেছেন এবং তাঁদের উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গিতে তেমন কোনও ত্রুটি ছিল না। অভিনয়ে প্রথমেই দৃষ্টি কাড়েন মাস্টারজির স্ত্রীর চরিত্রশিল্পী উমা জয়সওয়াল। আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ে এবং শিল্পময় অভিব্যক্তিতে সাধারণ চরিত্রকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। মাস্টারজির চরিত্রাভিনেতা সুধীর নিগমও যথাযথ। নায়িকা কণিকার চরিত্র রূপায়ণে সোমাদ্রি বিশেষ পারদর্শী, কৌশিক সেনগুপ্তও কবীরের বোধ ও প্রত্যয়কে যথাযথ তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। নবাগত এই দুই শিল্পীর মধ্যে সম্ভাবনা আছে। তবে এদের আরও অন্তর্মুখি হতে হবে, সাত্ত্বিক ভাবনার আরও গভীরতা চাই। কবীরের চলাফেরায় কিছু আড়ষ্টতা আছে, যা তাকে কাটাতে হবে। জেলাশাসকের চরিত্রে অশোক আগরওয়াল সফল -- পরিস্থিতি মোকাবিলায় দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা এবং ব্যর্থতার গ্লানি ও অসহায়তা প্রকাশে তিনি সচেষ্ট। বৃদ্ধ কবীরের রূপায়ণে অমিত রায় আন্তরিক। গুন্ডা, মামা ও নেতার তিন রূপকেই ফুটিয়ে তুলেছেন অখিলেশ পাঠক। সঙ্গীতা আগরওয়ালের প্রেস রিপোর্টার স্মার্ট ও সপ্রতিভ। এ ছাড়া নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছেন এজাজ আহমেদ, রঞ্জিত গুপ্তা, সারদা দত্ত, বিনায়ক জোশী, দেবাশিস ঘোষ, এস এন ব্যাস, উমেশ, প্রসূন, শামস প্রমুখ। খুব বড় মাপের শিল্পী এঁরা হয়তো নন, কিন্তু একটা মান এঁরা ধরে রেখেছেন এবং প্রায় একই স্কেলে অভিনয় করেছেন। পরিচলকের দক্ষতায় সামগ্রিকভাবে একটা সঙ্গতি ও সমতা রক্ষিত হয়েছে।

নাটকের কটি দৃশ্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথম দৃশ্যের আলো-আঁধারি পরিবেশে ট্রেন আসা, লুঠতরাজ গুন্ডামি, তীব্র চিৎকার, বৃদ্ধ কবীরের প্রবেশ ও মৃত্যু নাটককে চড়া সুরে বেঁধে দেয়। পলায়মান আতঙ্কিত মেয়েকে গুন্ডাদের ঘিরে ধরা এবং ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো মুখে শব্দ করা ও মেয়েটির আর্ত কান্না — পরিচালকের কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়। সেই দৃশ্য ভোলা যায় না যখন মাস্টারজি এসেছেন কবীরের খোঁজে জেলাশাসকের কাছে। তিনি বলেন, বেটা কা তলাশ কর রহা হুঁ। জেলাশাসক জানতে চান, তাঁর ছেলের নাম কী? মাস্টারজি বলেন — কবিরুল ইসলাম। আর তাঁর

নাম কী? প্রশ্ন করায় মাস্টারজি বলেন, — শ্যামনারায়ণ উপাধ্যায়। দর্শকবৃন্দ সচকিত হয়, জেলাশাসক স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন, প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হয়ে যায়, জেলাশাসকের হাতে জ্বলতে থাকা আলো গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে। এই দৃশ্যের পরিকল্পনাও অসাধারণ। পুঁথিবদ্ধ বিষয়কে গ্রহণ বা অতিক্রম করে পরিচালক প্রতাপ জয়সওয়াল এভাবেই এক নতুন শিল্পমূর্তি নির্মাণ করেছেন। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও সামগ্রিকভাবে অভিনয় নাট্যসংস্থা প্রযোজিত হিন্দিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'দুঃসময়' সম্প্রতিকালের এক বিশিষ্ট প্রযোজনারূপে বিবেচিত হবে। 'দুঃসময়' কলকাতার হিন্দি নাটকেরও দুর্দিন কাটিয়ে সুসময় আনবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা"।[৫২]

খ. সাম্প্রতিক হিন্দী নাটক বাংলায়

হিন্দী নাটক বাংলা মঞ্চে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। তার পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম হতে পারে, কিন্তু তার গভীরতা কম নয়। আধুনিকতার প্রথম দিকে হিন্দী বেশী পরিমাণে গ্রহণ করেছিল বাংলাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে হিন্দী নাট্যশিল্পের বৈভব ও মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বাংলার নাট্যশিল্পীরা এবং অকৃপণ হাতে গ্রহণ করেছেন সেই ঐশ্বর্যকে। যেমন, মহান কথাসহিত্যিক প্রেমচন্দের কত গল্প যে বাংলা নাট্যরূপ পেয়েছে এবং কত শতবার তাদের অভিনয় হয়েছে তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য।

সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখ্য অনুবাদ রমেশ মেহতার অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক 'আন্ডার সেক্রেটারী'। নিবেদিতা দাস 'যা নয় তাই' (ফানুস) নামে নাটকটি অনুবাদ করেন এবং কলকাতার শৌভনিক নাট্যসংস্থা এটি অভিনয় করেন ১৯৫৯ সালে। এই নাটকের আর একটি অনুবাদ করেন দেবু মজুমদার এবং বেঙ্গলী ক্লাব কাশ্মীরী গেট দিল্লী অভিনয় করে ১৯৬৯ সালে।

মোহন রাকেশ রচিত 'আধে অধুরে' বাংলায় অনুবাদ করেন প্রতিভা অগ্রবাল ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি ১৯৭২ সালে বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। নাটকটি প্রথম উপস্থাপিত করে শৌভনিক ১৯৭২ সালে এবং নতুন ভাব ও রীতির নাটক রূপে অভিনন্দিত হয়। নাটকের পরিচালনায় ছিলেন কৃষ্ণ কুন্ডু যিনি মহেন্দ্র, সিংহানিয়া, জগমোহন ও জুনেজার চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেন। কাজল মুখোপাধ্যায় করেন সাবিত্রী। বাণী করমা, ভূপাল মুখোপাধ্যায় ও প্রণতি মজুমদারও ভাল অভিনয় করেন। আনন্দবাজার লিখেছিল — "নাটকটি জটিল আধুনিক জীবনের সংঘাতে আর আবর্তে গড়ে উঠেছে। চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বের একটি আধুনিক রূপ এ নাট্যে প্রতিফলিত। প্রথাধর্মী অথবা হালকা নাটকের প্রমোদে অভ্যস্ত দর্শকের সামনে মননশীল আধে আধুরে উপস্থিত করে শৌভনিক সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। দর্শকদের রুচি বদলের এই চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য"।[৫৩] 'আষাঢ় কা একদিন' অনুবাদ করেছেন গৌতম চৌধুরী।

ধর্মবীর ভারতীর 'অন্ধাযুগ' বাংলায় অনুবাদ করেন প্রণতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনেতৃ সঙ্ঘের প্রযোজনায় এটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৭৫ সালে। পরিচালনায় ছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অশ্বত্থামা) অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (ধৃতরাষ্ট্র), নীলিমা দাস (গান্ধারী), অনুপকুমার (বোবা সৈনিক), শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র। কলকাতায় ও বোম্বাইতে এই নাটকের প্রায় কুড়িটি অভিনয় হয়। নাটকটি বহুরূপী পত্রিকায় ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। ধর্মবীর ভারতীর 'সৃষ্টি কী আখিরী আদমী' কাব্যনাটিকা বাংলায় অনুবাদ করেন দিলীপ কুমার ঘোষ ১৯৮০ সালে।

ধর্মবীর ভারতীর নাটক থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে বাংলা নাটক। অভিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের 'হে সময় উত্তাল সময়' নাটকের ভাবনা মনে করায় 'অন্ধাযুগ'কে'. আঙ্গিকের দিক থেকেও হিন্দীর প্রভাব আছে। মনোজ মিত্রের 'অশ্বত্থামা' নাটকের ঘটনা ও পরিবেশেও অন্ধাযুগের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

ডঃ শংকর শেষ রচিত "এক ঔর দ্রোণাচার্য" বাংলায় অনুবাদ করেন আশোক কুমার সরকার 'আর এক দ্রোণাচার্য' নামে। দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'নাট্যদর্পণ' (১৯৭৭) পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জনের গিরিজা দাসের পরিচালনায় 'নাট্যরূপা' এর সুন্দর অভিনয় করে। শ্রীরামপুরের প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'শৌনক' ১৯৭৮ সালে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন 'আর এক দ্রোণাচার্য' স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে। নাটকটি পরিচালনা করেন দ্যুতিবাহন, সম্পাদনা শংকর ভাদুড়ী ও অসীম মৈত্র। ডঃ শংকর শেষের 'পোস্টার' নাটক অনুবাদ করেন শ্যামল ঘোষ এবং উপস্থাপিত করে 'ভূমিকা'।

জ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রীর 'শুতুরমুর্গ' বাংলায় অনুবাদ করেন প্রতিভা অগ্রবাল 'উটপাখী' নামে ১৯৭০ সালে। এটি কলকাতায় অভিনীত হয়, প্রয়োজনা করেন শৌভনিক।

দিল্লীর যাযাবর গোষ্ঠী 'উটপাখী' অভিনয় করে ১৯৭২ সালে। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন রবীন ভট্টাচার্য যার 'বাজা' মনে করিয়ে দেয় শ্যামানন্দ জালানের অভিনয়কে।

ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ লাল রচিত 'মিঃ অভিমন্যু' নাটকটির সঙ্গে বীরু মুখোপাধ্যায়ের চার প্রহর' নাটকের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। 'মিঃ অভিমন্যু' সম্ভবত বাংলা নাটক দ্বারা প্রভাবিত। 'মিঃ অভিমন্যু' বাংলায় অভিনয় করেন আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির বাংলা ছাত্ররা ১৯৭৫ সালে। নাটকের রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য।

ডঃ লালের 'ব্যক্তিগত' নাটক অভিনয় করে কানপুরের 'বিভাস' নাট্যসংস্থা ১৯৭৮ সালে। নাটক অনুবাদ ও পরিচালনা করেন অমল বন্দোপাধ্যায়। 'কফি হাউস মে ইন্তজার' অনুবাদ করেন দিলীপ কুমার ঘোষ, প্রকাশ ১৯৮০।

বিষ্ণু প্রভাকরের 'মীনা কঁহা হ্যয়' বাংলায় অনুবাদ করেছেন অর্ঘ্য দাস ১৯৭৯ সালে। 'সাতদিন' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। শ্রী প্রভাকরের 'টুটতে পরিবেশ' অনূদিত হয় 'ঘর ভাঙে' নামে ও 'হিন্দী একাঙ্ক নাটক' সংকলনের অন্তরভূত হয় (১৯৮০)।

জগদীশচন্দ্র মাথুর-এর 'পহেলা রাজা' বাংলায় অনুবাদ করেন ডঃ প্রতিভা অগ্রবাল ও শমীক বন্দোপাধ্যায়, প্রকাশ কাল ১৯৭৮। জগদীশ চন্দ্র মাথুরের 'বন্দী' একাঙ্ক অনূদিত হয় ১৯৮০ তে।

ইব্রাহীম শরিফ-এর একটি গল্পের অনুপ্রেরণায় বাংলা একাঙ্ক নাটক রচিত হয়েছে 'যুযুধান', রূপকার মৃণাল মুখোপাধ্যায়। নাটকটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মূলতঃ প্রতিযোগিতার মঞ্চে অগণিতবার অভিনীত হয়েছে। 'যুযুধান' নাটক 'একাঙ্ক নাট্য সম্ভার' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৯৮৫)। প্রায় নতুন এই নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ইসরাইল রচিত 'রোশন' উপন্যাস অবলম্বনে অরুণ মুখোপাধ্যায় নাটক লিখেছেন 'রোশন'। চেতনা এই নাটকের প্রথম অভিনয় করে ৪ জানুয়ারি ১৯৮৫ অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। নির্দেশনায় ছিলেন অরুণ মুখোপাধ্যায় যিনি প্রধান চরিত্র রোশনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'রোশন' নাটক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৮৫ র বিশিষ্ট প্রযোজনার পুরস্কার লাভ করে। নাটকটি গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় (শারদ সংখ্যা ১৯৮৬) প্রকাশিত হয়।

জয়শংকর প্রসাদের নাটকের বিশেষ প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর 'কামনা' নাটকের সঙ্গেও রক্তকরবীর ভাবগত সাদৃশ্য আছে। 'কামনা' নাটকের বিশিষ্ট

অংশ বাংলায় অভিনীত হয়েছে সঙ্গীত কলা মন্দির আয়োজিত অনুষ্ঠানে। দেশ পত্রিকা লিখেছেন — "হিন্দীর বিখ্যাত নাট্যকার জয়শংকর প্রসাদের 'কামনা' নাটকের শেষাংশ বাংলায় অনুবাদ করেছেন পূর্ণশ্রী মিত্র। এটি বাংলায় অভিনয় করলেন অরুণ মিত্র, বিজয় জোশী, বিশ্বনাথ শর্মা, অশোক সিং, দীনেশ রাই, বালমুকুন্দ হাডা, মীরা আচার্য, উমা মেহতা। এঁদের অধিকাংশেরই মাতৃভাষা বাংলা নয়।"[৫৪]

প্রসাদের সুবিখ্যাত 'কামায়নী' বাংলায় রূপায়িত হয় নৃত্যনাট্য রূপে ভারতীয় ভাষা পরিষদের উদ্যোগে। অনুবাদ কণিকা বসু, পরিচালনায় ডঃ সুকৃতা আজমানী। সংগীত নির্দেশক – চন্দন রায় চৌধুরী। চন্দনা দে ও মমতা মিশ্র শ্রদ্ধা ও লজ্জার ভূমিকায় বিশেষ দক্ষতা দেখান।

প্রেমচন্দ ও বাংলা নাটক : প্রেমচন্দ, হিন্দী সাহিত্যের মহান লেখক, বাংলা নাট্য সাহিত্যকে প্রবলভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। প্রেমচন্দ মূলত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। স্বল্প কয়েকটি নাটকও তিনি লিখেছেন, কিন্তু বিস্ময়ের কথা প্রেমচন্দ বাংলা নাট্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন তাঁর নাটক দিয়ে নয়, গল্প দিয়ে। কথাশিল্পী প্রেমচন্দের রচনায় ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে -- বিশেষত চিরদরিদ্র অবহেলিত কৃষক মজুর সর্বহারা মানুষের ম্লান অস্তিত্ব, সামাজিক অর্থনৈতিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার আপ্রাণ প্রয়াস, ধ্বংসের মুখোমুখী দাড়িয়েও আপন সত্তাকে অম্লান রাখা – ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের এই দুর্বার প্রাণশক্তি প্রেমচন্দের রচনায় ধরা পড়েছে।

সম্ভবত বাংলার প্রেমচন্দের প্রথম নাটক 'দানসাগর'। প্রেমচন্দের 'কফন' গল্পকে অবলম্বনে করেন দেবাশিস মজুমদার 'দানসাগর' গল্প লেখেন এবং এটি মঞ্চস্থ করে থিয়েটার কমিউন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তর পরিচালনায়। ১৯৭৬ এর ২০ আগস্ট গৌহাটী রবীন্দ্রভবনে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়, দ্বিতীয় মঞ্চায়ন সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ কলকাতায় অ্যাকাডেমি মঞ্চে। থিয়েটার কমিউন 'দানসাগর' নাটক অন্তত ৬০০ বার অভিনয় করেছে করেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। নতুন ভাব ও রীতির নাটক রূপে 'দানসাগর' বিপুল অভিনন্দন লাভ করে। থিয়েটার কমিউনের প্রযোজনা ও নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের অভিনয় পরবর্তীকালে অনুকরণযোগ্য এক বিশেষ রীতিতে পরিণত হয়। বরুণ ড্রামা এন্ড অ্যাথলেটিক্স পানাগড়, থিয়েটার ইউনিট কোচবিহার, প্রয়াগ কলকাতা প্রভৃতি সংস্থা 'কফন' বা 'দানসাগর' মঞ্চস্থ করেছে। দানসাগর হিন্দীতেও রূপায়িত হয় বাংলা থেকে অনূদিত হয়ে।

প্রেমচন্দের 'ইস্তীফা' গল্পের মোহিত চট্টোপাধ্যায় কৃত নাট্যরূপায়ণ 'লাঠি' (১৯৭৮) বিশেষ জনপ্রিয় হয়। এই নাটক প্রথম উপস্থাপিত করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ ১৯৮০ র ২ জুলাই বিজন মঞ্চে। তারপর হয়েছে অসংখ্য অভিনয়। দুর্গাপুর শিল্পায়ন, আর্ক থিয়েটার প্রভৃতি সংস্থা এটি মঞ্চস্থ করে। 'লাঠি' পুনরায় হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। কলকাতার বঙ্গ বাণী থিয়েটার ইউনিট শিশির মঞ্চে বাব্বু শর্মা অনূদিত ও পরিচালিত 'লাঠি' মঞ্চস্থ করে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০। এই গল্পের নাট্যরূপ দেন নীলেশ সেনগুপ্ত এবং পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাটকটি অসাধারণ অভিনয় করেন স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাব তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ রাইটার্স বিল্ডিংস।

'সাওয়া সের গেঁহ' গল্প নাটক রূপায়িত করেন অমল রায় নাম 'চক্রবৃদ্ধি হারে' ('অভিনয়' ১৯৭৮)। অ্যাজিট গ্রপ ও অন্যান্য সংস্থা এর অভিনয় করে। এই কাহিনীকে

. শ্য নাট্যরূপ দেন মানবেন্দ্র গোস্বামী 'সনাতনী কথা' নামে (প্রকাশ গ্রুপ থিয়েটার .১৮০)। আবেক্ষণ ও অন্যান্য সংস্থা এটি মঞ্চস্থ করে।

প্রেমচন্দের 'নমকা কা দারোগা' গল্পের নাট্যরূপ বিশেষ সমাদর লাভ করে। এটা ..' নয়' নামে সুন্দর নাট্যরূপ দেন দেবব্রত দাশগুপ্ত (গ্রুপ থিয়েটার ১৯৮০) এবং এই . টক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন বঙ্গলোক (পরিচালনা গৌতম সেন), . ক (পরিচালনা প্রণব চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি সংস্থা। এই গল্পের গোপাল দাস কৃত . রূপ 'প্রত্যাখ্যান' (থিয়েটার বুলেটিন ১৯৮০) দুর্গাপুর স্মারক গোষ্ঠীর প্রযোজনায় . খ্যাতি অর্জন করে। সৌভ্রাত্রিক সংস্থার প্রত্যাখ্যান'ও বেশ ভাল হয়। এই গল্পের . এক নাট্যরূপ দেন সমীরণ আচার্য, 'কোতোয়াল ও শ্রেষ্ঠী' নামে (অভিনয় পত্রিকা . ০) ও 'থিয়েটার টেন্ট' 'ছাত্র সংঘ' প্রভৃতি এর অভিনয় করে। এই গল্পকে নাট্যরূপ . শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায় 'কেনা কাটার কিসসা' নামে যা মুখোশ সংস্থা মঞ্চস্থ করে। 'কোতোয়াল ও শ্রেষ্ঠী' হিন্দীতে রূপায়িত করেন প্রমোদ বেডিয়া 'সাহুকার ঔর কোতোয়াল' . মে ও পুরুলিয়ার সমবেত গোষ্ঠী এই নাটকের সুন্দর অভিনয় করে।

প্রেমচন্দের 'দুধ কা দাম'ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। সৌম্যেন্দু ঘোষ রূপায়িত দুধের . তাঁরই পরিচালনায় নাটকীয়'/'অভিনেয় (বালী) ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় .দ্দার সঙ্গে অভিনয় করছে ১৯৮১ থেকে। দেবী চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখও এই গল্পকে নাটক করেছেন ও তাদের অভিনয় হয়েছে।

মঞ্চদূত উপস্থাপিত করে লেখক, অভিনয়ে ছিলেন মানবেন্দ্র সন (যিনি পরিচালকও) এবং বর্ণালী চক্রবর্তী। প্রেমচন্দের 'সদগতি' গল্পটি বাংলায় নাটকাকারে .শত বার অভিনীত হয়েছে তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। এই গল্প অবলম্বনে অমল রায় লিখেছেন 'দুখী চামারের কুঠার'। যত্রতত্র নাট্য সংস্থা অরূপ মুখার্জির পরিচালনায় সদগতি শতাধিক বার মঞ্চস্থ করেছে সাফল্যের সঙ্গে। পম্পু মজুমদার, তপন গাঙ্গুলী প্রমুখ একে নাটকরূপ দিয়েছেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'সদগতি' অভিনয় করেছেন কাঁচরাপাড়া নাট্যকল্লোল, কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন বেলঘরিয়া, উদয়ন নাট্য সংস্থা মেদিনীপুর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। 'সদগতি' নাট্যরূপ বাংলা থেকে হিন্দীতে রূপায়িত করেছেন মিলন রায় ও খাপছাড়া কুলটী-এর অভিনয় করেছে। পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার 'সদ্‌গতি' এক অভিনব প্রযোজনা। এটা নৃত্য নাটক, কিংবা বলা ভাল নৃত্যে নাটক এতে ব্যালে নৃত্য ও নাটক এই তিনের সমন্বয় ঘটেছে। তার সঙ্গে ছিল সঙ্গীতের সুন্দর ব্যবহার। এর নৃত্য পরিচালক ছিলেন প্রেমব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত পরিচালক কুমার কিশোর ভট্টাচার্য। 'সদ্‌গতি'র প্রথম অভিনয় হয় ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৩, এবং নাটকটি শতধিক অভিনয়ের গৌরব অর্জন করেছে।

প্রেমচন্দের 'দো বয়েলো কি কহানী' গল্প অবলম্বনে সুন্দর নাটক লিখেছেন নিরূপ মিত্র 'হীরা মোতি বা দুই বলদের গপপো' নামে ১৯৮৪ তে। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন সংস্থা এর অভিনয় করে।

প্রেমচন্দের 'পূষ কী রাত' গল্পের ভাব নিয়ে গোপাল দাস লিখেছেন 'সেই কুঁড়ে লোকটা', এটি প্রথম মঞ্চস্থ করে শিল্পায়ন, দুর্গাপুর। 'সন্তান' গল্পের নাট্যরূপ দেন কুমারেশ ভট্টাচার্য এবং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সংসদ এর অভিনয় করে। কাহিনী নাট্য হেঁয়ালী'ও রূপায়িত করেন এই সংস্থার শিল্পীরা। 'দুরাশা' গল্প দিলীপ কুমার মিত্র কর্তৃক 'শলাকা' নামে অনূদিত হয় ও 'ভারতীয় একাঙ্ক গুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়। প্রেমচন্দের 'ঠাকুর কী কুআ' গল্পটিও বাংলা মঞ্চে এসেছে। প্রেমচন্দের 'কাতিল কী মা' গল্পের

নাট্যরূপ দেন শীলা চৌধুরী এবং শ্রুতিনাটক রূপে পরিবেশিত হয় ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সংসদ এর উদ্যোগে ৩১ ৭ ১৯৮৭ প্রেমচন্দ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে। ভারতবর্ষের কৃষক জীবনের মহাকাব্যিক রূপায়ণ 'গোদান' উপন্যাস ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় রচনা। 'গোদান' নাট্যরূপে পরিবেশিত হয়েছে বাংলায়। হিন্দীতে প্রতিভা আগরওয়ালের নাট্যরূপ বাংলায় অনুবাদ করেছেন রণজিৎ সিংহ, উপস্থাপিত করেছে থিয়েটার ফ্রন্ট। প্রথম অভিনয় ২৩ মে ১৯৮৪, অ্যাকাডেমি মঞ্চে। তারপর অন্তত ১০টি অভিনয় হয়েছে।

প্রেমচন্দের 'কফন' অবলম্বনে স্বপন দাস লিখেছেন 'বোধ' যে নাটকটি প্রয়াগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ তে। নাটকটি স্বপন দাসের পরিচালনায় প্রয়াগ নাট্যসংস্থা শতাধিক অভিনয় করে। পরিচালক ছাড়াও নাটকে অংশ নেন গার্গী দাস দিলীপ পাল প্রমুখ। মন্মথ রায় বললেন — বোধ নাটকটি আমাকে দেখিয়ে সত্যিই চমৎকৃত করে গেলেন। প্রত্যেকটি চরিত্র এমন নিখুঁত ভাবে অভিনীত হলো, মনেই হলো না অভিনয় দেখছি। এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পরিবেশিত দুটি মানুষের আশা হতাশার মধ্যে দিয়ে জীবন বৈচিত্র্য এমন ফুটে উঠেছে যা জীবনের আলো অন্ধকারের দুই স্রোতের সুমিলিত প্রয়াগ তীর্থই বটে। আমিও যেন অবগাহন করছিলাম (১০.১১.১৯৮৭)। আরো অনেক হিন্দী নাটক বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছে অনুবাদ ও অভিনয়ের মাধ্যমে। ভীষ্ম সাহনীর 'কবীরা খড়া বাজার মে' বাংলায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁরই পরিচালনায় 'চেতনা' নাটকটির অসাধারণ প্রযোজনা করেছে। অজস্রবার অভিনীত হয়ে নাটকটি মানুষদের আন্তরিক সমাদর লাভ করেছে।

ভীষ্ম সাহনীর 'হানুস' অনুবাদ করেছেন আশিস গোস্বামী যেটি বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৯৯৩)। স্যাস পত্রিকায় ৯৪ সালে তাঁরই অনূদিত 'মাধবী' প্রকাশিত হয়। সাহনীর 'মুয়াবেজ' প্রকাশিত হয় ২০০০ এর শারদীয় শূদ্রক পত্রিকায়। শ্রী গোস্বামীর অনুবাদ দক্ষতা এদের মধ্যে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। সর্বেশ্বর দয়াল সাকসেনা-র 'বকরি' অনুবাদ করেছেন সলিল সরকার বাংলা ১৩৯১ সনের শূদ্রক শরৎ সংখ্যায়। সলিল সরকার হিন্দী থেকে অনুবাদ করেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর 'জোঁক', দুধনাথ সিং-এর 'যমগাথা'। 'কোর্ট মার্শাল' অনুবাদ করেছেন সলিল সরকার যেটি অভিনীত হয়েছে।

সফদর হাশমী বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম, তাঁর নৃশংস হত্যার পর সারা দেশ উত্তাল হয়েছিল এবং নাট্যরসিকদের মনে হয়েছিলো যে সফদর হাশমী মানে জাগা জেগে থাকা জাগানো। সফদর ও জননাট্য মঞ্চের প্রায় সব নাটক বাংলায় অনূদিত হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় অনূদিত হয় 'গাঁও সে শহর তক' (সলিল সরকার)', 'হত্যারে' (প্রতিমা হায়দার), আওরত (আশিস গোস্বামী), 'রাজা কা বাজা' (অরুণ মুখোপাধ্যায়), 'হল্লা বোল' (প্রতিমা হায়দার), নন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'হল্লাবোল' (আশরফ চৌধুরী), 'অপহরণ ভাইচারেকা' (শচীন সরকার), নাঙ্গাপ্রসাদ (রঞ্জিত রায়চৌধুরী)। প্রয়াগ পত্রিকায় গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় অনুবাদ করেন 'অপহরণ ভাইচারেকা'। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি সফদর হাসমীর নাট্যসংগ্রহ প্রকাশ করে ১৯৮৯ এ। সফদরের নাটকের ভাব নিয়েও অনেক নাটক লেখা হয়েছে। হাশমীর নাটক বাংলায় অসংখ্য বার অভিনীত হয়েছে।

অসগর ওয়াজহত -এর 'সবসে সস্তা গোস্ত' বাংলায় অনুবাদ করেছেন গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা। নাটকটি বেশ কয়েকবার মঞ্চস্থও হয়েছে।

সূত্র পরিচিতি

১ হিন্দী নাটক, ডঃ বচ্চন সিং, পৃঃ ২১, এলাহাবাদ, ১৯৫৫
২ আধুনিক হিন্দী ঔর পঞ্জাবী নাটক, ডঃ সন্তোষ শার্গী, পৃঃ ১২৪, পাতিয়ালা ১৯৭০
৩ হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, রামচন্দ্র শুক্ল, পৃঃ ৪৫৩, কাশী, সংবৎ ১৯৯৭।
৪ হিন্দী নাটক সাহিত্য কা ইতিহাস, ডঃ সোমনাথ গুপ্ত, পৃঃ ১২১,
৫ হিন্দী নাটক ঃ উদ্ভব ঔর বিকাশ, ডঃ দশরথ ওঝা, পৃঃ ২৩১, দিল্লী, ২০১৮ বিক্রমাব্দ।
৬ তদেব
৭ হিন্দী নাটক সিদ্ধান্ত ঔর সমীক্ষা, রামগোপাল সিংহ চৌহান, পৃঃ ১৮৭, দিল্লী ১৯৭৯।
৮ লখনৌতে ১০ এপ্রিল ১৯৩৬ প্রথম সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে মুন্সী প্রেমচন্দ প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের অংশ।
৯ প্রগতিবাদ ঔর সমানান্তর সাহিত্য, রেখা অবস্থী, নয়াদিল্লী, ১৯৭০
১০ মুক্তি কা রহস্য, লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র, ভূমিকা, বারাণসী, স ১৯৮৯
১১ সন্ন্যাসী, লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র, ভূমিকা।
১২ রাক্ষসরাজ, লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র, ভূমিকা।
১৩ আজকে হিন্দী রঙ্গ নাটক, জয়দেব তনেজা, পৃঃ ৯, নয়াদিল্লী, ১৯৮০
১৪ হিন্দী নাটক সিদ্ধান্ত ঔর সমীক্ষা, রামগোপাল সিংহ চৌহান, পৃঃ ৩১৭, দিল্লী ১৯৭৯।
১৫ পাহেলা রাজা ও আধে অধুরে, অনুবাদ শমিতা অগ্রবাল ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা জগদীশচন্দ্র মাথুর, পৃঃ VI, নয়াদিল্লী, ১৯৭৮।
১৬. বীসবী শতাব্দীকে হিন্দী নাটকো কা সমাজ শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন, ডঃ লাজপত রায় গুপ্ত, পৃঃ ১৮১, মীরাট, ১৯৭৪।
১৭ নাট্য, কলিকাতা, মার্চ ১৯৬২।
১৮. নয়ে হাথ, বিনোদ রস্তোগী, ভূমিকা।
১৯. আধুনিক হিন্দী ঔর পঞ্জাবী নাটক, ডঃ সন্তোষ শার্গী, পৃঃ ১০০, পাতিয়ালা, ১৯৭০।
২০. আজ কে হিন্দী রঙ্গ নাটক, জয়দেব তনেজা, পৃঃ ১৫৫, নয়াদিল্লী, ১৯৮০।
২১ Enact, Ed R Paul Jan -Feb 77, New Delhi
২২. সমকালীন হিন্দী নাটককার, গিরীশ রস্তোগী, পৃঃ ৬১, দিল্লী, ১৯৮২।
২৩. হিন্দী নাটক ঃ পুনর্মূল্যাঙ্কন, ডঃ সত্যেন্দ্র তনেজা, পৃঃ ২৭, কানপুর, ১৯৭১।
২৪. হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, রামচন্দ্র শুক্ল, পৃঃ ৪৫৩, কাশী, সংবৎ ১৯৯৭।
২৫. হিন্দী নাটক ঃ পুনর্মূল্যাঙ্কন, ডঃ সত্যেন্দ্র তনেজা, পৃঃ ১৬৩, কানপুর, ১৯৭১।
২৬. তদেব, পৃঃ ২০৪।
২৭. হিন্দী মে নাট্যসাহিত্য কা বিকাশ, বিশ্বনাথ মিশ্র, পৃঃ ৩৫, ১ম সং।
২৮. দ্রষ্টব্য — আধুনিক হিন্দী সহিত্যে বাংলার স্থান, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৫৭।
২৯. হিন্দী নাটক ঃ উদ্ভব ঔর বিকাশ, ডঃ দশরথ ওঝা, পৃঃ ৩০৩, দিল্লী, বিক্রমাব্দ ২০১৮।
৩০. তদেব, পৃঃ ৪৩৪।
৩১. তদেব, পৃঃ ৪৩৫।
৩২. আধুনিক হিন্দী কবিতা ঔর রবীন্দ্র, ডঃ রামেশ্বরদয়াল মিশ্র, পৃঃ ২৮৭-২৮৮, দিল্লী ১৯৭৩।
৩৩. হিন্দী নাটক ঃ পুনর্মূল্যাঙ্কন, ডঃ সত্যেন্দ্র তনেজা, পৃঃ ২০৯, কানপুর।
৩৪. তদেব, পৃঃ ২০৩।
৩৫. আধুনিক হিন্দী কবিতা ঔর রবীন্দ্র, ডঃ রামেশ্বরদয়াল মিশ্র, পৃঃ ২৮৬-২৮৭, দিল্লী ১৯৭৩।

৩৬ তদেব, পৃঃ ৩০৩।
৩৭ হিন্দী নাটক ঃ উদ্ভব ঔর বিকাশ, ডঃ দশরথ ওঝা, পৃঃ ২৯৬, দিল্লী বিক্রমাব্দ ২০১৮।
৩৮ যুগান্তর, কলিকাতা, ২২ ৯ ৮৬।
৩৯ natya Tagora Issue (article Dance dramas of Tagore. Dr Charles Fabri P 14) Delhi
৪০ Vide The Hindu 22 5 87, Financial Express 24 5 87
৪১ পৌর্ভনিক, প্রথম বর্ষ, পৃ° ১৪৩, কলিকাতা।
৪২ নটরঙ্গ, সম্পাদক নেমিচাঁদ জৈন, সংখ্যা ৬, পৃঃ ৭৪, দিল্লী, ১৯৬৮।
৪৩ শরৎচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য, সম্পাদক নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, (প্রবন্ধ — হিন্দী সাহিত্যে শরৎচন্দ্র, মন্মথনাথ গুপ্ত, পৃঃ ১৫) দিল্লী, ১৯৭৬।
৪৪ আওয়ারা মসীহা, বিষ্ণু প্রভাকর, (বাংলা — ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ, অনুবাদ দেবলীনা ব্যানার্জী কেজরিওয়াল, ভূমিকা বিষ্ণু প্রভাকর, পৃঃ ১৬), দিল্লী ১৩৮৪।
৪৫ শরৎচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য, সম্পাদক নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, (প্রবন্ধ – হিন্দী সাহিত্যে শরৎ মানসিকতা, মায়া গুপ্ত পৃঃ ২১) দিল্লী, ১৯৭৬।
৪৬ হিন্দী নাটক ঃ পুনর্মূল্যাঙ্কন, ডঃ সত্যেন্দ্র তনেজা, পৃঃ ৩২৫, কানপুর, ১৯৭১।
৪৭ তদেব, পৃঃ ৩২৫।
৪৮ স্ক্রীন, কলিকাতা, ২৭ ১১ ৮৬।
৪৯ নটরঙ্গ, সম্পাদক নেমিচাঁদ জৈন, সংখ্যা ৯, ১৯৬৯, দিল্লী।
৫০ দৈনিক বসুমতী, কলকাতা, ১৩ ৯ ৮৪।
৫১ শনিবারের চিঠি, কলকাতা, ১২ ৪ ৮৬।
৫২ জলসাঘর দিলীপ কুমার মিত্র আনন্দলোক, কলকাতা, ২০ ৬ ২০০০।
৫৩ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ৮ ৬ ৭৩।
৫৪ দেশ, কলকাতা, ১৫ ৩ ৮৬।

পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক কন্নড় নাটক

১. সূচনা পর্ব

কর্নাটকে নাটকের ঐতিহ্য দীর্ঘ দিনের — অতীতকাল থেকেই নৃত্যনাট্য বিদ্যমান ছিল মর্যাদা ও মহিমায়। নৃত্যগীতি সম্পান্ন লোকনাট্যের এক বিশেষ রীতি হল 'যক্ষগান' যা ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং তা নাট্যামোদী মানুষের মন তৃপ্ত করত। ক্রমে মঞ্চ নাটকের উদ্ভব ও প্রসার ঘটে।

উনবিংশ শতাব্দীতে কন্নড় নাটকের প্রকাশ দেখা যায়। অনুবাদের মধ্য দিয়েই নাটকের সূচনা হয়। **বসবন্না শাস্ত্রী**, যিনি 'অভিনব কালিদাস' নামে আখ্যাত, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' 'উত্তররামচরিতম' 'চণ্ডকৌশিক' প্রভৃতি নাটকের সুন্দর অনুবাদ করেন। বসবন্না শাস্ত্রী শেকসপীয়রের 'ওথেলো' নাটক রূপান্তর করেন 'শূরসেন চরিত' (১৮৯৫) নামে। অবশ্য এর আগে 'ওথেলো' অনুবাদ করেন চুরমরি 'রাঘবেন্দ্র রাউ' (১৮৮৫) নামে। মুলাবগল 'উত্তররামচরিত' অনুবাদে দক্ষতা দেখান।

টি পি কৈলাসম-এর আগে কন্নড় ভাষায় বেশ কিছু সামাজিক নাটক লেখা হয়েছে। **কর্কি ভেঙ্কটরমণ শাস্ত্রী** গেলেন 'ইগ্গপ্পা হেগ্গডেয বিবাহ প্রহসন', (ইগ্গাপ্পা হেগ্গডে নামে লোকটার বিয়ের প্রহসন) যেটি অসম বয়সের বিবাহ নিয়ে লেখা প্রথম সামাজিক নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয ১৮৮৭ সালে। এটি বেশ আলোড়ন ফেলে।

একই বছরে রচিত হয় **শিবরাম ধারেশ্বর** রচিত 'কন্যাবিক্রয' যা নারীদের ওপর শোষণ ও অত্যাচারের চিত্র। বিশেষত কর্ণাটকের এক বিশেষ সম্প্রদায় হব্যাকা সমাজের চিত্র এতে চমৎকার ফুটেছে। এ দুটি কন্নড় ভাষায় প্রথম পর্যায়ের মৌলিক নাটক। রেনেসাঁসের প্রভাবে বাংলায় ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যে সংস্কার মূলক ও নতুন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এই নাটক দুটিতে তার প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য নাটকের উল্লেখ করা যায়; যেমন—**বেনাগল রামা রাও** রচিত 'কলহপ্রিয়া প্রহসন' (১৮৯৮)। **কেরুরু বাসুদেবাচারিয়া** রচিত 'পতিবশীকরণম' (১৯৬৬) ইত্যাদি। 'পতিবশীকরণম' গোল্ডস্মিথের লেখা She Stoops to Conquer অবলম্বনে রচিত। এটি কন্নড় রঙ্গমঞ্চে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। **ভেঙ্কটরঙ্গ কট্টি** রচিত 'আরু বেরলিন কুরুগু অর্থাৎ সুধারিসতক্ক আচরণেগলু' (১৮৯৮, ছোট আঙুলের সংকেত অথবা সংস্কারকরণীয় আচরণগুলি) ঠিক নাটক নয়, অনেকটাই সংলাপধর্মী রচনা; এটির বিষয় বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ।

২. প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব

১৯৩০ থেকেই কন্নড় নাটকের নতুন যুগ শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক ছিল পেশাদার রঙ্গমঞ্চের যুগ, তিরিশ থেকে আরম্ভ হয় আধুনিক নবোদয় নাটক এবং অপেশাদার বা সৌখীন নাটকের যুগ যা হরিয়াম্নি নামে আখ্যাত। প্রথম তিন দশকে থিয়েটারের

কাজকর্মে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল। রঙ্গালয় ছিল জাঁকজমকপূর্ণ এবং নাটকে সঙ্গীতেরও অসাধারণ প্রয়োগ হত। যদিও বড় নাট্যকার তখন আসেন নি বিশেষ; রঙ্গায়নের আতিশয্য এবং আধিক্যও ছিল প্রকট। এরই ফলে তিরিশেই গড়ে ওঠে নতুন নাট্যরীতি যাকে সমালোচক বলেছেন naturalistic থিয়েটার। As a negative reaction to the pomp din and festive atmosphere of this theatre (প্রাক তিরিশের নাটক), naturalistic theatre appeared in the thirties. It was a theatre of the sophisticated, urban, middle class.[১] এই রীতির প্রথম নাট্যকার হলেন টি পি কৈলাসম। যদিও তিরিশের আগে থেকেই তিনি নাটক লিখছেন।

তিরিশের পর থেকে সমাজসচেতন নাটকও বিশেষভাবে লেখা হয় যাতে অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অবিচার, ছু-অচ্ছুৎ, নারীজীবনের দুরবস্থা ইত্যাদি বিষয় রূপ পেতে থাকে। কৈলাসম, বেন্দ্রে, রঙ্গাচার্য প্রমুখের নাটক এ প্রসঙ্গেই বিশেষ উল্লেখ্য। দত্তাত্রেয রামচন্দ্র বেন্দ্রের 'উদ্ধার' ৩০-এর প্রথমেই লেখা যেটি কন্নড় ভাষায় প্রথম অস্পৃশ্যতা সমস্যা নিয়ে নাটক। শ্রীরঙ্গর প্রথম দিকের লেখা 'হরিজনবার' (১৯৩৩) নাটকও হরিজনদের কথা বলে ও তাদের নিয়ে ব্রাহ্মণদের নীচতা এবং শঠতার ছবি তুলে ধরে। আরও উল্লেখ্য এই যে ১৯৩০ থেকেই কোম্পানী নাটক অতি উন্নত স্তরে পৌঁছয় ও তদানীন্তন শিল্প রচনার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। By the 1930s, Company Nataka reached the pinnacle of its glory and its alchemy became so common that it became a model for all other popular arts to emulate.[২] এই ভাবে ১৯৩০ এর পর থেকে কন্নড় নাটকে নবীনতা বা আধুনিকতার সার্থক প্রকাশ দেখা যায়।

টি পি কৈলাসম (১৮৮৪-১৯৪৫) কন্নড় ভাষায় প্রথম যথার্থ সামাজিক নাটকের সূচনা করেন একথা বলা যায়। কৈলাসম একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি এবং যে কোন ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের সঙ্গে তার তুলনা চলে। তিনি ইংলন্ডে ছিলেন এবং ইবসেন প্রমুখ নাট্যকারদের রচনা ও পাশ্চাত্য বিচিত্র নাট্যরীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হন। বাস্তবতা ও আদর্শ, হিউমার ও স্যাটায়ার, গীতলতা ও নাটকীয়তা, ব্যঙ্গাত্মক টাইপ ও গভীর ভাবাদ্যাতক চরিত্র সৃজন—সৃষ্টির এই বৈচিত্র্য ও বিস্তার তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। সামাজিক রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক কৌতুকপূর্ণ আদর্শনিষ্ঠ নাটক রচনায় তিনি যেমন দক্ষ (যেমন 'টোল্লু গট্টি', 'পোলি কিট্টি', 'হোমরুল' প্রভৃতি নাটক যার প্রকাশ); তেমনি ভাবগম্ভীর ট্র্যাজেডিও তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশেষ তাঁর ইংরেজী নাটকে (যেমন Purpose, Fulfilment, Karna) তাঁর প্রথম নাটক 'টোল্লু গট্টি অথবা মক্কলি স্কুল মনেলভে' (ফাঁপা শক্ত অথবা বাচ্চাদের স্কুল বাড়িতেই তো) লেখা হয় ১৯২২ সালে। এটি কন্নড় নাট্যক্ষেত্রে এক নতুনত্বের সঞ্চার করে। নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার জীবনের মূল্যবোধকে তুলে ধরেছেন। পুটু ও মাধু দুই ভাই। পুটু লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে, পরীক্ষায় সে সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু সে ফাঁপা শূন্যগর্ভ। অপরদিকে মাধু গ্রন্থকীট নয়, যে সহজ স্বাভাবিক সহৃদয়। কিন্তু সে তার অসুস্থ মায়ের দেখাশোনা করে, মার সেবা শুশ্রূষা করে। সেই যথার্থ পূর্ণগর্ভ, পূর্ণ হৃদয়। নাটকের ভূমিকায় প্রখ্যাত সমালোচক C. R. Reddy যথার্থই বলেছেন—'Here is a diamond of the first quality and cut in the best style'. তাঁর 'হোমরুল' (১৯৩০) ছোট নাটকটিতে এক পরিবারে গৃহকর্তা স্বীকার করে যে 'বাড়িতে একজনই কর্তা আছে যে হল গৃহিনী।' কৈলাসম-এর লেখা 'বহিষ্কার' ও 'সূলে' আমাদের দেশে নারীদের দুরবস্থা নিয়ে লেখা। সমাজের অন্যায়েই তা ঘটে। 'বহিষ্কার'-এ

এক দরিদ্র কেরানী রঙ্গন্নার কথা বলা হয়েছে। দারিদ্রের জন্য যে মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না যদিও তার বয়স হয়েছে। ব্রাহ্মণরা রঙ্গান্নার বাবার পারলৌকিক কাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। তার মেয়ে নরসূ অত্যন্ত সংবেদনশীল ও সচেতন। সে যখন বোঝে তার জন্যই তাদের পরিবার বিপন্ন ও বিপর্যস্ত সে আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যু সাহসিক কাজ কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয় না। শেষের দিকে লেখা 'সূলে অথবা ওলভিন কোলে' (১৯৪৫ পতিতা অথবা ভালবাসার মৃত্যু) এক রিয়ালিস্টিক ট্র্যাজেডি যাতে অভিশপ্ত পতিতাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে মৃত্যু ছাড়া যার প্রতিকারের কোন পথ নেই। এক পতিতা তার মেয়েকে পতিতা হওয়া থেকে বাঁচাতে না পেরে সমাজের চাপে তাকে হত্যা করে ও নিজেও আত্মহত্যা করে। কৈলাসম-এর অন্যান্য বিশিষ্ট নাটক হল 'হুত্তাদলি হুত্ত' (১৯৪১, সাপের বাসায় সাপের বাসা--যেটা নাট্যকারের মতে আনরোমান্টিক কমেডি), নমকপ্পনি' (১৯৩৪, পুরোনো ধরনের নাটকের ব্যঙ্গ), 'সন্তবান সন্তান অথবা ত্রিশঙ্কুনরক' (১৯৪৩) 'পোলী কিট্টি' (১৯৪৩ দুষ্টু ছেলে কিট্টি, কমেডির অন্তরালে গভীর ভাবনা), 'নমব্রাহ্মঙ্কে' (১৯৪৫, ব্যঙ্গ নাটক), 'কীচক' (১৯৫০-নাট্যকার কথিত ইংরেজী নাটকের অনুবাদ) ইত্যাদি।

টি পি কৈলাসম নাটকে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র এনছেন—স্ত্রৈণ স্বামী, ভণ্ড রাজনীতিবিদ, মক্কেল না পাওয়া উকিল, জাঁদরেল স্ত্রী, প্রাচীনপন্থী বিধবা ইত্যাদি। তুলির স্বল্প আঁচড়ে তিনি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি একজন সুদক্ষ বাকনিপুণ শিল্পী যে ব্যঙ্গাত্মক ও বিদগ্ধ সংলাপ সমাজের ভণ্ডামী ও নীচতার রূপকে তুলে ধরে। কাহিনী নির্মাণেও তিনি পটু। যদি ঘটনাবিন্যাসে আতিশয্য, স্বগতোক্তির দীর্ঘতা, কথোপকথনে ইংরেজীর আতিশয্য তাঁর নাটকের বিশেষ ত্রুটি হয়েই দেখা দিয়েছে তবু the genius of Kailasam which blew like a wild wind on the Kannada land is something of a miracle to be admired in the history of Indian and world drama. টি পি কৈলাসম যথার্থই আধুনিক কন্নড় নাটকের জনক রূপে অভিহিত।

উত্তর কর্ণাটকে সামাজিক নাটকের সূচনা হয় **নারায়ণরাও কৃষ্ণরাও হুয়িলাগোল** (১৮৯৫-১৯৭১) রচিত 'শিক্ষণ সম্ভ্রম' (১৯২৫) নাটকের মধ্য দিয়ে। নাটকটি সুন্দর যদিও আঙ্গিকের বিচারে অনেকটাই প্রাচীন আদর্শের অনুসরণ আছে। আধুনিক শিক্ষার পথে বাড়াবাড়ি ও বেকার সমস্যা নিয়ে এটি লেখা। অচ্যুতরাও কৃষ্ণরাও হুয়িলাগোলর নাটক হল 'মহারথী ভীষ্ম' (পৌরাণিক নাটক ১৯৫২), 'বৈকুণ্ঠ মুক্তিজে' (প্রহ্লাদকে নিয়ে পৌরাণিক নাটক, ১৯৪৯), 'নরগুণ্ড মুক্তিজে' (বাবাসাহেব নরগুণ্ডর পতন নিয়ে ঐতিহাসিক নাটক, ১৯৫১) ইত্যাদি।

দত্তাত্রেয় রামচন্দ্র বেন্দ্রে (অম্বিকাতনয় দত্ত, ১৮৯৬-১৯৮১) বেশ কটি নাটক লিখেছেন তিনের দশকেই যাতে তার গভীর সমাজচেতনা ও প্রখর শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর কর্ণাটকের ভাষার প্রয়োগেও তিনি দক্ষ। তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ হল— 'তিরুকর পিড়ুগু' (ভিখিরিদের সমস্যা, তিনটে একাঙ্ক ১৯৩০), 'উদ্ধার' (১৯৩২), 'হুক্কাটাগলু' (মুর্গীগুলো, পাঁচটা একাঙ্ক, ১৯৩৩), 'হোস সংসার মত্তু ইতর একাঙ্কগলু' (পাঁচটা একাঙ্ক ও একাঙ্কর টেকনিকের আলোচনা আছে ১৯৫০) ইত্যাদি। কন্নড় ভাষায় অস্পৃশ্যতার সমস্যা নিয়ে লেখা প্রথম নাটক 'উদ্ধার'। নাটকে তিন ধরনের চরিত্র আছে। কোদন্ডরায় ও স্পর্শানন্দ মন্দিরে অচ্ছুতদের প্রবেশাধিকার চাইলেও তা সন্দেহজনক; দুর্গাপ্পা ও তাদের অচ্ছুৎ সঙ্গীরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়াতে চায়; বিঘ্নেশ্বরভট ও

রুদ্রাইয়া শহরের সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতীক। আর সিদ্দাপ্পা এক বৃদ্ধ অচ্ছুৎ যে আলাদা থাকে ও এদের রাজনীতির খেলা দেখে কিন্তু কিছুই করতে পারে না। বেন্দ্রের 'নগেদ হোগে' (আগুনের হাসি) বিভিন্ন দৃশ্যে বিন্যস্ত ছোট নাটক। সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারে এক তরুণী অবিবাহিত ব্রাহ্মণ কন্যার দুরবস্থা এতে আঁকা হয়েছে।

তিনের দশকের শেষ প্রান্তে এবং স্বাধীনতার পূর্বে চারের দশকে সারা দেশে যে প্রগতিশীলতার জোয়ার এসছিল কন্নড় সাহিত্যও তাতে আন্দোলিত হয়। গল্প উপন্যাস ইত্যাদিতে তার প্রভাব পড়েছিল। যেমন এ এন কৃষ্ণরাও-এর কথা বলা যায় যিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ঔপনাসিক। কিন্তু চারের দশকেও কন্নড় ভাষায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক লেখা হয় বহুল পরিমাণে, যারা শিল্পরূপে সার্থক কিন্তু তদনীন্তন অগ্নিময় দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ জীবনের ছাপ যে সব লেখায় খুব বেশী নেই। সামাজিক নাটকও কিছু লেখা হয় কিন্তু প্রগতিশীল রূপে তারা অভিহিত হবে না।

শ্রীকণ্ঠশাস্ত্রী অমরাচার্য হীরেমঠ (১৮৮০-১৮১৯) এর লেখা হল —'হেমবেড্ডি মল্লম্ম নাটক' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৯৪৭ ও ১৯৪৮, মল্লম্মর প্রচলিত কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা ভক্তিমূলক নাটক; 'মঙ্গলসূত্র নাটক'; 'মুডলপ্যায়া অহিরাবণ মহিরাবণ অবধূত চরিত্র', ১৯৫২; 'বৈলতা' বা মুক্তমঞ্চের লোকনাটক — পুরাণ কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা; 'মুডলপায়্যা দ্রৌপদী বস্ত্রহরণম' ১৯৫২, (মুডলপায়া হল বিশেষ ধরণের নাট্যরীতি) মহাভারতভিত্তিক লোকনাটক, ১৯৫২; 'মুডলপায়া ইন্দ্রজিৎ কালগা'—মুডলপায়া রীতিতে রচিত ইন্দ্রজিৎ কাহিনী ১৯৫৩; 'মুডলপায়্যা রতিকল্যাণ' অর্থাৎ মন্মথ বিজয় ১৯৫২ ইত্যাদি।

বেল্লাভি নরহরি শাস্ত্রী (১৮৮২-১৯৬১) শতাব্দীর প্রথম থেকেই নাটক নিয়ে এসেছেন। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল 'রাজশেখর বিলাস' (১৯১১), 'শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত' (১৯৩২), 'তুকারাম' (১৯৩৪), 'পাণ্ডব বিজয়' (১৯৩২), 'ভামা পরিণয়' (১৯৩৯, গদ্যপদ্যে পৌরাণিক নাটক), 'ভক্তি সাম্রাজ্য' (১৯৪৭), 'হাস্য কল্লোল' (আটটি হাসির একাঙ্ক, ১৯৪৮), 'অনসূয়া' (১৯৪৯), 'দশাবতার' (১৯৫০), 'মহাত্মা বসবেশ্বর' (গদ্যপদ্যে লেখা, ১৯৫১), 'শ্রীকৃষ্ণগারুডি' (১৯৫১, গদ্যপদ্যে লেখা পৌরাণিক নাটক), 'জলন্ধর' (গদ্যপদ্যে লেখা প্রচলিত রীতির নাটক) ইত্যাদি। তাঁর অধিকাংশ নাটক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে।

অপেরাধর্মী নাটক নিয়েছেন পুরোহিত **টি নরসিংহাচার** (১৯০৫-১৯৯৮) তাঁর বিশিষ্ট রচনা হল 'অহল্যে' (রামায়ণের অহল্যা উপাখ্যান নিয়ে অপেরা), 'দোনিয়া বিনদ মত্ত কবি' (দুটি অপেরা, ১৯৪৩), 'গোকুল নির্গমন' (১৯৪৫, কৃষ্ণর গোকুল থেকে মথুরা যাওয়া নিয়ে অপেরা), 'বিকটকবি বিজয়' (১৯৪৯, ব্যঙ্গনাটক) ইত্যাদি।

ভেঙ্কটেশ আয়াঙ্গার মাস্তি (ছদ্মনাম—শ্রীনিবাস, ১৮৯১-১৯৮৬) একজন প্রতিভাবান নাট্যকার। তিনি উচ্চমানের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক লিখেছেন, কমেডি রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। গদ্য, ব্ল্যাঙ্ক ভার্স, সঙ্গীত—নাটকে তিনের ব্যবহারেই তিনি নিপুণ। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল 'সাবিত্রী' (১৯২৩, পৌরাণিক নাটক), 'কাকন কোটে' (১৯৩০), 'মঞ্জুলা' (১৯৩০), 'শিব ছত্রপতি' (ঐতিহাসিক ১৯৩২), 'তিরুপাণি' (১৯৩৭, দক্ষিণ ভারতের এক হরিজন সাধককে নিয়ে লেখা, ভি কে গোকক একে বলেছেন—It is a gem in its own kind), 'যশোধারা' (বুদ্ধপত্নী যশোধারাকে নিয়ে কাব্য নাটক)। মাস্তির 'উষা' 'শান্তা' ও 'সাবিত্রী' কাব্যময় সুন্দর নাটক and they introduce us to a portrait gal-

lery of charming heroines. (V.K. Gokak) মাস্তির 'তালি কোট' (তালি কোট নামের দুর্গ) বিজয়নগর রাজ্যের পতনকে নিয়ে লেখা শেক্সপীয়র রীতির শক্তিশালী ঐতিহাসিক নাটক।

কে ভি পুট্টাপ্পা (ছদ্মনাম কুবেম্পু ১৯০৪-১৯৯৪) কবি হিসাবে বিশেষ খ্যাতিমান। নাটক রচনায়ও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩০ সালে তিনি লেখেন শেকসপীয়রের 'টেমপেস্ট' অবলম্বনে 'বিরুগলি'। 'হ্যামলেট' অবলম্বনে তিনি লেখেন 'রক্তাক্ষী' যেটি মহীশূর রাজ্যের বিদানুর-এর ইতিহাস আশ্রিত ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি লিখেছেন দুটো নাটক 'শূদ্র তপস্বী মত্তু বলিদান'। আজও বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে 'শূদ্র তপস্বী' নাটকটি। সত্যবান-সাবিত্রীর উপযোগের ওপর ভিত্তি করে লেখা 'য়মন সোলূ মত্তু ইতর নাটকগলু' (১৯৪৪) অমিত্রাক্ষর ছন্দের লেখা তাঁর প্রথম নাটক এবং সম্ভবত কন্নড় ভাষায়ও প্রথম। মহাভারতের একলব্য কাহিনীর ওপর নির্ভর করে লিখেছেন 'বেরালগে কোরাল' (১৯৪৭, আঙুলের জন্য গলা)

সমসা (এ সামী ভেঙ্কটাদ্রি আইয়ার, ১৮৯৮-১৯৩৯) নাট্যপ্রতিভার বিচারে টি পি কৈলাসম-এর সমতুল। যদিও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কৈলাসম লিখেছেন মহাকাব্যিক ও সামাজিক নাটক। সমসা ঐতিহাসিক নাটক রচনায় বিশিষ্ট। তাঁর 'বিগড়বিক্রমরায়' (সামন্ত বিক্রমরায়ের ঔদ্ধত্য, ১৯৩৩) নাটকের বিষয় হল এই—রাজার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতি রাজার প্রতি আনুগত্যের ভান করে কেমনভাবে সিংহাসন দখলের চক্রান্ত করেছিল। নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতে এবং শিল্পময়তায় বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। সমসা ছিলেন শেকসপীয়রের অনুরাগী পাঠক এবং শেকসপীয়রীয় ভাব ও রীতির গাম্ভীর্য ও মহিমা এবং শিল্প কৌশল তাঁর নাটকে ধরা পড়েছে, 'বিগড়বিক্রমরায়' নাটকটি সে বিচারে বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট নাটক হল 'বেট্টদ অরসু' (পাহাড়ের রাজা, ১৯৩৩) , 'সুগুনা গম্ভীর' (১৯৩৭), 'বিজয় নরসিংহ' (১৯৪৩) ইত্যাদি।

বি পুট্টস্বামাইয়া (১৮৯৭-১৯৮৪) প্রায় ২৫টি নাটক লিখেছেন যাদের মধ্যে সামাজিক ঐতিহাসিক পৌরাণিক ধর্মমূলক ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবনার প্রকাশ দেখা গেছে। সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাল রায়ের 'সাহজাহান' দিয়ে তার নাট্যরচনা শুরু যেটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরের নাটক 'কুরুক্ষেত্র' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় যাতে অর্জুন ও কৃষ্ণের মতাদর্শের দ্বন্দ্ব আছে যদিও কৃষ্ণের জ্ঞান ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রাধান্য পায়। তিনি নতুন ভাবে লেখেন 'সম্পূর্ণ রামায়ণ'। জীবনী নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট 'গৌতম বুদ্ধ'; 'অক্ক মহাদেবী'—দ্বাদশ শতাব্দীর বীরশৈব কবি ও সাধিকার জীবনকথা এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও মনীষার প্রকাশ; 'প্রভুদেব' (মহান মিস্টিকের জীবন ও সাধনার কথা); 'সতী তুলসী' ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' অনুবাদ করেন 'প্রচণ্ড চাণক্য' নামে এবং 'পাষাণী'র অভিনব রূপায়ণ ঘটান 'নেলেয়গু, শিলেয়গু কলেয়গু দেবী' রূপে যাতে লেখকের শিল্পসৃজনভাবনা রূপ পেয়েছে। তাঁর 'বিড়ুগডেয় বিচ্চগত্তি' (স্বাধীনতাব নগ্ন তরবারি) উচ্চমানের ঐতিহাসিক নাটক। তাঁর 'যাজ্ঞসেনী ও বভ্রুবাহন' খ্যাতি পায়। 'অভিনেত্রী' (১৯৪৮) সামাজিক নাটক। সীতাদেবী একজন দক্ষ অভিনেত্রী যাকে তার উদ্দাম স্বভাবের স্বামী কলকাতায় বিক্রি করে দেয়। সীতাদেবী এক বাঙালী পরিবারে থাকে। তাদের কর্ণাটকী গান শোনায় ও নিজে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে খুশী হন। তারপর সীতাদেবী মাদরাজে যায়। তার স্বামী ও ছোট মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হয় যে মেয়েকে তার স্বামী জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়ে মার জন্য

ব্যাকুল কিন্তু স্বামীর অপমান তার অত্যাচারে সীতাদেবী বিমূঢ় উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাঁর 'হরিত্তিনা কোলি' (আটাব মুরগী) নাটকের ভিত্তি কন্নড় ক্লাসিক 'যশোধারাচরিত্র', লেখক জন্ন। অনৈতিক প্রেম ও কামনা বিকৃতির ওপর ভিত্তি করে লেখা এটি, যদিও যৌন বিকৃতির বদলে ন্যায়ের আদর্শ প্রতিপাদিত।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব

স্বাধীনতার পর কন্নড় নাটকে নতুন উন্মাদনা আসে। যাঁরা এতদিন নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তাদের লেখায় এল নতুন প্রাণ নতুন চেতনা। যক্ষগণ ইত্যাদি প্রচলিত প্রাচীন ও ঐতিহ্যনিষ্ঠ রীতিও নবপ্রেরণায় বিকশিত হয়ে উঠল। The partition and national independence brought in a rich variety of themes in our drama. The unification of the Kannada-speaking areas brought an awareness of ourselves and a sense of self evaluation. Now, with the encouragement given to the stage and the playwright, the Kannada theatre seems to be finding its feet again. Yakshagana is coming into its own. The professional stage is consolidating itself as seen by the recent long runs of Gubbis 'Kurukshetra', Yenigi Balappa's 'Basareswara' and Chittarigi Company's 'Jeevanyatra'. The amateur stage seems to be at work again with a greater determination, as evidenced by the activities of several taented troupes. Drama Conferences and Fesitivals are proving beneficial to the resurrection of the stage. The audience is becoming increasingly thoughtful and critical. Here lies the real hope for the Kannada stage."[৪]

আদ্য রঙ্গাচার্য (শ্রীরঙ্গ, ১৯০৪-১৯৮৫) কন্নড় নাটকের এক উজ্জ্বল পুরুষ। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ও সৃজনশীল এই লেখক কন্নড় সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। কন্নড় নাটকের তিনি 'সর্বাপেক্ষা পূর্ণ মানুষ' (most complete man) বলে অনেকে মনে করেন। তিনি প্রায় চল্লিশটা পূর্ণাঙ্গ ও একশটা একাঙ্ক নাটক লিখেছেন, অনেক নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন, নাট্যতত্ত্ব ও থিয়েটার নিয়ে ইংরেজী ও কন্নড় ভাষায় বই লিখেছেন, আধুনিক কন্নড় নাট্য আন্দোলনকে গড়ে তুলেছেন এবং থিয়েটারকে সমাজে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর নাটক ধ্রুপদী আদর্শে স্থির, আধুনিকতায় উদ্ভাসিত, শিল্পরূপে বৈচিত্র্যময়, সমাজভাবনায় প্রখর এবং মানবিকতায় দীপ্ত—মানুষের সুখৈষণা ও আত্মানুসন্ধান যেখানে প্রবল হয়।

আদ্য রঙ্গাচার্যর নাট্যচর্চাকে দুটো পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম পর্যায় হল তাঁর প্রথম নাটক 'উদার বৈরাগ্য' (১৯৩০) থেকে 'শোকচক্র' (১৯৫২)। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়কাল ১৯৬০-এর নাটক 'কট্টলে বেলকু' (অন্ধকার ও আলো) ও 'কেলু জন্মেজয়' (শোন জন্মেজয়) থেকে শেষ পর্যন্ত যে সময়ের অন্যান্য বিখ্যাত নাটক হল 'রঙ্গভরত' (১৯৬৫), 'স্বর্গাক্ক মুরে বগিলু' (১৯৭০—স্বর্গের জন্য তিনটে দরজা) 'অপরাধঙ্গল ক্ষমিসো' (১৯৭১) ইত্যাদি।

প্রথম পর্যায়ের লেখা 'হরিজনবার' (১৯৩৩) শ্রীরঙ্গর এক অনন্য নাট্যকর্ম। এক আধুনিক মনোভাবাপন্ন উচ্চমাপের ব্যক্তি হরিজনদের উন্নতির কথা বলে কারণ সে নির্বাচনে জিততে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই লোকটি অত্যন্ত স্বার্থপর ও বর্ণবিদ্বেষী। তার স্ত্রী প্রাচীনপন্থী কিন্তু সেই প্রকৃতপক্ষে উদার সহৃদয় সংবেদনশীল। সে একটি হরিজনশিশুকে নিম্ন অবস্থা থেকে তুলে এনে তার প্রাণ রক্ষা করে। গান্ধীজীর আদর্শে

শিক্ষিত নাট্যকার এই নাটকে উচ্চবর্ণের মানুষদের মিথ্যাভাষণ ও কপটাচারকে তীব্র আঘাত করেছেন এবং ১৯৩৩ সালে যখন 'হরিজনবার' প্রথম মঞ্চস্থ হয় তখন ধারবার ও অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল তাদের ওপর আক্রমণের জন্য।

সন্ধ্যাকাল' (১৯৪৩) অবক্ষয়ক্লিষ্ট মুমূর্ষু শিল্প সংস্কৃতির রূপ তুলে ধরে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত কিন্তু অপদার্থ তরুণ সমাজের চিত্রও অঙ্কন করে। অনেকটা চেকভীয় রীতিতে সামাজিক পরিবর্তনের কথা বলে। 'শোকচক্র' (১৯৫২) একটি রাজনৈতিক নাটক যাতে এক আদর্শনিষ্ঠ গান্ধীবাদী চরিত্রের সঙ্গে ক্ষমতালোভী আদর্শবিচ্যুত রাজনীতিবিদের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। এই নাটকেও লেখক আদর্শহীন নীতিবিচ্যুত মূলত স্বাধীনতা পরবর্তীকালের, রাজনীতিবিদদের মেনে নিতে পারেন নি।

পরবর্তী পর্যায়ে রঙ্গাচার্যর নাট্যভাবনা ও নাট্যরীতির মধ্যে পরিবর্তন আসে। এই সময়ে লেখা 'কট্টলে বেলকু' এবং 'কেলু জন্মেজয়' প্রকৃতপক্ষে কন্নড নাটকে নবযুগ আনয়ন করে। 'কেলু জন্মেজয়' (শোন জন্মেজয়) সামাজিক বক্তব্য সমন্বিত রাজনৈতিক রূপক ও নেতৃত্বকে তীব্র ব্যঙ্গ। নাটকে সব কটি চরিত্রই বিশিষ্ট। বৃদ্ধ হল অভিজ্ঞতার প্রতীক, যুবক উৎসাহ ও উদ্যমের প্রতীক, নারী সহনশীলতার প্রতীক ও এক সাধারণ মানুষ যে কর্মশক্তির প্রতীক যার মধ্যে মেধা বা বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ নেই। এবং নেতা হল অন্ধ যে মানুষকে পথ দেখাবে কিন্তু তার দৃষ্টি নেই। সাধারণ লোক মেয়েটিকে বিয়ে করে নতুন জগৎ সৃষ্টির জন্য কিন্তু সে পারে না। নেতা এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে নতুন সমাজ গঠনের জন্য কিন্তু তা যান্ত্রিক মানবতাবোধবর্জিত শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। যদিও সবার সমন্বয়েই গড়ে উঠবে সভ্যতা যার জন্য চাই জ্ঞানীবুদ্ধিমান চোখওয়ালা দক্ষ নেতা। নাটকের নাম নেওয়া হয়েছে কুমারব্যাসের রচনা থেকে যিনি কন্নড ভাষায় মহাভারত নতুন করে লিখেছিলেন—হে জন্মেজয় শোন অন্ধরাজার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছিল বিদুরের উপদেশ শুনে। তিনি (ধৃতরাষ্ট্র) বিদুরকে অনুরোধ করেছিলেন আত্মপ্রকৃতি ও স্বরূপের গূঢ় তত্ত্ব তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করতে। সূত্রধার (যিনি নাটকের এক অভিনেতাও বটেন) নেতাকে বলেছে 'অন্ধরাজা' এবং আরও বলেছে যে বর্তমান সময়ে কোন অন্ধ অনুসরণ করে না অন্ধকে। Within the framework of this political allegory the play covers the themes of free will, the inter-relationship of man and woman and human destiny[৫] আঙ্গিকের দিক থেকেও নাটকটি অভিনব।

'কট্টলে বেলকু (অন্ধকার ও আলো) নাটকে নাট্যকর্মের আঙ্গিক নিয়ে বৈচিত্র্য আছে এবং নাটকের ভাবনা ও বক্তব্য নিয়ে মৌলিক চিন্তা আছে। নাটকে জীবনের এবং শিল্পের বেদনাদায়ক অসংগতির চিত্র অঙ্কন করে যা সৃজনশীলতা হারিয়েছে। নাটকের প্রধান চরিত্র এক নাট্যকার যে তার ঘরে প্রায় স্বেচ্ছা নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন। তার কাছে এক থিয়েটার প্রডিউসার ও এক ডিরেক্টর আসে ও একটা নাটক দিতে বলে। পৌরাণিক ঐতিহাসিক বা সামাজিক যে কোন ধরনের নাটক তাদের চাই। নাট্যভাবনার এই সরলীকরণে নাট্যকার বিরক্ত হয়ে তাদের কিছু দিতে অস্বীকার করে। তাছাড়া নাট্যকার আর চিন্তা করতে পারেনা এবং তার কল্পনা দিয়ে কোন আকর্ষক চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেনা কারণ এমন চরিত্র আর নেই। আসলে নাট্যকার তাদের বলা এই সব নাট্যরীতিকে মনে করে মিথ্যা বাতিল ও পরিত্যক্ত। প্রযোজক ও পরিচালক কিছু প্লটের কথাও বলে কিন্তু নাট্যকার তা গ্রহণ করবে না কারণ প্রত্যেক প্লট হল গতানুগতিক ও অবাস্তব। কিন্তু নাটকের আয়রনি হল এই যে নাট্যকার যা অবাস্তব বলে বাতিল করে বাস্তবে তাই ঘটে

বাড়ীকে কেন্দ্র করে। চারপাশে স্ক্যাণ্ডল ও মৃতদেহ দেখা নাগরিক, ব্যস্ত সমস্ত পুলিশ, স্ত্রীর খোঁজ করা ব্যক্তি (?), স্বামীকে হত্যা করতে চাওয়া মহিলা (?) ইত্যাদি নাট্যরসকে ঘনীভূত করে। নাট্যকারের আইডিয়া শুদ্ধ হয়ে গেছে যে তথাকথিত প্লট চায় না ঃ তবু তার ঘবকে কেন্দ্র করেই নাট্যরস নিবিড় হয়ে ওঠে।

আদ্য রঙ্গাচার্যর 'রঙ্গভরত' (১৯৬৫) নাটকে মহাভারতের কথা বলা হয়েছে আধুনিক সজ্জায়। অতীতে ও বর্তমানের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াসও আছে। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথাই নাটকে প্রধান যা আজও প্রবল ও প্রকট। 'স্বর্গক্কে মূরে বাগিলু' (স্বর্গের জন্যে তিনটে দরজা) সুখের চিরন্তন অন্বেষার কথা। অত্যাচারের রূপ যুগে যুগে থাকে—এক অন্ধ ভিক্ষুকের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে। তাইরেসিয়াসের অন্ধত্বের মত ভিক্ষুকের অন্ধত্ব মানব ইতিহাসের বিবর্তনকে যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করে। একটা দৃশ্যের চরিত্র অন্য দৃশ্যে আসে ভিন্ন ভূমিকায় ও ভিন্ন আইডেনটিটি নিয়ে। কিন্তু তারা যেন সত্যের রূপচ্ছবি নির্মাণ করতে পারে না। যে নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন শ্রীরঙ্গ তা যেন প্রতিষ্ঠা পেল না কোনদিন—বাস্তবে না, শিল্পেও না।

আদ্য রঙ্গাচার্য নাটকের রূপরীতি নিয়ে নিত্য পরীক্ষা করেছেন এবং নাটকের বক্তব্য সম্বন্ধেও তিনি জীবন অনুভবের কথা ব্যক্ত করছেন, মানুষের সুখের সন্ধান করছেন এবং ইতিহাস ও সভ্যতার বিবর্তন এবং অগ্রগমনের কথাও ব্যক্ত করছেন। তিনি পরীক্ষামূলক রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা চান এবং কর্ণাটকের পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে তাঁর বিরোধ যে মঞ্চে নাটকের এক্সপেরিমেন্ট নেই। সমালোচক এবং দর্শকদের সঙ্গেও তাঁর তিক্ত মধুর সম্পর্ক। এই সব ভাবনাও রূপ পেয়েছে তাঁর 'অপরাধঙ্গল ক্ষমিস' (১৯৭১) নাটকে। যদিও দেশের বড় বড় পরীক্ষারত নাট্যসংস্থা ও পরিচালকরা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। সমালোচকের মন্তব্য যথার্থ—'Kannada has had a long literary tiadition but Adya is the first great dramatist it has produced'.[৬]

গোবিন্দ ভীমাচার্য জোশী (জড়ভরত ১৯০৫-১৯) কন্নড় ভাষায় আধুনিক নাট্যকারদের প্রথম পর্যায়ের লেখক যাকে কৈলাসম ও শ্রীরঙ্গর সঙ্গে সমভাবে উল্লেখ করা হয়। জোশী স্বাধীনতার পর নাট্যচর্চা শুরু করেন। তিনি খুব বেশী নাটক লেখেন নি, তবে তাঁর স্বল্প পরিমাণ নাটক তাঁর ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। তাঁর প্রথম নাটক 'মূক বলি' (১৯৬০, বোবার বলিদান) একটি মেয়ের অসহায় জীবনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে : এই সমাজব্যবস্থায় যেন তাকে বলি দেওয়া হয়। নাটকটি প্রথমে একটি খসড়া ছিল যাতে দেখানো হয়েছে একটি মেয়ে অযোগ্য স্বামীর হাতে পড়ে ও শাশুড়ীর দ্বারা নিপীড়িত হয়। লেখক এই সামান্য কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে তাকে আরো পরিমর্জিত ও পরিবর্ধিত করেন। শান্ত অথচ সচেতন তরুণী সুশীলার বিয়ে হয় ও তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ভেবেছিল সে তার বাবার সব সম্পত্তি পাবে। কিন্তু তার জন্মের ষোলো বছর পর তার মায়ের একটি পুত্র হলে ঝামেলা শুরু হয়। বিশেষত সুশীলার শ্বশুরবাড়ি অত্যন্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত শিশুটি মারা যায়। গ্রামে ও শহরে কাহিনী পরিব্যাপ্ত, বিশেষত গ্রামের চরিত্রগুলি সুঅঙ্কিত যেমন সুশীলার বাবা রামান্না ও তার বন্ধু শিলপ্পা, কৃষক ও সন্ত কবি রুদ্রাপ্পা, ধনী চাষী বধূ নিঙ্গভভ ও তার ছেলে শঙ্কাপ্পা প্রমুখ।

'জোশীর দ্বিতীয় নাটক 'কদডিদ নীরু' (ঘোলা জল) আদর্শবাদের স্খলন ও রাজনৈতিক দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করে। শিবপ্পা প্রতিকূল পরিস্থিতি ও শক্তির দ্বারা বিপর্যস্ত হয়। সে গান্ধীবাদী কিন্তু সেই আদর্শ তাকে রক্ষা করতে পারেন না। সে তার বিষয়

সম্পত্তি হারায়, তার মেয়ে লাঞ্ছিতা হয়, তার ছেলে সেই রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করে যার দ্বারা তার বোন নিগৃহীত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত শিবম্পা আত্মহত্যা করে যদিও তা অত্যন্ত আবেগময় ও অতিনাটকীয় হয়ে ওঠে।

জোশীর তৃতীয় নাটক 'সত্তভর নেরালু' (মৃতের ছায়া ১৯৭৪) আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট নাটক থাকে সমালোচক গিরিশ করনাড এর 'তুঘলক' ও চন্দ্রশেখর কম্বর-এর 'জো কুমারস্বামী'র সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন যে নাটকগুলো থিয়েটারে নতুন আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। ধর্ম এই নাটকের বিষয় হলেও এটি ধর্মমূলক নাটক নয়। এক বৃহৎ ধর্ম প্রতিষ্ঠানের স্থিতি ও শেষ পর্যন্ত পতন এতে চিত্রিত। এক স্বামীজীর একটি মঠ নির্মাণ ও শিষ্যর সাহায্যে তাকে বড় করা, মঠের উত্তরাধিকারীর সন্ধান যার সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে পড়া, অযোগ্য লোকের আগমন ইত্যাদি নাটকের বিষয়। নাটকে ধর্মশাসন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব; বাস্তব ও কল্পনার সংঘাত; জীবিত ও মৃতর সম্বন্ধ নির্ণয় আছে এবং আত্মানুসন্ধান এক প্রবল রূপ নেয়। নাটকে এক অদ্ভুত চরিত্র আছে নাম শীনা যে মঠ-প্রশাসক কৃষ্টাচার্যের বাল্যবন্ধু ও যে উন্মাদ হয়ে গেছে কারণ সে দেখেছে যে তার মৃত স্ত্রী অন্য এক নারীর রূপ ধরে এসেছে যে নারী মারা গেছে; যে অন্বেষণ করছে সব কিছু কিন্তু তা যেন সত্যান্বেষণের পরিহাস হয়ে ওঠে। নাটকটি ২০০০ অভিনয় হয় ২০ নভেম্বর ১৯৯৮ রবীন্দ্র কলাক্ষেত্র মঞ্চে; প্রযোজক সংস্থা বেনাকা (Benaka)–Bangalore Nataka Kalavidaru, পরিচালক বি ভি করন্থ। জোশীর পরের নাটক 'ননে বিজ্জল' (আমি বিজ্জল ১৯৭০) পিরানদেল্লোর Henry IV অবলম্বনে লেখা।

জোশীর নাটকে বাস্তব এবং সমাজ জীবনের ছবি আছে। তবু তাতে অদ্ভুতত্বের ছোঁয়া লাগে, স্বপ্ন-কল্পনায় জীবন বিচিত্র হয়ে ওঠে, চরিত্রগুলির অন্তরলোকের রহস্যও যেন ধরা পড়ে। সাধারণ হয়েও জোশীর নাটক তাই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

পি লঙ্কেশ (১৯৩৫-২০০০)-এর নাটকে সমাজ জীবনের কথা আছে, মানবসত্তার গভীর অনুভূতি চিত্রিত হয়েছে, ক্রোধের তীব্র প্রকাশও তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। তাঁর নাটক সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন—The philosophical search in his plays is firmly rooted in the fate of human beings. So, finally it becomes a moving tale of human beings caught in the nexus of history society and other institutions. লঙ্কেশের নাটকের বিশেষ গুণ হল তাঁর ভাষা যা হল সম্মোহনকর, আকর্ষক এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারীও বটে।

লঙ্কেশের নাটক হল 'টি প্রসন্নন গৃহস্থাশ্রম' (টি প্রসন্নর বিবাহ জীবন বা গৃহজীবন, ১৯৬৪), 'নন্ন তঙ্গিগোন্দু গণ্ডু কোডি' (আমার বোনের জন্য একটা পাত্র দেখো), 'তেরেগলু' (ঢেউ, ১৯৬৭—এই ছোট নাটকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়; এটা মানুষের পাপবোধ ও বিচ্ছিন্নতা অথবা শ্রেণীসংগ্রামের ভাবনা কিংবা ব্যক্তি হত্যা ইত্যাদি প্রকাশ করে। তবে গোপালকৃষ্ণ আডিগ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব এর কাব্যময়তার বিশেষ প্রশংসা করেছেন), 'গিলিয়ু পঞ্জর দোলিল্ল' (খাঁচায় তোতাপাখী নেই), 'ক্রান্তি বন্ত ক্রান্তি' (বিপ্লব এসেছে, বিপ্লব—একজন শিক্ষিত বিদ্রোহী ব্যক্তির সংহতির অভাব ও নৈতিক ভীরুতার কথা), 'সিদ্দতে', 'পোলিসঁরিদ্দরে এচ্ছরিকে' (পুলিশ আছে সাবধান)। এই সাতটা নাটক একটা সংকলনে প্রকাশিত হয় 'এলু নাটকগলু' বা সাতটা নাটক নামে, ১৯৭১-এ।

'সংক্রান্তি' (১৯৭৩) সম্ভবত লঙ্কেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। কাহিনীর পটভূমি দ্বাদশ শতাব্দীর কর্ণাটক। এই সময়ের মিস্টিক কবি ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী নেতা বাসবন্নার

জীবনাদর্শের ওপর নাটক আধারিত। বাসবন্না রাজা বিজ্জলের কোষাধ্যক্ষ যে রাজ্যে তদানীন্তন প্রতিষ্ঠা ও রাজনীতির প্রতিভূ। বাসবন্নাও এই আদর্শের সমর্থক। তিনি হিন্দুজাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ করেন যা তাঁর ধর্মমতের অঙ্গ। ইতিহাসে আছে হরলাইয়া অচ্ছুৎ ও মধুবাইয়া ব্রাহ্মণ—যারা বীরশৈবধর্ম গ্রহণ করে শরণ হয়ে যায়। এই ঘটনা সামাজিক উত্থান ঘটায় ও বিজ্জলের হত্যা সঙ্ঘটিত করে। এই ঘটনাকে লঙ্কেশ অন্যভাবে সাজিয়েছেন। অচ্ছুৎ ছেলে রুদ্র ও উচ্চজাতের কন্যা উষার মধ্যে প্রণয় ঘটে। রুদ্র উষার মর্যাদায় মুগ্ধ ও উষা রুদ্রর অমার্জিত কিন্তু সৎ চরিত্রধর্মে আকৃষ্ট। রুদ্রকে বাসবন্না বীরশৈবমতবাদে দীক্ষিত করে। রুদ্র ও উষার সম্পর্কও জটিল হয়ে ওঠে। সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও উত্তাল হয়ে ওঠে। রাজা বিজ্জল নির্দেশ দেন রুদ্রকে হত্যার যাকে সংক্রান্তি উৎসবে বলি দেওয়া হবে। নাটকে অস্থির উন্মথিত সমাজে ভালবাসার ব্যর্থতা কথিত হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় নাটকটি লেখা হলেও এতে বর্তমান কালের ছায়া সম্পাত ঘটেছে। নাটক দেশের সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাকে বিম্বিত করে। মানবিক আদর্শের ওপর রাজনীতি প্রভুত্ব করে ও এই আদর্শের কঠামো হত্যা চলতে থাকে।

লঙ্কেশ তাঁর উপন্যাস 'বিরুকু'র (ফাটল) নাট্যরূপ দেন (১৯৭৩)। নব্বই-এ তাঁর নাটক 'গুণমুখ' (সুস্থতার দিকে, সেরে ওঠা) খ্যাতি পেয়েছে। নাদির শাহর দিল্লী আক্রমণের পটভূমিকায় নাটকটি লেখা। নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ করেন ও জয় করেন। মোগল বাদশহ মুহম্মদ নজীরুদ্দীন শাহও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। তখন দিল্লীতে নীতি নিয়ম শৃঙ্খলা কিছুই ছিল না। প্রায় সবাই লোভী, অসৎ, দুর্নীতি পরায়ণ, উৎকোচপ্রদানকারী অথবা গ্রহণকারী, ব্যভিচারী। নাদির শাহ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভীত ও স্তাবক চিকিৎসকরা তাঁর প্রশংসায় যতটা পারঙ্গম ঔষুধ প্রদানে ততটা নয়। হকীম অলাবী খান বৃদ্ধ হাকিম; যে দরিদ্র কিন্তু সৎ এবং প্রখর স্পষ্টবাদী। সে নাদির শাহকে বলে যে নাদির শাহ-র পাপ অন্যায় ও দুর্নীতির জন্য দেশ যেমন বিপর্যস্ত, তেমনি নাদিরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাকিম নাদির শাহকে ওষুধ দেয়। তাকে সুস্থ করে তোলে এবং ন্যায়ের পথে চলতে বলে। নাটকে যেন আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যায় ও দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। নাটকের সময়কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তা হল আক্রমণের এবং আত্মসমীক্ষণের আধুনিক কাল। নাটকে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস আছে।

৪. সাম্প্রতিক পর্ব

স্বাধীনতার দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যায়—স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আনন্দ-উল্লাস স্তিমিত হয়ে পড়ে। কন্নড় নাটকে আসে নতুন ভাবনা। প্রখর সমাজবোধ নাটকে আসে, নাটক হয় আপোষবিমুখ। রাজনীতিবিদদের নীতিহীনতা ভ্রষ্টাচার প্রবল হয়ে উঠলে নাট্যকার তাদের আঘাত করেন অথবা এড়িয়ে চলেন। খণ্ডতার সীমিত পরিসর থেকে বিপুল বিশ্বে প্রসারিত হয় নাটশিল্পীর চেতনা—existentialism বা অস্তিত্ববাদ তার চেতনাকে প্রবল ভাবে নাড়া দেয়। গিরিশ কারনাড বললেন—"In the sixties existentialism was very popular. And there was the question of 'anguish' and 'madness', and what is madness and what is sanity. All these questions were very much in the air and everyone was talking about them. Sartre, Camus, you know, Kierkegard, the whole lot of them."[৭] 'তুঘলক' নাটকের নামচরিত্রও অস্তিত্ববাদী

ভাবনায় উন্মেচিত হয়। কর্ণাটকের চিরায়ত লোক ঐতিহ্য বিশ্বচেতনায় অনন্ত প্রসারিত হয় যা দেখা গেল চন্দ্রশেখর কম্বর প্রমুখের নাটকে।

সত্তরের সূচনায় বামপন্থী ভাবাদর্শসম্পন্ন সমুদয় নাট্যগোষ্ঠীর আবির্ভাব কর্ণাটক রাজনৈতিক থিয়েটারের যথার্থ প্রকাশ ঘটায়, প্রসন্ন সি জে কৃষ্ণস্বামী প্রমুখ পরিচালক থিয়েটারের দায়বদ্ধতাকে যথার্থ তুলে ধরেন। জরুরী অবস্থা জারীও কন্নড় থিয়েটারে রাজনৈতিক সচেতনতা আনে। প্রসন্ন-র 'দাঙ্গেয় মুন্দিন দিনগল্', সি জি কে-র 'বেলচি', এম এস কে প্রভু-র 'বক' এ সময়ের বিশিষ্ট নাটক। বৈকুণ্ঠ রাজুর 'উদ্ভব' নাটক রাজনৈতিক ভাবনায় পূর্ণ। এ সময়ের ফসল পথ নাটকও রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট। সত্তরের পর অ্যাবসার্ড চিন্তাধারাও গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক চাপ ও অনুশাসনে ক্লিষ্ট পীড়িত মানবমন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দ্যে বিলীন হয় অথবা মৃত্যুবরণ করে জীবনের বিরুদ্ধে যেন প্রতিবাদ ঘোষণা করে। অ্যাবসার্ডিটির প্রকাশ দেখা গেল চন্দ্রকান্ত কূসনুর চন্দ্রশেখর পাটিল প্রমুখের নাটকে।

নব্বই-এর নাটকের বিষয় মূলত সংস্কৃতি সমীক্ষা—Plays written during the 1990s are mainly concerned with cultural analysis[৮] লঙ্কেশের 'গুণমখ', শিবপ্রকাশের 'মহাচৈত্র', 'মন্টেস্বামী কথাপ্রসঙ্গ' 'সুলতান টিপু' প্রভৃতি এই ধরনের নাটক। এদের সঙ্গে গিরিশ কারনাড-এর নাটকের তফাত আছে যদিও সবকটাই ঐতিহাসিক নাটক। কারনাডের 'তুঘলক' অস্তিত্ববাদী দর্শনের ওপর আধারিত, লঙ্কেশের নাটক সাম্প্রতিক নৈতিকতার বিচার, শিবপ্রকাশের 'সুলতান টিপু' ভাল ও মন্দের সংঘাতের মূল্যায়ন। শিবপ্রকাশের নাটকে দলিত ভাবনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে যা এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। দ্বাদশ শতাব্দীর বরেণ্য পুরুষ বসবন্নার জীবন ও আদর্শ নিয়ে গিরিশ করনাড লিখেছেন 'তালেদন্ড' আর শিবপ্রকাশ লিখেছেন 'মহাচৈত্র'। গিরিশের নাটকে অভিজাত ও ভদ্র মানুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে বিচার করা হয়েছে কিন্তু শিবপ্রকাশের নাটকে দলিত জীবন প্রাধান্য পেয়েছে ও সেই আদর্শ প্রতিপাদিত হয়েছে। এল হনুমন্তাইয়া-র 'আম্বেদকর' নাটক গান্ধীর সঙ্গে আম্বেদকরের সংঘর্ষের চিত্র আঁকে ও আম্বেদকরের জনমুখী চিত্র অংকনে প্রয়াসী হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কবি লোকসংস্কৃতিবিদ ড: **চন্দ্রশেখর কম্বর** (১৯৩৭) আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর 'মহামায়ী' (১৯৯৯) বিশ্বের যে কোন বড় মাপের নাটকের সঙ্গে তুলনীয়। চন্দ্রশেখর কম্বরের নাটকের আবেদন সর্বজনীন। ঐতিহ্যভাবনা তাদের মধ্যে থাকলেও আধুনিক জীবনচেতনার তীব্র প্রকাশ সেসব নাটকে আছে। ড. কম্বরের নাটক মনস্তত্ত্বমূলক—মানুষের হৃদয়ের জটিলতা ও অতল বিস্ময়কে তিনি তুলে ধরেছেন। মানুষের দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব সেখানে প্রকাশ পায়: সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে শরীর ও মনের সম্পর্ক এবং বাস্তব ও অতীন্দ্রিয় লোকের অন্বয়। আধুনিক ভারতীয় নাট্যকারদের মধ্যে কম্বর সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকতা বলতে দৈববোধ বা ঈশ্বরীয় চেতনার কথা বলা হচ্ছে না; জগৎ ও জীবনের শিল্পী হয়েও এই দার্শনিক লেখক জীবনকে অতিক্রম করে যান, মাটির স্পর্শ ও ঘ্রাণ তাঁর নাটকে পাওয়া যায় তবু তিনি মৃত্তিকার উর্ধ্বচারী এক মহাজীবনের রূপকার হয়ে ওঠেন যেখানে আত্মার দ্যুতি ঝলসে ওঠে, অতীন্দ্রিয় লোক উদ্ভাসিত হয়, অনন্তের আভাস পাওয়া যায়। অথচ শ্রেণী-সংঘাতের কথা তাঁর নাটকে আছে—শোষিত নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা তাঁর নাটকে আছে। এক তীব্র প্রতিবাদী চেতনা কম্বরের নাটককে স্বতন্ত্রচিহ্নিত করেছে। কিন্তু

নাট্যকার সহজ সাধারণ ও সরলীকৃত পরিণতিতে যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর মতে সততা বীর্যবত্তা নারীত্ব এবং মানবতাই চূড়ান্ত জয় আনবে। যৌনতা উর্বরাশক্তি ও প্রজননতত্ত্বের কথা ডঃ কম্বরের নাটকে বারবার এসেছে। শতাব্দীর বন্ধ্যা অনুর্বর ঊষর সভ্যতা যেমন এলিয়ট প্রমুখকে প্রভাবিত করেছিল, J. G. Frazer-এর The Golden Bough সভ্যতার যে রূপ অঙ্কন করে, কম্বরের নাটকে সেই পতিত পোড়ো সভ্যতার ফসল ফলানোর জন্য উর্বরা তত্ত্ব ও প্রজননের কথা বলে।

ডঃ কম্বরের আছে অনুপম কবিত্বশক্তি। নরনারীর হৃদয়-সম্পর্ক নির্ণয়ে, প্রকৃতির সৌন্দর্য চিত্রণে, জীবনের রহস্য ও বিস্ময় উন্মোচনে তিনি রোমান্টিক ও কল্পনাপরায়ণ এবং গভীর। কম্বর লোকসংস্কৃতির সুদক্ষ রূপকার। তাঁর নাটকে লোক আঙ্গিকের নিপুণ প্রয়োগ দেখা যায়। বায়ালতা রীতিতে তিনি অত্যন্ত সফল যে নাট্যরূপের ভাষা একদিকে জাঁকজমকপূর্ণ অন্যদিকে প্রায় রুচিহীন ও লৌকিক। এই ভাষা দিয়ে গভীরতা ও লঘুত্ব দুটোই বোঝানো যায়। যক্ষগণ রীতির সফল প্রয়োগও তাঁর নাটকে দেখা গেছে। লোকভাবনার সঙ্গে অলোক ভাবনার সমন্বয়, বাস্তবের সঙ্গে পরাবাস্তবের সংযোগ এবং সান্তের মধ্যে অনন্তের প্রকাশ চন্দ্রশেখর কম্বরের নাট্যসাধনাকে বিরল সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছে।

প্রায় কুড়িটা নাটক লিখেছেন কম্বর যেগুলো তাঁর নাট্য ভাবনার ঋদ্ধ পরিচয় বহন করে। তাঁর প্রথম উল্লেখ্য নাটক 'নার্সিশাস' (১৯৬১) যার বিষয় মানুষের দ্বৈততার সংকট যা কম্বরের এক প্রিয় ভাবনা। The relation between being and becoming is like the relation between the human body and its shadow.'ঋষ্যশৃঙ্গ' প্রথমে ব্যালে আকারে লেখা হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। নাটকের প্লট নেওয়া হয়েছে তাঁর নিজের লেখা কবিতা 'হেলতেনা কেলা' (শোন বলছি) থেকে যাতে এক সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ বালাগোণ্ডার মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। বালাগোণ্ডাকে হত্যা করেছে এক দৈত্য যে তার বাবাকেও হত্যা করে ও ফিরে আসে সেই বাবার রূপ ধরে এবং বিয়ে করে বালাগোণ্ডার ক্ষমতালোভী মা-কে। এই কথার ওপর ভিত্তি করে ১৯৭০-এ লেখা হয় নাটক 'ঋষ্যশৃঙ্গ' যাতে নিয়তির অনিবার্যতা, জীবনচর্যার শুদ্ধতা এবং সৎ স্বভাব নরনারীর মিলনের কথা বলা হয়েছে যার ফলে রুক্ষ মৃত্তিকায় জল ঝরবে, দেশে শান্তি ফিরে আসবে ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। 'ঋষ্যশৃঙ্গ' উত্তর-কর্ণাটকের গুরুত্বপূর্ণ লোকনাটক দোড্ডাটা-র (Doddata) আদর্শে লেখা।

'জো কুমারস্বামী' (১৯৭২) নাটক উর্বরাশক্তি ও প্রজননতত্ত্বের লোককাহিনীর ওপর আধারিত। আবার যার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে শ্রেণী-সংগ্রামের ভাবনা। 'জো কুমারস্বামী' এক লিঙ্গদেবতা যার পূজা আজও উত্তর কর্ণাটকের বিভিন্ন গ্রামে হয়। এই পূজা করলে ও জো কুমারস্বামীর প্রতীক ফল রান্না করে বন্ধ্যা নারীদের স্বামীরা খেলে সেই নারীরা পুত্রবতী হয়। জো কুমারস্বামী এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী লড়াকু বসন্না দুজনেই এক যদিও তার পরিণাম হয় ট্র্যাজিক। 'জো কুমারস্বামী' নাটকের প্রধান চরিত্র গৌড়া যে অত্যাচারী দাম্ভিক নারীলোভী এবং নির্বীর্য। সে কৃষকদের আঘাতে অত্যাচারে জর্জরিত করে ও তাদের সর্বস্ব গ্রাস করে। বসন্না সাধারণ কৃষক কিন্তু সে বীর ও সংগ্রামী এবং গৌড়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। গৌড়ার সন্তানহীনা স্ত্রী গৌড়াথী স্বামী কর্তৃক অপমানিত লাঞ্ছিত হয়, সে পুত্রকামনায় ব্যাকুল। সে জো কুমারস্বামীর মূর্তি গড়ে পূজা করে ও সেই খাদ্য রাত্রিবেলায় নিয়ে যায় ক্ষেতে তার স্বামীকে খাওয়াবে বলে। কিন্তু

গৌড়া সে রাতে বসন্নাকে সেই ক্ষেতে যেতে বলেছিল কারণ সে চক্রান্ত করেছিল যে তার লোকেরা বসন্নাকে হত্যা করবে। বসন্না গৌড়ার লোকেদের হারিয়ে ও হটিয়ে দিয়ে সে ক্ষেত্রে সেখানে থাকে। গৌড়াথি তাকেই তার স্বামী মনে করে পূজার নিবেদন তাকে খাওয়ায় যা করলে সে গর্ভবতী হবে। বসন্নাকে চিনতে পেরে তার ভুল বুঝে গৌড়াথি লজ্জিত কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু বসন্নার কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। বসন্নার প্রতি গ্রামের অন্য নারীরাও আসক্ত যে জন্য পুরুষরা তার ওপর ক্রুদ্ধ। নাটকের শেষে গৌড়া ও তার দলবল বসন্নাকে আক্রমণ করে ও হত্যা করে। লোককথার আধারে আধুনিক জটিল জীবন সংগ্রামের কথা নাটকে বলা হয়েছে। ধর্ম ও লোকাচার, শাসন অত্যাচার ও শ্রেণী চেতনা; সংহত নাট্যসৃজন ও সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদির সমন্বয় নাটকে ঘটেছে। গ্রন্থের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—Chandrasekhar Kambar's vibrant, earthly play creatively uses the local folk theatre form of Bayalata blending worship music dance song narrtion sex death and religion to convey a powerfully contemporary anti-feudal message.[১]

১৯৭৪-এ 'চালেশা'র পর ড. কম্বর ১৯৭৫-এ লেখেন 'জয় সিধনায়ক' যার অর্থ বিজয়ী সিধনায়ক বা সিধনায়কের জয় হোক। এক গ্রামীণ অত্যাচারী মোড়ল বা দেশাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে নাটকে। গ্রামের মানুষ দুঃখবেদনায় পীড়িত ও জর্জরিত হচ্ছে দেশাইয়ের শাসনে ও শোষণে যেখানে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয় সিধনায়ক ও তার বন্ধু উরিনিঙ্গ-র নেতৃত্বে। তারা রুখে দাঁড়ায়, দেশাইকে হত্যা করে ও দেশ থেকে অপশাসন দূর হয়। দেশাই উরুনিঙ্গর স্ত্রীকেও অপহরণ করেছিল, সেও মুক্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের আশা সফল হল না। নতুন ভাবে যেন শোষণ-পীড়ন ফিরে আসে। নাট্যকার সম্ভবত বলতে চেয়েছেন মানুষও সমাজকে যথাযথ গঠন না করলে বিপ্লব সফল হয় না।

এরপর কম্বর ক্রমান্বয়ে লিখে চলেন 'সঙ্গ্যা বাল্যা আনাবেকা' (৭৫) 'নায়ি কথে' (কুকুরের গল্প, ১৯৮১), 'হরকেয় কুরি' (মানতের ভেড়া/বলির বকরী, ১৯৮১)। তাঁর সৃজন দক্ষতার পরিচয় এদের মধ্যে পাওয়া যায়। 'কাড়ু কুদুরে' (জঙ্গলী ঘোড়া ১৯৮১)। Lorca-র The House of Bernada Alba-র ওপর আধারিত। কিন্তু নাটককে কম্বর নিজের মত করে গড়ে তুলেছেন। এক দাপুটে মহিলার প্রবল কর্তৃত্ব এবং মেয়েদের সম্পূর্ণ শাসনে রেখে লরকা যেন ফিউডাল প্রথার জীবন ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, মেয়েদের তথাকথিত সম্মানবোধ ও মর্যাদাকে বজায় রাখতে চেয়েছেন যার জন্য মেয়ের প্রাণও যায়। কিন্তু কম্বরের নাটকে মেয়ে হয়েছে প্রতিবাদী, সে চলে গেছে প্রেমিকের সঙ্গে মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। শেষ পর্যন্ত মার পরাজয় ঘটেছে যে ভালবাসার প্রবাহকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কম্বরের নাটকে আছে triumph of virility over sterility.

'শাম্বশিব প্রহসন' কম্বরের একটি হাসির নাটক যাতে উদ্ভট ও অনেকক্ষেত্রেই অমার্জিত কৌতুকরসের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ আছে। বিচিত্র চরিত্রের পিতা শাম্ব ও পুত্র শিবকে নিয়ে নাটক গড়ে উঠেছে। নাটকে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে—পুরুষ পরিণত হয় নারীতে, পূজাবেদী থেকে নেমে আসে দেবতা কারণ সেখানে ভক্ত নেই ভক্তিও নেই, মানুষ পরিণত হয় জন্তুতে ঃ রাজা হয় গাধা ও গাধাকে করা হয় মন্ত্রী। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র ধূর্ত শাম্ব বলছে—'একটু রঙ চঙ মাখলে একটা গাধা হয় রাজা, আর সেই রঙ চঙ পোশাক খুললে রাজা পরিণত হয় গাধাতে।' নাটকে সত্যিই সেসব ঘটনা ঘটেছে।

নাট্যকার উদ্ভট কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্র আমলাতন্ত্র পুরোহিততন্ত্র এবং প্রতিষ্ঠানিকতাকে আঘাত করেছেন, আধুনিক সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপরও আছে আঘাত তীব্র। কম্বরের বিদ্রোহী মানসিকতাও এখানে ধরা পড়েছে যা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান চায়। এই নাটকে লেখকের শিল্প-বোধ ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত।

'সিরিসমপিগে' (১৯৮৭) নতুন ভাব, আদর্শ ও আঙ্গিকের নাটক। শিবপুর রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী বীর সুদর্শন তরুণ রাজপুত্রকে ঘরে আছে এক অশুভ ভাবনা। দেবতা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রাজপুত্র সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে অথবা মারা যাবে একজনের জন্য যে ব্যক্তি সেই বিষয়ের উত্তরাধিকারী যার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হল রাজপুত্রই, অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যই যুবরাজ মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু তার জন্য কোন ভাবনা নেই কারণ রাজপুত্রের কোন ভাই নেই। তবু রাজপুত্র ষোড়শবর্ষ প্রাপ্ত হলে রাণী তার পুত্রের বিবাহ দিতে আন্তরিক হয় ও সুন্দরী রাজকন্যা সিরিসমপিগের তার বিবাহ স্থির করা হয়। কিন্তু রাজপুত্র যেন এক অদ্ভুত স্বপ্নবিকারে আচ্ছন্ন। সে ভালবেসেছে এক দীপবালাকে যে একরাত্রে তার ঘরে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ও নৃত্যরতরূপে তার শরীরে প্রবেশ করেছিল। রাজপুত্র তার কল্পনায় এক বিস্ময়কর কথা ভাবে ও বলে—সে একদিন একাকী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল যখন প্রাসাদ দেয়াল বিদীর্ণ হয় ও কে একজন খাপ থেকে তরবারি বার করে ও তার গায়ে সেটার স্পর্শ লাগে। রাজপুত্র বলে যে তার শরীর দুভাগ করে দুটি পাত্রে রাখতে হবে। তাই করা হয়। যুবরাজ একটা পাত্র থেকে অক্ষত বার হয় এবং অপর পাত্র থেকে তার স্বপ্নের দীপবালা নয়, বেরিয়ে আসে এক ফণাযুক্ত কোবরা। সিরিসমপিগের সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয় কিন্তু স্বপ্নাবিষ্ট যুবরাজের সঙ্গে স্ত্রীর কোন সম্পর্ক থাকে না। সে বাইরে খুঁজে বেড়ায় সেই নারীকে। ইতিমধ্যে সিরিসমপিগে আকৃষ্ট হয় সর্প-দেবতা অন্যজগতের রাজা কলিঙ্গর ওপর, তাদের মিলন হয় ও সিরিসমপিগে সন্তান সম্ভাবিতা হয়। রাজপুত্র তার স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহপরায়ণ হয়ে প্রকাশ্য বিচার সভার আয়োজন করে যেখানে সিরসমপিগে তার সতীত্ব প্রমাণ করবে। নাগলিঙ্গের মন্দিরে সবাই আসে। সিরসমপিগে বলে—নাগলিঙ্গের ওপরে যে সাপটি রয়েছে তা আমার শরীরে নেব। যদি আমি সাধ্বী ও পবিত্র হই এই সাপ আমার শরীরে ঘুরবে কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পারবে না। না হলে এই সর্প আমাকে দংশন করবে। এই পরীক্ষায় সে জয়ী হয় ও দেবীর মর্যাদা পায়। কিন্তু সাপ বা কলিঙ্গকে তার স্ত্রীর ঘরে দেখে রাজপুত্র অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয় ও তাকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু সর্পরাজ বা কলিঙ্গ যেন রাজপুত্রকে আপনজন মনে করে—'ওকে দেখে আমার রাগ হয় না, কেন তা জানি না। মনে হয় ওর শরীরে আমি আছি, মনে হয় আমরা আগের জন্মে ভাই ছিলুম।' আবার রাজপুত্রের তীব্র ক্ষোভের উত্তরে সিরিসিমপিগে বলে—'হে প্রভু, আমি অর্ধেক বিধবা। তুমি তার দুঃখ বুঝতে পারবে না যে সর্বদাই অর্ধেক বৈধব্যপীড়িত। যখন তুমি আমার সঙ্গে থাক আমার শরীর হয় বিধবা; যখন আমি তার সঙ্গে থাকি একসঙ্গে শয়ন করি আমার মন হয় বিধবা। আমি সবসময় অর্ধেক বিধবা। এর থেকে কষ্ট আর নেই। আমার দুঃখ কেউ আমাকে বুঝল না। আমি একাকী। নিঃসঙ্গতায় ভীত হয়ে আমি সঙ্গী খুঁজে বেড়াই। কিন্তু আমার সঙ্গীরা হল অর্ধেক মানুষ। আমি কি অর্ধ-মানবদের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলুম? দেবতা শিবলিঙ্গর সম্পূর্ণতা আমি খুঁজছি যে জন্য আমি জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে আমার সন্তান জাত হয়েছে অবৈধভাবে অসম্পূর্ণ মানুষের দ্বারা। ও এক বিধবার সন্তান! অবৈধ সন্তানের জন্মদাত্রী এক নারীকে তুমি হত্যা করতে

হও? আমি প্রস্তুত!' কলিঙ্গর সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামে রাজপুত্র। কলিঙ্গ বীব হলেও যুদ্ধ করতে চায় না। সে রাজপুত্রকে বলে—'চোখের দর্পণে আমি তোমাকে দেখেছি। তুমি আমার অপর সত্তা, তোমার ওপর আমার ক্রোধ নেই। মনে হয় পূর্ব জন্মে আমরা ভাই ছিলুম!' কিন্তু রাজপুত্র তাকে হত্যা করে। কলিঙ্গর মৃত্যু ও রাজপুত্রর জয় শুনে রাণী অত্যন্ত আনন্দিত হয়, এবার ঐ অসতী বৌ সিরিসমপিগেকে শাস্তি দেওয়া যাবে। কিন্তু রাজপুত্র বলে যে কলিঙ্গ তার দ্বিধাবিভক্ত সত্তা, তার ভাই। যে সিরিসমপিগেকে বলে—

রাজপুত্র—ভুলের আগুনে আমি দগ্ধ হয়েছি; এখন আমি সব বুঝতে পারছি।

সিরিসমপিগে—তুমি ভাল আছ রাজা?

রাজপুত্র—রাণী, রাজকুমার কেমন আছে?

সিরিসমপিগে— ও শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। তুমি কেমন আছ?

রাজপুত্র—খবরটা তুমি শুনেছ তো?

সিরিসমপিগে—হ্যাঁ প্রভু। তুমি কলিঙ্গকে হত্যা করেছ।

রাজপুত্র—রাজকুমার যেন তার শেষকৃত্য করে। আমারও!

সিরিসমপিগে—প্রভু!

রাজপুত্র—শোন। দেখো, আমাদের পুত্র যেন নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত না করে।

(মৃত্যু)[১০]।

'সিরিসমপিগে' নাটকের ভাবনা দার্শনিক। মানুষের দ্বৈতসত্তার কথা, দ্বিধাবিভক্ত অস্তিত্বের সংকটের কথা নাটকে বলা হয়েছে। আর ফাটল থাকে বস্তুজগৎ (realistic) এবং আত্মিক (Spiritual) জগতের মধ্যে, দেহ ও মনের মধ্যে। কারনাড প্রমুখের নাটকে সাপ হয়েছে যৌনতার প্রতীক কিংবা অবদমিত বিকারগ্রস্ত কামনার প্রতীক; তাছাড়াও এই নাটকে সাপ হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় সত্তার প্রতীক এবং তা যেন অবহেলিত উপেক্ষিত অসম্মানিত। নাটকটি কর্ণাটকের ঐতিহ্যমণ্ডিত যক্ষগণ রীতিতে উপস্থাপিত। এতে সঙ্গীত নৃত্য ও মূকভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যরস ঘনীভূত করা হয়েছে। নাটকে আছে মিথের ব্যবহার অন্যদিকে তার মধ্যে আধুনিক জটিল জীবনবোধের প্রকাশ, এই ন-আধ্যাত্মিক বা সেকুলার নাটকে চিরন্তনের সঙ্গে সমসাময়িকতার মিলন ঘটেছে। 'সিরিসমপিগে' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় নিনসম-এর প্রযোজনায় হেগ্গড়ু-র শিবরামকরন্থ রঙ্গমন্দিরে ২১.৮.১৯৮৬ তারিখে এবং সাতদিন পরে হয় দিল্লীতে কে ভি সুব্বান্না এবং অতুল তিওয়ারির নির্দেশনায়। তারপর অজস্র অভিনয় হয়েছে।

কম্বরের 'মহামায়ী' শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। 'মহাময়ী' কথার অর্থ মহামাতা বা মৃত্যুমাতা। সঞ্জীবশিব-র শৈশবেই তার বাবা ও মা মারা যায়। মৃত্যুর আগে তারা সন্তানকে দিয়ে যায় মহামাতার হাতে ও প্রার্থনা জানায় যে তাদের পুত্র যেন সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। মাতা সঞ্জীবশিবকে বড় বৈদ্য করে তোলেন। সে রোগীর নাড়ী দেখলেই রোগী সেরে ওঠে। রহস্য হল এই যে মাতা অন্যদের কাছে অদৃশ্য ও তিনি রোগীর ডানদিকে দাঁড়ালে সঞ্জীব তাকে দেখবে ও রোগী বেঁচে উঠবে; আর মাতা বাঁদিকে দাঁড়ালে রোগী মারা যাবে। চিকিৎসায় সঞ্জীবের খ্যাতি বেড়ে চলে। অন্যদিকে রাজ্যের রাজকুমারী অত্যন্ত অসুস্থ ও মৃত্যুর মুখোমুখী। দেশের কোন চিকিৎসক তাকে সারাতে পারেনি এবং অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সঞ্জীবশিবকে আনা যায়নি। একদিন রোগের যন্ত্রণায় রাজকুমারী সবার অলক্ষ্যে প্রাসাদ থেকে জঙ্গলময় পাহাড়ে এসেছে যেখানে আছে মৃত্যুগুহা যার মধ্যে প্রবেশ করলে কেউ ফেরে না। ঘটনাক্রমে সঞ্জীবও সেখানে ওষুধের

জন্য লতাপাতা খুঁজতে আসে ও রাজকুমারীকে মরণোদ্যত দেখে তার হাত ধরে তার রোগ বুঝতে পারে ও সারারাত প্রয়াস করে। সঞ্জীব তাকে শিকড়বাকড় খাওয়ায় ও তার গলায় লতার মালা পরিয়ে দেয়। রাজকুমারীর রোগ কমে যায়। সঞ্জীবশিব রাজকুমারীকে দেখে মুগ্ধ হয় ও তাকে ভালবাসে, এবং রাজকুমারীও জীবন ফিরে পেয়ে আনন্দে নিবিড় হয় ও সঞ্জীবর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে।

কিন্তু মাতা সঞ্জীবশিবকে সতর্ক করে দেন যে রাজকুমারী মরবেই ও সঞ্জীব তাকে যেন ওষুধ না দেয়। কিন্তু সঞ্জীব চিকিৎসকরূপে রাজকুমারীকে বাঁচাবেই। সে তার অনন্যা মার কাছে অতি সামান্য তবু যে যথার্থ বৈদ্য হতে চায়, মানুষকে বাঁচাতে চায় এবং রাজকুমারীকে নিয়ে সামান্য কিন্তু সুখী জীবন যাপন করতে চায়। মাতা ক্রুদ্ধ কারণ তিনিই বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারী এবং সঞ্জীবশিবকে তিনিই এত বড় করেছেন যার ফলে যে তাকে অগ্রাহ্য করতে পারছে। তিনি নির্দেশ দেন সঞ্জীবশিব যেন ঐ সামান্য নারী রাজকুমারীকে গ্রহণ না করে।

সঞ্জীবশিব মাতার হাত থেকে রক্ষা পেতে রাজকুমারীকে প্রাসাদ থেকে নিয়ে যায় সবার অলক্ষ্যে গহণ অরণ্যে যেখানে তারা থাকবে। সেখানে এক অদ্ভুত ঘর দেখা যায় আর শোনা যায় বিবাহের গান তা যেন তাদের বিবাহ সঙ্গীত। সেই ঘরে সঞ্জীবশিব ঢোকে, কিন্তু রাজকুমারীকে কারা যেন তুলে নিয়ে যায়। বিমূঢ় সঞ্জীব দেখে সেই ঘরে অনেক শিখা জ্বলছে যার মধ্যে দুটি দীপ বিশেষ উল্লেখ্য যার একটি উজ্জ্বল অপরটি ম্লান। সঞ্জীব বোঝে এটা সেই মাতারই স্থান। সে প্রতারিত হয়েছে; সে মাতার কাছ থেকে কখনোই দূরে যেতে পারেনি, কারণ মাতা সব দেখেন জানেন সব নিয়ন্ত্রণ করেন। সঞ্জীব জানতে পারে উজ্জ্বল দীপটি সঞ্জীবশিবের এবং ম্লান স্বল্পতৈলপূর্ণ দীপটি রাজকুমারীর প্রাণের প্রতীক এবং এটি নিভে গেলেই রাজকুমারী মারা যাবে। মাতার লোকই নিয়ে গেছে রাজকুমারীকে যাকে সেখানে আনা হয় মুমূর্ষু অবস্থায়। সঞ্জীবশিব মাতার কাছে প্রার্থনা করলে মাতা প্রসন্ন হয়ে তার আয়ু দ্বিগুণ করে দেন কিন্তু রাজকুমারীকে মরতেই হবে যা তার নিয়তি যাকে নিয়ন্ত্রণ করেন মাতা। অকস্মাৎ সঞ্জীবশিব তার প্রাণের দীপ থেকে তৈলের অর্ধেক ঢেলে দেয় রাজকুমারীর দীপে যা তখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অর্থাৎ রাজকুমারীর আয়ু অনেক বেড়ে যায় ও সজীব প্রাণময় হয়ে ওঠে। মৃত্যু মাতার ভয়ঙ্কর চিৎকারে সেই মরণজগত কেঁপে ওঠে এবং মাতার আশীর্বাদ বঞ্চিত হয়ে সঞ্জীবশিব চলে আসে রাজকুমারীকে নিয়ে। নাটকের উপকাহিনীও আছে।

'মহামায়ী'তে দার্শনিক ভাবনা উচ্চমানের নাট্যরূপ পেয়েছে। মৃত্যুর সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্করতার প্রকাশ নাটকে আছে কিন্তু মৃত্যুকে অতিক্রম করে প্রাণ মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। 'মহামায়ী' একটা অসাধারণ প্রেমকাব্য—প্রেমের সূক্ষ্ম সুকুমার আবেগময় রূপ নাটকে ফুটে উঠেছে। নাটকটি ঐতিহ্যনিষ্ঠ হলেও আধুনিক বুদ্ধিমার্গীয় ভাবাবেগে পূর্ণ। হাস্যরসের নিপুণ প্রয়োগও নাটকে আছে। সামগ্রিকভাবে 'মহামায়ী' এ সময়ের এক অনন্য মহৎ নাট্যকাব্য হয়ে উঠেছে।

গিরিশ কারনাড (১৯৩৮) আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। শুধু কন্নড় নয়, আধুনিক ভারতবর্ষের এক বিশিষ্ট নাট্যকারের সম্মান তিনি লাভ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ নাটকই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাফল্যের সঙ্গে অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে। অজস্র সম্মান ও পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন। চলচ্চিত্রেও তিনি সমানভাবেই দক্ষ। কারনাডের নাটকে myth ও folk-এর ব্যবহার আছে এবং আধুনিকতার তীক্ষ্ণ ধারালো

সলো ফেলে তিনি পুরাণ ও লোককথাকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের অন্তর্গত চিরায়ত সত্যের উদভাসন করেছেন। গিরিশ কারনাড বলেছেন যে The playwright should have a contemporaneous sense. তাঁর ঐতিহ্য চেতনায় সমকাল ছায়া ফেলে যায় বারবার। তাই ভারতীয় পৌরাণিক ভাবনার মধ্যে আধুনিক ইউরোপীয় সার্ত্র-এর অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটে, মধ্যযুগীয় ইতিহাসের চরিত্র তুঘলক হয়ে ওঠেন বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও জটিলতায় আকীর্ণ আধুনিক চরিত্র, দ্বাদশ শতাব্দীর সন্ত কবি নতুন যুগের মানবতার বাণী বহন করে আনেন, নাগনির্ভর গল্প মানুষের দ্বৈত সত্তা এবং বাস্তব-কল্পনা ও অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্বময় জটিল রূপ তুলে ধরে, বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেও শূদ্র ও নারীজাতির সমস্যা সংকট প্রাধান্য পায়। তবে সাধারণ মানুষের সমস্যা-সংকটের কথা তিনি বলেন নি, যৌনতা ও অবদমিত কামনা-বাসনার কথা তার নাটকে কখনো বড় হয়ে ওঠে, রাজনীতিকে সচেতনভাবে এড়িয়ে চলায় মানবতাবাদ অবহেলিত হয়, কখনো তিনি অতীব আত্মশ্লাঘাপরায়ণ এবং সে কারণেই ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ। তবু গিরিশ কারনাডের নাট্যকৃতি বিরল মর্যাদার যোগ্য এবং অনন্য নাট্যপ্রতিভারূপে তিনি সর্বত্র সম্মানিত।

'যযাতি' ১৯৬১ সালে লেখা। কোন কোন সমালোচকের মতে 'যযাতি' সম্পূর্ণ নতুন রীতির নাটক—a modernist drama. পৌরাণিক যযাতি-দেবযানী-শর্মিষ্ঠা-পুরুর কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে 'যযাতি'। নাটকের সময় কাল বেশী নয়। কাহিনীর শেষ পর্বেই চার অঙ্কের কাহিনীর উপস্থাপনা। যুবরাজ পুরু বিবাহ করে নববধূকে নিয়ে আসছে—সবাই তার অপেক্ষায় রত। দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র, দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে আদৌ পছন্দ করে না; আবার শর্মিষ্ঠা রূপে গুণে অনন্যা হয়েও সে দেবযানীর দাসী এবং সে অসুর কন্যাও বটে। তাই সে ক্রোধে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে তীব্র হয়ে ওঠে। যযাতি শর্মিষ্ঠার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ—সে শর্মিষ্ঠাকে গ্রহণ করে। দেবযানী পরিত্যাগ করে রাজগৃহ, তার পিতার অভিশাপ আসে যযাতির ওপর যে সে জরাগ্রস্ত হবে। প্রতিকারের কথা বলা হলেও যযাতির আশানুযায়ী কেউ তার জরা গ্রহণ করে না। কিন্তু পুরু কোন বড়কুলের নারীর পুত্র নয়। যযাতি একদা দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে এক রাক্ষসকুল কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করে তার পরিণাম পুরু। কিন্তু সেই নারী যযাতির মহৎ বংশকে বেশী দিন কলঙ্কিত না করে সর্ব মর্যাদা পরিহার করে প্রয়াতা হয়। পুরু যযাতির জরা গ্রহণ করে। তার সেই স্থবির জরাগ্রস্ত মূর্তি দেখে সদ্যবিবাহিত স্ত্রী চিত্রলেখা ঘৃণায় শিউরে ওঠে যদিও সে পুরুর এই ব্যক্তিত্ব সমীহ করে। চিত্রলেখা বিষপানে আত্মহত্যা করে। যযাতি ফিরিয়ে নেয় তার জরা। সে ও শর্মিষ্ঠা অরণ্যে চলে যায়।

'যযাতি' নাটকের বক্তব্য কি? নাট্যকারের মতে এই নাটক লেখার সময় তিনি সার্ত্র-এর existentialism দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেইজন্যই I wanted to make it a play on the theme of Responsilility and wished to trace the tragic results of relagation of responsilility. প্রকৃতপক্ষে নাটকের প্রায় সব চরিত্রই তাদের কাজের পরিণতিজাত ফলাফলের জন্য দায়িত্ব নেয় না। দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে দাসী করে আনে কিন্তু তার পরিণাম স্বীকার করে না। যযাতি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু অভিশাপ নেবে না। পুরুও নববধূর প্রতি দায়িত্ব পালন করে না নিজের 'মহত্ত্ব' প্রমাণের জন্য, পরিণামে নতুন আসা চিত্রলেখাকে প্রাণ দিতে হয়। কেবল শর্মিষ্ঠা তার কাজের দায়ভার গ্রহণ করে।[১১] করনাডের নাটকে মূল কাহিনী থেকে কিছু পরিবর্তন উল্লেখ্য। পুরাণে শর্মিষ্ঠার সন্তান পুরু। করনাডের নাটকে নয়; তবু পুরু শর্মিষ্ঠাকে 'মা' বলে

সম্বোধন করে কারণ পুরু জানে তার মা-ও শর্মিষ্ঠার মত অসুরকন্যা এবং সে তার সন্তানের আবেগকে শর্মিষ্ঠার মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয়। নাট্যকার 'দায়হীনতা'র কথা বললেও নাটকে অনেকক্ষেত্রেই আস্তিক্যের বোধ থাকে। তাই যযাতি পাপের জন্য অভিশপ্ত হয়, অসুর মাতার সন্তান 'সহজ' হবার চেষ্টা করে, অসুরকন্যা শর্মিষ্ঠাও মেনে নেয় জীবনকে—তার বেদনা গ্লানিতে, দেবযানীও কৃতকর্মের জন্য দুঃখের অনিবার্যতাকে মেনে নেয়, আর সবার পাপ বহন করে নিস্পাপ চিত্রলেখা বরণ করে মৃত্যুকে। 'যযাতি'র বাংলা অনুবাদক সলিল সরকার মনে করেন যে নাটকটি 'কেবল কোন এক পৌরাণিক কালের রাজা যযাতির যৌবনমোহের কারণে জরাগ্রস্ত হবার অভিশপ্ত কাহিনী নয়। নারী যে আজও পণ্য পুরুষের চোখে এবং আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যেভাবে যযাতির মত যৌবনকে গ্রাস করে পুরুরূপ বর্তমান প্রজন্মকে জরাগ্রস্ত করে রাখতে চাইছে, তারই সুচারু প্রতিরূপ এই যযাতি নামক পৌরাণিক কাহিনীটি' (গ্রুপ থিয়েটার Aug-Oct. ১৯৯৪)।

'তুঘলক' (১৯৬৪) ঐতিহাসিক নাটক। বড় ক্যানভাস, ঘটনার বাহুল্য, তীব্র উত্তেজনা ও উন্মাদনাময় বিন্যাস, যা নাটকীয়ও বটে। এটি অত্যন্ত ঘটনাবহুল নাটক, বাণিজ্যিক মঞ্চের উপযোগী। তুঘলক বিচিত্র চরিত্র—তিনি অস্থির উন্মথিত চিত্ত কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান। রাজ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে অনায়াসে মানুষ খুন করেন। কিন্তু নিজে থাকেন নিরাপদ দূরত্বে। তিনি অত্যন্ত খেয়ালী যদিও তার নিজের যুক্তি ছিল। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ রাজধানী নিয়ে যান লোকজন সমেত—ফলে হৈ চৈ বিশৃঙ্খলা মানুষের অসহ্য কষ্টবেদনা ও মৃত্যু। কিন্তু তা করেছিলেন কারণ মুসলমান আমীররা হিন্দু প্রধান দৌলতাবাদে গিয়ে সুবিধা করতে পারবেন না। আবার রাজধানী ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হন। তিনি তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন যা রৌপ্যমুদ্রার সমমানের হবে। এটা করেন অর্থ সংকট দূর করার জন্য। এর ফলে প্রচুর তামার জালমুদ্রা হয়, অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। কিন্তু তুঘলক সব অর্থ প্রত্যর্পণ করেন প্রজাদের। তুঘলক পীড়ক কিন্তু নিরপেক্ষ-—হিন্দু মুসলমান কেউই তাঁর পীড়নের হাত থেকে বাদ যায়নি। দুর্ভিক্ষে সব লোকই মরেছে। হয়ত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি তিনি চেয়েছিলেন তবে তা নিজের জন্য। একবার মুসলমানদের নমাজ পড়া তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বেশ কবছর পরে তিনি তা প্রত্যাহার করে নেন।

'তুঘলক' নাটকে তুঘলকের সঙ্গে ছোটি আম্মার (বিমাতার) সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। বাংলায় শ্যামানন্দ জালান পরিচালিত নাটকে তুঘলকের (শম্ভু মিত্র) সঙ্গে তার বিমাতার (কেয়া চক্রবর্তী) একটা শারীরিক সম্পর্ক ছিল তেমন একটা ইঙ্গিত আছে। আলেক পদমসী ইংরেজী নাটকেও তেমন একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু কারনাড তা মানেন নি। তিনি বলেন তুঘলকের সঙ্গে তাঁর নিজের মার সম্পর্ক ...... খুবই ..... ঘনিষ্ঠ ছিল, তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। বিমাতাকে তুঘলক পাথর ছুঁড়ে হত্যা করিয়েছিলেন সর্বসমক্ষে দোষী সাব্যস্ত করে। 'তুঘলক' নাটকে কারনাড দুটোকে মিশিয়েছেন।

গিরিশ লিখতে চেয়েছিলেন এক বড় মাপের নাটক—a play on a grand scale. এর প্রেক্ষাপট হবে বড়, এতে থাকবে অনেক চরিত্র, এবং ইতিহাসের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ পরিবেশ তাতে অঙ্কিত হবে। 'তুঘলক' মোটামুটি বড় মাপের নাটক, দিল্লীর পুরান কিল্লায় ইব্রাহিম আলকাজীর পরিচালনায় বড় মাপের প্রযোজনা হয়ে উঠেছে। কিন্তু নাটকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হল তুঘলক স্বয়ং যে মধ্যযুগীয় এবং ঐতিহাসিক হয়েও আধুনিক। তুঘলক এক

আধুনিক জটিল চরিত্র—গিরিশ কারনাডের ভাষায়—সে একজন existentialist ও atheist. তুঘলক আদর্শবাদী বুদ্ধিমান কিন্তু অস্থির দোলায়িতচিত্ত ও মহৎ ব্যর্থতার প্রতীক। এই নাটক ঐতিহাসিক হয়েও সমসাময়িক এবং ষাটের নেহরু শাসিত ভারতীয় রাজনীতির ব্যর্থতা হতাশা ভেদাভেদ তুলে ধরে। U R. Ananta Murthy অগ্রজ কন্নড় নাট্যকার মস্তি-র 'কাকন কোটে' বা আদ্য রঙ্গাচার্যর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নাটকের কথা মনে রেখেও বলেছেন there is, perhaps, no play in Kannada comparable to 'Tughlaq' in its depth and range [১২]

মানুষ পূর্ণতার প্রয়াসী, যে সম্পূর্ণতার ভাবনার নাটক 'হয়বদন' (১৯৭১)। দুই বন্ধু দেবদত্ত ও কপিল। দেবদত্ত সৌম্য সুন্দর বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ—কবি ও পণ্ডিত। কপিল হল কামারের ছেলে—বীর যোদ্ধা শক্তিশালী। অসম জীবন ও আদর্শ হলেও তারা বন্ধু। আর এক জন আছে হয়বদন বা ঘোড়ামুখো মানুষ—এক রাজকন্যা ও ঘোড়ার সন্তান। সে হতে চায় পুরো মানুষ। দেবদত্ত সুন্দরী বণিক কন্যা পদ্মিনীকে দেখে, ভালবাসে ও তাদের বিবাহ হয়। এই বিবাহকার্যে কপিলের সহযোগিতা ছিল। পদ্মিনী সন্তান-সম্ভাবিতা হয়। দেবদত্ত, পদ্মিনী ও কপিল উজ্জয়িনীর পথে চলেছে। পদ্মিনী কিন্তু কপিলের প্রতিও আসক্ত, দেবদত্তকে স্বামীরূপে ভালবাসলেও কপিলের প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করে সে। দেবদত্তর মনে এই সন্দেহ কাঁটার মত বেঁধে। পথে কালীর মন্দিরে দেবীমূর্তির সামনে এসে দেবদত্ত বিচলিত হয়। তাকে রেখে কপিল ও পদ্মিনী কাছাকাছি গেলে দেবদত্ত কালীর সামনে রাখা তরবারি দিয়ে নিজের শির ছিন্ন করে। ফিরে এসে তা দেখে কপিলও আত্মহত্যা করে। পদ্মিনী দুজনের মৃত্যু দেখে আত্মহত্যা করতে গেলে দেবী তাকে থামিয়ে বলেন যে পদ্মিনী দুটো ছিন্ন মুণ্ডু দুজনের মাথায় ঠিকঠাক বসালে তিনি দুজনকেই বাঁচিয়ে দেবেন। বিচলিত পদ্মিনী তাড়াতাড়িতে দুটো মুণ্ডু দুটো ভিন্ন শরীরে বসিয়ে দেয়—দেবদত্তর শরীরে কপিলের ও কপিলের শরীরে দেবদত্তর মুণ্ডু বসায়। শুরু হল গোলমাল, কে দেবদত্ত কে কপিল? এবং দুজনেই পদ্মিনীকে দাবী করে। কিন্তু দেবদত্তর মাথা কপিলের শরীরে আছে তাই তাকে পদ্মিনী দেবদত্ত মনে করে গ্রহণ করে চলে যায়। প্রবল আহত বেদনার্ত হয় কপিল—সে উন্মাদের মত চলে যায়। পদ্মিনীর ছেলে হয়। কতদিন পর ফিরে আসে কপিল। তার মনে এখনও পদ্মিনীর জন্য ব্যাকুলতা। পদ্মিনীও অস্থির উন্মথিত। এমন সময় দেবদত্ত আসে। কপিল ও দেবদত্ত লড়াই করে ও দুজনেই মরে। আসে ঘোড়ামুখো লোকটা—সে এখন পুরো ঘোড়া হয়ে গেছে। সে পূর্ণতা চেয়ে দেবীর কাছে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। দেবী কালী তাকে পুরো ঘোড়া করে দেন। পদ্মিনীর ছেলে ঘোড়ায় চেপে বাড়ি ফেরে।

নাটকে আনুষঙ্গিক আরো বিষয় আছে। সূচনায় গণেশের মুখোশের সামনে পূজা, সূত্রধার বা অধিকারীদের গান ও কাহিনীর বক্তব্য ব্যক্ত করা, নটের আবির্ভাব ইত্যাদি। অর্থাৎ নাটকে আছে ঐতিহ্য চেতনা ও লোকসংস্কৃতির প্রকাশ, যদিও তা ব্যঙ্গাত্মক। দেবী কালী-কে সর্বশক্তিময়ী করেও হাস্যকর করা হয়েছে। নাটকে কালীকে নগ্নও দেখানো হয়েছে। দেবীর কথাবার্তা ভাবভঙ্গী অত্যন্ত হাস্যরসের উদ্রেক করে। কালী রেগে যান, হাই তোলেন, ঘুম ভাঙ্গালে বিরক্ত হন, লঘুচিত্ত নারীর মত কথা বলেন, প্রতিশ্রুত বিষয় না পেলে বিরক্ত হন; যদিও তিনি প্রাণদান করতে পারেন। কালী প্রসঙ্গে এসব কথা নিছক মজা বা ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত। নাটকে লোকরীতির প্রয়োগ আছে; এবং প্রবল অনুভূত হয় টমাসম্যানের প্রভাব।

নাটকের বক্তব্য কি? মানুষের সাধনা পূর্ণতার সাধনা। মানুষ বা প্রাণ অপূর্ণ, সে পূ- হতে চায় সম্পূর্ণতা পেতে চায়। তাই ঘোড়ামুখো পূর্ণতা চেয়েছিল—যদিও সে মানুষ হল না, হল পূর্ণ ঘোড়া। দেবদত্ত চেয়েছিল তার তীক্ষ্ণ মেধায় কপিলের সুগঠিত দেহ; কপিল তার বলিষ্ঠ দেহের ওপর চেয়েছিল এক পূর্ণ শিল্পিত মন ও মেধা। তাদের বাসনার পরিণাম কিন্তু সুখকর হয়নি। পদ্মিনীও দেবদত্ত ও কপিল দুজনকেই চেয়েছিল—সে চেয়েছিল দেবদত্তর বুদ্ধি আর কপিলের পৌরুষ, সে পেল কিন্তু তার পাওয়াও সম্পূর্ণ হল না। চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত সংঘাত, পাওয়ার নামে আরো আঘাত বেদনা ও বাসনার অচরিতার্থতা এবং শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ব্যর্থতা—এভাবেই জীবন এগিয়ে চলে, জীবনচক্র পূর্ণতা পায়। নাটকের আর এক বক্তব্য মানুষের দ্বৈততার সংকট। জাতীয় সংগীত নিয়ে বিদ্রুপ পরিহাস নাট্যকারের স্মার্ট ও সপ্রতিভ হবার ব্যর্থ প্রয়াস।

'অঞ্জমল্লিগে' (১৯৭৭) ইংলন্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে লেখা। এটা অজাচারী প্রেমের চিত্র, পৌরাণিক যম-যমী কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত। 'হিট্টিনা হুঞ্জা' (১৯৮০, আটার তৈরী মুরগী) ধর্মের নামে কৃত্য আচার-অনুষ্ঠানকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে। জৈন মতে দেবতাকে কোন প্রাণী বলি দেওয়া যায় না, তাই আটার মুরগী করে বলি দেওয়া হয়। এ নাটকে ধর্ম আচার ইত্যাদির মধ্যকার ভণ্ডামীকে আঘাত করা হয়েছে। লেখকের কথায় 'মনের আদিম অবস্থাতে মানুষ কতদূর অজ্ঞানতায় ডুবতে পারে, কতটা হিপক্রিসি করতে পারে দেবতার নামে' নাটকে তাই দেখানো হয়েছে।

'নাগমণ্ডল' (১৯৮৮) কর্ণাটকের লোককথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর কাহিনী অদ্ভুত বিচিত্র। রানী এক মেয়ে—তার মাথার চুলের খোঁপা যেন নাগিনী কুণ্ডলী। সে প্রেমিক নাগের জন্য বসে থাকে। রানীর বিয়ে হল অপ্পন্নার সঙ্গে সে সারাক্ষণ রানীকে বাড়ীতে আটকে রাখে। সে সকালে আসে, খায়, তারপর দরজায় তালাচাবি দিয়ে চলে যায়; রানীর দিকে তাকায় না। তাকে কেবল অপমান করে আর ধমকায়। দিনের পর দিন কাটে। এক বয়স্কা অন্ধ নারী কুরুডব্বা আসে যুবক ছেলে কপ্পন্নাকে নিয়ে। কুরুডব্বা রানীর জন্য ব্যথিত। সে রানীকে এক সাধুর দেওয়া দুটো ছোট বড় শিকড় দেয় স্বামীকে খাওয়ানোর জন্য যা খেলে স্বামী বশীভূত হবে। ছোট শিকড়ে কাজ না হলে বড় শিকড় বেটে খাবার সঙ্গে খাওয়াতে হবে। রানী ছোট শিকড় খাওয়ায় অপ্পন্নাকে, কিন্তু কাজ হয় না। কুরুডব্বা বড় শিকড় দেয়। রানী খাওয়াতে সাহস পায় না, সে কেন এই অন্যায় করবে। সে ডালে মেশায় শিকড় বাটা, তারপর এক সাপের গর্তে ফেলে দেয়।

সেদিন রাতে কালসাপ রানীর ঘরে ঢোকে, মানুষের রূপ নেয়। অপ্পন্নার মতই তার চেহারা পোষাক—তার নাম নাগপ্পা। নাগপ্পা রোজ রাতে অপ্পন্নার রূপ ধরে রানীর কাছে আসে, তার সঙ্গে মিলিত হয়, সকালে চলে যায়। রানী ভাবে তার স্বামী এভাবেই রোজ রাতে আসে। কিন্তু সকালে অপ্পন্না এসে রানীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। রানী কিছু বুঝতে পারে না। ক্রমে রানী গর্ভবতী হয়। একদিন অপ্পন্নাকে বলে। অপ্পন্না শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, কারণ সে একদিনও রানীর সঙ্গে মিলিত হয়নি, কি করে রানীর গর্ভে তার সন্তান আসবে? সে বলে রানী অসতী ভ্রষ্টা কুলটা। সে গ্রামে মুখিয়াদের ডাকে বিচারের জন্য। রানী কিছু বুঝতে পারে না। মুখিয়ারা এসে রানীকে বলে তাকে সতীত্বের পরীক্ষা ধরে। রানী ভাবে এর থেকে মৃত্যু ভাল। সে বলে—সে নাগশপথ নেবে সাপের গর্তে হাত দিয়ে সাপকে ধরে মৃত্যুর চুম্বন নিয়ে। সে গর্তে হাত দিয়ে সাপকে টেনে বলে—তার স্বামী আর সাপ ছাড়া কাউকে সে স্পর্শ করেনি; একথা মিথ্যে হলে কালসাপের দংশনে তার যেন

মৃত্যু হয়। সাপ রানীর কাঁধের ওপর দিয়ে ওঠে, মাথায় উঠে ফণা ধরে, তারপর তার গলার চারপাশে মালার মত ঘোরে, শেষে চলে যায়। লোকে মনে করে রানী দেবী, অপ্পন্নাও তাই ভাবে যদিও তার মনে দ্বিধা আছে।

রানীর সন্তান হয়েছে —স্বামী শিশু সব নিয়ে তার সংসার। এদিকে সাপ বা নাগপ্পা রানীর জন্য ব্যাকুল হয়। আবার সুখী রানীকে দেখে তার হিংসা হয়। তারই জন্য রানী পেয়েছে এই সুখ। সে রানীকে কি মারবে? না, সে তার প্রিয়কে মারতে পারবে না, বরং সে মরবে। সে রানীর নাগিনীকুন্তলার মত ঘন কালো চুলে নিবিড় হয়ে থাকবে। সে চুলে প্রবেশ করে, একগাছি চুল নিয়ে ফাঁস করে পরে নিজের গলায়। পরদিন মৃত সাপকে দেখে রানী বোঝে অনেক কিছু। অপ্পন্না যখন বলে যে রানীর চুলই তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে, রানী বলে যে কাল সাপ নিজের জীবন আহুতি দিয়েছে, বাঁচিয়েছে তাদের সন্তানকে, কালনাগ পিতার মত তার জীবন ভিক্ষা দিয়েছে। এ ঋণ যে ইহজন্মে শোধ করতে পারবে না, তার সন্তানও যেন এ ঋণ কোনদিন না ভোলে। তার ছেলে এর মুখাগ্নি করবে এবং প্রতি বৎসর এই দিনে তার ছেলে কালনাগের তর্পণ করবে, পিণ্ডদান করবে। অপ্পন্না রানীর কথায় রাজী হয়, কারণ সে তো সাক্ষাৎ দেবী।

'নাগমণ্ডল' ক্ষুদ্র অর্থে পুরুষের দুই রূপ——একদিকে নিষ্ঠুর নির্মম, অন্যদিকে প্রেমিক। রাজিন্দর নাথ 'নাগমণ্ডল' এর ব্যাখ্যা করেছেন as something between illusion and reality, a blurring of lines as it werer, where our desires take on fantastical shapes নাট্যকাহিনী ঠিক মৌলিক নয়। লোককথায় এর পরিচয় আছে। নাগমণ্ডল-এর গল্প তিনি শুনেছিলেন এ কে রামানুজন-এর কাছে, নাটকটি তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়। এই নাটক বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে। নীলম মানসিং চৌধুরী নাটকটি 'নাগছায়া' নামে পঞ্জাবীতে প্রযোজনা করেন। তাঁদের মতে এর বিষয় হল— transformation and duality of human experiences and existence. The leit-motif is the image of the snake that is part metaphor, part reality, part idea and energy. সমালোচক Nikhat Kazmi বলেছেন যে The playwright's creative genius turns itself to the unfathomable recesses that lie within man-woman relationship and explores the hidden depths of the human psyche.[13]

'তালেদণ্ড' (শিরচ্ছেদ বা শিরচ্ছেদের শাস্তি, ১৯৯০) দ্বাদশ শতাব্দীর কর্ণাটকের বিশিষ্ট পুরুষ বসবন্না বা বাসবেশ্বর-কে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। বীরশৈবধর্মে দীক্ষিত বসবন্না ছিলেন রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ সন্ত কবি এবং লিঙ্গায়ত ধর্মমতের প্রবক্তা। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী — স্থাবর দেবতা ও মন্দিরের অর্থ তিনি খুঁজে পাননি। তিনি মানুষকেই বড় বলে মনে করতেন। কায়িক শ্রমই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং লোভলালসা সম্পদবৈভব বর্জিত জীবনচর্যাই তার আদর্শ। তাঁর শিষ্যরা শরণ নামে অভিহিত আধুনিক অর্থে যাদের সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত সম্প্রদায়রূপে অভিহিত করা যায়। 'তালেদণ্ড' নাটকের তিনিই প্রধান পুরুষ। নাটকের কাহিনী স্মরণ করা যাক। কল্যাণের রাজা বিজ্জল। তিনি কালচূর্য বা নাপিত বংশের সন্তান। বাসবন্না তাঁর প্রিয়পাত্র ও রাজকোষাগারের প্রধান। বাসবন্না দেশের মানুষকে জাগাতে চান, বর্ণাশ্রম প্রথাকে দূর করতে চান, সব মানুষকে ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করাই তার সাধনা। দেশে বাসবন্নার শিষ্য শরণ সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষের সম্পর্ক। এর মধ্যে এক প্রতিলোম বিবাহের ঘটনা ঘটে। শরণ ও মুচি জাতের হরলাইয়ার

ছেলে শীলবন্তর সঙ্গে আর এক শরণ কিন্তু জাতে ব্রাহ্মণ মধুবরম-এর মেয়ে কলাবতীর বিয়ে হয়। বসবন্না এই বিবাহে সম্পূর্ণ মত দেননি কারণ এর ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা রক্তপাত ও হত্যার মধ্য দিয়ে যে ভয়ংকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে তাকে সামাল দেবার মত অবস্থা এখনো তৈরী হয়নি। বিজ্জল এই বিবাহের বিরোধিতা করেন নি। বাসবান্না নিজ মানুষজন ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। এই বিবাহের ফলে ব্রাহ্মণ ও শাসক গোষ্ঠীর মানুষজন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তারা বিজ্জলকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করে এবং বিজ্জলের অপদার্থ পুত্র সোবিদেবকে রাজা করে। সারা দেশে আগুন জ্বলে, রাজার আদেশে শরণদের ওপর প্রবল অত্যাচার চলে, নতুন রাজা সোবিদেব ঘোষণা করে—ওদের ধ্বংস কর। কেউ রাজার বিরুদ্ধে মুখ খুলবে না, রাজপরিবার রাজানুচর বা অমাত্যদের বিরুদ্ধেও কোন কথা বলা চলবে না। সমস্ত শরণকে, সমস্ত স্বাধীন চিন্তার মানুষকে, সমস্ত বিদেশীকে রাজ্যে নিষিদ্ধ করা হল। শহরে তাদের দেখা গেলে তাদের শিরচ্ছেদ করা হবে। শিশুদের কান্না, নারীদের আর্তনাদ, অস্ত্রের ঝনঝনানি আর পেছনে দাউ দাউ জ্বলা আগুনের মধ্যে নতুন রাজার মহিমার কথা ঘোষিত নকিবের কণ্ঠে। নাটক শেষ হয়।

এই বিষয় নিয়ে কন্নড় ভাষায় আরো নাটক লেখা হয়েছে। তবু গিরিশ কারনাডের নাটকটি বেশ উচ্চমানের । ঘটনা যথাযথ বিন্যস্ত। চরিত্রগুলির মনোলোকও উদ্ভাসিত হয়েছে। রাজা বিজ্জলের পুত্রের প্রতি বিচিত্র আচরণ যাতে বিদ্বেষ ও ভালবাসা দুইই আছে, আপন অতীত বর্ণপরিচয় নিয়ে (সে নীচ জাতের সন্তান) মানসিক জটিলতা যার ফলে বাসবন্নার প্রতি অনুরাগ ও প্রতিলোম বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ না করা ইত্যাদি চমৎকার হয়েছে এবং তার শেষ পরিণতিও যেন তার অনাকঙ্ক্ষিত থাকেনা। বসবন্নার মনেও দ্বন্দ্ব আছে—নিজস্ব আদর্শ ও বাস্তব ভাবনার দ্বন্দ্ব, রাজানুগত্য ও রাজবিদ্রোহের দ্বন্দ্ব। তবে নাট্যকার সাধারণ মানুষের ওপর রাজতন্ত্রের জয় ঘোষণা করেছেন; শরণদের ওপর প্রবল অত্যাচার দিয়েই নাটক শেষ হয়। যদিও প্রায় একই বিষয় নিয়ে লেখা এইচ এস শিবপ্রকাশ-এর 'মহাচৈত্র' নাটকে বিদ্রোহী শরণদের জয় ঘোষিত হয়েছে।

'অগ্নি মাত্তু মালে' (অগ্নি ও বর্ষা, ১৯৯৪) নাটক মিথ নির্ভর তবে এর ব্যাখ্যা আধুনিক। দশ বছরের অনাবৃষ্টিজনিত খরাপীড়িত অঞ্চলে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে প্রসন্ন করার জন্য বৃহৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত পরবসুর কাছে সূত্রধার অনুমতি চায় যজ্ঞস্থলে এক নাটক অভিনয়ের যাতে পরবসুর ভাই পিতৃহত্যার দায়ে অভিযুক্ত অরবসুকে অভিনয় করার অনুমতি দেওয়া হয়। পরবসুর পত্নী বিশাখার সঙ্গে অরবসুদের জ্ঞাতিভ্রাতা যবক্রিব একটা সম্পর্ক আছে। যবক্রি অরণ্যে দশ বছর ছিল যেখানে সে কৃচ্ছ্রসাধন করেছে ও কিছু গোপন বিদ্যা শিখে এসেছে। কিন্তু তার বাল্যের ভালবাসা আছে মনে। সে বিশাখাকে প্রলুব্ধ করে। স্বামীর ঔদাসীন্য ও লোভের জন্য বিশাখার শুষ্ক ও অবহেলিত মন এতে সাড়া দেয়। বিশাখার শ্বশুর রাইভ্য বিশেষত যবক্রির ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় তার অন্যায় আসক্তির জন্য। তার অলৌকিক শক্তির দ্বারা ও মন্ত্রপূত জলের সাহায্যে সে এক পিশাচ রাক্ষস (ব্রহ্মরাক্ষস) নির্মাণ করে যবক্রিকে হত্যার জন্য। বিশাখা যবক্রির কাছে গিয়ে তাকে সতর্ক করে। কিন্তু সে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে দেখে যে কেবল প্রতিহিংসার জন্য যবক্রি তাকে প্রতারিত করেছে; তার ভালবাসাও ছিল চক্রান্তের অঙ্গ। বিশাখা ফেলে দেয় মন্ত্রপূত জল যা যবক্রিকে বাঁচাতে পারত ও তাকে চলে যেতে বলে জীবনরক্ষার জন্য। রাক্ষস যবক্রিকে হত্যা করে। অরবসু ভালবাসে উপজাতি গোষ্ঠীর মেয়ে নিত্তিলাই-কে। কিন্তু উপজাতি গোষ্ঠীর অগ্রজরা কোন কারণে

অরবসুর ওপর ক্রুদ্ধ হয় ও তাদের জাতের মেয়েদের অন্যত্র বিবাহের স্থির করে; কিন্তু অরবসু তাকেই চায়। পরবসুকে বিশাখা তার প্রেমহীন জীবন ও শ্বশুর কর্তৃক পীড়নের কথা বলে। রাইভ্যা ফিরলে সে পরবসুর তীরের আঘাতে মারা যায়। অন্য কেউ দেখার আগে পরবসু যজ্ঞস্থলে যায় ও ছোটভাইকে বলে শেষকৃত্যের আয়োজন করতে। তাকে পিতৃহত্যার দায়ও নিতে বলে। বিশাখা বাধা দেয়। পিশাচ পরবসুর কাছে মুক্তি প্রার্থনা করে। পরবসু তাকে সরিয়ে দেয়। পরবসু যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করে ও অরবসু এলে তাঁকে পিতৃহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে। অরবসুকে প্রবল আঘাত করা হয়। নিত্তিলাই ও সূত্রধর তাকে বাঁচায় ও নাটকে তাকে অভিনয় করতে বলে। নিত্তিলাই লুকিয়ে থাকে কারণ তার জাতির লোকেরা তাকে হত্যার জন্য খুঁজছে। নাটকের মধ্যে নাটক শুরু হয়। অরবসু যেন আবিষ্ট। সে মণ্ডপে অগ্নিসংযোগ করে। পরবসু অগ্নিতে প্রবেশ করে। নিত্তিলাই রক্ষা করে অরবসুকে কিন্তু এই উপজাতি মানুষের তীরে সে মারা যায়। চরম বলিদান ঘটে। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র প্রবেশ করে। রাক্ষস অরবসুকে বলে তাকে মুক্তি দিতে। অন্যরা চায় বৃষ্টি। অরবসু চায় তার নিত্তিলাই ফিরে আসুক, প্রাণ নিয়ে। অরবসু শেষ পর্যন্ত বোঝে যে কালের চাকা এগিয়ে যাবে। সে রাক্ষসের মুক্তি চায়। তার ইচ্ছা পূরণ হয়। ক্রমে প্রার্থিত ফল পাওয়া যায়। আস্তে আস্তে নামে বাতাস ...... ঝড় ..... বজ্রপাত এবং বৃষ্টি। শাস্ত্রনিষ্ঠ পরবসু স্বর্গের আশীর্বাদ পায় না; অরবসুর ভালবাসা ও নিত্তিলাইকে বলিদান আনে বৃষ্টি।

নাটকে বৈদিক ঐতিহ্যকে বিচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ও সেখানের দুই দুর্বল আদর্শকে প্রবল করা হয়েছে—নারী ও শূদ্র। বিশিষ্ট পরিচালক এই নাটকে ব্রহ্মরাক্ষসের চরিত্রকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে বাদ দিয়েছেন, কিন্তু গিরিশ তা চান নি। চরম মুহূর্তে অরবসুর সিদ্ধান্ত—সে তার প্রেমিকার জীবন চাইবে না ভয়ঙ্কর ব্রহ্মরাক্ষসের? করনাডের মতে এটা নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু পরিচালক প্রসন্নও সঙ্গত কারণেই দীর্ঘ ক্লান্তিকর নাটককে হ্রস্ব করেছেন, তাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক বাদ দিয়েছেন; ব্রহ্মরাক্ষস এখানে মূল নাটকের ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে না মনে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নাটকে বৈদিক আদর্শের পুনর্বিচার আছে; লোক ঐতিহ্য ও লোকায়ত ভাবনার প্রকাশ আছে; নারীদের বেদনার কথা বলা হয়েছে বিশেষত শূদ্র নারীদের কথা : সামগ্রিকভাবে নারীদের অসহায়তার কথা রূপে পেয়েছে। তবু নাটকে বক্তব্য ঠিকমত প্রতিপাদিত হয়নি, ভাবনার প্রকাশ ঘটেনি যথাযথ, নাটকের গাঁথুনি দুর্বল—নাটক হয়েছে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর। অবশ্য কোন কোন সমালোচক 'তালেদন্ড' নাটককে শিল্পবিচারে অত্যন্ত সার্থক মনে করেছেন। কবিতা নাগপাল বলেছেন—Brahminicide, patricide, fratricide, adultery, mortals wooing and winning the gods, celestial beings granting boons—the play reads like a minor Greek tragedy.[১৪]

টিপু সুলতান ছিলেন ভারত ইতিহাসের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি বীর যোদ্ধা ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই করেছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতেও তাঁর ছিল নিরলস প্রয়াস। তিনি ছিলেন উদার ও অসাম্প্রদায়িক এবং এক মহান দ্রষ্টা। স্বদেশ ও সভ্যতাকে নিয়ে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর দেখা এই স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে গিরিশ করনাড লিখেছেন, 'টিপু সুলতান কণ্ড কনসু' (টিপু সুলতানের দেখা স্বপ্ন) যে গ্রন্থটি প্রকশিত হয় ২০০০ সালে। এই নাটক 'টিপ্পুবিন কনসগলু' নামে মঞ্চস্থ হয় ১৯৯৯-এর মে মাসে। টিপুর মহাপ্রয়াণের দুশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এটি রচিত হয়। টিপুর দেখা

স্বপ্নগুলো—যা দেশকে জাতিকে গড়ে তুলবে — নাটকে দৃশ্যায়নের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি প্রযোজনা করে নাটক কর্ণাটক রঙ্গায়ণ মাইসোর, পরিচালক বিশিষ্ট নাট্যবিদ সি বাসবলিঙ্গাইয়া। নাটকে টিপুর ভূমিকায় অভিনয় করেন হুলুগপ্পা কট্টিমণি। নাট্যপ্রযোজনার মধ্যে ছিল আকর্ষণীয় চমক।

সারা ভারতবর্ষে এবং বহির্ভারতে গিরিশ কারনাড অনন্য মর্যাদা পেলেও তিনি সমালোচকদের সর্বদাই প্রসন্ন করতে পারেন নি। তিনি বাস্তব বিমুখ, সাধারণ মানুষ তাঁর নাটকে শোচনীয়ভাবে অবহেলিত, তিনি অবদমিত যৌন বাসনার রূপকার ইত্যাদি প্রতিকূল সমালোচনা তাঁর নাটক সম্বন্ধে করা হয় যদিও সর্বাংশে সত্য কিনা তা বিচার্য। তবু মনে হয় তাঁর ভাবনায় যুক্তির বা বোধের অবনমন ঘটছে। আমাদের আহত করে তিনি বলেন যে বিগত সহস্র বৎসরে ভাল নাটক লিখেছেন ধর্মবীর ভারতী, বিজয় তেণ্ডুলকর, মোহন রাকেশ ও বাদল সরকার (The best plays in the last thousand years have been written by Dharamvir Bharati, Vijay Tendulkar, Mohan Rakesh and Badal Sirkar.[15] (The Hindu, Theatre, 8.2.98) — এসব অবোধের উক্তি। এবং এটা আশ্চর্যের লাগে না যখন তিনি বলেন—'রবীন্দ্রনাথকে আমি কোনো নাট্যকারই মনে করি না,'[১৬] কারণ এতে রবীন্দ্রনাথের থেকে কত নীচে তাঁর অবস্থান তা সহজেই বোঝা যায়। তবে বলবন্ত গার্গী (যার মেধার জগতকে কারনাড কোনদিনই ছুঁতে পারবেন না) প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব মনে করেন যে আধুনিক ভারতীয় থিয়েটার বলতে বোঝায় রবীন্দ্রনাথকেই যে শিল্পী গায়ক কবি অভিনেতার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল (Theatre in India–Balwant Gargi)। বোধের এই সব বিচ্যুতি বা ভ্রান্তি সত্ত্বেও গিরিশ কারনাড আধুনিক কন্নড় তথা ভারতীয় নাটকের এক অনন্য উজ্জ্বল পুরুষ রূপেই সম্মানিত হবেন।

চন্দ্রশেখর বাসবরাজ পাটিল (১৯৩৯) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। কবিরূপেও তিনি বিশেষ শক্তিমান। 'সংক্রমণ' মাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে কবিতা ও নাটক লেখার জন্য তিনি কারাবাস করেন। নাট্যকার হিসেবে তিনি সম্যক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ভাবনার বৈচিত্র্য তাঁর নাটককে স্বাতন্ত্র্য-মণ্ডিত করেছে। তিনি ব্যঙ্গাত্মক লেখক—তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে তিনি অন্যায়কারী ও অত্যাচারীকে জর্জরিত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক রচনায়ও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। অ্যাবসার্ড তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি উদ্ভটত্ব ও অসংগতিকে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু সেই আপাত যুক্তিহীন অসংলগ্নতার মধ্যেও গভীর অর্থ নিহিত থাকে। সমাজসচেতন জীবননিষ্ঠ নাট্যকারের গভীর বোধ এখানেও প্রকাশ পায়। প্রতীকের মাধ্যমে সংকেত-তির্যক ভাষণে তাঁর বক্তব্য গভীর ও ভাবময় হয়ে ওঠে। তাঁর অনুপম কবিত্বশক্তি চন্দ্রশেখরের নাটককে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তাঁর উল্লেখ্য নাটক হল 'কোডেগলু' (ছাতাগুলি, ১৯৬৮), 'আপ্পা' (১৯৬১), 'গুর্তিনভরু' (চেনালোক ১৯৭০), 'কুন্তা কুন্তা কুরুবত্তি' (ল্যাংড়া কুরুবত্তি—লোকগীতির প্রথম পংক্তি, ১৯৭০) 'তিঙ্গরা বুড্ডনা' (১৯৭১), 'কত্তল রাত্রি' (আঁধার রাত, ১৯৭৩), 'জগদম্বেয় বিদিনাটক' (জগদম্বের পথ নাটক ১৯৭৪), 'গোকর্ণদ গৌড়সনি' (গোকর্ণর মোড়লের স্ত্রী) 'বুরুডিবাবা' ইত্যাদি।

'আপ্পা' জীবনের গভীর বোধের নাটক। এর বিষয় পিতৃত্ব যাতে এক পতিতার ছেলে যন্ত্রণাকাতর কারণ সে জানেনা তার বাবাকে। রূপকথার গল্প, রাজকুমারীর গল্প যা তার মা তাকে বলত আর তাকে সান্ত্বনা দেয়না কারণ সে এখন বড় হয়েছে। ব্যর্থ অনুসন্ধানের

পর সে এই সিদ্ধান্তে আসে যে সে-ই তার জনক কারণ যা সে করেছে ও যা সে করবে সবকিছুর জন্য সে-ই দায়ী। মানুষের পরিচয় সে নিজে, তারা পূর্বাপর কর্মই তাকে নির্মাণ করে। 'গোকর্নদ গৌড়সনি' নাটকে আধুনিক কন্নড় নাটককে ব্যঙ্গ বা প্যাবডি করা হয়েছে যা কনভেনশনাল লোকনাটকের আঙ্গিকে পূর্ণ অথবা অকিঞ্চিৎকর পৌরাণিকতা তার মধ্যে আছে যা আধুনিক জীবনের জটিল সমস্যাবলী ঠিকমত প্রকাশ করতে পারে না।

'তিঙ্গর বুড্ডন্না' চন্দ্রশেখর পাটিলের বিশেষ খ্যাতিমান নাটক। উদ্ভট অবাস্তব ভাবনাব দ্বারা গভীব সত্যকে ব্যক্ত করা হয়েছে যা হল ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তা প্রয়োগকারীকেই ধ্বংস করে। মদমত্ত ক্ষমতাবলে মানুষ আত্মপর্বে স্ফীত হয়ে নিজের ধ্বংসকেই টেনে আনে। এক বৃদ্ধ দম্পতির পুত্র হয় পুরোনো পিঁয়াজের মধ্য থেকে। তারা পালিত পুত্রকে বড় করে যার মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা প্রবল হয়। সে স্কুলে যায় কিন্তু বন্ধুরা তাকে নীচু জাত, পিঁয়াজ বুড্ডা ইত্যাদি বলে অপমান করে। বৃদ্ধা মার কাছে তার অপমানের কথা জানালে বৃদ্ধা তাকে মন্ত্র শিখিয়ে দেয় যা দিয়ে সে তার অপমানকারীকে হত্যা করতে পারে। সে একটা কাঠবিড়ালীকে একটা প্রজাপতিকে তার বন্ধুদের এবং শিক্ষককেও হত্যা করে। তার বৃদ্ধা মা তাকে ঠিক সময়ে খেতে না দেওয়ায় তাকে মন্ত্র পড়ে মেরে ফেলে এবং বৃদ্ধ পিতাকেও। শেষ পর্যন্ত সেই দাম্ভিক অবিমৃষ্যকারী নিজের কাজ না বুঝে নিজেকেই হত্যা করে। অহংকারী নির্বোধ অত্যাচারী মদগর্ব ব্যক্তির এই পরিণামই ঘটে ঃ বিশ্ব ইতিহাসও তাই শিক্ষা দেয়।

চন্দ্রকান্ত কুসনূর (১৯৩১) এক প্রখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক। তিনি একজন বিশিষ্ট নাট্যকারও বটেন। তিনি প্রায় ২৫টি নাটক লিখেছেন যাদের মধ্যে তাঁর পরিশীলিত শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি Absurd play বা উদ্ভট নাটকের খ্যাতিমান স্রষ্টা। তাঁর নাটকে অসঙ্গত ভাবনার মধ্য দিয়ে জীবনের রূপকে তুলে ধরা হয়েছে যাকে তিনি সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে চান। নাট্যশিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি মনে করেন নাটকের মধ্য দিয়ে দর্শকের সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ করা যায়। এই সৃজনশিল্পের সম্ভাবনা অন্যান্য শিল্পরূপের থেকে বেশী বলে তিনি মনে করেন। বাচিক ও শারীরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভাবনার সুন্দর প্রকাশ ঘটে। চন্দ্রকান্ত কুসনূরের বিখ্যাত নাটক হল— 'হল্লাকোল্লা নীরু' (নদীর জল), 'মূরু অসংগত নাটকগলু' (তিনটে অসংগত নাটক, ১৯৭১-৭২), 'নালকু অসংগত নাটকগলু' (চারটে অসংগত নাটক, ১৯৭২), 'সেলাতা' (১৯৭২), 'মনে' (বাড়ি), 'আনিবন্ততনি' (বাচ্চাদের ছড়ার লাইন, এর অর্থ হাতী আসছে হাতী) ইত্যাদি।

প্রসন্ন (১৯৫১) বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী। তিনি খ্যাতিমান নাট্যকার, নাট্যপরিচালক; কবিতা এবং অন্যান্য শিল্পের ওপরও তার গভীর আকর্ষণ আছে এবং সে সব বিষয়েও তার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যে তো তিনি খ্যাতিমান। প্রসন্ন প্রায় ৪০টা নাটক পরিচালনা করেছেন যারা সর্বভারতীয় মর্যাদা পেয়েছে।

নাট্যকার রূপে তাঁর স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি সমাজের কথা বলেছেন, দ্বন্দ্ব জটিলতায় আকীর্ণ ভারতবর্ষের সমাজ ও রাজনৈতিক ভাবনায় সত্যরূপকে তিনি ধরতে চেয়েছেন; জীবনের জটিলতার রূপ তিনি এঁকেছেন। মানুষই তাঁর নাটকের প্রধান বিষয়— লোককথার চরিত্র অথবা প্রবল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সবাই তাঁর নাটকে ফুটে উঠেছে আপন স্বরূপে এবং বৈশিষ্ট্যে।

তাঁর প্রথম নাটক 'ওন্দু লোক কথে' (১৯৭৭—এক দুনিয়ার গল্প) রাজস্থানী

লোককথার ওপর আধারিত। 'দাঙ্গেয় মুণ্ডিনা দিনগলু' (১৯৭৮—দাঙ্গার আগের দিনগুলো) নাটকে ব্রিটিশ দখলের পূর্বে অযোধ্যার সুলতানের রাজ্যের অবক্ষয়ের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। সুলতান এই বিপর্যয়ের মধ্যেও অনেকটা নির্বিকার, দেশের অভিজাতজনও উদাসীন। নারীদের নৈতিকতারও অধঃপতন ঘটেছে। বিবাহিত জীবনের অসম্পূর্ণতা ও বেদনা অনেকে মেনে নিলেও কোন কোন নারী স্বামীর অযোগ্যতা বা অপদার্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে পরপুরুষে আসক্ত হয়। প্রসন্নর 'দাঙ্গেয় মুণ্ডিনা দিনগলু'র ভিত্তি প্রেমচন্দের গল্প, কিংবা বলা ভাল সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'। নাটকের কাহিনী সংক্ষেপে বলা হল। মির্জা সলিম আলির বাসভবনে মির্জা ও তার বন্ধু মীর রোশন আলি দাবা বা শতরঞ্জ খেলায় ব্যস্ত। বেগম মির্জা অবহেলিত হয়। কিন্তু বেগম মীর স্বামীর অবহেলায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রেমিক হাসানের কাছে যায়। হাসান লখনৌ-র অবস্থায় অধীর। বেগম মির্জা তাদের বাড়ি থেকে দাবার বোর্ড উল্টে দেয়, খেলোয়াড়দের উৎখাত করে যারা নিরুপায় হয়ে রাস্তার ধারে বেঞ্চে বসে এবং মানুষের বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হয়ে মীরের বাড়িতেই যায়। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট অযোধ্যার নবাবকে জানায় যে গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে সুলতানের রাজ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী রাখা হবে আইন শৃঙ্খলার জন্য। সুলতান এতদিনে সচেতন হন। কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে, দাবা খেলার দল মীরের বাড়িতে যাওয়ায় বাড়ির লোকেরা ক্ষুব্ধ কারণ তাদের কাজ করতে হবে। বেগম মীরও প্রেমিক হাসানের সঙ্গে পরামর্শ করে কি করে খেলোয়াড়দের তাড়ানো যায়, হাসান সুলতানের দূত সেজে এসে বলে যে মীর ও মির্জাকে সুলতানের দরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে। এরা পালায় ও নির্জন স্থানে গিয়ে খেলা শুরু করে—ব্রিটিশ সেনার পদধ্বনি তাদের কানে পৌঁছয় না। সুলতান পরাজয় স্বীকার করেন, হাসান ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগ দেয় ও বিপ্লবের প্রয়াস পায়, খেলায় মত্ত মীর্জা ও মীর এক সামান্য বিষয় নিয়ে কলহে লিপ্ত হয় ও পরস্পরকে হত্যা করে।

প্রসন্ন-র 'তদ্রুপি' (৭৯, একইরকম) মার্কুইজ-এর Autumn of a Patriarch পড়ে লেখা। পরের নাটক 'মহিমাপুর' (১৯৮১)। 'উলি' আগে লেখা হলেও পরে ছাপা হয়। 'জঙ্গমদ বাদুকু' (জঙ্গম জীবনের কথা) নাটকও আগে লেখা, প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। এটি নারী-পুরুষ সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরে—বিবাহ, নীতিবোধ এবং ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার সংকট এখানে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সময়ে মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা নাটকে ফুটে উঠেছে।

পরের নাটক 'হদ্দু মীরিদা হাদি' (মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া রাস্তা)।

প্রসন্ন-র নাটক 'গান্ধী' রচিত হয়েছে অনেক আগে, কিন্তু লেখক জানিয়েছেন যে এর প্রকাশকাল ২০০১ খ্রীস্টাব্দ। গান্ধীজীর মহৎ আদর্শ, তাঁর মানবতাবাদী জীবনদর্শন, হিন্দু-মুসলমান মিলন ভাবনার ওপর প্রসন্নর গভীর আস্থা। রামচন্দ্র ছিলেন গান্ধীজীর আদর্শ এবং প্রসন্ন ভবভূতির লেখা 'উত্তররামচরিত' মঞ্চায়নের সময়ে রামকে চিত্রিত করেছেন এক আদর্শবাদী অসাম্প্রদায়িক রাজা রূপে। প্রসন্ন মনে করেন 'Gandhi starts with the image of Ram and ends with the image of Christ'.[১৭] 'গান্ধী' নাটকের আঙ্গিকও অভিনব। The National School of Drama Repertory-তে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ৯ মার্চ ২০০০। নাটকের মঞ্চায়ন ও বক্তব্য সম্বন্ধে পত্রিকার মতামত উদ্ধৃত হল —

Playwright-director Prasanna's production *Gandhi* has raised public questions. The play has become a stimulant and its topical and sensitive nature generates more questions and defies the ground realities. Prasanna is in search of the truth and truth is God. Prasanna attempts in this play to

understand Gandhi but through his adversaries. The play is a testing ground of Gandhian ideas through the eyes of his adversaries.

Prasanna calls his production an experiment with truth. The play is a process. Actors do not play character roles. The only real character in the play is the teacher enacted by Sapna Moudgil. The rest of the cast are students. Even Gandhi's role is not acted by a single student.

It is only rare that one gets to see plays as powerful as *Gandhi*. The script is powerful and the cast is made up by final year students of National School of Drama. It took him 40 days just to write and prepare the play. Not only is the script on Gandhi different from others but so also is the form.

Realism becomes emulative says Prasanna and so this production is not even realistic. It is directors' play. The actors fill in the roles given to them to perfection. The incidents are ones that could happen to anyone. They could be discussions at the street corner level or at the official level.

A group of students coerce the teacher into doing a play on Gandhi. Keeping in mind the sensitive communal situation in the country, the teacher is hesitant. Finally she agrees but retains the right to stop any thought, idea or gesture that could threaten harmony. It is Nathuram Godse's trial courtroom. Godse is dead. And so is Gandhi. But the ideas for which they stood for are skilfully projected and have been related in terms of current problems.

In his struggle for India's freedom, Gandhiji donned the image of Ram. It is an image and not the reality. Gandhiji's version of Ram is moral, ascetic and non-violent. The play is critical of the current breed of politicians who utilise Ram to suit their political ends. Obviously he hints at the December 6 incident of Ayodhya.

Godse's attack on Gandhi is a play within the play. The teacher comes to his rescue but gets injured in the process. The tense atmosphere gets some reprieve when the teacher starts to singing *Vaishnav jan to taine kahiye je*. Issues such as Noakhali and partition are also taken up. The play reaches London where comedians enact—Gandhi, Churchil and Charlie Chaplin.

The sets are simple—minimum of props. The form is also flexible. The students are attired in casuals. Only Tagore wears a robe and Churchil is painted to look like a clown. The resultant concotion is simple yet so strong and infectious that the audience is forced to think. Perhaps, it would be a good idea to screen the play on Doordarshan for wider reach.

Music has also been assigned an effective role. Songs have been compiled by Mohan Uppreti which carry an air of entrancing music.

The message is clear : *Ahimsa* is the right solution to the problems that face us today. Even Godse admits in the end Gandhi is right. And when you think of Bombay incidents the image of Gandhi tugs you all the more.[18]

লিঙ্গদেবরু হলেমনে (১৯৪৯) একজন ভাষাতত্ত্ববিদ এবং সাহিত্যিক। নাটকে তাঁর বিশেষ আগ্রহ—বলা যায় তিনি এসময়ের একজন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনি মূলত

ইতিহাসাশ্রিত নাটক লেখেন যেগুলি ঠিক ঐতিহাসিক নাটক নয়। তাদের মধ্য দিয়ে লেখক ইতিহাসকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে। পুরোনো ইতিহাসকে কেবল নাট্যরূপে গ্রহণ করেন নি, তাকে নতুন ভাবে বিচার করতে চেয়েছেন। মনে হয় একই ইতিহাস যেন গড়ে উঠেছে নতুন রূপে নতুন প্রত্যয়ে। সাধারণ মানুষের ভাবনাই তাঁর নাটকে রূপ পায়। মানবমন এবং সমাজের দ্বান্দ্বিক বিচারেই তিনি প্রয়াসী। মানুষের জীবনকেন্দ্রিক আদর্শবাদের ওপরেই নির্ভর করে তিনি নাটক লেখেন বলে অনেক সমালোচক মনে করেন; এই মত সত্য হলেও তিনি গ্রাহ্য করেন না as long as my plays lend their voices to the common man's aspirations.[১৯]

লিঙ্গদেবরু হলেমনের মৌলিক নাটক হল 'চিক্কদেব ভূপ', 'হায়দার', 'অন্তেমবর গণ্ড', 'শাপ', 'তস্কর' ইত্যাদি। এছাড়া কয়েকটি নাটকও তিনি অনুবাদ করেছেন। অনূদিত নাটকগুলি হল—'ড. বেথুন' (১৯৮৬, কানাডিয়ান নাট্যকার রড ল্যাংলের ঐ নামীয় নাটকের অনুবাদ), 'ধর্মপুরিয় দেবদাসী' (১৯৯১, ব্রেখটের Good Woman of Setzuan-এর রূপান্তর), 'মাদার কারেজ' (১৯৯৫, ব্রেখটের অনুবাদ), 'মনুষ্য অন্দ্রে মনুষ্য নে' (১৯৯৭, মানুষ হল মানুষ, ব্রেখটের Man is Man অবলম্বনে), 'চুপু তলে গুণ্ডু তলে' (১৯৯৮, ব্রেখটের Round heads, peak heads অবলম্বনে) ইত্যাদি। ব্রেখটের 'The Resistable Rise of Arturo Ui' নাটকেরও রূপান্তরসাধন করেছেন। এছাড়া তিনি টেলিসিরিয়াল লিখেছেন, নাটকের ওপর অনেক প্রবন্ধও লিখেছেন যেগুলি বড় মাপের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অনেক ছোট নাটক এবং পথ নাটকও লিখেছেন, তার নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। তার নাটকগুলি প্রথমে মঞ্চস্থ হয় পরে, প্রকাশিত হয়।

'চিক্কদেব ভূপ' (১৯৮১) ঐতিহাসিক নাটক। ১৭৩০ সালে মহীশূর রাজ্যের চিক্কদেবরাজ ওডেয়র-এর সময়ে কৃষক বিদ্রোহের ওপর ভিত্তি করে এটি লেখা। রাজ্য বাড়ানোর জন্য রাজা অতিরিক্ত কর বসানোয় প্রজারা ক্ষুব্ধ হয় ও বিদ্রোহ করে। সাম্প্রদায়িক শক্তিরাও কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেয় রাজসভায় নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য। জৈন, বৈষ্ণব ও বীরশৈব মন্ত্রীদের মধ্যেও সংঘাত লাগে। এই ঝামেলার মধ্যে সৈন্যদল কৃষকদের বিধ্বস্ত করে। কৃষকরা ক্রোধে জৈন প্রধান-মন্ত্রীকে হত্যা করে। এই আশার বাণীতে নাটক শেষ হয় যে কৃষকদের আবার নব অভ্যুত্থান ঘটবে। শাসক ও শাসিতের দ্বান্দ্বিকতা নাটকে আছে। অনেক নাটকটিকে কন্নড় ভাষার প্রথম সম্পূর্ণ বিদ্রোহ-নাটক বলে অভিহিত করেন। নাটকটি বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা করেন বিশ্বনাথ মিরলে ও সি জি কৃষ্ণস্বামী ও গঙ্গাধর স্বামী।

'হায়দর' (১৯৮৭) নাটকের ভিত্তি মহীশূর রাজ্যের অষ্টাদশ শতকের শাসক হায়দর আলি খান-এর জীবন। হায়দর একজন অশিক্ষিত ও সামান্য সৈনিক, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মিশরের নবাব হন। ব্রিটিশদের ওপরও তিনি অনেক সময়ে আধিপত্য করেন। নাটকে একদিকে আছে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের কথা অন্যদিকে শক্তিশালী শাসকদের কথা। নাটকটি বিশ্ব কন্নড় সম্মেলন-এ প্রথম অভিনীত হয়ে বিশেষ সম্মান পায়। নাটক পরিচালনা করেন জয়রাম তৎচর।

'অন্তেমবর গণ্ড' (১৯৯৯) অর্থাৎ রাজার স্তুতিবাচক সম্বোধন, অর্থ—সমস্ত স্তুতি প্রাপকদের যিনি রাজা। মহীশূর রাজবংশের বিখ্যাত রাজা রণধীর কণ্ঠীরভ এই নাটকের প্রধান চরিত্র। ক্ষমতার লড়াই এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশা—এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া নাটক

গ্রাছে। রণধীর অদ্ভুত ভাবে ক্ষমতায় আসেন। তিনি প্রতিবেশী রাজ্য তিরুচিরপল্লীর এক কুস্তিগিরকে পরাজিত ও নিহত করলে ওখানকার রাজা রণধীরকে হত্যার জন্য একদল লোককে নিযুক্ত করেন। রণধীর মহীশূর রাজবংশের মানুষ হলেও রাজা নন। তাকে রক্ষা করার জন্য চক্রান্ত করে শাসনকারী রাজাকে সরিয়ে রণধীরকে রাজা করা হয়। কিন্তু রণধীর রাজা হয়ে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে মানুষদের ওপর প্রবল অত্যাচার শুরু করেন। সাধারণ মানুষের 'আদর্শ রাজা'র ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক শাসকদলও এভাবে ভিন্নরূপে ক্ষমতায় এলেও শাসন ও অত্যাচার বহাল রাখে। নাটকটি বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা করেছেন উমেশ এবং রমেশ।

'তস্কর' (১৯৯৯) নাটক তস্কর তন্ত্রের বা চৌর্যবৃত্তির বিষয়ে লেখা। প্রাচীন ভারতে তস্কর শাস্ত্রকে নিয়ে কথা আছে সেই চুরি বিদ্যা ও চোর ধরার বিষয় এখানে কথিত। নাটকে আধুনিক কালের বড় চোর রাজনীতিবিদদের কথা কৌতুক-ব্যঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। প্রসন্ন-র 'শাপ' (২০০০) নাটকও মহীশূর রাজবংশের কাহিনীর ওপর আধারিত। তখন মহীশূর ছিল বিজয়নগর রাজ্যের অধীন এক ক্ষুদ্র অঞ্চল। যখন বিজয়নগর রাজ্য বাহমনি সুলতানদের কাছে হেরে যায় রাজবংশের শেষ পুরুষ শ্রীরঙ্গরায় নিরাপত্তার জন্য শ্রীরঙ্গপট্টনে পালিয়ে যায়। তার পত্নী অলমেলম্মা স্বামীর সঙ্গে যায় বিজয়নগরের সমস্ত মূল্যবান রত্ন অলঙ্কার সঙ্গে নিয়ে। তখন রাজা ওডেয়র মহীশূরে ক্ষমতায় আসীন। সে রাজ্য বাড়ানোর লোভে বিজয়নগর রাজবংশের পতনের সুযোগ নিয়ে শ্রীরঙ্গরায়কে আক্রমণ করতে চায় ও শ্রীরঙ্গপট্টনকে দখল করতে চায়। তখন শ্রীরঙ্গরায় অসুস্থ হয়ে বৈদ্যের নির্দেশে তলকুড-র কাছে এক পুণ্যস্থানে যায়। তার স্ত্রীও সঙ্গে থাকে। রাজা ওডেয়র শ্রীরঙ্গপট্টন আক্রমণ ও অধিকার করে কিন্তু মূল্যবান রত্নাদির খোঁজ পায় না। অলমেলম্মা-র কাছে সেই রত্নসম্ভার আছে জেনে রাজা সৈন্য পাঠায়। ইতিমধ্যে রাজা মারা যায়। সৈন্যরা তার সম্পদ নেবার জন্য আসছে জেনে রানী অলমেলম্মা সমস্ত রত্ন অলঙ্কারসহ কাবেরী নদীতে মরতে যায়, তার আগে অভিশাপ দেয় যে তলকাডু মরুভূমি হয়ে যাবে, কাবেরীর সন্নিহিত গ্রাম মলঙ্গী ঘূর্ণিস্রোতে পরিণত হবে আর মহীশূর রাজাদের সন্তান হবে না। এই অভিশাপ ফলে যায়। নাটকটি লোকশিল্পরীতি 'বহুরূপী'র ঢঙে রচিত হয়। এটি পরিচালনা করেন বি. জয়শ্রী।

হুলি শেখর এই সময়ের এক বিশিষ্ট নাট্যকার যার রচনার মধ্যে জীবনের বহুবিচিত্র রূপ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর শিল্পের গভীর বোধ দিয়ে সমাজ সত্যকেও উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। সৃজনরূপের বিচারেও তাঁর নাটকগুলি সার্থক। হুলি শেখর রচিত বিশিষ্ট নাটক হল—'হাবু হরিদাডুতাব' (১৯৮৫, সাপগুলো বুকে হেঁটে চলছে), 'অরগিন বেট্টা' (১৯৮৭, জতু পাহাড়), 'বেকুবা' (১৯৮৯), 'গান্ধিনগর' (১৯৯৫), 'এরডু লাবণি এরডু নাটক' (১৯৯৫, দুটো ব্যালাড, দুটো নাটক)।

দেবানুর মহাদেব (১৯৪৯) কর্ণাটকের একজন সৎ ও সংবেদনশীল লেখক। তিনি মূলত কথাশিল্পী। দরিদ্র হরিজন পরিবারে তাঁর জন্ম। চারপাশের জীবন পরিবেশ ও সমাজ সম্বন্ধে তিক্ত ও তীব্র ধারণা লেখকের আছে। জাতিভেদ বর্ণভেদ সম্বন্ধে প্রবল অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন। দলিত জীবনের বেদনা যন্ত্রণা দাহ দেবানুবের রচনায় যথার্থ প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি একজন বিদ্রোহী লেখক—দলিত জীবনের প্রকৃত রূপকার। তাঁর উপন্যাস নাটক রূপে মঞ্চস্থ হয়েছে ও বিপুল সমাদর পেয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত ও বর্ণবিভজিত সমাজ ব্যবস্থায় তার রচনা এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ।

'ওডানলা' দলিত জীবনের নিপুণ ও নিখুঁত চিত্র ঃ দারিদ্র্য লাঞ্ছিত মানুষদের কথা আশ্চর্য দক্ষতায় বলা হয়েছে। বেঁচে থাকবার যন্ত্রণার সঙ্গে মিলেছে পুলিশের অত্যাচার। সাকব্বা এক গরীব ও বুড়ি। তাদের পরিবার বেশ বড়—ছেলেরা ও তাদের বৌ, স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে ও তাদের সবার সন্তান। অত্যন্ত দুঃখে কষ্টে তাদের জীবন চলে। সাকব্বা-র মুরগী হারিয়ে যায়, সে সব জায়গায় খোঁজে কিন্তু পায় না। খোঁজার বর্ণনাটিও ভারি চমৎকার—লোকের বাড়ীর বাইরে গিয়ে দেখে পালক পড়ে আছে কিনা কিংবা গন্ধ শোঁকে মাংস রান্না হচ্ছে কিনা। রাত্রিবেলায় সাকব্বার ছেলে কোথা থেকে একরাশ বাদাম আনে, রাত্রে সবাই তা পুড়িয়ে যায়। বাদাম-মালিক পুলিশের কাছে অভিযোগ করে। সকালে পুলিশ আসে, সন্দেহ করে কিন্তু প্রমাণ পায় না। সাকব্বার ছেলেকে পুলিশ বলে এবার তাকে ছেড়ে দিল প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে। কিন্তু আর ছাড়বে না। সাকব্বা পুলিশকে তার মুরগী চুরির কথা বলে এবং ঐরকম আর একটা মুরগী দেখায়। পুলিশ সেটা নিয়েও চলে যায়।

'কুসুমবালে' স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের এক অসামান্য উপন্যাস যেটিও নিপুণভাবে দলিত জীবনের ছবি তুলে ধরে। উপন্যাস হলেও এটি নাটকীয় হয়ে উঠেছে এবং অত্যন্ত সার্থকভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে। দলিত মানুষদের জীবনচিত্র এতে যেমন অঙ্কিত হয়েছে তাদের মুখের ভাষাও এতে যথাযথ এসেছে; উপভাষার দক্ষ প্রয়োগ এতে আছে। প্রখ্যাত পরিচালক সি বাসবলিঙ্গাইয়া নাটকটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন।

প্রখ্যাত নাট্যপরিচালক সি জি কৃষ্ণমূর্তি পরিচালনা করেছেন 'ওডানলা'। তাঁর পরিচালনায় নাটকটি আর ও প্রসিদ্ধি অর্জন করে। সমাজের সর্বাপেক্ষা নিম্নবর্ণের মানুষ এতে এসেছে এবং রূপায়ণেও সি জি কে সেই ব্রাত্য জীবন কথাকেই তুলে ধরেছেন আশ্চর্য নৈপুণ্যে। সমালোচক বলছেন, Odanala, about the class-caste clash, is a milestone in the history of theatre in Karnataka. It is a class in itself and has broken the culture of conventional theatre tradition.[২০]

সি জি কে-র 'বেলচি'-ও উন্নতমানের নাটক ও প্রযোজনা। বিহারের বেলচি গ্রামের মজুররা তাদের প্রাপ্য মজুরি চাইলে ১১ জন দলিতকে পুড়িয়ে মারা হয়, নাটকটি এই মর্মান্তিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা। নাটকের প্রযোজনায়ও সিজিকে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। 'বেলচি' প্রযোজনার আগে তিনি সমালোচক কি রাম নাগরাজের সঙ্গে বস্তি এলাকা ঘুরে দেখেন, ছেলেদের নির্বাচিত করেন ও তাদের ট্রেনিং দেন। তারাই নাটকে অংশ নেয়। নাটকটির দু হাজার অভিনয় নয়, কলকাতাতেও হয়েছে।

কন্নড় নাট্যক্ষেত্রে দুজন মহিলার নাম বিশেষ উল্লেখ্য। বি জয়শ্রী রচনাতে নিপুণ এবং নাটক পরিচালনায়ও সুদক্ষ। তাদের 'স্পন্দনা' শতাধিক নাটকের প্রযোজনা করেছে। 'করিমাই' (লৌকিক দেবী করি মা) শতাধিকবার প্রদর্শিত হয়েছে। 'অগ্নিপথ' পেয়েছে বিশেষ খ্যাতি। লোকরীতিতে প্রযোজিত 'চিত্রপট রামায়ণ' নতুন রীতির নাটক। চিন্দোড়ী লীলা-র 'পলিসনা মগালু' (পুলিশের মেয়ে) কয়েক সহস্র রাত্রি অভিনীত হয়ে গিনেস বুকে স্থান পেয়েছে। নাটকে এক সৎ পুলিশ অফিসারের কথা বলা হয়েছে যে অনেক কষ্ট পেয়েছে কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেনি এবং তার মেয়েও অসামাজিক মানুষদের বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই করেছে। এই নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

জীবননিষ্ঠ সমাজসচেতন শিল্পের বিচিত্র সাধক এইচ এস শিবপ্রকাশ (১৯৫৪) আধুনিক কন্নড় তথা ভারতীয় ভাষার এক বিশিষ্ট নাট্যকার। বেশ কয়েকটি নাটক তিনি লিখেছেন যার মধ্যে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি বিচ্ছুরিত। তিনি ঐতিহ্যনিষ্ঠ কন্নড় নাট্য-

সাহিত্যের ঋদ্ধ ঐশ্বর্য গ্রহণ করে তাকে আরো নতুন আরো বিকশিত করে তুলেছেন - জটিল দ্বন্দ্বসমাকীর্ণ জীবন ও সমাজের যথার্থ প্রতিরূপ হয়েছে তাঁর নাটক। উত্তর আধুনিক কবিতার প্রবক্তা শিবপ্রকাশের নাটকও আধুনিকোত্তর ভাবনায় নবীন শতাব্দীর আভ্যুদয়িক মন্ত্র উচ্চারণ করে।

শিবপ্রকাশের নাটকের মধ্যে অনেক ভাবনা অনেক রীতি মিশেছে - অতীত আদর্শের মধ্যে আধুনিক জীবনের জটিলতার উন্মোচন সেখানে পাওয়া যায়। প্রাচীন ইতিহাস, পৌরাণিক বক্তব্য, লোককথা ও লোকশিল্পের সংমিশ্রণে তাঁর নাটক ট্যাপেস্ট্রির মত বর্ণময়, বিচিত্র ভাবসমাকীর্ণ ও আশ্চর্য গ্রথিত হয়ে উঠেছে। তিনি মার্কসবাদে আস্থাশীল, সামজচেতনায় প্রখর; আবার তিনি একজন ধর্মভাবাপন্ন মিষ্টিক লেখক। এই জগতের অনিয়ম ও নীতিহীনতা তিনি এক মহৎ ভাবসূত্রে গ্রথিত করেছেন। শিবপ্রকাশ বলেছেন

I dont think I am a religious playright because I care very little for religion. The seemingly religious things I have written have a sociological dimension to it. For instance Manteswamy was a saint of the untouchables and so was Maadeswara.

শিবপ্রকাশ ঠিক প্রচলিত রীতির নাট্যকার নন। নিছক একটি জীবনকথার রূপায়ণে তিনি নিবিষ্ট নন অথবা একটি মানুষের হৃদয়কে উন্মোচনেই মাত্র তাঁর শিল্পকর্ম তিনি নিয়োজিত করেন নি। তিনি বহুব্যাপ্ত বহুপ্রসারিত। মহাজীবনের বিস্ময় তাতে প্রতিভাত হয়, তাই অবিরল রক্তপাত আর প্রাণবিনাশের পর মহাচৈত্রের সুগন্ধ পবনে তাঁর নাটকের ভুবন হিল্লোলিত হয়, রাজনৈতিক পরাজয় সত্ত্বেও আত্মিক জয় সুলতান টিপুর জীবনকে বৃহৎ ও মহৎ ইতিহাসের অঙ্গীভূত করে তোলে। নিছক আঙ্গিকের চাতুর্যে তিনি পাঠক দর্শকদের আবিষ্ট করেননি ঃ ঐতিহ্যনিষ্ঠ ও লোকায়ত সর্ববিধ শিল্পের সমন্বয়ে তাঁর নাটক কায়া পরিগ্রহ করেছে। ভারতীয় পুরাণের মহিমা, মরমীবাদের রহস্যময়তা, লোকশিল্পের প্রাণপ্রাচুর্য, শেকসপীয়রীয় কল্পনার বিপুল বিস্তার এবং ব্রেখটীয় এ-এফেক্ট ও তদনুযায়ী রূপপ্রয়োগ শিবপ্রকাশের নাটকে এনেছে বিস্তৃত আবেদন। শিবপ্রকাশের সব নাটকই তত্ত্বনাটক ও নির্যাতিত মানুষের সপক্ষে তা কথা বলে এবং সেই সব নাটকই শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। মিষ্টিসিজম থেকে মডার্নিজম, মিথ থেকে মার্কস, এলিয়েনেশন থেকে এক্সপ্রেশনিজম - সবের সমন্বয়ে শিবপ্রকাশের নাটক অবিকল্প অনন্য।

জীবনের পথ পরিক্রমায় শিবপ্রকাশ পেরিয়ে এসেছেন অনেক বাঁক, ভাবনার বৈচিত্র্য তাঁকে অনেক তত্ত্বদর্শনের মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছে যাদের মধ্য থেকে তিনি বেছে নিয়েছেন একটি আদর্শ — তা হল সত্যদর্শন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — সত্য যে কঠিন / কঠিনের ভালবাসিলাম, / সে কখনো করে না বঞ্চনা। এই সত্যের প্রকাশেই তাঁর নাটক দ্যুতিময়। সত্যের দীপশিখা হাতে তিনি পথ চলেছেন; দূর করেছেন অজ্ঞান কুসংস্কারের অন্ধকারকে, প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংঘাত হয়েছে তাঁর এবং সেই আদর্শেই তিনি স্থির থাকতে চেয়েছেন যা মানুষকে বিশেষত ব্রাত্যজনকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। সেই মানবিক আদর্শের সন্ধানেই তাঁর পথ চলা। প্রচলিত ধর্ম মতে যেন তিনি আস্থা হরিয়ে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হন, পরে বীরশৈবমতবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করে; এবং মার্কসীয় আদর্শে তাঁর আস্থা থেকে বৌদ্ধ ও বীরশৈবমতবাদকে পর্যালোচনা করেন। 'মার্কসবাদের স্পিরিচুয়াল তত্ত্ব'ও উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হন। গোঁড়ামী ও কুসংস্কারহীন অবৈদিক মতাবাদ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে — নাথ ও সিদ্ধযোগীদের আদর্শের প্রতিও তিনি আকর্ষণ অনুভব করেন, এবং সুফী মতাবাদেও তাঁর মন সমাচ্ছন্ন হয়। তিনি কন্নড় লোকসংস্কৃতির

গুরুত্ব প্রথম দিকে সম্যক উপলব্ধি করেন নি; But the reading of two great epics on the saints of untouchables Male Maheswar and Manteswamy came as an eye opener. The lives and deeds of these saints embodied the ideals I was groping for. They too were pitted against hostile forces which I am also struggling with শিবপ্রকাশের নাটকের অসম্পূর্ণতার কথাও সমলোচক বলেন। শিবপ্রকাশ মানবমনের গভীরে প্রবেশ করেননি, মানবহৃদয়ের অতলান্ত রহস্য ও বিস্ময় তাঁর অনধিগম্য। একক মানুষ নয়, যূথচারী সমাজবদ্ধ মানসিকতাই তাঁর নাটকে প্রাধান্য পায়। যার দ্বারা সমাজকে পালটে ফেলে শাসন শোষণমুক্ত নতুন সমাজব্যবস্থা গঠন করা যায় সেই যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শন তাঁর নেই। শিবপ্রকাশের মার্কসীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাও যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। বার্টল্ট ব্রেখট মনে করতেন যে থিয়েটারে হাসি নেই তা হাস্যকর — শিবপ্রকাশের নাটকে সেই সজীব হাস্যবস নেই। ছিদ্রান্বেষী সমালোচক এভাবেই শিবপ্রকাশের নাটকে আরো কিছু ক্রটি বিচ্যুতি খুঁজে পেতে পারেন। তবু শিবপ্রকাশ সৃজনশিল্পীরূপে অনন্য হয়েই থাকেবেন।

শিবপ্রকাশ সৃষ্টির বিচিত্র লীলায় মগ্ন। তিনি মৌলিক নাটক লিখেছেন. নাটক অনুবাদ করেছেন, সাহিত্য সমালোচক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন, কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। কর্ণাটক সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি এবং কেন্দ্র সঙ্গীত নাটক একাডেমীর সম্মান তিনি লাভ করেছেন। তবে নাট্যকার রূপেই তিনি সমধিক খ্যাতিমান। তাঁর সব কটি নাটকই অভিনীত হয়েছে ও জনসমাদর লাভ করেছে। এসময়ের কন্নড় ভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তাঁর নাটক রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নাট্যকারের নিজের মতামত আমরা উল্লেখ করতে পারি —

আমার কাছে থিয়েটার এমন এক সাংস্কৃতিক বিন্যাস যাতে নানা পরস্পরবিরোধী সামাজিক ক্রিয়াকান্ড জড়িয়ে আছে : আলাপনে গড়া যোগাযোগ, আবার বার্তা প্রেরণ. অতিকথা এবং ইতিহাস; আচারানুষ্ঠান এবং আমোদ; দর্শন এবং কৌতুকও। এই ঐশ্বর্যময় সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে ব্যবহার করে আমি বিভিন্ন দূর ও নিকট স্থান কালের আখ্যানিক, নাটকীয় ও কাব্যিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিজের সময় এবং মানুষের সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতায় পৌঁছতে চাই। আমরা কাছে থিয়েটার একই সঙ্গে জীবনের সমালোচনা, ক্ষণমুহূর্তকে ঘিরে উৎসব, অনন্তের দিকে সংকেত।

কবিতার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পর শিবপ্রকাশ নাটক রচনায় ব্রতী হন। তাঁর প্রথম নাটক 'মহাচৈত্র' (১৯৮৬) তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর কর্ণাটকের সমাজ-ধর্মীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় নাটকটি লেখা। নাটকের প্রধান চরিত্র বসবন্না ছিলেন কালচুর্যর রাজা বিজ্জলের দীর্ঘদিনের সঙ্গী ও রাজার ধনাগারের রাজকোষের ভান্ডারী বা চীফ একাউনট্যান্ট। বসবন্না কবি, সমাজ-সংস্কারক, প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী এবং মানবিকগুণ সম্পন্ন। তিনি একটি ধর্মের স্থাপনা করেন — শরণ ধর্ম বা বীরশৈবধর্ম বা লিঙ্গায়েৎ মতাদর্শ। শিবপ্রধান এই ধর্মে জাতি বর্ণ ও স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ ছিল না, উচ্চবর্ণের মানুষদের গৌরব বা স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি পায়নি; এই ধর্মে ছিল দলিতদের মর্যাদা ও অধিকার। এক প্রতিলোম বিবাহে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে অচ্ছুত ছেলের বিবাহে তিনি সম্মতি দেন। এই অভিযোগে বাসবন্নার বিরুদ্ধে দেশের ব্রাহ্মণ ধর্মনায়ক ও বণিকরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তাদের নির্দেশে রাজা বিজ্জল বসবসন্নাকে পদচ্যুত করেন এবং বসবন্নার অনুগামী শরণদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের লেলিয়ে দেন — রাজধানী কল্যাণ রক্তে ভেসে যায়। বসবন্না (স্বেচ্ছা)মৃত্যুকে বরণ করে নেন। শরণরা প্রতিবাদী হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়,

তাদের অধিকার প্রতিপন্ন করতে থাকে। রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরা চক্রান্ত করে বিজ্জলকে হত্যা করে। ভয়ংকর হত্যা ও রক্তপাতের পর অত্যাচারের অবসান হয়। শরণরা মনে করে রক্তের দিন পার হয়ে এসেছে মহাচৈত্র বা বসন্তকালে যখন পৃথিবী আবার হবে শ্যামল সুন্দর। নাটকের শেষ অংশ দৃশ্য ১৪-এপিলোগ উল্লেখিত হল যেখানে দুই শরণ বিদ্রোহী ধোপা মাচিদেব ও নাপিত আপ্পান্না এবং তিন অভিনেতা (যারা নাটকের মধ্যে নাটক করেছে) চৌডাইয়া, কালকেতাইয়া ও মারিদন্ডে মঞ্চে আসে—

(চৈত্রের সকাল। নেপথ্যে গান শোনা যায়)

গান — দূরে চলে গেছে কঠিন মাঘের শীত

এসেছে চৈত্র সেই পথ দিয়ে আজি

পূর্ণ কণ্ঠে কোকিল কুহরে তান

কাল মধুমাস সুন্দরে ওঠে সাজি।

(মাচিদেব, আপ্পান্না ও অভিনেতারা প্রবেশ করে)

মারিদন্ডে — মাচিদেব, আমরা জলপ্রপাতের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তুমি যেমন চেয়েছিলে। আমরা এখানে কোথাও ডেরা বাঁধব, আর একই নাটক অভিনয় করব।

এবার আমাদের ছুটি দাও।

(অভিনেতারা অভিবাদন করে ও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়)

আপ্পানা — আমরা আবার মিলব কবে?

মারিদন্ডে — আর এক যুগে।

কালকেতাইয়া — আর এক স্থানে।

চৌডাইয়া — আর এক রূপে।

তিনজন — শিল্পীর দল আমরা সবাই

সব হল শেষ ফিরে চল যাই।

(সবাই নাচতে নাচতে বেরিয়ে যায়)

মচাইয়া — আপ্পান্না দেখ ঐ জলপ্রপাতকে। এত জলে সব আগুন নিভে যাবে।

আপ্পান্না — এর ধারে গাছগুলো কি সবুজ আর সতেজ। এই অপরূপ বসন্ত এই মহাচৈত্রের বৃক্ষলতা ও কচিপাতা কি সুন্দর। এত সবুজ যে আমাদের সব রক্ত মুছিয়ে দেবে।

দুজনে — এখানে আমরা স্নান করব, ধুয়ে ফেলব হাতের রক্ত, আর নিভিয়ে দেবো বুকের আগুন। তারপর ফিরে যাব মহাপ্রাসাদে - এই পৃথিবীর মহৎ আবাসে।

(সবাই বেরিয়ে যায়। গান চলতে থাকে)।

এই নাটকটি নিষিদ্ধ করা হলেও মানুষের দাবিতে তার বন্ধনমোচন ঘটেছিল। শিবপ্রকাশের নাটকের বৈশিষ্ট্যসমূহ 'মহাচৈত্র'তে পাওয়া যায়। বাসবন্নার মানবতাবাদী জীবনাদর্শ, সাধারণ মানুষের ওপর রাজা ব্রাহ্মণ ও বণিকদের বর্বর অত্যাচার, দলিত ও ব্রাত্য মানুষদের জাগরণ ও তাদের অধিকারে অর্জনের প্রয়াস ইত্যাদি নাটকের ভাব নির্মাণ করেছে। প্রকাশভঙ্গীতেও আছে অভিনবত্ব। ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে মিথ (Myth) ও রিচুয়ালের (ritual) মধ্য দিয়ে যা হয়েছে সিম্বলিক ও মিস্টিক। নাটকের মধ্যে নাটক আনে নতুন মাত্রা। কবিতা ও সঙ্গীতের সুন্দর প্রয়োগ আছে।

নাটকের প্রধান চরিত্র বাসবন্না একবারও মঞ্চে আসেননি, অথচ তিনিই নাটকে পরিব্যাপ্ত। বাসবন্নাকে নিয়ে কন্নড় ভাষায় আরো নাটক লেখা হয়েছে। কিন্তু তাদের থেকে

এই নাটক স্বতন্ত্র। এখানে দলিত ব্রাত্য মানুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে ও তাদের অধিকার প্রতিপন্ন করা হয়েছে। নাটকের শিল্পরূপও উন্নতমানের। নাটক আরো উল্লেখ্য এই কারণে যে আধুনিক লেখকরা যখন মিথকে রিয়েল করার চেষ্টা করছেন, তখন শিবপ্রকাশ করেছেন তার বিপরীত —

What I wanted to actually show was how historical character became a myth, an archetype in his own lifetime.

'মহাচৈত্র' গ্রন্থের অন্তত ছয়টি সংস্করণ হয়েছে। এই নাটককে সরকার থেকে নিষিদ্ধ করাও হয়েছিল। অজস্র অভিনীত হয়েছে এই নাটক। প্রথম অভিনয় করে বাঙ্গালোরের রঙ্গসম্পদ সংস্থা সি. জি. কৃষ্ণস্বামীর পরিচালনায়। বি ই এম এল কলাসঙ্ঘ একে উপস্থাপিত করে, পরিচালক মল্লিকার্জুন। সমুদয়ও এই নাটক মঞ্চস্থ করে ইকবাল আহমেদের পরিচালনায়। এছাড়া অন্যান্য স্থানেও 'মহাচৈত্র'র সফল অভিনয় হয়েছে।

'সুলতান টিপপু' (১৯৮৮) ঐতিহাসিক নাটক। টিপুর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও মৃত্যুবরণ নাটকের বিষয়। বাইরে শত্রু ও ঘরে বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা টিপু পীড়িত হন। তাঁর ক্রমিক পতন টিপুকে নিয়ে যায় সুফী পরিণতি শহদত বা শহিদত্বের দিকে। টিপুর শেষ সংগ্রামের ইতিহাস মিশে যায় কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের আধ্যাত্মিক সংগ্রামে শহীদত্ব বরণের সঙ্গে। নাটকটি দুই বৈপরীত্যকে মেলাতে চেয়েছে — আত্মিক জয় ও রাজনৈতিক পরাজয়। নাট্যকার টিপু সুলতান -এ ইতিহাসের নায়কের মধ্যে মরমীয়াবাদের প্রকাশ দেখেছেন — Apart from Tippu's valour, secular nature and democratic leaning, I saw in him a strong element of Sufi mysticism. He was named after a Sufi saint. Muslim saw him as a great saint and called him Tippuwali. নাটকে লেখক ইতিহাসের সঙ্গে মিথকে মিশিয়ে নির্মাণ করতে চেয়েছেন my own mode of aesthetic perception. (দ্রষ্টব্য S. Prasad এর The Mythical element in Plays প্রবন্ধ)। 'সুলতান টিপু' নাটকটিও বহুল অভিনয়ের সম্মান লাভ করেছে। এর মঞ্চায়ন করে বাঙ্গালোরে রঙ্গসম্পদ, পরিচালক সি জি কৃষ্ণস্বামী; মাঙ্গালোরের অভিনয় তরঙ্গ, পরিচালক দীনেশ; কর্ণাটকের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পরিচালক নাগেশ; বাঙ্গালোরের জে এস এস কলেজ, পরিচালক কৃষ্ণমূর্তি কাভাতর ও অনেক সংস্থা।

ইংরেজী সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক এইচ এস শিবপ্রকাশ শেকসপীয়রের কিং লীয়র অনুবাদ করেছেন যে গ্রন্থটিও কর্ণাটক সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। 'শেকসপীয়র স্বপ্ন নৌকে' (শেকসপীয়রের স্বপ্ন নৌকা, রচনা ১৯৮৯, গ্রন্থপ্রকাশ ১৯৯১) নাটকে নাট্যকারের জীবনের সঙ্গে মিশেছে তদানীন্তন যুগ ও পরিবেশ। শেকসপীয়র, বেন জনসন ও মাইকেল ড্রেটন বসে আছো স্ট্রাটফোর্ডের এক ট্যাভার্নে শেকসপীয়রের জীবনের শেষ সন্ধ্যায়। তাঁরা কথা বলছেন তাদের জীবনের সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে যাতে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ ঈর্ষা ইত্যাদি ধরা পড়ে। নাটকে প্রাধান্য পায় শেকসপীয়রের জীবনকথা — কি করে সামান্য একজন মানুষ অত্যন্ত জনপ্রিয় ও কৃতি নাট্যকার রূপে পরিগণিত হলেন। এর সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উত্থান ও বিস্তার, দেশে বিদেশে কলোনীর উপস্থাপনা এবং এলিজাবেথীয় যুগের নির্মমতা ও অত্যাচার একই রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। এই ইতিহাসের বিভিন্ন দৃশ্য নাটকে রূপায়িত হয়েছে যার প্রতিরূপ দেখা দেছে শেকসপীয়রের জীবন ও সাধনায়। নাটকের সমাপ্তি শেকসপীয়রের যন্ত্রণাময় মৃত্যু

দিয়ে তা যেন ব্যঞ্জিত করে কলোনীসমূহের মুক্তি। শিবপ্রকাশের শিল্পভাবনা নতুন মাত্রা পেয়েছে এই নাটকে যেখানে জীবন ও ইতিহাস এক হয়ে গেছে যাতে মানবচরিত্রের বিচিত্র দ্বন্দ্বসমাকীর্ণ চিত্রণের সঙ্গে ইতিহাসের জটিল সংঘাতময় তীব্রতাও সার্থক অঙ্কিত। নাটকটির সফল প্রযোজনা করে রঙ্গনিরন্তর, পরিচালক ছিলেন সি জি কৃষ্ণস্বামী।

শেকসপীয়রের ম্যাকবেথের নবরূপায়ণ 'মারনায়কন দৃষ্টান্ত' (১৯৯১) শিবপ্রকাশের দুঃসাহসিক শিল্পভাবনা তুলে ধরে। জৈন নীতিকথার ভাবনায় সজ্জিত এই নাটকের প্রেক্ষাপট মধ্যযুগের কর্ণাটকের এক ট্রাইবাল রাজ্য যেখানে মারনায়ক লোভের বশবর্তী হয়, রক্তদেবতা কাটেরি-দের নির্দেশে রাজাকে হত্যা করে রাজা হয়। তার জন্য মারনায়কের নবজাতককে রাজার ছেলে মেরে ফেলে। আবার রাজার ছেলেকে মারনায়কের স্ত্রী হত্যা করে ও রাজ্যকে ঘিরে থাকা গভীর অরণ্যে নিজেকেও হত্যা করে। মৃত রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র অরণ্যে বাস করে। সে একজন জৈন সিদ্ধ। মারনায়ক তাকে প্রতিকারের পথ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে চারপাশের অরণ্য থেকে মুক্ত হলে মারনায়ক রক্ষা পাবে। তার নির্দেশকে ভুল বুঝে মারনায়ক ধ্বংস কর অরণ্যকে ও তার উৎস জননী ধরিত্রীকে। প্রকৃতির রক্ষাকারী দেবী ধ্বংসকারী মারণায়ককে হত্যা করে রক্ষা করে প্রকৃতিকে। নতুন রীতির এই নাটকটি আশ্চর্যভাবে সমাদৃত হয়েছে ও অজস্রবার সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। একে মঞ্চস্থ করেছে সমুদয় (পরিচালক রমেশ); উদয়কলাবিদারু (পরিচালক—গুরু রাও বাপট); কলেজ টীচার্স ওয়ার্কশপ (পরিচালক — শশীধর বরিঘাট); অভিনয় তরঙ্গ ম্যাঙ্গালোর (পরিচলক কৃষ্ণমূর্তি কাভাতর) ইত্যাদি সংস্থা; শহরের জেলবন্দীদের জন্যও মঞ্চস্থ হয় (পরিচালক—হল কট্টি)। মৈনা চন্দ্রও নাটকটি পরিচালনা করেছেন।

নো নাটক Damask Drum ওপর ভিত্তি করে শিবপ্রকাশ লিখেছেন 'মাকারা চন্দ্র' (মকরে চন্দ্র, যা কারুর পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক)। মূল নাটকে ছিল এক মালী রাজকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়। কিন্তু রাজকন্যার অদ্ভুত শর্ত পূরণ করতে না পেরে জলে নিমজ্জিত হয়ে সে প্রাণ দেয়। এই নাটকেও একজন অতি সামান্য ব্যক্তি এক চলচ্চিত্র নায়িকাকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার শর্ত মানতে ব্যর্থ হলে আত্মহত্যা করে। নাটকটিতে জীবনের অসহায়তার চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। কৃষ্ণমূর্তি কাভাতর-এর পরিচালনায় প্রয়োগরঙ্গ এটি মঞ্চস্থ করে।

হাস্যরসের দিকে জোর না দিলেও শিবপ্রকাশ রসিক সুজন। কৌতুকনাট্যরচনায় তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে 'মল্লম্মন মানে হোটেল' (মল্লম্মর বাড়ী হোটেল, ১৯৯০) নাটকে যা লরকার The Shoemakers Prodigious Wife নাটকের স্বচ্ছন্দ নবরূপায়ণ। লরকার 'violent force' এক কৌতুক মজা ও কিছুটা তিক্ততাকে যথাযথ রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন ভারতীয় নাট্যকার। মল্লম্মার অত্যাচারে তার বৃদ্ধ স্বামী ঘর ছাড়লে সে ঘরকে হোটেল করে। চলে যাওয়া স্বামীকে সে রোমান্টিক করে তোলে। কিছু পরে তার স্বামী পুতুল নাচের শিল্পীর ছদ্মবেশে ফিরে এলে মল্লম্মা তাকে প্রথমে চিনতে না পারলেও পরে চিনে আগের মতই দুর্ব্যবহার করে। নাটককে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছে প্রয়োগরঙ্গ (পরিচালনা-বি সুরেশ); সৃষ্টি (পরিচালনা-সুরেশ অনগল্লি; এবং কোডাভা রূপান্তরে পরিচালক কারিয়াপ্পা); দিল্লী কন্নড় মণ্ডল ইত্যাদি সংস্থা।

'মন্টেস্বামী কথা প্রসঙ্গ' (১৯৯১) দক্ষিণ কর্ণাটকের দলিত জীবনের মহাকাব্য 'মন্টেস্বামী কাব্য'র ওপর আধারিত লোকরীতির নাটক। মন্টেস্বামী এক অদ্ভুত সাধক যিনি

অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করেছিলেন। সেকুলার ও রিলিজিয়ন দুধরনের শক্তির বিরুদ্ধেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ ছিল তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য। নাট্যকার দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা কেবল স্থবির ও নিশ্চল ছিল না, তা সেসময়ের শক্তিমত্ততার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই নাটকের আড়াই শতরও বেশী অভিনয় হয়েছে। পরিচালনায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সুরেশ আনগল্লি।

'মাদারী মাদয়্যা' (যাদুকর মাদয়্যা) নাটকের উৎস আঞ্চলিক ভাষার লেখা দক্ষিণ কর্ণাটকের মহাকাব্য 'মাদেশ্বর পুরাণ'। এটি লোকরীতির শিল্প, লোকজীবনের কাব্য যাতে দেখানো হয়েছে দলিত ব্রাত্যদের প্রয়াসে অত্যাচারীর পতন। অত্যাচারী জন সব কিছু জয় করে নিয়েছে — রাজা থেকে দেবতা সবাইকেই এবং শেষ পর্যন্ত ধরিত্রী জননীকেও অধিকার করতে চেয়েছে। ব্রাত্য সন্ন্যাসী তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এক অদ্ভুত দম্পতির চামড়া দিয়ে তৈরি পাদুকা সেই অত্যাচারীকে দিলে তার বিনাশ হয়। নাটকটি বাসবলিঙ্গাইয়াব পরিচালনায় বিজয়ওয়াড়া আঞ্চলিক উৎসবে অভিনীত হয়।

'মধুর কান্দ' (মিষ্টি ছেলে) নির্মিত হয়েছে তামিল মহাকাব্য 'শিল্পপ্পদিকরম' এব প্রেরণায় যেটি লিখেছেন ইলাঙ্গ আডিগল। ধনী বণিক কোভালন-এর সাধ্বী স্ত্রী কান্নাগির সংকট নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটক। তার অমিতাচারী জীবনযাপনের জন্য কোভালন দেউলিয়া হয়ে স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায় মদুরেতে নতুন জীবনের সন্ধানে। তারা পাথর খোদাইকারীদের অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। একদিন কোভালন তার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করতে বাজারে গেলে লোভী বণিকের চক্রান্তে মৃত্যু ফাঁদে পড়ে। মূল কাহিনীতে আছে কান্নাগি শহরকে ধ্বংস করে নারীত্বের তেজে ও সে নিজে সতী হয়। নাটকে কান্নাগি রাজার মুখোমুখী দাঁড়ায় ও যখন সে সতী হতে যায় একটি অসহায় মাতাপিতৃহীন বালকের আকর্ষণে সে ফিরে আসে জীবনে। নাটকটি উপস্থাপিত হয়েছে সমুদয় এর উদ্যোগে সুরেশ অনগল্লির পরিচালনায় ১৯৯৩ সালে।

শিবপ্রকাশের নাট্যপ্রয়াস ক্ষান্তিহীন। নতুন ভাব ও রীতির কত নাটক তিনি লিখছেন যেগুলো আমাদের সাহিত্যের সম্পদ। 'মনেয়োলগিন বেঙ্কি' (ঘরের মধ্যে আগুন) বাবরি মসজিদ ভাঙার অব্যবহিত পরে লেখা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রাজনৈতিক নাটক। একজন প্রবীণ গান্ধীবাদী স্কুল শিক্ষক দাঙ্গাপীড়িত একটি মুসলিম পরিবারকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু তার বিপথগামী পুত্র উগ্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ও বিভিন্ন প্ররোচনায় নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। লেখকের উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নাটকে সুন্দর ধরা পড়েছে।

'সতী' ও 'ক্যাসান্ড্রা' গ্রীকরীতির দুটি নাটক। যদিও ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নাটক দুটি স্থাপিত। সতী তার পিতা দক্ষের গৃহে যজ্ঞে আসে শিবের আপত্তি সত্ত্বেও। পিতা কর্তৃক অপমানিত হয়ে সতী যজ্ঞের আগুনে প্রাণ-ত্যাগ করে। ক্রুদ্ধ শিব যজ্ঞশালা ধ্বংস করে। এই প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে লেখক সুর ও অসুরের দ্বন্দ্বকে প্রত্যক্ষ করলেন। 'ক্যাসান্ড্রা' নাটকে ক্যাসান্ড্রা জানে তার ভবিষ্যৎ কথা যে সে মারা যাবে যখন সে আগামেমননের পত্নী ক্লাইটেমনেস্ট্রার আহ্বানে আসে। ক্যাসান্ড্রার ট্রাজেডি তাকে পিতার যুদ্ধোন্মত্ত পরিবেশ থেকে নিয়ে আসে স্বামী বা বিজয়ীর প্রাসাদে। এই মৃত্যু যেন স্বামীগৃহ থেকে পিতার মৃত্যুগহে সতীর ফিরে আমার পরিপূরক।

কন্নড় ভাষায় নাটকের যে গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে তার উজ্জ্বল উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন এইচ এস শিবপ্রকাশ। আধুনিককালে অনেক শক্তিশালী নাট্যকার আবির্ভূত

হয়েছেন কন্নড় ভাষায় যাদের মধ্যে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব আদ্য রঙ্গাচার্য, চন্দ্রশেখর কম্বর, গিরিশ কারনাড, চন্দ্রশেখর পাটিল, প্রসন্ন, টি এন সীতারাম, লিঙ্গদেবরু হলেমনে, বি ভি বেকুণ্ঠরাজু, প্রকাশ কম্বতল্লি ও অন্যান্য স্রষ্টাদের নাম। সাম্প্রতিকালে শিবপ্রকাশ ও অন্যান্য নাট্যকাররা কন্নড় নাটককে নতুন পথে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হয়েছেন। বিবিধ ভাবনা ও আদর্শের সংমিশ্রণ, আঙ্গিকের বহুবিচিত্র প্রকাশ, তীব্র সমাজ সচেতনতা ও বলিষ্ঠ জীবনজিজ্ঞসা এবং সর্বোপরি প্রবল মানবিক প্রত্যয় তাঁদের এসময়ের অনন্য নাট্যনির্মাতা করে তুলেছে এবং আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃজনশিল্পীর মর্যাদা লাভ করেছেন। নবীন শক্তিশালী কন্নড় নাট্যস্রষ্টাদের সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ প্রসারিত মার্গ যে পথে তাঁরা চলবেন অনেকদিন, দূরে অনেক দূরে শতাব্দী পেরিয়ে নতুন আলোতীর্থে উত্তীর্ণ হবেন। কালোহ্যয়ং নিরবধি এই প্রাচী ভূখণ্ডে তাঁরা স্বমহিমায় দীপ্ত থাকুন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

৫. বাংলা ও কন্নড় নাটক : পারস্পরিক সম্পর্ক

(১) সূচনা

কন্নড় ভাষা ও সাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্য আছে। নিজস্ব রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কন্নড় সংস্কৃতি সমুজ্জ্বল। বাংলার সঙ্গে তার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে রেনেসাঁসের আলোকধারায় উদ্ভাসিত বাংলা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল কর্ণাটককে। K.V. Puttappa বলেছেন — In fact so great was the spiritual and literary influence that Bengal exerted on Karnataka that we feel closer to Bengal despite the presence of many other provinces in between. ইংরেজী এবং য়ুরোপীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার যোগ ছিল গভীর এবং কর্ণাটকের মানুষ বাংলার বাতায়ন দিয়েই অনেকটা দূরের জগৎকে দেখেছিল। বাংলা উপন্যাস নাটক ইত্যাদি বহুল পরিমানে কন্নড়তে অনূদিত হয়। এই দেওয়া-নেওয়ার পালা আজও চলছে বিশেষত নাটকের ক্ষেত্রে। তাই বাংলা নাটক যেমন কর্ণাটকে সমাদৃত তেমনি আধুনিক কন্নড় ভাষার বিশিষ্ট নাট্যকাররাও বাংলায় আন্তরিক ভাবেই সমাদৃত হচ্ছেন। চন্দ্রশেখর কম্বর গিরিশ করনাড এর মত প্রবীণ অন্যান্য ও বহুমান্য নাট্যকাররা বাংলায় যেমন নিশ্চিত স্থান করে নিয়েছেন, তেমনি এইচ এস শিবপ্রকাশের মত অপেক্ষাকৃত কমবয়সী নাট্যকাররাও বাংলার নাট্যমঞ্চে গৌরবের সঙ্গে বিরাজ করছেন।

(২) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও কন্নড় নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ণাটকে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকটি নাটক কন্নড় ভাষায় অনূদিত হয়। নাট্যকারের পুত্র দিলীপ কুমার রায়ও এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কোন কোন নাটকের একধিক সংস্করণও হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক প্রথম অনুবাদ হয় ১৯১৪ সালে, 'দুর্গাদাস' অনুবাদ করেন আর ব্যাসরায়। ডি কে ভরদ্বাজ অনূদিত 'ভীষ্ম' ধারাবাহিক ভাবে বেরোয় 'জয়কর্ণাটক' পত্রিকায় ১৯২২ সালে। 'মেবার পতন' নাটকের অনুবাদক গোবিন্দ লক্ষণ হল্লেপ্পা শান্তিনিকেতনে ছিলেন এবং বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে তার গভীর সংযোগ ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনূদিত নাটকসমূহের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

ভীষ্ম	দত্তাত্রেয় কৃষ্ণ ভরদ্বাজ	১৯২২
বিরহ (নগেগেড়ু)		
চন্দ্রগুপ্ত	রঙ্গরায় হীরেকেরুর	১৯৩২
চন্দ্রগুপ্ত (প্রচন্ড চাণক্য)	বি পুট্টস্বামাইয়া	১৯৫৪
দুর্গাদাস	আর ব্যাসরায়	১৯১৪
দুর্গাদাস	পি এস রামাপ্পা	১৯৫৪
পাষাণী (অভিনব রূপায়ণ)	বি পুট্টস্বামাইয়া	১৯৮০
মেবার পতন	গোবিন্দ লক্ষণ হল্লেপ্পা	১৯৪৯
মোহিনী	মাইসোর নরসিংহ রাও	১৯৩৬
শাহজাহান	বি পুট্টস্বামাইয়া	১৯২৬
সীতাদেবী	দত্তাত্রেয় কৃষ্ণ ভরদ্বাজ	১৯২২

দ্বিজেন্দ্রলালের বেশ কটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য হল 'ভীষ্ম' নাটকের অভিনয়। সদাশিবরাও গরুড় ছিলেন একজন বড় অভিনেতা এবং তাঁদের নাট্যদলও ছিল। তাঁবা 'ভীষ্ম' নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। প্রখ্যাত অভিনেতা এম পীর অভিনয় করেন 'শাহজাহান' নাটকে। এছাড়া তাঁর অন্যান্য নাটকও মঞ্চস্থ হয়।

কন্নড় নাট্যসাহিত্যের ওপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আছে। তাঁর প্রবন্ধ অনুবাদ করেন গোপালকৃষ্ণ শাস্ত্রী ১৯৫৩ সালে। 'কালিদাস মত্তু ভবভূতি' (কালিদাস ও ভবভূতি)। বি পুট্ট- স্বামাইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' নাটকের অভিনব রূপায়ণ করেন 'নেলেয়গু, শিলেয়গু, কলেয়গু দেবী' নামে নতুন নাটকে। রামায়ণে অহল্যা কাহিনীর অনেক ব্যাখ্যা আছে। পুট্টস্বামী তার শিল্প সৃজনের ভাবনাকে এর মধ্যে অন্তর্নির্হিত দেখেছেন — Stone is the base of existence and it has to be remodelled to be made into an artefact.[21]

এম এন চৌডাপ্পা 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক লিখেছেন যেটা প্রাচীন 'মুদ্রা মঞ্জুষা' গ্রন্থের উপাদান নিয়ে লেখা। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের কথা এটি মনে করায়; গ্রন্থের ভূমিকায় এ এন কৃষ্ণরাও বলেছেন যে কৌতুহলী পাঠক দুটো নাটককে মিলিয়ে পড়লে খুশি হবেন। এছাড়া 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের গল্প ও নাটক নিয়ে লেখা হয়েছে ছোট বই 'মৌর্যজাতি'। চন্দ্রগুপ্তর নামে উপন্যাসও রচিত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে বি পুট্টস্বামাইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' কে অভিনব রূপ দান করেছেন। তিনি মনে করেন যে — পাথর হল অস্তিত্বের ভিত্তি এবং তাকে রূপান্তরিত করতে হবে শিল্পকর্মে।[২৩]

(৩) রবীন্দ্রনাথ ও কন্নড় নাটক

অ. ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ও কর্ণাটক নিকট সম্পর্কে অন্বিত। তাঁর অনুপম সৃজনশক্তি, অসামান্য শিল্পব্যক্তিত্ব, ভারতের মহিমাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার সাধনা রবীন্দ্রনাথকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। জাতীয়তাবোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার একটা বিশ্বজনীন বোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল যা কন্নড় শিল্পী সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অনেক কন্নড়ভাষী শান্তিনিকেতনে পড়তে যান ও সেই আদর্শে তাঁরা গড়ে ওঠেন। শান্তিনিকেতনের রীতিতে তাঁরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তাঁদের

দেশে। এম এন কামাথ, পন্ডিত তারানাথ প্রমুখের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিজয়ী কন্নড় লেখক ডঃ শিবরাম করন্ত পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও আছে রবীন্দ্র প্রভাব। কর্ণাটকের উপকূলবর্তী শহর কারাভর রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল। এখানকার জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকটি লেখার পটভূমি পাওয়া যাবে এখানকার বর্ণনায়।[২৩] তরুণ লেখকরা রবীন্দ্রসাহিত্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। নাটকে এই অনুপ্রাণনা ছিল প্রবল। এম এন কামাথ ১৯২৪ সালে অনুবাদ করেন 'ডাকঘর'। এই সালেই জি আর কুলকার্ণী অনুবাদ করেন 'মুক্তধারা'। অতঃপর রবীন্দ্রনাটক কন্নড় ভাষায় নিয়মিত অনূদিত হতে থাকে যে ধারা আজও বহমান। রবীন্দ্রপ্রভাবে নাটকও রচিত হতে থাকে। রবীন্দ্রভাবনা প্রভাবিত প্রথম কন্নড় নাটক 'তপস্বিনী', লেখিকা হলেন শ্রীমতী ভারতী (তিরুমলে রাজাম্মা)।

আ. রবীন্দ্রনাটকের কন্নড় অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই কন্নড় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। নাটকগুলি মূলত বাংলা থেকেই রূপান্তরিত হয়েছে। একটি নাটকের একাধিক রূপান্তরও ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক যা সম্প্রতিকালে কন্নড় ভাষায় মঞ্চস্থ হয় তার কিছু নতুন শিল্পীরা অনুবাদ করে নিচ্ছেন অথবা তাদের প্রয়োজনমত পরিবর্তন সাধন করছেন। কন্নড় ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাটকের একটি তালিকা দেওয়া হল।

অচলায়তন	নারায়ণ সঙ্গম	১৯৬২
বসন্ত	হোঙ্গসালা	১৯৪৬
বিসর্জন		
ক) (বিসর্জন ত্রম্ব	হলসঙ্গী চেন্নামল্লাপ্পা	
প্রাণীধর্ম বোধক নাটক)	বা মধুরচেন্না	১৯২৭
খ) বলিদান	অহোবলা শংকর	১৯৫৭
চন্ডালিকা	এন বিশ্বনাথ	১৯৫৮
চিরকুমার সভা	বি পুট্টস্বামাইয়া	১৯৫৬
চিত্রাঙ্গদা	ক) মস্তি ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার	১৯৪৫
	খ) কে বি হনুমন্তরাইয়া	১৯৫১
	গ) কে ভি পুট্টাপ্পা	
	ঘ) কে এম সেট্টি	১৯৬১
	ঙ) ইউ কে সুব্বারায়াচার	
ডাকঘর	ক) এম এন কামাথ	১৯২৪
	খ) 'অঞ্চে মনে' — আর গণেশ শর্মা	১৯৫৬
	গ) 'অঞ্চে য়া মনে' — অহোবলা শংকর	১৯৬১
হাস্যকৌতুক	এম কে ভরতিরমনাচার্য	১৯৬১
লক্ষ্মীর পরীক্ষা	লক্ষীয়া পরীক্ষে ঃ শঙ্করানন্দ	
মালিনী	পশুপতি রেড্ডী	
মুক্তধারা	ক) জি আর কুলকার্ণী	১৯২৪
	খ) বন্ধবিমোচন — কে এল সুব্বারাও	১৯২৭
নটীর পূজা	নর্তকীয় পূজে—পঙ্কজ শ্রীনাথ ও অহোবল	১৯৬৬

রক্তকরবী	রক্তকরবীরা — অহোবল শঙ্কর	১৯৫৯
রাজা	স্বামী শঙ্করানন্দ সরস্বতী	১৯৬১
রাজা ও রাণী	ক) পি ভেঙ্কটচারিয়া (অত্তে মাসী, রাজা ও রাণী, শুভা) খ) অহোবল শঙ্কর	
শোধবোধ	(ঋণমুক্তি) এস সত্যদেব	১৯৬০
এরাড়ু সাংকেতিক নাটকগলু	স্বামী শঙ্করানন্দ সরস্বতী	১৯৬১

ই. কন্নড় নাটকে রবীন্দ্রপ্রভাব

কন্নড় নাটককেও রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত করেছেন। কবিতার ওপর তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা বিশেষভাবে থাকলেও নাট্যকাররাও তাঁর দ্বাবা প্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের বিশেষত 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির চরিত্র নতুন ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রীমতী ভারতী (তিরুমলে রাজাম্মা) ১৯৩০ সালে লেখেন একটি ছোট কাব্য নাটক 'তপস্বিনী'। কে ভি পুট্টাপ্পা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' অনুসরণে লেখেন স্বতন্ত্র নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'। পুট্টাপ্পার বিভিন্ন কাব্যনাট্যের ওপরও রবীন্দ্রপ্রভাব আছে। মধুর চেন্না 'ডাকঘর' অনুবাদ করেন; কবিতা রচনায়ও তিনি রবীন্দ্র প্রভাবিত। মস্তি ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গাব-এর 'চিত্রাঙ্গদা' কবিত্বপূর্ণ গদ্যে লেখা। ডি আর বেন্দ্রে রবীন্দ্রকবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁব কিছু ছোট নাটকও যেন রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে মনে করায। কন্নড় নাটকের মধ্যেও ববীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে ঢুকে পড়েছেন। বি পুট্টস্বামাইয়া রচিত 'অভিনেত্রী' (১৯৪৮) নাটকের নায়িকা সীতাদেবী ভাগ্যবিপর্যয়ে কলকাতায় আসে ও এক বাঙালী পরিবাবে আশ্রয় নেয়। সে তাদের কর্ণাটকী গান শোনায় এবং নিজে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে। নাট্যকার এতদূর যান যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সীতাদেবীর গান শোনেন ও অত্যন্ত মুগ্ধ হন। দক্ষিণের রবীন্দ্রনুরাগী বিশিষ্ট শিল্পী সাবিত্রী কৃষ্ণণ প্রমুখের কথা মনে রেখেই সম্ভবত নাট্যকার এই চরিত্রর কথা লিখেছেন।

ঈ. কন্নড় ভাষায় রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটক কন্নড় ভাষায় মঞ্চস্থ হয়েছে। বিশিষ্ট ও খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থা এই সব নাটকের মঞ্চায়ণ করেছেন। তাদের কয়েকটি প্রযোজনা কথা উল্লেখ করা হল। রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষে 'পাঁচটি রবীন্দ্রনাটক প্রযোজিত হয়। কন্নড় থিয়েটারস মঞ্চস্থ করেন 'চিরকুমার সভা' যে নাটকের মঞ্চবিন্যাস বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়েছিল। ললিত কলা নিকেতন মঞ্চস্থ করে 'বলিদান' (বিসর্জন)। অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান আর গিরিয়ান (জয়সিংহ), বি রাম রাও (রঘুপতি) ও কুমারী হেমলতা (অপর্ণা)। 'মালিনী' প্রযোজনা করে মাইসোর স্টেট সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অফ আর্টস এন্ড আর্টিস্টস এবং 'রাজা ও রানী' করে মাইসোর গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিযেট ক্লাব। শেষ দুটি প্রযোজনাও খুব খারাপ হয়নি। সাধনা আর্টিষ্টস মঞ্চস্থ করে 'চিত্রা' (চিত্রাঙ্গদা)। প্রযোজনা দর্শকদের বিশেষ সমাদর লাভ করে। জি আর বীরভদ্রাপ্পা অর্জুনের চরিত্রে এবং ললিতা চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে সাফল্যের পরিচয় দেন।

পরবর্তীকালে বাঙ্গালোরের স্পন্দন গোষ্ঠীর 'যক্ষনগরী' (রক্তকরবী) বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। নাটকটি অনুবাদ করেছেন কে মারুলসিদ্দাপ্পা, পরিচালনা করেছেন বি জয়শ্রী

যিনি নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। অন্যান্য শিল্পীরা হলেন এ জে সদাশিব (রাজা, চেতন (কিশোর), রমেশ পন্ডিত (গোকুল), শ্রীনিবাস (বিশু), চন্দ্রশেখর (ফাগুলাল), মীরা কুড়ুপল্লি (চন্দ্রা), পুট্টরাজু (গোঁসাই), আর নাগেশ (রাজ্যপাল), প্রকাশ (সহরাজ্যপাল), ধনঞ্জয় (মুখ কাভলুগার), রমেশ সলগুন্ডি (বিজ্ঞানী), রামকৃষ্ণ (ঐতিহাসিক)। জয়শ্রী নাটকের চরিত্র কিছু বদল করছেন এবং ঘটনাও কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। 'রক্তকবরী' নাটককে তিনি বুদ্ধিজীবীদের আওতা থেকে বার করে এনে সাধারণ মানুষেব মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি কিছু অদল বদল করেছেন। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের কাছে তা বিশেষ গুরুত্ব না পেলেও সাধাবণ দর্শকরা জয়শ্রীর প্রযোজনাকে মেনে নিয়েছেন। দিল্লীর কামানী অডিটোরিয়াম-এ এই নাটকটির প্রযোজনা দেখে পত্রিকায় লেখা হয় — Unlike in the text, the king – Maharaj – remains visible throughout and to that extent the element of suspense leading to his climactic appearance towards the end is taken away. The absence of the lone voice from inside the wire-meshed curtain broadcasting the powerful presence of a person whose arrogance and growing sense of despair under a crushing system of his own making conjure up the vision of a strong but strangely helpless man, gives an altogether different turn to the proceedings, and A. J. Sadashiva exposes the limitations by stiff body movements behind the barge cobweb screen and outside as well as delivery of words unadorned with modulatory varieties. A deep masculine terror is imperative.

Quite impressive is the style in which the king and Nandini, the former then out of his shell and completcly determined to break the shackle, declare war against oppression heralding a revolution. They jump out of the stage one by one, Nandini first giving the clarion call of "rise and untite" rundown the aisle and disppear — as if in the crowd. At the sametime, on the stage, the forces of cruel establishment are seen bent on crushing the struggling and rejuvenated workers. Thereby the seriousness of the conflict is underlined. Certainly a realistic way of showing humanism challenging repressive acquisitiveness. Jayashree, therefore, deserves credit for her presentational techniques as also her own performance. The first scene epitomising a crushing authoritarianism is a gem of an introduction. Equally moving is the sound of the whiplash from inside the wings and the simultaneous onstage agony of the tortured. Jayashree portays Nandini well enough, although a ringing tone in voice would have perhaps been more representative of a bubbling optimistic soul. This is no orthodoxy, please. Srinivas (Vishu) captures the heart. Oh, if the could sing as well! R. Nagesh as the ruthless Rajyapala claims attention. But he seems merely stern and not the astute manipulator of mind the Ralindranath's Sardar is. Happily Chandra (Meera Kuduvalli) and Fagulal (Chandrashekhar) act with restraint, for unbridled emotionalism on their part would have upset the relationships between them and others.[28] বি ভি করন্থ পরিচালিত 'তাসের দেশ' এক উচ্চমানের শিল্পকর্ম রূপে সমাদৃত হয়েছে। সেটি ছিল একটি চিত্রময় বর্ণাঢ্য প্রযোজনা।

কন্নড় নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে আর একটি তথ্য বিশেষ উল্লেখ। গুব্বী বীরান্না ছিলেন অনন্য শক্তিমান নাট্য পরিচালক ও প্রযোজক। তিনি কর্ণাটক রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র সঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন ("Gubbi Veeranna introduced 'Ralındra Sangeet' on the stage" -- The Tradıtıon of Kannada Theatre, ed. by K.D. Kurtkoti; এর মধ্যে প্রবন্ধ The Professıonal Theatre of Karnataka by S.S. Kotion; p. 83).

৬. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও কন্নড় নাটক

ক. সাম্প্রতিক বাংলায় নাটক কন্নড় ভাষায়

সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার জীবনের সঙ্গেও কর্ণাটকের মানুষের হৃদয়ের বন্ধন বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়েছে। যার সঙ্গে নাটকের সম্পর্কও ছিল। বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর কর্ণাটকের মানুষদেরও নাড়া দেয় এবং বাংলা ও বিজাপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের জন্য একটি কন্নড় নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৩ সালে, নাম 'জয় শ্রী'। এদের প্রচারপত্রে লেখা ছিল—

Bengal Bijapur Famine Relief
UNDER THE KIND PATRONAGE OF
Dharmaprakash Mr. L.S. Venkaji Rao
UNITED ARTISTS PRESENT
JAYA SHREE
A Kannada Drama
And Dance Recitals By
KUMARI SARALA
(WITH SARASWATI ORCHESTRA)
AT THE
TOWN HALL
On Tuesday 12 Oct. 43 at 6.45 p.m.
Rates Rs. 5,3,2,1 & As. 8

BANGALORE STUDENTS FEDERATION[২৫]

বাংলার প্রতি কর্ণাটকের এই ভালবাসা আমাদের অভিভূত করে।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা যেতে পারে। মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিস্ময়কর জীবন আকৃষ্ট করেছিল কর্ণাটকের বুদ্ধিজীবীদের। তাঁরা গভীর অনুরাগী ছিলেন এই বিরাট মানুষের। নেতাজীর জীবনকথা নিয়ে কন্নড় ভাষায় একটি ভাল নাটক লেখা হয়েছে 'বাংলার মহাব্যাঘ্র' (১৯৬২), লেখক এস গণপাইয়া সেট্টি।

শ্রী বিন্ডিগণবিলে নারায়ণস্বামী এক আশ্চর্য মানুষ। উদার সংস্কৃতিবান এই মানুষটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। তিনি অজস্র বাংলা নাটক কন্নড় ভাষায় অনুবাদ করেছেন অ ত্যন্ত সার্থকভাবে। আধুনিক বাংলার ক্রমিক সৃজনকে যেমন তিনি রূপান্তরিত করেছেন; তেমনি জনপ্রিয় শক্তিশালী বিভিন্ন নাট্যকর্মও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, যেগুলিও তাঁর অনুবাদে কন্নড় ভাষায় সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। বাংলা ও কর্ণাটক এই দুই দেশের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনে তাঁর প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হবে।

শ্রীবিন্ডিগণবিলে নারায়ণস্বামী অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'কলকাতার ইলেকট্রা', 'সত্যসন্ধ' এবং অন্য নাটক 'মোস্তেভেটি'। তিনি অনুবাদ করেছেন

ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা'। জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল', রতন কুমার ঘোষের 'ভূমিকম্পের আগে' ও 'ভূমিকম্পের পরে', শম্ভু বাগের 'লেনিন' ও 'অগ্নিগর্ভ লেনা' ইত্যাদি নাটক কন্নড় ভাষায় তিনি রূপান্তরিত করেছেন। অরুণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'মারীচ সংবাদ' তিনি অনুবাদ করেছেন 'মরীচনা বন্ধুগলু' (মারীচের বন্ধুরা) নামে। 'মারীচ সংবাদ' নাটকের একাধিক অভিনয় হয়েছে; বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা করেছেন প্রসন্ন (সমুদয়), অক্ষুর জয়তীর্থ প্রমুখ।

বাদল সরকার কন্নড় ভাষায় এক বিশেষ পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় নাম। গিরিশ কারনাড তাঁকে একসময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মনে করেন, অন্যান্য নাট্যশিল্পীরাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আনত। শ্রী বিভিবিলে নারায়ণস্বামী অনুবাদ করেছেন বাদল সরকারের 'সলিউশন একস', 'কবিকাহিনী', 'বল্লভপুরের রূপকথা' 'বড় পিসীমা' এবং 'রাম শ্যাম যদু'। তাঁর অনূদিত বাদল সরকারের নাটক বিশেষভাবেই মর্যাদা পেয়েছে। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' করেছেন বি ভি করন্থ ১৯৭৩ এ। 'বাকি ইতিহাস' আবার অনুবাদ করেছেন এন এস ভেঙ্কটরাম। শম্ভু মিত্রর 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটক 'কুরুড় কাঞ্চন' নামে রূপান্তরিত করেছেন প্রেমা করন্থ ১৯৭৮ সালে। বাদল সরকারের জীবননিষ্ঠ বক্তব্য ও অভিনীত আঙ্গিক (থার্ড থিয়েটার ফর্ম) প্রভাবিত করেছে নাট্যকর্মীদের। প্রসঙ্গত লিঙ্গদেবরু হলেমনের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের শরিক হলেমনে উৎপল দত্তর দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন— I am influeneed by Badal Sarkar and Utpal Dutta. I had attended two workshops conducted by Mr. Badal Sarkar and have been influeneed by his third theatre technique. His Groteskian Indian concepts have helped us in inventing our street theatre and Extension theatre. As far as Utpal Dutta is concerned, I am influeneed by his dramas and his association with I.P.T A.[২৬]

মহাশ্বেতা দেবী কর্ণাটকে অত্যন্ত পরিচিত নাম। দলিত মানুষ আদিবাসী মানুষদের জন্য তাঁর গভীর অনুরাগ কর্ণাটকের মানুষদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর রচনা কন্নড় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। জি কুমারাপ্পা অনুবাদ করেছেন মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' যে অনুবাদকর্মটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে এবং অনুবাদক কন্নড় সাহিত্য অ্যাকাডেমি কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন।

এই কাহিনী কিছুটা নাটকায়িতও হয়েছে। মহাশ্বেতী দেবীর পাঁচটা নাটক কন্নড় ভাষার অনুবাদ করেছেন জি. কুমারাপ্পা।

মহাশ্বেতা দেবীর 'জল' কন্নড় ভাষায় মঞ্চস্থ হয়েছে। অনুবাদ করেছেন নগরকোর রমেশ, প্রযোজক সমুদয় বাঙ্গালোর। পরিচালনার দায়িত্ব নেন কৃষ্ণ কুমার, সঙ্গীত পরিচালক গজানন টি নায়ক। ২০০০ সালের আগষ্ট মাসে এ ডি এ রঙ্গমন্দিরে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

প্রসন্নর 'দাঙ্গেয় মুঞ্চিনা দিনগলু' (দাঙ্গার আগের দিনগুলো) নাটক মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অধ্যায় ও ব্রিটিশদের আগমনের পটভূমিকায় লেখা। এই নাটকের ওপর সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' চিত্রের সম্পূর্ণ প্রভাব আছে।

খ. সাম্প্রতিক কন্নড় নাটক বাংলায়

সম্প্রতিকালে বেশ কিছু কন্নড় নাটক বাংলায় অনূদিত হচ্ছে ও মঞ্চস্থ হচ্ছে। কন্নড় নাটকের গভীর বোধ ও আঙ্গিকগত চাতুর্যকে বাংলার নাট্যমোদী মানুষ ক্রমেই সম্যকভাবে উপলব্ধি কবতে পারছে এবং তাকে সাদরে বরণ করে নিচ্ছে। কর্ণাটক নাট্যকারদের নিয়েও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে পত্রপত্রিকায়। বি ভি করন্থর একটি সুন্দর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় যা সানন্দা পত্রিকায (৫.৮.৯৪) পত্রিকায প্রকাশিত হযেছে। গিরিশ কারনাডকে নিয়ে সাক্ষাৎভিত্তিক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে 'দেশ' পত্রিকায় (১৩.৬.৯২), লেখক সুরজিৎ ঘোষ। এইচ এস শিবপ্রকাশের সম্পূর্ণ নাট্যকৃতির ওপর আলোচনা করেছেন দিলীপ কুমাব মিত্র, প্রবন্ধটি — 'শিবপ্রকাশেব নাটক ঃ মহাজীবনের শিল্পভাষ্য' প্রকশিত হয়েছে ১৯৯৯ এর শারদীয়া 'অসময়েব নাট্যভাবনা' পত্রিকায়। আরো বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে কন্নড় নাট্যকারদের নিয়ে।

কন্নড় নাট্যকারদের মধ্যে বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত ও পরিচিত হলেন গিরিশ কারনাড। তাঁর নাটক বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং বাংলায় অনূদিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। গিরিশের 'তুঘলক' বাংলায় অনুবাদ করেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ ও স্বপন মজুমদার। প্রথম প্রযোজনা করে বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রচার সমিতি ১৯৭২ এ এবং ঐ বছরই নাটকটি প্রকাশিত হয় বহুরূপী পত্রিকায়। থিয়েট্রন এই নাটক মঞ্চস্থ করে ১৯৮০ সালে। দুটি নাটকই বিশেষত বহুরূপীর প্রযোজনা জনপ্রিয় হয়। গিরিশের 'হয়বদন' শঙ্খ ঘোষ অনুবাদ করেন 'ঘোড়ামুখোপালা' নামে যেটি প্রকাশিত হয় বহুরূপী পত্রিকায় ১৯৭৪ সালে। এটি মঞ্চস্থ করে অবয়ব। 'যযাতি' অনুবাদ করেন সলিল সরকার এবং নাটকটি মঞ্চস্থ করে বহুরূপী ১৯৮৬ তে। 'যযাতি' প্রকাশিত হয় গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় ১৯৯৪ সালে। বহুরূপী প্রযোজিত নাটকটিও বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। নাট্য পরিচালনায় কুমার রায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। গিরিশের 'তালেদণ্ড' শঙ্খ ঘোষ অনুবাদ করেন 'রক্তকল্যাণ' নামে যেটি ১৯৯৪ সালে স্যাস পত্রিকায় প্রকশিত হয়। 'রক্তকল্যাণ' মঞ্চস্থ হয় ২০০০ এর মার্চে, প্রযোজক সংস্থা 'মনিরথ', পরিচালক শান্তনু বসু।

এইচ এস শিবপ্রকাশ রচিত 'মহাচৈত্র' নাটকের অংশবিশেষ বাংলায় অনুবাদ করেন দিলীপ কুমার মিত্র এবং তা অভিনয় করেন 'এসো নাটক শিখি' সংস্থা ১৯৯৯ সালে তাপস দাসের পরিচালনায়। 'মহাচৈত্র'র সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন সোমা বসু এবং নাটকটি শারদীয় শূদ্রক প্রকাশ করে ২০০০ সালে। শিবপ্রকাশের 'সুলতান টিপ্পু' বাংলায় অনুবাদ করেছেন দিলীপ কুমার মিত্র এবং অভিনয় নাট্যসংস্থা এটি অভিনয় করে ২০০১ এর জানুয়ারীতে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় এই যে কন্নড় নাটকটি অনূদিত হয় বাংলায় এবং মূলত অবাঙালী শিল্পীরা এতে অভিনয় করেন যার দর্শকরা ছিলেন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ। অভিনয়ে অংশ নেন প্রতাপ জয়সওয়াল সুধীর নিগম অশোক আগরওয়ালা কৌশিক সেনগুপ্ত অখিলেশ পাঠক উমেশ প্রসাদ রঞ্জিত গুপ্ত এজাজ আহমেদ উমা জয়সওয়াল। নাটকটি পরিচালনা করেন প্রতাপ জয়সওয়াল। নাটকটি পরেও অভিনীত হয়েছে। নাটকটি ২০০১-এ ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়া জার্নালে প্রকাশিত হয়।

ডঃ চন্দ্রশেখর কম্বর রচিত 'মহামায়ী' অনুবাদ করেছেন দিলীপ কুমার মিত্র। সৃষ্টি প্রকাশন-এর উদ্যোগে নাটকটি শ্রুতি নাটকরূপে পরিবেশিত হয় জুন ২০০০ সালে। এই

..টক মুদ্রিত হয় স্যাস পত্রিকায় ২০০০ সালেই। শ্রুতি নাটক প্রযোজনায় উদ্যোগী সংস্থার প্র‍চারপত্রে ডঃ কম্বর এবং তাঁর নাটক সম্বন্ধে বলা হয় —

SRISTI PRAKASHAN arranges a public reading of Dr. Chandrasekhar Kambar's Kannada play "MAHAMAYI" in Bengali on 17 6.2000 at 6.30 p.m. Dr. Chandrasekhar Kambar is a noted playwright of this time. His plays are highly acclaimed both in India and abroad. His latest play is "MAHAMAYI". It is a philosophical play with serious content in an exquistite theatre form. Though death pervades play all through, it finally upholds the victory of life over death. It is, at the same time, a pleasant love story. Though traditional in appearance, the play is very much modern in content and its appeal is universal This play has been ably rendered into Bengali by Dr. Dilip Kumar Mitra. We have arranged a public reading of the play in which you are cordially invited.

চন্দ্রশেখর কম্বরের 'শাম্বশিব প্রহসন' অনুবাদ করেন অনিল সাহা 'গণপতি বাপ্পা' নামে। নাটকটি শারদীয় ২০০০ বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কন্নড় কাহিনী অবলম্বনে শ্রুতি নাটক 'সেই মেয়েটি' সম্প্রতি বাংলায় প্রযোজিত হয়। মূল লেখক আনন্দ (অজ্জংপুর সীতারাম)। গল্পটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন মুকুল গুহ এবং তাকে নাট্যরূপে সজ্জিত করেছেন অনুপ চক্রবর্তী। ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়া নাটকটি পরিবেশন করে কলকাতায় ২০০১ এর জানুয়ারীতে, শিল্পীরা ছিলেন চন্দন মজুমদার শেখ হাকিমুল ও মহুয়া মজুমদার। এদের অভিনয় প্রশাংসিত হয়। 'সেই মেয়েটি' আবার পরিবেশন করে হাওড়া উদ্দীপন অত্যন্ত সার্থকভাবে। নাটকের বক্তব্য বিষয়ে তারা জানান

'এই নব সহস্রাব্দে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান চেতনার দুরন্ত জয়যাত্রার যুগেও অশুভ সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এদেশের বহুকোণ। ওরকমই এক অস্তে বোধ ও তার থেকে উত্তরণের (ট্র্যাজিক) কাহিনী হল এই নাট্যের বিষয়'।[২৭] নাট্যরূপ ও নির্দেশনা — অনুপ চক্রবর্তী, আবহ — শ্যামল দোলুই, অভিনয় শিল্পীরা হলেন সুমনা মল্লিক নির্মাল্য ভক্ত ও সুখময় সিংহরায়। ২০০১ এর ফেব্রুয়ারিতে নাটকটি প্রযোজিত হয় উলুবেড়িয়া কলেজের হরিপদ মঞ্চে।

কন্নড় নাটক এভাবেই জয় করে নিচ্ছে নাট্যানুরাগী বাঙালীর মন।

সূত্র পরিচিতি

১. Encyclopoedia of Indian Literature, Vol 2 p. 1077.
২ The Dreams of Kannada Theatre - K. V Akshara, Theatre India, Nov. 1999, New Delhi
৩. History of Kannada Drama – R S. Muggali
৪. Indian Literature–Kannada Drama. H.K. Ranganath. April-Sept. 1958.
৫ K.D. Kutkorti.
৬. The Hindu. G.S. Amur. 16.1.1977
৭ Rangvarta, Feb. 91. Calcutta
৮. Post 1980 plays – O I. Nagabhusan Swamy. an article in Theatre India, May 1999, New Delih.
৯. Jo Kumaraswami গ্রন্থের পরিচয়ে B V Karanth

১০. সিরিসমপিগে, ডঃ চন্দ্রশেখর কম্বর।
১১. Rangvarta. Feb. 91. Calcutta.
১২. 'তুঘলক'-এর ইংরেজী অনুবাদের মুখবন্ধ।
১৩. The Times of India 15.7.90.
১৪. Kavita Nagpal. Outlook. 19 Oct. 1998.
১৫. The Hindu. Theatre. 8.2.98.
১৬. দেশ, ১৩.৬.৯২, কলকাতা।
১৭. Deccan Herald. 20.3.1993. পত্রিকায় উদ্ধৃত।
১৮. National Herald 21.3.93. Deepak Arora.
১৯. লেখককে চিঠি।
২০. Deccan Herald 24.9.2000.
২১. B. Puttaswamaya — S.M. Punekar
২২. Ibid.
২৩. রবীন্দ্রনাথ ও কর্ণাটক - হা. মা. নায়ক, আবর্ত — অর্ধেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদিত। এপ্রিল-জুলাই, ১৯৯৫, কলকাতা।
২৪. The Statesman 135. 1987 N.D.
২৫. দ্রষ্টব্য ঃ কন্নড় রঙ্গভূমীয় বিকাশ — এই কে রামনাথ, ১৯৯০।
২৬. বর্তমান লেখককে প্রেরিত পত্র।
২৭. উদয়ন সংস্থার প্রচারপত্র, ২০০১।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আধুনিক মলয়ালম নাটক

১. সূচনা পর্ব

নাটক বলতে যা বোঝায় প্রাচীন বা মধ্যযুগের মলয়ালম সাহিত্যে তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। মন্দির শিল্প বা লোক শিল্পের বিস্ময়কর বিকাশ কেরালায় ঘটেছিল। বিশ্ববিখ্যাত কথাকলি নৃত্যের উদ্ভব সেখান থেকেই ঘটে। কথাকলি নাচেই মানুষের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ হত। বিগত তিন শত বৎসর কথাকলি ও তার সাহিত্য কেরালায় নাটকের পূরক রূপে কাজ করেছে ও নাটকের আবির্ভাবকে দ্বিধান্বিত করেছে।[১]

কেরল বর্মা কলিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটক অনুবাদ করেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যা প্রকৃতপক্ষে মলয়ালম নাটকের সূত্রপাত করে। যদিও অত্যন্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা রীতিতেই এই কাজ তবু ক্লাসিকের এই নবরূপায়ন অত্যন্ত আবেদনশীল হয় ও মঞ্চের ভেতরে ও বাইরে প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক অনূদিত হতে থাকে, যেমন চাতুক্কুটি মান্নাডিয়ার অনূদিত 'জানকীপরিণয়ম' ও 'উত্তররামচরিতম', কোট্টারথিল সনকুন্নি অনুদিত 'মালতীমাধবম', এ আর বাজরাজ বর্মা অনুদিত 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' প্রভৃতি।

ক্লাসিক মডেলের আদর্শে মৌলিক নাটকও সুরু হয়। এক্ষেত্রে প্রথম প্রয়াস **কোচুন্নি তমপুরন** (১৮৫৫-১৯২৬) রচিত 'কল্যাণী নাটকম'। সমসাময়িক সমাজের পটভূমিকায় এটা একটা মৌলিক নাটক এবং বাস্তবধর্মীও। ইংরেজী নাটক থেকে প্রেরণা পেয়েছেন নাট্যকার। তবে এই নাটকটা মঞ্চ সফল নয় কারণ তমপুরন ঠিক নাট্যকার ছিলেন না।

প্রথম যুগের মৌলিক নাটকের মধ্যে স্মরণীয় **কুনাইকুট্টন তমপুরন**-এর 'চন্দ্রিকা', কে সি কেশব পিল্লা রচিত 'লক্ষ্মী কল্যাণম', কাণ্ডাত্তিল ভার্গিস মাপ্পিলার 'এব্রায়াককুট্টি' (হিব্রু ছেলে) যা ওল্ড টেষ্টামেন্টের যোশেফের ঘটনা নিয়ে লেখা। চংগনসেসরি রবি বর্মা সমসাময়িক বিষয় বা কবিদের নিয়ে লিখলেন 'কবিরঞ্জনম', বয়স্কর মূসু লিখনের 'মনোরমা বিজয়ম'। পৌরাণিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করলেন তোত্তাকট ইককাবম্মা (সুভদ্রার্জুনম), কুনাইকুট্টন তমপুরন (লক্ষ্মণ সঙ্গম), কোচুন্নি তমপুরন (উমা-বিবাহম), এন এ নামপুতিরি (ভগবত দূতু) প্রভৃতি।

ইংরেজী নাটকের অনুবাদও হয়। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল 'টেনিং অফ দি শ্রু'র অনুবাদ কে. ভি. মাপ্পিলার 'কলংকিনীদমনকম'। কিছু পরে ব্র্যাংক ভার্সে শেকসপীয়রের হ্যামলেট ও কিং লীয়রের অনুবাদ করেন দেওয়ান বাহাদুর এ গোবিন্দ পিল্লা।

এই সময়েই কেরালা মঞ্চ স্থাপনের প্রয়াস চলে। অগ্রণী পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা তিরুভত্তর নারায়ন পিল্লা। তাঁর সংগঠিত নাট্যদল মনমোহনম সারা কেরালা পরিভ্রমণ করে ও অভিনয় করে শকুন্তলম, জানকী পরিণয়ম, উত্তররামচরিতম প্রভৃতি। এই সব প্রয়োজনা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে ও নাট্যকার রূপে মর্যাদা পেতে তিনি অনেকে নাটক লিখতে শুরু করেন যদি-ও সমালোচকরা তাদের উচ্চমূল্য দেন না।

এই সময়ে এক অপরিচিত লেখক **মুনসী রামকুরুপ** (১৮৪৮-১৮৯৭) রচিত স্যাটায়ার 'চাক্কী চংগরম' (১৮৯৩) বিস্ফোরণ ঘটায়। চংকরম ভালবাসে চাক্কীকে ও সুকুমারন ভালবাসে মাধবীকে এবং প্রচলিত সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী মিলনে তাদের পরিণতি ঘটে। সুকুমারন-মাধবী থেকে তাদের চাকর চংগরম-চাক্কী প্রধান্য পায় ব্যঙ্গাত্মক চিত্রনে। কিন্তু তার থেকে উল্লেখ্য সমকালীন নাটক ও কবিদের ওপর তীব্র ব্যঙ্গ।

মলয়ালম নাটকে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটান **সি. ভি. রমন পিল্লা** (১৮৫৮ - ১৯২২) যিনি মূলত ঔপন্যাসিক, বিশেষত ঐতিহাসিক রোমান্স তাঁর প্রিয় বিষয়। রঙ্গমঞ্চের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাঁর প্রথম নাটক 'চন্দ্রমুখী বিলাসম' (১৮৮৫) সংস্কৃতরীতির প্রতি আস্থাশীল হলে-ও এতে সমসাময়িক সমাজের বিশেষত ত্রিবান্দ্রামের উচ্চমধ্যবিত্ত নায়ার সমাজের সমালোচনা আছে। ঐ সমাজের এক অভিজাত তরুণীকে নিয়ে কাহিনী কিন্তু নৃত্যশিক্ষক বিয়ের দালাল দুষ্কৃতিকারী ও জন জুয়ানদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ। প্রায় পঁচিশ বছর পর তিনি লেখেন 'কুরুপিল্লাকারি' (১৯০৯, শিক্ষকহীন স্কুল) যেটা মলয়ালম ভাষায় প্রথম কমেডি। নাটকটি সংস্কৃত প্রভাব মুক্ত এবং গোল্ডস্মিথ শেরিডনের সঙ্গে শেক্সপীয়র ও প্লটাস টেরেন্সকে স্মরণ করায়। এটা সম্পূর্ণ গদ্য ভাষায় লেখা। এতে আছে নতুন শেখা ইংরাজী শিক্ষার আড়ালে উঁচুতলার লোকেরা কিভাবে তাদের নীচতা ভণ্ডামিকে আড়াল করার চেষ্টা করে। এর প্রধান চরিত্র নব্য ইংরাজী শিক্ষিত বিদুষী নারীকুলের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরক এক নারী—পঞ্চামৃত কোচম্মা।

সি ভি রমন পিল্লা আরো লেখেন—'পান্ডাত্তে পাচন' (পূর্ববর্তী পাচন), 'কুরুপ্পিন্টে তিরিপ্পু' (কুরুপের কৌশন), 'বাটলার পাপ্পন', 'ডক্টবকক্ কিত্তিয়া মিচম' (ডাক্তারের মোট লাভ) ইত্যাদি। সি ভি মহৎ সাহিত্য রচনা করেন নি, সমসাময়িক জীবন নিয়ে হাস্যাত্মক রচনাই তিনি লিখেছেন যাদের ফার্স বলাই সংগত। তবু নাটকের জ্ঞান, বাস্তবতার বোধ, ব্যঙ্গাত্মক হলেও জীবনের চিত্রন এবং রঙ্গমঞ্চের ধারণা তাঁকে আধুনিকতার পুরোধা করেছে। সমালোচক সেই কথাই বলেছেন—"The modern period starts with him."[২]

আর একটা বিস্ময়কর ঘটনা এই যে সি ভি রমন পিল্লা একটাও ঐতিহাসিক নাটক না লিখেও মলয়ালম ঐতিহাসিক নাটকের জনক রূপে অভিহিত হয়েছেন কারণ তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহ — মার্তন্ড বর্মা, ধর্মরাজ, রামরাজ বাহাদুর প্রেমাসৃতম প্রভৃতি — অপরের হাতে নাট্যরূপ পায় ও তারা অত্যন্ত মঞ্চ সফল হয়। ফলে তরুণরাও এ বিষয়ে লিখতে উৎসাহিত হয়।

পূর্ববর্তী ধারাকে আরো পূর্ণ করতে এগিয়ে আসেন **ই. ভি. কৃষ্ণ পিল্লা** (১৮৮৪ - ১৯৩৯) যিনি নাট্যকার ও পরিচালক রূপে সফল এবং সুদক্ষ অভিনেতাও। তাঁর বিখ্যাত কমেডি হল 'বিএ মায়াবী' (১৯৩৪), 'প্রণয় কমিশন, 'মায়ামনুষন' (১৯৩৫, রহস্যময় মানুষ), 'পেন্নারসুনদ' (মেয়োরাই শাসক) ইত্যাদি। ইনি সি ভি-র ধারাকে বজায় রেখে ঐতিহাসিক নাটক লেখেন ও তাঁর লেখা তিনটি ট্র্যাজেডী 'শীতলাক্ষী' (১৯২৬) 'রাজা কেশব দাস' ও 'ইরাভিকুট্রি পিল্লা' (১৯৩৩) প্রকৃতপক্ষে মলয়ালম ভাষায় ট্র্যাজেডির সূত্রপাত করে।

পরবর্তী স্তরে কৈনিক্কর ভাইরা—পদ্মনাভ পিল্লা ও কুমার পিল্লা স্মরণীয় অবদান রাখেন। **কৈনিক্কর পদ্মনাভ পিল্লা-র** (১৮৯৮ - ১৯৭৬) উল্লেখ্য নাটক হল 'কালভরিয়িলে কল্পপাদপম' (১৯৩৪ কালভরির দিব্যবৃক্ষ), 'ভেলুতাম্পি দলভা' (১৯৩২). 'বিধিমণ্ডপম'। প্রথম নাটকটি নিউ টেস্টামেন্টের ওপর ভিত্তি করে লেখা, মেরী করেলীর

'বাবাব্বাস' থেকেও উপাদান নিয়েছেন। জুডিথ যীশুখ্রস্টের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ পোষণ করে কারণ তার ভাই জুডাসকে যীশু টেনে নিয়ে গেছে পরিবার পরিজন থেকে। জুডাসের মৃত্যুর পর সে মানসিক ভারসাম্য হারায় ও শেষ পর্যন্ত মেরী ম্যাগডালেনের কাছে শান্তি পায়। 'সামাজিক দৃষ্টি কোন থেকে খৃষ্টকথা নিয়ে একজন হিন্দু লেখকের এই নাটক রচনা আধুনিক কালের সমন্বয়মূলক মনোভাবনার প্রথমপর্যায়ের উল্লেখ্য প্রয়াস'।[৬] পদ্মনাভর 'ভেলুতাম্পি দলভা' ঐতিহাসিক নাটক - ভেলু তাম্পি ভারতবর্ষের প্রথম বিপ্লবী যিনি ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করেছিলেন ও শেষ পর্যন্ত দেশের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেন।

কৈনিক্কর কুমার পিল্লা (১৯৯০) নাটকে জীবনের মৌল নীতি ও মূল্যবোধকে ভন্নত মহিমায় তুলে ধরেছেন। 'হরিশ্চন্দন' ও 'মহাভূম' 'মুক্তিয়ুম' (১৯৫১ প্রলোভন ও মুক্তি) পৌরাণিক নাটক ও তাঁর আদর্শবাদের প্রকাশ এতে আছে। 'মনিমঙ্গলম'-এর (১৯৩৮) বক্তব্য সামাজিক ও বাস্তব। 'বেশঙ্গল' (১৯৪৬ মুখোশ) সামাজিক নাটকে তিনি নরনারী এঁকেছেন মুখোশ দিয়ে এবং মানবজীবনের সুখ স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে অলিখিত ও অনিবার্য শক্তির প্রকাশ দেখেছেন।

২. প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে মলয়ালম নাটকে আধুনিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়। এই সময় নূতন ভাবনা ও চেতনায় সমস্ত দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। কেরালার মানুষ স্বাদেশিকতার প্রত্যয়ে উদ্দীপিত হয়েছেন, রাজনীতি সচেতন জনগন আপন অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন, প্রগতিশীল ভাবনায় মানুষের মন জাগ্রত হয়েছে, প্রাচীন জীর্ণতা সংস্কার মূল্যবোধ আমূল উৎপাটিত হতে চলেছে—অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষ এগিয়ে চলেছে সমুখ পানে · বাইককম ও গুরুবায়ুর মন্দির ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্য অচ্ছুত মানুষদের পদশব্দে মন্দ্রিত হচ্ছে, নারীরা আপন ভাগ্য জয় করার মহামন্ত্র লাভ করেছে, শোষিত নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে বিপ্লবের গান। এই যুগ এই জীবন মানসিকতার প্রতিফলন পাওয়া যায় তৃতীয় দশকের আরম্ভ থেকেই যা মলয়ালম নাটকে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটায়।

গান্ধীজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সমাজ সচেতন লেখক **ভি. টি. আর. ভট্টতিরিপাদ** (১৮৯৭ - ১৯৮২) ব্রহ্মন নামপুতিরি সমাজের গোঁড়ামী কুসংস্কার স্থবিরতার বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানলেন ১৯৩০ সালে 'অড়ুক্কলইল নিন্নু অরঙ্গঠেকু' (রান্নাঘর থেকে মঞ্চ) নাটকে। নামপুরুতিরি পুরুষ একাধিক পত্নী ও উপপত্নী রাখতে পারত। পণপ্রথা কুৎসিত ব্যাধির মত সমাজকে কলংকিত করত, বৃদ্ধ বালিকাকে বিবাহ করত, ব্রাহ্মণরা অচ্ছুত হরিজনদের ছায়া মাড়াত না, তরুণদের মানতে হত বিবিধ সংস্কার এবং নামপুতিরি সমাজে মেয়েরা ছিল সর্বাপেক্ষা অবহেলিত লাঞ্ছিত এবং রান্নাঘর ও পর্দা ছিল তাদের ভবিতব্য—এই সব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই নাটক এবং জগদ্দল পাথর চাপা নামপুতিরি সমাজের বুকে অগ্নিবিস্ফোরণ ঘটায় ও তার ভিত্তি কাঁপিয়ে দেয়। আরো স্মরণীয় এর প্রথম অভিনয়ে মহিলার ভূমিকায় নামপুতিরি মেয়েদের মঞ্চে অবতরণও বিশেষ উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল।

একই সময়ে **এম আর ভট্টতিরিপাদ** লেখেন 'মরক্কুটকুল্লিলে মহানরকম (ঢাকা ছাতার মধ্যে মহানরক)।এই নাটকেও সমাজ ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিকে আঘাত করা হয়েছে বিশেষত নারীদের শোচনীয় দুরবস্থা এখানে চিত্রিত হয়েছে।

ইবসেন আধুনিক মলয়ালম নাটকের সূচনালগ্নে বিশেষ প্রভাব ও প্রেরণা রূপে বিদ্যামান। সামাজিক সমস্যা ও সংকটের উপস্থাপনা, মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত, মননশীল বিচার পদ্ধতি মূলত ইবসেন থেকেই এসেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ইবসেনের অনুবাদ ও তদনুযায়ী নাট্য সৃষ্টি মলয়ালম নাটককে সবিশেষ মূল্য দিয়েছে। ১৯৩৫ সালের 'গোষ্টস' নাটকের অনুবাদ করেন 'প্রেতঙ্গল' নামে বিশিষ্ট পুরুষ **এ বালকৃষ্ণ পিল্লা** (১৮৮০ - ১৯৬০) ও **এ. কে গোপাল পিল্লা। সি নারায়ন পিল্লা** অনুবাদ করেন ইবসেনের 'রসমেরশম' ১৯৪০-এ 'মুল্লুক্কল ভবনম' নামে। **টি এন গোপীনাথন নায়ার** (১৯১৯) 'এন এনিমি অফ দি পিপল' অনুবাদ করলেন 'জনদ্রোহী' নামে। **ই এস কাভুর** 'ওলাইল্ড ডাক' অবলম্বনে লিখলেন 'কাট্টু তারাভু'।

কেরালায় বামপন্থী আন্দোলন প্রসারিত হয়। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংকট তীব্র হতে থাকে, মানুষের রাজনৈতিক বোধ বাড়ে। শ্রেণী চেতনা প্রখর হতে হতে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সাহিত্যে তার প্রভাব পড়ে। ১৯৩৬ সালে লখনৌতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া প্রেসিভ রাইটার্স কনফারেন্স দক্ষিণভূমিকে আলোড়িত করে, ১৯৩৭ সালে কেরালায় প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্থা গঠিত হয়—'জিভল সাহিত্য সমিতি'। এর প্রায় সাত বৎসর পর ১৯৪৪ সালে শোরনুর-এ প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বসে। তদানীন্তন নাটক এই প্রগতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। কে দামোদরন-এর 'পাট্টাবাকি' যুগসন্ধিক্ষণের অনিবার্য প্রকাশ হয়ে দেখা দেয়, রচিত হয় ইতিহাস।

কে দামোদরন (১৯১২ - ১৯৭৬) রচিত 'পাট্টাবাকি' (জমির পাট্টা বা খাজনা বাকি ১৯৩৮) সামাজিক অর্থনৈতিক শোষনের নির্মম ছবি আঁকে। শ্রমিক, তার বৃদ্ধা মা, তরুণী বোন ও ছোট ভাইকে নিয়ে কাহিনী। ভাড়া দিতে না পারায় জমিদার তাদের তাড়ায়। মা মারা যায়। ফ্যাক্টরি মালিকও শয়তান — যে বিবিধ প্রকার অত্যাচার অপমান করে। ক্ষুধার জ্বালায় শ্রমিক চুরি করলে তাকে জেলে দেওয়া হয়। এরা মেয়েটির দিকে হাত বাড়ায়। অসহায় মেয়েটি ভাইকে খাওয়াবার জন্য পথে নামতে বাধ্য হয়। জেল থেকে শ্রমিক আসে, পতিতা বোনকে ফিরিয়ে আনে। এই অত্যাচার অপমানের বিরুদ্ধে তারা লড়াইয়ের শপথ নেয় : লড়াই ছাড়া বাঁচার পথ নেই। একমাত্র বিপ্লবই পারে শোষণ বন্ধ করতে। সমাজবাস্তবতার বিশেষ পরিচয় ঐ নাটকে পাওয়া যায় যা মলয়ালম নাটকে এনেছে নতুন যুগ।

এম পি ভট্টতিরিপাদ রচিত 'ঋতুমতী' (১৯৩৯) সমসাময়িক সমাজের গোঁড়ামি রক্ষণশীলতা কুসংস্কার ও অন্যায় নীতিনিয়মের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। মাতা-পিতৃহীন মেয়ে দেবকী লেখাপড়া করতে চায়, নামপুতিরি পরিবার ও সমাজের অচলায়তনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। বন্ধন থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু তার অত্যন্ত গোঁড়া কাকা ও কাকীমা তার ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকে সর্বপ্রকারে শাসন পীড়ন করে ও এক বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির করে। শেষ পর্যন্ত দেবকীর প্রথম স্কুলের সাথী, এখন যুবক নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত দুর্নীতি- বিরোধী বাসু এসে এই সংকটের অবসান ঘটায়।

সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে সিরিয়াস নাটক লেখা হতে থাকে। তাতে এল গভীরতা, মানবমনের তীব্র দ্বন্দ্ব সংঘাত বা পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়। **The influence of Ibsen played a great role in ushering in this type of play. If the pivotal problem in a play by Ibsen has social, political and economic implications and concrete level, as they emerge as inward conflicts in characters whom their pressures have moulded.**[৪]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এন কৃষ্ণ পিল্লা রচিত সমস্যা নাটক সমূহ।

এন কৃষ্ণ পিল্লা (১৯১৬ - ১৯৮৮) রচিত 'ভগ্নভবনম' ইবসেনীয় রীতির প্রভাব বহন করে, 'কন্যকা' ইবসেনীয় বিষয়ের। 'ভগ্নভবনম' এ (১৯৪২) বৃদ্ধ পিতা মাধবন নায়ার তার মেয়ে রাধার বিয়ে দেবে অসুস্থ ঈর্ষাকাতর জনোর্দনন নাযারের সঙ্গে যদিও রাধা বিয়ে করতে চেয়েছিল হরিন্দ্রনকে। রাধা বিবাহিত জীবনে অত্যন্ত অসুখী। মাধবন মেজ মেয়ে সুমতির বিয়ে দেয় ধনবান কিন্তু বর্বর কুরুপের সঙ্গে। সুমতি নিত্য লাঞ্ছিত অপমানিত হয়, মাধবন তাকে ফিবিয়ে আনে, কুরুপ তাকে নিয়ে যাবে মাধবনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত সুমতি আত্মহত্যা করে। সেদিনই রাধা হরিন্দ্রনের সঙ্গে চলে যাবে ঠিক ছিল, কিন্তু এই ঘটনায় রাধা মানসিক ভারসাম্য হারায়। মৃত্যুশয্যায় মাধবন হরিন্দ্রন-কে অনুরোধ করে লীলাকে বিয়ে করে অন্তত একজনকে এই ভগ্নভবন থেকে বাঁচাতে। নাটক শেষ হয় কিন্তু কোন পরিণতি ঘটে না - এক ঘন কালো অন্ধকারে ঢেকে যায় সবকিছু।

'কন্যকা' (১৯৪৯) মানবহৃদয়ের গোপন গভীর দুরন্ত আবেগকে ব্যক্ত করে এবং প্রচলিত বিধিনিয়মের সঙ্গে তার অসঙ্গতিকে প্রকট করে। এর নায়িকা পঁয়ত্রিশ বৎসরের দেবকী কুট্টি যে সরকারী অফিসার, মর্যাদাসম্পন্ন চরিত্র এবং পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। সে অবিবাহিতা, কিন্তু তার মনের গভীরে পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের স্বপ্ন। তার স্বপ্ন সার্থক করতে সমাজকে অবহেলায় তুচ্ছ করে দামি চাকরি ও সম্মান ছেড়ে দিয়ে সে তার পিয়ন বেলু পিল্লাকে বিবাহ করবে।

'বলাবলম' (১৯৪৬) নাটকে গৃহকর্ত্রী বিধবা লক্ষ্মী আম্মার প্রবল প্রতাপ, ছেলেদের ওপর কর্তৃত্ব, পুত্রবধূর ওপর অত্যাচার এবং শেষ পর্যন্ত কনিষ্ঠ পুত্র ও বধূর বন্দীশালা থেকে পলায়ন ও মুক্তির কথা বলা হয়েছে। 'অনুরঞ্জনম' (১৯৫০) একক ব্যক্তি সত্তা ও অপরের প্রতি কতর্ব্যবোধের দ্বন্দ্ব। 'আড়িমুখত্তক্কু' (১৯৫৫ নদী মোহনার দিকে) নাটকে কৃষ্ণ পিল্লা দেখিয়েছেন এক পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়ে ও তাদের অতীত গৌরব সমৃদ্ধি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা বোঝে যে কঠোর পরিশ্রমের থেকে সম্মানীয় আর কিছু নয়। এই নাটকে কেরালা সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব

বহুপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতা এল কিন্তু স্বাধীনতার উন্মাদনার সঙ্গে মিশে রইল ক্ষোভ বেদনা দুঃখ। 'আশা ছিল স্বাধীনতা নিয়ে আসবে সকলের জন্য সমৃদ্ধি ও সুন্দর জীবন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সব আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল কারণ যাই হোক না কেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরি করল নবনব সমস্যা যার জন্য প্রয়োজন হল নতুন উপায়। নতুন যুগের নাট্যকারদের অনেকেই এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সচেতন।'[৫] সাতচল্লিশের পরবর্তী মলয়ালম নাটকে রাজনীতি প্রধান প্রেরণা হয়ে দেখা দেয়। এতে স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্ভূত রাজনৈতিক সমস্যা ও সংকটের প্রকাশ ঘটেছে। সাম্যবাদী বিচারধারা অর্থাৎ মার্কসীয় চিন্তাপদ্ধতি, রাজনৈতিক সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যবিধি, সাধারণ মানুষ ও কৃষক মজুরের সংগ্রাম প্রভৃতি রূপ পেয়েছে নাটকে। ক্রমশ দেশের সমস্যা সংকট তীব্রতর হয়েছে। ভূস্বামী-ভূমিহীনের দ্বন্দ্ব সংঘাত, অত্যাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, রাষ্ট্র নির্মাণে সাধারণ ও সর্বহারা মানুষের ভূমিকা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নাটকে এসেছে ও শ্রেণীসংগ্রামের প্রবল আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

অধিকাংশ সমালোচকদের মতে ১৯৫০ থেকে পরবর্তী দশ বছর হল মলযালম নাটকের সুবর্ণযুগ যে সময়ে কেরালার বিশিষ্টতম নাট্যকাররা তাদের অসাধারণ সৃজনকর্মে মলয়ালম নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন।[৬] এ পর্যাযের শ্রেষ্ঠ লেখক বলা যায় তোপ্পিল ভাসীকে; কে টি মুহম্মদ, এন এন পিল্লা, সি. জে. টমাস, ওমচেরী প্রমুখ এই পর্যায়ের বিশিষ্ট নাট্যকাব।

কে রামকৃষ্ণ পিল্লা (১৯০৯ - ১৯৮১) বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বলিষ্ঠ সৈনিক, দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রান। নাট্যকার অভিনেতা রূপেও তিনি স্মরণীয়। তাঁর 'প্রতিমা' নাটক এক অত্যাচারী শাসকের অন্যায় অবিচাবের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিবাদ। সেই শাসক অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে তার শাসন যন্ত্র চালায এবং পৃথিবীর লোককে বিশ্বাস করাতে চায় যে সে রাজ্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি। সে তাব মূর্তি গড়ায় ও স্থাপন করাতে চায় কারণ তাই 'জনগণের ইচ্ছা'। সে তাব স্ত্রী-পুত্রকেও পরিত্যাগ করে। কিন্তু মূর্তি স্থাপনের সময় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। জনতা ক্রোধে গর্জন করে ওঠে, তার ছেলে স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক মূর্তি ভেঙে ফেলে। দায়িত্বশীল উপযুক্ত সরকারে গঠনের আগে ত্রিবাঙ্কুরে যে প্রবল রাজনৈতিক উন্মাদনা দেখা দেয় সেই পটভূমিকায় নাটকটা লেখা।

তাঁর 'বেল্লাপোক্কম' (১৯৪৭) নাটকে সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘটিত। 'জেতাক্কল' (বিজয়ী) নাটক বিদেশী শাসন ও রাজশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং জনগণের জন্য জনগণের শাসন ও অধিকার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী নাট্যকার বলেছেন যে কংগ্রেসের আন্দোলনেই তা সম্ভব হয়েছে। 'বিশারিক্কু কাটটু বেন্টা' (পাখার হাওয়া চাই না) ধনী জমিদার ও নির্ধন কৃষকের দ্বন্দ্ব। শোষিত নিপীড়িত অসাহায় মানুষের প্রতি লেখকের সমবেদনা স্পষ্ট।

পাপ অপরাধ ও দুঃসহ আত্মপীড়নের চিত্র 'তপ্ত অশ্রু' (১৯৫০) যেখানে তাম্পি পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে তার বন্ধু নায়ারের প্রেমিকাকে প্রলুব্ধ ও ভ্রষ্ট করে। শেষে অসহায় ও নিরুপায় মেয়েটি গর্ভস্থ সন্তানকে মেরে ফেলার চেষ্টা করলে ধরা পড়ে ও তাকে বিচারের জন্য আনা হয়। বিচারক হল তাম্পি। তাম্পির স্ত্রী সরোজম সেই পুরুষটি তীব্র নিন্দা করে যে ঐ মেয়েটির সর্বনাশা করেছে। তামপির মনে প্রবল অনুতাপ দেখা দেয়। সে স্বীকারোক্তি লিখে যায় ও আত্মহত্যা করে।

এডাস্সেরি গোবিন্দন নায়ার (১৯০৬ - ১৯৭৪) রচিত 'কুট্টু কৃষি' (১৯৫০ যৌথ কৃষি) নাটকের বক্তব্য, বলিষ্ঠ সামাজিক রাজনৈতিক তাৎপর্যময়ও। মালাবারের হিন্দু মুসলমান দুই পরিবার শ্রীধরন নায়ার ও আব বুকর তাদের পার্থক্য ভুলে গিয়ে হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলে এবং বাঁচবার তাগিদে মিলে মিশে চাষাবাদ করে। নাটকে এই বক্তব্যই তুলে ধরা হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতা নয়, অর্থনৈতিক বৈষম্যই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। নাটকের শেষে নায়ারের ভাই সুকুমারনের সঙ্গে আবু বকরের মেয়ে আয়েষার পারস্পরিক আকর্ষণের কথাও আছে। নাটকের বক্তব্য বলিষ্ঠ এবং এতে যথার্থই মাটির মানুষের ছবি ফুটেছে। চরিত্র সমুহের জীবনে ও সংলাপে কবিত্বের স্ফুরণ দেখা যায় সুন্দরভাবে।

তোপ্পিল ভাসী (১৯২৪ - ১৯৯২) বিশিষ্ট বামপন্থী কর্মী ও সংগ্রামী সৈনিক. মলয়ালম নাটকের ক্ষেত্রেও এক অবিস্মরনীয় নাম। বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশ নেবার জন্য পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে লাগে। তিনি ১৯৪৮ সালে ফেরার হন ও আন্ডার গ্রাউন্ডে

যান। 'শুরনাড কাণ্ড'তেও তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় ও তিনি কারারুদ্ধ হন। স্বাধীনতার আগে ত্রিবাঙ্কুরে প্রবল গণ-আন্দোলন হয়, শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানুষ ক্রোধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বাধীনতা সেই গরীব কৃষক শ্রমজীবী মানুষদের কোন পরিবর্তন ঘটাল না বরং আরো প্রবল হয়ে ওঠে অত্যাচার পীড়ন। ১৯৫০ এ ত্রিবাঙ্কুরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুর্দমনীয় হয় আন্দোলন, পুলিশও খুন হয়। ফলে চলে ভয়ঙ্কর দমন নীতি, হাজার মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয় ও তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলে। এই অগ্নিগর্ভ পটভূমিকায় তোপ্পিল ভাসীর বিখ্যাত নাটক সমূহ রচিত হয়েছে।

'নিঙ্গল এন্নে কমিউনিস্ট আক্কি' (তুমি আমায় কমিউনিস্ট করেছো, ১৯৫২) নাটকটি তোপ্পিল ভাসী লেখেন আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকার সময়। কেরালা পিপলস আর্টস ক্লাবের প্রয়োজনায় অসংখ্যবার এই নাটক অভিনীত হয়। এর জনপ্রিয়তায় বিমূঢ় কংগ্রেস সরকার একে নিষিদ্ধ করে ফলে সারা কেরালায় আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কেরালা বিধান সভায় আলোচনা চলে এ নিয়ে। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রায় দেয়। বিস্ময়ের কথা নাটকে উগ্র কম্যুনিজমের প্রচার কোথাও নেই, বিভিন্ন 'ক্লিশে' এর মধ্যে আছে, উন্নত শিল্প সৃজন-ও এই নাটক নয়। তবু মলয়ালম ভাষায় এই নাটক ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে। নাটকের কাহিনী স্মরণ করা যাক। কেশবন নায়ার গ্রামের অত্যাচারী মহাজন ও ভুস্বামী। সে সবায়ের জমিজমা কেড়ে নিতে চায়, মুখের গ্রাসে টান মারে, গ্রামের মেয়েদের দিকেও তার নজর। আবার ক্ষয়িষ্ণু প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পরমুপিল্লা ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড়িয়েও কোন পরিবর্তন চায় না। তার ছেলে গোপালন কমিউনিস্ট পার্টি করে, চাষী কৃষক মজুররাই তার সঙ্গী সাথী। সে কেশবনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে। কিন্তু পরমুপিল্লা সহ্য করতে পারে না ছেলের কমিউনিস্টিক মতিগতি। কেশবন পরমুপিল্লার জমি ভিটেমাটি প্রায় প্রতারণা করে নিয়ে নেয়। কেশবনের মেয়ে সুমন বাবার এইসব অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ করে। কেশবন তাকে শাসন করে তবু তার প্রতিবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। সুমন ও গোপালন পরস্পরের অনুরাগী হয়ে ওঠে। নাটকীয় জটিলতা আরো বাড়ে যখন হরিজন খেতমজুর করম্বনের মেয়ে মালা গোপালনের অনুরাগিণী হয়। কেশবনের সঙ্গে গোপালনের সংঘাত তীব্র হয় গোপালনের নেতৃত্বে সর্বহারা মানুষের অধিকার রক্ষার প্রয়াসে। কেশবন নায়ারের গুণ্ডারা গোপালনকে আক্রমন ও আহত করে, সমস্ত গ্রামের লোক গর্জে ওঠে। শেষ আঘাত হানতে কেশবন ও শাসক গোষ্ঠী পুলিশ বাহিনী নিয়ে আসে এদের দমন করতে। সমস্ত মানুষ লাল ঝাণ্ডা তুলে ধরে প্রতিরোধের সামিল হয়, তাদের সামনে থাকে পরমুপিল্লা। সমবেত মানুষের মিছিল গর্জে ওঠে। জয়ী হয় মানুষের সংগ্রাম। অত্যাচারীর পরাজয় ঘটে।

তেপ্পিল ভাসীর 'মূলধনম' (১৯৫৮) কেরালার বিগত সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের যথাযথ চিত্র, বাস্তব ঘটনা এর ভিত্তি। ১৯৪৯-৫১-র উত্তাল সময়, শুরনাড ঘটনা তীব্রতর হয়ে উঠেছে, এক সাধারন মানুষ কুঞ্জুরামন (এই নাটকে রবি) শুরনাড মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ফেরার। তার পরিবারের ওপর দুঃসহ পীড়ন চলে—তার ছোট ঘরে যেন ভুমিকম্প হয়, সন্তানরা কোথায় হারিয়ে যায়, তার দশ বছরের মেয়ে ভার্গবী তিন বছরের ভাইকে নিয়ে ভিক্ষে করে। সন্তানদের খোঁজ করতে আসা কুঞ্জুরামন একদিন দেখে ভার্গবী তীব্র জ্বরে বেহুঁশ ও মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে পড়ে, পাশে অসহায় ছোট ভাই। কুঞ্জুরামন বাচ্ছাদের কাঁধে নিয়ে দুদিন চলে আসে কুলত্তুপ্পুল্লা পাহাড়ে গোপনে বাসকারী স্ত্রীর (নাটকে শারদা) কাছে। ঐ পাহাড়ে বাবা মেয়ের কবর খোঁড়ে। লৌকিক নিয়মানুসারে

ঐ সমাধিতে আধপাকা নারকেল রাখছে এমন সময় পুলিশ এসে পাহাড় ঘিরে ফেলে। এই বাস্তব ঘটনা নিয়েই 'মূলধনম' নাটক লেখা হয়েছে—লেখকের হৃদয় বার বার আপ্লুত হয়েছে, চোখ অশ্রু সজল হয়েছে গভীর বেদনায়।[৭] তোপ্পিল ভাষীর আরেক নাটক 'সর্বকুল্ম'ও শুরনাড ঘটনার ভিত্তি করে লেখা।

'অশ্বমেধম' (১৯৬৬) ভারতে কুষ্ঠ রোগের সমস্যা নিয়ে লেখা। সরোজম বিবাহের পূর্বে দেখে যে সে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত। চিকিৎসায় সে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত হয়, কিন্তু তার প্রেমিকের সাহস হয় না সরোজমকে গ্রহণ করতে। হাসপাতালে যে সহৃদয় ডাক্তার তাকে সারিয়ে ছিল তার সাহায্যে সমাজ স্বজন পরিত্যক্ত সরোজম বাঁচার পথ পায়—নার্সের কাজ সে গ্রহণ করে। নাট্যকার গভীর সহানভূতি ও সমবেদনার সঙ্গে এই রোগ ও রোগীদের কথা বলেছেন এবং কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মানুষদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষের পরিবর্তে সহানুভূতি জাগাতে চেয়েছেন।

তোপ্পীল ভাসী লিখেছেন অনেক। তিনি বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাস করেন ও এর দ্বারা মানুষের কল্যাণ হবে বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টীর দ্বন্দ্ব তাঁকে পীড়া দেয়। তিনি মনে করেন বিশেষ করে দুই কমিউনিস্ট পার্টির মিলন হওয়া দরকার তাতে দেশের ভাল হবে। তাঁর পরের নাটকসমূহ এই ভাবনা ব্যক্ত করে। আশির দশকে তিনি লিখলেন 'লেয়নম' (মিলন), 'সুক্কিক্কুকা ইডাদুবাসম পৌভুকা' (বাঁয়ে চলুন) ইত্যাদি। তাঁর 'কাইয়ুম তালিয়ুম পুরাতু ইডীরুদু' (১৯৮০ বাসের বাইরে হাত ও মাথা রাখবেন না) নাটক একটা বাস নিয়ে লেখা। বাস চলছে, অনেক যাত্রী, হঠাৎ ব্রেক ডাউন। যাত্রীরা তর্ক বিতর্ক করছে, সকলেই মতামত দিচ্ছে—কিন্তু বাস চলে না। এর একটা প্রতীকী অর্থ করা যায়। বিকল বাস আমাদের দেশ, চিৎকার ও কলহপরায়ন যাত্রীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা—কেউই পথ দেখাতে পারেনা। দেশ থেমে গেছে, রাজনীতিবিদরা অক্ষম। ১৯৮৫ সালে তেপ্পিল ভাসী সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার পেয়েছেন।

তোপ্পিল ভাসীর 'ওলিভিলে ওরমাগল' (সংগোপন স্মৃতি) তাঁর শেষ নাটক। এটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক নাটক নয়ের দশকে যা অভিনয় করে সাড়া ফেলে কে পি এ সি বা কেরালা পিপলস আর্ট ক্লাব। নাট্যকারের জীবনের কথা, দেশের সংগ্রামের কথা, প্রতিবাদী লড়াকু মানুষের কথা নাটকে আছে। লেখক নিজেকে সংগোপনে রেখেছেন; তবু জীবনের চিত্রণে, সমাজের রূপালেখ্য নির্ণয়ে, জয়পরাজয় মৃত্যুর বেদনা ও অস্তিত্বের উজ্জ্বল উদ্ভাসে, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জয়ে আর অধিকার প্রতিষ্ঠার উল্লাসে এক সমাজসচেতন সংবেদনশীল এবং প্রগতিশীল শিল্পীর পরিচয় একান্ত হয়ে প্রকাশ পায়। নাটকের সূচনায় ও পরিণামে ভরতবাক্য উচ্চারণে লেখক ঐতিহ্যনিষ্ঠ; কিন্তু জমিদার জোতদার পুলিশ গুণ্ডা চাষী এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের সমন্বয়ে এক তীক্ষ্ণ ধারালো জীবনচিত্র ও সংগ্রামের ভাষ্য নাটকটিকে অনন্য করে তুলেছে।

পি কেশব দেব (১৯০৫ - ১৯৮৪) কথাশিল্পী রূপে অনন্য, নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। রাজনৈতিক টানাপোড়েনে অস্থির উন্মথিত কেরালার সমাজ ও জীবন তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে, সঙ্গে সঙ্গে মানবহৃদয়ের গভীর জটিল অনুভূতিগুলিকেও তিনি প্রকাশ করেছেন সংবেদনশীলতায়। ব্যঙ্গবিদ্রুপে তিনি দক্ষ—সমাজ রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে অন্যায় অবিচার অসংগতি দেখেছেন সেখানে তাঁর ব্যঙ্গ ঝলসে উঠেছে। বারটি পূর্ণাঙ্গ ও সাতটি একাংক লিখেছেন কেশব দেব।

কেশব দেবের নাট্যযাত্রা শুরু হয় দুটি সঙ্গীত নাটক দিয়ে 'সুহরুত' (বন্ধু) ও 'জাতি'

এই নাটকদুটির তিনি লেখক ও পরিচালক। 'নাটককৃৎ' (নাট্যকার ১৯৪৫) ব্যঙ্গ নাটক-তদানীন্তন পেশাদার মঞ্চের দুর্নীতি অশালীনতা অপদার্থতা নিয়ে লেখা। 'প্রধানমন্ত্রী' (১৯৫১), 'মুন্নোট্টু' (অগ্রণী ১৯৫৩) রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নাটক। 'তস্কর সংঘম' (১৯৫০) নাটকে নেতাদের আক্রমণ করা হয়েছে যারা বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে নিজেদের আখের গোছাবার জন্য।

কেশব দেবের 'এগ্রানিপ্পন কমিউনিস্টাভুম' (আমি কমিউনিস্ট হব ১৯৫৩) রাজনৈতিক ব্যঙ্গনাটকের এক তীক্ষ্ণ নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে তোপ্পিল ভাসীর 'নিঙ্গল এন্নে কমিউনিস্ট আক্কি' নাটকের প্রতিবাদেই এটা লেখা হয়—চাপান উতোরের খেলায় কেরালার নাটমঞ্চ জমে ওঠে। নাটকের নামকরণ হয়েছে নাটকের একটা ঘটনা থেকে যেখানে চায়ের কাপ ভাঙার জন্য বাড়ির দাসীকে তিরস্কার করলে সে ভয় দেখায় যে সে তক্ষুণি গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবে। নাটকের চরিত্রদের নাম গোপালনভ ও শঙ্করিলা — ওরা যেন রাশিয়ান। একজন প্রগতিশীল লেখকের নাম জর্জ চৌ চুন যার গল্পে কমিউনিস্ট প্রচারমূলক কাহিনীর ক্যারিকেচার। কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় এলে জমিদার কম্যুনিস্ট হয়ে যায় প্রজাদের উচ্ছেদের জন্য। ইলেকশনের হৈ হট্টগোল, ঝঞ্ঝাট ঝামেলা, রাজনৈতিক দলগুলোর নির্দল প্রার্থীদের কিনে নেবার প্রয়াস—সব কিছুকে তুলে ধরা হয়েছে নাটকে।

পোনকুন্নম বার্কী রচিত 'বিশারিককু কাট্টু ভেনটা' (পাখার হাওয়া চাই না ১৯৫৮) শ্রেণী সংঘর্ষের চিত্র, জমির দখলের জন্য লড়াই-এর নাটক। জমি মালিক কুরুপের ছেলে ভার্গবন পিতার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে চাষীদের পক্ষ অবলম্বন করে ও তাদের এক মেয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। কেরলে প্রথম কমিউনিস্ট রাজত্বে জমিদারদের ধানজমি থেকে ভাগচাষী প্রজাদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আইন তৈরী হয়। নাটকে দেখানো হয়েছে কিভাবে জমিদাররা ধানখেতে রবার চাষ করে আইনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে।

টি এন গোপীনাথন নায়ার কমেডির সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস নাটক লিখেছেন। ইবসেনীয় ধারার অন্যতম প্রবর্তক তিনি। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল 'নীলাভুম নিঝালুম' (জ্যোৎস্না ও ছায়া) 'অকভূম পুরভূম' (ভিতর বাহির ১৯৪৮), 'স্বপ্ন মেখলা' (১৯৫৩) ইত্যাদি। তার 'পশ্চাদপসারন' (১৯৪৯) তীব্র ব্যঙ্গ করে কেরালায় শিল্প সংস্কৃতি ঐতিহ্যের জোয়ারকে যা মহামারীর মত আচ্ছন্ন করেছিল কেরালার সমাজ জীবনকে। বিশেষত লেখাপড়া জানা মেয়েদের। এই নাটকে মেয়েরা চায় প্রাচীন কালের মত কালারি বা অসি ও অন্যান্য যুদ্ধ বিষয়ক ক্রীড়ায় দক্ষ প্রেমিক যারা কবিতার লাইন বলবে, আবার কথাকলিতেও দক্ষ। এমন কি বিয়ে করতে তারা আসবে মোটর গাড়িতে নয়, পুরোনো দিনের মত ঘোড়ায় টানা শকটে। 'পরীক্ষা' ১৯৬৫ নাটকে পরীক্ষায় নম্বর বাড়নোর পদ্ধতিকে তীব্র আঘাত করা হয়েছে ও সেপ্রসঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্বও চিত্রিত হয়েছে। বিবেক সম্পন্ন পরীক্ষক জনার্দনন পিল্লার ওপর স্বজন প্রিয়জনের প্রচন্ড চাপ আসে একজনের পরীক্ষার নম্বর বাড়াবার জন্য। কিন্তু জানার্দনন নিজ আদর্শে স্থির থাকে অপরের আদর্শ বোধকে জাগ্রত করে।

কে সুরেন্দ্রন (১৯২১) নাটক লিখেছেন পরিবার ও সমাজের সংকটের ওপর ভিত্তি করে। বিবাহ জীবনের এক জটিল অধ্যায়, কিন্তু তা বৈপরীত্য সৃষ্টি করে একদিকে রোমান্টিক ব্যক্তি- কামনায় অন্যদিকে পরিবার ও সমাজের প্রতি কঠিন দায়িত্ব বোধে যার ভিত্তিভূমি মধ্যবিত্তের ভঙ্গুর অর্থনীতি। এর ফলে নরনারীর হৃদয় রক্তাক্ত হয়, মানবজীবন সুকঠিন আঘাতে জর্জরিত হতে থাকে, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই আত্মত্যাগ ও দায়িত্ব পালন সেই প্রত্যাশিত মর্যাদা পায় না। জীবনের এই ব্যথা বেদনা দ্বন্দ্ব জটিলতার

চিত্র এঁকেছেন কে সুরেন্দ্রন তাঁর নাটকে। 'বলি' (১৯৫৩) নাটকে মাধবী ও গোবিন্দন পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসলেও মাধবী গোবিন্দনকে প্রত্যাখ্যান করে কারণ বোন সুকুমারী ও ভাই কুঞ্জুকৃষ্ণণকে মানুষ করতে হবে। কিন্তু উত্তরকাল মাধবীর আত্মত্যাগকে মূল্য দেয় না। তাই ভাই নিজের বিয়ে ও সুখের জন্য মাধবীকে ছেড়ে যায়। সুকুমারীও বিয়ে করে ঘর সংসার করছে — মাধবী গুরুতর অসুস্থ হলে ও সে আসার সময় পায় না। বৃদ্ধ বিপর্যস্ত শিক্ষক গোবিন্দন তার আর্থিক দূরবস্থা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের আশায় লেখাপড়া শেখাচ্ছিল মেয়ে দেবকীকে কিন্তু সেও বাড়ি থেকে চলে গিয়ে বিয়ে করে। মাধবীর মৃত্যুশয্যায় দেবকী এলে মাধবী তাকে প্রসন্নভাবে নেয় কারণ সে মাধবীর মত ভুল করেনি।

'পলঙ্কুপাত্রম' (স্ফটিক পাত্র ১৯৫৭) নাটকও এই সমস্যার তীব্র বেদনার্ত ট্রাজিক ছবি। কমলাম্মা বাড়ির ঠিক করা যোগ্য সমৃদ্ধ পাত্র ছেড়ে এক সাধারন যুবকের সঙ্গে চলে যায় যে অকালে মারা গেলে কমলাম্মা মেয়ে সতীকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়ে। অসহ্য দুঃখ দরিদ্র সত্ত্বেও মা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে চায়। এক বদমায়েশ শয়তান কান্ননকর সতীর গৃহশিক্ষক হয়ে আসে ও প্রশ্নপত্র চুরী করেও সতীকে পরীক্ষায় খুব ভাল করিয়ে দেবে বলে। মেয়ের সুখের জন্য মা তার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সতীও প্রতারিত হয় ও গর্ভবতী হয়। এক ঝটিকা-ক্ষুব্ধ দৃশ্যে সতী তার মাকে অভিযোগ করে বলে যে তার মোহাচ্ছন্নতার জন্যই সতী আজ ভাল বাড়ি যোগ্য পিতা যথাযথ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কমলাম্মার সারা জীবনের দুঃখ বেদনার কোন মূল্য থাকে না, সতীও আত্মহত্যা করে।

'অরক্কিলম' (লাক্ষা ঘর) দেখিয়েছে সমাজ ব্যবস্থা কিরকম দাহ্য ও ধ্বংসোম্মুখ হয়েছে। ধনবতী মহিলার প্রথম পুত্র প্রচলিত প্রথায় কৃষিকার্য করে, দ্বিতীয় জন ফ্যাক্টরি করেছে ও তৃতীয় জন শ্রমিক নেতা। সম্প্রসারনের জন্য ফ্যাক্টরি অধিকার স্থাপন করতে চায় কৃষিক্ষেত্রের উপর — দু ভাইয়ে সংঘাত লাগে, তৃতীয় ভাই শ্রমিক নেতাও দুজনকে বিপদগ্রস্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রিত হয় মহিলার ব্যক্তি জীবনের জটিলতা, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক, তৃতীয় পুত্রর জনকত্ব নিয়ে সন্দেহ যে প্রসঙ্গ নাটক জটিল করেছে।

সি জে টমাস (১৯১৭-১৯৬০) নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। মননশীলতার যথার্থ প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখা যায়। সফোক্লেস থেকে স্ট্রিন্ডবার্গ পর্যন্ত পাশ্চত্য নাট্যকাররা তাঁর মানস পরিমণ্ডল রচনা করেছে, তাঁকে নবতর শিল্পরূপ সৃজনে প্রয়াসী করেছে। মানবহৃদয়ের জটিল গভীর অনুভূতিগুলিকে তিনি উপলব্ধি ও প্রকাশ করেছেন, সমসাময়িক সমাজ জীবনের ছায়াসমপাতও ঘটেছে তাঁর নাটকে।

সি জে টমাসের 'অবন বিণ্ডুম বরুনু' (১৯৪৯, ও আবার আসবে) মানব অস্তিত্ত্বের বেদনাযন্ত্রণা দাহর চিত্র। বিয়ের পরই মাত্তুকুট্টী সৈন্য দলে যোগ দিয়ে চলে যায়। চার বছর তার বৌ সারাম্মা বা মা তার পাঠানো টাকায় বেঁচে থাকে। যুদ্ধে মাত্তুকুট্টী তার দু চোখ হারিয়ে ফিরে আসে। এসে দেখে তার বন্ধু কুঞ্জুবর্কীর সঙ্গে সারাম্মার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এতদিন কুঞ্জবর্কী এদের কাছে আসতে আসতে সংসারের প্রয়োজনে জড়িয়ে যেতে যেতে স্বামী সঙ্গ বঞ্চিত সারাম্মার সান্নিধ্য পেতে পেতে তাদের নৈকট্য হয়েছে ও পরিনামে সারাম্মা গর্ভবতী হয়েছে। নিঃসঙ্গ অসহায় চক্ষুহীন মাত্তুকুট্টী বেঁচে থাকার কোন মানে খুঁজে পায় না। সে এক বোমা তৈরীর কারখানায় কাজ নেয় ও বিস্ফোরণে মারা যায়। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় সারাম্মা এক শিশু সন্তানের জন্ম দিয়েছে। য়ুরোপীয় নাটক প্রভাবিত মানব জীবনের যুদ্ধের ভয়াবহ পরিনামের কথা বলা হয়েছে নাটকে, তার সঙ্গে

সঙ্গে মানব চরিত্রের অনন্ত বৈচিত্র্যের উন্মোচন, মানব হৃদয়ের দুরবগাহ গভীরতার উপলব্ধি এখানে পাওয়া যায়। মাত্তুকুট্টীর হৃদয় যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত তবু সে ক্ষমা করে সারাম্মাকে কারণ তার অবহেলা উপেক্ষাই সারাম্মাকে নিয়ে গেছে অপরের কাছে। এক প্রবল অপরাধবোধ সারাম্মাকে কুরে কুরে খায়—সে স্বামীকে প্রতারণা করেছে পাপ করেছে, তবু কুঞ্জুবর্কীকে সে দায়ী না করে রক্ষা করতে চায়; কুঞ্জু বর্কীর সন্তান ধারন করেছে সারাম্মা তবু সে আবেগ উদ্বেল মুহূর্তে নবজাতককে বলে—'আমার ছোট্ট মাত্তুকুট্টি'। এক অদ্ভুত উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তি নাটকে সারাক্ষণ বাইবেলের বাণী ঘোষণা করে যায় —'ও আবার আসবে, আপন দীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা কর।' পৃথিবীর পাপ যখন পূর্ণ হবে তখন ঈশ্বর পুত্র আবার আসবেন, সেদিন শেষ বিচারের দিন। বাইবেলের গম্ভীর মন্দ্রিত ধ্বনি সুপবিত্র মহান ভাবনায় কাহিনী বিন্যস্ত হয়ে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

'বিষবৃক্ষম' নাটক রাজনৈতিক মোহভঙ্গের নাটক। কেরলে বামপন্থী সাম্যবাদী দল শাসন চালাচ্ছে, অনেক কষ্ট ও সংগ্রাম করে তারা শাসনের অধিকার পেয়েছে, তাদের আদর্শবাদী নেতারা জনগনের কল্যাণ চায়। কিন্তু ক্ষমতা পাবার পর সব পালটে যায়, নেতারা আপন কর্তব্য ভোলে --- ক্ষমতালোভ অর্থলাভ স্বার্থ সিদ্ধি তাদের কাছে এখন প্রধান বিষয়, এখন সরকার কিষান মজুরের নয়। জনগন এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করে। সাম্যবাদ গরীব ও শোষিতের কাছে কল্পবৃক্ষের সমান, কিন্তু পরিনামে তা হয়েছে বিষবৃক্ষ।

'১১২৮ লে ক্রাইম ২৭' (১১২৮ এর ক্রাইম ২৭, ১৯৫৪) নাটক শিল্পকৌশলের দিক থেকে অভিনব, বক্তব্যও জোরালো। নাট্যকারের মনকে ছুঁয়ে গেছে ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটক এবং আধুনিক কালের পিরানদেল্লো ও ব্রেখট। গুরু তার শিষ্যকে সত্য শিক্ষা দেবে ও সে পরিচালক হয়ে নাটকটি উপস্থাপিত করে। নাটকের মধ্যে নাটক সুরু হয়। দুই চুনভাটি কর্মী মার্কোস ও বার্কির মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে--মার্কোসের ধারণা তার বউ এর সঙ্গে বার্কি প্রেম করছে। অতঃপর মার্কোসকে চুন ভাটায় ফেলে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয় বার্কির বিরুদ্ধে কারণ মার্কোসকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ কেস নম্বর হল ক্রাইম ২৭ অফ ১১২৮। সমস্ত সমাজ এই অপরাধের বিরুদ্ধে। শিক্ষক নির্দেশকের বক্তব্য এই যে সমাজের আগ্রহ মৃত্যুতে নয়, খুনে; একটি সত্তার বেদনার্ত বিনাশ নয় একজনের হত্যায় যার পুনরাবৃত্তি হতে পারেঃ এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকেই স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। এরকম অপরাধ না ঘটলে বাদী ও প্রতিবাদী উকীল এবং বিচারকের কোন কাজ থাকবে না। বার্কি আত্মহত্যার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে বাঁচায় ওষুধপত্র দিয়ে। কিন্তু সেরে ওঠার পর পুলিশ তাকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে ও বলে যে সে হার্টফেল করেছে। শিষ্য সাংবাদিক হয়ে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশ করে প্রচুর পয়সা পায়। চুনভাটির মালিক ক্ষতি পূরণ বাবদ মার্কোসের বউকে দেয়। কিন্তু মার্কোস প্রকৃতপক্ষে চুন ভাটি থেকে পালিয়েছিল ও বার্কির ফাঁসীর অপেক্ষা করছিল। সে এখন বউ-এর কাছে আসে টাকা নিতে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সেই টাকা দেওয়া হবে না। সে পরিচালককে অনুরোধ করে যে কোন ভাবেই হোক টাকাটা দিতে। কিন্তু পরিচালক বলে যে গোটা ব্যাপারটাই একটা নাটক এবং তার উদ্দেশ্য ছিল অভিনয় করে টাকা পাবার ও তা সে পেয়েছে।

তিক্কোডিয়ন (১৯১৬-২০০১) এক বিশিষ্ট নাট্যকার। নাটক রচনায় ও পরিচালনায় সুদক্ষ। তাঁর নাটকে পারিবারিক জীবনের ছবি সুন্দর ফুটেছে, সামাজিক বৈশিষ্ট্যও ধরা

পড়েছে। আজীবন সংগ্রামী নাট্যকার জীবনকে শুদ্ধ সমুজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন। মূলত নাট্যকার তথাপি ভ্রমণ ও স্মৃতিকথাও লিখেছেন। তার বিখ্যাত নাটক হল—'পুষ্পবৃষ্টি', 'পুদুপড়ম' (হঠাৎ নবাব), 'কন্যাদানম', 'জীবিতম', 'পনক্কিডি' (৭২, টাকা ভর্তি ব্যগ) 'তিরুোডিয়ন্টে নাটকঙ্গল' (৮৬, তিরুডিয়নের নাটকসমূহ), 'প্রসবিক্যাথা আম্মা' (না বিইয়ে মা) ইত্যাদি।

এন এন পিল্লা (১৯১৮—১৯৯৬) নাট্যকার অভিনেতা এবং পরিচালক এই তিন রূপেই বিশিষ্ট ও সমুজ্জ্বল। তাঁর নাটকে জীবনের গভীর প্রত্যয় থাকে, সমাজের ক্রুটি বিচ্যুতি অন্যায় বিচারের উদঘোষণ থাকে, এবং অভিনেতারূপে তিনি বিদ্রূপ করেন আঘাত হানেন রাজনৈতিক নেতাদের ভ্রষ্ট আমলাদের ও সমাজ-পরজীবীদেব। তিনি বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী, নাস্তিক, প্রাচীন নীতি সংস্কারের প্রবল বিরোধী। তাঁর বোধ হয় এটাই বিশ্বাস যে সত্যর সূচনা ঈশ্বর বিরোধিতা থেকে। তিনি ইবসেন, শ, সার্ত্রর, সরোয়ান প্রমুখ পাশ্চাত্য নাটকারদের অনুরাগী। মঞ্চ রূপায়ণেও তিনি সবিশেষে দক্ষ।

এন নারায়ন পিল্লা ১৯৩৮ এ জীবিকার সন্ধানে মালয় যান। সেখানে নেতাজীর আই এন এ-র সান্নিধ্যে আসেন ও সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর সাহিত্য চেতনাব বিকাশ ঘটে। ১৯৪৪ বর্মার মেরগুইতে তাঁর প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয়—'তাঁতিয়া টোপী'। এরপব রেঙ্গুনে অভিনীত হয় 'কুরবানী' যেটা স্বয়ং সুভাষচন্দ্র দেখেছিলেন।[৭] কেবালায় ফিরে তাঁব নাট্য চর্চা অব্যাহত থাকে। তিনি কুড়িটির বেশী পূর্ণাঙ্গ লিখেছেন, তাঁর একাংক সংকলন পাঁচটি ও নাটকের আলোচনা লিখেছেন 'নাটক দর্পণম'।

'প্রেতলোকম' (১৯৬৫) নাটকে ভবঘুরে অনিকেতদের সঙ্গে মেনন-এব মত উঁচুতলাব মানুষের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন যাদের আদর্শের বাগাড়ম্বর ও কার্যক্ষেত্রে স্বার্থপরতার মধ্যে তফাত অনেক। এই ভাণ্ডামির প্রতি লেখকের আক্রমণ। মেননেব ভাইপো রাঘবনের মধ্যে এই ভণ্ডামির ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয।

'ঈশ্বর অ্যারেস্টিন' (১৯৬৭) নাটকে স্বর্গনরক দুদিকে যাবার বন্ধ দরজা দেওয়া এক ঘরে নাটকের শুরু। আইনস্টাইন সেখানে চিন্তা করছে যদিও সে মৃত। শয়তান ও ভগবান আসে, শয়তান বলে যে সে ভগবানের যমজ ভাই ও অগ্রজ এবং সে সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের অধ্যাপক ছিল পরে রাজনীতিতে যোগ দেয় এবং সমস্ত ইতিহাস হচ্ছে তার ও তার ভাইদের মধ্যে ভোট প্রতিযোগিতা। নাটক বিভিন্নধরনের চরিত্র এসেছে—ধর্ম প্রচারক, হিন্দু ভক্ত, এক মুসলমান মেয়ে ও একটু শিশু—যারা মরে গেছে ও নারীরূপিণী মৃত্যু তাদের নিয়ে আসে। তত্ত্বনাটক অ্যাবসার্ডিটি ও লোককমেডির হাস্যরসাত্মক সংমিশ্রণ নাটকে আছে। 'মরণনৃত্যম' (১৯৬৭) নাটকে বলা হয়েছে মানুষের শয়তান সত্তার কথা যাকে সহজে পরাভূত বা রুদ্ধ করা যায় না। তাম্‌পি তার দীর্ঘজীবন কাটিয়েছে অনৃত ভাষণে, অপরকে ও নিজেকে প্রতারণায়। সম্পূর্ণ হতাশ ও মোহহীন অবস্থায় সে আত্মহত্যা করে। অন্তিম মুহূর্তে এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তার মৃত্যু হয়েছে না বুঝে তার প্রতারিত প্রণয়িনী তাকে চাবুক মারে, তার জারজ পুত্র তাকে ছুরিকাঘাত করে, মেয়ে বিষাক্ত পানীয় তৈরি করে ও জামাতা তাকে গুলি করে।

'আ মরেম' (১৯৭০) এক অসাধারন একাঙ্ক। এক কাঠুরিয়া গাছ কাটার সময় একটা মেয়ের ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসে যে এক বছর আগে তার প্রেমিকের সঙ্গে ঐ গাছে ঝুলে মরেছে। কিন্তু মেয়েটি বলে যে ওর মা ও প্রেমিক তাকে হত্যা করেছে, যদিও সে জানে না তার প্রেমিক কীভাবে মরেছে। সে চলে গেলে ছেলেটি এসে বলে যে তার বাবা ও মেয়েটি

তাকে মেরেছে যদিও সে জানেনা মেয়েটি কেন মরল। সে চলে গেলে মেয়েটির বৃদ্ধ মা ও ছেলেটির বৃদ্ধ বাবা এল। বাবা বলল যে মেয়েটি তার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য ছেলেকে দায়ী করায় সে আত্মহত্যা করেছে। মেয়ের মা বলে যে বৃদ্ধর ছেলে তার মেয়েকে গর্ভবতী করায় সে লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে। কাঠুরিয়া দেখল যে গাছের ডালটি এত নিচু যে যে কেউ ঝুলে মরতে পারে এবং সে বলে যে সেই রাতে চাঁদের আলোয় সে দেখেছে, যে বড় মানুষের বাড়িতে ছেলে মেয়েটা কাজ করত সে বাড়ি থেকে ভাড়াটে খুনীরা দুটো বস্তা নিয়ে আসছে ও মালিক সবকিছু তদারকী করছে। কিন্তু বৃদ্ধ বলে যে সেদিন ছিল অন্ধকার রাত ও বৃদ্ধা বলে যে মালিক সেদিন মাদরাজে ছিল। কিছু পরে গাছ চাপা পড়ে কাঠুরিয়া মারা যায়। নাটকটিতে জাপানী ফিল্ম কুরোসআ নির্মিত 'রশোমন'-এর ছায়া আছে।

'কাপালিক' নাটক-এ এন এন পিল্লার সমাজ সচেতন দুর্বার মানসিকতার পরিচয় ফুটেছে। এই নাটক অসংখ্য অভিনীত হয়েছে। নাটকের নায়িকা এক মলয়ালী নারী যে পেশায় বারাঙ্গনা ও বোম্বাইতে অভিজাত জীবন যাপন করে। নায়ক অনেকে যারা মুখোশ পরে ভদ্রভাবে সমাজ ঘুরে বেড়ায় : প্রকৃতপক্ষে সমাজই এর প্রধান চরিত্র। যে সমাজ ব্যবস্থা একটি মেয়েকে নিতান্তই যৌন তৃপ্তির উপাদান রূপে দেখে কিন্তু বাইরে পবিত্রতা ও মহত্তের ভান করে তারই ছবি এঁকেছেন নাট্যকার। নাটকের একটা অংশ উল্লেখ করা যায় যেখানে এক পুরোহিত নায়িকার কাছে যায় উদ্ধার আশ্রমের জন্য টাকা চাইতে। তারপর—

কাপালিক—কী হয়েছে প্রভু?

পুরোহিত—আমার দুঃখ হচ্ছে।

কাপালিক—কেন?

পুরোহিত—কেন না তুমি এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছ।

কাপালিক—আমি তো নিজে আসিনি, আমাকে টেনে এনছে।

পুরোহিত—কে?

কাপালিক—কেউ একা নয়, গোটা সমাজ। যে সমাজ আপনার গলায় পৈতে পরিয়েছে সেই আমার শায়ার দড়ি খুলেছে।

নাট্যকার নির্মম নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে এঁকেছেন জীবনের ছবি। কাপালিক রোমান্টিক নায়িকা নয়, জীবনের কঠিন ধাতব পটে ঘা খেয়ে খেয়ে সে তীক্ষ্ণ তীব্র হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে প্রখর। বার্ণার্ডশ-র মিসেস ওয়ারেন্‌স প্রফেশন এর মত এটাই তার পেশা, বাঁচার পথ। নাটকের বক্তব্য তীব্র প্রখর।

এন এন পিল্লার 'মন্বন্তরম' আঙ্গিক ও বক্তব্যে অভিনব। একটা দল স্টেজে দাঁড়িয়ে, তারা যেন অজন্তা গুহা দেখতে এসেছে, তাদের নাম পোশাক-পরিচ্ছদ স্বাভাবিক। সহসা ১৯ নং গুহার সামনে কি ঘটে যায়—এক প্রাচীন অলৌকিকতা তাদের ওপর নেমে আসে। তারপর ঘটে নতুন নাটক। যে সব ভাস্কররা এই সব অসাধারণ মূর্তি গড়েছে তারা যেন প্রকৃতপক্ষে দাস, শিল্পের তথাকথিত পৃষ্টপোষক রাজারা তাদের বন্দী করে রেখেছে। একজন শিল্পী শতগুণম এগিয়ে আসে, তার পা শৃঙ্খলাবদ্ধ। তার শৃঙ্খল ভেতরে ষ্টেজ পর্যন্ত টানা—হয়ত তার দীর্ঘ যুগযুগান্তের শৃঙ্খল বন্ধনকে নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন। সেই ভাস্কর আধুনিক শিল্পীদের—যারা অজন্তা দেখতে এসেছে—বলে সে তাদের দেহ শৃঙ্খলিত, মন নয়।

এন নারায়ণ পিল্লার 'এন. ও. সি.' (N. O. C. ১৯৮৩) সাম্প্রতিক দেশের এক সংকট নিয়ে লেখা—আরব দেশে ভারতীয়দের যাওয়া। চাকরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেতে কিছু লোক আরবে যেতে চায়। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের লোকেরা প্রতারিত হয় এক ব্যক্তিব দ্বারা যে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল সব ব্যবস্থা করবে এবং এন ও সি বা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এনে দেবে। এই আপাত লঘু কিন্তু প্রকৃতই গুরুতর অন্যায় কাজ কীভাবে একটা পরিবাব ও মানুষদের ভয়াবহ সংকটাপন্ন করে নাটকে তাই দেখানো হয়েছে।

পি জে এন্টনী (১৯৩১ - ১৯৮০) কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির কর্মী। চিরকাল সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। তিনি উচ্চমানের অভিনেতাও বটেন। 'নির্মাল্যম' বইতে অভিনয়েব জন্য ভরত পুরস্কার পান। IPTA, KPAC প্রভৃতি নাট্য গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ ছিল। নাটকের মধ্যেও তিনি সাম্যবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর অজস্র নাটকের মধ্যে স্মরণীয় 'নাঙালয়ুডে মানু' (আমার মাটি) যা ভূস্বামী ও ভূমিহীনদের সংঘাত ও সমস্যার ওপর ভিত্তি করে লেখা। চাষী বন্ধ্যা জমিকে কঠোর পরিশ্রমে বাসযোগ্য করে তুললে জমি মালিক তাদের উৎখাত করতে চায়। জমিদারের ছেলে কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করে এবং এক গরিব চাষীর মেয়েকে বিয়েও করে। তার পরিবারের লোকজন ছেলেকে বিতাড়িত করলেও চাষীদের উৎখাত করতে পারে না কারণ তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ায়। 'ইনকিলাবিন্টে মককল' (ইনকিলাবের ছেলে) সমাজ সচেতন নাটক যাতে সাধারণ মানুষ কীভাবে পরিবেশ পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকটে পড়ে ও অসহায় হয়ে যায় তারই চিত্র আঁকা হয়েছে।

এস এল পুরম সদানন্দন (১৯২৭) যথার্থই জীবনশিল্পী রূপে অভিহিত হতে পারেন। প্রায় কুড়িটি নাটক তিনি লিখেছেন। রাজনীতি অবলম্বন করে নাটক লিখলেও মানব হৃদয়েব গভীরে তিনি অবগাহন করেছেন ও চিরন্তন আবেগ অনুভূতি জটিলতার উন্মোচন করেছেন।

তাঁর 'সত্রম' নাটক সাম্যবাদী সিদ্ধান্ত ও আদর্শের প্রতিপাদন। কেরলে সাম্যবাদী শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। এতাবৎকাল কেন্দ্রীয়নীতিতে সরকার বিব্রত ও জনগণ বিপর্যস্ত হত; নতুন সরকার ও নেতা জনগণের হিতৈষী, শ্রমিক কৃষকের মুক্তিকামী। সাম্যবাদী আদর্শের যাথার্থ কথিত হয়েছে এই নাটকে।

নরনারীর জীবনের জটিল রহস্য ও যৌন সম্বন্ধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে 'কুরচ্চ রিয়ুকা এরে বিশ্বাসিক্কুকা' (অল্প জান বিশ্বাস রাখো অনেক, ১৯৬০)। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও শ্রীধরন বিয়ে করে লীলাকে যার চরিত্রের খুবই অখ্যাতি। শ্রীধরন বিয়ে করে লীলাকে এবং শুরু হয় প্রবল সংকট। শ্রীধরন বন্ধু গোপীর কাছে লেখা লীলার চিঠি পায় যাতে দেখা যায় লীলা-গোপীর অত্যন্ত অবৈধ সম্পর্ক ছিল। শ্রীধরন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। কিন্তু গোপী বলে যে সে শ্রীধরনকে অনেক কিছুই বলেছিল লীলা সম্বন্ধে। সে আরও বলেছিল যে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুললে শ্রীধরনের বিবাহ জীবন সুখের হবে এবং তাই সে শ্রীধরনকে বলেনি লীলার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা। গোপী আরও বলে যে শ্রীধরনের অতীত খুব ভাল নয়। কিন্তু শ্রীধরন বলে পুরুষের অতীত কলংক আর নারীর এক নয়। লীলা তার অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তার স্বামী ও পরিবারকে গভীরভাবে পেতে চায় ভালবাসতে চায়। কিন্তু শ্রীধরনের অত্যাচারে বিপর্যস্ত লীলা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। যাবার আগে সে নির্মম প্রতিশোধ নেয়। সে বলে যে

শ্রীধরনের ভাইও তার অন্যতম প্রেমিক ছিল। সে আরো জানায় যে শ্রীধরন তার সন্তানের পিতা নয়। লীলার এই আত্মগ্লানিকর অভিযোগ হয়ত মিথ্যা কিন্তু প্রতিশোধ বাসনায় সে শ্রীধরনের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস রোপণ করে দেয়। জীবনের এই সুতীব্র সঙ্কটের প্রকাশ নাটকটি।

'অগ্নিপুত্রী' (১৯৬৯) নাটকেরও মূল বিষয় এরকম। আদর্শবাদী রাজেন্দ্রন এক উদ্ধার আশ্রমের মেয়ে সিন্ধুকে বিয়ে করে। সিন্ধু রাজেন্দ্রনকে গভীর ভালবাসলেও এই বিবাহের বিরোধী ছিল কারণ এর পরিনাম সুখের হবে না। রাজেন্দ্র অত্যন্ত আহত হল যখন সে জানল যে সিন্ধু ছিল তার বন্ধু বালচন্দ্রনের প্রণয়িনী। আর এক আঘাত তাকে বিমূঢ় করল যে তার ভাই জয়দেব—যে সিন্ধুকে ঘরে আনবার প্রবল বিরোধিতা করেছিল—সিন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। প্রকৃত পক্ষে জয়দেবের পালিতা কন্যা বিন্দু জয়দেব-সিন্ধুরই মেয়ে। প্রচন্ড মানসিক আঘাত সত্ত্বেও রাজেন্দ্রন সিদ্ধান্ত নেয় যে সিন্ধুকে তার স্ত্রী মর্যাদা দেবে, কিন্তু সিন্ধু বিষপানে আত্মহত্যা করে। নাটক হিসাবে প্রথমটি উন্নত হলেও চরিত্রায়নের গভীরতা এই নাটকে বেশি। শ্রীধরনের অস্থিরতা দোদুল্যমানতার থেকে রাজেন্দ্রনের আদর্শবাদ ও সাহস অনেক প্রবল, লীলার তুলনায় সিন্ধুর মহত্ত্বও বেশি। লীলার মত নির্মম প্রতিশোধ বাসনার পরিবর্তে আত্মবিনাশের দ্বারাই সে রাজেন্দ্রনের জীবনের অশান্তি জটিলতা প্রশমিত করে।

কে টি মুহম্মদ (১৯২৯) আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। তিনি অন্তত ৬০টি নাটক লিখেছেন যেগুলি সবই মঞ্চস্থ হয়েছে। কে টি মুহম্মদ বক্তব্য ও অঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা মলয়ালম নাটককে সমৃদ্ধ করছেন নিয়ত। সমাজব্যবস্থার এক নিখুঁত নিপুণ চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন এবং যে সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজের প্রগতিশীলতার পরিপন্থী তাকে তিনি তীব্র আঘাত করেছেন। ঘটনা ও পরিস্থিতি দ্বারা নাটকীয়তা সৃষ্টিতেও তিনি দক্ষ। তার প্রথম নাটক 'উরুম পেরুম' (১৯৫০)। তারপর 'কারভাট্টা পশু' (দুধ না দেওয়া গরু) নিয়ে কে টি মুহম্মদ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। ১৯৫৩ সালে কোশিক্কড-এ প্রথম নাট্যোৎসবে তিনি প্রথম পুরস্কার পান।

'ইথু ভূমিয়না' (এই ভূমি ১৯৫৫) নাটকে প্রাচীনপন্থী মুসলিম সমাজের গোঁড়ামি সংস্কার জড়তা প্রথাবদ্ধতার ওপর প্রবল আঘাত করেছেন। এই রীতিনীতি আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধেছে সমাজকে বিশেষ করে নারীদের যারা বাইরে যাবে না পর্দানশীন হবে, লেখাপড়া শিখবে না, শাড়ি পরবে না, সিনেমা দেখবে না। এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। নাটকের মালিক চরিত্র সেই সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামীর প্রতীক এবং সে নিজের বড় ছেলে ঔকরকিয়া-কেও সেই মত তৈরি করেছে—রোজা রাখা নামাজ পড়া দোকান খোলা কাজ কারবার করা তারা সবই করে। তবে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য ইনকাম ট্যাক্সের খাতার কারচুপিতে-ও তারা দক্ষ। বাবা দ্বিতীয় পুত্র হাসান ও মেয়ে কদীসার ওপর জোর শাসন চালাতে চায়, কিন্তু বাবাকে প্রবল ভয় করলেও নিঃসংশয় আনুগত্য বোধ হয় এদের দুজনের নেই। তারা খালিদের ভক্ত ও অনুরাগী। গোলমালটাই পাকিয়েছে মালিকের ভাই উদার হৃদয় ওসমানের তেজী বুদ্ধিমান সহৃদয় ও সংস্কারমুক্ত ছেলে খালিদ যে একটি প্রায় পথের মেয়ে পাত্তেয়ীকে ঘরে আনে অসম্মান অপমান থেকে বাঁচাতে। সারা গ্রামে ধিক্কার পড়ে যায়, আপন বংশে কলঙ্ক লজ্জা আরোপের ভয়ে মালিক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু খালিদ কোন অপমান কলঙ্ক গ্রাহ্য করে না। সে শিক্ষা-দীক্ষায় পাওয়েীকে গড়ে তুলতে থাকে এবং সমাজের অচলায়তনকে প্রবল আঘাত হেনে শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রহণ করে।

'কাটালপ্পালম' (সমুদ্রের ভেতরে যাবার ছোট সেতু বা জেটী ১৯৬৫) নাটকেও পারিবারিক প্রভুত্বের চিত্র আঁকা হয়েছে। কইমল একজন আইনবিদ, এক্ষেত্রে সে নির্মম হৃদয়হীন, পুত্র কন্যাদের ওপরেও পিতা হিসাবে এরকম শাসন চালায়। কিন্তু বার্ধক্যে পৌঁছে সে চোখের দৃষ্টি হারায়, তার ছেলে মেয়েরাও এই অত্যাচার থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু কইমল তার চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেও কর্তৃত্ব হারায়। সে বোঝে তার জীবন একটা প্রলম্বিত জেটীর মত যাতে করে সে সমুদ্রের দিকে গেছে ও আর ফেরার পথ নেই।

কে টি মুহম্মদ ট্রিলজি লিখেছেন সাম্প্রতিক কালে—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারম। 'সৃষ্টি' (১৯৬১) এক নাট্যকারের গল্প। নাট্যকার নাটক রচনায় ব্যাপৃত যার জন্য তিনি নাট্য দলের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, প্রথম অভিনয়ের দিনও স্থিব হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি এখনও নাটক লিখতে সুরু করেন নি। নাট্যকার ভাবছেন। এই সময় প্রতিবেশী এক পরিবারের কর্তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে, তার ফলে গোটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। এই পরিবার এই সমাজেরই প্রতিরূপ এবং এর গল্প গোপীর অথবা ক্ষুধার। গোপী খেতে চায়, তার ক্ষুধার জ্বালা সবাইকে যেন দগ্ধ করে। সৃষ্টি স্থিতি সংহার—সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষুধা যা আধুনিক সমাজকে চালিত করে এবং এই ক্ষুধাই নাটকের নায়ক। নাটকেব একটা অংশ উল্লেখ করা যাক—

"ইন্সপেক্টর—গোপীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ও মরেনি।

বেনু—ওকে মরতে দিন। ওকে বাঁচিয়ে রাখা ওর পক্ষে অভিশাপ, ওর দেশের পক্ষে। ও ক্ষুধার প্রতীক। ও যদি না মরে ওকে মেরে ফেলুন।

শংকরকুট্টি মেনন—কোত্থেকে যে লোকেরা বিষ যোগাড় করে। ব্যাটাবা এক মুঠো চালও কিনতে পারে না, এদিকে বিষ।

বেনু—রাজনৈতিক দলগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এক আদর্শকে বিষে পবিণত কবেছে তা হল সমাজবাদ। যারা বিষ খেয়ে ফেলেছে মরেছে, তবু গোপী নামক ক্ষুধাটা বেঁচে আছে।" নাটক তিনটি ক্ষুধার ভাবনার বিবর্তন—সূচনা, বিকাশ ও চূড়ান্ত মুহূর্তের প্রকাশ। নাট্যকারের বক্তব্য এই যে ক্ষুধাই সর্ব নিয়ামক শক্তি, সৃষ্টি স্থিতি সংহারেব মূলে ক্ষুধাব ভয়ঙ্কর শক্তি বিদ্যমান। এখানে নাট্যকার জীবন ও নাটকের একত্ব এবং অভিন্নতাও প্রতিপাদন করেছেন। 'সৃষ্টি', 'স্থিতি', 'সংহারম' ট্রিলজির সঙ্গে একমাত্র গাঁথা 'সাক্ষলকরম' 'সমন্বয়ম', 'সন্নাহম' যাদের মধ্যে ক্ষুধার তত্ত্ব ও অস্তিত্বের দর্শন একশিত।

কে. টি. মুহম্মদ-এর 'দীপস্তম্ভম মহাশ্চর্যম' আট-এর দশকে লেখা এক তীব্র ব্যঙ্গাত্মক নাটক যেটি একজন 'মহামানব'-এর জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। সেই মহামানবের ষাট বছর যাপনের প্রস্তুতি চলেছে। মহামানবের স্ত্রী রূপে এক সুসজ্জিতা নারী এসে বলে যে এই মহামানবকে নিয়ে যে শ্রেষ্ঠ জীবনী লিখবে সে পুরস্কার পাবে। লেখকরা এগিয়ে আসে। কিন্তু ক্রমে প্রকাশ পায় সেই মহাপুরুষের চরিত্র। সে ছিল ভয়ঙ্কর স্বভাবের মানুষ। সে একদা রাজনীতি করত, মন্ত্রীও হয়েছিল। কিন্তু তার আচরণ ছিল দুর্দম। সে কয়েকটি হত্যা করেছে বা করিয়েছে। এদের মধ্যে এক মহিলা আছে যে ঐ মহাপুরুষের সন্তানের জন্ম দিয়ে অপমান এড়াতে মৃত্যুবরণ করে। ঐ ছেলেকে মারবার জন্য তার বাবা লোক পাঠায় কিন্তু সে তাকে মারতে পারেনি। সেই ছেলে বড় হয়ে এখন ঐ মহামানবেব মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে যা মহামানবের চরম পরিণতি ডেকে আনে। নাট্যকারের সমাজ চেতনার পরিচয় নাটকে সুন্দর হয়ে ফুটেছে।

নায়ের দশকের 'সূত্রধারণ' নতুন রীতির নাটক। বক্তব্যের গভীরতায় ও কথনের চাতুর্যে নাটকটি অন্য মাত্রা পায়। সূত্রধারণ ছিল একদা থিয়েটারের লেখক-কথক। কিন্তু

এখন সে বেকার। সে চাকরি হারিয়ে এক ফিল্ম প্রডিউসারের কাছে এসেছে। ঐ পরিচালকের এক জীবন দর্শন আছে তা হল টাকাই আধুনিক জীবনের সব। সূত্রধার এক নাটক বলে যার অভিনয় হয়। এক অপরিণামদর্শী অমিতব্যয়ী যুবক জয়ন বাবার টাকা জুয়া খেলে নষ্ট করে। সব জুয়াড়ীর মত সেও বিশ্বাস করে যে আবার জুয়া খেলে সব পাবে। ক্রুদ্ধ শ্বশুর মেয়েকে নিয়ে যায় ও জয়নের বাবা ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তার খুব দুরবস্থা। সে তার শেষ পাঁচ টাকা দিয়ে জুয়া খেলে অনেক টাকা পায়। সে ভাবল টাকা ফিরে পেয়েছে যা দিয়ে সব সম্পর্ক আবার ঠিক হবে। সে বাড়ি ফিরে দেখে মা মৃত্যুশয্যায় এবং সবসময় বাবা ছেলেদেরও ক্ষমা করে না। অবশ্য তার বউ ফিরে আসে। কিন্তু সে আবার টাকা নষ্ট করে। সূত্রধার বোঝায় যে টাকার থেকে মানুষের সম্পর্ক অনেক বড়। অতিক্রুদ্ধ প্রযোজক বলে যে কপর্দকহীন ভালবাসার গল্প সে নেবে না। ব্যর্থ সূত্রধার টাকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। নাটকটি উজ্জ্বল ঝকঝকে, আঙ্গিকও সুন্দর। নাটকে দুটো মাত্রা আছে। সূত্রধারণ ও প্রযোজক শতরঞ্চ খেলছে এবং অন্যান্য অভিনেতা দর্শকদের আবিষ্ট করছে। এটা নাটকের মধ্যে নাটক; ফিল্মের মধ্যে নাটক; আবার সূত্রধার ও প্রযোজক বারবার নাটকে ঢুকছে ও বাধা দিচ্ছে তর্ক করছে—যেন একটা ব্রেখটীয় রীতি প্রযুক্ত।

কে টি মুহম্মদের শেষ দিকের নাটক 'বেশম প্রসন্নম' (১৯৯১) তীব্র ব্যঙ্গাত্মক রচনা। নাট্যকার দেখিয়েছেন সব মানুষই মুখোশ পরে থাকে, ভণ্ডামী করেই বেঁচে থাকে। কিন্তু তা তাদের সত্যিকারের রূপ নয়। সে রূপ জটিল কিন্তু মানুষ তাকে মিথ্যা আবরণে ঢেকে রাখে।

ওমচেরী এন নারায়ণ পিল্লা (১৯২৭) আধুনিক সময়ের এক বিশিষ্টতম নাট্যকার। তিনি প্রথম কবিতা লিখতেন পরে নাটকে লিখতে প্রবৃত্ত হন, কারণ নাট্যবৃত্তকে তাঁর যোগ্যতম মাধ্যম মনে হয়েছিল নিজেকে প্রকাশ করতে : তা হল মানব চেতনার দ্বন্দ্ব সংঘাত, জীবনের জটিলতার উন্মোচন।

ওমচেরীর প্রথম নাটক 'ঈ বেলিচ্চম নিঙ্গল কুল্লদানু' (এই আলো তোমার জন্য) একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রান ক্যাথলিকের জীবন নিয়ে লেখা যে ভেবেছিল যারা চার্চে আসে তারা সকলেই ভাল, আর যারা আসে না তারা সেরকম নয়। ক্রমশঃ সে নিজের ভাবনার জগৎ এড়িয়ে সেই সমস্ত লোকদের সান্নিধ্যে আসে যারা ভাল হলেও গীর্জায় যায় না। সে আরও বোঝে যে যারা গীর্জায় যায় তাদের প্রার্থনার মূলে আছে স্বার্থ পূরণ বাসনা; এবং সে দেখে নীচুতলার শোষিত নিপীড়িত মানুষরাও কোনদিন মর্যাদা পায়না। পুরোহিত বোঝে সেও পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার। শেষ পর্যন্ত সে গীর্জা ছেড়ে চলে যায়, ঈশ্বর অথবা মানুষকে সেবা করতে। নাটকটি বিভিন্ন বামপন্থী সংস্থা অভিনয় করে।

'ইথু নম্মুদে নাদানু' (এই আমার দেশ) নাটকে একদিকে আছে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ অন্যদিকে দালাল ও উৎপীড়নকারী। তীব্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের এক নিখুঁত চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে।

'প্রলয়ম' বর্তমানে কালের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ১৯৭২ সালে এই নাটক কেরালা সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পায়। পরমাণু যুদ্ধে মানুষের দুরবস্থা—প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবতার অসহায় বেদনাই—নাটকে রূপ পেয়েছে। জাতিসমূহ শক্তি অর্জনে মত্ত ও অস্ত্র প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। বাতাসে ভয়ঙ্করের আভাস, আকাশে সর্বনাশের পদধ্বনি, চতুস্পার্শে প্রলয়ের গর্জন। প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর গলায়

ক্রশ ঝুলছে যা পরমাণু বিস্ফোরণের তড়িত চুম্বকীয় তরঙ্গ অর্থাৎ নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের রেডিয়েশন থেকে সবাইকে বাঁচায়। নোয়ার আর্কের ঘটনা একবার ঘটেছিল। ঈশ্বর নোয়াকে বললেন বিংশ শতাব্দীর শেষে আবার প্রলয়ঙ্কর বন্যা আসবে ও তিনি নোয়াকে জাহাজ নির্মাণ করতে বললেন। কাদের বাঁচাতে হবে নোয়ার স্ত্রী তার তালিকা করছে। স্বর্ণমূল্যে যারা বেশী দাম দেবে তাদের জন্যই আসন সংরক্ষিত হবে। বিশ্বের সব অন্যায়কারী পাপীরা সে সব আসেন কেনে। এক সচেতন ধর্মপ্রাণ যীশুসদৃশ বিদ্রোহিনী নারী মেরী শ্রীমতী নোয়ার কাজের প্রতিবাদ করে, তাকে হত্যা করা হয়। নোয়া শেষ মুহূর্তে এই সব জানতে পারে। চারপাশ থমথম করছে শেষ সর্বনাশের আশঙ্কায়, জলোচ্ছ্বাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর ভাবে ছুটে আসছে প্রলয়ের ঢেউ। নিমজ্জিত হয় না জাহাজ অবশ্য। শেষ পর্যন্ত নাট্যকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সর্বনাশা শক্তিমত্ততা প্রবল দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখিয়েছেন, নিউক্লিয়ার যুগের এক নির্মম চিত্র ফুটেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের অসহায়তা ও যন্ত্রণার কথাও তুলে ধরেছেন। যদিও এই সর্বনাশের মধ্যেও মানুষের বেঁচে থাকার মহৎ বার্তা ঝলসে উঠেছে। অঙ্গিকের বিচারেও নাটকটি অভিনব। একটা বড় ক্রশ ঘরে ঝোলে, প্রত্যেকের গলায় ক্রশ, এক বিশাল টেলিভিশন সেট আছে তাতে বেন বহির্বিশ্ব নিত্য প্রতিফলিত হচ্ছে, ইন্টার-স্টেলার স্যাটেলাইট থেকে যেন জেহোভার ছবি ভেসে আসছে—বোধ হয় তাঁর গলাতেও পরমাণু-বিস্ফোরণরোধী নতুন ক্রশ। বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য, কল্পনার অভিনবত্ব, শিল্পের চমৎকরিত্ব 'প্রলয়ম' নাটককে এপিকের মর্যাদা দিয়েছে।

ওমচেরীর 'উলাকুণ্ডা পেরুমল' কাব্যধর্মী নাটক যদিও এতে সমাজ সচেতনতার প্রখর পরিচয় আছে। উলাকুণ্ডা পেরুমল এক অত্যাচারী রাজা যার অহংকে তৃপ্ত করে সচিব ও একদল মোসাহেব। সে প্রজাদের পরীক্ষা করে—বস্ত্রহীন হয়ে হেঁটে যায় পথ দিয়ে। যদিও আগে বলা হয়েছে যে সে বস্ত্র পরিহিত। প্রজারা ভয়ে বলে যে রাজা পোষাক পরেছে কিন্তু বিরোধিরা বলে যে এটা মিথ্যা এবং বলে রাজা নির্বীর্য। তৎক্ষণাৎ তাদের কারারুদ্ধ করা হয়। প্রবল বন্যায় রাজ্য বিধ্বস্ত, চারপাশে দুঃখদুর্দশা। বিদ্রোহ দেখা দেয় রাজ্যে। এক নেতা অবধূদন প্রজাদের প্ররোচিত করলে সচিবের নির্দেশে তার মস্তক চ্যুত করা হয়, কিন্তু তার কাটা মাথা কথা বলে চলে—জনগণের কণ্ঠই ঈশ্বরের কণ্ঠ। ইতিমধ্যে রাজাকে বলা হয় যে এক উত্তরাধিকারীর জন্ম তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। রাজা নিজের নির্বীর্যতার কথা জেনেও নিজেই সন্তান উৎপাদনের কথা বলে। তার পেট মাসের পর মাস ফোলে, কিন্তু নবজন্মের চিহ্ন নেই। শেষ পর্যন্ত রাজার নিকটজনও জনগণের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দেয়, সচিবন আত্মহত্যা করে, রাজার পেট বিদীর্ণ করে বিদ্রোহীরা বেরিয়ে আসে, রাজার মৃত্যু হয়।

ওমচেরীর ছোট নাটক 'ইংলিশ মিডিয়াম' উপভোগ্য ব্যঙ্গাত্মক রচনা। শিশুদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াতেই হবে এটাই এখনকার মা-বাবার মানসিকতা, তাদের অবস্থা যতই সামান্য হোক। এতে কারুরই খুব বিশেষ কল্যাণ হয় না। এই বিষয় নিয়ে ওমচেরীর নাটক 'ইংলিশ মিডিয়াম' যা বর্তমানকালের এক অতি প্রাসঙ্গিক সমস্যা নিয়ে এসেছে।

'থেভারুডে আনা' মন্দিরের এক হাতিকে নিয়ে লেখা নাটক। হাতিটা ষাট বছর ধরে বিভিন্ন কাজ করেছে—মাথায় দেবমূর্তি বহন করা, কাঠের গুঁড়ি টানা ইত্যাদি। সে এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, মেগাফোন হাতে রাজনীতিবিদ্, ফাইল নিয়ে ব্যুরোক্র্যাট, স্টেথো

হাতে ডাক্তার প্রমুখ তাকে দেখতে আসে, সারার ওষুধ বলে কিন্তু ধরতে পারে না রোগ। যখন হাতি তাদের সকলকে গিলে ফেলে তারা হাতির পেটে গিয়ে সত্যি জিনিসটা দেখতে পায়—হাতি কত বছর ধরে ক্ষুধার্ত। যারা হাতির রোগ সারানোর কথা বলেছে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের কথা বলেছে, প্রকৃত আরোগ্যের কথা নয়। এর মধ্য দিয়ে আধুনিক যুব সমাজের ট্র্যাজেডী আঁকা হয়েছে যারা চারপাশের পরিবেশ ও জীবন দেখে কিন্তু কিছু করতে পারে না। অথবা হাতির মাধ্যমে ক্ষুধার্ত মানুষের কথা বলা হয়েছে।

'সিদ্ধার্থ' নাটকও আধুনিক অসহায় ও ক্লিষ্ট যুব মানসের প্রতিফলন। শিক্ষিত সংবেদনশীল যুবক জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা দেখে কিন্তু প্রতিকারে অসহায়। প্রাচীন মহামানবের মত সে জগৎ ছেড়ে কোথাও চলে যাবে অথবা তাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

সি এন শ্রীকণ্ঠন নায়ার (১৯২৮-১৯৭৬) প্রখ্যাত নাট্যকার এক জীবন সচেতন শিল্পী যিনি এক দিকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ছবি এঁকেছেন নিপুণভাবে, অপরদিকে পুরাতনকে আধুনিক জটিল ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন ও বিচার করেছেন। তাঁর 'মন্দ বিনিময়' (১৯৫৭) নায়ার সমাজের শুধু নয়, প্রকৃত পক্ষে গোটা সমাজের বিশেষতঃ নারীদের অসম বিবাহ, পণপ্রথা, শিক্ষা না পাওয়া, সম্পত্তির অধিকার বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ ও তজ্জাত দুঃখকর পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং এই অসহায় নির্মম সমাজ ভাবনার শিকার না হয়ে নারীর কণ্ঠে বিদ্রোহের ভাষা উচ্চারিত হয়েছে। সুকুমারন নায়ার সারদাকে বিবাহ করে এই সর্তে যে সারদার ভাই কৃষ্ণন নায়ার তার বোন আম্মিনিকে বিয়ে করবে। কিন্তু আম্মিনির শিক্ষা চাকচিক্য না থাকাতে এই বিবাহ ক্রমশ পিছোতে থাকে ও ক্রুদ্ধ সুকুমারন সারদাকে ভালবাসলেও তাকে ত্যাগ করে। ফলে কৃষ্ণন আম্মিনিকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সারদার মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সে বোঝে এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পণ্য করা হয়েছে, প্রেম প্রীতি শ্রদ্ধায় তাকে বরণ করা হয় না। সুকুমারন তাকে আহ্বান করলেও সে আর ফিরতে রাজি নয়। 'কাঞ্চন সীতা' (১৯৬১) নাটকের জন্য নায়ার কেরালা সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পান। এটা পৌরাণিক কাহিনীর নবরূপায়ণ। রামের অন্তর্দ্বন্দ্ব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় তা যেন আধুনিক যুগের জটিলতাকে প্রকাশ করে। আর্য-দ্রাবিড়ীয় সম্পর্ক চিত্রন প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের মিলন সংহতির প্রয়াস।

সি এল জোস (১৯৩২) অন্তত কুড়িটি নাটক লিখেছেন এবং সবকটি মঞ্চে অভিনয়ের অত্যন্ত উপযোগী। ঘটনার সুন্দর বিন্যাস, পরিস্থিতির যথাযথ নিয়ন্ত্রণ তাঁর নাটকে আছে, তার সঙ্গে আছে আবেগ বিহ্বলতা ও আদর্শের মহৎ প্রকাশ। চরিত্রচিত্রনে তিনি দক্ষ। চরিত্রের স্থির প্রত্যয় সেখানে আছে। সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যাময় জীবনের রূপচিত্রণে তাঁর দক্ষতা সবিশেষ।

জোসের পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'তীপিডিচ্চ আত্মাভূ' (প্রজ্বল আত্মা, ১৯৬৩) শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে লেখা। দেশের শিক্ষানীতির ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে গিয়ে নাট্যকার প্রকৃত পক্ষে গোটা সমাজ ব্যবস্থার চিত্র অঙ্কন করেছেন। ইয়্যুন্নি একজন ব্যবসায়ী এবং স্কুল তার টাকা আদায়ের ক্ষেত্র। তার একজন ভাড়াটে শ্রমিক কোরুথ-এর এক উচ্চাশা আছে যে তার মেয়ে থানকাম্মাকে লেখাপড়া শেখাবে। কিন্তু মেয়েকে স্কুল ভর্তি করতে গেলে একটা টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে এক হাজার টাকা দিতে হবে। তার বাড়ি জমি ইয়্যুন্নির কাছে বন্ধক রেখে সে টাকা যোগাড় করে। থানকম্মা পরীক্ষায় পাশ করে। ইয়্যুন্নির স্কুলে

একটা চাকরি খালি হয় কিন্তু সে পনেরোশো টাকা চাইলে কোরুথ তার বন্ধকী জমি বাড়ি বিক্রি করে। তবু টাকা কম হয়। ইতিমধ্যে কোরুথের বাড়ি পালানো ছেলে মাইকেল কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরে। কিন্তু ইয়্যুন্নি বলে যে সে অনন্তকাল অপেক্ষা না করে চাকরিতে লোক নিয়েছে। মাইকেল তাকে ছুরি মেরে পালায়। কিন্তু তার ধরা পড়ার খবরে কোরুথ রাত্রে বেরিয়ে যায়। থানকাম্মা একক নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে, তার সঙ্গে কেউ নেই, তার প্রেমিক ইয়্যুন্নির ছেলে পিটার-ও নয়।

দুদৃশ্যের ছোট 'নোমপরঙ্গল' (ব্যথা, বেদনা)-এ জীবনের গভীর বেদনা স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি ও শেষ পর্যন্ত মহত্ত্বের প্রতিভাস আছে। মাদরাজে সুসী ও সেবিয়ার সুখে সংসার কাটায়। হঠাৎ এক ছন্দ পতন হয়। সুসীর একদা সহপাঠী সন্নী ক্যানসার রোগ সারাবার জন্য ওখানের হাসপাতালে আসছে। সন্নী আসে সঙ্গে চিরসঙ্গী ভায়োলিন। অসুস্থ রুগ্ন মৃত্যুপথযাত্রী সন্নীকে দেখে সুসী চমকে ওঠে—সুন্দর রূপবান লোকটার একি চেহারা! সন্নী তার ভায়োলিন সুসীকে দিয়ে হাসপাতালে যায়। কিন্তু সেবিয়ার সইতে পরে না সন্নীকে, স্ত্রীকে তার মনে হয় ব্যভিচারিণী। সে ভায়োলিনটা ভাঙতে যায়। সুসী চোখের জলে বলে যে সে ও সন্নী প্রণয়যুক্ত ছিল, তাদের বিয়েরও ঠিক। কিন্তু তখনই ধরা পড়ে সন্নীর ক্যানসার ও সে জোর করে সুসীর মন ফেরায় ও তাকে বিয়ে করায়। তার জন্যই সুসী আজ সেবিয়ারের স্ত্রী। কিন্তু তার স্বামী নিষ্ঠুর নির্মম তাই মৃত্যু পথ যাত্রী মানুষকে এরকম আঘাত হানতে যায়। স্ত্রী-র কথায় স্বামীর চৈতন্য ফেরে, অনুতপ্ত চিত্তে সে সন্নীর কাছে যেতে চায়—খবর আসে সন্নী মারা গেছে।

'ভেলিকম' পিনানগুন্নু' (আলো নিভে যাচ্ছে ১৯৮০) নাটকেও জোস এঁকেছেন সমাজের চিত্র—দুঃখ দরিদ্র বেকারী কিভাবে জীবনকে ক্লিষ্ট বিপর্যস্ত করে তোলে তার পরিচয় নাটকে পাওয়া যায়। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ছেলের যন্ত্রণা, বিধবা নারীর অসহায় মানসিকতা, পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত বাবা : আধুনিক ভারতীয় জীবনের সামাজিক অর্থনৈতিক সংকটকে তুলে ধরে।

কাভলম নারায়ণ পানিক্কর (১৯২৮) ভারতবর্ষের এক অনন্য নাট্যব্যক্তিত্ব। নাট্যকর্মের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার দীপ্তি উৎসারিত। নাটক রচনায় ও অনুবাদে তিনি সিদ্ধ হস্ত। প্রায় তিরিশটি নাটক তিনি রচনা করেছেন মলয়ালম ভাষায় এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন। ধ্রুপদী শিল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে লোকরীতির মহিমা। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল 'সাক্ষী', 'জবালা সত্যকামন', 'দৈবথর', 'ওট্টায়ন', 'করিমকুট্টি', 'অরণি', 'থেয় থেয়ম', 'সূর্যথনম', 'আরম্বন' ইত্যাদি। 'দৈবথর' (মানব-দেবতা) লোক আঙ্গিকে লেখা বিদ্রুপাত্মক নাটক বা আধুনিক সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরে। মানুষ যেন ভগবানকে আরাধনা করে ব্যক্তি মানুষের দুঃখবেদনা উপেক্ষা করে। 'জবালাসত্যকামন' চিরকালের মানবতা ও মাতৃত্বের চিত্র।

'করিমকুট্টি' তাঁর বিশিষ্ট নাটক। 'করিমকুট্টি' শব্দটা যেন পঞ্চভূতের উপাদান দিয়ে তৈরী—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম। নাটকের প্রধান চরিত্র করিমকুট্টিকে ঠিক বাস্তবভাবে ধরা যায় না। সে নীচ ও অত্যাচারিত মানুষের নেতা। কোণ্ডিমদন করিমকুট্টি ও তার তিনশ নব্বই অনুচরের মালিক। এদের পরস্পরের সম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ধরা পড়ে। লোভী প্রভু ও তার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের মধ্যে আগে যে হৃদয়ের বন্ধন ছিল এখন প্রভুর দাপট প্রবল হয় ও ভৃত্যরা বিদ্রোহী হয়। মন্ত্রবন্ন একদা কোণ্ডিমদনের শিষ্য ছিল যাদুবিদ্যায়। শিষ্য এখন প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করায় গুরুকে পরিত্যাগ করে নিজের কাজকর্ম শুরু করেছে। কুটিল যাদুবিদ্যা অনুসরণ করে সে এখন প্রভূত ধনশালী। সে তার

গুরুকে সাহায্য করে প্রচুর অর্থ দিয়ে, গুরু মনে করে তা শ্রদ্ধার দান। কিন্তু মন্ত্রবন্ন তাকে টাকার জন্য চাপ দেয়। সে বলে যে অর্থের কথা সে ভুলে যাবে যদি সে পায় একজন চেট্টান (এক আত্মা বা স্পিরিট যে অত্যন্ত উপকারী হয় তার প্রিয়জনের)। নাটকে দাস বা ভৃত্যকে চেট্টানের সমান মনে করা হয়েছে। যখন প্রিয় ভৃত্য করিমকুট্টিকে অর্থের জন্য বিক্রয় করা হয়, তখনই পতনের সূত্রপাত হয়। নাটকটি পানিক্করের পরিচালনায় সোপানম সংস্থার প্রয়োজনায় অসমান্য সফল্য অর্জন করে যাতে লোক অঙ্গিকের অসাধারণ প্রয়োগ করা হয়েছে। পানিক্কর একজন সঙ্গীতবেত্তা ও গীতিকবিও বটেন যে পরিচয় ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর মূলত লোক আঙ্গিক নির্ভর নাটকগুলিতে। 'পোরনডি' সম্প্রতিকালে লেখা। এর ভিত্তি কেরালার এক গ্রামের এক লোকরীতি 'পল্লিপ্পনা' যে রীতিতে মানুষকে বলি দেওয়া হয়। অবশ্য পরে নরবলি অন্য বলিতে পরিবর্তিত হয়। এই বলিদানের মধ্য দিয়ে উচ্চবর্ণ ও শক্তির ভণ্ডামী ও বর্বরতা তুলে ধরা হয়েছে। রাজা মনে করে যে বলি একটা পবিত্র অনুষ্ঠান, কিন্তু বলির জন্য নির্বাচিত পোক্কন-এর কাছে এটা হল 'নিনম' বা রক্তস্নান। এই বলিদানকে অবলম্বন করে সামাজিক যন্ত্রণা শক্তির দ্বন্দ্ব লোক আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্রদাসন-এর পরিচালনায় লোকধর্মী নাট্যসংস্থা এটি সফল রূপে মঞ্চস্থ করে।

পানিক্কর সংস্কৃত নাটক পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট হল 'মধ্যমব্যায়োগম', 'বিক্রমোর্বশীয়ম', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম', 'কর্ণভারম', 'উরুভঙ্গম', 'দূতবাক্যম' ইত্যাদি। শেকসপীয়রের 'দি টেমপেস্ট'কে তিনি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, নিজস্ব অনুবাদ মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন নতুন রীতিতে লোক আঙ্গিকের রূপে। এই প্রযোজনা দর্শকের প্রত্যাশিত স্বীকৃতি পায়নি।

৪. সাম্প্রতিক পর্ব

বর্তমানে মলয়ালম নাটক বহুল পরিমাণে রচিত হচ্ছে। কিন্তু তার পূর্ব গৌরব কতটা রক্ষিত হচ্ছে তা আলোচনার বিষয়। ষাটের পরবর্তী সময়ে কেরালার সুসমৃদ্ধ নাট্যসাহিত্য তার মর্য্যদা কিছুটা হারায়। পেশাদার মঞ্চ অধিকার করে নাটককে এবং সাধারণ জন রুচি অনুযায়ী নাটক লেখা হতে থাকে—নাচ গান জমজমাট পরিবেশ সিনেমারীতির প্রয়োগ মঞ্চে বিশেষ দেখা যায়। প্রগতিশীল লেখকরাও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারলেন না যদিও এই ক্ষোভের বিরুদ্ধে কিছু তীক্ষ্ণ সামাজিক রাজনৈতিক নাটক দেখা যায়।

তবু সম্প্রতিকালে মলয়ালম নাটক আবার সৃষ্টির নবনব মহিমায় উদ্ভাসিত হচ্ছে। একদিকে সমাজ ব্যবস্থার প্রকাশ অন্যদিকে মানবতার প্রতিষ্ঠা নবীন নাট্যকারদের প্রেরণা দিচ্ছে নবতর সৃষ্টিতে। মানহৃদয়ের অনন্ত বৈচিত্র্য ও বিস্ময় দেখা যাচ্ছে নাটকে। কখনো নাট্যকার অতীত থেকে প্রাণের উপাদান ও উন্মাদনা গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ রূপক প্রতীকের প্রয়োগে সাংকেতিকতার পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। ঐতিহ্যনিষ্ঠ লোকশৈলীর প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে নাটকে—লোক আঙ্গিকে সমাজচিত্র উদ্ভাসিত হচ্ছে। পিরানদেল্লোর বাস্তবতার অনুসন্ধান, ইয়োনেস্কোর অধিবাস্তব তত্ত্ব, ব্রেখটের বস্তুবাদী দর্শন ও প্রখর সমাজসচেতনতা সাম্প্রতিক মলয়ালম নাটকে পাওয়া যায়। সম্প্রতিকালের বিশিষ্ট নাট্যকার হলেন জি. শঙ্কর পিল্লা, শ্রীরঙ্গম, পি এম তাজ, ইব্রাহিম ভেনগরা, নরেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ।

জি. শঙ্কর পিল্লা (১৯৩০-১৯৮৯) বিশিষ্ট নাট্যতত্ত্ববিদ ও মননশীল অধ্যাপক। আধুনিক মলয়ালম তথা ভারতীয় নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি এক বিশ্রুত নাম। বহিরঙ্গ নয়, জীবনের অন্তরঙ্গ ভাবনার রূপকার তিনি।[৮] মানবহৃদয়ের দুরবগাহ গভীরতা তাঁর নাটকে

শিল্পবদ্ধ হয়েছে, মানবতার চ্ছল চ্ছল বেদনা প্রবাহ এক গম্ভীর ভাব-মাহিমার সৃজন করেছে। আধুনিক দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ সমাজবোধও তার নাটকে তীক্ষ্ণ হয়েছে কখনো। রূপকেব অন্তর্লীনতা, প্রতীকের দ্যুতি, কবিতার ভাবসমুন্নতি, মুখোশের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদি আঙ্গিকের চমৎকারিত্ব এক রূপদক্ষ স্রষ্টার শিল্পিত সাধনার পরিচয় বহন করে।

এক গভীর সমবেদনা ও করুণা জি. শংকর পিল্লার নাটকের অন্যতম ভাবনা। তাঁব প্রথম নাটক 'স্নেহদূতম' (১৯৫৩) একাঙ্ক সেইভাব প্রকাশ করে। সিদ্ধার্থর মানসিক বেদনা ও মহৎ আত্মত্যাগের ওপর ভিত্তি করে এটি লেখা। তরুণ রাজকুমার একদিন অপরিমিত আনন্দ বিলাসের পর অলিন্দে এসে দাঁড়ায় ও নীচের রাস্তায় জরা রোগ মৃত্যুর মিছিল দেখে তাঁর পরিবর্তন ঘটে। গঠন কৌশলের চমৎকারিত্বেই শুধু পুরাতন কথার নবরূপায়ণ নয়, সিদ্ধার্থর সর্বব্যাপী করুণা ও মানবতাবোধ আশ্চর্য প্রকাশিত হয়েছে। 'পরাজিতম' নাটকে মহাভারতের পটভূমিকায় উপস্থাপিত। অর্জুন দুঃশলার সংলাপে যুদ্ধবিরোধী যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা এ যুগেরও।

'মরীচিকা' (১৯৬৫) এক শিল্পীর যন্ত্রণা বেদনা আর্তির চিত্র। চিত্রশিল্পী ভাসী যে মেয়েকে বিয়ে করেছে সে ঈর্ষাপরায়ণ ছিল, এখন উন্মাদ হয়ে মানসিক চিকিৎসালয়ে। শিল্পী ভাসী আঁকছে মরুভূমি মরীচিকার ছবি। সে ভালবাসে ঐ স্থানের এক প্রাক্তন কর্মীর মেয়ে শ্যামলাকে যার জীবনও মরুভূমি কারণ সেও প্রেমিকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অদ্ভুত অবস্থায় পৌঁছেছে। ভাসীর ভালবাসা তার জীবনে আশীর্বাদ কিন্তু পরে তাও মরীচিকা হয়ে ওঠে কারণ অভিভাবকের নির্দেশে সেও সরে আসতে বাধ্য হয়। ভাসীর স্ত্রী আরোগ্য হলেও তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে না। ভাসীর জীবন ধু ধু করা মরুভূমির মত। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাই শুধু মরীচিকা সৃষ্টি করে না, মানুষের উদ্দেশ্যমূলক কার্যবিধিও অপরকে মিথ্যা ত্যাগে প্ররচিত করে যা স্বভাবতই প্রবল দুঃখদায়ক হয়ে ওঠে।

'অভয়রথিকল' (উদ্বাস্তু ১৯৬৫) নাটকও প্রতীকী। এই একাঙ্কে প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছে একজন নারী সে মা হয়ে চায় কিন্তু বন্ধ্যা, এক ব্যর্থ প্রেমিক, পুত্রের জন্য অপেক্ষমান বৃদ্ধ যে কোনদিনই পুত্রকে পাবে না কারণ সে মারা গেছে। ট্রেন আশা আকাঙ্খা প্রাপ্তির প্রতীক কিন্তু সেই ট্রেন আসবে না কোনদিন।

'বন্দী' (১৯৬৭) যেন বাস্তব-কল্পনার সংমিশ্রণে রচিত এক ছায়াচ্ছন্ন জগৎ যেখানে চরিত্ররা তাদের প্রবৃত্তির যেন প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রতিনায়ক শক্তি উন্মত্ত হয়ে যাকে নিয়োজিত করে অপরকে হত্যা করার জন্য সেই তার ঘাতক হয়ে যায়।

'ভরতবাক্যম' (১৯৭০) জি শঙ্কর পিল্লার এক অসামান্য রচনা। এর ভাব গভীর, বক্তব্য অভিনব, আঙ্গিক চতুর ও বিস্ময়কর। নাট্যকার মানব মনকেই যেন মঞ্চ করছেন, অভিনেতা বন্ধু অভিনেত্রী চোর—এরাই চরিত্রের নাম। বন্ধু ও অভিনেত্রী অভিনেতার বিভিন্ন মানসিকতার প্রতিভাস। প্রকৃতপক্ষে নাটকে একটা চরিত্রই আছে—অভিনেতা। তার মনই দৃশ্যপট। নাটকটি একটি মানুষের অবদমিত মনোবাসনাজাত দুঃখ যন্ত্রণার চিত্র; এটা একজন মানুষের নিজের সঙ্গে যুদ্ধের কথা : প্রত্যেক মন অসংখ্য যন্ত্রণায় আকীর্ণ, এই যন্ত্রণা মানব মনের অঙ্গ। নাটকটির প্রধান চরিত্র ভরত একজন অন্ধ হয়ে যাওয়া অভিনেতা। আর দুই চরিত্র মঞ্চে এসেছে যারা বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে। একজন হল বন্ধু যে অভিনেতার আত্মরূপ ও আত্মবাসনার প্রতিফলন, অপরজন এক নারী যে অভিনয় করে বিচিত্ররূপ—কখনো অভিনেতার বোন যে মুমূর্ষু নারীর অলঙ্কার সে চুরি করেছে, কখনো তার প্রেমিকা যাকে সে ভালোবেসেও গ্রহণ করেনি উচ্চাশার মোহে

পালিয়ে গেছে, কখনো এক অভিনেত্রী যে ভালবেসেছিল। নাটকে অভিনেতা বন্ধু ও নারী মিলে যায়, যাদের আশা আকাঙ্খা দুঃখ বেদনার বিচিত্র টানা পোড়েনে গ্রথিত হয় শিল্প, জীবন ও মঞ্চ এক হয়ে যায় গভীরতম ভাবনায়। চরিত্রদের আসা যাওয়া বিভিন্ন কার্যাবিধি এক আশ্চর্য নাটকীতায় বিন্যস্ত হয়, আলো আঁধাবের সংমিশ্রণ এক মায়াময় পরিবেশ রচনা করে, বাস্তব কল্পনার ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যায, অর্ধচেতন মনের গভীর প্রকাশ দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। মুখোশ ইত্যাদির ব্যবহার কথাকলি প্রভৃতি রীতির প্রয়োগে আঙ্গিকের এক অসাধারণ বিস্ময় রচনা করে।

'কিরাতম' একদিকে সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘাত অন্যদিকে মানুষের চিরন্তন আশার রূপ। এক উপজাতি মেয়ে অপেক্ষা করে পর্বতারোহনকারীর যে মাপতে গেছে জয় করতে গেছে অজেয় পাহাড়কে। সেই লোকটিকে বীরের মর্যাদা দেওয়া হবে, তার প্রস্তুতি চলছে। সিপাই রাখা হয়েছে শান্তির জন্য। কিন্তু একজন সিপাই ধর্ষণ করে মেয়েটিকে। সংঘর্ষ হয় সিপাই ও উপজাতি মানুষদের মধ্যে। কিন্তু মেয়েটি অপেক্ষা করে বীরের প্রত্যাগমনের। মানুষের বুকে চিরন্তন আশা জেগে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের লিখেছেন জি. শঙ্কর পিল্লা। 'কৌথা দৈবথে তেডি' (কালো ঈশ্বরের সন্ধানে) নাটকে চরম শক্তি বা এ্যাবসলিউট পাওয়ার অন্বেষণ করছে মানুষ। কমেডি নাটকও লিখেছেন তিনি—'পে পিতিচা লোকম' (উন্মাদ পৃথিবী) ও 'রক্ষাপুরুষন' (রক্ষাকর্তা); সামাজিক নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট 'পূজামুরি' (প্রার্থনা কক্ষ)। কিন্তু তথাকথিত বাস্তবতা এদের মধ্যে নেই এবং আঙ্গিকেও তারা নতুনত্বের দিশারী।

শ্রীরঙ্গম বিক্রমন নায়ার (১৯৩৮) সমাজজীবনের সমস্যা-সংকট উপলব্ধি করেছেন তার সঙ্গে সঙ্গে মানবহৃদয়ের গভীর বিস্ময়কেও অনুভব করেছেন ও তার প্রকাশে আন্তরিক হয়েছেন। তার 'চিত্তল পুটুকল' (উহয়ের বাসা ১৯৬৭) সরকারী হাসপাতালের অব্যবস্থার চিত্র বিশেষত চিকিৎসকদের অবহেলা ঔদাসীন্য লালসাই এরজন্য অনেকটা দায়ী। 'চিরাকুকল তিনানাএগুল' (ডানা ও অগ্নিশিখা ১৯৬৭) নাটকের মধ্যে নাটক—সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও যন্ত্রণা, নাট্যকারের মানসিকতার প্রতিসর্গ পরিবর্তনশীল বিভিন্ন চরিত্রের সৃজন, এবং জীবনের জটিলতা এই নাটকে আঁকা হয়েছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক নাট্যকার যার কাছে রাত্রিবেলায় তার সৃষ্ট চরিত্ররা আসে। বৃদ্ধ নায়ার বলে যে নাট্যকারই তার সংসারে অশান্তি এনেছে। নাট্যকার বলে যে ঘটনা অন্যমত-নিরপেক্ষ হয়েই স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলে। নায়ারের ছোট ছেলে দামুও অভিযোগ নিয়ে আসে, কিন্তু নাট্যকার দামুকে দিয়ে, জোর করে স্বীকার করায় যে সে তার দাদা চন্দ্রনের স্ত্রী ভানুকে ভালবাসে। নাট্যকার জানায়, দামু তারই মুখপাত্র। চন্দ্রনকে নাট্যকার বলে যে ভানু তার বেদনা প্রকাশ করে না কারণ সে নিজের থেকে স্বামীকে অনেক বেশী ভালবাসে। ভানু এসে ক্রুদ্ধ অভিযোগ করে যে তার প্রতি দামুর আকর্ষণের কথা জোর করে বলায় ভানু স্বামীপুত্র পরিজনদের কাছে অপমানিত হয়েছে। নাট্যকারের সঙ্গে দামুর একত্বের অসংগতিকেও সে তীব্র আক্রমণ করে। সকলের সমবেত ক্রোধের প্রকাশে নাট্যকার দিশাহারা উদভ্রান্ত। ম্লান বিষণ্ন অন্ধকারে চরিত্ররা চলে গেলে নাট্যকার পাণ্ডুলিপি ছিড়ে ফেলে কারণ তা অসম্পূর্ণ। পিরানদেল্লোকে অবলম্বন করলেও নাট্যকারের ভাবনা নূতনতর তাৎপর্য আনতে চেয়েছে।

'চতুরঙ্গম' (১৯৮০) তথাকথিত আভিজাত্যকে আঁকা হয়েছে যা অপরকে দূরে সরিয়ে দেয় ও নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য মর্যাদার জন্য সাধ্যাতীত অর্থ সম্পদ বিনষ্ট করতে হয়। ঝুটো সম্মান বোধকে আঘাত করা হয়েছে নাটকে।

কে এস নামপুতিরি রচিত 'পতনম', 'সমস্যা' ও 'সমাবর্তনম' সমসাময়িক জীবনের জটিলতা, সমস্যা ও যন্ত্রণার ওপর ভিত্তি করে লেখা। এরা কাহিনী সূত্রে গ্রথিত না হলেও এদের মধ্যে বর্তমান জীবনের বাস্তবতার এক নিরবচ্ছিন্ন সূত্র পাই তাই এদের ট্রিলজি বলা যেতে পারে। শিক্ষিত জনের চাকুরী সমস্যা, নিজ গোষ্ঠীর গোঁড়ামির জন্য নামপুতিরিদের পতন, রাজনৈতিক প্রতারণা, প্রত্যাশার বিনাশ — আধুনিক জীবন ও সমাজের প্রতিভাস হয়ে উঠেছে নামপুতিরির নাটক।

'সমন্বয়ম' (১৯৮৫) নাটকে নামপুতিরি প্রাচীন ও নবীন আদর্শ ও মূল্যবোধের কথা বলেছেন। উচ্চ বর্ণের মানুষরা এখনও চাইছে নিজেদের অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে যদিও বর্ণভেদ লুপ্ত, অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে প্রাচীন আদর্শের প্রতিভূরা এই পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে নিজেদের যন্ত্রণাময় করে তুলেছেন।

ওমাল্লুর গোপালকৃষ্ণণ (১৯৩৪) রচিত 'স্বর্ণতাকোল' (সোনার চাবি) ছোট নাটক হলেও এর আবেদন বিরাট — বিভিন্ন সময় ও বিরাট পৃথিবী আনীত হয়েছে একত্রে। যে প্রজন্ম সর্বশক্তি ও কর্মক্ষমতা হারিয়েছে, যে মৃত্যুর মুখোমুখী এবং যে সময়ের প্রতিকূলতায় মাথা তুলতে পারে না নিঃশেষিত হয়—তারই চিত্র আঁকা হয়েছে নাটকে। বর্তমানে যা কিছু আছে তাকে রক্ষা করতে হবে, নূতন বিশ্বাস নূতন সত্যের জন্য হবে লড়াই। ঈশ্বর মৃত, মানুষের জন্ম হবে — সৃষ্টি হবে নবযুগের।

আসীস বা পি এম আবদুল আসীস বা টিপ টিপ আসীস নতুন ভাবের চিত্র পরিচালক। ডকুমেন্টারী ফিল্মের জন্য রাজ্য পুরস্কার পেয়েছেন। কেরালা সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন 'চাবেরপড়' নাটকের জন্য। ঐতিহাসিক উক্তি 'জয়ের জন্য হত্যা কর ও নিহত হও' আধুনিক পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। মৃত্যু আত্মত্যাগ শহিদত্ব বরণ ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাসের বুক থেকে এনে আধুনিককালে স্থাপন করা হয়েছে। তার 'কাক' ভিন্ন স্বাদের একাঙ্ক, অদ্ভুত অলৌকিকত্ব আছে। তার সঙ্গে আছে সামাজিক প্রতিবেশ।

আসীসের আছে এক পুরাণজাত কল্পনা যা অভাবিত মঞ্চরূপকে কাব্যময়তায় নিবিড় করে তুলতে পারে। সিনেমার প্রতি তার গভীর অনুরাগ থাকলেও তিনি 'দ....দ....দ' নাটকে কুটিয়াট্টমের মঞ্চ রীতির সঙ্গে ক্লাসিকাল ভারতীয় থিয়েটারের ধারণাকে মিলিয়েছেন। 'মহাভারত'-এর কিছু কথাকে নাট্যরূপ দেবার সময় আসীস তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—সিনেমার থেকে নাটকে আমার অধিকতর আগ্রহের জন্য আমি কুটিয়াট্টমের অনন্ত মঞ্চ সম্ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হই। এটা মনে করা হয় যে সংস্কৃত নাটকই বার্টল্ট ব্রেখটের এ্যালিয়েনেশন তত্ত্বের অনুপ্রেরণা। মঞ্চ উপস্থাপনার প্রচলিত রীতির জন্য দর্শকরা চরিত্রর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে মঞ্চে বাস্তবের প্রতিরূপ নির্মাণ করে। এখানে যা ঘটে তা নাটকের ঠিক উপভোগ নয়। বরং the spectators capacity for appreciation and discrimination are frozen.

আসীসের বিশিষ্ট নাটক হল 'চাবেরপড়' (স্থানীয় গুণ্ডাবাহিনী/আত্মহত্যাবাহিনী), 'বলিকাকা' (শ্রাদ্ধের অন্নভোজী কাক), 'ভাড়াকাবীড়ু' (ভাড়া বাড়ী), 'দ...দ...দ' (১৯৯২। তাঁর হাসির ও কৌতুকব্যঙ্গের নাটকসমূহ ২০০০ সালে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'টিপ টপ আসীসিন্টে হাস্যনাটকঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের (নভেম্বর ২০০০) নাটক তিনটির নাম হল—'নিঙ্গলকক্কে শকুন্তলম মাতি' (তোমরা সবাই শুধু শকুন্তলাকে চাইছে, 'চিন্নাপন উইথ চিন্নামা' (চিন্নাপন চিন্নামার সঙ্গে) এবং 'সাম-দুষ্ট কুড়ুম্বম' (দুষ্ট কুটুম্ব ও

তুষ্ট কুটুম্ব প্রায় এক উচ্চারণ পাওয়াতে কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে)। আসীসের কৌতুকরসোচ্ছল শিল্পভাবনার পরিচয় এই নাটকগুলিতে ধরা পড়েছে।

পি. আর. চন্দ্রন (১৯২৯) নতুন রীতির লিখেছেন — 'নোক্কিনিল্লু শবদিকেরুত' (দেখ কিন্তু কথা বলো না) ও 'শালভঞ্জিকা (মূর্তি)। 'শালভঞ্জিকা' এক নারীর আশাভঙ্গের বেদনাময়, কাহিনী। রাজীর অনেক স্বপ্ন ছিল জীবনে, নৃত্য অভিনয় শিল্পে সে ছিল পারদর্শিনী। বিয়ের পর সে শান্ত সুখী জীবন চেয়েছিল তাই সে ছেড়ে দেয় সবকিছু। কিন্তু স্বামী তাকে ভুল বোঝে, শাশুড়ীর ব্যবহার তিক্ত হয়, তার সন্তানকে পাঠানো হয় বোর্ডিং স্কুলে। রাজী এসব ত্যাগ করে ফিরে আসে পুরাতন শিল্পের জীবনে। 'জ্বালা' এক পতিতা মেয়ের কথা। তার কাছে সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা আসত। কিন্তু সে সংকটে পড়ায় সবাই তাকে অস্বীকার করে। মেয়েটি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে সমাজই তাকে এমন করেছে। যারা সমাজের নামীদামী মানুষ তাদের স্বরূপ সে তুলে ধরে।

চন্দনের 'তাডাবুকার' (আসামী, ১৯৮৫) এক রিটায়ার্ড অফিসারের বেদনা যন্ত্রণার কথা। একদা কোন অন্যায় করার জন্য সে অনুতপ্ত। সে চারপাশের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রিয়-পরিজনদের সঙ্গেও দূরত্ব। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সে নিজেকে অপরাধী মনে করছে।

নরেন্দ্রপ্রসাদ (১৯৪৬)ও নব্যরীতির লেখক। তাঁর বিশিষ্ট নাটক 'সৌপরনিকা' (১৯৮০) এক যক্ষিণী ও এক মর্ত্য মানবের পুরাতন প্রেম কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। নাটকটি প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে অভিনব হয়ে ওঠে যখন ভিস্যুয়াল আর্টরূপে কথাকলির অঙ্গবিন্যাস ও পদসঞ্চার থাকে অথবা ভাষার বিকল্প হয় নৃত্য। মাইম বা মূকাভিনয়ের সুন্দর প্রয়োগও আছে। 'সৌপরনিকা' সঙ্গীত ও নাটকের বেশ কয়েকটি রাজ্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছে। এটি এক খেয়ালী কল্পনাময় নাটক যাতে মানুষের অন্তরলোকও উন্মোচিত। এটা এক যক্ষ্মী বা মায়াবিনী ও কুহকিনীর নাটক। এর মধ্যে আবার আছে লোকভাবনা এবং অতীন্দ্রিয় চেতনাও। এক অতি সামান্যবংশজাত শিল্পী মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক সুন্দরী রমণীর ছবি আঁকো। সেই ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে। তার নাম সৌপরনিকা। সে শিল্পীর আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তার রক্তপান করে ও তাকে হত্যা করে। শিল্পীর বন্ধুকেও আর এক যক্ষী হত্যা করে। এরকম ভয়ঙ্করতা তারা আরো চালায়, ছড়ায় আতঙ্ক। সূর্য কলাদি-র পিতাকে এক যক্ষী মেরেছিল। সে ওঝা হয়ে এক যক্ষিণীর প্রাণনাশ করে কিন্তু নিজেও মারা যায়। এক নির্বোধ ব্রাহ্মণ যুবক ভেনমনি সহপাঠীদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ধ্যান করে, সৌপরণিকা তার কাছে আছে, তাকে জ্ঞানবান করে তোলে ও তাকে ভালবাসে যে ভালবাসা পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত নয়। তাদের ভালবাসা অতীন্দ্রিয় অলৌকিক। বাড়ীর চাপে ভেনমনি বিয়ে করতে বাধ্য হয়, তার সন্তান হয়। কিন্তু আশ্চর্য! সৌপরণিকার নারী হৃদয় এক সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়। সে ভেনমনির পুত্রের উপনয়নের দিন আসে এক সাধারণ নারীর বেশে ও প্রথম ভিক্ষা দিতে চায় কিন্তু ভেনমনির পত্নী-ততরি তা কিছুতেই হতে দেবে না। গ্রামের অন্য মেয়েরাও সৌপরনিকাকে অপমান করে। ভেনমনি বলে যে সৌপরনিকা তার প্রথম স্ত্রী ও তার পুত্রের বড় মা। কিন্তু কেউ তা শোনে না। সবাই তাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করে। সৌপরনিকা আহত বেদনার্ত অপমানিত। সে তার প্রিয়জন ভেনমণিকে বলে যে তার সন্তানরা পাবে শক্তি আর আশীর্বাদ কিন্তু তিন বংশধারার পর এদের ঘরে সন্তান হবে না। ভেনমনির পিতামহ, পিতা ও সে নিজে ক্রমান্বয়ে মারা যায়। নেমে আসে অলৌকিক যক্ষিণীর অভিশাপ।

ইব্রাহিম ভেনগরা (১৯৪১) সম্প্রতিকালের এক বিশিষ্ট অভিনেতা। ষাটটিরও বেশী নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। নাট্যকার রূপেও তিনি উল্লেখ্য। প্রবল সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের প্রকাশ তার নাটকে পাওয়া যায়। জরুরী অবস্থার সময়ে লেখা 'ভূতভবনম' নাটকের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। তার 'পেরুমতী' (বড় অগ্নিকাণ্ড) শ্রেণী সংঘর্ষের নাটক। কৃষকদের সঙ্গে জোতদারের লড়াই প্রবল। কৃষকরা নতুন মুক্তির বাসনায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের সংগঠিত করে ও জোতদারের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাদের সামনে আছে একটি মেয়ে-পেরুমতী। কৃষকদের লড়াই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। এই নাটকটি বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়েছে ও কৃষকদের মধ্যে এনেছে জাগরণের নতুন মন্ত্র। ইব্রাহিম ভেনগরার 'রাজসভা' সমাজ বোধের ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নাটক।

পি. এম. তাজ পরীক্ষামূলক নাটক রচনায় অত্যন্ত দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'কুড়ুককা' (পাত্র) সম্প্রতিকালের এক বহু অভিনীত ও সম্মানিত রচনা। এই নাটক ১৯৮৩-তে কেরালার বিখ্যাত 'শক্তি' পুরস্কার পায়। কুনহিরমন নামক এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে তার দারিদ্র ও ক্ষুধার জ্বালায়। সে বনে যায় চোখের জল নিয়ে ও গাছের ডালে ফাঁস দিয়ে মরতে যায়। গাছরা তাকে বারণ করে (মানুষই করছে গাছের অভিনয়) ওখানে মরতে। কারণ গাছ সবাইকে ফল দেয়, কেউ মরলে তাদের ডাল ভাঙবে। কিন্তু কুনহিরমণ মরবেই। সে মরণকে ডাকে। তার ডাকে মৃত্যু দেবতা যম আসে ও তার দুঃখের কথা শুনে একটা পাত্র দেয় যার থেকে পূর্ণির্মার রাতে যা চাইবে তাই পাবে। কুনহিরমণ আনন্দে ঘরে ফিরছে পথে দেখা কুনহিকান্নার সঙ্গে (বৌ মরে গেছে বলে সে শোকার্ত), কুনহিকেলুর সঙ্গে (ক্ষুধায় দরিদ্রে সে পাগল প্রায়) ও সীতার সঙ্গে (যে ছেলেকে খাওয়াবার জন্য নিজেকে নীলাম করবে)। কুনহিরমন সবাইকে যমের দেওয়া পাত্রের কথা বলে সঙ্গে আনে। পূর্নিমা রাতে সবাই চাইবে, কিন্তু কে আগে পাত্রটা পাবে সেই লোভে ও আশায় সবাই উত্তেজিত। তাদের টানা হেঁচড়ায় পাত্র ভেঙে যায়। কুনহিরমন ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে 'আমাকে একটা পাত্র দিয়ে কি করবে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ আছে তাদের জন্য চাই.....'। নাটকটি অজস্র বার অভিনীত হয়েছে ও পুরস্কৃত হয়েছে।

কনিয়াপুরম রামচন্দ্রন সম্প্রতিকালের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। তার 'ভগবান কালুমারুন্নু' (ভগবানের স্বর্ধমচ্যুতি) ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে বিচিত্র নাটক। কেরালায় বিভিন্ন মন্দিরে মূর্তি ও অলঙ্কারদি চুরি হত। বাম সরকার ধর্মে মাথা ঘামাবে না অতএব এসব কাজ চলত অবাধে। একদা বিখ্যাত আইয়াপ্পন মন্দির থেকে মূর্তি চুরি যায়। সরকার তদন্ত করে। অত্যন্ত নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে মূর্তি পাওয়া যায়। দেখা গেল মন্দিরের লোকেরাই এ সব কাজ করে। ধর্মের নামে একদিকে চলে জনগণকে অফিম খাইয়ে প্রতারণা করা অন্যদিকে শাসক গোষ্ঠীকে বিব্রত করা। নাটকটি বহুল অভিনয়ের সম্মান পায়।

করিভেলুর মুরলী (১৯৫৬) কবি ও নাট্যকার রূপে বিশিষ্ট। তিনি চারটি পূর্ণাঙ্গ এবং অন্তত ৫০টি পথ নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটক হল 'অপরাজিতরুদে রাত্রি' (১৯৭৭, অপরাজিতর রাতি), 'সঙ্ঘগণম' (১৯৮০), 'অগ্রয়নম' (১৯৮০) এবং 'চে গুয়েভারা' (১৯৯৮)। 'চে গুয়েভারা' নাটকে বিপ্লবী নায়কের জীবন ও সমকালের কথা বলা হয়েছে এবং নতুন পৃথিবীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ণয়ের প্রয়াস আছে। নাটকটির জন্য মুরলী কেরালা সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর পথ নাটকগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়েছে।

অনেক নাট্যকার আসছেন সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিয়ে। **কাডাভুর জি চন্দ্রন পিল্লা** লিখেছেন 'পুত্রকামেস্টি' 'প্রহেলিকা' 'প্রভাতম আকেলে' (সকাল দূরে), 'আকাশগঙ্গা', 'যুগে যুগে' যেগুলো বেশ খ্যাতি পেয়েছে। তার 'প্রভাসতীর্থম' (১৯৯০) এসময়ের উল্লেখ্য নাটক। **সেভিয়ার পুলপট্টু** রচিত 'নভেমবেরিন্তে নভেম্বর' (নভেম্বর মাসের নভেম্বর) সাধারণ ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটক। সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণ লড়ছে, ক্রুদ্ধ প্রশাসন ও পুলিশ তাদের দমন করতে চায়, শেষে জনগণ জেগে ওঠে! **টি কে সি জোস** রচিত 'সন্ধ্যা নিডল' (সন্ধ্যা ছায়া ১৯৯৯) এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। তারা একাকী, তাদের দুই ছেলের কেউই কাছে থাকে না, বৃদ্ধ পিতামাতা ছেলেদের কথা ভাবে—ভাবে তাদের বিয়ে হবে, ছেলে মেয়ে হবে এবং সেই শিশুদের নিয়ে তারা আনন্দে জীবন কাটাবে। কিন্তু তাদের আশা ব্যর্থ হয়। একাকী নিঃসঙ্গ বার্ধক্য পীড়িত মানুষের কথা সাম্প্রতিক ভারতীয় নাটকে বিশেষভাবে দেখা দেয়। বর্তমান নাটকটির সঙ্গে মরাঠী নাট্যকার জয়বন্ত দলভীর 'সন্ধ্যাছায়া' নাটকের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

সম্প্রতিকালে বিভিন্ন নাট্যকাররা এগিয়ে আসছেন নতুন সম্ভার নিয়ে। হয়ত পূর্বসূরীদের মত তাঁরা নন, তবু তারা ক্রিয়াশীল। এই সব নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন Theatre India Nov. 1999 পত্রিকার একটি প্রবন্ধে Ayyappa Paniker; এবং বলেছেন—The number of plays published from year to year are getting fewer and fewer : are the playwrights indifferent or incapable of sustaining their successes ? The malaise is not easy to analyse or to remove. **পি বালচন্দ্রন** কটি ছোট নাটক লিখেছেন উচ্চমানের যাদের মধ্যে উল্লেখ্য 'পবম উসমান' (১৯৮৭)। **শ্রীজনার্দনন** একজন নাট্যকার ও পরিচালক যিনি অপেশাদার মঞ্চের বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন; তার পাঁচটি ছোট নাটক বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে—"জগন্নাথনু এন্দু সম্বভিচু' (জনন্নাথের কি হয়েছে), 'জাগ্রত! ওরু মিথ আত্মহত্যা চেয়ুন্নু' (সাবধান! মিথ আত্মহত্যা করছে), 'রাজকুমারণ নগ্নন আইরুন্নিল্লা' (রাজকুমার নগ্ন ছিল না), 'ডায়রি-ইলে অবসানতে তাল' (ডায়রির শেষ পাতা) এবং 'বর্ষাবসানম' (বছরের শেষ)। এগুলির প্রকাশকাল ১৯৯১, যদিও এরা সমাদৃত হয়নি। **সতীশবাবুর** 'মারাভিল ক্রিয়া' (পর্দার নেপথ্য ক্রিয়া, ১৯৯১) একদা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। **মধু মাস্টার** লিখেছেন 'ক্যালিগুলা' (১৯৯০), 'বর্তমানম' (১৯৯৮)। 'বর্তমানম' মলয়ালম নাটকে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছে। **কে জে বেবী**-র লেখা 'নটুগড্ডিকা' (১৯৮৩)। আদিবাসী জীবনের পটভূমিকায় উপস্থাপিত নাটকটি সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি তুলে ধরে আশ্চর্য দক্ষতায়। এটি এসময়ের স্মরণীয় নাটক। এর প্রতিবাদী বক্তব্য তথাকথিত প্রগতিশীল নাটকের থেকে স্বতন্ত্রও আরো জোরালো। আর একটি বইও প্রবল আলোড়ন তুলেছে। আকাশবাণী ত্রিবান্দ্রামের কর্মী **এস রমেশন** লিখেছেন একটি নাটক 'শতাভিষেকম'। এই নাটকে তাকে অপমান করা হয়েছে অভিযোগ করে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এই বইয়ের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালান। পরিণামে বইটির চাহিদা দারুণভাবে বেড়ে যায় ও বিক্রী হয় বিপুল পরিমাণে। (সম্ভবত ৩০ দিনে ৩০ হাজার কপি বিক্রী হয়।)

কিন্তু কেরালায় সর্বাধিক আলোড়ন তুলেছে **সিভিক চন্দন** রচিত 'নিঙ্গল আরে কমিউনিস্ট আক্কি?' (তুমি কাকে কমিউনিস্ট করেছো?)। সিভিক চন্দন একজন স্বল্পখ্যাত নকশাল কবি। রাজনীতি অবলম্বন করে তিনি লেখেন। কিন্তু বর্তমান কম্যুনিস্ট পার্টির অবস্থা দেখে তিনি এই নাটকটা লিখেছেন। তোপ্পিল ভাসীর 'নিঙ্গল এন্নে কম্যুনিস্ট আক্কি' (তুমি আমায় কম্যুনিস্ট করেছো) গ্রন্থে প্রকাশিত আদর্শ আজ কতটা বিপন্ন ও হীন হয়ে

পড়েছে চন্দনের গ্রন্থে তা দেখানো হয়েছে। লেখক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের দুর্বলতা, পার্টির বর্ণ হিন্দুদের অক্ষমতা অথচ দাপট এবং সাধারণ মানুষের অসহায়তা দেখে নতুন নাটক লিখেছেন। চন্দনের নাটকে কম্যুনিস্ট নায়ক মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। অত্যাচারী কেশবন নায়ার মুখ্যমন্ত্রীর শ্বশুর হবার সুবাদে 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান। নায়কের বাবা এখন জবরদস্ত ঠিকাদার। কিন্তু সংগ্রামী মেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর একদা প্রণয়িনী মালা থেকে গেল হরিজন বস্তিতেই। নাটকের শেষ দৃশ্যে মালার মৃতদেহ শ্মশানের বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে কারণ ঐদিন মুখ্যমন্ত্রী গোপালন শহীদ বেদীতে মালা দেবেন। কেরালার দুই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ নাটকটির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এইভাবে তর্ক-বিতর্ক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সামাজিক-রাজনৈতিক বিক্ষোভ সংক্ষোভের মধ্য দিয়ে মলয়ালম নাটক এগিয়ে চলেছে। **সচ্চিদানন্দন**-এর 'গান্ধী' (১৯৯৫), **জয় ম্যাথু**-র 'মধ্যধরণয়াঝি' (ভূমধ্যবর্তী, ১৯৯৬) ভাল নাটক। **পি কে বেনুকুট্টন নায়ার**-এর লেখা 'এলানকুলথে আম্মা' (এলানকুলথের মা, ১৯৯৮) প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের প্রথম জীবনের ওপর ভিত্তি করে লেখা)। বেণুকুট্টন নায়ারের আগের সব নাটকও মঞ্চ সফল হয়েছে। **কে এস শ্রীনাথ**-এর 'দেব শিলাকল' (১৯১৯) বুদ্ধদেবের জীবনকে আদর্শ করে লেখা, এবং নাটকের নায়িকা যশোধারাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পিরাপ্পনচোডে মুরলী প্রচলিত ইতিহাস বা সাহিত্যের কথাকে আকর্ষণীয় নাট্যরূপ দিয়েছেন। 'ইন্দুলেখা' (চান্দু মেননের ঐ নামীয় উপনাসের নাট্যরূপ), 'স্বাতী তিরুনল' (ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার জীবনী নাটক) ভাল লেখা।

টি এম আব্রাহাম (১৯৪৯) আধুনিক মলয়ালম ভাষার বিশিষ্ট নাট্যকার। পরিচালক রূপেও সমাদৃত। কেরালা সাহিত্য অ্যাকাডেমি সম্মান ও কেরালা সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি সম্মান পেয়েছেন। তীব্র সমাজ চেতনা এবং প্রবল প্রতিবাদী মানসিকতা তাঁর নাটককে স্বতন্ত্র মূল্যে ভূষিত করেছে। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল—'নিঝলকুডারম' (ছায়া তাঁবু ১৯৮৩); 'পেরুন থাচান' (১৯৮১) এবং 'আহাম আহাম'। দুটি একাঙ্ক নাটকের সংকলনও তার প্রকাশিত হয়েছে। কামুর 'ক্যালিগুলা' নাটকের অনুবাদ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

'রক্তবলি' নাটকে এক বিপ্লবী যুবকের জন্য খ্রীস্টান মঠের মাদারের গভীর ভালবাসার কথা উচ্চারিত হয়েছে এবং সংগ্রামী মানুষের প্রতি প্রত্যয় ও অত্যাচারীর প্রতি বিদ্বেষ উৎসারিত হয়েছে। নাটকের পটভূমি আদিবাসীদের গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত একটি মঠ যেখানে সিসটাররা কুষ্ঠরোগী এবং অসহায় মানুষদের সেবা শুশ্রূষার কাজে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। এক রাতে বাইরে গুলির আওয়াজ শোনা যায় ও পুলিশের গুলিতে এক রক্তাক্ত মৃতপ্রায় যুবক মঠে ঢোকে। সিস্টাররা বিশেষত মাদার তার সেবাশুশ্রূষা করে; যুবকের নাম রঘুবীর যে বিপ্লবীদের নেতা। রঘুবীর সিসটারকে মা বলে ডাকে। সে বলে মানুষের কল্যাণের জন্যই তারা লড়াইকে বেছে নিয়েছে, সেই জন্যই পুলিশ তাকে হত্যা করতে চায়। পুলিশ বারবার তার খোঁজে আসে, কিন্তু মাদার তাকে লুকিয়ে রাখে। শেষ রাতে রঘুবীর মারা গেলে মাদার ও সিসটাররা তাকে গীর্জার পেছনে জঙ্গলে কবর দেয়। পুলিশ অন্য দুজনকে মারলে মা পুলিশের হয়ে সাক্ষী দেয় না। সে মনে করে রঘবীরকে নয় যীশুকে যেন হত্যা করা হয়েছে তিন দিন পর যে মহামানবের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল। নাটকে একদিকে বিপ্লবীদের প্রতি গভীর ভালবাসা অন্যদিকে মানবতাবাদী সেবাব্রতী খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। এখন ভারতবর্ষে এই জাতীয় নাটকেরই বেশী প্রয়োজন।

কেরালার নাট্যলোক বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে আবার উত্তাল হয়ে উঠেছে। সামাজিক রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক দ্বন্দ্ব সংঘাত দেশের মত নাটককেও দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মকেন্দ্রিক জটিলতা। **কার্তিকেয়ন পডিয়থ** রচিত 'সবম তীনি উরুমবুগল' (মৃতদেহ খাওয়া পিঁপাড়) নাটকটি অভিনীত হয়ে এক প্রবল জটিলতার সৃষ্টি হয়। নাটকের দলটি শারজায় গেলে সবাইকে জেলে পোরা হয় ইসলামকে অপমান করা হয়েছে এই যুক্তিতে। এক বৃদ্ধ এক কফিন আগলাচ্ছে মড়াখেকো পিঁপড়ের হাত থেকে। এক যুবক এসে খাদ্য চাইলে বৃদ্ধ তাকে জল আনতে পাঠায়। তারপর ক্রমে ক্রমে আসে ও খাদ্য চায় তিন জন—তারা হল এক ক্রিশ্চান, এক মুসলিম ও এক মার্কসিস্ট। সবাই সেই মৃতদেহ খায়। ইতিমধ্যে যুবক জল নিয়ে আসে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খেয়েছে দেখে তিনজনকেই হত্যা করে। বৃদ্ধ যুবককে মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি রূপে কফিনে স্থাপন করে ঐসব মড়াখেকো পিঁপড়েদের হাত থেকে রক্ষার জন্য।

পি এম এন্টনী লিখেছেন 'ক্রিস্টিভিনটে অরম থিরুমুরিভু' (যীশুখ্রিস্টের ষষ্ঠ পবিত্র ক্ষত) যাতে দেখানো হয়েছে যীশুও রক্তমাংসের মানুষ এবং তিনিও প্রলোভন দ্বারা তাড়িত হন। এই নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু ক্রীশ্চানরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলে, আইনও তাদের সাহায্যে আসে। নাটকের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তীব্রভাবে অভিযুক্ত হন, লেখক এন্টনীর অস্তিত্বও বিপন্ন হয়। নাটকগুলো আবার দেখান দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ এবং কেরালার নাট্যলোক সেই দ্বন্দ্বের প্রবল উৎসারণে চঞ্চল ও গতিশীল হয়ে উঠেছে।

কলকাতাবাসী অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক **এভুর কৃষ্ণণ নায়ার** মলয়ালম ভাষার বিভিন্ন নাটকের সঙ্গীত রচনা করেছেন যেগুলি বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হয়েছে তারই নির্দেশনায়। সুর দিয়েছেন কে ভি নারায়ণ। নাটকগুলি হল 'দৈবম মারিচু' (কে জি চন্দন পিল্লা), 'ঈশ্বর এ্যারেস্টিন' (এন এন পিল্লা), 'কুটুকুডুম্বম' (তোপ্পিল ভাসী), 'যাদুগ্রহণম' (বৈক্কম চন্দ্রশেখরণ নায়ার) ইত্যাদি। এরা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

৫. বাংলা ও মলয়ালম নাটক ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক

(১) সূচনা

কেরালার সঙ্গে বাংলার জীবন ও মানসিকতার একটা নিকট সম্পর্ক আছে। সাহিত্যের সূত্রে বাংলার সঙ্গে কেরালার সংযোগ ভালমতই গড়ে উঠেছে যা নাটকের মাধ্যমে বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায় থেকে তার সূত্রপাত, রবীন্দ্রনাথ আসান বল্লত্তোল প্রমুখকে অবলম্বন করে তার প্রসার, উত্তরকালে তাতে হয়েছে নতুন ভাবনার সংযোজন।

(২) প্রথম পর্যায়

বাংলা থেকে মলয়ালমে অনেকদিন আগে থেকেই অনুবাদ হয়েছে 'কীর্তিবিলাস', 'বোধেন্দু বিকাশ', 'রত্নাবলী' প্রভৃতি বাংলা নাটক। মধুসূদন গিরিশচন্দ্র প্রমুখ মলয়ালমে এসেছেন অবশ্য অনেক পরে। মধুসূদন দত্তর 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অনুবাদ করেন পি শেষাদ্রি আয়ার 'ইতো পরিষ্কারম্' ও 'মুল্লু বাল্লু নাদম নিল্লু' নামে। বি. এস. শর্মা অনুবাদ করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল'। 'শঙ্করাচার্য'ও অনূদিত হয়। মহেন্দ্র গুপ্তর 'টিপু সুলতান' অনুবাদ করেন রামকৃষ্ণ ও ভাস্করণ ১৯৪৭ সালে।

(৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও মলয়ালম নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক মলয়ালমে প্রায় সবই অনূদিত হয়েছে, কোন কোন নাটক একাধিকবার। ১৯৩০ সালে 'সীতা'র অনুবাদ করেন আর নারায়ণ পাণিক্কর, সম্ভবতঃ এটাই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম অনুবাদ। দ্বিজেন্দ্রলালের অনূদিত নাটকের বর্ণানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হল।

বঙ্গনারী (ভারতনারী)	সি. গোবিন্দন কুরুপ্পু	১৯৩৮
চন্দ্রগুপ্ত (উদয়কান্তি)	ডঃ ভেল্লায়ানি অর্জুনন	১৯৬৮
চন্দ্রগুপ্তন	ভী কুঞ্জলক্ষী আম্মা	১৯৪৮ ৪র্থ সং
দুর্গাদাস	কে. কে. পলানি	১৯৪০
দুর্গাদাস (ত্যাগক্ষেত্রম)	টি. কে. রামন মেনন	১৯৪৮
দুর্গাদাসন	আর সি শর্মা	১৯৪৯
মেবার পতন (মেবাড়িন্তে পতনম)	এ. কৃষ্ণ মেনন	১৯৪৭
নূরজাহান	সি অচ্যুত কুরুপ্পু	১৯৫১ ৩য় সং
নূরজাহান (স্বপ্নসৌধম)	পি. কুন্নিরামন নায়ার	
পরপারে (অক্করে)	সি গোবিন্দ কুরুপ	১৯৪৮
সাহজাহান (সাজিহান)	আর. সি. শর্মা	
সোরাব রুস্তম (সোরাবুম রুস্তভূম)	টি. এস. মেনন	১৯৪১
সীতা নির্বাসন	আর নারায়ণ পানিক্কর	১৯৩০
সীতা (প্রণয় তৃষ্ণা)	এম. ভি. উন্নিত্তন	১৯৪৫

নাটকের বিষয়ে বা আঙ্গিকের বিচারে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুটা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত করেছেন মলয়ালম নাট্যকারদের। কে মাম্মন রচিত 'চন্দ্রগুপ্তন' (১৯২৯), 'সাজাহান' (১৯২৫), কাভালম মাধব পানিক্কর রচিত 'নূরজাহান' (১৯২১) প্রভৃতি নাটকের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

৪. রবীন্দ্রনাথ ও মলয়ালম নাটক

অ. ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে কেরালার মানুষরা শান্তিনিকেতনে আসতেন। বিশ্বভারতীর প্রভাব ওখানকার মালয়ালী ছাত্রদের ওপর ছিল প্রবল ও গভীর। অনেকে শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়ে তাদের নামের সঙ্গে শান্তিনিকেতন শব্দটা যোগ করে দিয়েছেন; যেমন শান্তিনিকেতন কৃষ্ণণ আয়ার। শান্তিনিকেতনের মডেলে অনেকে কেরালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন; যেমন ভেল্লানাদ কে বিশ্বনাথন ও জি. রামচন্দ্রন। নৃত্যশিল্পী চন্দ্রশেখরণ বিশ্বভারতীর ছাত্রথাকাকালীন জীবনের উজ্জ্বল অভিজ্ঞতা নিয়ে 'চিত্রাঙ্গদা' ইত্যাদি নৃত্যনাটক পরবর্তীকালে মঞ্চস্থ করেছেন। ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে কেরালার সম্পর্ক অতি নিকট। রবীন্দ্র নাট্য ভাবনার সঙ্গে কেরালার নৃত্য ও নাট্য সংস্কৃতির একটা আশ্চর্য যোগাযোগ আছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক মলয়ালম ভাষায় অনূদিত হতে শুরু হয়েছে অনেককাল এবং রবীন্দ্র আবির্ভাবের কত পরেও তা সমান মর্যাদা পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণী সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন, কথাকলি নৃত্যর সৌন্দর্য ও মহিমা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, শান্তিনিকেতনে কথাকলি নৃত্যের প্রবর্তন তিনি করেছিলেন। এবং প''বর্তীকালে রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনায় কথাকলির বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

সঙ্গে মহাকবি বল্লত্তোলের নৈকট্যের কথা উল্লেখ করতে হয়। 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বল্লভোলের সংযোগ গড়ে উঠেছে যতটা কবিতার মধ্য দিয়ে তার থেকে বেশী নৃত্যকলার মধ্য দিয়ে। শান্তিনিকেতন এক বিশেষ কেন্দ্র যার মাধ্যমে মালাবারের শিল্প কথাকলি বিশ্বে পরিচিত হয়েছে, বল্লত্তোল প্রতিষ্ঠিত মালাবারের কেরল কলামণ্ডলম বাদ দিলেও কলামণ্ডলমের অনেক ছাত্র শান্তিনিকেতনে এসেছে এবং এর মধ্য দিয়ে কেরালা ও মলয়ালম সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে'।[৯] এভাবেই অনুবাদে. অভিনয়ে ও প্রভাব বিস্তারে রবীন্দ্রনাথের নাটক মলয়ালমে এক বিশেষ মূল্য ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

আ. রবীন্দ্রনাটকের মলয়ালম অনুবাদ

মলয়ালম ভাষায় রবীন্দ্রনাটকের সম্ভবত প্রথম অনুবাদ করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রানুরাগী বাংলা ভাষায় সুদক্ষ ভি. উন্নিকৃষ্ণণ নায়ার। ১৯১৮ সালে তিনি অনুবাদ করেন 'চিত্রাঙ্গদা'। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সেই অনুবাদ কার্য চলেছে। কেরালা সাহিত্য একাডেমী এই অনুবাদ কার্যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

মলয়ালম ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাটকের বর্ণানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হল—

বিসর্জন	ভি. উন্নিকৃষ্ণণ নায়ার	
বিদায় অভিশাপ	জি. শংকর কুরুপ	
চিত্রাঙ্গদা	ভি. উন্নিকৃষ্ণণ নায়ার	১৯১৮
চিত্রাঙ্গদা (সাফল্যম)	এনড্রুস চেরিয়ান	১৯৫৭
চিত্রা	মলয়েশ কে রামকৃষ্ণ পিল্লা	১৯৬১
চিত্রা	কে. ভি. মনলিককর	১৯৬৭
চিরকুমার সভা	ভি. উন্নিকৃষ্ণণ নায়ার	
ডাকঘর	ভি. উন্নিকৃষ্ণণ নায়ার	
ডাকঘর (তিরুভেলুত্তু)	কে. সি. পিল্লা	১৯৩৫
গান্ধারীর আবেদন	ভি. উন্নিকৃষ্ণণ নায়ার	
হাস্যকৌতুকম	নিলীনা আব্রহাম	
কর্ণকুন্তী সংবাদ	ভি. উন্নিকৃষ্ণণ নায়ার	১৯২৬
কাবুলিওয়ালা	এ পি পি নামপুতিরি	১৯৬১
নর্তকী পূজা	এম. নারায়নন	১৯৫২
মুক্তধারা	পি. বাসুদেব কুরুপ, সুপ্রিয় চেরিয়াল, কৈনিক্কর কুমার পিল্লা	
রক্তকরবী	এ	
রাজা	ঐ	

ই. মলয়ালম নাটকে রবীন্দ্রপ্রভাব

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মলয়ালম কবিতায় বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। মলয়ালম নাট্য সাহিত্য প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। মলয়ালম ভাষার প্রতীকী নাটক, গীতিধর্মী নাটক বা ভাবধর্মী নাটকে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা আছে। অনেকেই মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই এই জাতীয় নাটক মলয়ালম ভাষায় রচিত হয়েছে।

বিশিষ্ট লেখক অকাল প্রয়াত কবি কুমারণ আসান শিক্ষার্থী জীবনের কয়েক বছর কলকাতায় কাটান। "তাঁর জীবনের গঠনের পর্বে আসানের সৌভাগ্য হয়েছিল ভারতীয়

রেনেশাঁসের স্নায়ু-কেন্দ্র কলকাতায় থাকার। সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রবল ঢেউ মহানপুরুষ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল তা সংস্কৃতের এই তরুণ শিক্ষার্থীর মনে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে যায় যিনি রেনেশাঁসের এইসব প্রয়োজনীয় উপাদানকে গ্রহণ করেন তাঁর মধ্যে। এবং যখন তিনি কেরালায় ফিরে যান তিনি দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।"[১০] রবীন্দ্রনাথ যখন ত্রিবান্দ্রামে যান তখন আসান কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে একটা কবিতা লেখেন 'দিব্যকোকিলম' যাতে বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপ্ত সহৃদয়তা ও সমবেদনার কথা, রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের কথা যা পৃথিবীকে স্বর্গ করে তোলে, এবং রবির জ্যোতির্ময় কিরণের কথা যা দেশের যুগব্যাপ্ত অন্ধকারকে মুছে দেয়।

কুমারন আসান দুটি 'নাট্যধর্মী আখ্যান কাব্য' লেখেন — 'নলিনী' (১৯১১) ও 'লীলা' (১৯১৪)। এই দুয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের লেখা 'কবি কাহিনী' (১৮৭৭) ইত্যাদির সাদৃশ্য বা সমরূপতা আছে, প্রভাবও আছে। আসানের কাব্য 'নলিনী' বা 'নলিনী অল্লেঙ্কিল ওরু স্নেহম' (নলিনী অথবা একটি ভালবাসা)। রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী'র বিষয় নলিনীর সঙ্গে কবির প্রণয় ও মিলন, নলিনীর সব পেয়েও কবির অতৃপ্তি কারণ সে অসীমকে চায়, পূর্ণতা পাবার জন্য দেশে দেশে ঘোরে। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য বা বিশ্বের বিস্ময় তার মন ভরায় না, সে ফেরে তার প্রত্যাশী প্রতীক্ষাকাতর নলিনীর কাছে যখন যে মৃত্যুপথযাত্রিণী। আসানের কাব্যের নায়িকা নলিনীর ভালবাসাও ব্যর্থ হয় কারণ নায়ক অনন্ত ভাবনায় অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংসার ত্যাগ করে। নলিনী জীবনের সব আকর্ষণ হারিয়ে বনে বনে ঘোরে, এক যোগিনী তাকে রক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত প্রেমিকের সঙ্গে তার দেখা হয় ও সে মৃত্যু বরণ করে। রবীন্দ্রনাথ ও আসানের কাহিনী অনেকটা একজাতীয়, মূল বক্তব্যও এক ধরনের, বিন্যাসও সমরূপ। উভয়েরই নায়িকার নাম নলিনী। নায়ক ও নায়িকার চরিত্র ও মানসিকতার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। আসানের 'লীলা'র সঙ্গে অবশ্য এই সাদৃশ্য অত প্রবল নয়।

আসানের 'চিন্তাবিষ্টায় সীতা' (সীতার ভাবনা বা অনুধ্যান) অনেকটা একসংলাপী নাটকের মত। সীতার দুই পুত্র বাল্মীকির সঙ্গে অযোধ্যায় গেছে রামের অশ্বমেধযজ্ঞে। নির্জন নিঃসঙ্গতায় সীতার মানসিকতার উপলব্ধি ও প্রকাশ। গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে সীতার ভাবকে প্রকাশ করেছেন আসান—সীতার আহত অহঙ্কার, ক্ষোভ ও ক্রোধ ও তাকে অতিক্রম করে স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও তার কল্যাণচিন্তা এবং সীতার দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিকতা যা দিয়ে জীবনের বৈচিত্র্য জটিলতাকে স্থিরভাবে দেখা যায়। কুমারন আসানের সীতা সামান্য নারী নয়, রাজা রামের রাণী নয়, অবলা নারী জাতির ভাগ্যকে মেনে নেওয়া নয়; সীতা ধরিত্রী জননীর সন্তান, সে মানব মুক্তি প্রতীক, সর্ববন্ধন ছিন্নকামী অদম্য ব্যক্তিসত্তার তেজে সে দীপ্ত, সে মহতের পিয়াসী। This conception is necessarily abstract and here Asan stands in the company of Rabindranath Tagore, who, in that memorable verse in Gitanjali sings of the heaven of freedom - Where the mind is without fear and the head is held high.[১১]

কুমারণ আসান-এর 'চণ্ডাল ভিক্ষুকী'র (১৯২৩) কাহিনী বৌদ্ধ কথা থেকে নেওয়া। অচ্ছুত কন্যা আনন্দকে ভালবাসে, তাকে পেতে চায়। শেষ পর্যন্ত প্রভুর কৃপায় তার পরিবর্তন হয়, কামনা পরিণত হয় মহৎ প্রেমে। লক্ষ্মী নারাসু রচিত The Essence of

Buddhism গ্রন্থ থেকে কবি বক্তব্য নেন। রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নাটকের সঙ্গে এর গভীর সাদৃশ্য আছে যদিও রবীন্দ্রনাথের রচনা অনেক পরের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর সঙ্গে যথেষ্টই পরিচিত ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী এক কবি এ বিষয়ে কবিতা লেখেন অনেক আগেই। আসান ও রবীন্দ্রনাথ — দুজনের ভাবনার সমতা বিস্ময়কর।

আসানের ওপর রবীন্দ্রপ্রভাব সম্বন্ধে এ ধারণা দৃঢ় হয় কারণ আসানের আর একটি নাট্যধর্মী কাব্য 'করুণা' (১৯২৪) রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার'-এর উপগুপ্ত-বাসবদত্তা কাহিনীর মত। যদিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কিছু তফাত আছে। Dr. Paul Carus-এর The Gospel of Buddha থেকে লেখক 'করুণা'র উপাদান নিয়েছেন।

রূপযৌবনবতী বারাঙ্গনা বাসবদত্তা বুদ্ধশিষ্য উপগুপ্তকে গৃহে আহ্বান করে। কিন্তু উপগুপ্ত এল না, কারণ এখনো সময় হয়নি। বাসবদত্তার এখনো আত্মিক উন্নয়ন হয়নি। শেষ পর্যন্ত উপগুপ্ত বাসবদত্তার সাক্ষাৎ পায় ভয়ঙ্কর বধ্যক্ষেত্রে যেখানে বাসবদত্তা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। বাসবদত্তা অতিকামের জন্য ঘৃণ্যতম পাপ করেছে। তাই সে শাস্তি পেয়েছে ও ঘাতক তার সুন্দর দেহ রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন করেছে। উপগুপ্ত তার কাছে যায় গভীর সহানুভূতিতে—তাকে বুদ্ধের কথা বলে, 'নির্বাণ'এর কথা শোনায়। পরম শান্তিতে মৃত্যুবরণ করে বাসবদত্তা।

রবীন্দ্রনাথ এভাবেই অনুপ্রাণিত করেছেন কুমারণ আসানকে। তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির মানুষ সংবেদনশীল শিল্পী আসান কলকাতায় রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এসে রবীন্দ্র মানসিকতার মহৎ প্রভাবে প্রভাবিত হন। সমালোচকের মন্তব্য মনে পড়বে এ প্রসঙ্গে—'কলকাতায় থাকাকালে আসান রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যের সঙ্গেও। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও আসানের সাহিত্যের মধ্যে কোন কোন জায়গায় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় এবং এতে বোঝা যায় আসান রবীন্দ্র সাহিত্য কতটা জেনেছিলেন।'[১২] এক মহৎ প্রতিভা স্বাভাবিকভাবেই আর এক মহৎ প্রতিভার অনুপ্রাণনা লাভ করেছেন, উত্তরসূরী সহজ আন্তরিকতায় গ্রহণ করেছেন শ্রদ্ধেয় অগ্রজকে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় প্রতীকধর্মী কিছু নাটক লেখা হয়েছে মলয়ালম ভাষায়। কৈনিক্কর কুমার পিল্লা ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী, রবীন্দ্রনাথের নাটক তিনি মূল বাংলা থেকে মলয়ালমে অনুবাদ করেন। তিনি প্রতীকাশ্রয়ী নাটক লিখেছেন যেগুলো রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করায়। যেমন তাঁর 'মোহমুক্তি'। এটা প্রতীকী নাটক, এর বক্তব্য কাহিনী ও সংলাপ রবীন্দ্রনাথের রূপ ও ভাবকে মনে করিয়ে দেয়। তাঁর 'মহাভূম মুক্তিয়ুম' (১৯৫১) নাটকও রূপকধর্মী নাটক। পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করে দেখানো হয়েছে জীবনের সত্যরূপের প্রকাশ। রূপায়িত করা হয়েছে এই নাটকে প্রতীকের মাধ্যমে কিভাবে ন্যায় সততা জয়ী হয় অসতের ওপর। এই নাটকের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রতীকীবাদের প্রভাব আছে। এই কথা জানিয়েছেন সমালোচক পি. ভি. পরমেশ্বরণ নায়ার।[১৩] কৈনিক্কর কুমার পিল্লার নাটকের গদ্য ভাষার মধ্যে এক আশ্চর্য মায়া আছে কবিত্ব দিয়ে যা সৃষ্টি। এই কাব্যিক গদ্য ভাষা অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শেই গড়ে উঠেছে।[১৪]

কবি নাট্যকার জি. শঙ্কর কুরুপ রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনা, বিশ্বসম্পর্কিত তাঁর ধারণা যে তা হল এক চিরায়ত ও অপরিহার্য সত্তার সুন্দর ও নিত্য পরিবর্তনশীল প্রকাশ, তাঁর আন্তরিক ও সর্বব্যাপ্ত মানবিকতা যার অপর নাম

আন্তর্জাতিকতা, তাঁর গীতিময় কবিতার শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য : জি. শংকর কুরুপের জীবন দর্শন ও সাহিত্য চেতনাকে নিত্য অনুপ্রাণিত করেছে—একথা শংকর কুরুপ নিজেই জানিয়েছেন।[১৫]

জি. শঙ্কর কুরুপ কিছু প্রতীকাশ্রয়ী ও রূপকধর্মী নাটক লিখেছেন যার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। যেমন 'সন্ধ্যা'। এই নাটকের বক্তব্য হল ধর্মচেতনাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত ভোগপরায়ণতা আত্মবৈরূপ্য ও আত্মগ্লানিতে অবসিত হয়। নাটকের নায়িকা সন্ধ্যা, সে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রমূর্ত রূপ, তার সঙ্গে মাধুর্য পবিত্রতা যুক্ত। সে উগ্রতেজ দিন-এর পত্নী। কিন্তু কামুক আকাশ যখন তার প্রবল ভোগবাসনায় সন্ধ্যাকে আচ্ছন্ন করে তখনই ঘটে পতন। সন্ধ্যা হয় অহল্যার মত প্রস্তরীভূত, আকাশও চরম অভিশপ্ত। নাটকের বক্তব্যে ও প্রতীকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে, নাটকের ভাষাও কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথকে মনে করায়। যেমন তারিকা-র উক্তি — আমি তো সত্যের দূতী, সৌন্দর্যের আরাধিকা।

কুরুপের 'ইরুট্টিনুমুম্পু' (অন্ধকারের আগে) নাটকের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ইথিওপিয়ার ওপর ইতালির আক্রমণ এর বিষয় কিন্তু বিষয়ের বাস্তবতাকে অতিক্রম করে গেছে কাব্যিকতা ও প্রতীকধর্মিতা যা রবীন্দ্রনাথেরই মত। আসলে 'কুরুপের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা আছে যা রবীন্দ্রনাথের মত', এই যন্ত্রণাই তাঁকে শিল্পনির্মাণে সাহায্য করে।[১৬]

কথাকলি কেরালার সৌন্দর্যময় অপরূপ শিল্পরূপ। রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্যকলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কথাকলির প্রসারে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভূমিকা ছিল, তাঁর অনেক নৃত্যনাট্য কথাকলি রীতিতে রূপায়িত হয়েছে। আবার, অনেক স্থানে কথাকলি নৃত্যের বিষয়বস্তু রূপে রবীন্দ্রনাটককে গ্রহণ করা হয়েছে। "ওখানকার সুপ্রসিদ্ধ কথাকলি নৃত্যের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছে চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন, পূজারিনী প্রভৃতির গল্পাংশ। এমনি একখানি গ্রন্থ কৃষ্ণ ওয়ারিয়র প্রণীত 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৬২)। এটি ঠিক অনুবাদ নয় আবার মৌলিক রচনাও বোধ হয় বলা চলে না একে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ও কেরলের কথাকলি এই দুয়ের মিশ্রণে এটি একটি 'আট্ট কথা' (নৃত্যনাট্য)।'[১৭] এন. ভি. কৃষ্ণ ওয়ারিয়রের গ্রন্থটির সম্পূর্ণ নাম 'চিত্রাঙ্গদা আট্টকথা' বা চিত্রাঙ্গদা নৃত্যকথা। এটা ১০টি দৃশ্যে বিন্যস্ত, চরিত্র হল ৫টি : চিত্রাঙ্গদা, অর্জুন, কামদেব, বসন্ত ও বনচর। সংস্কৃত কাহিনীর উপাদান লেখক অনেক গ্রহণ করেছেন যদিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশী। এন. ভি. কৃষ্ণ ওয়ারিয়র শরৎচন্দ্রের অনেক রচনাও অনুবাদ করেছেন।

ঈ. মলয়ালমে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নৃত্যনাট্য দুটি শিল্পরূপই বিশেষ মূল্য পেয়েছে কেরালার মঞ্চে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাকলি নৃত্য সাধনার এক গভীর সংযোগ ছিল। কথাকলি নৃত্যরীতি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে কথাকলির প্রয়োগ ঘটেছে, যেমন 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শ্যামার নৃত্যভঙ্গীতে কথাকলিরই প্রকাশ। বিশিষ্ট কবি ও নৃত্যশিল্পী বল্লত্তোল রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় আন্তরিক ছিলেন, রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। তাঁর নৃত্যসাধনাও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। "একথা স্বীকৃত সত্য যে কথাকলি নৃত্যকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য ১৯৩০ সালে তিনি যে 'কেরল কলামণ্ডলম' স্থাপন করেন তার মূলে ছিল

রবীন্দ্রসাধনার প্রেরণা। গুরু ঋণের স্বীকৃতি হিসাবে বল্লভোল ১৯৩৯ মার্চ মাসে সদলবলে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথকে কথাকলি নৃত্য কলা দেখিয়ে যান এবং কবিও নাকি সেই অনুষ্ঠান দর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।"[১৮]

কথাকলি রীতিতে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। কথাকলি নৃত্যগুরু কেলু নায়ার রবীন্দ্রভবনের শিক্ষক ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে 'তাসের দেশ' ইত্যাদি নৃত্যনাট্যে অংশ নেন রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে। কেলু নায়ার কথাকলি রীতিতে 'কালমৃগয়া' করেন ১৯৬৫ তে যাতে তিনি স্বয়ং অন্ধমুনির অভিনয় করেন। ১৯৬৭ সালে কেলু নায়ারের 'চিত্রাঙ্গদা' বিশেষ প্রশংসিত হয়। এই নাটকের রীতি ও ভঙ্গী, পেষাক সাজসজ্জা, যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদি সবই কথাকলি ঢঙের, গান ছিল বাংলায়। এতে অর্জুনের ভূমিকায় ছিলেন কেলু নায়ার। গোবিন্দন কুট্টি করেন মদন। কলকাতায়ও এটি মঞ্চস্থ হয়।

পি. গোবিন্দন কুট্টি কথাকলি নৃত্যের সুদক্ষ শিল্পী। তিনি কথাকলি রীতিতে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। তাঁর এক বিশেষ অনুষ্ঠান হল 'রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে কথাকলি।' কথাকলি আঙ্গিকে তিনি অর্জুন, অরুণেশ্বর ও বজ্রসেন চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন। মুদ্রাভিনয়, অঙ্গ চালনা, নৃত্যরীতি সবই কথাকলি রীতির, রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়েছিল বাংলায়। ১৯৮৪ সালে এটি প্রযোজিত হয়।

পি. গোবিন্দন কুট্টি বিভিন্ন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করেছেন দলের সঙ্গে এবং সর্বত্রই তাঁর নাচের রীতি কথাকলি। 'চিত্রাঙ্গদা'য় তিনি অর্জুন করেছেন কথাকলি রীতিতে, পূর্ণিমা ঘোষ চিত্রাঙ্গদা করেছেন মণিপুরী ঢঙে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বাল্মীকি, 'মায়ার খেলা'য় অমর, 'চণ্ডালিকায়' আনন্দ, 'শ্যামা'য় বজ্রসেন—সবই কথাকলি রীতিতে। তাঁর 'শ্যামা'র একক অভিনয় নিয়ে সমালোচকের মতামত উল্লেখ করা যায়—

"গোবিন্দন কুট্টি রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' কথাকলি নৃত্যশৈলীতে পরিবেশন করেন, কিন্তু একক অভিনয়ের মাধ্যমে। শ্যামার মতন বিষয়বস্তুর গভীরতায় বিশিষ্ট, গানে-অভিনয়ে সমৃদ্ধ এক নৃত্যনাট্যকে একক অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে উপস্থাপন করার প্রয়াস সাধু হলেও দুঃসাধ্য। গোবিন্দন কুট্টির কৃতিত্ব হল, এই কঠিন পরীক্ষায় তিনি উতরে গেলেন। পুরুষ-প্রধান কথাকলির নৃত্যপ্রকরণের সঙ্গে বজ্রসেনের ভূমিকা সঙ্গতি রেখে চলবে সেটাই প্রত্যাশিত। গোবিন্দন কুট্টি বজ্রসেনকে মঞ্চে জীবন্ত করে তুলেছিলেন তাঁর ব্যঞ্জনাময় অভিনয় গুণে। বিশেষ করে, 'হৃদয় বসন্ত বনে যে মাধুরী বিকাশিল' বা 'আহা একি আনন্দ'-গানের রূপায়ণ শিল্পীর সহজ-সুন্দর নৃত্যভঙ্গি ও ভাব-অভিব্যক্তির সাবলীলতার গুণে মনোহারী হয়ে উঠেছিল। তুলনায় শ্যামার চরিত্রচিত্রন চলনসই পর্যায়ের উপরে ওঠেনি। 'নহে নহে এ নহে কৌতুক'-শ্যামার এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে শিল্পীর যেন বেগ পেতে হয়েছিল বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের সার্বিক আবেদনে গানের ভূমিকা নগণ্য নয়—একথা সকলে জানেন। তাই সেদিনের অনুষ্ঠানের সাফল্যের পিছনে অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও মধুশ্রী বসু রায়চৌধুরীর অবদান আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে"।[১৯]

হিন্দুস্তানী ক্লাসিকাল মিউজিক ও রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে 'মেঘের পরে মেঘ' অনুষ্ঠান করেছিল 'ত্রিবেণী', পরিচালনায় সুমিত্রা সেন। এতে গোবিন্দন কুট্টি কথাকলি, থাঙ্কমনি কুট্টি ভরতনাট্যম এবং শ্রীলেখা মুখার্জী কথক নৃত্যরীতির প্রয়োগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটক মলয়ালম ভাষায় অভিনীত হয়েছে। ১৯৬১ সালে মাদরাজের ঐতিহ্যমণ্ডিত মিউজিয়াম থিয়েটারে অভিনীত হয় 'মাস্টার মশায়'। প্রযোজক

সংস্থা কেরালা সমাজ। রবীন্দ্র শতবর্ষে ও তারপর বিভিন্ন সময়ে কেরালায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও অব্যবসায়িক সংস্থায় রবীন্দ্রনাথের কিছু নাটক অভিনীত হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে মলয়ালম ভাষায় রবীন্দ্রনাটক পুনরায় প্রযোজিত হচ্ছে। ১৯৮৫-তে কলকাতায় 'রাজা' নাটকের অংশবিশেষ উপস্থাপিত করেন মারিয়াম কোশী। রবীন্দ্রনাথের ১২৫ জন্মবার্ষিকীতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাট্য সভায় কেরালার তরুণ শিল্পী জোস চিরামেল মঞ্চস্থ করেন মলয়ালমে 'বিনি পয়সার ভোজ' যা বিশেষ প্রশংসিত হয়। "জোস চিরামেল রবীন্দ্রনাথের 'বিনিপয়সার ভোজ' (ওসিয়িল ওরু ভিরুন্তু — মলয়ালমে তাঁরই রূপান্তর) বিস্ময়কর রূপে উপস্থাপিত করেন। তাঁর উচ্চমানের অভিনয় দক্ষতা এতে পরিস্ফুট।"[২০]

১৯৮৬-তেই রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' মলয়ালমে মঞ্চস্থ হয়। অনুবাদ ভি. উন্নিকৃষ্ণণ নায়ার, অভিনয়ে অংশ নেন অর্জুন-এন এম জন, এবং চিত্রাঙ্গদা-বিজয়লক্ষী নায়ার।

রবীন্দ্র আবির্ভাবের ১২৫ বর্ষে নিউইয়র্কে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয় ১৯৮৬-র মে মাসে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছিল মলয়ালম ভাষায় 'বাসবদত্তা'। নাটকটি কুমারন আসানের 'করুণা'র সঙ্গে বেশী সম্পর্কিত, তবে রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার'ই এর ভিত্তি। তাই রবীন্দ্র অনুষ্ঠানে এটি পরিবেশিত হয়।

রবীন্দ্রসদনে কেরল নৃত্যকলা কেন্দ্রম-এর উদ্যোগে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। "বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্যকলায় যে মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছিলেন তা প্রশংসনীয়।"[২১] ডি এস জানকী (উত্তীয়), বৈশালী চৌধুরী (শ্যামা), জয়তী দেব চৌধুরী (বজ্রসেন) এবং অনুপম কৈমাল (কোটাল) এর অভিনয় ও নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিচুর কেরালার নিরীক্ষাধর্মী নাট্যসংস্থা 'রুট' ১৯৮৬-র অক্টোবরে এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করে যেখানে রবীন্দ্রনাথের চারটি ছোট নাটক অভিনীত হয়। অভিনীত চারটি নাটক হল—সূক্ষ্মচর্চা, রসিকন, বিনি পয়সার ভোজ, রোগী-কলুডে মিত্রম (রোগীর বন্ধু)। চারটে নাটকের পরিচালক জোস চিরামেল। প্রতিটি নাটকের পর ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। সূচনায় ছিল রবীন্দ্রনাথের নাটকের আলোচনা। ত্রিচুরের সাহিত্য একাডেমী হল-এ ১২ অক্টোবর ১৯৮৬-র এই অনুষ্ঠান দর্শকদের কাছে আনন্দের এক নতুন আস্বাদ নিয়ে আসে। রুট সংস্থা আরো অন্য জায়গায়ও এই সব নাটক মঞ্চস্থ করে।

১৯৮৭-র মে মাসে দিল্লীতে আয়োজিত রবীন্দ্রনাট্যোৎসবে নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' কথাকলি রীতিতে পরিবেশন করেন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফল কথাকলি, নিউদিল্লী। এই নৃত্যনাট্য দর্শকদের কাছে অভিনন্দিত হয়। কোরিওগ্রাফার ছিলেন সদানম বালকৃষ্ণন যিনি অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটকটি সম্বন্ধে সংবাদপত্রে মতামত উল্লেখ করা যায়—

CHITRANGADA : Tagore was perhaps the first Indian choreographer — long before Uday Shankar to utilise different styles, such as Kathakali, Manipuri, Kandyan and various folk dances. Chitrangada was the Princess of Manipur and Tagore introduced Kathakali into this dance-drama of Chitrangada. It had an electrifying effect on the audience then.

With Sadanam Balakrishnan of the International Kathakali Centre as the chereographer, the Kathakali element has been further emphasized in this production. Balakrishnan himself donned the role of Arjuna and he

excelled in exposing the weakness of Arjuna for a pretty face with a fine sense of humour.

Revathi Iyer, who is fast emerging as one of the best female exponents of Kathakali in the Capital, played the role of Chitrangada with versatility. Uma Poduval as Kamadeva and Kavita Sreenivasan as Chitrangada (Lalita), were commendable[22].

কেরালায় রবীন্দ্রনাট্যচর্চা আজও অব্যাহত। কেরালায় রবীন্দ্র ভাবাশ্রিত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম 'মিত্র নিকেতন' যা শান্তিনিকেতনের মডেলে গড়ে উঠেছে। আদর্শ বিদ্যালয়, মুক্ত বিদ্যালয় ও লোকসংস্কৃতিচর্চার অন্যতম কেন্দ্র এটি—শিক্ষা শিল্প ইত্যাদির চর্চাও এখানে হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ কে বিশ্বনাথন যিনি এক সময় শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এরা করেন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' মলয়ালম ভাষায় ১৯৯৭-তে। যাত্রা আঙ্গিকে চতুর্দিকে দর্শক পরিবেষ্টিত হয়ে নাটকটি উপস্থাপিত হয়। নাটকের কসটিউম মেক আপ সবই কেরালীয়। দর্শকরা নাটকটিকে আন্তরিকভাব গ্রহণ করেন, তাঁরা কখনো মনে করেননি যে এটা অন্যভাষার নাটক। নাটকের পরিচালক ড. দীপক চন্দ্র পোদ্দার।

শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বল। তাঁর 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' কথাকলি রীতিতে উপস্থাপিত হয়ে রসিক দর্শকদের আনন্দবিধান করে। পত্রিকায় লেখা হয়—

Tagore in Kathakali

It is an unique experience to be a part of the tragedy of Karna, the abandoned hero of the Mahabharata. The tragedy was enacted at Gyan Manch but with a difference. This time it was happy blending of Tagore's poem "Karnakunti Sambad" and Kathakali, Kerala's very own performing art.

Schooled in Kathakali by Kalamandalam Raman Kutty Nair and inspired by the legendary Guru Gopinath who brought new life to the art form, Kalamandalam Murali, now a teacher of Viswa Bharati, offered a Calcutta audience a new experience. The rich voice of Mrityunjoy Chattopadhyay who recited the passages of Karna, written by Tagore, with Murali in the traditional costume of Kathakali brought to life deeply felt emotions. The audience was drawn into sympathy for the wronged hero.

Why had "Arjun janani" come to Karna in the battlefield and why did he not accept Kunti's offer to fight on the side of the Pandavas? These are some of the questions in the drama answered in the language of Kathakali. Murali is an excellent actor and Nandini Mukherjee, his disciple, lived up to the role of Kunti. The white costume worn by her in the typical Kathakali fashion was aesthetically beautiful.

However the Hindusthani classical music to recreate the tragedy of an abandoned son and his repentant mother had a flaw. It reminded the audience of an altogether different period in history.

(The Statesman 21.5.99 Tapati Chowdhurie)

মিত্র নিকেতন ত্রিবান্দ্রমের উদ্যোগে আরো একটি নাটক প্রযোজিত হয়, নাম—'নামোকো দীপঙ্গল তলৈকম' (আমরাই আমাদের আলো জ্বালব)। এটি লিখেছেন টি মাধবমেনন। সূর্য নিভে যাচ্ছে, সে আর উঠবে না। সবাই চিন্তিত, কি হবে এখন। সবাই

ভাবছে, আলোচনা করছে, বড় বড় কমিটি হচ্ছে—কিন্তু সমাধান হচ্ছেনা সমস্যার। তখন দেখা গেল একটা ছোট মেয়ে প্রদীপ নিয়ে আসছে। এই দীপশিখা দেখে নতুন ভাবনা খেলে গেল। সবাই ভাবল, প্রত্যেকেই যদি আলো জ্বালাবার চেষ্টা করে তাহলে ছোটভাবে হলেও সমস্যার সমাধান করা যাবে। নাট্যকারের বক্তব্য—বিশ্বব্যাপী কোন সমস্যা বা সংকটকে যদি স্থানিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা যায় তাহলে সমস্যার কিছুটা প্রতিকার হবে। নাটকের ভাব নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা থেকে—'কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যারবি'। এই কবিতার এমন ভাবময় রূপান্তর অন্য কোন ভাষায় হয়েছে বলে জানা নেই। নাটকটি পরিচালনা করেছেন ড. দীপকচন্দ্র পোদ্দার।

রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতাটি দ্বিচারিত্রিক নাটক রূপে সজ্জিত করেছেন দিলীপ কুমার মিত্র। নাটকটি মলয়ালম ভাষায় অনুবাদ করেন ড. কে মাধবন। নাটকটি ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়া আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত হয় বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বদের সামনে। শিল্পী ছিলেন ড. মাধবন ও শ্রীমতী সহিনা পি অহস। অনুষ্ঠানের সময় ১৭ মে ২০০০।

১৯৯৫-এ আকাশবাণী ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় 'রাজা'; পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ড. দীপক চন্দ্র পোদ্দার। ১৯৯৬-এ আকাশবাণী ত্রিচুর থেকে সম্প্রসারিত হয় 'মুক্তধারা', পরিচালক সি পি আর নায়ার। আকাশবাণী থেকে মলয়ালম ভাষায় অন্যান্য রবীন্দ্রনাটকও সম্প্রচারিত হয়েছে।

(৫) শরৎচন্দ্র ও মলয়ালম নাটক

শরৎচন্দ্রের নাম কেরালায় প্রতি ঘরেই শোনা যায়। শরৎচন্দ্রের প্রভাব মলয়ালম উপন্যাসে প্রবল। নাটকের ওপর সে প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই শরৎচন্দ্র অনূদিত হতে শুরু হয়েছেন মলয়ালম ভাষায়। ত্রিশের পর থেকে শরৎচন্দ্র বেশ পরিচিত। সমাজ সংস্কার, প্রথাবদ্ধ যান্ত্রিক নিষ্ঠুর নীতি নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজে নারীর অসহায় অবস্থার চিত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মলয়ালম লেখকদের মিল আছে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মলয়ালম নাট্য সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন সমালোচক ও. এন. ভি. কুরুপ[২৩]। কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজকে শরৎচন্দ্র প্রবল আঘাত করেছেন, কেরালার নাট্যকাররাও তাই করেছেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কিছুটা মিল পাওয়া যায় ভরতরতন নামবুদিরিপাদ-এর ১৯৩০-এ প্রকাশিত 'আপ্‌পানডে মগল' (বাবার মেয়ে) নাটকের সঙ্গে। ভি. টি. ভট্টতিরিপাদ ও তাঁর অনুগামীরা যেসব নাটক লিখেছেন ও মঞ্চস্থ করেছেন তাদের সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য আছে। নামবুদিরি মেয়ের যন্ত্রণা যে বয়ঃসন্ধির পর বাইরের আলো দেখতে পায় না, নামবুদিরি পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের আইনগত অধিকার এবং অন্যান্য পুত্র-কন্যাদের বেদনা ও দাহ, নামবুদিরি তরুণের আধুনিক জীবনের জন্য তীব্র উন্মাদনা, গোঁড়া প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘাত — রিফরমিষ্ট নাটক উপন্যাসাদির এসবই বৈশিষ্ট্য। 'নির্যাতীত নারী'-র কথাও সেখানে আছে অবশ্য এদের পটভূমি বা স্থাপন ঠিক শরৎচন্দের নারী চরিত্রের মত নয়। শরৎচন্দ্রের শেষ দিকের উপন্যাসে যে আদর্শ ও প্রতিবাদী মানসিকতা আছে ভি. টি. ভট্টতিরিপাদ ও অন্যান্য নাট্যকারদের রচনায় তারই প্রকাশ।[২৪]

শরৎচন্দ্রের 'রমা' নাটক মলয়ালমে অনুবাদ করেন আর নারায়ণ পানিক্কর ১৯৪৭ সালে। বিশিষ্ট নাট্যকার কে. সুরেন্দ্রন ছিলেন শরৎচন্দ্রের অনুরাগী। তিনি 'বিন্দুর ছেলে'

অনুবাদ করেন 'প্রেম সাগরম' নামে ১৯৪৭-এ। কে সুরেন্দ্রনের নাটকে নারী জাতির বেদনার কথা আছে। তাদের দুঃখযন্ত্রণা বেদনা দাহ তিনি এঁকেছেন। এ প্রসঙ্গে 'বলি' (১৯৫৩) নাটকের কথা মনে পড়ে। নাটকের নায়িকা মাধবী যে চিরকাল অবিবাহিতা থেকে সংসার চালায় কিন্তু পরিনামে পায় দুঃখ লাঞ্ছনা। প্রেমিক পুরুষকে কাছে পাওয়া তার কোনদিন ঘটে না। 'বলি'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বড় দিদি উপন্যাসের মিল আছে। দুটি কাহিনীই নায়িকার নাম মাধবী, কেউই বিবাহিত জীবনের স্বাদ পায়নি — একজন বাল্য বিধবা, আর একজনের বিবাহ হল না, দুজনের কেউ প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতে পারল না, যদিও তাদের ভালবাসা গভীর কিন্তু তা পূর্ণতা পেল না; অন্তহীন দুঃখে দুজনের জীবন নিঃশেষিত হয়।

৬. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও মলয়ালম নাটক

ক. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক মলয়ালমে

আই. পি. টি. এ. বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে কেন্দ্র করে এক সময় সারা ভারতের নাট্য ভাবনা সমান ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। বাংলা ও কেরালার মধ্যেও এ বিষয়ে সমতা আছে। দুদেশের রাজনীতি সচেতনতা, সমাজ নিষ্ঠা, প্রগতিশীল চিন্তা দুই মানসিকতাকে সমসূত্রে গেঁথেছে। তিন দশকের নাটকের মধ্যেও তার প্রকাশ দেখা গেছে। শাসক ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জমিদারের অত্যাচারের প্রতিবাদ, মালিক শ্রেণীর স্বরূপ নির্ণয়, কৃষক ও শ্রমিকের অধিকার অর্জন, নারীদের যথাযথ স্থান নির্ণয় ইত্যাদি মানসিকতা মলয়ালম নাটকে দেখা গেল যার সঙ্গে বাংলার মিল আছে। কে দামোদরন ('পাট্টা বাকি' ১৯৩৮), কে. রামকৃষ্ণ পিল্লা ('প্রতিমা'), পি. জে. এন্টনী (নাঙালয়ুডে মান্নু—আমার মাটি), পোঙ্কুন্নন বার্কী (জেটাকন, প্রেমবিপ্লবম), এডাম্সেরী গোবিন্দন নায়াব (কুট্ট কৃষি ১৯৫০), তোপ্পিল ভাসী (নিঙ্গলেন্নে কম্যুনিষ্ট আক্কি ১৯৫২) প্রমুখের সঙ্গে বাংলার নাট্যকারদের ভাবনার সাদৃশ্য আছে।

ভাসীর 'পুথিয়া আকাশয়ুম পুথিয়া ভূমিয়ুম' (নতুন আকাশ নতুন পৃথিবী ১৯৫৯) নাটক এক তরুণ আদর্শবাদী ইঞ্জিনিয়ারের কথা যার সঙ্গে সংঘাত লাগে তার শ্বশুরের যার স্বার্থ জড়িত আছে বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে। বাঁধ তৈরীর কাজে দুজনের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে ও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে ইনজিনিয়ার। এই বিষয় নিয়ে বাংলায় নাটক লিখেছেন বীরু মুখোপাধ্যায়—'চার প্রহর'। দুটি নাটকের মধ্যে ভাবনাগত আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

বাদল সরকার কেরালায় বিশেষ পরিচিত নাম। তাঁর নাটকের বক্তব্য ও আঙ্গিক (থার্ড থিয়েটার) কেরালার নাট্য রসিক মানুষদের কাছে আবেদনশীল হয়েছে। যদিও বাদল সরকার কথিত থার্ড থিয়েটার ফর্ম কেরালায় আগে থেকেই প্রচলিত এবং সম্প্রতিকালে কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি সংস্থা এভাবেই নাটক করে। ছোট ছোট নাট্য রেখাচিত্র দ্বারা তারা বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়, সমাজ-সমস্যা, অরণ্য ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি বিষয় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। তবু বাদল সরকারের মধ্যে একটা শৈল্পিক ও বিষয়গত প্রত্যয় মলয়ালম শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছে এবং বাদল সরকার সেখানে গৃহীত হচ্ছেন। বাদল সরকারের 'ভোমা' মালয়ালম ভাষায় অনূদিত ও অভিনীত হচ্ছে। কেরালার 'রুট' এই নাটক অভিনয় করেছে ত্রিচুর ও অন্যান্য স্থানে। বোম্বাইতে এটি রূপায়িত হয়েছে মলয়ালমে জোস চিরামেলের নির্দেশনায়। বাদল

সরকারের 'মিছিল' নাটকটি মানবেন্দ্রনাথ রূপায়িত করেন 'ঘোষযাত্রা' নামে এবং এটি অভিনীত হয়।

বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার ফর্ম কেরালায় বিশেষ সমাদৃত। তাঁর নাটকের বক্তব্যও। কেরালার একটি দল কলকাতায় আসে। নাট্যমুখপত্র (৯.১.১৯৯৭) এ সম্বন্ধে জানিয়েছেন—

কেরালার যুবকরা বাদল সরকারের ধারায় নন্দন প্রাঙ্গণে অভিনয় করে গেলেন

'থিয়েটার আই' কেরলের ত্রিচুড় থেকে আগত আট-দশজন ছেলেদের একটি দল। এঁরা গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে (১৯৯৬) 'নন্দন' প্রাঙ্গণে প্রথম অভিনয় প্রদর্শন করেন। 'থিয়েটার আই' তাঁদের শৈশবাবস্থা থেকে তেমন ভাবে বেরিয়ে আসতে পারেনি, অবশ্য, থিয়েটারের ক্ষেত্রে তিন বছর সময়টা খুব বেশী নয়।

এদিন এঁরা চারটি স্কেচের মধ্য দিয়ে এঁদের আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়কলা প্রদর্শন করে উপস্থিত দর্শকদের মাতিয়ে দেন। শুরু এবং শেষে দু'টো মালয়ালি লোকসঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করলেন। নাটক শুরুর আগে 'থিয়েটার আই'-এর কর্ণধার সুরজিৎ প্রতিটি স্কেচ সম্পর্কে বলে দেন। প্রথম স্কেচটি ছিল ব্রিজ অর্থাৎ সেতু। দুটি চরিত্র একজন রক্ষী এবং অপরজন সাধারণ মানুষ। একটি সংরক্ষিত পুকুরের ওপরে একটি ব্রিজ যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ অথচ একটি লোক ঢুকে পড়ে এবং মাছ ধরা শুরু করে। অবশেষে রক্ষীর নজরে পড়ে যায় এবং স্থানত্যাগ করার নির্দেশ ও না মানার ইচ্ছা এই নিয়ে চলে বিতণ্ডা। দ্বিতীয়টির নাম 'গিলিগুার', মানুষ এই স্কেচের বিষয়। দুটি চরিত্রের মধ্যে শুরু হয় কান্না ও হাসির অভিনয়। এতে আঙ্গিক অভিনয় একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছে। তৃতীয়টা ছিল 'কোয়া কোয়া'। দুজন মানুষ তাদের উদ্দেশ্য শিকার করা। একদল পশুকে (যা হোক না কেন) তাড়া করা ও তাদের একজনকে ধরে তাকে শিকার করা। আর ছিল 'অ্যাকটিভ ম্যান ও প্যাসিভ ম্যান' — একজন মানুষ সক্রিয় থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় আবার একজন নিষ্ক্রিয় মানুষকে কীভাবে চেষ্টা করে সক্রিয় করে তোলা যায় তারই প্রদর্শন। পুরো ব্যাপারটাই শরীরী প্রদর্শন। এতে মাইমের সংযোজন ও অবয়বের ভূমিকাটাই প্রধান ছিল।

দলের নির্দেশক সুরজিৎ। জানতে চেয়েছিলাম আপনারা ওখানে কি-ভাবে কাজ করেন? উত্তরে জানালেন প্রত্যেকে অন্যান্য কাজকর্মের পরে থিয়েটার নিয়ে কাজ করেন। তবে নিষ্ঠাটা কম নেই এটা জানাতে ভুললেন না। থিয়েটারের আভ্যন্তরীন সংকট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন যে, আমার মনে হয় কেরালা ও বাংলা দু'টো স্বতন্ত্র রাজ্য হলেও থিয়েটারের সংকটের চেহারাটা উভয় জায়গায় একই। সরকারী অনুদান কখনো সঠিক হাত দিয়ে আসেনা। আর তেমন কিছু মেলেনা বলে জানালেন। বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতির সঙ্গে কিরকম পরিচিতি আছে জিজ্ঞাসা করতে বললেন রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে পরিচয় ঘটেছে। এছাড়া তেমন কিছু নেই।

কলকাতা ও কলকাতার মানুষ প্রসঙ্গে বললেন, খুব ধোঁয়া আর মানুষ খুবই ভালো এবং ভীষণ সহযোগিতা করেছে। সব জায়গাতেই সহযোগিতা পেয়েছি। অঙ্গন থিয়েটারে তেমন ভাবে মেকআপের ব্যবহার নেই কিন্তু আপনারা মেক-আপ করেন কেন? বললেন অভিনেতা ও দর্শক বোধটা রাখার কারণে মেকআপ্ পোশাকের ব্যবহার করা। কলকাতায় এঁদের প্রথম সফর কেরালার বাইরে। এরপর এঁরা যাবেন মুম্বাই, বরোদা। দলের

অন্যান্যরা হলেন, জোস, রাফেল, জেমস্, রাজন, গোপালন, হ্যারি নিশাদ ও দলের একমাত্র বাঙালী ছেলে অভিরূপ। এঁরা বাদল সরকারের একটি নাটক অভিনয় করছেন মালয়ালি ভাষায়। — 'বিয়ন্ড দ্য ল্যান্ড অব্ হট্রমেলা'। অ্যাকাডেমির ছেলেদের এ ব্যাপারে ধন্যবাদ জানাতেই হয় কারণ এরাই এখানে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যদিও এঁরাও বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের ছেলে যাঁরা সাংগঠনিক দিক দিয়েও সমান সক্রিয়। এঁরা কলকাতায় আরও দুটো অভিনয় প্রদর্শন করবেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও প্রেসিডেন্সী কলেজ। (বরুণ মৈত্র)

উৎপল দত্ত-র 'অজেয় ভিয়েতনাম' মলয়ালমে অনুবাদ করেছেন সি কে সোমন 'ভিয়েতনাম' নামে যেটা প্রকাশ করেন প্রখ্যাত বামপন্থী একাশক চিন্তা পাবলিশার্স ত্রিবান্দ্রম ১৯৭৮ সালে। উৎপল দত্তর 'সূর্যশিকার' নাটক অনুবাদ করেন কে. পি. করতা, রূপান্তরিত নাম 'সুর্যভেট্রা'। এটি 'দৃশ্যকাব্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নাটকটি কেরালার বিভিন্ন স্থানে অজস্রবার অভিনীত হয়েছে। প্রথম অভিনয় করে 'রুট' সংস্থা ১৯৮৩ সালে। বোম্বাই-এর সম্মুখানন্দ হল-এ 'সূর্যভেট্রা' মঞ্চস্থ হয় ১৯৮৫ সালে 'ডেকোরা' সংস্থার উদ্যোগে। পরিচালক — জোস চিরামেল।

বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' মলয়ালমে অনুবাদ করেছেন কে. পি. এ. যেমন। অনূদিত নাম-'পুত্তরি চোরু' (পুত্তরি-নতুন, চোরু-অন্ন, ভাত)। ১৯৭২ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

খ. সাম্প্রতিক মলয়ালম নাটক বাংলায়

মলয়ালম নাটক বাংলায় এসেছে তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে কথাকলির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। কথাকলি নৃত্যরীতির সৌন্দর্য মাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁর নৃত্যনাটকে এই রীতিব প্রয়োগ তিনি করেছেন 'শ্যামা' প্রভৃতিতে। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

প্রথম উল্লেখ্য মলয়ালম যে নাটক বাংলায় অনূদিত হয়েছে তা হল আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা 'নিঙ্গলএন্নে কমিউনিস্ট আক্কি'। তেপ্পিল ভাসী রচিত এই নাটক বাংলায় রূপান্তর করেন বোম্মানা বিশ্বনাথম ১৯৬৬ সালে। বাংলাতেও এই নাটকটি আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এটি অভিনীতও হয়। রূপান্তরিত নাম "তুমি আমায় কমিউনিস্ট করেছ"।

অমিতাভ আচার্য চক্রবর্তী অনুবাদ করেন ওমচেরী এল পিল্লার নাটক 'থেভারুডে আনা'। রূপান্তরিত নাম 'মন্দিরের হাতী'। নাটকটি থিয়েটার বুলেটিন পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯৭৮ সালে।

সাম্প্রতিক কালে মলয়ালম বেশ কিছু নাটক বাংলায় অনূদিত হয়েছে ও অভিনীত হয়েছে। মলয়ালম ছোটগল্পও নাট্য-রূপায়িত হচ্ছে। মলয়ালম সাহিত্যে যে জীবনবোধ যে সমাজ সচেতনতা আছে বাংলার শিল্পীরা তার সঙ্গে সমমর্মিতা অনুভব করেছেন বলেই এই নাট্য-প্রয়াস। প্রখ্যাত কথাশিল্পী নাট্যকার পি. কেশব দেব 'গুস্তি' (কুস্তি) নামে একটি ছোটগল্প লেখেন যাতে দেখানো হয়েছে সামান্য বিষয়কে নিয়ে কিভাবে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগতে পারে যার ফল হিন্দু মুসলমান উভয়ের পক্ষেই ভয়াবহ। এই গল্প অবলম্বনে লেখা হয়েছে একটি নাটক 'সাম্প্রদায়িক' যেটি 'ও থিয়েটার থিয়েটার' পত্রিকায় ১৯৮৪-তে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক দিলীপ কুমার মিত্র।

বিশিষ্ট লেখিকা কমলা দাসের লেখা 'চোদ্দ দিনের যুদ্ধ' ছোট নাটকটি বাংলায়

অনুবাদ করেছেন পূর্ণশ্রী মিত্র 'যুদ্ধ' নামে। নাটিকাটি 'সাহিত্য এখন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ১৯৮৫-তে। কমলা দাসের 'টি. ভি. স্ক্রীন প্লে' বাংলায় অনুবাদ করেন লক্ষ্মী প্রামাণিক। নাটকটি 'ভারতীয় একাঙ্ক গুচ্ছ' নাট্যসংকলনে গ্রথিত হয়েছে। নাটকের নাম 'ডাক্তার'।

প্রখ্যাত গল্পকার এস. কে. পোট্টেকট-এর একটি গল্প বাংলায় নাটকায়িত করেন পূর্ণশ্রী মিত্র 'আরজি' নামে। নাটকটি এক সংলাপী রচনা যেটি অভিনীতও হয়। "আরজিতে সমাজ সংসারের চাপে ঘৃণ্য জীবন-যাপন রত এক নারীর ক্ষোভ বেদনা প্রবল দহন একক অভিনয়ে সুন্দর তুলে ধরেছেন বীথি চৌধুরী।"[২৫]

গল্পকার বৈক্কম মুহম্মদ বশীর-এর 'সেকেন্ড হ্যান্ড' গল্পটিকে নাট্যরূপ দেওয়া হয় ও তাকে শ্রুতি নাটকের ঢঙে উপস্থাপিত করা হয় (নাটক — দিলীপ কুমার মিত্র) কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় নাট্য সমাবেশ-এ। পত্রিকায় লেখা হয়—"বৈক্কম মুহম্মদ বশীর-এর 'সেকেন্ড হ্যান্ড' এক প্রতারিত অসহায় নারীর মর্যাদা লাভের কাহিনী — পুষ্পল মুখার্জী, কৃষ্ণেন্দু দে ও লীলা দাশগুপ্তর অভিনয়ও চমৎকার।"[২৬] একই কাহিনীর নাট্যরূপ দেন মানবেন্দ্র সেন ও অভিনয় করেন 'মঞ্চদূত'।

প্রখ্যাত নাট্যকার সি. জে. টমাস-এর '১২৮ লে ব্রাইম ২৭' আইন শাসন ও সমাজনীতির ওপর তীব্র ব্যঙ্গ। এই নাটকটি বাংলায় 'ক্রাইম ২৭' নামে একাঙ্ক রূপায়িত করা হয় ও তাকে নতুন রীতিতে উপস্থাপিত করা হয় কলকাতায় ১৯৮৫-তে। "সি জে টমাসের 'ক্রাইম ২৭' থার্ড থিয়েটার ফর্মে পরিবেশিত হয়।"[২৭] প্রযোজনা ছিল আকর্ষণীয়।

নাট্যকার নাট্য-পরিচালক জি. শংকর পিল্লার 'পরাজিতন' নাটককে বাংলায় নতুনভাবে রূপান্তরিত করেছেন পূর্ণশ্রী মিত্র (ও দিলীপ কুমার মিত্র)। কাব্য নাটকের ঢঙে লেখা হয়েছে এটি, রূপান্তরিত নাম 'অর্জুন দুঃশলা'। কলকাতায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, ১৯৮৫-র ৮-মে ড্রামা একাডেমী ইন্ডিয়ার উদ্যোগে। 'দেশ' পত্রিকাব মতে এই নাটক 'পুরানের মুকুরে বর্তমানকে দেখা।"[২৮] আজকাল এ সম্বন্ধে লিখেছে—"জি. শংকর পিল্লাই-এর মলয়ালম নাটকের ভাবাশ্রিত 'অর্জুন দুঃশলা' মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও এতে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা আধুনিক। সুন্দর অভিনয়ে তা প্রস্ফুটিত হয়।"[২৯] এটি মুদ্রিত হয় ১৯৮৬-তে। বাংলায় রূপান্তরিত এই নাটক আবার গুজরাতীতে অনূদিত হয় ও অভিনীত হয় ভারতীয় ভাষা পরিষদ মঞ্চে।

এন. এল. পিল্লা (ওমচেরী) রচিত 'প্রলয়ম' বাংলায় অনুবাদ করেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক কুমার রায়। এটি প্রকাশিত হয়। এটি মঞ্চস্থ করেন 'ঋত্বিক', পরিচালক — প্রণব চট্টোপাধ্যায় যিনি নোয়ার ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন কল্পনা বিশ্বাস, কাবেরী বসু, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, শীলা মিত্র, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, করবী মজুমদার প্রমুখ। ঋত্বিক-এর স্মারক গ্রন্থে এই নাটক সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"বাইবেলে বর্ণিত নোয়া এবং সেই মহা জলপ্লাবনকে ভিত্তি করেই এন্ এন্ পিল্লাই-এর 'প্রলয়'। যুদ্ধের বিভীষিকায় পঙ্গু এই শতাব্দীর এক নোয়ার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে আবার এসেছে ঈশ্বরের আহ্বান—'সাতদিনের মধ্যে পৃথিবী ধ্বংস হবে। তুমি অর্ণবপোত নির্মাণ কর।'

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অলীক কল্প কাহিনী রচনা করলেন তাঁর স্ত্রী। জনসংযোগের সমস্ত আধুনিক মাধ্যমগুলির মাধ্যমে বিশ্বের ব্যাপক জনসমষ্টির মধ্যে পৃথিবী ধ্বংসের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বের নানা প্রান্তে দেখা দিল নানাধরণের প্রতিক্রিয়া।

ক্ষমতালোভী মিসেস নোয়া এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারে সচেষ্ট হলেন। জাহাজে একটি সিটের বিনিময়ে তিনি সমস্ত পৃথিবীর অর্থ এবং ক্ষমতাকে তাঁর করায়ত্ত করার লালসায় নিজেকে লিপ্ত করলেন। বিত্তবান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চলল আসন সংগ্রহের প্রতিযোগিতা।

কিন্তু সত্যিই কি তিল তিল করে গড়া এই সভ্যতা একটি অঙ্গুলিলেহনে ধ্বংস হয়ে যাবে। 'মহাকালের পাত জুড়ে নামবে একটা শূন্য'। জন্মের আদিকাল থেকে বিধ্বংসী আগুনকে ব্যবহার করে মানুষ বিশাল সভ্যতাব জন্ম দিয়েছে। আজ সে পরমাণুকে ভাঙছে; প্রাণ সংরক্ষণ করবে না ধ্বংস করবে— একটা প্রশ্ন।''

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অন্তভারতীয় পুস্তকমালার অন্যতম গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেছেন 'মলয়ালম একাঙ্ক গুচ্ছ' নামে, সম্পাদক ড. কে রাঘবন পিল্লা। এতে ১২টি একাঙ্ক আছে, নাটকগুলি লিখেছেন—কে রামকৃষ্ণ পিল্লা, কৈনিক্কর কুমার পিল্লা, এন কৃষ্ণ পিল্লা, টি এন গোপীনাথন নায়ার, সি এল জোস, আনন্দ কুট্টন, ওমচেরী নারায়ণ পিল্লা, তিক্কোডিয়ান, তোপ্পিল ভাসী, কে টি মুহম্মদ, জি শঙ্কর পিল্লা এবং এন এন পিল্লা। নাটকগুলি বাংলায় অনুবাদ করেন নিলীনা আব্রাহাম এবং প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। এই নাটকগুলি বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে এবং কটি বাংলায় অভিনীত হয়েছে। সি এল জোস-এর 'নোম্পরঙ্গল' (অনন্ত ব্যথা) এক ক্যান্সার রোগীর বেদনা ও মৃত্যুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। বাংলায় এটি অভিনীত হয়েছে। বাংলা নাটকের সঙ্গে এব ভাবনার সমতা দেখা যায় যেমন ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যর 'তৃতীয় পক্ষ' যে নাটকটি বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ও বি বিজয়ন রচিত 'শিলাখন্ড' গল্পের অনুপ্রেরণায় অমল রায় লিখেছেন শ্রুতিনাটক 'শেষ যুদ্ধের শেষে'। পরমাণুযুদ্ধ বিরোধী নাটকটি পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর রূপ তুলে ধরে এবং মানুষের জয়গান গায়। নাটকটি ২১ মে ১৯৯৮ পাক-ভারত জনমঞ্চ আহুত ধর্মতলায় পোখরাণে ও চাঘাইতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদ সমাবেশে পিপলস অডিও থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় ৬ আগস্ট ১৯৯৯ হিরোসিমা দিবসে।

টি এম আব্রাহাম আধুনিক মলয়ালম ভাষার এক বিশিষ্ট নাট্যকার। তাঁর নাটক অনুবাদ করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায় 'রক্তবলি' নামে। নাটকটি প্রকাশিত হয় শারদীয় শূদ্রক পত্রিকায় ২০০০ সালে এবং বিশেষ প্রশংসিত হয়।

সূত্র পরিচিতি

১. Indian Literature, April-Sept. 1958 (article-Malayalam Drama. K. M. George, p. 103), New Delhi, 1958.
২. A Survey of Malayalam Literature, K. M. George, p. 193.
৩. A History of Malayalam Literature, Krishna Chaitanya, p. 356, New Delhi,1971.
৪. Ibid. p. 370.
৫. Indian Literature Since Independence, Ed K. R S. Iyenger, (article - Malayalam, K. M. George, p. 155) New Delhi, 1973.
৬. Malayalam Nataka Charitram, G. Shankar Pilla, Kerala Sahitya Akademi, Kerala, 1980.
৬. (ক) মূলধনম, ভূমিকা, তোপ্পিল ভাসী-বল্লীকুন্নম, ১৯৫৮।

৭. The Hindu, Madras, 20 7 1980.

৮. 'I am more concerned with the inner realities of man than the externals'– G. Shankar Pilla, Sangeet Natak Journal, July-Sept. 1980. p. 14. New Delhi, 1980.

৯. Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebrations. Vol. II, Ed. S. C Sengupta (article-Rabindranath and Malayalam Literature, C. Kunhan Raja, p. 66-67, Santiniketan.

১০. Selected Poems of Kumaran Asan, Ed. K. Ramchandran Nair. p. VII, Trivandrum, 1975.

১১. Ibid, p. ix - x.

১২. Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebrations. Vol. II, Ed. S. C Sengupta (article - Rabindranath and Malayalam Literature, C. K. Raja, p. 59), Santiniketan.

১৩. 'There is a touch of Tagorean symbolism in Mahavum Muktiyum' History of Malayalam Literature, P. V. Parameswaran Nair, p. 157, New Delhi, 1967.

১৪. "He (K. Kumara Pillai) has been influenced by Walt Whitman and Rabindranath Tagore in evolving a style of poetic prose". K. M. George. Western Influence on Malayalam Language and Literature, K. M. George. p. 140, New Delhi, 1972.

১৫. Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebrations, Ed. S. C. Sengupta Vol. II. (article-Rabindranath and Malayalam Literature. G. Sankara Kurup, p. 55, Santiniketan.

১৬. Otakkuzhal and other Poems, G. S. Kurup. P. 7. Madras, 1966.

১৭. কলকাতা পুরশ্রী, জুন ১৯৮৪ (প্রবন্ধ-দক্ষিণ ভারতে রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২২), কলিকাতা ১৯৮৪।

১৮. তদেব।

১৯. দেশ ২৭.০.৮৭ (সমালোচনা-কথাকলিতে একক শ্যামা, বিক্রমণ নায়ার), কলিকাতা।

২০. পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ১৯.৯.৮৬।

২১. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৭.১.৮৬।

২২. The Hindustan Times, New Delhi, 18.5.87.

২৩. The Golden Book of Saratchandra. All Bengal Sarat Centenary Committee (article - Saratchandra Chatterjee, A Malayalee's view, O. N. V. Kurup, p. 92). Calcutta, 1977.

২৪. Ibid p. 93.

২৫. আজকাল, কলিকাতা, ১৪.৫.৮৫

২৬. তদেব।

২৭. দৈনিক বসুমতী, কলকাতা, ২৬.৫.৮৫

২৮. দেশ, কলকাতা, ৩.৮.৮৫

২৯. আজকাল, কলকাতা, ১৪.৫.৮৫

সপ্তম অধ্যায়
আধুনিক মরাঠী নাটক

১. সূচনা পর্ব

মরাঠী সাহিত্য প্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ হলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে নাটকের উল্লেখ তেমন পাওয়া যায় না। যদিও লোকনাট্যরীতির প্রচলন বিশেষ পরিমাণেই ছিল। ১৮৪৩ সালের ৫ নভেম্বর সাংলী জেলায় বিষ্ণুদাস ভাবে রচিত 'সীতা স্বয়ংবরম' নাটকের অভিনয় হয় যাকে 'প্রথম মরাঠী নাটক' বলে অভিহিত করা হয়। এর পর অনেক নাটক অভিনীত হয়েছে কিন্তু সে গুলো প্রায় সবই সংস্কৃত অথবা ইংরাজী নাটকের অনুবাদ। শেকসপীয়রের অনুবাদ হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

আন্নাসাহেব কির্লোসকর ১৮৮০ সালে কয়েকজন নাট্যপ্রেমীর সহযোগিতায় পড়ে তোলেন 'কির্লোসকার নাটক মন্ডলী' এবং সেসময় থেকেই মরাঠী নাটকের আদিপর্ব সূচিত হয়। কির্লোসকর ছিলেন অভিনেতা পরিচালক নাট্যকার, সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। তাঁর তিনটে নাটকই — শকুন্তলা, সুভদ্রা ও রামরাজ্য বিয়োগ — বিশেষ জনপ্রিয় হয়। কাব্যময় ভাষা, সুন্দর কাহিনী ও গীতিময়তা তাঁর বৈশিষ্ট্য।

গোবিন্দ বল্লাল দেবল (১৮৫৪-১৯১৬) মৃচ্ছকটিক ও বিক্রমোর্বশী অনুবাদ করেন, ওথেলোর অনুবাদও বেষ খ্যাতি পায়। তবে তাঁর দুটি নাটক মরাঠী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ্য ঃ 'শারদা' ও 'সংশয় কল্লোল'। 'শারদা'র (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৯) বিষয়বস্তু বয়স্ক কুমারী বিবাহ। উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে এই নাটকের অভিনয় মরাঠী নাটকে বাস্তবতার সূচনা ঘটায়। এর রস করুণ গম্ভীর। 'সংশয় কল্লোল' কৌতুকরসাত্মক এতে মানুষের প্রকৃতি বিশেষত ঈর্ষ্যা হাস্যরসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সংগীতের সুন্দর ব্যবহার এদের জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে দেয়।

কৃষ্ণাজী প্রভাকর খাদিলকর (১৮৭২-১৯৪৮) পৌরাণিক সামাজিক রাজনৈতিক নাটক লিখেছেন। তিনি যুগ জীবন সচেতন ছিলেন, বিশেষত তিলকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল, তাই তাঁর প্রায় নাটকেই রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ থাকে। এপ্রসঙ্গে তাঁর পৌরাণিক নাটক 'কীচক বধ' (১৯০৭) উল্লেখ করতেই হবে যাতে কীচক বধের মধ্য দিয়ে লর্ড কার্জন ও ব্রিটিশ শাসকদের ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। সরকারী নির্দেশে এই নাটককেনিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই নাটকে গণপতরাও ভাগবতের (মহারাষ্ট্র নাটক মন্ডলী) অভিনয় ও কীচকের নতুন ব্যাখ্যা বিশেষ সম্মান পেয়েছে। 'ভাউ বন্ধকী' (আপস লড়াই) নাটকও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তাঁর প্রথম নাটক 'সওয়াই মাধবরাও য়াঞ্চা মৃত্যু' (১৯০৬) ঐতিহাসিক নাটকে হ্যামলেট ও ইয়াগো চরিত্র দুটিকে একত্রিত করে একটা অভিনব প্রচেষ্টা করেছিলেন। মহারাষ্ট্র নাটক মন্ডলী ছাড়া বালগন্ধর্বর (গন্ধর্ব নাট্যমন্ডলী) জন্য তিনি উচ্চমানের সংগীত বহুল নাটক লেখেন জনপ্রিয় 'মানাপমান' (১৯১১) 'বিদ্যাহরণ' (১৯১৩) 'স্বয়ংবর' (১৯১৬) ইত্যাদি। খাদিলকর ও বালগন্ধর্বর সম্মিলিত প্রয়াসে মরাঠী নাটক উচ্চাসন লাভ করে।

শ্রীপাদ কৃষ্ণ কোলহটকর (১৮৭১-১৯৩৪) মরাঠী নাটকের সূচনা পর্বের বিশিষ্ট নাম। তাঁর বিখ্যাত নাটক হল মূকনায়ক (১৯০১) গুপ্তমঞ্জুষ (১৯০৩) মতিবিকার (১৯০৭) সহচারিণী (১৯০৮) ইত্যাদি। তাঁর সমস্ত নাটকই কির্লোসকর নাটক মন্ডলী দ্বারা অভিনীত হয়েছে।

রামগণেশ গডকরী (১৮৮৫-১৯১৯) মরাঠী নাটকের প্রথম পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে এক বিপ্লব আনলেন। তাঁর মধ্যে ছিল আশ্চর্য প্রতিভা ও অপরূপ কল্পনাপ্রবণতা। তাঁর সমস্ত নাটক কাব্যগুণে সমৃদ্ধ তার সঙ্গে আছে চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা, জীবন্ত হাস্যমুখর সংলাপ রচনার পারদর্শিতা। ভাবাবেগপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক রচনায়ও তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তাঁর নাটক সংখ্যায় অবশ্য কম — 'প্রেম সন্ন্যাস' (১৯১২ — সামাজিক ট্র্যাজেডি), 'পুণ্যপ্রভাব' (১৯১৭, রোমান্টিক নাটক), একচ পেয়ালা (১৯০৯ সামাজিক নাটক), ভাববন্ধন (১৯২০ সামাজিক নাটক), 'রাজসন্ন্যাস' (অসম্পূর্ণ নাটক, শম্ভাজীর বেদানাময় জীবন পরিণতি নিয়ে লেখা ট্র্যাজেডি ১৯২২) কিন্তু এরাই তাঁকে অবিস্মরণীয় করেছে। তাঁক অকাল মৃত্যু না ঘটলে এই মহান নাট্যকার নবনব সৃষ্টিতে মরাঠী নাট্যসাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করতেন তাতে সন্দেহ নেই।

এস পি যোশী (১৮৮২-১৯৪৯) ও **মহাদেব নারায়ণ যোশী** (বা মাধবরাও যোশী ১৮৮৫-১৯৪৮) সামাজিক নাটক লিখেছেন, যদিও প্রবল কৌতুক ও ব্যঙ্গই সেখানে প্রধান। এস পি যোশীর নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'বিচিত্র লীলা' (১৯১৬) চার অংকর সামাজিক নাটক, 'মায়েচা পূর্ট' (১৯২০) 'খড়াষ্টক' (১৯২৭) চার অংকের ফার্সিকাল কমেডি, 'তো আনি তী অর্থাৎ প্রেমাচী ভাবনা' (১৯৩৯) প্রভৃতি। মাধবরাও যোশী নাট্যকার রূপে অনেক বেশী সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, ভাল নাটক তিনি রচনা করেছেন। পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক তিনি লিখেছেন, তবে রঙ্গব্যঙ্গাত্মক নাটকগুলিই বিশেষ জনপ্রিয় হয়। যেমন মিউনিসিপ্যাল শাসন ও নির্বাচনকে ভিত্তি করে লেখা 'সংগীত স্থানিক স্বরাজ্য অথবা মিউনিসিপ্যালিটি' (১৯২৫) অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। 'বিনোদ' (১৯১৬; 'মনোরঞ্জন', ১৯১৬, পৌরাণিক), 'আনন্দ' (সামাজিক ১৯২৪) 'বশীকরণ' (কমেডি ১৯৩২) 'হাস্যতরঙ্গ' (কৌতুক ১৯২৭), 'পৈসাচ পৈসা' (ফার্স ১৯৩৫) ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত নাটক।

২. প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব

১৯৩০ থেকে মরাঠী নাটকে এল এক বির্পযয়। সিনেমার সঙ্গে মরাঠী নাটক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখী হল। ত্রিশের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালে নাটকের মান বেশ কিছুটা নেমে যায়। রোমান্টিক কমেডি বা মেলোড্রামা মরাঠী নাটকের আবেদন কমিয়ে দেয়, তাকে লঘু করে, তার রূপায়ণও ছিল সেরকম। তাই সিনেমা সহজেই তাকে সরিয়ে দেয়, নাট্যদলগুলোও বন্ধ হতে থাকে।

কিন্তু এই বিপর্যয়ের মধ্যেই নতুন করে জেগে ওঠে মরাঠী নাটক, প্রাচীনতার নির্মোক বিদীর্ণ করে সৃষ্টি হয় নতুন যুগ। মরাঠী নাটকে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়।

ত্রিশের গোড়ার দিকে একদল তরুণ আদর্শবাদী ইবসেন ও বার্নার্ড শর আদর্শে দীক্ষিত হয়ে একটি নাট্যসংস্থা স্থাপন করলেন 'নাট্য মন্বন্তর' যা **শ্রীধর বিনায়ক বর্তক** (১৮৯৩-১৯৫০) রচিত 'অন্ধলাঞ্চি শালা' (১৯৩৩) প্রযোজিত করে মরাঠী নাটকের প্রচলিত রীতি থেকে নতুনত্বের সঞ্চার করে। "এই নাটকটি মরাঠী নাটককে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ

করেছে।''[১] আজকের প্রচলিত যথার্থবাদ ও তার সমস্যা, স্বভাব অনুযায়ী সংলাপ ও নেপথ্য রচনা, দু তিনটি ভাব অনুযায়ী গান এবং আবহ সংগীতের ব্যবহার এবং স্ত্রী ভূমিকায় শিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়েদের নিয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে আধুনিক বৈশিষ্ট্য নাটকে দেখা গেল। অত্যন্ত লাবন্যময়ী ও অসাধারণ সুকণ্ঠী গায়িকা জ্যোৎস্না ভোলে এ নাটকে প্রথম অভিনয় করেন।

বাস্তবতা আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ এবং ত্রিশোত্তর মরাঠী নাটকে এই বাস্তবতার প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। অভিনেতা পরিচালক কে. টি দাতে ১৯৩০ সালে সমর্থ নাটক মন্ডলীতে যোগ দেন। ''সেখানে তিনি মঞ্চস্থ করেন বাসুদেব বামন ভোলে রচিত 'সরলা দেবী' (১৯৩১) যাকে বলা যায় প্রথম আধুনিক বাস্তবধর্মী নাটক।''[২]

ত্রিশের সূচনাকাল থেকেই যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটল মরাঠী নাটকে অধিকাংশ সমালোচকই তা স্বীকার করেন। From the early thirties Ananta Kanekar, K. Narayan Kale, P. Y. Altekar and P. K. Atre tried to provide the new stirrings towards a modernity away from the traditional approaches hitherto attempted.[৩]

ত্রিশোত্তর মরাঠী নাটকে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য হল — রোমান্টিকতার পরিচয়, ভাবে ও প্রকাশে আবেগ আতিশয্য বাদ দেওয়া এবং নাটককে স্বাভাবিক করা; যথার্থবাদের প্রকাশ, বাস্তব জীবন ও পরিবেশকে তুলে ধরা; সামাজিক সমস্যা, দ্বন্দ্ব ও সংকট নাটকে ব্যক্ত করা; পারিবারিক সত্য ও শক্তিকে দৃঢ় করা। পাশ্চাত্য নাটক বিশেষত ইবসেনের প্রভাবে নতুনতর প্রত্যয়ের সঞ্চার হয়। ''১৯৩০ সালের পর মরাঠী নাটক সাধারণ ভাবে ইবসেন প্রভাবিত বলা যায়। শেকসপীয়রের রীতি এবং ইবসেনের প্রভাব নাট্য রচনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এক একটি দৃশ্যের এক একটি অংক, স্বগত উক্তি বর্জন এবং সুগঠিত একমুখী নাট্যবৃত্ত এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মবাঠী নাটকে ইবসেনের প্রভাব চিহ্নিত''।[৪]

মামা ওয়ারেরকর, মোতিরাম গজানন রঙ্গনেকর, পি কে আত্রে প্রমুখ নাট্যকারদের রচনায় আধুনিকতার প্রকাশ দেখা যায়। ''রঙ্গনেকর, কে নারায়ণ কালে, পার্শ্বনাথ আলতেকর, দামু অন্না জোশীর মত কুশলী ও শিক্ষিত নির্দেশকরাও এগিয়ে আসেন ও তাঁদের সহযোগে আধুনিক মরাঠী রঙ্গমঞ্চের শুভ সূচনা হয়''।[৫]

চারের দশকে আধুনিকতার নতুন প্রত্যয় ঘোষিত হল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর প্রথম মরাঠী নাটকের অভিনয় হয় এবং বিষ্ণুদাস ভাবের সেই অসামান্য কাজকে স্মরণ করে ১৯৪৩এ মহাসমারোহে উদযাপিত হয় মরাঠী নাটকের শতাব্দী উৎসব। বিশিষ্ট নাট্যবিদ্ মুম্বাই মরাঠী সাহিত্য সংঘের সম্পাদক ডঃ এ. এন ভালেরাও এর আন্তরিক প্রয়াসে মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয় এই অনুষ্ঠান।

অতীতের প্রথিতযশা নাট্যকার জি. বি. দেবলের 'শারদা' নাটকের অভিনয় উৎসবের স্মরণীয় অঙ্গ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়, খ্যাতনামা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন, অভিনেতা নাটক ও নাট্যকারদের সম্বন্ধে জনগণ বিশেষ উৎসাহ দেখান। নতুন যুগের তরুণ সমাজ মরাঠী থিয়েটারের অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ অবহিত হয়ে আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রকে আরো ঋদ্ধ ও ঐশ্বর্যবান করে তুলতে প্রয়াসী হন। নতুন উন্নত মানের রঙ্গমঞ্চও প্রতিষ্ঠিত হয়। নাটক নিয়ে, তার আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে।

অন্যদিকে গণনাট্য আন্দোলন চলতে থাকে দুর্বার বেগে। বোম্বাই হয় সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রধান কেন্দ্র এবং তার আনুষ্ঠানিক সূচনা বোম্বাইতেই হয়। মরাঠী শিল্প সংস্কৃতি বিশেষত নাটকে তাব প্রবল প্রভাব পড়ে। মায়া ওয়রেরকর, অনন্ত কানেকর, পার্শ্বনাথ আলতেকর, আন্নাভাউ সাঠে প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যবিদ্ ও শিল্পীরা এর সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত হন। গণনাট্য আন্দোলন মরাঠী নাটকে নতুন মাত্রা আনে।

গণনাট্য সংঘের মরাঠী নাটক **অনন্ত কানেকর** (১৯০৫-৮০) এর 'রক্ত আনি আস্' হিন্দু মুসলমান একতার কথা বলে : সব মানুষ সমান, হিন্দু ও মুসলমান রক্তের কোন তফাত নেই, ধর্ম সম্প্রদায়গত মিলন ও ঐক্যই আমাদের দেশ জাতিকে গঠন করতে পারে। লিটল থিয়েটার এর প্রখ্যাত পরিচালক আলতেকর এই নাটকের পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতা দেখান।

বোম্বাই গণনাট্য সংঘের বিশিষ্ট প্রযোজনা **টি. কে. সরমলকর** এর 'দাদা'। লেখক নিজে শ্রমিক পরিবারের সন্তান এবং বোম্বাই শ্রমিকদের প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র হাস্যকৌতুক ও গভীর অর্ন্তদৃষ্টির সঙ্গে আঁকেন। শ্রমিকদের ওপর শোষণের কথাও প্রবল ভাবে বলা হয়। নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্ত হচ্ছে মে দিবসে শ্রমিকদের মিছিল বেরোয় ও মঞ্চে জনতার দৃশ্য দেখা যায়। নাটকের শেষে একটি চরিত্র জনপ্রিয় শ্রমিকদের গান গায় — 'নকরেপে ডংকা লগা হ্যয়, তু শস্ত্র কো অপনা সম্বল' এবং সমবেত দর্শক, যারা প্রায় সকলেই মজুর এই গানে যোগ দেয়। নাটকের পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখান প্রভাকর গুপ্ত। সরমলকরের আর একটি নাটকও শ্রমিকদের মধ্যে আলোড়ন জানায় — 'ধনি' (প্রভু)। নাটকটি কৃষক ও জমিদারের সংঘর্ষ নিয়ে লেখা। নাটকের নায়ক এক কৃষক যাকে জমিদার উচ্ছেদ করতে যায়। কৃষকরা প্রথমে দেবতার কাছে ধর্না দেয় প্রতিকারের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিষান সভা তাদের সংগঠিত করে ও জমিদার তাদের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়।

কারেল চাপেক এর 'মাদার' মরাঠীতে এস. মনোহর রূপান্তর করেন 'আঈ' (মা) নামে। 'ফোর কমরেডস' নাটকটি ইংরেজী থেকে মরাঠীতে অনূদিত হয় এবং গণনাট্য সংঘের মহিম শাখা তার সুন্দর অভিনয় করে 'নারাড়ী পূর্ণিমা' (নারিকেল উৎসব) পূজার পরিবর্তে।

গণনাট্য সংঘের প্রেরণায় পাওয়াদা তমাশা প্রভৃতি লোক শিল্পরীতি নতুন প্রত্যয়ে গড়ে ওঠে। "কমরেড আপটে ও গাওয়ান্‌কর একটি পাওয়াদা দল গঠন করেন। তাঁরা বস্তি অঞ্চলে রাত্রিবেলায় যেতেন ও রাত্রিতে অভিনয় করতেন। এগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। কমরেড গাওয়ান্‌কার একজন সঙ্গীতবিদও বটেন, তিনি পাওয়াদায় অংশ নিতেন। আমাদের বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র ধরনের — ঝাঁসীর রাণী, ভগত সিং, জোয়া, স্তালিন গ্রাদ, ওয়াংপুর অবরোধ"।[৬]

এই প্রসঙ্গে **আন্নাভাউ সাঠে**-র কথা অবশ্যই উল্লেখ্য করতে হবে। অস্পৃশ্য দিনমজুর, রাজমিস্ত্রি, কুলি, বাড়ির চাকর, সুতাকল শ্রমিক আন্নাভাউ ছিলেন মহান মরাঠী কবি নাট্যকার গীতিকার ইত্যাদি। তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত। আন্নাভাউ সাঠে ছিলেন গণমুক্তি সংগ্রামের এক নিপুণ যোদ্ধা। "তাঁর সুবিখ্যাত তমাশাগুলি (কৌতুকপূর্ণ লোকনাট্য) এবং পাওয়াদাগুলি মহারাষ্ট্রের ক্ষয়িষ্ণু ও অধঃপতিত লোকনাট্য রীতিগুলিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিল। এই তমাশাগুলি গ্রাম এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শহরগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে

উপভোগ করত এবং বম্বের শিবাজী পার্কে এক অনুষ্ঠানে এক লক্ষ লোক তমাশা, পাওয়াদা, লাওনি ইত্যাদি অনুষ্ঠান দেখেছিল''।[৭]

প্রহ্লাদ কেশব আত্রে (১৮৯৮-১৯৬৯) ছিলেন নাট্যকার, ব্যঙ্গশিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক, বক্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি মরাঠী নাটকে আধুনিকতার উদ্গাতা রূপেই বিশেষ স্মরণীয়। ''মরাঠী নাট্যচর্চেত যুগ প্রবর্তনাচে শ্রেয় অনেক নাটককারাঞ্চা পদয়াত টাকন্যাত য়েত অসতে। বাস্তবার্থানে জ্যা কাহী নাটককারানা যুগ প্রবর্তক হী প্রদবী অর্পণ করতা য়েইল অশা নাটককারান্ত আচার্য আত্রে য়াঞ্চে নাব প্রামুখ্যানে ঘ্যাবে লাগেল। অত্র্যাঞ্চা 'সাষ্টাঙ্গ নমস্কারা'নে সুরু কেলেলী হাস্যরসাঞ্চ্যা বাপরানে জীবনাতীলে কঠোর সত্যাঞ্চা বেধ ঘেন্যাচী হী প্রথা আধুনিক মরাঠী নাট্য লেখনাতীল প্রমুখ প্রবৃত্তি আহে''।[৮]

নট নাট্যকার আত্রে মূলত হাস্যরসাত্মক নাটক রচনায় যশস্বী। সামাজিক অনৈক্য অসংগতিকে তিনি কৌতুক ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন। সমাজসচেতনতা ও জীবনবোধ তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য। প্রথম পর্যায়ে তিনি নাটক বচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সাংবাদিকতা ও রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন, শেষ বয়সে আবার নাটক লিখতে সুরু করেন। মোট ২৫টি নাটক তিনি লিখেছেন।

'সাষ্টাঙ্গ নমস্কার' (১৯৩৩) মরাঠী থিয়েটারের প্রথম আধুনিক হাস্যরসাত্মক নাটক। এটা এক পরিবারের কিম্ভূত আচরণ বা মানসিকতার প্যারডি। মহারাষ্ট্রের এক ছোট রাজ্য আউন্ধ- এর রাজার বাতিক ছিল যে সূর্য নমস্কার বা সাষ্টাঙ্গ নমস্কার বলে একটা ব্যায়াম করলে সব ব্যাধি দূর হয়, শরীর চর্চা বা বলোপাসনা দ্বারাই মানুষের উন্নতি হতে পারে। তিনি দেশের সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব প্রকাশ ও প্রচার করতেন। আত্রের নাটকে একে ব্যঙ্গ করা হয়েছে রায়বাহাদুর শেষাদ্রির চরিত্রে। জ্যোতিষ চর্চা এবং অকারণ কবিত্বকেও বিদ্রুপ করা হয়েছে কবি ভদ্রায়ু ও সিদ্ধেশ্বরের চিত্রণে প্রবল কৌতুকের মধ্য দিয়ে। এবং জীবনের সার্থকতা যে অন্যত্র সেকথাও ব্যক্ত হয়েছে। রায়বাহাদুর প্রবাস যাত্রায় গাড়ির মধ্যে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করে। ভদ্রায়ু আহত লোককে চিকিৎসা না করে কবিতা শোনায়, সিদ্ধেশ্বর প্রেমনিবেদন করতে গিয়ে পিছিয়ে যায় কারণ জ্যোতিষ মতে সময় হয় নি।

আত্রে লিখে চলেন 'ভ্রমাচা ভোপলা' (দুঅঙ্কের কমেডি ১৯০৪), 'উদ্যাঞ্চা সংসার' (১৯৩৫), 'ঘরাবাহের' (১৯৩৪), 'লগ্নাচী বেড়ী' (১৯৩৬), 'বন্দে ভারতম' (সেকালীন রাজনীতি নিয়ে ব্যঙ্গ ১৯৩৭)। শেষ পর্যায়ে লেখেন 'তো মী নভ্হে' (১৯৬২ সে আমি নই) 'মী মন্ত্রী ঝালো' (১৯৬৬ আমি মন্ত্রী ছিলাম) 'ডঃ লাগু', 'ব্রহ্মচারী' (তাঁর ঐ নামের চলচ্চিত্রের নাট্যরূপ ১৯৬৯) 'বুয়া তেথে বায়া' (যেখানে বাবা সেখানে মেয়ে), 'সম্রাট সিংহ' (কিং লীয়র অবলম্বন) ইত্যাদি।

'লগ্নাচী বেড়ী' (বিবাহ বন্ধন) নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক তথা বিবাহ সমস্যার ওপর ভিত্তি করে লেখা। বিবাহ বন্ধনের দ্বারা আদর্শ গৃহজীবনের দ্বারা জীবনে সুখ পাওয়া সম্ভব। সিনেমার অভিনেত্রী রশ্মি পুরুষদের উচ্ছৃঙ্খলতার পূর্ণ প্রবৃত্তি দেখেছে। গৃহস্থদের সুখী করতে সে বিবাহিত জীবনের আবশ্যকতার ওপর জোর দেয় ও এ বিষয়ে একটা চিত্রপটও তৈরী করতে চায়। কাঞ্চন রশ্মির আকর্ষনে উম্মত্ত হয় ও শেষ পর্যন্ত সাধ্বী স্ত্রীর মর্যাদা বোঝে। পরাগ ও অরুণা কেবল বন্ধু হয়ে থাকতে চায় কারণ বিবাহিত জীবন তাদের কাছে প্রবল বন্ধন। কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত সেই বিবাহ বন্ধনকেই কল্যাণকর বলে মেনে নেয়। আর এক দম্পতি গোকর্ণ ও গার্গী পরস্পরকে সর্বদা আঘাত আক্রমণ করলেও তার মধ্য দিয়েই তাদের ভালবাসা উৎসারিত হচ্ছে। এটি Goldsmith এর She Stoops to Conquer অবলম্বনে রচিত হলেও মৌলিক হয়ে উঠেছে।

আত্রের 'তো মী নভেচ' সুপার হিট নাটক, এখনও সমান ভাবে অভিনীত হয়ে চলেছে। এটাকে মিস্ট্রি কমেডি বলা যায়। এক ব্যক্তি ব্যবসায়ী, বড় চাকুরিয়া, নৌবাহিনীর অফিসার ইত্যাদি নানান পরিচয়ে ষোলটি বিভিন্ন মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং প্রতি ক্ষেত্রে তার পূর্ব বিবাহের সংবাদ গোপন রেখেছে। শেষ পর্যন্ত এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখী হয় সে। বিচারশালায় অভিযুক্ত হয়ে সে বারেবারেই বলে 'সে আমি নই'। এম. জি. রঙ্গনেকরের পরিচালনায় নাটকটি সাফল্য অর্জন করে, বিশেষত প্রভাকর পানশিকর-এর অনন্যসাধারণ অভিনয় এর জনপ্রিয়তা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভার্গবরাম বিঠ্‌ঠল (বা মামা) ওয়রেরকর (১৮৮৩-১৯৬৪) দীর্ঘদিন ধরে নাটক লিখেছেন। ওয়ারেরকর যথার্থই কালের অভিযাত্রী। তিনি সিনেমার প্রবল আক্রমণ থেকে মরাঠী নাটককে বাঁচাতে চেয়েছেন, থিয়েটারের মধ্যে আধুনিকতার সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জীবনকে তুলে ধরেছেন তার নাটকে। সমকালীন রাজনীতি প্রবল ছায়া ফেলেছে তাঁর রচনায়, ''সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অন্যায় তিনি দেখেছেন, তাকে বিদ্রূপ করেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন, কঠোর সমালোচনা করেছেন তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে। তিনি নাটকে সংগীতের ব্যবহার পছন্দ করতেন না। তাঁর নাটকে ইবসেন ও মলিয়রের প্রভাব দেখা যায়''।[৯]

'সন্ন্যাসাচা সংসার' (সন্ন্যাসীর সংসার ১৯২০) নাটকে প্রথম ওয়রেরকর পরিবর্তিত যুগ ও কালকে ধরতে চেয়েছিলেন। ললিত কলাদর্শ প্রযোজিত ওয়ারেরকরের 'সত্তেচে গুলাম' (শক্তির গোলাম ১৯২২) তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামাজিক জীবনের এক বিশাল চিত্র — গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্রের লড়াই ও 'দিল্লী চলো'র আহ্বান নাটকে ধ্বনিত হয়েছে। প্রযোজনার নতুনত্ব, আঙ্গিকগত কলাকৌশল, আলোকপ্রয়োগ রীতি এবং বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জা নাটকটিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে। তিনি ক্রমান্বয়ে লিখে চলেন — 'সোন্যাচা কলস' (মন্দিরের সোনার চূড়া, ১৯৩২), 'স্বয়ংসেবক' (১৯৩৪), 'সদা বন্দিবান' (১৯৩৩), 'জগৎ জ্যোতি' (১৯৩৩), 'কোরাড়ি' করামত' (১৯৩৯, মদ্যপান বিরোধিতা বিষয়ক) 'অপূর্ব বঙ্গাল' (১৯৫৩), 'ভূমিকন্যা সীতা' (১৯৫৫) প্রভৃতি। 'অ-পূর্ব বঙ্গাল' নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিয়ে লেখা। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা, খুন জখম, নারীদের ওপর অত্যাচার এবং তার সঙ্গে সৎ মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা আছে। কলকাতাতেও নাটকের এক দৃশ্য হয়েছে। লেখক বাঙ্গালী জীবন আচরণ বাকরীতি ইত্যাদি আনার সার্থক চেষ্টা করেছেন। গান্ধীজীর আদর্শে লেখক অনুপ্রাণিত হয়েছেন বিভিন্ন ভাবে — এনাটকেও তার প্রকাশ আছে। তার বাবা পণের টাকা না যোগাড় করতে পারায় স্নেহলতা নামে এক বাঙালী মেয়ে আত্মহত্যা করে, এ ঘটনা নিয়ে লেখা 'হাচ মুলাচা বাপ' (১৯১৬)।

'ভূমিকন্যা সীতা' মূলত 'উত্তররামচরিত' অবলম্বনে লেখা। সীতার চরিত্র নাটকে সুন্দর ভাবে ফুটেছে, কাব্যে উপেক্ষিতা ঊর্মিলার চিত্রাঙ্কনেও লেখক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। জীবনের গভীর উন্মীলন এই নাটকে পাওয়া যায়। সমালোচক ওয়ারেরকরের অন্যান্য নাটকে ক্ষণস্থায়ী প্রচারধর্মিতা দেখলেও 'ভূমিকন্যা সীতা'র কালজয়ী মূল্য ও মহিমার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন।

মোত্তিরাম গজানন রঙ্গনেকর (১৯০৭-১৯৯৫) প্রথমত: ছিলেন এক সাংবাদিক যাঁর ব্যঙ্গের বোধ ছিল প্রখর। তিনি খ্যাতিমান নাট্য প্রযোজক এবং বিশিষ্ট নাট্যকারও বটেন। আধুনিক যুগের প্রথম পেশাদার সংস্থা 'নাট্য নিকেতন' ১৯৪২ সালে তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে

ওঠে। তাঁর প্রথম নাটক 'আশীর্বাদ' (১৯৪১) দিয়ে শুরু হয় সংস্থার কাজ যার অভিনয়ে ছিলেন জ্যোৎস্না ভোলে, বিষ্ণুপন্ত আউন্ধকর প্রমুখ। এক চাকুরীজীবী মেয়ের সমস্যা নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটক যে মেয়ে বিয়ের পর তার পরিবারকে আর দেখতে পারে না এবং পরিবারের কর্তা চাকরি হারানোর ফলে প্রবল সংকটের সম্মুখীন হয়। এদের দুঃখ ও সংকটের তীব্রতা বোঝাতে আর একটি পরিবারকে কিছুটা ব্যঙ্গের মাধ্যমেই উপস্থাপিত করেছেন যারা ধনী, অহংকারী ও তাদের মেয়ের পাণিপ্রার্থী যুবককে কিনে নিতে চায়। রঙ্গনেকর মরাঠী পরিবার ও জীবনের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং যুগোপযোগী সামাজিক অর্থনৈতিক সংকট তাতে সুন্দর ফুটেছে।

'নাট্য - নিকেতন' এ রঙ্গনেকর মহারাষ্ট্রীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যা সংকট নিয়ে আরো কিছু নাটক প্রযোজনা করেন যার মধ্যে তাঁর নিজের লেখা বেশ কয়েকটি নাটক আছে। এঁদের মধ্যে 'কুলবধূ' (১৯৪২) অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। এক সিনেমা অভিনেত্রীকে নিয়ে নাটক গড়ে উঠেছে যার স্বামী তার ওপর অত্যন্ত ঈর্ষাজর্জর হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডিতে কাহিনীর শেষ হয়। নাটকটী ইবসেনের 'এ ডলস হাউস' নাটককে অনিবার্যভাবে স্মরণ করায় যদিও দুয়ের মধ্যে তুলনা চলে না। নাটকের নায়িকার সঙ্গে জ্যোৎস্না ভোলের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব যেন একেবারে মিশে যায ও এই নাটক দীর্ঘদিন পূর্ণ রঙ্গমঞ্চেও চলে। ১৯৪২ এর আগষ্টে মুম্বাই এর অপেরা হাউস-এ প্রথম অভিনীত নাটকটিতে নাট্যকারের জীবনদর্শন যথাযথ প্রকাশিত হয়েছে।

রঙ্গনেকরের অন্যান্য নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'কন্যাদান' (১৯৪৩), 'মাঝে ঘব' (আমার ঘর ১৯৪৫) 'এক হোতা মহতারা' (এক যে ছিল বুড়ো ১৯৪৮) 'রম্ভা' (১৯৫২) ইত্যাদি। সামাজিক সংকট বিশেষত অসম বা বলপূর্বক বিবাহের সমস্যা নিয়ে তাঁর এসব মূলত গড়ে উঠেছে। যাটের পরে বোম্বাই শহরের বাসস্থান সংকট নিয়ে লেখা তাঁর কৌতুক ব্যঙ্গের নাটক 'ভটালা দিলি ওসরি' (পুরুতকে দিল ঠাই) প্রযোজনায় এক রেকর্ড স্থাপন করে। সমসাময়িক কিছু পরিচিত ব্যক্তির যথাযথ ক্যারিকেচারও নাটককে জনপ্রিয় করে।

রঙ্গনেকর তার নাটকে সমাজজীবনের কিছু মূল্যবোধকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন; তার সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক অসাম্য অসংগতিকে তিনি আঘাত করেছেন প্রবলভাবে। তদানীন্তন বাণিজ্যিক মঞ্চের উদ্ভটত্ব ও অতিশয্যকেও তিনি দূর করার চেষ্টা করেছেন। মরাঠী নাটক ও মঞ্চকে গঠন করায় রঙ্গনেকরের গৌরবময় ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব ঃ

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে সমাজে ও জীবনে আদর্শের দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখা বিশেষ ভাবে দিল। যে মূল্যবোধকে এতকাল সযেত্নে লালিত করা হয়েছিল তার অন্তসারশূন্যতা ধরা পড়ল। আদর্শের দ্বিধাগ্রস্ততা, সংশয়, মূল্যবোধের সংকট প্রভৃতি মরাঠী নাটকে দেখা গেল। পু ল দেশপান্ডের 'তুঝে আহে তুজপাশী' নাটকে এই ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় যিনি স্বাধীনতা উত্তর কালের প্রথম নাট্যকার রূপে পরিগণিত।

পারিবারিক সামাজিক নাটকে এল নতুন ভাবনা। কেবল সুখদুঃখের চিত্রই সেখানে আঁকা হল না, নাট্যকার তার গভীরে গেলেন, তার কারণও নির্ণয় করার চেষ্টা করলেন। ব্যক্তিভাবনার সঙ্গে সমাজভাবনার মিলন সাধিত হল। একদিকে স্বামী-স্ত্রী পিতা - পুত্র প্রভৃতির সূক্ষ্ম সম্পর্ক অন্যদিকে পরিবর্তনশীল ভঙ্গুর সমাজের পটভূমিকায় তার

উপস্থাপনা — ফলে জটিল বিমূঢ় কখনো বা ভয়াবহ পরিণতি লাভ করে। বাল কোলহাটকর, মধুসূদন কালেলকর, সুরেশ খরে প্রমুখের নাটকে যা পাওয়া যায় এবং যা তীব্র হয়ে ওঠে রত্নাকর মতকরী, বিজয় তেন্ডুলকর প্রমুখের নাটকে। এতাবৎকাল নাটক মূলতঃ ছিল বিনোদন নির্ভর, দর্শকদের আনন্দ দানই তার প্রধান লক্ষ্য। এখন নাটক হল উদ্দেশ্য মুখীন, জীবনের সমস্যা সংকট তাতে রূপায়িত হল এবং মানুষের মধ্যে তাব প্রতিক্রিয়াও দেখান হল।

উত্তর স্বাধীনতা পর্বের নাটক হয়ে উঠল অন্তর্মুখী। সামাজিক অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব সংক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে আলোড়ন ওঠে, তার অন্তরের মর্মমূল দিব্যদাহে আলোকিত হয়, তার চেতনায় ঘটে বিস্ফোরণ। যূথবদ্ধ জীবনে মানুষ একাকী নির্জন নিঃসঙ্গ, বিশেষত সমাজের সঙ্গে অভিঘাতে সে ক্রমশ হয়ে ওঠে একক অন্তর্মুখী। বিজয় তেন্ডুলকর প্রমুখের নাটকে চরিত্রের এই গভীর অনুভব ও মানসিক গতিবিধির সন্ধান পাওয়া যায়।

নাট্যকাররা ক্রমশ রাজনীতি - সচেতন হয়ে উঠছেন উত্তর স্বাধীনতা কালে। দেশেব রাজনৈতিক ঘূর্ণ্যাবর্ত, রাজনীতির তীব্র দুরন্ত গতি ও প্রবাহ সাধারণ মানুষকেও তরঙ্গ বিক্ষোভে ছুঁড়ে ফেলে ও তাকে ইতিহাস চক্রের অঙ্গীভূত করে। বিজয় তেন্ডুলকরেব 'দম্বদ্বীপচা মুকাবলা' থেকে জয়বন্ত দলভীর 'সূর্যাস্ত' পর্যন্ত নাটক রাজনৈতিক ভাবনাব যেন দলিল হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা পরবর্তী মরাঠী নাটক হল তুলনামূলকভাবে অনেক গভীর, সূক্ষ্ম আন্তরিক ও এক প্রখর সচেতন শিল্পকর্ম যার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক অনেক নিকট, অনেক নিবিড়, অনেক একান্ত।

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপান্ডে (১৯১৯-২০০০) স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বের বিশিষ্ট নাট্যকার যার মধ্যে সমসাময়িক বৈশিষ্ট্য উত্তর স্বাধীনতা কালের মানসিকতা যথাযথ ধবা পড়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের যে মূল্যবোধের সংকট তাই তাঁর নাটকের মূল বিষয় — "He is centrally occupied with a clash of values which is peculiar to post-independent India"।[১০] পি. এল. দেশপান্ডের 'তুঝে আহে তুঝ্যপাশী' নাটকের মধ্যেই এই প্রবণতা বিশেষ ভাবে দেখা যায়।

পি. এল. যথার্থই জীবনরসিক শিল্পী। জীবনের প্রতিটি অনুভব থেকে কৌতুকরস সৃষ্টি করতে পারেন তিনি, বেদনা ও অসংগতি তাঁর চিত্তে রসমাধুর্যের স্ফূরণ ঘটায়। মূল্যবোধের অবনমন তাঁর নাটকের অন্যতম বিষয়। তিনি বাস্তব সচেতন, বাস্তবতার তীব্র প্রকাশ তাঁর মধ্যে আছে। মানুষের জীবনের বৈষম্য অসংগতিকে তিনি তুলে ধরেন কৌতুক পরিহাসের মধ্য দিয়ে, কিন্তু জ্বালা বা আক্রমণ নয়, একটা গভীর সহানুভূতি রয়ে যায় তাঁর মনে। উচ্চ অভিজাত সমাজ হোক আর বস্তি অঞ্চলের দীনতম পরিবেশ হোক — সর্বত্রই তিনি উদার, অপক্ষপাত, আন্তরিক ও রসস্নিগ্ধ।

পি. এল. দেশপান্ডের প্রথম নাটক 'তুকা মহনে আতা' (১৯৪৮) সাধক কবি তুকারামের জীবন ও আদর্শ নিয়ে লেখা। তদানীন্তন জীবন ও পরিবেশের চিত্র এখানে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের জীবন ব্যাখ্যায় আধুনিক মানসিকতার প্রকাশ ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় নাটক "অম্মলদার" (১৯৫২) গোগোলের বিখ্যাত 'দি গভর্নমেন্ট ইনসপেকটর' অবলম্বনে লেখা। বাস্তব চেতনা ও কৌতুকময়তার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে এতে। সমারসেট মমের 'শেপী' অবলম্বনে 'ভাগ্যবান' ট্রাজেডির মধ্যেও মূল্যবোধকে অন্বেষণ করে।

'তুঝে আহে তুঝ্যপাশী' (তোমার জিনিষ তোমার কাছে, ১৯৫৭) নাটকে পি এল দেশপাণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেছেন পূর্ণ মহিমায়। মরাঠী নবনাট্য ভাবনার সূত্রপাত এই নাটক দিয়ে হয়েছে বল যায়। "পি. এল দেশপাণ্ডের 'তুঝে আহে তুজপাশী' নাটকই নব্য মরাঠী থিয়েটার বলতে আমরা যা বুঝি সেই আন্দোলনের জন্মলগ্ন সূচিত করে"।[১১] কাকাজী বক্সী তার মাতা পিতৃহীন ভাইপো ভাইঝি শ্যাম ও উষাকে নিয়ে থাকে। তার জীবন আনন্দ উল্লাস ভোগের। শ্যাম ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, সাদাসিদে খদ্দরপরা ব্যক্তিত্বময়ী উষা মানবসেবা দেশসেবার কাজ করে। সেখানে আসে আচার্য যে গান্ধীবাদী আদর্শনিষ্ঠ কঠোর নীতিবাদী রূপে পরিচিত, সঙ্গে তারই পালিত তরুণী মেয়ে গীতা। দুই জীবনের সংঘাত লাগে, কাকাজীদের আনন্দময় জীবনের মূল্যই প্রতিষ্ঠিত হয়, গীতা ও শ্যাম পরস্পরের অনুরাগী হয় এবং আচার্য বুঝতে পারে তার কঠোর জীবনবিমুখতা অনেকটাই লোক দেখানো আদর্শবাদ ও নীতি নিষ্ঠার ব্যর্থতা। সে চলে যায় একাকী সত্য পথের সন্ধানে। জীবনাদর্শের সংঘাত, মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, চরিত্রের অন্তরভাবনার প্রকাশ এবং শ্লেষাত্মক হয়েও এক সহানুভূতিময় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নাটককে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

পরের নাটক 'সুন্দর মী হোনার' (আমি সুন্দর হব, ১৯৮৫) বেসিয়ার রচিত 'দি ব্যারেটস অফ উইমপোল স্ট্রীট' নাটকের নবরূপান্তর যা রবার্ট ব্রাউনিং ও এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর জীবনকথার ওপর ভিত্তি করে লেখা। মূলকাহিনীতে কবি দম্পতির জীবন্ত আস্বাদ না থাকলেও এর নায়ক নায়িকার চিত্রন, অত্যাচারী বাবা ও পঙ্গু মেয়ের সংঘাত, অন্যান্য মেয়েদের চিত্রও চমৎকার ফুটেছে। My Fair Lady র 'তী ফুলরাণী' নামে রূপান্তর অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়।

ব্রেখট অবলম্বনে পু. ল. লিখেছেন 'তিন পৈশাচা তামাসা', গ্রীক নাটকের অনুবাদ --- 'রাজা ওয়দিপৌস'। অন্যান্য অজস্র নাটকও তিনি লিখেছেন। তাঁর বিপুল খ্যাতি আর একটি কারণের ওপর নির্ভরশীল। তিনি অনেক ছোট একাংক বা নাট্যচিত্র রচনা করেছেন এবং যার অনেকগুলো একক অভিনয়ের দ্বারা অসাধারণ রূপে উপস্থাপিত করেছেন। যেমন 'বটাট্যাচী চাল' (১৯৫৩, আলুর বস্তি) বোম্বাইয়ের এক 'চাল' বা বস্তি জীবনের বিভিন্ন ধরনের মানুষ তাদের সমস্যা সংকট বৈষম্য অসংগতি বিচিত্র জীবনযাত্রা সব কিছু নিয়ে কৌতুক ব্যঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তিনি একক অভিনয়ে তাদের অপরূপ রূপায়িত করেছেন। আর একটি নাটক 'ওরায়াওয়ারচি বরাত'; এর এক অংশে রবিবারের সকালে এক গায়কের কথা বলা হয়েছে যে অসংখ্য লোকের ডাকে বারবার উত্যক্ত হচ্ছে যা চরম হয় স্ত্রীর বারংবার ডাকে। ধোপাকে প্রশ্ন করা হল সে তাঁর শার্ট পরেছে কিনা। ধোপা উত্তর দিল, 'আজ্ঞে না আপনার শার্ট আমার গায়ে একটু টাইট হয়।' পু. ল. নাটকে উত্তর দিলেন, 'ঠিক আছে ভাই, এর পরের বার দরজিকে বলব আমার জামা যেন তোমার মাপে করে দেয়।' এ নাটকের আর এক অংশে শহরের এক সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তি গ্রামে যায় লোকনৃত্য বা লোক শিল্পের পরিচয় পেতে। কিন্তু সেখানকার মানুষ ওসব লোক শিল্প বোঝে না, বরং ফিল্মের গান বা আধুনিক প্রচলিত গানের কথা বলে। 'ওয়াত ওয়াত' নাটকে দেখিয়েছেন যেসব লোক সারাক্ষণ কথা বলে তারা অপরের বেশী কথা বলার সমালোচনা করে। একজন মন্ত্রীর কথা বলা হয়েছে যে সব সময় রেডিমেড লেকচার দেয় ও অন্য প্রসঙ্গ হলেও বক্তৃতা পালটায় না। রেডিওকে বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং 'যুব বাণী'র মত 'বুব বাণী' করেছেন বৃদ্ধদের জন্য। আঙ্গিকের দিক থেকেও এরা বিশেষ মূল্যবান। আধুনিক নাট্যরীতির সঙ্গে তমাশা প্রভৃতি লোকরীতির সুন্দর মিশ্রণ তিনি

ঘটিয়েছেন এদের রূপায়ণে। হাস্যরস সৃজনের ক্ষেত্রে পু. ল. দেশপান্ডে মরাঠী নাটকে তুলনাহীন নাম। প্রখ্যাত লেখকও সাংবাদিক প্রয়াত পি. কে. আত্রে পু. ল. দেশপান্ডে সম্বন্ধে বলেছিলেন যে — As a humorist we never had a kind of him in ten thousand years past and will not have in ten thousand years to come. It may appear an exaggeration that there is no more befitting tribute to his undisputed fame as a humorist. Like Oliver Goldmith he adorned every thing that he touched' (Vide article 'Humour his forte' by N. P. Dani in Deccan Herald 27.8.2000).

বসন্ত কানেটকর (১৯২২-২০০১) মরাঠী থিয়েটারের বিশেষ জনপ্রিয় ব্যক্তি। তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে চিরায়ত মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, চারপাশের ভাঙন অবক্ষয় তাঁকে আরো স্থির প্রত্যয়যুক্ত করেছে। প্রেম প্রীতি নারীত্ব মানবতা ইত্যাদি বোধগুলি তাঁর নাটকে অসামান্য প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কখনো মানবতাবাদী মহান পুরুষদের জীবন কথা তাঁর নাটকের উপজীব্য হয়েছে যাদের জীবনের নাটকীয় উপদানকে যেমন তিনি গ্রহণ করেছেন অন্যদিকে তাঁদের মহৎভাবনাগুলোও উদ্ভাসিত হয়েছে। বসন্ত কানেটকরকে অনেকে নিতান্তই কমার্শিয়াল থিয়েটারের নাট্যকার বলে মনে করেন, দর্শকদের ছকবাঁধা ওয়েল মেড জাতীয় নাটক দিয়ে এবং তাদের হাসিকান্নাময় আবেগকে উন্মথিত করে যারা সাফল্যের সীমায় উপনীত হন, কিন্তু ভাবগভীরতা ও শিল্প উৎকর্ষ যাদের মধ্যে কম। প্রকৃতপক্ষে কানেটকর দর্শকদের মানসিকতা অত্যন্ত সুন্দর ধরেছেন, তিনি তাদের সম্পূর্ণ চালিত করতে পারেন এবং তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও মহিমা দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। তাঁর প্রতিটি নতুন নাটক পেশাদার মঞ্চে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। পেশাদার মঞ্চের তিনি ছিলেন অবিসংবাদী নেতা ও চালক।

ত্রিশটারও বেশী নাটক লিখেছেন বসন্ত কানেটকর। তাঁর প্রথম নাটক 'বেড়্যাঞ্চ ঘর উনহাত' (১৯৫৭ খেপার ঘর রোদ্দুরে) শ্রীরাম লাগুর পরিচালনায় পুণার প্রগ্রেসিভ ড্রামাটিক এসোসিয়েশন মঞ্চস্থ করে। এক সম্পন্ন ব্যক্তি বিপর্যয়ে পড়ে ও সুখী সুন্দর গৃহজীবন থেকে তার পতন ঘটে। তার দুঃখ যন্ত্রণার পরিণতিতে মানসিক ভারসাম্য হারায়। এই অসহ্য চেতনা ও ট্র্যাজেডির পাশে তার ভাইয়ের অর্থপ্রাচুর্যের জীবন বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে। বিষয়বস্তুর আবেদন, সংলাপের মাধুর্য এবং প্রযোজনার চমৎকারিত্ব নাটকটিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে। পরের নাটক 'দেবাঞ্চা মনোরাজ্য' ফ্যানটাসি ধরনের যাতে মানবজীবনের অসংগতি দূর করতে দেবতারা হস্তক্ষেপ করে। 'প্রেমা তুঝা রঙ্গ কাসা' (১৯৬০) সাধারণ নাটক। অধ্যাপক বল্লাল মার্তণ্ড গুপ্তের মেয়ে বব্বডও কয়লা দোকান মালিক নিলকণ্ঠ আত্মরাম গোরের ছেলে বাজীরাও কমবয়সী হলেও পরপরের প্রতি আসক্ত হয় ও সবায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের পরেই রোমান্স কাটে ও তারা বিচ্ছিন্ন হতে চায় — অভিভাবকদের হস্তক্ষেপে সে সমস্যা মেটে। আবার অধ্যাপকের ছেলে বচ্চাজী সুশীলার প্রেমে পড়লেও সুশীলার অন্যত্র বিয়ে হয় ও তাদের জীবনেও ঝঞ্ঝাট আসে। আবার অধ্যাপকের সাহায্যে সমাধান হয়। তরুণ প্রেম চেতনা, আদর্শবাদ, সহৃদয় বিবেকবান মানুষের দ্বারা জীবনের সমস্যা সংকট মোচন, ইত্যাদি নাটকে পাওয়া যায়।

'রায়গড়ালা জেভ্যা জাগ এতে' (১৯৬২) তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অনেক মনে করেন। শিবাজীর জীবনের শেষ কবছর নিয়ে এটা লেখা। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মরাঠী রাজার সঙ্গে তার

উদ্ধত অসংযত পুত্র শম্ভাজীর সম্পর্ক নাটকের বিষয় যে দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছে বিভিন্ন ঘটনায়। মাতাপিতার স্নেহ বঞ্চিত ঈর্ষা বিদ্বেষ ষড়যন্ত্রপূর্ণ পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার শম্ভাজীর হৃদয় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মহান শাসক শিবাজীর হৃদয়ের দুঃখ বিশেষত পিতৃহৃদয়ের ব্যথা বেদনা যন্ত্রনার প্রকাশ মনকে স্পর্শ করে। 'মৎস্যগন্ধা' (১৯৬৪) শান্তনু সত্যবতী ও ভীষ্মকে নিয়ে পৌরাণিক নাটক যদিও আধুনিক দৃষ্টিতে তাদের দেখতে চেয়েছেন নাট্যকার। সঙ্গীতের সুন্দর প্রয়োগ এই নাটকের বৈশিষ্ট্য।

'হিমালয়াচী সাবলী' (হিমালয়ের ছায়া, ১৯৭২) নাটকেও জীবনের আদর্শবাদ ও মহিমাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মহান পুরুষ ধোন্ডো কেশব কার্ভের জীবন ও আদর্শকে নিয়ে এটা গড়ে উঠেছে। শ্রীকার্ভে নারীমুক্তি নারীশিক্ষা বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সারা জীবন কাজ করে গেছেন। তিনি নিজেও বিধবা বিবাহ করে তাঁর আদর্শকে ব্যক্তিজীবনেও প্রতিপন্ন করেছেন যে নারীকে তিনিও উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। তাঁর পুত্র-পুত্রবধূও বিখ্যাত হন। নাটকে নানাসাহেব, বায়ো, পুরুষোত্তম ও অরুন্ধতীর মধ্য দিয়ে আদর্শময় জীবনের কথা সুন্দরভাবে রচিত হয়েছে। 'কস্তুরীমৃগ' এক নারীর অসহায় যন্ত্রণাতুর জীবন নিয়ে লেখা। অঞ্জনী এক পণ্যাঙ্গনা এবং সে সংগীতে নিপুণ, কাব্যে অনুরাগিনী, নাটরচনায়ও দক্ষ। কিন্তু তার জীবন পূর্ণ বিকশিত তো হলই না, মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবার সব আশাও ব্যর্থ হল। ভদ্র রুচিবান পুরুষরা তাকে প্রলুব্ধ করে প্রতারিত করে। তার চোখে স্বপ্নের ছবি এঁকে দেয়। কিন্তু সামান্য পতিতাকে নিয়ে কেউ ঘর বাঁধবে না, কেউ দেবে না তাকে মর্যাদা। ধনী রায়বাহাদুর পেন্ডসে, অভিনেতা ভাউরাও, শ্রদ্ধেয় লেখক দাদাসাহেব সবাই এক। পতিতা নারীর অন্তরের মহৎ প্রবৃত্তির কথা বলেছেন বসন্ত কানেটকর এবং দেখিয়েছেন পুরুষ শাসিত সমাজে এরকম নারীরা কত অসহায়।

কানেটকরের ২৫ তম নাটক 'গোষ্ট জন্মান্তরীচী' (পূর্বজন্মের কাহিনী) জে. বি. প্রিস্টলের I have been here before নাটকের ভাব নিয়ে লেখা যদিও ভারতীয় ভাবনা এতে অন্তর্নিহিত, নাটকের কালকল্পনার আধার ভারতীয় দর্শন ও বেদান্ত। সম্পূর্ণ অন্য রীতির লেখা পরের নাটক 'গাঠ আহে মাঝ্যাসি' (আমার সঙ্গে গাটছাড়া) রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নাটক যাতে ধুরন্ধর চতুর রাজনীতিবিদদের চিত্র যারা আইনের সাহায্য ও আশ্রয়ে পাপ করে অপরাধ করে। এক মন্ত্রী হত্যা করে, কেউ তাকে ধরতে পারে না। শুধু তাই নয়, সে প্রতিপক্ষকে খুনের মামলায় জড়ায় ও তাকে দোষী প্রতিপন্ন করে এবং তার মৃত্যুদন্ড হয়। চতুর কৌশলী আইনবিদের সহযোগে এই কাজ হয়। শেষ পর্যন্ত এক আইন-জানা সাংবাদিক যে সত্য ন্যায়কে মর্যাদা দেয় — পরিণামে নির্দোষকে বাঁচায়।

'গগনভেদী' (১৯৮২) নাটকে কানেটকর চেষ্টা করেছেন শেকসপীয়রের চারটি বিখ্যাত ট্রাজেডির ভাবনাকে এক সঙ্গে বাঁধতে। একজন মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় বিচিত্র দুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যা শেকসপীয়রের বিভিন্ন ট্রাজেডির নায়কের যন্ত্রণার মত এবং কখনো মা কখনো স্ত্রী কখনো মেয়ে জীবনের দুঃখবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য শেকসপীয়র অনুরাগীরা বলবেন শেকসপীয়রের একটি নাটকেই মানবজীবনের যে ট্রাজেডি আছে তা অভাবনীয় ও তা বিশ্বজনীন রূপ পেয়েছে। যেখানে বসন্ত কানেটকরের একটি নাটকে চার ট্রাজেডির সমাবেশ বড় বেশী আত্মপ্রত্যয়ের কাজ এবং তাই কানেটকর কখনই সফল নন। 'গগনভেদী' নাটকে নায়কের বাবা শিল্পপতি যে নিহত হয়। নায়কের মা ম্যানেজারকে বিয়ে করে। নায়ক বাড়ি থেকে চলে যায় ও নিজের

চেষ্টায় গড়ে তোলে বড় সম্পদ। কিন্তু একদিন তার মেয়ে এসে নিদারুণ অভিযোগ করে যে তার মার অন্য পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে। নায়ক স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করতে যায়। নাটকের শেষ দৃশ্যে মেয়ে তার বাবাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই নাটক লন্ডনে প্রথম অভিনীত হয়। কানেটকরের 'বাদল মানসলতায়' (ঝড় থেমে গেছে) ১৯৮৪ র ডিসেম্বর প্রথম অভিনয় হয়। কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় এখানে বিবেচিত হয়েছে এবং বাবা আমতের মহান আদর্শ স্মরণ করে নাটক গড়ে উঠেছে।

বিষ্ণু বামন শিরওয়াডকর (১৯১২-১৯৯৯) কবিতা উপন্যাস নাটক সব ক্ষেত্রেই আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্তত চল্লিশটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। জীবনের গভীরতার বোধ তাঁর মধ্যে আছে তার সঙ্গে আছে অনুপম কবিত্ব। তিনি কবি 'কুসুমাগ্রজ' রূপেই বিশেষ সম্মানিত। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে 'কৌন্তেয়' (১৯৫৩) ও 'যযাতি আনি দেবযানী' (১৯৬৮) পৌরাণিকতার নতুন দিক উন্মোচিত করে যার মধ্যে জীবন ধর্ম বড় হয়ে ওঠে। 'অস্কার ওয়াইল্ডের' 'অ্যান আইডিয়াল হাজব্যান্ড' তিনি অনুবাদ করেন — 'দুরচে দিবে' (দূরের আলো), 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে লেখেন 'রাজমুকুট', মেটারলিংকের 'মন্না ভান্না' রূপান্তর করেন 'বৈজয়ন্তী' নামে।

'দুসরা পেশোয়া' (১৯৪৭) নবভাবের ঐতিহাসিক নাটক যা পেশোয়া বাজীরাও এর ব্যক্তি জীবনের এক রোমান্টিক অধ্যায়কে নিয়ে গড়ে উঠেছে — মুসলমান সৌন্দর্যময়ী নারী মস্তানির সঙ্গে তার ভালবাসা। বাজীরাও-এর শেষ দিনগুলি ও তার মৃত্যুর পর মস্তানির অসহায়তার চিত্র বেশ সুন্দর।

'নটসম্রাট' (১৯৭০) নাটকের জন্য তিনি একাডেমী পুরস্কার পান। এই নাটকের ওপর কিং লিয়র নাটকের প্রভাব আছে। এক নটের জীবনের বেদনাময় পরিণতি নিয়ে নাটক গড়ে উঠেছে। গণপতরাও বেলওয়ালকব প্রতিভাবান অভিনেতা ছিল — সারা জীবন সম্ভ্রম ও মর্যাদার সঙ্গে অভিনয় করে গেছে। সুখী পরিতৃপ্ত সে। শেষ বয়সে অর্জিত ধন দুই পুত্র কন্যাকে দিয়ে দেয় যারা তার জীবনের ভালবাসার পবিত্র সম্পদ। সে বাকি জীবনটা নিত্যসঙ্গিনী কাবেরীকে নিয়ে কাটাবে তাদের ছেলে কিংবা মেয়ের বাড়ি। তার অর্থ নেই আছে নটের গৌরব অভিনেতার সম্মান শিল্পীর ব্যক্তিত্ব। লিয়র কন্যার মত তার পুত্র কন্যার কাছ থেকে এল নির্মম আঘাত। আঘাতে অপমানে অসুস্থ কাবেরী মারা যায়, অসহায় বিধ্বস্ত বেলওয়ালকর উন্মাদের মত পথে ঘুরে বেড়ায়। বুট পালিশ ছেলে রাজা এই বৃদ্ধকে আপন করে নেয়। অনেক সন্ধান করে পুত্র কন্যারা আসে কিন্তু নটসম্রাট আপন মহিমায় স্থির অবিচল। জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও রাজমহিমায় অস্বীকার করে অগ্রাহ্য করে ক্ষুদ্রতা নীচতার বন্ধনকে, বরণ করে স্রষ্টার মর্যাদামন্ডিত শেষ পরিণামকে। এই নাটকে একজন শিল্পীর মহিমাকে পূর্ণ মূল্যে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে — চারপাশের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা স্বজনদের সংকীর্ণতা প্রতিবেশের প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করে শিল্পী অভ্রংলিহ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যা হয়েছে নটসম্রাট বেলওয়ালকর। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের নৈকট্য ও গভীরতার অপরূপ চিত্রনও আছে। এবং আশ্চর্য কবিত্বময় ভাষা ও সংলাপ 'নটসম্রাট' কে শিল্পের চরমোৎকর্ষ দান করেছে।

শেষদিকের নাটক 'মী এক মুখ্য মন্ত্রী' তাঁর এক ছোট গল্পের ওপর ভিত্তি করে লেখা রাজনৈতিক নাটক। গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী, তার দুই ছেলে — একজন অপদার্থ, আর একজন নকশালপন্থী — যে ছদ্মনামে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আর এক চরিত্র চিত্রা সলওয়ংকর যে আপাত দৃষ্টিতে অসৎ ও প্রলোভনকারিণী কিন্তু সে আবার হয়ে ওঠে

বিবেকের প্রতিমূর্তি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চিত্রা ও পুত্র সমীরের দ্বন্দ্ব যে বাবাকে খুন করতে যায় কিন্তু পিতার মহত্ত্বের কাছে পরাভূত হয়।

বাল কোলহাটকর পেশাদারী মঞ্চের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছেন নাটকে। আবেগ তাঁর নাটকে প্রাধান্য পায়, প্রেম ভালবাসার দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে, চরিত্রগুলো সাদা অথবা কালোয় অংকিত, অতিনাটকীয়তার প্রবণতাও আছে। 'দুরিতাঞ্চে তিমির জাভো' (পাপীদের অন্ধকার দূর কর) জনপ্রিয় নাটক, একটু অতিনাটকীয়তা আছে। 'অঙ্গাই' (ঘুম) সন্তানের প্রত্যাশায় এক নারীর আকুলতা। 'ভেগলে ভাইচয়া মলা' (আমি আলাদা থাকতে চাই) হিন্দু যৌথ পরিবারের ওপর লেখা যার পরিণতি বেদনাদায়ক। 'সীমেওয়ারুন পরত জা' (সীমা থেকে ফিরে যাও) ঐতিহাসিক নাটক, গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার ও ভারতীয় বীরদের নিয়ে লেখা। 'বাহাতো হী দুর্বাঞ্চি জুড়ি' (দুর্বাফুলের অঞ্জলি) নাটকও মরাঠী পরিবারকে নিয়ে লেখা। শেষদিকের নাটক 'দেবরচে হাত হজার' (দাতার হাজার হাত) নাটকের বিষয় ধর্মসংস্কার নিষ্ঠ, যদিও এর উপস্থাপনা অভিনব। এক মৃত ব্যক্তির আত্মা এসেছে যে স্ত্রীর অবিশ্বাসে শতাব্দী ধরে যন্ত্রণা পেয়েছে। সে আর এক ভুল পথে যাওয়া স্বামীকে ঠিক পথে চালিয়ে মুক্তি পায়। অর্ধশতাধিক নাটক কোলহটকরের সৃজন ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

গোপাল নীলকণ্ঠ দণ্ডেকর মূলত ঔপন্যাসিক, কথাশিল্পের তিনি খ্যাতিমান স্রষ্টা। তবে নাটক রচনায়ও সবিশেষ দক্ষ। আবেগময় জীবন, নরনারীর প্রেম সম্পর্ক, সমাজ সংসারের সাধারণ চিত্র ইত্যাদিতে তিনি দক্ষ। মহারাষ্ট্রের গ্রামজীবনের রূপায়ণে তিনি বিস্ময়কর দক্ষতা দেখিয়েছেন। রঙ্গনেকরের আহ্বানেই তিনি মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হন এবং 'রাধামাঈ' মঞ্চস্থ হয় যাতে জ্যোৎস্না ভোলে কৃষ্ণের বাল্যসঙ্গিনী মহিয়সী রাধার ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরে দন্ডেকর গ্রাম্য সাধারণ মরাঠী জীবনের প্রাণোচ্ছল ছবি আঁকেন। 'জগন্নাথচ রথ' ও 'পবন কাঠচা ধোন্ডী' (পবন নদীর ধারে ধোন্ডী) কিছুটা অতিনাটকীয়তার লক্ষণাক্রান্ত হলেও মহারাষ্ট্র গ্রামজীবনের নিখুঁত পরিচয় তুলে ধরে। 'শিতু' (১৯৫৩) উপন্যাসের নাট্যরূপ অসাধারণ জনপ্রিয় হয়। দন্ডেকর এই নাটকে কোঙ্কন গ্রামজীবনের পটভূমিকায় নরনারীর প্রেমের ট্র্যাজিক ছবি এঁকেছেন। কাহিনীর নায়ক গ্রামের প্রধান বিশু ভালবাসে শিতুকে যে এক অন্ত্যজ নারী এবং বাল্যবয়সে দুবার বিয়ে হলেও স্বামীরা মারা গেছে। সে নিজেকে অভিশপ্ত মনে করে ও বিশুর প্রবল আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে চায়। শেষ পরিণতি বেদনার। বিশু উন্মাদ প্রায় হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে মিলিত হতে আসা শিতু নদী পার হতে মারা যায়। এই নাটকের অভিনয় মঞ্চ সফল হয় বিজয়া মেহতার পরিচালনায় যিনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ও করেন, কাশীনাথ ঘাণেকর হন বিশু।

শ্রীপাদ নারায়ণ পেন্ডসে অগ্রণী মরাঠী উপন্যাসিক ও তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস সার্থক নাট্যরূপ পেয়েছে। 'মহাপুর' কৌতুক-ব্যঙ্গের নাটক। 'রাজে মাষ্টার' (তাঁর 'হদ্দাপার' উপন্যাসের নবরূপ, ১৯৫০) এক গ্রাম্য স্কুল শিক্ষকের কাহিনী। দুয়েরই পটভূমি পরিবেশ কোঙ্কন।

'গরমবীচা বাপু' (তার ঐ নামের বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ ১৯৫২) কোঙ্কন গ্রামের পটভূমিকায় জীবনের চিত্র, নরনারীর প্রেম সম্পর্কের কথা, যুবসমাজের কাহিনী। গ্রামের মোড়ল বা মুখিয়া যশোদার প্রতি অনুরক্ত যাতে যশোদা সন্তান সম্ভাবিতা হয়। কিন্তু তার বিয়ে হয় বিঠোবার সঙ্গে। যশোদার ছেলে হয় বাপু যে বড় হলে মুখিয়ার সঙ্গে

তার প্রবল বিরোধ হয় ও বাপুই জয়ী হয়। বাপুর সঙ্গে বাধার ভালবাসারও একটা সুন্দর ছবি এঁকেছেন পেন্ডসে।

বিদ্যাধর গোখলে এক শক্তিশালী নাট্যকার যিনি সাহিত্য সংঘ গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন না। তিনি মরাঠী ধারার প্রচলিত ঐতিহ্যকে বহতা রেখেছেন। তিনি মরাঠী সংগীতময় নাটককে পুনর্জীবিত করেছেন, কবিত্বময় সংলাপ ও সংগীতের প্রয়োগ তাঁর নাটককে সুন্দর সমৃদ্ধ করেছে। কৌতুকেও তিনি দক্ষ।

গোখলের প্রথম প্রয়াস আগাথা ক্রিস্টির 'উইটনেস ফর দি প্রসেকিউসন' এর রূপান্তর। প্রথম মৌলিক প্রয়াস 'পন্ডিতরাজ জগন্নাথ (১৯৬০) জগন্নাথ পন্ডিতেব জীবন ও কাব্য- সাধনার নাট্যচিত্র যে পন্ডিত-কবিকে প্রথম যুগের মোগল বাদশাহরা সম্মান কবতেন। 'সুবর্ণতুলা' (১৯৬০) সঙ্গীতময় পৌরাণিক নাটক যাতে শ্রীকৃষ্ণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। নাটকে রুকমিনী ও সত্যভামার দ্বন্দ্ব হিন্দু দেবতাদের বিবাহিত জীবনকে কৌতুক রসিকতাকে তুলে ধরার সঙ্গে সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকেও ব্যঙ্গে প্রকট করে। সংগীতের সুন্দর প্রয়োগ আছে যা ঘটনানুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে কৌতুককরও। 'মন্দারমালা' (১৯৬৩) অনেকটা খাদিলকরের 'মানাপমান' নাটকের রীতিতে লেখা। তার অন্যান্য নাটক হল 'মদনাপ্তী মঞ্জরী' 'স্বর সম্রাজ্ঞী' 'জয় জয় গৌরশংকর' (১৯৬৬) ইত্যাদি। বিদ্যাধর গোখলের লেখনী আজও সম্মানিত।

মধুসুদন কালেলকর (১৯২৪-১৯৮৫) প্রায় ৩৫ টা নাটক লিখেছেন। তিনি ভারতীয় সমাজ ও জীবনের বৈচিত্র্য নাটকে তুলে ধরেছেন। তার 'অপরাধ মিচ কেলা' (অপরাধ আমিই করেছি) বিখ্যাত নানাবতী হত্যা মামলা অবলম্বনে লেখা। কম্যানডার অশোব ওয়ারতি ও তার স্ত্রী শৈল সুখ শান্তিতেই জীবন কাটায়, তবে স্বামী বাইরে গেলে স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা বেড়ে যায়। ধনী ব্যবসায়ী শ্যাম অজিঙক্যা এ অবস্থায় শৈলর ঘনিষ্ঠ হতে চায়। অশোক ফিরে এসে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্যামের কাছে যায় ও বলে যে সে ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে। শ্যাম তিক্ত নির্মম স্বরে বলে যে মেয়েরা তার সঙ্গে শোয় তাদের প্রত্যেককেই সে বিয়ে করতে পারে। উত্তেজিত অশোক তাকে হত্যা করে। তীব্র উত্তেজনাময় ভাবে এই কাহিনী নাটকে পরিবেশিত হয়েছে। 'দিল্যা খরি তু সুখী রহা' (যেখানে বিয়ে হবে সুখে থাক) প্রেম ও কৌতুকের নাটক। অবিনাশ অলকাকে খেলার মাঠে দেখে ও প্রথম দর্শনেই তারা প্রেমে পড়ে। কিন্তু তাদের প্রেমিকরা যেখানে এসে পড়ায় তারা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে তৈরী হয় বিভিন্ন মজার ঘটনা। কালেলকরের অন্যান্য নাটক 'দিবা জলু দে সারি রাত' (১৯৬৫, সারারাত দীপ জ্বলুক), 'মাঝা কুনা মনু মী' (আমি কাকে আমার আপন বলি), 'হে ফুল চন্দনাচে' (এ ফুল চন্দনের) ইত্যাদি।

পুরুষোত্তম দরভেকর (১৯২৮-১৯৯৯) নাটকের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, ভাল পরিচালকও। নাট্যকার রূপেও বিদর্ভের এই শিল্পী মরাঠী দর্শকদের মন জয় করেছেন। ঘটনার তীব্র গতি ও বলিষ্ঠ সংলাপ তাঁর বৈশিষ্ট্য। দরভেকরের প্রথম নাটক 'চন্দ্র নভীচা ঢললা' (১৯৬০, চন্দ্র আকাশে ঢলে পড়েছে) আলবেয়র কাম্যুর 'ক্যালিগুলা' নাটকের সুন্দর রূপান্তর। 'কলি মাতি ক্ষরে পনি' (কালো মাটি নোনা জল) নাটক আঞ্চলিক পটভূমিকায় স্থাপিত যাতে এক ভূস্বামীর নিষ্ঠুরতা ও তার ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব জটিলতার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের চরিত্র চিত্রনে লেখক সার্থক হয়েছেন। তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট নাটক হল 'মনশ্যাম নয়নি আলা' (ঘনশ্যাম চোখের সামনে এলেন), 'কথা কুনাচি ব্যথা

কুনা' (একের কথা অনেক ব্যথা) 'ক্যাট্যার কলেজাত ঘুসলী' (তরবারি হৃদয়ে বিদ্ধ) ইত্যাদি।

সুরেশ খরে (১৯৩৮) মধ্যবিত্ত সমাজের দুর্নীতি ও পতনের চিত্র এঁকেছেন নাটকে। 'পাপা সাঙ্গা কুনাচে' (বাবা বলি কাকে) প্রহসন জাতীয় নাটক। বাবা একজন ভাল লোক, উপযুক্ত স্বামী ও দুই পুত্রের আর্দশ পিতা। ঘটনাক্রমে তাব সঙ্গে এক বিবাহ বিচ্ছিন্ন নারীর পরিচয় হয় ও সে দু বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়। বাড়িতে বিষম গন্ডগোল দেখা দেয় ও তার পুত্রকন্যারা নতুন বাড়ি যায় ও বিচিত্র কান্ড কারখানা ঘটে। 'কাচেচা চন্দ্র' (কাচের চাঁদ) এক সিনেমা অভিনেত্রীর জীবনের ট্র্যাজেডি নিয়ে লেখা যে প্রথমে তাব ভাইয়েব হাতের পুতুল ছিল যে নিজ স্বার্থের জন্য বোনের প্রতিভা ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে।

সুরেশ খরের 'এক ঘবাত হোতী' (১৯৭২) সমাজ পটভূমিকায় পাবিবারিক ট্র্যাজেডিব কাহিনী। শ্রীধর পঙ্গু হয়ে পড়ে, উমা চাকরী করে, পরিবারে বিশেষত শ্রীধরেব মনে বেদনা দুঃখ সন্দেহ জাগে উমার আচরণ নিয়ে যদিও উমার সততায় প্রশ্ন নেই। ক্লান্ত বিষন্ন শ্রীধর আত্মহত্যা করে। আধুনিক সমাজ জীবনের জটিল আবর্ত, মনলোকেব দ্বন্দ্ব সংকট প্রবল ভাবে চিত্রিত হয়েছে।

মধুকর তোরডমল (১৯৩২) এক যথার্থই নাট্যব্যক্তিত্ব — একজন সুদক্ষ পরিচালক, ক্ষমতাবান নাট্যকার ও নিপুণ অভিনেতা। সাম্প্রতিক সমাজ ও ব্যক্তিজীবনেব বৈষম্য বিকৃতি অসংগতিকে তিনি তীব্র আঘাত করেছেন এবং এক যথার্থের ভাবনা ও সত্যের আকাঙ্ক্ষা সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। তার 'তরুণ তুর্ক ও মাতারে অর্ক' (১৯৭২ তরুণ তুর্ক ও বুড়ো শালিক) 'মাতারে অর্ক বাইত গর্ক' (বুড়ো শালিকের মেয়ে কামনা) কৌতুক ব্যঙ্গে র নাটকে লোভী লোলুপ বৃদ্ধদের আঘাত করা হয়েছে ও প্রাচীন নতুনের দ্বন্দ্ব প্রকাশ হয়েছে। 'ক্রান্তি'- জর্জ অরওয়েলের 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' অবলম্বনে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীব্র প্রকাশ। 'সট কাট্' নাটকও ব্যঙ্গাত্মক ও তিক্ত প্রায়। 'ঋণানুবন্ধ' (ঋণের সম্পর্ক) পারিবারিক কাহিনী—অন্যায়-পাপ, প্রেম-প্রীতি, অনুতাপ-ক্ষমার মধ্য দিয়ে কাহিনী আকর্ষণীয়ভাবে নড়ে উঠেছে। প্রথম অভিনয় — রসিকরঞ্জন মুম্বাই, পরিচালনা তোরডমল।

'কালে বেট লাল বাত্তি' (কালো দ্বীপ লাল বাতি) তার প্রথম দিকের লেখা যাতে এক ধর্ষকামী শাসকের কথা বলা হয়েছে। এক দ্বীপে আটকে পড়েছে কজন ব্যক্তি — বিজ্ঞানী, পুরোহিত, বক্তা, চিকিৎসাবিদ ছাত্র ও মহিলা। শাসক তাদের হত্যার ভয় দেখায় ও বাঁচাবার তাগিদে তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে হত্যায় প্ররোচিত করে। সেই অত্যাচারী শাসক যেন আমাদের মনেরই প্রবৃত্তি যা হত্যা কিংবা ভয়ঙ্করতায় আনন্দ পায়। তিন অঙ্কের হাস্যরসের নাটক 'বাপ বিলন্দর বেটা কলন্দর' (১৯৭৫) 'গুড বাই ডকটর' (১৯৭৬) প্রভৃতিও তার বিশিষ্ট রচনা।

শংকর গোবিন্দ সাঠে হাস্যরসিক নাট্যকার যিনি কৌতুক রসিকতায় সমাজ ও মানবজীবনের সত্যকে তুলে ধরতে চান। 'ছাপিল সংসার' প্রথম পর্বের কমেডি যাতে সুখ দুঃখময় জীবনের চিত্র রসরসিকতায় ফুটেছে। 'পহতেচি চাঙ্গল' নাটকে এক তরুণ যুবকের বেদনাময় চিত্র যে সমস্ত অসংগতি বা প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনকে গড়ে তুলতে চায়। 'স্বপ্নিচে হি ধন' দুই চরিত্রের ভিন্নধর্মী মানসিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে — একজন ফিরে আসতে চায় জীবন থেকে তার একজন সেখানে যেতে চায়। মরাঠী পরিবারের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য নাটকে ফুটেছে। 'সসা অনি কাসর' (খরগশ ও কচ্ছপ) প্রচলিত লোক কাহিনীর বক্তব্য নিয়ে লেখা যা এযুগে সম্পূর্ণ পালটে গেছে। সে যুগে জিতেছিল

ধীর স্থির কচ্ছপ কিন্তু আজ সেই ধৈর্য নেই স্থিরতা নেই আন্তরিকতা মূল্যহীন ও পরাজিত। তাই শান্ত নিরীহ শ্রীধর তার প্রেমিকার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। শ্রীধর সহজ সরল, তার বন্ধু মুকুন্দ চালাক ধূর্ত। শ্রীধর কুমুদকে ভালবাসে যদিও কুমুদ তাকে বোকাই বানায়। মুকুন্দর সঙ্গে কুমুদের প্রণয় গড়ে ওঠে। শ্রীধরকে প্রত্যাখ্যান করে কুমুদ, শ্রীধর অত্যান্ত আহত হয় বিশেষত যখন শোনে যে মুকুন্দর সঙ্গে কুমুদের বিয়ে হবে। আর এক মেয়ে উষা সেও সহজ সরল, শ্রীধরের প্রতি তারও অনুরাগ ছিল। কিন্তু এখানেও শ্রীধরের ভালবাসা পূর্ণতায় পরিণতি পেল না। নাটকে শ্রীধরের চরিত্রের প্রকাশ সুন্দর, বোম্বের বস্তিজীবনের ছবিও সুন্দর ফুটেছে।

পি. এস. রেগে (১৯১০-১৯৭৮) একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে কাব্যরচনায়ও সুদক্ষ। অনেক কাব্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনটি নাটক রেগে লিখেছেন যেগুলো কাব্যিকতায় সুন্দর, মনের গভীর অনুভূতিতে অপূর্ব এবং নাটকীয়তায় তীব্র। রঙ্গপাঞ্চলিক (১৯৫৮) গ্রন্থের প্রথম নাটক 'রঙ্গপাঞ্চালিক'-এর মূলভাব প্রেম, মূল আকর্ষণ অর্জুনের প্রতি উত্তরার ভালবাসা ও তার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় নাটক 'কালযবন' এর মূল প্রশ্ন ভয় কী? মৃত্যুভয়ের অর্থ কি? সারা মথুরা নগরী কালযবনের মত সিদ্ধিপ্রাপ্ত ও অবধ্য শত্রুর ভয়গ্রস্ত। এই সংকট থেকে সবাই মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু সবাই দিশাহারা। নিজের মনের ভয় লুকোতে সবাই প্রশ্নোত্তর খেলে। রাধার কেবল মৃত্যুভয় নেই। সে বোঝে সব থেকে বড় ভয় নিজের ভয়। 'মাধবী : এক দান'-এ কলা নির্মাণের রহস্য নিয়ে বক্তব্য আছে।

ব্যাঙ্কটেশ মাডগুলকর (১৯২৭) উপান্যাস ও ছোটগল্পের রচয়িতা রূপে অতি বিশিষ্ট, নাটকও লিখেছেন। 'পতি গেলেগা কাঠবাড়ি' (পতি গেল কাঠবাড়ি) উল্লেখ্য নাটক। আমেরিকান ফিল্ম 'ফিডলার অন দি রুফ' অবলম্বনে মাডগুলকরের 'বিকট ওয়াট বহিবাত' আই এন টি প্রযোজনা করে ১৯৭৬-এ। মূল কাহিনীতে জারের সময়ে একটি রাশিয়ান গ্রামের ওপর অত্যাচারের কথা। এই নাটকে হায়দ্রাবাদে নিজাম শাসিত রাজ্যে এক গ্রামের ওপর রাজাকারদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। 'কালাবরোবর চলা' (১৯৬২) আধুনিক তামাসা, নতুন রীতির নাটক। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এই 'শিল্পীর রচনা বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বিজয় ধোণ্ডোপন্ত তেণ্ডুলকর (১৯২৮) মরাঠী নাট্য সাহিত্যে বহুখ্যাত ও সর্বাধিক বিতর্কিত নাম। দর্শকদের বিমূঢ় করে, সেনসর প্রথাকে পরাজিত করে, সমালোচকের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে তাঁর নাটক সগৌরবে অভিনীত হয়ে চলেছে বিভিন্ন ভাষায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বিজয় তেন্ডুলকর প্রবল মাত্রায় সমাজ সচেতন ও বর্তমান অবক্ষয়জীর্ণ ঘুণধরা সমাজব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্য স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি — এক সর্ববিধ্বংসী সর্বনাশা ঝটিকা উদ্দাম প্রবাহিত হয়ে ন্যায়-নীতি-নিয়মের প্রচলিত বোধকে আমূল উৎপাটিত করে সমাজ ভাবনার ভিত্তিমূলকে প্রকম্পিত করে দিচ্ছে তাঁর নাটক। এবং ক্রোধে ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়ছেন। ঘৃণার আগুনে ঝলসে দিতে চাইছেন এই সমাজ ব্যবস্থাকে, পুরাতন মূল্যবোধকে ছিন্ন ভিন্ন করতে চাইছেন। ব্রিটেনের নাটকের মত মরাঠী থিয়েটারেও তিনি 'ক্রুদ্ধ তরুণ' রূপে অভিহিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক চেতনা তাঁর মধ্যে আছে। সমসাময়িক রাজনৈতিক ভারতবর্ষের এক অস্থির নির্মম চিত্রও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নাটকে। তেন্ডুলকর নব্যনাট্যরীতির প্রথম নাট্যকার এবং আধুনিক নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের গভীর অনুভবও বিজয় তেন্ডুলকরের নাটকে পাওয়া যায় — মানবমনের দুরবগাহ গভীরতার উদ্ভাসন করেছেন তিনি। একক ব্যক্তি মনের অসহ্য বেদনা ও হাহাকার তাঁর মনে অনুরণন তোলে। ব্যক্তি ও সমাজের সংঘর্ষের ফলে জাত চরিত্রের একাকীত্ব ও নৈরাশ্য সুতীব্র আকুলতায় প্রকাশ পায়। "ব্যক্তীচা একটেপনা হা তেন্ডুলকরাঞ্চা আবড়তা বিষয় হোয়। 'মানুষ নাবাচে বেট' মধীল কাশীনাথ, 'মী জিঙ্‌কলো মী হরলো', মধীল মাধব, 'গিধাড়ে' মধীল রমা, 'শান্ততা। কোর্ট চালু আহে!' মধীল বেনারে, 'ঘরটে আমুচে ছান' মধীল সুনেত্রা, 'ঘাসিবাম কোতবাল' মধীল ঘাশীরাম হী যা একাকী জীবনাচী উদাহরণে।"[১২]

আঙ্গিকের বিচারে চরম শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন তেন্ডুলকর। তাঁর নাটকের গাঁথুনি ভাল, তমাশা দশাবতারী প্রভৃতি লোক আঙ্গিকের অসামান্য প্রয়োগ করেছেন তিনি, এবং আধুনিক সফিসটিকেটেড টেকনিকের শিল্পঋদ্ধ ব্যবহারও তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। কোন ছকবাঁধা রূপবন্ধনে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, নতুন বিস্ময় ও অভিনবত্ব প্রতিবারই তিনি আনতে চান।

অন্তত পঁচিশটা পূর্ণাঙ্গ, বেশকিছু একাংক তিনি লিখেছেন · সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্প ও চিত্রনাট্য তিনি রচনা করেছেন। প্রথম নাটক 'গৃহস্থ' (১৯৫৫) বিশেষ উল্লেখ যোগ্য নয়। পরের নাটক 'শ্রীমন্ত' (১৯৫৫) কুমারীর মাতৃত্ব প্রসঙ্গে উঁচু সমাজের মানুষদের মানসিকতা প্রকাশিত। উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে (মথপুরা) গর্ভবতী হয় ও গরিব যুবককে (শ্রীধর) আনা হয় তাকে বিয়ে করতে। 'মানুষ নাবাচে বেত' (১৯৫৬) দেখায় কি ভাবে সামান্য মানুষ জীবনে বেঁচে থাকতে পারে। 'মী জিঙ্‌কালো মী হারলো' (১৯৬৩ আমি জিতেছি আমি হেরেছি), এক সাধারণ মানুষকে নিয়ে লেখা যার বাসনা অভিনেতা হবার; প্রথমে পেশাদার মঞ্চে ও পরে চলচ্চিত্রে আবর্ত সংকুল জীবনে তার অবস্থান কৌতুক বেদনায় আঁকা হয়েছে। অভিনেতা ও তার স্ত্রীর সম্পর্ক সুন্দর ফুটেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে লিখে চলেন 'রাত্র' (নরনারীর হৃদয়ের উন্মোচন), 'চার দিবস' (চাকরী যাওয়া মেয়ের বেদনা) 'বলি' (মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বময়) ইত্যাদি।

'দম্বদ্বীপচা মুকাবলা' (১৯৬৮) তেন্ডুলকরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। দম্বদ্বীপের জনপ্রিয় মহারাজার মৃত্যুর পর পাঁচ বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজ্যের লোভে অধীর হয়, কিন্তু মহারাজের একমাত্র কন্যা হঠাৎ সিংহাসনে বসে। মন্ত্রীরা ভাবে একে যেরকম খুশী চালাবে। কিন্তু রাজকুমারীর প্রতিহারী ও সহযোগী হিজড়ার কুট বুদ্ধি ও শিক্ষায় সে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠেছে ও পাঁচ মন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে দেশকেও দক্ষতায় চালায়। সেই নারী ক্ষমতায় ও শক্তিতে উন্মত্ত হয়ে যা খুশী করতে থাকে, মন্ত্রীরা তার বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করে কিন্তু রাজকুমারীর নির্দেশে তারা জনতার ওপর গুলি চালায় ও ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করতে এলে রানী হাসিমুখে তাদের সামনে দাঁড়ায় ও জনতার শত্রু ঐ পাঁচজনকে মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত করে। রানী হলেন ইন্দিরা গান্ধী, পাঁচ বৃদ্ধ মন্ত্রী মোরারজী কামরাজ প্রমুখ, আর হিজড়েরা হল বুদ্ধিজীবী। ভারতবর্ষের এক যথাযথ চিত্র নাটকটি।

'শান্ততা! কোর্ট চালু আহে' (১৯৬৮) নাটকটি তেণ্ডুলকারের খ্যাতিকে সারা দেশে প্রসারিত করে। লেখকের সমাজ চেতনা, যৌন মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ, হৃদয়ের অনুপম প্রকাশ এবং নাট্যগ্রন্থন কৌশল নাটককে অসাধারণ শিল্পমূল্যে অধিষ্ঠিত করেছে। একদল নরনারী কোর্ট কোর্ট খেলতে শুরু করে, খেলার ছলে এক নারীর (লীলা বেনারে) জীবনের ঘৃণ্য লজ্জা গোপন বেদনা চরম কলংক উদ্‌ঘটিত হয় : সমাজ ব্যবস্থা কীভাবে এক নারীর

শুভ্র সুন্দর বিকাশোন্মুখ পবিত্র বাসনাকে ধর্ষিত করে তাকে চূড়ান্ত অবমাননার দিকে ঠেলে দেয় তাই নাটকে বলা হয়েছে। নাটকের শেষে লীলা বেনারে যন্ত্রণামথিত কণ্ঠস্বরে যেন বুকের উথালপাথাল কান্না ঝরে পড়ে ও তার গান বয়ে আনে রক্তক্ষরিত হৃদয়ের আর্তনাদ।

'অশী পাখরে য়েতি' সহজ আন্তরিক গল্প। এক ছন্নছাড়া উদাসীন মানুষ অরুণ বেরিয়েছে পৃথিবীর পথে। সে এক অচেনা অজানা পরিবারে আসে ও তাদের আপন করে নেয়। সেই বাড়ির মেয়ে সরু, তাকে নিয়ে সবাই বিব্রত কারণ সে সাজসজ্জা লজ্জাশরম বা নারীত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয় এবং তার বিবাহ নিয়ে তাই সমস্যা দেখা দিয়েছে। অরুণ তাকে বোঝাবার জাগাবার চেষ্টা করে, তাকে দেখতে আসা পাত্র সম্বন্ধে অবহিত করে। শেষ পর্যন্ত জীবন-বিবিক্ত উদাসীন অরুণ নিজেই মেয়েটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে পথে।

'গিধাড়ে' (১৯৭০) নাটকে আবার নাট্যকার তীব্র প্রচন্ড। এক আধুনিক ভারতীয় জীবন তার লোভে বর্বরতা ঘৃণা বিদ্বেষ নিয়ে অংকিত : বৃদ্ধ পিতা, তার বিতাড়িত ভ্রাতা সখারাম, তার পুত্রদ্বয় রমাকান্ত ও উমাকান্ত — প্রত্যেকেই প্রতারক ঘৃণ্য ভয়ংকর অপরিমিত মদ্যপায়ী। বৃদ্ধের যুবতী কন্যা মানিকও একই ধরনের — সে এক রাজাকে গাঁথতে গিয়ে নিজেই গর্ভবতী হয়। বৃদ্ধ পিতার অবৈধ সন্তান কবি রজনীনাথের ভাষায় এরা পাঁচ শকুন : এদের পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ অমঙ্গল-প্রয়াস ধ্বংসবাসনা এক ভয়াল শ্বাসরোধকারী পরিবেশ সৃজন করে যা স্নায়ুকে অসহ্য পীড়ন করে ও এক নৈরাশ্য ক্ষুব্ধ যন্ত্রণাক্লিষ্ট মরুভূমির ধু ধু করা জ্বালাময় প্রতিবেশ সৃষ্টি করে। রমাকান্তর শান্ত স্তব্ধ সন্তানহীনা স্ত্রী রমা যেন সমগ্র বিষ নিজেদেহে ধারণ করে : তার গর্ভে অন্যের সন্তান। 'সখারাম বাইন্ডার' (১৯৭২) একজন বই বাঁধানেওলার যৌন কামনা ও বিকারকে নিয়ে লেখা। এই নাটক নিয়ে সাহিত্য রুচি সম্পর্কিত ও আইন ঘটিত অনেক তর্ক-বিতর্ক বা ঝড় ওঠে।

'ঘাসিরাম কোতওয়াল' (১৯৭৩) নাটকের পটভূমি অষ্টাদশ শতাব্দীর পুণে; তখন মরাঠা শাসনের শেষ পর্ব, রাজনৈতিক জটিলতা ও নৈতিক বিকৃতি তখন প্রবল। প্রকৃতপক্ষে মরাঠারাজ্য তখন অস্থির, বিশৃঙ্খলতায় টালমাটাল। পেশোয়ার প্রধান অমাত্য নানা ফড়নবীস এক চতুর ধূর্ত বদমায়েশ এবং নিত্য নারীসঙ্গকামী রাজনীতিবিদ্। কনৌজ থেকে ঘাসিরাম পুণাতে এসেছিল ভাগ্য ফেরাতে কিন্তু সেই বিকৃত পরিবেশে সমাজচালক ব্রাহ্মণদেব অসভ্যতা ও অত্যাচারে সে নিদারুণ অপমানিত হয় ও এদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। সে তার কন্যা ললিত গৌরীকে নিয়ে আসে ও লালসাপরায়ণ নানার হাতে তাকে অর্পণ করে, বিনিময়ে পায় পুণা শহরের কোতওয়ালের পদ। তাই পেয়ে সে নিদারুণ অমানুষিক অত্যাচার করতে শুরু করে বিশেষত ব্রাহ্মণদের ওপর। ধূর্ত নানা সাহেব তাকে দিয়েই সব অন্যায় করায়। কিন্তু তার মনে এক গভীর যন্ত্রণা — তাব প্রাণপুত্তলী গৌরীকে সে দিয়েছে নানাসাহেবকে। অচিরে নানা সাহেবের মোহ কাটে, সে গৌরীকে সরিয়ে দেয় পৃথিবী থেকে এবং কন্যাশোকে উন্মত্তপ্রায় ঘাসিরামকেও পদচ্যুত করে ও ক্রুদ্ধ জনতা তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। জনতার সামনে পাপীর পতনে নানা সাহেব আনন্দ প্রকাশ করে ও সারা দেশে নৃত্যগীত মহোৎসবের আয়োজন করে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও উঁচুতলার রাজনীতিবিদ্দের নাট্যকার প্রবল আক্রমণ করেছেন এখানে, এবং এক বিকৃত সমাজব্যবস্থার কদর্য রূপও উদ্ঘটিত হয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে রূপ

পেয়েছে সমসাময়িক মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবেশ। (মুখ্যমন্ত্রী বসন্তরাও নাইক হলেন নানা ফড়নবীস এবং ঘাসিরামের অন্তরালে আছেন বাল ঠাকরে যাকে বসন্তরাও অর্থ সামর্থ দিয়ে শিবসেনা গড়তে সাহায্য করেন যার দ্বারা রাজ্যের কলকারখানা থেকে ডাঙ্গের কমিউনিস্ট শ্রমিক সংগঠনদের উৎখাত করা হয়)। নাটকের আঙ্গিকও অসাধারণ — নৃত্যগীতের সঙ্গে তমাশা দশাবতারী প্রভৃতি আশ্চর্য প্রয়োগ দেখা যায়; গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতীর নাচ, লোক ও উচ্চাঙ্গ গীতের প্রয়োগ, সূত্রধার, ব্রেখটীয় পদ্ধতির রূপায়ণ, মানুষের সাহায্যে দেয়াল বা মঞ্চ বিন্যাস ও উপকরণ প্রভৃতি উন্নতমানের শিল্পবোধের পরিচায়ক। ডঃ জব্বর প্যাটেল এই নাটকের পরিচালনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মোহন আগাসের নানা ছিল অসাধারণ। প্রযোজনা আন্তর্জাতিক খ্যাতি পায়।

'কমলা' (১৯৮০) ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের এক নির্মম চিত্র যেখানে নারী কেনা বেচার মত কুৎসিত প্রথা আজও চালু আছে। সাংবাদিক জয় সিং যাদব আদিবাসী যুবতী কমলাকে কিনে আনে ও সাংবাদিক সম্মেলনে তাকে উপস্থিত করে মারাত্মক আলোড়ন ফেলে। আর এক নাটক ঘটে রাতের গভীরে যখন সংবাদিক-পত্নী নিদ্রাহীন সরিতাকে কমলা প্রশ্ন করে তাকে কত টাকায় মালিক কিনে এনেছে। সরিতার মনেও আলোড়ন তোলে — সেও এক প্রকার কেনা দাসী মাত্র। অন্যদিকে প্রবল আলোড়ন ফেলতে কায়েমী স্বার্থে ঘা দেবার জন্য জয় সিং-এর চাকরী যায়। তবে নাটকের মূল বক্তব্য জোরদার হয় নি, নারী ব্যবসায়ের কদর্য অধ্যায়কে লেখক আঘাত করতে পারেন নি, সাংবাদিক পত্নী সরিতার হঠাৎ দাসীত্বের চেতনাও আকস্মিক ও আরোপিত। সাংবাদিকের চাকরী যাবার প্রসঙ্গও যথাযথ — এ সমাজে সকলেই দাস। তবে অনেকগুলি বক্তব্য নাটকে আসাতে 'কমলা'র তীর একমুখীন হতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে।

'মিত্রাচী গোষ্ঠ' (এক বন্ধুতার গল্প) এক সমকামী নারী রোহিনীর কথা যাকে কলেজ জীবনের প্রেমিক পরিত্যাগ করে এই বিকৃত স্বভাবের জন্য। রোহিনী আর এক মেয়েকে প্রলুব্ধ করলে মেয়েটির প্রেমিক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় ও প্রতিবাদ করে। এই সব ব্যর্থ প্রেমের ঘটনার পরিণতিতে নিরাশ ও ক্ষুব্ধ রোহিনী শেষ পর্যন্ত পতিতা হয়ে যায়।

'কন্যাদান' (১৯৮৩) জাতপাতকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে লেখা। এক অন্ত্যজ বর্ণ ও জাতির যুবক অরুণ এক ব্রাহ্মণ কন্যা জ্যোতি-কে বিয়ে করে। যুবকটি লেখক ও প্রতিভাবান, কিন্তু সে পাশব প্রবৃত্তির। সে স্ত্রীর ওপর নিদারুণ অত্যাচার করে, এমন কি সন্তান-সম্ভাবিতা নারীর পেটে পদাঘাত করে। জ্যোতি বোঝে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের তফাত এবং এই দুই সমাজের ও বর্ণের পার্থক্য এত সহজে দূর করা যায় না। যদিও তার বাবা নীতিগত ভাবে তা গ্রহণ করেছিল কিন্তু জ্যোতি জীবন দিয়ে বুঝছে এর ব্যর্থতা। নাটকের কাহিনীতে সঙ্গতি নেই, বক্তব্যও প্রতিপাদিত হয় নি ঠিকমত। তবু জ্যোতির বেদনা মনকে ছুঁয়ে যায় গভীরভাবে, মার কষ্ট বারবার যন্ত্রণাও মনকে মথিত করে। আই এন টি-র প্রযোজনা এবং ডঃ শ্রীরাম লাগু (ছেলেটির উদার হৃদয় গান্ধীবাদী শ্বশুর), সদাশিব আম্রপুরকর (ছেলেটি), সুষমা তেন্ডুলকর (মেয়ে) প্রমুখের অভিনয় সত্ত্বেও নাটক তেমন খ্যাতি পায়নি। এটি অন্ত্যজ সম্প্রদায়কে ক্রুদ্ধ করেছে বিশেষভাবে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় তেণ্ডুলকর আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

বিদ্যাধর পুন্ডলীক মহাভারতের পটভূমিকায় দ্রৌপদীর তীব্র মানসিক অনুভব ও যন্ত্রণাকে অবলম্বন করে লিখেছেন 'মাতা দ্রৌপদী'। দীর্ঘদিন রাজ্যভোগ করে পাণ্ডবরা যাবে মহাপ্রস্থানের পথে — তা যেন পরমের সঙ্গে মহামিলনের জন্য মহাযাত্রা। কিন্তু

দ্রৌপদীর মনের ক্ষোভ বেদনা আজও কমেনি, বিশেষত পঞ্চ পুত্রের জন্য তার দুঃখ আজও বুকে আগুন জ্বালায় এবং পুত্রহত্যাকারী অশ্বত্থামার ওপর ক্রোধ আজও তীব্র ভয়ংকর। দ্রৌপদী একবার দেখতে চায় অশ্বত্থামাকে যাকে ভীম বন্দী করে আনে। উজ্জ্বল সুন্দর অশ্বত্থামা আজ ম্লান বিবর্ণ নিষ্প্রাণ, গতিবেগ শিথিল এলেমেলো, সে আজ উন্মাদ প্রায়, কপালে লাল ভয়াবহ ক্ষতচিহ্ন। দ্রৌপদীর মনের পরিবর্তন ঘটে; চরম প্রতিশোধ বাসনায় তার নির্দেশে অশ্বত্থামাকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে তার ললাটস্থিত ব্রহ্মদত্ত মণি ছিনিয়ে আনে ভীম যার অসহ্য বেদনা যন্ত্রণা চিরদিন বয়ে বেড়াচ্ছে অশ্বত্থামা। আর দ্রৌপদীও চিরকাল দুঃখই পেয়েছে, ধর্মরক্ষা কিংবা প্রতিহিংসা গ্রহণ সবই এনেছে দুঃখ। এই দুঃখই মানব জীবনের অনিবার্য কিংবা অপরিহার্য সত্য যার নিবারণ নেই, ঘূর্ণায়মান কালচক্র সেই নিষ্ঠুর ভয়ংকরতাই যেন আবর্তন।

গঙ্গাধর গাডগিল অর্থশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক। নবযুগের মরাঠী সাহিত্যে নতুন গল্পকথার সংস্থাপক। দুশোর বেশি গল্প লিখেছেন, উপন্যাসও আছে, নাট্য রচনায় সুদক্ষ। মধ্যবিত্ত জীবনের পটভূমিকায় রচনাগুলিতে বস্তু নিষ্ঠা আছে, গভীর কারুণ্যের সঙ্গে সহজ জীবনকে মিলিয়ে দেন। ফার্স রচনায় সুদক্ষ। তাঁর 'জ্যোৎস্না আনি জ্যোতি' কিছুটা তত্ত্বমূলক নাটক। প্রেম এর বিষয়, কিন্তু দেহ ও মনের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের কথাই বড় হয়েছে। জ্যোৎস্নার কাছে প্রেম হল স্বপ্নময়, তাতে কামগন্ধ নেই। কিন্তু জ্যোতি বিদ্রোহিনী, কেবল মন দিয়েই প্রেমের প্রকাশ হয়না তার বাস্তব মূর্ত প্রকাশ আছে। নাটকে মনস্তত্ত্ব ও প্রতীকময়তা প্রধান হয়েছে।

গাডগিলের বিখ্যাত চরিত্র বন্ডু যাকে নিয়ে অনেক কৌতুককর চিত্র তিনি অংকন করেছেন। 'বন্ডু নানু আনি গুলাবী হত্তী' একাংক সংকলনে এ নিয়ে কটি নাটক আছে যার অন্যতম 'স্নেহলচেতী শিলেদারী' সার্থক প্রহসন। বন্ডু তার ছেলের স্কুলের টাস্‌ক করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, অংক টংক একেবারেই মেলেনা — চৌবাচ্চার একটা নল দিয়ে জল বেরোলে আর একটা দিয়ে জল ঢুকলে কি ভাবে তা ভরবে কিছুতেই সে বুঝতে পারে না। তার ওপর 'ঘোড়ার পিঠে সওয়ার মরাঠী সিপাহী' আঁকতে দিয়েছে। বন্ডু উত্যক্ত। সে স্ত্রীকে বলে সিনেমা দেখার জন্য টাকা দিতে, কিন্তু পায় না। অফিস চাপরাশী নাগু আসে, বলে যে রোকড়ে সাহেব তাকে ডেকেছে। বন্ডু তাকে দশ আনা পয়সা দিয়ে সাহেবকে বলতে বলে যে সে বাড়ি নেই। নাগু অসন্তুষ্ট কারণ সবাই তাকে একটাকা দিয়েছে। সে চলে যায়। দরজায় শব্দ, রোকড়ে আসছে ভেবে বন্ডু খাটের নীচে ঢোকে। কিন্তু এসেছে তার বন্ধু নানু।

তারপর —

নানু — হ্যালো বৌদি, বন্ডু সাহেব কই?

বন্ডু (খাটের নীচ থেকে) — আরে নানু, তুমি?

নানু — হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কোথায়?

বন্ডু — এখানেই আছি বাবা, খাটের নীচে। দাঁড়াও, আসছি।

নানু — দাঁড়াও দাঁড়াও, কষ্ট করতে হবে না। আমিও খাটের নীচে যাচ্ছি।

বন্ডু — না না, আমি বাইরে আসছি।

নানু — আরে থাক না, আমিই খাটের নীচে যাচ্ছি।

স্নেহলতা — আপনারও কি মাথা খারাপ হল নানু বাবু। খাটের নীচে বসে গল্প মারবেন না কি?

নানু — তাতে কী হয়েছে? ছেলেবেলায় আমরা খাটের নীচে বসে কত —

স্নেহলতা — আপনাদের মাথায় কিছু নেই, এখন তো আপনারা বড হয়েছেন।

বন্ডু — সত্যি কথা নানু, খাটের নীচে বড় আনকমফর্টেবল লাগছে।

নানু — আরে থাক না বন্ধু। আপনিও ঠিক বলেছেন বৌদি, তবে বন্ডুব সঙ্গে আমার কিছু প্রাইভেট কথা আছে কিনা।

নানু পাঁচটা টাকা ধার করে এনেছে বন্ডুবই এক নিকট আত্মীয়ব কাছ থেকে বন্ডুরই নাম করে। স্নেহলতা অতি ক্রুদ্ধ হয়ে নানু ও বন্ডুকে কটু কথা বলে, ওরা ছেলেদের গান ধবে — মেড়া বলে ডরাও ডরাও, বাঘ বলে আও আও, কুত্তা বলে ভু ভু ভু, কোকিল বলে কুহু কুহু। ওরা তারস্বরে গান করছে এমন সময় প্রবেশ করে পত্নীসহ রোকড়ে সাহেব। রোকড়ে সাহেব বললেন স্কুলের মাস্টারদের অদ্ভুত আচরণের কথা — তার ছেলেকে ঘোড়ার ওপর সিপাই আঁকতে দিয়েছে, ছেলে তো দূরের কথা তিনিই পারছেন না। কিন্তু শ্রীমতী রোকড়ে ছাড়বেন না, তাই অফিসে সবাইকে ডাকছিলেন ঐ ছবি আঁকার জন্য। বন্ডুকেও তিনি বললেন কাল ছবিটা এঁকে অফিসে নিয়ে যেতে। আসলে স্নেহলতাই ভাল ছবি আঁকে। সে রোকড়েকে দিয়ে কটা শর্ত করায় নানু ও বন্ডুর নির্দেশে — রোকড়ে কখনো ঘরে ফাইল পাঠাবে না, বোকড়ে যেন মোচ না রাখে যা দেখলে বন্ডুর ইনফিরিওরিটি কমপ্লেকস আসে ইত্যাদি।

রত্নাকর মতকরী (১৯৩৮) আধুনিক সময়ের এক বিশিষ্ট নাট্যকার যিনি নাট্যচর্চাকেই জীবনের ব্রত বলে মনে করেছেন যার দ্বারা মরাঠী নাট্য সাহিত্য শিল্পময়তায় বিকশিত হচ্ছে এবং মানবজীবনের বৈচিত্র্য উদ্ভাসিত হচ্ছে ও সমাজের অন্যায় পাপ ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদূরিত হয়ে এক নতুন প্রত্যয় গড়ে উঠতে চাইছে। তাই তিনি লোভনীয় ব্যাঙ্ক চাকরি ছেড়ে দিয়ে কন্যা কলত্র সমেত নাট্য সাধনায় রত। অন্তত ৩৫টি পূর্ণাঙ্গ ও বেশ কিছু একাংক নাটক তিনি লিখেছেন, কিশোরদের জন্যও উঁচুমানের নাটক তিনি রচনা করেছেন। সব কিছুর মধ্যে এক সমাজ সচেতন জীবন সংবেদনশীল শিল্পীচিত্তের পরিচয় সমুদ্ভাসিত।

'ওয়ার্‍্যাওয়রচে মুসাফির' (ঘুরন্ত মুসাফির, ১৯৬৯) তাঁর প্রথম নাটক যা এক তরুণের মানসিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে বাড়ির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়। 'অস্টাই' সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের এক মেয়েকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। 'লোককথা ৭৮' (১৯৭৮) নাটকে মতকরীর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় যে নাটক সর্বভারতীয় স্তরে তাঁকে খ্যাতিমান করে। ভারতবর্ষের একটি গ্রামের চিত্র যেখানে অন্ত্যজ ও দরিদ্র মানুষের ওপর চলে প্রবল অত্যাচার — পীড়ন ধর্ষণ খুন অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি দ্বারা ভুস্বামী মহাজনরা কি ভয়ংকর হয় নাটকে তা বলা হয়েছে। গ্রামের জমিদার মোড়ল সরপঞ্চ ও পুলিশের জ্বালায় লোক দিশাহারা। এদের ছেলেরা এক গরীব চামারের মেয়েকে ধর্ষণ করে ও সে মারা যায়। কিন্তু কোন প্রতিকার হয় না। তীব্র প্রতিবাদ করে জগন্যা ও এই অন্যায়ের প্রতিবিধান চায়। তাকে রাতের অন্ধকারে খুন করা হয়। সবাই নিথর, জগন্যার বৌ সাবিত্রীর কান্না ভেসে বেড়ায়। শহর থেকে কাগজের লোকেরা আসে, তাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে গ্রামের প্রভুরা, কিন্তু গুন্ডারা সাবিত্রীর ঘরে আগুন দেয় তার মুখ বন্ধ করার জন্য। সমস্ত ঘটনা কাগজের বেরায়, সরকারের টনক নড়ে, হৈ হৈ পড়ে যায় চারদিকে। নাটকের মুখিয়া বা সূত্রধার এগিয়ে এসে বলে — সাবিত্রী সরকারের কাছে জমি আর নগদ টাকা পেতে পারে। কিন্তু ও কি ন্যায় পেয়েছে। যে গুন্ডারা

জগন্যাকে খুন করেছে তারা হয়ত পেয়েছে আরো বেশী টাকা আর জমি। আপনি কি করবেন? বাড়ি গিয়ে সব কিছু ভুলে যাবেন? না কি আমাদের মত হতভাগার জন্য কিছু করবেন? (সবাই চুপ। সেই মুখিয়া সঙ্গীদের বলে যারা গাঁ থেকে এসে যেন এতক্ষণ নিজেদের কথা নাটকে বলছিল, অভিনয় করে দেখাচ্ছিল) চল রে, এরা কিছুই বলছে না। আমাদের যা বলার ছিল বলেছি। এবার চল, চুপচাপ নিজের গ্রামে ফিরে চল। নাটকটি ভারতবর্ষের এক গ্রামের ওপর অত্যাচারের ভয়াল চিত্র আঁকে, আঙ্গিকের দিক থেকেও তাকে অভিনব রূপে প্রকাশ করে।

'মাঝ কায় চুকল' (আমি কি ভুল করেছি?) অনেকটাই পারিবারিক নাটক যাতে দেখানো হয়েছে এক তরুণ দম্পতির ট্র্যাজিক পরিণতি যা ঘটেছে ছেলের নিষ্ঠুর স্বভাব মায়ের জন্য। মধ্যবিত্ত দর্শককে এই নাটক নাড়া দিয়েছে। 'স্পর্শ অমৃতাচা' (১৯৮৩) কুষ্ঠ রোগ ও রোগীদের নিয়ে লেখা। চুরাশিতে লেখা 'অগ্নিদিব্য' সাম্প্রতিক বধূদহনের পটভূমিকায় লেখা — পণপ্রথা, সমাজে নারীদের স্থান ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। গোপালরাও ও জনকীবাঈয়ের চার মেয়ে। মৃদুলা সবচেয়ে বড়। তার বিয়ের ব্যাপারে সবাই চিন্তিত। বানুতাই এই বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী যদিও সে খুব সুবিধার মেয়ে নয়। দোজবরে মহেশের সঙ্গে মৃদুলার বিয়ের ঠিক হয়, মেয়েদের পক্ষে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও ছেলে পক্ষের আগ্রহে দ্রুত বিয়ে হয়। বিয়ের পর মৃদুলার ওপর অমানুষিক পীড়ন চলে, সে চলে আসে বাপের বাড়ি। নাট্যকার এখানে আরেকটি প্রশ্ন তুলেছেন — অসহায় অত্যাচারিত একটা মেয়ে তার জন্মস্থান পরিবারে এলে সবাই তাকে ফেরৎ পাঠাতে ব্যস্ত কেন? তথাকথিত সমাজবোধের মূল্য কি একটা মেয়ের প্রাণের থেকেও বেশী? উচ্চশিক্ষিত যুবকদের পণের লোভের কদর্যতাও দেখানো হয়েছে। নাটকে বধূদহনের দৃশ্য রক্ত জমাট দেয় — মৃত্যুপথযাত্রিণীর মরণ আর্তনাদ সওয়া যায় না, তার সঙ্গে উৎপীড়কের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

পু. ল. দেশপান্ডের নাটক 'অসা মী অসা মী' কে তিনি নতুন করে লিখেছেন যেটিও জনপ্রিয় হয়েছে। 'ঘর তিঘঞ্চ হব' গান্ধীজীর সমসাময়িক ও নিকটজন প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী তারাবাঈ মোদক-এর ব্যক্তিজীবনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। পদ্মভূষণ তারাবাই ব্যক্তিজীবনে সুখী ছিলেন না। মদ্যপ স্বামীর সঙ্গে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তার একমাত্র কন্যাও আত্মহত্যা করেন। এই উজ্জ্বল আদর্শনিষ্ঠ নারীর জীবন ও মন মতকরীর নাটকে সুন্দর ফুটেছে। 'তুমচে আমুচে গান' (তোমার আমার গান, ১৯৮৯ এক মধ্যবিত্ত ক্লার্ক মাধবকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সংকট, পারিবারিক জটিলতা, প্রত্যাশা ও মোহভঙ্গ ইত্যাদি নিয়েই নাটক। তাঁর অন্যান্য নাটক হল 'বিঠো রখুমায়' (১৯৮৭), 'বে এক বডরুম' (১৯৯১), 'বকাসুর' (১৯৯৪), 'চার দিবস প্রেমাচে' (১৯৯৫), 'একদা পাহাব করুণ' (১৯৯৮) ইত্যাদি। রত্নাকর মতকরীর নাটকগুলি বিজয় কেঁকরে, দামু কেঁকরে, বামন কেন্দ্রে এবং অরবিন্দ দেশপান্ডের মত বিশিষ্ট মানুষজন পরিচালনা করেছেন। শ্রীমতকরী আধুনিক মরাঠী তথা ভারতীয় নাটকের এক অসামান্য উজ্জ্বল পুরুষ রূপে বিবেচিত হবেন।

জয়বন্ত দলভী (১৯২৫-১৯৯৪) আধুনিক সময়ের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। তিনি মরাঠী লেখক কিন্তু সারা ভারতবর্ষে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন। গল্প উপন্যাস লিখলেও নাট্যকাররূপেই তিনি অধিকতর সম্মানিত। প্রায় পঁচিশটি নাটক তিনি লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে নাট্যরূপও তিনি দিয়েছেন। মোটামুটি ক্রমানুসারে

তাঁর নাটকের নাম দেওয়া হল — সভ্য গৃহস্থ হো! (১৯৭৩, তাঁর প্রথম নাটক), সন্ধ্যাছায়া, ব্যারিস্টার, সূর্যাস্ত, মহাসাগর, দুর্গী, সাবিত্রী, পুরুষ, মালবনী সৌভদ্র, মুক্তা, পর্যায়, হারি অপ হারী! স্পর্শ, কালচক্র, অপূর্ণাঙ্ক, নাতীগোতী (রূণানুবন্ধ উপন্যাসের নাট্যরূপ), সংসারগাথা, মী রাষ্ট্রপতি। একাংক সংকলন গ্রন্থও তাঁর আছে — কাবলে আনি ইতর একাঙ্কিকা। দলভীর বিস্ময়কর নাট্যসৃজন ক্ষমতা নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রকাশিত। দলভীর নাটকের বিষয়বস্তু হল — প্রাচীন ও নবীন মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক, প্রখর রাজনীতি সচেতনতা, মধ্যবিত্তের সমস্যা সংকটের উপস্থাপনা, সমাজবোধ, নারীদের প্রতি সহানুভূতি, মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। প্রাচীন নবীনের দ্বন্দ্বে নতুনের জয় অনিবার্য জেনেও তিনি সমর্থন করেছেন প্রাচীনকে। তিনি বলেছেন — Basically, I belong to the old Gandhian generation. I worked for the Rashtriya Seva Dal which was the youth wing of the Socialist Party. That's why I belive in the values of Lohia, J. P and S. M. Joshi. তাঁর 'সূর্যাস্ত' নাটকের প্রধান চরিত্রে এই তিন আদর্শের মিলিত প্রকাশ দেখা যায়। 'পুরুষ' নাটকে নায়িকার বাবাও একই ধরনের যদিও নাটকের বিষয় নারীদের ওপর অত্যাচার। 'কালচক্র' এবং 'সন্ধ্যাছায়া' সন্তানদের কাছে অবাঞ্ছিত বৃদ্ধ পিতামাতার সংকটের কথা বলা হয়েছে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা ধরা পড়েছে তাঁর বিভিন্ন নাটকে। এই জটিলতার মূলে আছে সামজিকতা, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-জটিলতাও এর জন্য দায়ী। 'মহাসাগর' 'অপূর্ণাঙ্ক' প্রভৃতি নাটক এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

দলভী রাজনীতি সচেতন, পূর্বকথিত তার বক্তব্যেই তা প্রমাণিত। 'সূর্যাস্ত' নাটকের মধ্যে তার প্রকাশ আছে। 'মী রাষ্ট্রপতি' ও রাজনৈতিক নাটক। ভারতবর্ষের সমসাময়িক রাজনীতির এক ঘটনাই তাঁকে এই নাটক লিখতে প্ররোচিত করে। রাজীব সরকারকে পদচ্যুত করার জন্য জৈল সিংকে চল্লিশ কোটি টাকা দেওয়া হবে — এই সংবাদ পড়েই তিনি এই নাটক রচনা করেন। মধ্যবিত্তের দুর্ভার সমস্যা-সংকট তাঁর নাটকে এসেছে বারবার। এর কারণ কি? দলভী জানিয়েছেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই একদিন দেশকে শাসন করবে — That is the class that will rule ultimately. Otherwise, what is socialism? Elevate the down-trodden to the middle class and pull down the capitalists also to the middle class. So that's the only class we will finally have. সমাজ দলভীর উপন্যাসের প্রেক্ষাপট তাই সামাজিক সমস্যা তাঁর প্রায় সব নাটকেই ঘুরে ফিরে আসে। তাঁর 'পর্যায়' পণ-লোভীদের সামাজিক বয়কটের ডাক দেয়। 'হারি আপ হারি' দুর্নীতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক। একটি সৎ ছেলে মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করে। সে যেন হঠাৎ কোন অলৌকিক ক্ষমতা পায় যা দিয়ে সব ঠিক করতে চায়। কিন্তু সমাজপ্রভুরা যে তার থেকেও অনেক শক্তিশালী। 'মুক্তা' নাটকে এক অসহায় মেয়ে সন্তান সম্ভাবিতা হয়ে অপমানের মুখোমুখী হলে এক শিক্ষকদম্পতি তার সন্তানের ভার নিতে চায়, তারা এটাও জানতে চায় না বাচ্চাটি হিন্দু না মুসলমান। জয়বন্ত দলভী নারীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তরুণী নারীর অপমান, বয়স্ক নারীদের লাঞ্ছনা তাকে প্রবল পীড়া দেয় তাঁর বুকের মধ্যে অবিরল রক্তক্ষরণ হয়। তিনি বলেছেন — The undercurrent is there in all my writings — how women are tortured. তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই লেখক নারীদের এই অত্যাচার ও অপমান দেখেছেন যে চিত্র তাঁর নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। লেখক মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেন। সামাজিক ভ্রষ্টাচার

রাজনৈতিক দুর্নীতি মূল্যবোধেব সংকট সবকিছুকে অতিক্রম করে জীবনকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চান তিনি, তিনি চান মানবতার জয়।

'সন্ধ্যাছায়া' (১৯৭৪) নির্জন নিঃসঙ্গ মানুষের যন্ত্রণাকাতর সত্তার সহজ বেদনানিবিড় কাহিনী। বৃদ্ধ দম্পতি নানা ও নানী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। বড় ছেলে দীনু আছে আমেরিকায় — সেখানকাব আড়ম্বরময় ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনই তার কাম্য ও স্বদেশের প্রতি তার বিবাগ; সে সেখানেই থাকবে। ছোট ছেলে নন্দু আর্মিতে বিমান বাহিনীর পাইলট। নানা-নানীর জীবন কাটে গভীর বেদনায় — কখনো অতীতের স্মতিচারণ, কখনো ফোনেব বন্ধু অপরিচিত ছোট মেয়ে শর্মিলার সঙ্গে কথা, কখনো ঠিকানা খুঁজতে আসা আগন্তুকের সঙ্গ। বড় ছেলে বিয়ে করেছে মার্কিনী মেয়েকে; ছোট ছেলের জীবন নিয়ে এরা সুখী পরিবারের স্ব প্ন দেখে। কিন্তু ছায়া প্রসারিত হয় তীব্র ভাবে, ঘন কালো অন্ধকারে ডুবে যায় সব কিছু, এক অসহ্য অতল যন্ত্রণায় নিঃশেষিত হয় এদের সত্তা : সংবাদ আসে ছোট ছেলে যুদ্ধে মারা গেছে। আর দীনু বাবা-মাকে ছেড়ে থাকবে আমেরিকায়। এদেব অনন্ত সীমাহীন শূন্যতা ও বেদনাকে মুক্তি দেয় অনিবার্য পরিণতি। জীবনের এই গভীর অনুভব দর্শক মনকে ছুঁয়ে যায় একান্ত ভাবে।

'ব্যারিস্টার' উনিশ শতকের মহারাষ্ট্রের জীবন নিয়ে লেখা যেখানে সামাজিক মানবিক দায়িত্ব পালনে বুদ্ধিজীবীদের ব্যর্থতার কথা তুলে ধবা হয়েছে। মূলত দুই পবিবারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটক — পারিবারিক সামাজিক সংকট ও অভিশাপ যেখান নিহিত। এক দিকে এক পরিবারের প্রধান ব্যারিস্টার যে উন্মাদ হয়ে যাওযা আইনবিদের পুত্র ও অন্যদিকে নিম্মমধ্যবিত্ত শহুরে যদিও রক্ষণশীল ব্রাম্মণ দম্পতি। ব্যারিস্টারের সংকীর্ণতা সামাজিক নির্মমতাকে প্রতিরোধের অক্ষমতা, নৈতিক দায়িত্ব পালনকে অস্বীকার প্রকট হয় যখন তার মামী অত্যাচারিত হয় এবং মাবা যাওয়া প্রতিবেশীর স্ত্রীকে — যার প্রতি তার প্রেম ছিল —মূল্য দিতে সে ব্যর্থ হয়।

'সূর্যাস্ত' (১৯৭৮) ভারতবর্ষের সুবিধাবাদী মানবতাবিরোধী ভয়ংকর রাজনীতির নিষ্ঠুর নির্মম চিত্র। প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীজীর আদর্শ দীক্ষিত নেহরুর সহকর্মী আপ্পাজীর ছেলে বালাসাহেব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আদর্শবাদী ন্যায়নিষ্ঠ আপ্পাজী বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত; অন্যদিকে বালাসাহেবের শ্যালক সন্তরাম এক পাপ দুর্নীতির চক্র গড়ে তুলেছে যারা সর্ববিধ অন্যায় করে যায় মুখ্যমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায়। আপ্পাজী প্রতিবাদ করে, ফলে সবাই ক্রুদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে বাবুরাও তাকে শাসায় ও তার টেলিফোন কেটে দেওয়া হয়। ফ্ল্যাটের সামনে পুলিশ থাকে। রাজ্যের হালচাল দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী পাঠিয়েছে গেন্ডা সিংকে যে বর্বর লোকটিকে খুশী রাখতে সন্তরাম তার অপদার্থ পুত্র লাল্যার স্ত্রী শালনকে ভেট দেয়। নাটক তীব্র হয় যখন খবর আসে সরকার গমচাষের জন্য অন্য রাজ্য থেকে যে বীজ আনিয়েছে তাতে কোন ফসল হবে না বরং হবে চাষীর সর্বনাশ এবং সন্তরামরা লাভ করবে লক্ষ লক্ষ টাকা। অস্থির ক্রুদ্ধ আপ্পাজী লাল্যাকে দিয়ে গোপনে সরকারের কার্যকলাপ ফাঁস করে দেওয়া প্রচারপত্র ছাপিয়ে আনে। সেদিন রাত্রে গেন্ডা সিং-এর নেতৃত্বে মহাসমারোহে গরিবদের বস্তি বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, চারপাশে আগুন মানুষের কান্না বুলডোজারের শব্দ; ওপর থেকে আপ্পাজী নীচে ছুড়ে ফেলছে সব প্রচারপত্র, ছুটে আসে সন্তরাম, চলছে তীব্র তর্ক-বিতর্ক বাদানুবাদ — শেষ পর্যন্ত সন্তরাম আপ্পাজীকে ধরে ২৮ তলা বাড়ি থেকে নীচে ফলে দেয়। বেতারে মহানপুরুষ আপ্পাজীর মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর শোক ঝরে পড়ে, বলা হয় তাঁরই আদর্শে সবাইকে এগোতে হবে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভয়ংকরতা, আদর্শহীনতা, মূল্যবোধের বিনাশ নাটকে চমৎকার ফুটেছে। কমলাকর সারংগ পরিচালিত 'অভিষেক' প্রযোজিত নীলু ফুলে প্রমুখ অভিনীত এই নাটক নিঃসন্দেহে হয়ে উঠেছে সময়ের এক নির্মম দলিল চিত্র।

'পুরুষ' (১৯৮৩) নাটকেও সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি প্রসঙ্গ আছে এবং এক ভয়ংকর রসের অবতারণা করা হয়েছে। অম্বিকা এক শিক্ষিতা আদর্শবাদী মেয়ে যে স্যোসাল ওয়ার্ক করে, মেয়েদের অধিকারের কথা বলে, বস্তিতে স্কুল চালায় গরিবদের শিক্ষার জন্য। শাসকদলের এক লোক গোলাপ রাও দুর্নীতিপরায়ণ ও বদমায়েশ, সে অম্বিকাকে সাহায্য করবে বলে ডাকে ও তাকে ধর্ষণ করে। অম্বিকার বাবা সৎ আদর্শবাদী শিক্ষক, গোলাপ রাও তাকে মানে কিন্তু তার মেয়ের ওপরেই অত্যাচার করে। অম্বিকা প্রতিশোধ নেবে। সে অন্ত্যজ যুবক বান্ডা-র সাহায্য চায়। অম্বিকা গোলাপ রাওকে ডাকে স্কুলের ব্যাপারে কথা বলতে। গোলাপ রাও আসে সে আবার অম্বিকার ওপর অত্যাচার করতে যায়, হঠাৎ লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে বান্ডা, গোলাপকে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে ও তাকে বীভৎসভাবে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। নাটকটি আতিশয্যময়, অতিনাটকীয় এবং কিছুটা মনে বিরূপতাও হয়ত জাগায়।

'মহাসাগর' মানবমনের অতলান্ত রহস্য বিস্ময় গভীরতার কথা। নাটকের নায়িকা সুমী উচ্ছলা যৌবনবতী — সে সবসময় উত্তেজনা চায়, যদিও সে ভালবাসে স্বামী ঘনশ্যামকে। সে রহমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। রহমান বিচিত্র মানুষ, তার স্বাস্থ্য সম্পদ সবই আছে, সে নারীদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু সে বিয়ে করবে না কারণ কোন বাঁধনে সে ধরা পড়বে না যদিও সুমীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিকট ও গভীর হয়। অন্যদিকে সুমী ও ঘনশ্যামের বন্ধু দিগম্বর, দিগাম্বরের স্ত্রী চম্পু মা কাকী ও ভাই পারিবারিক সংঘাত সংকটের মধ্যে আদর্শ বজায় রাখার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত রহমান আত্মহত্যা করে; সুমীও জীবনকে ভালবেসে স্বামীপুত্রকে ভালবেসেই মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। কুষ্ঠরোগের ভয় আতঙ্ক কীভাবে মানুষকে ভয়াবহতার দিকে ঠেলে দেয় 'স্পর্শ' নাটকে দেখানো হয়েছে। নাটকে আছে বয়স্ক পিতামাতা আন্না ও সীতা তাদের পুত্র পুত্রবধূ পৌত্রী ও অবিবাহিত মেয়ে। সীতাবাইয়ের কুষ্ঠ হয়েছে শুনে সবাই বিমূঢ়। ভাবী জামাতা ডাক্তার হয়েও ভয় পায়। সত্যি তাকে ভালবাসে মেয়ে বীণা, কাজের লোক নাটেকর। পুত্র-পুত্রবধূ তাকে কুষ্ঠাশ্রমে পাঠায়। সীতা সুস্থ হয়ে ফিরলেও কেউ তাকে মানবে না। সে চলে যাবে, তার মেয়েও সঙ্গে যাবে; এতদিনে ভুল বোঝা বৃদ্ধ স্বামীও তাদের সঙ্গী হয় — তারা থাকবে নিজেদেরই মত। নাটকের বক্তব্য মনকে স্পর্শ করে গভীরভাবে।

বার্ধক্যের একাকী ও নিঃসঙ্গতা ফিরে এসেছে 'কালচক্র' নাটকে। বৃদ্ধ ইনামদার ও তার স্ত্রী রুক্মিনী থাকে পুত্র বিশার কাছে। পুত্রবধূ তাদের নিত্য অপমান করে। ছোট ছেলে শরদও বাবার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন। বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে মুক্তি চাইছে ছেলেরা। একাকীত্বের নিঃসঙ্গতায় বাবা-মা বিজ্ঞাপন দেয় যদি কেউ তাদের রাখে। যুবক রাঘব এগিয়ে আসে, তাদের বাড়ি নিয়ে যায় যেখানে সে ও তার স্ত্রী তাদের যত্ন করে রাখে। ইনামদার ও তার স্ত্রীর জীবনে সুখ ফিরে আসে। আবেগময় এই নাটকটি রূপায়িত করেছে শ্রীসতেরী প্রোডাকশন, পরিচালক ডি কেকরে। শিল্পীরা হলেন — যশবন্ত দত্ত (ইনামদার) , সুধা করমরকর (স্ত্রী), শ্যাম পোঙ্খে (বিশা), উপেন্দ্র দাতে (রাঘব), কীর্তি শারদ (লীলা-পুত্রবধূ), রাধিকা রাও, নিরঞ্জন পরলকর।

মানুষের অপূর্ণতার কথা আছে 'অপূর্ণাঙ্ক' নাটকে। একদা সুন্দরী দুর্ধর্ষ অভিনেত্রী কাঞ্চনমালা চল্লিশ ছাড়িয়েছে — লাবণ্য থাকলেও সে এখন একক বিষণ্ন। তার কাছে

আসে ব্রমেহ—এক অপরিচ্ছন্ন বিষণ্ণ এক সংবাদপত্রের প্রুফরিডার; এবং অথ্‌লে— এক ভদ্র নিষ্ঠাবান উকিল যে যৌবনকাল থেকেই কাঞ্চনমালার অনুরাগী। ব্রমেহ স্ত্রী কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। অথ্‌লে বিবাহিত, স্ত্রী বাণীকে সে ভালবাসে। কিন্তু কি যেন হারিয়ে গেছে ও সে নারীর বন্ধুত্বপূর্ণ সান্নিধ্য চায়। বাণীও একাকী নিঃসঙ্গ। এটাই যেন কাহিনীর মূল বিষয়। পুরুষ বা নারী কেউই সম্পূর্ণতা পায় না, সবাই যেন অপূর্ণ ও কিছু হারায় ও কেউ না কেউ এর জন্য দায়ী। নাটকে প্লেটোনিক প্রেমের কথাও বলা হয়েছে। নাটকটির প্রযোজনা সুন্দর। পরিচালক — রাজীব শিন্দে। অভিনয় শিল্পীরা হলেন — স্মিতা তলওয়ালকর (কাঞ্চনমালা)। জয়ন্ত সবরকর (ব্রমহে), সঞ্জয় সোনে (অথ্‌লে), স্বাতী (বীণা)।

'মী রাষ্ট্রপতি' তীব্র রাজনৈতিক নাটক, সমসাময়িক জীবনের প্রবল ছাপ আছে। একজন অত্যন্ত ধনবান ও ক্ষমতানিপুণ লোক পাপাজী দেশের প্রধান হতে চায়; গুণ্ডামি হত্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে সে নাম করেছে, অমিত ধন সঞ্চয় করেছে। অত্যাচারী নারীলোভী এই লোকটি তার লালসা থেকে পুত্রবধূকেও রেহাই দেবেনা। তার অবহেলিত স্ত্রী আম্মাজী স্বামীকে রক্ষা করতে পারে না। সে মাদকাসক্ত হয়। পাপাজীর দূর সম্পর্কের ভাই একজন ব্যর্থ কমিউনিস্ট, বর্তমান পরিস্থিতিতে সে গৌণ। তাকে পাপাজী ও তার লোকেরা পাগল মনে করে কারণ সে নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখে। পাপাজীর প্রধান ইচ্ছা সে রাষ্ট্রপতি হবে, পার্লামেন্ট সদস্যদের কোটি কোটি টাকা সে ঘুষ দেবে এ জন্য। সে পরিকল্পনা মত কাজ করতে চায়। পাপাজীর দুই ছেলে রাজগুরু ও মুল্‌করাজ : রাজগুরু তার বাবারই ছায়া কিন্তু বাবার কাছে সে ভীতু অসহায়। পাপাজীর লালসার শিকার হয় তার স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর অপমানে সে জেগে ওঠে। মুল্‌করাজ এক উপজাতি মায়ের ছেলে, তার রক্তে উদ্দামতা। সে বিদ্রোহী হয় ও অবহেলিত উপজাতিদের নিয়ে সংগঠন করে। পাপাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় তার ছেলেরা পরিণামে পাপাজীর নিদারুণ পরিণাম ঘটে। তীব্র প্রখর রাজনৈতিক নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। পরিচালক বামন কেন্দ্রে; অভিনয়ে — মোহন যোশী (আপ্পাজী), গৌরী কেন্দ্রে (আম্মাজী, সয়াজি জিন্দে (বলবন্তরাও), গণেশ যাদব (মুল্‌করাজ) প্রমুখ।

এভাবেই তীব্র সমাজ সচেতনতায়, প্রখর রাজনৈতিক ভাবনায়, গভীর জীবন সংবেদনায় ও আন্তরিক মানবিক প্রত্যয়ে এবং ভাবনার শিল্পিত প্রকাশে জয়বন্ত দলভীর নাটক অনন্য হয়ে উঠেছে।

৪. সাম্প্রতিক পর্ব

স্বাধীনতার পর কেটে গেল দু-দশক। শুরু হল মরাঠী নাটকের নতুন পর্ব। নতুন ভাবনায় দ্যোতিত হল মরাঠী নাটক, আঙ্গিকে এল বিস্ময় ও বৈচিত্র্য।

সাম্প্রতিক নাটকের বৈশিষ্ট্য গভীরতম অনুভব — মানবজীবনের অতল গভীরতা আদিগন্ত বিস্ময়কে তুলে ধরা।

অ্যাবসার্ড বা অধিবাস্তব দর্শনের প্রকাশ সাম্প্রতিক মরাঠী নাটকে বিশেষভাবে দেখা দিল যা দিয়ে জীবনের অসংগতি বৈষম্য উদ্ভটত্বকে নাট্যকার তুলে ধরলেন। আয়োনেস্কো, বেকেট প্রমুখের প্রেরণায় এই নব্যদর্শন মরাঠী নাটকে এল তবে তা পাশ্চাত্য নাটকের মত এক সর্বগ্রাসী শূন্যতা এক অসহ্য নির্জনতা এক ভয়াল বিচ্ছিন্নতার পরিমণ্ডল রচনা করে না। কিন্তু সমাজ ও পরিবেশের চাপে পিষ্ট মানবতার যন্ত্রণা দাহ আর্তনাদ তাতে প্রকাশিত হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রতীক বা সংকেতের মধ্যে তা দ্যোতিত হয়।

যৌনচেতনার প্রবল প্রকাশ সাম্প্রতিক মরাঠী নাটকে দেখা গেল। নীতিনিয়ম সম্ভ্রমতা বর্জিত ভারতবর্ষের এক সমাজেরই তা কেবল বিকারগ্রস্ত প্রকাশ নয়, প্রেমপ্রবৃত্তি ও যৌনবোধ সর্বনিয়ামক প্রবল শক্তি যার দ্বারা মানুষের আবেগ অনুভূতি এবং কার্যবিধিও প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কখনো তা হয়ে ওঠে তীব্র ভয়ংকর সর্ববিধ্বংসী।

সাম্প্রতিক মরাঠী নাটকে মার্কসীয় চিন্তাধারার দুর্বার প্রকাশ দেখা দিল যা দিয়ে সমাজ জীবনের সমস্যাসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা যায়। এর ফলে এল প্রখর রাজনৈতিক চেতনা যা চূড়ান্ত রূপ পেল নকশালবাড়ি চিন্তাধারার মধ্যে।

মরাঠী নাটকের আঙ্গিকেও এল নতুনত্ব। অধিকাংশ নবীন নাট্যকার প্রচলিত নাট্যরীতিকে ভাঙতে চাইলেন, পরিহার করলেন কমার্শিয়াল থিয়েটারের রূপরীতিকে। সাম্প্রতিক নাটক ও মঞ্চ যথার্থই পরীক্ষামূলক বা এক্সপেরিমেন্টাল। শিথিল নাটকীয় বিন্যাস, সংগতি ও পারম্পর্যবিহীন ভাবনার আপাত সমাবেশ, উদ্ভট প্রয়োগ, লোকশিল্পরীতি সংগীত নৃত্য প্রভৃতির ব্যবহার, রূপক প্রতীকের দ্যুতি মরাঠী নাটককে বিস্ময়কর ও অভিনব শিল্প রূপ দান করেছে।

সি টি খানোলকরকেই নব্যরীতির প্রথম নাট্যকার বলে উল্লেখ কবা যায়। "মরাঠী ভাষায় সর্বপ্রথম নবনাট্যের সূচনা তিনিই করেছেন তাঁর 'এক শূন্য বাজীরাও' নাটকে"।[১৩] বিজয় তেন্ডুলকরের প্রতিভার বিরাটত্ব আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু "যখন আমরা এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের কথা বলি তখন বিজয় তেন্ডুলকরের থেকে সি. টি. খানোলকরের প্রতিভা আমাদের মনোযোগ অনেক বেশী কেড়ে নেয়। তাঁর প্রথম নাটক এক শূন্য বাজীরাও, যা বিষয় ও আঙ্গিক দুদিক থেকেই পরীক্ষা মূলক, তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিহিত হতে পারে। এক বিদূষকের ট্র্যাজেডির চিত্রণ, নাটকের মধ্যে নাটকের উপস্থাপনা, এবং এর অন্তর্নিহিত দার্শনিকতা যে সমস্ত এক অপরূপ কবিত্বে মন্ডিত হয় এর আগে মরাঠী স্টেজে কোনদিন দেখা যায়নি।... কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও তিনি মরাঠী নাট্যকারদের মধ্যে অদ্বিতীয়।"[১৪]

পরীক্ষামূলক থিয়েটারের তিন বিশিষ্ট স্রষ্টা হলেন মহেশ এলকুঞ্চওয়ার, সতীশ আলেকর ও অচ্যুত ওয়াজে যাদের মধ্যে অ্যাবসার্ড দর্শনের বিশেষ প্রকাশ পাওয়া যায়; যৌন-মনস্তত্ত্বেরও তাঁরা নিপুণ স্রষ্টা, এবং অভিনব আঙ্গিকেও তাদের নাটক সমৃদ্ধ।

রাজনৈতিক ভাবনার দুর্বার প্রকাশ দেখে গেছে জি. পি. দেশপান্ডে, অনিল বর্বে প্রমুখের মধ্যে যাদের হাতে পলিটিক্যাল থিয়েটার পেয়েছে নতুন তাৎপর্য।

চিন্তামণি ত্র্যম্বক খানোলকর (১৯৩০-১৯৭৬) এক বিশেষ সম্ভাবনা নিয়ে মরাঠী মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন — প্রকৃতপক্ষে অতি আধুনিক নাট্য আন্দোলন তার নাটক দিয়ে সুরু হয়েছে একথা অনেক সমালোচক বলে থাকেন। "মরাঠী ভাষায় সর্বপ্রথম নবনাট্যের সূচনা তিনিই করেছেন তাঁর 'এক শূন্য বাজীরাও' নাটকে" এ কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রচলিত রীতির অনুবর্তন না করে তিনি ভাব ও রূপের এক অভিনব প্রত্যয় সঞ্চার করতে চান —.বিভিন্ন প্রবৃত্তির লীলায় সমাকীর্ণ জীবন তার বিপুল বৈচিত্র্য নিয়ে খানোলকরের রচনায় প্রতিভাত। প্রকৃতপক্ষে এক অ্যাবসার্ড দর্শন এক অধিবাস্তব চেতনা তাঁর নাটককে যেন সমাচ্ছন্ন করে আছে, যদিও নিছক শূণ্যতার দর্শন অবক্ষয়ের তত্ত্বকে তিনি গ্রহণ করতে চান না : ভারতীয় দর্শনের এই শিক্ষা। খানোলকরের নাটকসমূহে লোকনাট্যের ঐতিহ্য ও স্মৃতি আশ্চর্য সুন্দর যুক্ত হয়েছে।

'এক শূন্য বাজীরাও' (১৯৬৬) তাঁর প্রথম নাটক যাতে আপ্পাবাও গৌরী ও বাজীবাও চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক জীবনেব সীমাহীন গভীরতা ও নিঃসীম ব্যাপ্তির চিত্র অংকন করেছেন। তাদের কামনা বাসনাব দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিচিত্রলীলা, প্রেমপ্রীতি বিদ্বেষ ঘৃণা এক বিস্ময় জগৎ নির্মাণ করে। বিচিত্র চরিত্র বাজীবাও : নির্জন নিঃসঙ্গ বিদূষক চরিত্রটি শূন্যতার মধ্যে পেযেছে পূর্ণতাকে, ব্যর্থতায় অন্বেষণ করেছে সার্থকতাকে আর হাসির মধ্যে বৃত হযেছে গভীবতম কান্না। 'অবধ্য' (১৯৭১) মানুষের দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব অথবা জীবনের দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব যে অগ্নিদহনে জীবন জ্বলে-পুড়ে খাক হযে যায আবাব অন্য দিকে তা শুদ্ধ পূর্ণ হেমপ্রদীপ্ত হয় ওঠে। ঔপন্যাসিক গঙ্গাধরকে তাব দুই সত্তাব দ্বন্দ্ব রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করছে। এক সত্তা জীবনের শক্তি আশাবাদ ও মানবতাকে প্রকাশ কবে, অন্য সত্তা মৃত্যু দুঃখ সিনিসিজম্‌কে প্রকট করে তোলে। একদিকে সে প্রেমিক নারীকে পবিত্রতায় গ্রহণ করতে চায়, অন্যদিকে কলঙ্ক ঘৃণায় তাকে পরিত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাধর আত্মহত্যা করে, যদিও তার অন্যায় প্রবৃত্তি কয়েকজনের মধ্যে বেঁচে থাকে। কিন্তু তার শুভচেতনা প্রভাবিত করে হোটেল ভৃত্য পান্ধারিকে যে ঋজু দেহ সরল মন আর সৎ বিবেক নিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়।

'আজব ন্যায় বর্তুলচা' ব্রেখটের 'ককেশিয়ান চক সার্কল'-এর মরাঠী রূপান্তর। দেশজ লোকনাট্যশৈলীর অসামান্য প্রয়োগ এতে পাওয়া যায়। ১৯৭৪ সালে মুম্বাই মরাঠী সাহিত্য সংঘ এই নাটকের মঞ্চায়ন ঘটায়, পরিচালক ছিলেন ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ ও বিজয়া মেহতা। এই নাটক পূর্ব জার্মানীতে সাফল্যের সঙ্গে সঞ্চস্থ হয়।

'সগে সোযারে', 'শ্রীমন্ত পতিচি রাণী', 'প্রতিমা' প্রভৃতি বিভিন্ন নাটক লিখেছেন খানোলকর। 'কালায় তস্মৈ নমঃ (১৯৭২) এক জ্যোতিষীর ভুল ভবিষ্যৎ বাণীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক ভয়ানক ট্র্যাজেডি। জ্যোতিষাচার্য বিনায়করাও তার পুত্র মধুর জন্ম পত্রিকা বিচার করে দেখেছে যে মধুর প্রথম স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় মারা যাবে ও তাব দ্বিতীয় বিবাহ হবে। মধু স্তম্ভিত। সে সুষমাকে ভালবাসে ও দুজনে স্থির করেছে তারা অবশ্যই বিয়ে করবে এবং অচিরে। মধু সুষমা দুজনেই বিমূঢ় হয়। মধু এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মানেনা কিন্তু তার বাবা যে ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। এমন সময় বিনায়ক রাও -এর বন্ধু গ্রামের মানুষ বন্যাবাপু এদের কাছে আসে সঙ্গে মাতৃহীনা যুবতী মেয়ে শকু। শকু মানসিক রোগগ্রস্ত — ছেলেবেলা থেকে একক বিচ্ছিন্ন জীবন; মাযের, মৃত্যু, বাবার প্রবল শাসন তাকে উদভ্রান্ত করে তুলেছে। মধুর মা আনন্দী সহজ সরল শিশুপ্রায় শকুকে কাছে টেনে নেয়। মধু এক নিষ্ঠুর কাজ করে। শকুকে সে বিয়ে করে যদিও তার বিন্দুমাত্রও ভালবাসা নেই এবং সে শকুকে মদ্যপ অবস্থায় ধর্ষণ করবে যাব ফলে শকু সন্তান প্রসবের সময় মারা যাবে ও মধু সুষমাকে বিয়ে করবে। মধু তার ষড়যন্ত্রে নির্মম। কিন্তু সুষমা সইতে পারে না আর এক মেয়ের এই সর্বনাশ ও মধুর নির্মমতা। সে আত্মহত্যা কবে। চরিত্রের গভীরতার প্রকাশ, তাদের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব সংক্ষোভ, মানসিক জটিলতা অসামান্য রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

মহেশ এলকুঞ্চওয়ার (১৯৩৯) অ্যাবসার্ড ভাবাদর্শের সার্থক রূপকার, নাটকে সুররিয়ালিজমের প্রবক্তা, যৌন - মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষক। তিনি জটিল জীবনের শিল্পীও বটেন। নাগপুর জাত এই মরাঠী নাট্যকার সাহিত্যপত্র 'সত্যকথা'য় কটা একাংক লিখে স্বীকৃতি পান, বিজয়া মেহতার পরিচালনায় এদের অনেকগুলো অভিনয় হয়। এর পাঁচটি 'সুলতান' (১৯৭০) নামে সংকলিত হয়। এর আগে ১৯৬৮ তে তিন অংকের 'রুদ্রবর্ষা'

অভিনীত হলেও প্রচলিত 'সামাজিক' নাট্যরীতি অনুযায়ী রচিত এ নাটক বিশেষ সমাদৃত হয় নি। 'সুলতান' একাংকে প্রবল শক্তিসম্পন্ন ও পরপেষণকারী এক মানসিকতার তীব্র বিসর্পিল গতির কথা যা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ক্ষমতা বা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতীক। 'হোলি' কলেজ জীবনের বীভৎস চিত্র যেখানে ছাত্রদের ধর্মকামের ফলে এক ছাত্রের নিদারুণ পরিণতি ঘটে। 'এক মহতার্য্যচা খুন' (এক বৃদ্ধের হত্যা) ভয়াল রসের নাটক — দুই যুবক ও এক যুবতী এক বৃদ্ধকে হত্যা করার পর আতংকের মধ্যে শুনতে পায় দূর থেকে শৃগালদের আর্তরব যা ক্রমশ তাদের ঘিরে ফেলে। এটা অ্যাবসার্ডিটিরও সার্থক নিদর্শন — রহস্যময়তা, অশ্লীলতা, বিশ্বজনীন প্রতীক ও দ্যোতনা, গভীর ট্র্যাজিক বোধ এবং অধিবাস্তব আঙ্গিকে এটা এক অবিস্মরণীয় নাটক।

অর্থহীন জীবনচর্যা, বন্ধ্যা সভ্যতা ও মিথ্যা ব্যর্থ অস্তিত্বের রূপায়ণ পাওয়া যায় 'গারবো' (১৯৭৩) নাটকে। ক্লান্ত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ইনটাক, তরুণ সমকামভাব প্যানসি এবং অর্থবান কামুক শ্রীমন্ত মাঝারি ধরনের অভিনেত্রী গারবোর (যে এদের তিনজনকেই বিভিন্ন প্রকারে আত্মদান করেছে) সন্দেহপূর্ণ পিতৃ পরিচয়যুক্ত আসন্ন সন্তানের জন্য অপেক্ষা করে — এদের চারজনের হাসি ঠাট্টা উজ্জ্বল কথোপকথন কামপূর্ণ জীবনভাবনা ও যৌনলালসা সব কিছুই যেন সন্তান প্রত্যাশায় আতুর হয়ে ওঠে। কিন্তু গারবো প্রায় ইচ্ছা করেই মৃত সন্তান প্রসব করে সিনেমার মোহে যৌবনকে বেঁধে রাখার তাগিদে। সকলের প্রত্যাশা খান খান হয়ে ভেঙে যায়। এদের খিন্ন ক্লিষ্ট জীবন মুখ থুবড়ে পড়ে ঊষর মরুতে।

'বাসনাকান্ড' (১৯৭৫)-কে মহেশ এককুঞ্চওয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যেতে পারে। এটা তরুণী ললিতা ও তার অগ্রজ হেমকান্তর অজাচারী জীবনচর্যার এক ভয়াল কঠিন নিয়তি-তাড়িত চিত্র। আবেগসর্বস্ব অবদমিত - যৌনবাসনাযুক্ত ললিতা দীর্ঘকাল পর প্রত্যাগত শিল্পী ভ্রাতা হেমকান্তর সঙ্গে তাদের দীর্ঘপরিত্যক্ত বিশাল গা ছমছমকরানো পূর্বপুরুষদের প্রাসাদে এসেছে যেখানে এক অত্যাচারিত মায়ের অভিশাপ ভেসে বেড়ায় — এ বংশে কারুর সন্তান বাঁচবে না। ললিতা তার সর্বস্ব অর্পণ করে হেমকান্তকে, হেমকান্ত দৈহিক যৌনসুখকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করে এবং পাথরে ললিতার নগ্ন দেহ ও আত্মার ছবি খোদাই করে। ললিতা এক মৃত সন্তান প্রসব করে। অভিশাপ ফলে, নিয়তির আমোঘ অনুশাসন নেমে আসে, আদিম পাপের এরা শাস্তি পায়। উন্মত্তপ্রায় ললিতা সকলকে দেহদান করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়, গ্রামবাসীরা হেমকান্তর তৈরী মূর্তি ধ্বংস করে ফেলে এবং এদের দুজনকেই মৃতপ্রায় করে দেয়। পাপের শেষ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ললিতা প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করে যাতে তারা দুজনেই ধ্বংস হবে। বেদনার ঘন কৃষ্ণ ছায়া নাটককে পরিব্যক্ত করে রাখে। আদিম পাপের এক ভয়ংকর অনুভূতি সমাচ্ছন্ন করে রাখে দর্শক চেতনাকে। পাপপূর্ণ অন্যায় - ন্যায়ের স্বরূপ চিত্তে গভীর আলোড়ন তোলে। যন্ত্রণা তাড়িত পাপদগ্ধ দুই চরিত্র যখন দর্শকের সামনে আসে মনে হয় নিয়তির মহাকালের মুখোমুখী তারা দাঁড়িয়েছে শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় যা তাদের ওপর নেমে আসে অমোঘ কঠিন নিষ্ঠুরতায়। 'বাসনাকান্ড' তার ভয়াল গাম্ভীর্যে প্রবল মহিমায় যথাযথ শিল্প রূপায়ণে আধুনিক কালের এক ধ্রুপদী শিল্পের মাহাত্ম্য অর্জন করেছে।

'পার্টি' নাটকে লেখক বুদ্ধিজীবী ও উঁচুতলার অর্থবান মানুষদের মাধ্যমে এই সভ্যতার এক রূপচিত্র অংকন করেছেন। গৃহকর্ত্রী দময়ন্তী, ডাক্তার, কুমারী মা, তিনজন নাট্যকার প্রভৃতি চরিত্রের জীবনচর্যা কথোপকথন ও ভাবভঙ্গী নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ

সমাজব্যবস্থাকে তুলে ধরে। 'রক্তপুষ্প' যৌবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়ানো এক নারীর প্রবল মানসিক ক্ষোভ সংঘাত ও চৈত্তিক বিকারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। পদ্মার যুবক ছেলে যুদ্ধে মারা গেছে, বাড়িতে স্বামী ভাই ও মেয়ে লীলা। কিন্তু ক্লান্ত বিষণ্ণ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে পদ্মা। মূলত তার আগ্রহেই তরুণ রাজু তাদের বাড়ি আছে পেইং গেস্টরূপে যাকে সে তার মরে যাওয়া সন্তানের মতই দেখতে চায় যদিও একটা বিকারগ্রস্ত কামনা তার মনে খেলা করে। অতিরিক্ত আদর যত্নে সে রাজুকে দেখে, তার চলে যাওয়া যৌবনের রূপকে ধরতে চায় রাজুর সামনে। ক্রুদ্ধ কন্যা লীলার নিষ্ঠুর প্রশ্নের সামনে সে দাঁড়ায়, স্বামীর চোখেও ঘৃণা বিদ্বেষ — অসহ্য যন্ত্রণায় পদ্মা বলে যে সে ফিরে পেতে চায় জীবনকে, সে আবার মা হতে চায় এবং এই চিঠিগুলো নিতান্তই কল্পিত জনকে লেখা পত্র — তার নিঃসঙ্গ ব্যথিত চিত্ত এখানেই পেতে চেয়েছে শান্তি।

এলকুঞ্চয়ারের triology 'ওয়াডা চিরেবন্দী' 'মগ্ন তল্যাকাঠী' এবং 'যুগান্ত' অভিনব সৃষ্টিরূপে সমাদৃত কারণ মরাঠীতে প্রথম রচিত ও প্রথম মঞ্চায়িত ত্রি-নাটক এই গ্রন্থটি। 'ওয়াডা চিরেবন্দী' (প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকা, ১৯৮২) নাটকে আছে সময়ের প্রবাহ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ভাবনার পরিবর্তন ও জীবনের বৈচিত্র বিস্ময় জটিলতা। পরিবারিক দ্বন্দ্ব সংঘাতও এতে তীব্র রূপ পেয়েছে। গ্রামে এক প্রাচীন জমিদার-ধরনের পাথুরে অট্টালিকা। বাড়ির দাপুটে কর্তা মারা গেছে। সবাই সমবেত হয়েছে। বাড়িতে থাকে প্রয়াত গৃহকর্তার কালা ও অন্ধ বৃদ্ধা মাতা, তার সম্প্রতি বিধবা স্ত্রী আঈ বা মা, বড় ছেলে ভাস্কর তার বউ বাহিনী মেয়ে রঞ্জু ও ছেলে পরাগ, ছোট ছেলে চাঁদু, ভায়েদের বোন প্রভা; মেজ ছেলে সুধীর ও তার বৌ অঞ্জলি যারা মুম্বাই থেকে এসেছে। এরা প্রায় প্রত্যেকেই আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর, নিজেদেরটা গোছাতে চায়। মা নিরীহ ভালমানুষ, চিরকাল দুঃখকষ্ট পেয়েছে। এখনও ছেলেদের ভাগবাটোয়ারায় ঝগড়ায় দুঃখিত, নিজের সব দিয়ে দেয়। বড় ছেলে গ্রাম্য চাষাড়ে এবং ধূর্তও বটে। তার বৌ বাহিনী ভালমানুষ ধরনের হলেও কিছুটা স্বার্থপর। মেয়ে রঞ্জু সিনেমার ম্যাগাজিন ও গান নিয়ে ব্যস্ত এবং মাস্টারের সঙ্গে প্রেম করে। ছেলে পরাগ বদসঙ্গে পড়েছে। তার মা পরাগকে মুম্বাই পাঠাতে চায় দেওর সুধীরের সঙ্গে। প্রভা একসময় ভাল ছাত্রী ছিল কিন্তু গোঁড়া বাবা তাকে পড়তে দেয়নি, তার বিয়েও হয়নি; এখন তার বয়স হয়েছে, সে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ, মা-কে ভালবাসে বলে টাকা-পয়সা পেলে আবার পড়বে চাকরি করবে মাকে নিয়ে যাবে। সুধীর আর অঞ্জলিও অত্যন্ত চতুর ও স্বার্থপর। ছোট ছেলে নিরীহ, বাড়িতে রাতদিন খাটে, সবায়ের অনুগ্রহপ্রার্থী। বাড়ির পরিস্থিতি জটিল হয়, বাবার শ্রাদ্ধের খরচ কে দেবে, গাঁয়ের সবাইকে নেমন্তন্ন করা হবে কি হবে না এবং সে টাকা পয়সা কোথায় পাওয়া যাবে, সাবেক গয়না কে কে নেবে — ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রবল কলহ চলে। বাড়ির সামনে রাখা স্থবিরতার প্রতীক ট্র্যাক্টর লেগে ছোট ছেলের পায়ে ক্ষত হয়। কিন্তু কে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে? যে যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত; তার পায়ে সেপটিক হয়। বাড়ির সবাই কলহে মত্ত, তখন রঞ্জু বাড়ির গয়নার বাকস নিয়ে মাস্টারের সঙ্গে পালায়। সকলেই উদ্বিগ্ন চিন্তিত, সুধীর শহরে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভাইঝিকে ফিরিয়ে আনে, রঞ্জুর গয়নার বাকস নিয়ে প্রেমিক পালিয়েছে। সংসারের শান্তির জন্য মা সব দিয়ে দেয়। সুধীর মুম্বাই ফিরে যাচ্ছে — অসুস্থ শায়িত ছোট ভাই কাতর স্বরে ডাকে — দাদা; বাড়ি ভাঙার শব্দ; সুধীর বেরিয়ে যাচ্ছে; চারপাশে স্থবিরতা ভাঙন অবক্ষয়। Wada Chirebandi is full of observations about rural life and caste and class re-

lations in post – Independence India The writer's identity is very clearly involved with the subject. প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার নিজেই একে তার রক্ত-মাংসের (flesh and blood) নাটক বলে উল্লেখ করেছেন। পববর্তী দুই পর্বে 'মগ্ন তল্যাকঠী' ও 'যুগান্ত' তে এই কাহিনী আরো পরিব্যাপ্ত হয়েছে যদিও তারা স্বতন্ত্র নাটক রূপে বিবেচিত হতে পারে। এই ত্রয়ী নাটক মহেশ এলকুঞ্চওয়াবকে খ্যাতিব শীর্ষে উপনীত করেছে এবং মবাঠী নাট্য সাহিত্যেব ইতিহাসে নতুন সৃষ্টিরূপে সমাদৃত হয়েছে।

অচ্যুত ওঝে মরাঠী আভ-গার্দ নাট্যবীতির অন্যতম প্রবক্তা ও উদ্‌গাতা। পরীক্ষামূলক নাটক রচনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নাট্যরচনা পরিচালনা অভিনয এবং সঙ্গীত সৃজনেও তাঁব বৈচিত্র্যময় দক্ষতা প্রমাণিত। উদ্ভট তত্ত্ব ও অধিবাস্তব দর্শনেব প্রয়োগ তাঁব নাটকে আছে এবং তাব মধ্য দিয়ে সমাজ ও জীবনেব রূপ প্রকাশিত হয় যা কখনো নির্যাতকের পীড়নজাত সুখে, কখনো বেদনামথিত মানুষেব প্রতি প্রচ্ছন্ন সমবেদনায, কখনো যৌন কামনায়, কখনো বা শূন্যতাব বোধে প্রকট হযে দেখা দেয। তবে নাটকেব গ্রন্থনও অদ্ভুত · আপাত অসংলগ্ন পারম্পর্যবিহীন অথচ গভীরতম ভাবনায় গ্রথিত অথবা নাচ গান লোকশিল্পীরীতির বিচিত্র প্রয়োগ এক বিস্ময়কব রূপলোক নির্মাণ করে।

অচ্যুত তাঁর নাট্যচর্চা শুরু কবেন কিশোব নাটক দিয়ে — 'হরবলয় বল্লহার রাজকন্যেচা' (১৯৬৭) ও 'সহসী সহা' (১৯৬৮) যা তিনি পরিচালনা করেন। 'শদজা' (১৯৭১) নাটক এক শক্তিশালী অত্যাচারী ব্যক্তি কিভাবে দুজন লোকেব ওপর অত্যাচার করে তার বিশ্লেষণ যা অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক। এই প্রবল 'শক্তি'র সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হওয়াও সম্ভব।

'চল রে ভোপল্যা টুনুক টুনুক' (১৯৭৩) নাটকের নামকরণ হয়েছে মরাঠী ছেলেভুলানো ছড়া থেকে। ভাউ সাহেবের আছে এক মেয়ে জুডি ও দুজন পেইং গেস্ট দন্ডেকর ও খন্ডেকর। আর একজনও সেখানে আসে ওয়াঙ্কেকর ও তার চালকুমড়ো ভোপলা। ওয়াঙ্কেকর অনেক কাজ করতে চায় বিশেষত চালকুমড়ো নিয়ে। তার কাছে এই ভোপলাই সব — প্রেম ধর্ম সঙ্গী এমন কি মনের খাদ্যও। ভোপলাও অদ্ভুত জিনিষ— বিচিত্র ঢঙে ও অঙ্গ ভঙ্গীতে নাচে গানে সংলাপে সব ব্যক্ত করে। ওয়াঙ্কেকর বিয়ে করে জুডিকে ও আশা করে তার সন্তান হবে একটা চাল কুমড়ো। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে হতাশই হয়। 'কমিক রিসার্চের' মধ্য দিয়ে নাটকে জীবনের অর্থহীনতাকেই তুলে ধরা হয়েছে। নাচ-গান কৌতুক বিন্যাস সব নাটকে আছে। সূচনায় ভোপলা - প্রশস্তি মজাব, শেষাংশে সিরিয়াস। অগ্রদূত প্রযোজিত অমল পালেকর পবিচালিত অভিনীত এই নাটক সাম্প্রতিক পরীক্ষামূলক নাট্যপ্রযোজনার এক উল্লেখ্য নিদর্শন।

'সোফা কাম বেড' এক একুশবছরের যুবক জোমো -কে কেন্দ্র করে লেখা। জোমোর অস্থির মানসিকতা, যৌন বাসনা, চিন্তা ও কল্পনাকে নিয়ে নাটক গড়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন নাগরিক সভ্যতার একটা চিত্রও লেখক অংকন করেছেন। জোমোর সঙ্গে মন্দিরার কামনামিশ্রিত সম্পর্ক। অনামিকার প্রতি তার তীব্র আসক্তি ও সম্ভোগ বাসনা, কল্পনায় সেই মিলনেচ্ছা পূরণ, অনামিকার মার সোসাইটি-কেন্দ্রিক ভাবনা, জোমোর উদভ্রান্ত অস্থিরতা এলোমেলো খাপছাড়া সংগতিহীন দৃশ্যাবলীর মধ্যেও জীবনের এক চিত্র ফুটিয়ে তোলে।

'পভশ নাটক' (১৯৭৭) অনেকটা প্রচারমূলক নাটক। জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে আহ্বান। যদিও এটা প্রচলিত রাজনৈতিক নাটক নয়, সামাজিক রাজনৈতিক প্রবল

মতবাদও নেই। নাটকে কবি বাজা ডিক্‌টেটরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সে শুনেছে বিবেকের আহ্বান উপলব্ধি করেছে আত্মপ্রকাশের তাগিদ তাই তাকে জেগে উঠতেই হবে, করতে হবে প্রতিবাদ। অচ্যুত ওঝে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই বেশী করে দেখেছেন, তথাকথিত সমাজচেতনার থেকে মানবচেতনাই তার কাছে বড়। তাই এই প্রচার-মূলক নাটকেও সমাজের থেকে বড় হয়ে ওঠে মানুষ, মানুষের হৃদয়ের প্রকাশ।

'সয় সকব' (সর চিনি) নাটকে জীবনের অসংগতি ও বিমূঢ়তা ফুটেছে। এক তরুণ-তরুণী একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে আসে যাতে এক বৃদ্ধ নরনারী আগে থেকেই বাস করে। স্থির হয় চারজনেই ফ্ল্যাটে থাকবে কিন্তু কেউ কারুর সম্পর্কে মাথা ঘামাবে না, পরস্পর কথাও বলবে না। কিন্তু তা মানা যায় না। কেবল বৃদ্ধা একাকী থাকে, সে চিন্তিত কারণ সিলিং দু ফুট নেমে এসেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে মেয়েটি বৃদ্ধদের কন্যা হয়। তরুণ যুবকটি হয় তার প্রেমিক। এদিকে সিলিং নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জলের কল থেকে অবিশ্রান্ত জল পড়তে থাকে ও পুরো বাড়ি জলে ভর্তি হতে থাকে। প্রত্যেকে বিচলিত উত্তেজিত, পরিবেশ হয় আতংকের। মেয়েটির জীবনের কোন ট্র্যাজিক ঘটনা এদের মথিত করে, তরুণ যুবক মারা যায়, সিলিং ভেঙে পড়ে, এবং বাড়ির দালাল এসে নতুন ভাড়াটাকে ঘর দেখায়। অনেকটা দুর্বোধ্য এই নাটকে জীবনের বিমূঢ়তা অর্থহীনতা প্রকাশিত হয়েছে। মানব অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা এবং দুই জেনারেশনের সমস্যাও এতে রূপায়িত হতে পারে। এই নাটকের আরো ব্যাখ্যা করেছেন রাজীব নায়ক।[১৫]

সতীশ আলেকর (১৯৪৯) মরাঠী নাট্যসাহিত্যের এক নতুন বিস্ময়। তাঁর নাটকে সমসাময়িক সমাজ-সংস্কৃতির এক গভীর প্রকাশ আছে যার সঙ্গে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট জটিলতাও ফুটে ওঠে। তাঁর নাটকগুলোকে কেউ কেউ 'ব্ল্যাক কমেডি' রূপে উল্লেখ করেছেন কারণ কৌতুক পরিহাসের মধ্য দিয়ে জীবনের নিষ্ঠুর নির্মম সত্যগুলো তুলে ধরেন তিনি, উদ্ভট হাস্যকর ঘটনা বিন্যাসে ভয়ংকর জীবনসত্য প্রকাশিত হয়। আঙ্গিকের এক অপরূপ রূপ অঙ্কন করেছেন তিনি — নৃত্য গীত লোকশিল্পরীতির প্রয়োগ অদ্ভুত উদ্ভট বিন্যাস প্রভৃতি হয়ত দুর্বোধ্য কিন্তু অভিনব শিল্পলোকের বার্তা আনে। তাঁর নাটকের মূল্যায়ন করে সমালোচক বলেছেন — Alekar's plays express varying shades of the tragic in man's everyday existence, with the intensity characteristic of lyrical poetry. The drab and boring existence devoid of creativity or heroic qualities, constitutes tragic in the last quarter of the 20th Century .... He seems to suggest that tragic and the playful are inseparable and an air of inevitability weighs heavily on human existence. Inequality, injustice, accident, failure, a search for new meaning, love, sex, thirst for knowledge, the wide chasm between ambition and average potential, irritation at being oneself, sterility, despair, death — all these and such things and their inevitability, the helplessness of men and his incessant efforts to overcome the material world around him seem to leave a bitter and sour taste in Alekar's mouth.[১৬] সমালোচকের এই মননশীল মন্তব্যে সতীশ আলোকরের বৈশিষ্ট্য অনেকংশই ধরা পড়েছে।

'মিকি আনি মেমসাহেব' (১৯৭৩) নাটকে এক প্রবল শক্তিময়ী ও ব্যক্তিত্বময়ী নারী ও সংবেদশীল বুদ্ধিমান অথচ নিরীহ এক শিক্ষাবিদ পুরুষের মধ্য দিয়ে উৎপীড়ক - উৎপীড়িতের সম্পর্ক নির্ণয় করার প্রয়াস আছে। প্রৌঢ় অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের মলেকিউলার বায়োলজির প্রধান, বিভিন্ন গবেষণা করে। তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী মেমসাহেব

নিজে কিছু না লিখে অধ্যাপকের সাহায্যে ডক্টরেট হয়েছে। সে অত্যন্ত প্রভুত্বপরায়ণা নারী — অধ্যাপককে অংগুলি সংকেতে চালায়। অধ্যাপক ল্যাবরেটারিতে একটা ইঁদুর বা মিকির ওপর পরীক্ষা চালায়, তাকে নিয়ম করে খাবার দেয় ইনজেকশন দেয়। অধ্যাপকের ছাত্র গুলবানি তার কাছে অনেকদিন রিসার্চ করছে, কিন্তু মেমসাহেবের নির্দেশে অধ্যাপক জল তোলা সবজী কাটা প্রভৃতি কাজে এত ব্যস্ত যে সেদিকে মন দেবার সময় পায় না। একদিন হঠাৎ মিকিকে তার বাক্সে পাওয়া যায় না, অধ্যাপক আহত কারণ সে মিকিকে গড়ে তুলছিল নতুন প্রয়াসে। হঠাৎ গুলবানিকে দেখে অধ্যাপক মনে করে মিকিই এত বড় হয়ে উঠেছে তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ পরীক্ষায় দ্বারা। সে খুশি হয়, জোর করে মিকিকে (গুলবানিকে) ইনজেকশন দেয়। এভাবে সে নতুন পরীক্ষায় মেমসাহেবকে পালটে দেবে, তখন মেমসাহেব তার কথা শুনবে, জল ভরবে, সব কাজ করবে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, গভীর জীবন-বিশ্লেষণ, শোষক-শোষিতের সম্পর্কের রূপায়ণ প্রতীক ময়তায়, সুররিয়ালিষ্ট ঢঙে, অ্যাবসার্ড রীতিতে সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে নাটকে।

'মহাপুর' (১৯৭৩) যৌবনে পদার্পণোদ্যত এক তরুণের মানসিক দ্বিধাসংকটের বেদনা বিপর্যয়ের চিত্র। তার বাবা মা ছিল তথাকথিত দেশপ্রেমিক যারা সবসময় সদম্ভে আড়ম্বরে নিজেদের মহত্ব স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ ইত্যাদির কথা বলে, আবার ছেলেকে সবসময়ে দাবিয়ে ও দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে নিজেদের স্বার্থের জন্যই। ছেলের মনে সর্বদাই গ্লানি আতংক বিষণ্ণতা যা বাবা-মার প্রতি তার ঘৃণা বিদ্বেষ জাগায়। সে একটা মেয়ের দ্বারাও অবহেলিত অপমানিত হয়। সব কিছুর পরিণামে তার মানসিক বিপর্যয় ও বিকলন ঘটে। নাটকে তথাকথিত আদর্শবাদ ও নীতিপরায়ণতাকে তীব্র ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অন্যদিকে সংবেদনশীল চিত্তের গভীর বিশ্লেষণ আছে।

তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'মহানির্বাণ' (১৯৭৪) ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে সমাজ ও জীবনের সত্যকে তুলে ধরে কিছুটা উদ্ভট ভংগীতে। এক মধ্যবিত্ত মানুষ ভাউরাও মারা গেছে; এবং তার পর প্রতিবেশীদের আগমন ও ভিড় করা, খেলা প্রতিযোগিতা থেকে ছেলে নানা-র ফিরে আসা ও পিতার মৃত্যু সংবাদে বিশেষ ব্যথিত না হওয়া, স্ত্রী বিষণ্ণ রমার মনে অন্য অবদমিত চিন্তার আবির্ভাব, এবং মৃতের গান গাওয়া ও নাচা — এভাবে প্রকাশ পায় জীবন। মৃত্যুতে সকলের প্রতিক্রিয়া, স্ত্রী-পুত্রর বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা ও দুঃখবোধ এবং তাদের প্রকাশ — এসব দেখে কে? স্বয়ং মৃত্যুই দেখে এসব। মৃত্যুই এই সব প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ প্রকাশ। রমা এতকাল অবরুদ্ধ ও অবদমিত জীবন কাটিয়েছে যা সব হয়েছে তার স্বামীর জন্য যার মৃত্যুতে সে ব্যথিত হলেও মুক্ত। ছেলের মনেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া — একদিকে বাবার মৃত্যুতে অসহায়তা অন্যদিকে মুক্তি। মৃত ব্যক্তি কথক। তবে সাধারণ মানুষের মত সে কথা বলবে না। কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে ব্যক্ত করে। তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখানে দাহ করা যাবে না। কারণ নতুন বিদ্যুৎ চুল্লী আসার জন্য তা বন্ধ। তাতে সে ব্যথিত। নানা ঘুষ দিয়ে পুরোনো চুল্লীতে বাবার দেহ দাহ করায়। তাতেও ভাউরাও বা মৃত খুশি। আগুন তাকে ঘিরে ধরে ও সে নাচগান করে। এভাবেই জীবন রূপ পায়। সমাজ পরিবার চিরাচরিত মূল্য বোধ — সবকিছুর অন্তঃসারশূন্যতা কৌতুক ব্যঙ্গ অ্যাবসার্ডিটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

'বেগম বর্বে' (১৯৭৯) এক মানুষের কথা যে দীর্ঘদিন ধরে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতে করতে প্রায় নারীতে পরিণত হয়। এর মধ্য দিয়ে মানব দেহ ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ আছে। অনেকে এতে সমকামের প্রকাশ দেখেন। 'বেগম বার্ভে' স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের নাটক।

বার্ভে একদা স্বপ্ন দেখেছিল বালগন্ধর্বর সৌন্দর্যলোকের, সে হতে চেয়েছিল সঙ্গীত-নাটক লোকের বড় শিল্পী। কিন্তু সে এখন এক সামান্য অফিসের সাধারণ কর্মচারী যার পীড়নকারী মালিক তাকে বেগম বলে। আর দুজন কেরানি আছে — জওডেকর ও বওডেকর যারা অফিসের বিরক্তিকর একঘেয়েমীতে ক্লান্ত। জওডেকর অফিসের এক মহিলার প্রতি আসক্ত; সে বার্ভের মধ্যে সেই নারীকে দেখে। বার্ভে কল্পনা করে সে বিবাহিতা নারী এবং তার সন্তান হবে। জওডেকরের সেই কল্পনা। কিন্তু বাস্তবের আঘাতে বার্ভের স্বপ্ন খানখান হয়ে যায়, জওডেকারেরও। এক সূক্ষ্ম সুকুমার কল্পনার আবরণে নাটকটা ঢাকা। অবশ্য প্রত্যক্ষ ও বাস্তব বিচারে এর মর্যাদা কতটা আছে বোঝা মুস্কিল। থিয়েটার একাডেমী পুণে এই নাটকের মঞ্চায়ন করে সতীশ আলেকারের পরিচালনায়। বেগম বার্ভের চরিত্রে অংশ নেন চন্দ্রকান্ত কালে যাঁর অনুপম কণ্ঠে অনন্য সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অসাধারণ সঙ্গীত ও অসামান্য অভিনয়ে কেলকর নাটকটিকে সুন্দব সমুজ্জ্বল করে তোলেন।

'শনিবার রবিবার' (১৯৮২) আধুনিক যান্ত্রিক প্রথাবদ্ধ জীবনের তীব্র প্রকাশে, মানবচেতনার বিশ্লেষণে ও ফ্যানটাসির স্পর্শে আশ্চর্য নিবিড়। এক সন্তানহীন মধ্যবয়সী দম্পতি পরস্পরকে ভালবাসলেও মনের গভীর অতৃপ্তি পোষণ করতে থাকে এবং পরস্পরকে প্রবল অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে। এক পুরুষ ও নারী সেখানে আসে যাদের সঙ্গে তারা আপাতপ্রণয়ে লিপ্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কোথায় চলে যায় — সবই যেন ফ্যানটাসি। তাই সব মুছে যায় কোন দাগ থাকে না।

'গাভারা' (মন্দিরের গর্ভাগার) নাটকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ভাল মন্দ ধর্ম-অধর্ম সত্য-মিথ্যার অন্বেষণ। এর প্রেরণা ১৯৭৬-এ পুণায় জোশী-অভ্যংকর হত্যা। তরুণ হত্যাকারীরা ছিল শিল্পী, ভয়ংকরতা থেকে জাত আতংককে তারা উপভোগ করে। এই অস্বাভাবিক আনন্দ ও নিষ্ঠুরতা একদিকে আছে নাটকে। অন্যদিকে রাজনীতিবিদদের (অনেকটা স্পষ্ট করে বলতে গেলে মহারাষ্ট্রের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর) দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার থেকে জাত আনন্দ পূরণ। নাটকে এক মারুতি বচ্চন আছে (যার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে এক অভিনেতার মিল) যে এই দুই শক্তিকে যুক্ত করে। দেশের সাম্প্রতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রকাশ করার প্রয়াস আছে নাটকে।

গোবিন্দ পুরুষোত্তম দেশপান্ডে (১৯৩৮) জি পি দেশপান্ডে বুদ্ধিদীপ্ত নাটক লেখেন। একটি মননশীল মূলত রাজনৈতিক ভাবনাকে তিনি নাটকে তুলে ধরেন এবং তাকে নাটকীয় করে তোলেন। তিনি বলেছেন—"I think I can claim that I have created the genre of the play of ideas or the intellcetual play in Marathi..... It is my belief that the tension of ideas can create high drama." তিনি সাম্প্রতিক সময়ের এক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ রূপে সম্মানিত। সাহিত্যেও জীবননিষ্ঠ মননশীল ছাপ আছে। 'উধ্বস্ত ধর্মশালা' (১৯৭৪) নাটকে আপোষহীন এক মার্কসীয় বিপ্লবী অধ্যাপকের জীবনকে আঁকা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীধর বিশ্বনাথ কুলকর্ণী একদা রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, কয়েকটি নাটকও লিখেছেন, এখনো এক প্রবল রাজনৈতিক মতাদর্শে নীতি ও তত্ত্বগতভাবে বিশ্বাস করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ছাত্রদের মধ্যে উগ্র রাজনীতি ছড়াচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংগঠিত করছেন, বিপ্লবী শিক্ষক সংগঠন স্থাপন করেছেন যার উদ্দেশ্য মার্কসবাদ

লেনিনবাদ নিয়ে আলোচনা করা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির মুখোমুখী হয়েছেন যাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের সময় ফ্ল্যাশব্যাকে তাঁর অতীত জীবন জানা যায় — তিনি চিরকাল সচেতন বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী, তাঁর বাবা সম্পূর্ণ অন্য রাজনীতি করতেন বলে তাঁদের বিরোধ যদিও বাবার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, তাঁর স্ত্রীও বামপন্থী রাজনীতি করতেন কিন্তু সেই দল ক্রমশ সুবিধাবাদী হয়ে পড়ে ও তার স্ত্রীও হন কেরিয়ারিস্ট ফলে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা; তাঁর স্থির নিষ্ঠ আদর্শবাদ ও আপোষবিমুখতার জন্য সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। কুলকর্ণী আজ একক বিচ্ছিন্ন। তবু আদর্শে স্থির প্রত্যয়ে অনড়। তার ছেলের জীবনেও এই রূপ আসতে দেখে বিচলিত হয় সে, তাকে সে সর্তক করে সচেতন করে, জীবনকে গ্রহণ করতে হলে বলিষ্ঠতায়, আদর্শ মেনে মাথা উচু করে চলতে শিক্ষা দেয়। মূলত সওয়াল-জবাবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সংলাপ-নির্ভর এই নাটকে রাজনৈতিক মতাদর্শের পর্যলোচনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্ব জটিলতা, ব্যক্তি মনের তীব্র বেদনা, মানবহৃদয়ের অতল গভীরতার উন্মোচন আছে। কুলকর্ণীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার আপোষহীন বৈপ্লবিক ব্যক্তিত্বকে চারপাশের ক্ষুদ্রতা নীচতার মধ্যেও অভ্রংলিহ মহিমায় স্থাপন করে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবেরই জয়গান গেয়েছেন যা আপাত পরাজয়েও উজ্জ্বল উদ্ভাসিত। একজন বুদ্ধিমান সচেতন সংবেদনশীল মার্কসিস্টের জীবন ও মানসিকতার অসামান্য বিশ্লেষণ 'উধ্বস্ত ধর্মশালা'। নাটকের গঠনও সুন্দর। কোর্টরুমের রীতি, ফ্ল্যাশব্যাক, ফিল্‌মিক কৌশল নাটককে অভিনব করেছে। বোম্বাই-এর 'রূপবেধ' এই নাটকের সুন্দর মঞ্চায়ণ করে বিশেষত কুলকর্ণীর ভূমিকায় ডঃ শ্রীরাম লাগুর অভিনয় অবিস্মরণীয়। তিনি নাটকের পরিচালকও।

'চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত' (১৯৮৮) খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পটভূমিকায় স্থাপিত, এর প্রধান চরিত্র চাণক্য। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ, নন্দবংশ ধ্বংস, চাণক্যর প্রেরণায় চন্দ্রগুপ্তর ভারত সম্রাট হওয়া নাটকের বিষয়। কিন্তু এটা ঠিক প্রচলিত রীতির জীবনীমূলক বা ঐতিহাসিক নাটক নয়; এটা রাজনৈতিক নাটক, বলা ভাল রাজনৈতিক তত্ত্বনাটক। চাণক্য দেখছেন যে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করছে, দমন করতে চাইছে দেশকে। সারা ভারত ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত, তাদের সামর্থ্য নেই বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার। চাণক্য বিবিধ পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করে — প্রতারণা করে ভয় দেখিয়ে ও হত্যা করে শত্রুদের দমিত করে চন্দ্রগুপ্তর নেতৃত্বে এক ভারতবর্ষ গঠন করতে প্রয়াসী হলেন। চন্দ্রগুপ্ত ভালবেসেছিল ও বিয়ে করতে চেয়েছিল রাজা নন্দর মন্ত্রী শকটরের কন্যা সুবাসিনীকে যে সঙ্গীতনৃত্য নিপুণ এবং প্রখর বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বময়ী। কিন্তু চাণক্য সেই বিবাহ হতে দেয়না, চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে সেলুকাস কন্যা হেলেনের বিয়ে দেয়। সুবাসিনী বিবাহ করে রাজা নন্দকে অনেকটা প্রতিশোধ বাসনায়, কিন্তু নন্দকে হত্যা করা হয়। আরো অনেক ছিল সুবাসিনীর পাণিপ্রার্থী; চন্দ্রগুপ্তও এল তাকে আবার বিয়ে করতে। কিন্তু সুবাসিনী সবাইকে পরিহার করে বৌদ্ধ মঠে চলে যায় ভিক্ষুণী হয়ে। নাটকের দ্বন্দ্ব প্রখর বুদ্ধিমান সর্বগ্রাসী ক্ষমতাসম্পন্ন এক ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ব্যক্তিমন ও হৃদয়ের অস্বীকারকারী চাণক্যর সঙ্গে সুবাসিনীর। চাণক্যর কাছে ব্যক্তির কোন মূল্য নেই। কিন্তু সুবাসিনী ব্যক্তি ভাবনাকেই বড় করে তুলতে চায় — এটা totalitarian state ও individual libertyর দ্বন্দ্ব। নাটকের শেষ দৃশ্যে চাণক্য ও সুবাসিনীর সাক্ষাৎ হয় গঙ্গার তীরে এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে বির্তকে মত্ত হয়। যে যার মতবাদে অটল থাকে। নাটকের শেষাংশ উদ্ধৃত হল —

বিষ্ণুগুপ্ত — ইতিহাসের সংকট বা ভবিষ্যতের সমস্যার সমাধান তোমার বা আমার হাতে নেই। পরবর্তী প্রজন্মই স্থির করবে আমাদের বিতর্কের পরিণাম কী হবে। ওসব নিয়ে এখন চিন্তা কোরো না। যাই হোক এই সময়েই তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর যা তোমার দরকার নেই।

(চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত সুবাসিনীর দিকে পেছনে ফেরে। অন্ধকার। সুবাসিনীকেএকা দেখা গেল আলো আসার পর। সে নদীর দিকে চেয়ে থাকে। যেন নিজের মধ্যেই মগ্ন)

সুবাসিনী — তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের ওপর সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলেন। আমাকে আশীর্বাদও করলেন যদিও আমি তা চাইনি। বৈদিক ঐতিহ্যের বিরোধীদেরও গ্রহণ করলেন। আচার্য এটা একটা পুরোনো খেলা। আপনি চান আমিও সেই পথে চলব? না, আমি তা কখনো করব না। কক্ষণো না। আপনিও দেখবেন আমার সামর্থ্য। আমি যুদ্ধ করব। সব ভাবেই আমি লড়ব। ইতিহাসের শেষ পর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গে লড়ব, যদি তাই আমাকে করতে হয়। আপনি দেখবেন আমার সামর্থ আমার চিরন্তন যুদ্ধ।

নাটকে আধুনিক কালের ছায়া সম্পাত ঘটেছে। নাটকের প্রথমেই এক ব্যক্তি সূত্রধার নেহরুর মত পোষাক পরে আসে। এবং সে কাহিনীর সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় নেহরুর সঙ্গে যিনি "জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সর্বপেক্ষা আধুনিক এবং নাটকে সেই মানুষটির কথা বলা হচ্ছে যিনি তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা উপস্থাপিত করেছিলেন"।

যাই হোক 'চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত' এসময়ের এক বিশিষ্ট নাটকরূপেই পরিগণিত হবে।

'আন্ধার যাত্রা' দেশপান্ডের এক অত্যন্ত জটিল পরিণত ও সফল নাটক রূপে পরিগণিত। দেশপান্ডের রীতি অনুসারে রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক, আদর্শ বিশ্বাস প্রভৃতি এখানে আছে; তবু মনে হয় মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী নাট্যকার যেন বামপন্থী ভাবনার প্রতি কিছুটা হতাশ। নাটকের প্রধান চরিত্র বসুন্ধরা। ব্যক্তিত্বময়ী এই নারী যেন চিরকালের আর্থ সামাজিক শোষণের শিকার। সে স্বামী পরিত্যক্তা। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ দৌলতরাও তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করে। তার জীবনে আসে বামপন্থী অধ্যাপক শ্রীপাদ আর আসে অশ্বত্থ নামে এক আদর্শবাদী ছাত্র নেতা যাকে বসুন্ধরা পুত্রের মত ভালবাসে। তেলেঙ্গানাতে প্রবল রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে অশ্বথ্ব সেখানে ছুটে যায়, কিন্তু পুলিশের গুলিতে সে মারা যায়। শ্রীপাদও বিচলিত হয়ে সেখানে যায় ও পুলিশ তাকে রুদ্ধ করে। বসুন্ধরার জগৎ আলোহীন হয়ে পড়ে। বসুন্ধরা মুক্তি খুঁজেছে, অশ্বত্থ বেছেছিল বিপ্লবের পথ, শ্রীপাদ অন্বেষণ করেছিল সঠিক রাজনীতির আদর্শ। সবই যেন ধ্বংস হয়। শেষ পর্যন্ত বসুন্ধরা গ্রহণ করে দৌলতরাওকে — এখানে তার অন্ধকারের যাত্রা শেষ হয়! নাটকে আদর্শের দ্বন্দ্ব এবং বসুন্ধরা চরিত্রের যন্ত্রণা দাহ ও মনের উন্মোচন ভিন্ন মাত্রা পায়।

জি পি দেশপান্ডের 'সত্য শোধক' (১৯৯৬) নাটকও তাঁর ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। ৮৭ তে লেখা 'মামক পান্ডবশ্চৈব'ও মার্কসীয় আদর্শের ভিত্তিতে লেখা। দেশপান্ডে শিবাজীকে নিয়ে সিরিয়াল লিখেছেন কারণ শিবাজী হলেন ভারতবর্ষের প্রথম শূদ্র রাজা। তিনি ফুলেকে নিয়েও নাটক লিখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে All these great men are in many ways symbols of change in society, changes for a better life and better social organization. Idealism linked with social change, seen in the

light of an understanding of the dynamics of a society and the changes that come over it thorugh the agency of human action. have always fascinated me.

বৃন্দাবন দণ্ডবাতে (১৯৩৪) তাঁর পরীক্ষামূলক নাটক 'এক রাজাচা খেল'-এ অনেকটা রূপক প্রতীকের মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিক পৃথিবীর শক্তিস্মন্যতা ও শক্তির অপপ্রয়োগের কথা বলেছেন। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজা — তাসের রাজার মতই সে। সেই রাজার রীতি ব্যবহার নিজের ক্ষমতা জাহিরের চেষ্টায় আধুনিক কালের শক্তির রূপই ফুটে ওঠে যেভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র বা নায়ক নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত কবতে চায়। নাটকে হলঘর যেন সার্কাস এরিনায় পরিণত হয় ও অভিনেতারা সার্কাস খেলোয়াড়দের মত আচরণ করতে থাকে। নাটকের সুর ব্যঙ্গের — কৌতুক বিদ্রূপের মধ্য দিয়েই শক্তি-র অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগকে তুলে ধরা হয়েছে।

'বুট পালিশ' নাটকে বুট পালিশ ও পালিশ-ওয়ালাদের রুজি রোজগার জীবনধারণের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের জীবন ফোটানো হয়েছে। "এই নাটক যথার্থই আধুনিক। কারণ বুট ও বুটকে ঘষেমেজে উজ্জ্বল করার দ্রব্য যে বুট পালিশ এবং সেই পালিশ সম্বল করে যাদের রুজি-রোজগার তাদের প্রতীকের আড়ালে মহানগরের সর্বস্তরের সামগ্রিক জীবন তার সমস্ত অসংগতি সুদ্ধ উপস্থিত। এই অসংগতির মধ্যে দিয়ে আসে বাস্তব ও কাল্পনিক, হাস্যকর ও গম্ভীর, সুখদ ও দুঃখদ — সব বিসংবাদী ব্যাপার। সারাটা জীবন কেমন একই মুহূর্তে চাওয়া না - চাওয়ার আবর্তে আবদ্ধ — তারই প্রকাশ দেখা যায় এই নাটকে। এই নাটকের একটি বিশেষত্ব তার পুরুষ নির্ভরতায়। এর পটভূমি তৈরি হয়েছে জগন্মাতা - সদৃশ্য একটি নারী প্রতিমা দিয়ে। পুরুষের জন্ম নারীগর্ভে, পুরুষের সুখ নারী সংসর্গে, এবং নারী সঙ্গ বিবর্জিত হলে পুরুষ কত হতবল হয়, কত ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়, কত একঘেয়ে হয় তাই নিয়েই এই নাটক।"[১৭]

অনিল বর্বে (১৯৪৮-৮৪) স্বল্পায়ু জীবনের কয়েকটি নাটকে তাঁর সৃজন প্রতিভার দীপ্ত স্বাক্ষর রেখেছেন। তীব্র প্রখর সমাজচেতনা তাঁর বৈশিষ্ট্য; সামাজিক বৈষম্য অসংগতির প্রবলতাই কেবল তিনি চিত্রিত করেননি তার মুলানুসন্ধানও তিনি করেছেন এবং যে অন্যায় অপরাধের ফলে তা ঘটে তার মূলও উৎপাটন করতে চেয়েছেন। একটা বিপ্লবী মানসিকতা তাঁর মধ্যে ছিল যার ফলে সমাজবোধের এই তীব্র উৎসারণ ঘটেছে। অকাল প্রয়াণ না ঘটলে এই শিল্পস্রষ্টা মরাঠী তথা ভারতীয় নাট্যসাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারতেন।

'থ্যাংক ইউ মিঃ গ্ল্যাড' (১৯৭৭) এক উগ্রভাবনা সম্পন্ন বন্দী বিপ্লবীর তেজস্বী মানসিকতা ও প্রবল মানবিক বোধ এবং এক উগ্র নির্মম জেলারের বৈচিত্র্যময় মানসিকতাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। গ্ল্যাড-সাহেব এক নিষ্ঠুর নির্দয় জেলার, তাকে দেখলে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়। সেই জেলে এক ফাঁসীর আসামী বিপ্লবী বীরভূষণ পট্টনায়ক আসে। গ্ল্যাড ভাবে বীরভূষণকে শিক্ষা দিতে হবে, ঘোচাতে হবে বিপ্লবীপনা। কিন্তু বীরভূষণের ব্যক্তিত্বে তেজে ঘা খেয়ে গ্ল্যাডের সব আঘাত ফিরে আসে। গ্ল্যাড কিছুতেই বীরভূষণকে হারাতে পারে না। সে কিছুতেই মার্সি পিটিশনে সই করবে না। বীরভূষণের স্ত্রী স্বামীকে দয়া চাইতে দেবে না, বরং তাকে প্রেরণা দেয় উৎসাহ দেয়, বলে যে তার সন্তানকে বীর পিতার মতই গড়ে তুলবে। গ্ল্যাড হতবাক। গ্ল্যাডের মেয়ে জেনী বিদেশ থেকে বাবার কাছে আসে, তাঁর সন্তান হবে। সে বীরভূষণকে দেখে মুগ্ধ। সে বাবাকে বলে বীরভূষণকে সামনে

রেখে গুলি করে মারতে — যেটা বীরের মৃত্যু। সে ভাবে তার ছেলে যেন ওরকম হয়। একদিন প্রবল ঝড়জলের রাত, প্রলয় এসেছে, চারপাশে অন্ধকার, জলে ভেসে গেছে। গ্ল্যাড অসহায় বিমূঢ়, পৃথিবীতে তার একমাত্র ভালবাসার বন্ধন জেনী-র জন্য সে অস্থির উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে। হঠাৎ মনে পড়ে বীরভূষণ -এর কথা যে প্রকৃতপক্ষে ভাল সার্জন ছিল। পরদিনই তার ফাঁসী হবে। গ্ল্যাডের কথায় বীরভূষণ আসে, জেনীকে পরীক্ষা করে, সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে দক্ষতায় তার কাজ করে ও জেনীর পুত্র-সন্তান হয়। গ্ল্যাড অভিভূত বিহ্বল, সে ডাকে — কমরেড, কমরেড। তারপর গ্ল্যাড বীরভূষণের বুকে গুলি চালায়। বীরের আকাংখিত মৃত্যু পায় সে, ধন্যবাদ জানায় গ্ল্যাডকে — থ্যাংক ইউ মিঃ গ্ল্যাড : তার কথা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। হত্যাপরাধে গ্ল্যাডকে বন্দী করা হয়, রাখা হয় বীরভূষণের সেলে। একদিকে বিপ্লবের আদর্শ, বিপ্লবীর মহৎ মানবিক মহিমা, অন্যদিকে এক আপাতকঠোর নিষ্ঠুর মানুষের হৃদয়ের গভীর মহৎ প্রকাশ — নাটককে বিরল মর্যাদা দিয়েছে। নকশালবাড়ি আদর্শের এক সুন্দর শিল্পিত প্রকাশ এই নাটক।

'হমীদাবাইচী কৌঠী' (হমীদাবাইয়ের বাড়ি) সংগীত ও নৃত্যপরায়ণা বাইজীদের নিয়ে লেখা যাদের জীবনের কথা বলতে গিয়ে লেখক সমাজ সভ্যতার স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। হমীদাবাই গায়িকা, তার মেয়ে শব্বো, আর এক বাইজী সইদা প্রমুখকে নিয়ে নাট্যকার জীবনের এক ছবি এঁকেছেন, দেখিয়েছেন কিভাবে নিষ্ঠুর নির্মম সমাজব্যবস্থায় এরা এই জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় ও শেষ পর্যন্ত পণ্যাঙ্গনা হয়ে যায়, অথচ সৎ জীবনের প্রতি তাদের কি আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ থাকে। এদের ভালবাসাও প্রতারিত হয় লোভী নিষ্ঠুর পুরুষের দ্বারা নির্মমভাবে। তাই শব্বো সেঠের বাড়িতে গায়ে কেরাসিন তেল ঢেলে ওপরের দিকে তাকিয়ে নির্মম যন্ত্রণায় বলে তার কামনার কথা -- সে অর্থ সম্পদ অলংকার চায় না, চায় কেবল তাদের স্বপ্নের পূর্ণতা, জীবনের সার্থকতা।

আশির পরের মরাঠী নাট্যকাররা এগিয়ে আসছেন নতুন সম্ভার নিয়ে। এই নতুন কালের নাট্যকাররা প্রাচীন সব আদর্শ বর্জন করতে চাইলেন — সৌন্দর্য, দর্শন বা রাজনীতি বিষয়ক কোন মতবাদ দ্বারা তারা অবিষ্ট হতে চাইলেন না। তাঁদের থিয়েটারের দৃষ্টিভঙ্গী হল — A play must first and foremost be a play and the audience must see it as a play. নতুন স্রষ্টাদের মতে আগের সময়ের থিয়েটারে যথার্থ নাট্যকর্মের বদলে থাকত প্রচারময়তা। নতুন রীতির নাট্যকাররা প্রচলিত বাস্তব বা রিয়ালিষ্টিক নাটককেও গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। রাজীব নায়ক জানাছেন যে যখন তিনি এক নাটকের ওয়ার্কশাপে তাঁর 'সন্ধা' নাটকটি পড়েছিলেন তখন অংশ গ্রহণকারীরা জানতে চাইছিলেন প্রত্যেক দৃশ্যের স্থান বা সময় কি। নাট্যকার বললেন দৃশ্যটি সকালের হতে পারে, বিকেলেরও হতে পারে আবার জায়গাটা কিচেন হতে পারে বাগানও হতে পারে। তার কাছে এটা কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু এই প্রশ্নগুলো আমাকে অবাক করল যে রিয়ালিস্টিক ড্রামা এখনও আমাদের এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে আছে যে প্রচলিত রীতি পদ্ধতি বাদ দিয়ে আমরা থিয়েটারের কথা ভাবতে পারি না। (অবশ্য রাজীবের নাটকে স্থান কাল বা আসবারের বর্ণনা আছে)। নতুন প্রজন্ম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির প্রতিও বিরূপ। তবু প্রখর সামাজিক ভাবনা, ব্যক্তিমনের গভীর অনলংকৃত প্রকাশ, নিজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রভৃতি সাম্প্রতিক নাটককে বিশিষ্ট করেছে। কিন্তু পূর্বসূরীদের মত অসাধারণ সৃষ্টি করতে এরা পারেননি — একথা বোধ হয় স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

শ্যাম মনোহর (১৯৪১) বয়সের দিক দিয়ে পূর্বকালের হলেও প্রথাবিরোধিতায় নতুনের সহযাত্রী। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল 'যকৃত' (প্রথম প্রযোজনা ১৯৮৩, পরিচালক সত্যদেব দুবে; গ্রন্থ প্রকাশ ১৯৮৭), 'হৃদয়' (প্রথম প্রযোজনা ১৯৮৪, পরিচালক সত্যদেব দুবে; গ্রন্থ প্রকাশ ১৯৮৫)। 'ইয়েলকোর্ট' (ধ্বংস/বিনাশ) তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত অথচ বক্রদৃষ্টিতে মধ্যবিত্তের যৌন ভাবনার রূপ তুলে ধরে। তার 'প্রেমাচী গোস্ট?' (ভালবাসার গল্প?) মূল স্রোতের নাটক যাকে সুন্দর রূপ দিয়েছেন শ্রীরাম লাগু ও নীলু ফুলে। মধ্যবিত্তের ভাবনা ও মূল্যবোধ এবং জীবনচর্যার অসংগতিকে তুলে ধরায় শ্যাম মনোহর সার্থক। শ্যাম মনোহরের নাটকে দেখানো হয়েছে "নীরস হাসি বিদ্রূপ এবং নতুন অর্থনৈতিক নীতি-উদ্ভূত নির্লজ্জ কেরিয়ারিজম ন্যায়হীনতা এবং নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার ফাঁদে পড়া উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীলালিত নৈতিক ও যৌন মীথ"।

শফত খান (১৯৫২) ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সিদ্ধহস্ত। সঙ্গে সঙ্গে গভীর সমাজবোধও আছে। প্রাচীন আঙ্গিকের বদলে নতুন রীতিতে নাটক লিখতে সচেষ্ট। তাঁর 'ভূমিতিচা ফার্স' (জ্যমিতিক ফার্স) গত পনেরো বছরের এক অসামান্য প্রযোজনা রূপে বিবেচিত। নাটকে শফ্যত খান মানুষের অস্তিত্বকে জ্যামিতিক রূপ বা রেখা বলে মনে করেছেন — বর্গক্ষেত্র, ত্রিকোণ, বৃত্ত ইত্যাদি। গণপতি বন্দনার সময় গণেশের বদলে তার ইঁদুর আসে : প্রযোজনায় এভাবে প্রচলিত রীতি থেকে নতুনত্ব আনার প্রয়াস আছে। The conflict of interests between the dominant and the subaltern, the defied existence and workshop of ganapati and the scampering, shadow life of the mouse that he rides, became a metaphor for all hiearchies including the rigid geometrical divisions that Governed the lives of the protaganists of the play, high lighted by its withly dialogue. (Shanta Gokhale)

শফত খান-এর 'শোভাযাত্রা' তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভাবে মস্তানশাসিত আদর্শবিহীন ভারতীয় রাজনীতির রূপ তুলে ধরে। সূচনায় দেখা যায় মঞ্চে আসীন রয়েছেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী, গান্ধীজী, নেহরু, সুভাষচন্দ্র, তিলক প্রমুখ মহান ব্যক্তিরা। কিন্তু ক্রমে বোঝা যায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শোভযাত্রা বেরোবে যাতে অংশ নেবার জন্য এভাবে চরিত্রদের সাজিয়ে আনা হয়েছে। এদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দেশের চিত্র ধরা পড়ে এবং দেখা যায় এই শোভাযাত্রার দায়িত্ব নিয়েছে মাফিয়া নেতা। কিন্তু শোভাযাত্রা বেরোতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হচ্ছে ও চারদিকে হানাহানির ছবি দেখে 'ঝাঁসির রানী' ও অন্যান্যরা চলে যেতে চায়। তখন ক্রুদ্ধ মাফিয়া নেতা পাবলস বলে — "কোথায় চললেন ম্যাডাম? বাইরে আমাদের লোক দাঁড়িয়ে আছে; শালা, কে এত মাথায় তুলেছে এ মেয়েকে? কার এক্তিয়ারে এত বাড় বেড়েছে মেয়েটার? আজ আমরাই বহু চেষ্টা করে আপনাদের গায়ে এই সব পোশাক পরিয়ে দিয়েছি বলে আপনারা একেবারে নিজেদের আসল গান্ধি নেহরু ভাবতে শুরু করেছেন? এই মেয়েমানুষ তো একেবারে নিজেকে ভারতমাতা ভাবছে। আয় শালা এদিকে, তোর মত পঞ্চাশজনকে ট্রাকে চড়িয়ে নাচাতে পারি আমি"।

শফত খানের 'রাহিলে দূর ঘর মাঝে' অসগর ওয়াজহতের বিখ্যাত নাটক 'জিস লাহোর নহী দেখা ও জম্মাই নহী' অবলম্বনে রচিত এক অসামান্য শিল্প। বামন কেন্দ্রে-র পরিচালনায় নাটকটি বিশেষভাবেই সফল হয়ে ওঠে ও এক অনন্য সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হয়।

রাজীব নায়ক (১৯৫৬) তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিগত অনুভব থেকেই নাটকের বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন। বাস্তবতা বা সমাজ ভাবনার প্রচলিত প্রকাশ তাঁর নাটকে তিনি চাননি।

তাঁর প্রজন্মের নাট্যকারদের বিষয় হল the feeling of insecurity, fear, anxiety, inner turmoil that we all seem to be battling with and wihich gets reflected in diffierent ways in our work. এবং এই উৎকণ্ঠা বা অনিশ্চয়তার উৎসে পৌঁছতে তারা চেষ্টা করছেন এবং তা বুঝতেও চেষ্টা করছেন।

রাজীবের প্রথম নাটক 'অনাহত' (প্রথম অভিনয় ১৯৮৪) উপনিষদীয় ভাবনার ওপর ভিত্তি করে লেখা। 'জাতক নাটক' দুর্গা ভাগবতের অজন্তা শিল্পের ওপর এক প্রবন্ধ 'কালী রানী'র প্রতিক্রিয়ায় লেখা। 'মানুষ ঘর' ইবসেনের A Doll's House এর যেন উপসংহার। 'সন্ধা' (সন্ধি, সংযোগ, প্রথম অভিনয় ১৯৮৬, পরিচালক অজিত ভুরে, সংস্থা — অন্তরনাট্য) নাটক আজকের তরুণদের দুই রূপ বা মুখোশের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যারা বাস্তবকে এড়াতে চায়। 'অপসতল্য গোষ্ঠী' (আমাদের ছোট খাট উদ্বেগ) সাধারণ মানুষ ও তাদের হৃদয়ধর্মের কথা ব্যক্ত করে। মানুষের অন্তরনিহিত নিঃসঙ্গতা ও অনিশ্চয়তার প্রকাশ এখানে আছে। তার 'আখেরচা পর্ব' (শেষ অধ্যায়) মহাভারতের চরিত্রগুলিকে তিন ভাবে বিচার করার চেষ্টা করে — সামাজিক ঐতিহাসিক ও নান্দনিক ভাবনায়। নাটকটি পরিচলনা করেন রাকেশ সরং। 'সাথেচ কায় করায়চে?' (সাঠেকে নিয়ে কি করা যায়? ১৯৯৬) অভয় নামক এক হীনমনা পরের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ বিকারগ্রস্ত মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। তার বন্ধু বা সহকর্মীদের প্রতি তার প্রবল ঈর্ষ্যা ও বিরাগ। নাটকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়েছে অভয়ের স্ত্রী সালমা যে বিধর্মীকে বিয়ে করেছে (যদিও নাটকে কোন ধর্মদ্বেষের কথা নেই) এবং পরশ্রীকাতর ঈর্ষ্যা- পরায়ণ স্বামীর সমস্ত পাপ আর অন্যায় সে গ্রহণ করে নিজেকে আর উজ্জ্বল করে তুলেছে। মহেশ এলকুঞ্চওয়ার এই নাটককে একমাত্রিক ও উচ্চ শিল্পমূল্যযুক্ত নয় বলে মনে করেও বলেছেন — It has power and it is eminently theatrical. What holds it together is intensity of its passion and its super dialogue which is taut, psychologically charged and yet has a tremendous natural ring to it. (Theatre India, Nov. 2000, New Delhi).

'থোমব্যা' (মাথামোটা, প্রকাশ ১৯৯৮) এ সময়ের খন্ড সমাজে প্রবেশ করে। আজকের প্রতিবেশে চিন্তা ও কর্ম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, বস্তু ও তার প্রতিছবি, বাসনা ও অবসাদের অসম্পূর্ণতার ভগ্ন চিত্র।

তুষার ভদ্রে (১৯৫৯) প্রচলিত রীতি থেকে সরে এসে অখ্যাত অনামী জাতির জীবনযাত্রার অসহ্য দুঃখবেদনাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকের সংখ্যা অল্প কিন্তু ভারতবর্ষের অবহেলিত ব্রাত্য মানুষদের চিত্রণে তারা আন্তরিক ও তৎপর। মুম্বাই-এর মূল শহর থেকে দূরে মাতারা মফঃস্বল এলাকাতেই তার নাট্যসাধনা চলেছে। প্রথম দিকের বিশিষ্ট একাংক 'দৌরা' (যাত্রা বা ভ্রমণ)। এই সব নাটকে দেখানো হয়েছে কীভাবে রাজনৈতিক নেতারা বেকার যুবকদের ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থের জন্য। 'ভকওয়ান' (ভগবানের কাছে মানত) একটা মন্দিরকে মাঝখানে রেখে গ্রামের দুই গোষ্ঠীর রাজনীতির লড়াই। নাটকে প্রশ্ন ওঠে — মানুষের দেবতাকে কি রাজনীতিবিদরা নিয়ন্ত্রণ করবে? সাধারণ মানুষের রাজনীতিবিদদের ওপর বিশ্বাস নেই কিন্তু মন্দিরের ওপর আছে — তাদের ভূমিকা কী হবে? রাজনীতিবিদরা যদি মন্দির বা ভক্তদের চালায় তাহলে বিশ্বচালনায় রাজনীতিবিদদের পেছনে আর কি কোন শক্তি আছে? সংক্ষেপে, ভগবানের কি অস্তিত্ব আছে?

তুষার ভদ্রের বিখ্যাত নাটক 'করণ' (১৯৮৭, ভূত ঝাড়ার মন্ত্র) অন্ত্যজ দলিত মানুষদের নির্মম বেদনার চিত্র তুলে ধরে। 'উৎখনন' (খনন) বামপন্থার অবক্ষয়ের চিত্র। 'গজর' (দেবতার নাম ধরে ডাক) হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করতে চায় এবং মানবতার মহামন্ত্র উচ্চারণ করে। নাটকটি ১৯৮৬ তে মঞ্চস্থ হয়। তাঁর 'মচ্ছর নির্মূলন' (মশা বিনাশ) দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে কেন্দ্র করে লেখা। 'আমহালা কাহিহী মহনায়াচ নাহী' (আমরা কিছু বলতে চাই না) ভাল মানের নাটক। তার একাংক 'বর্তমান'-এর বিষয় সন্ত্রাস ও ভীতি মনোবিকার যা আজ সমাজে সর্বত্র দেখা যায়।

প্রশান্ত দলভী (১৯৬১) মরাঠী নাটকের মূল স্রোতের কাছে নত না হয়ে নিজের মত করেই নাটক লিখে গেছেন। বস্তাপচা আবেগ বা ভাবালুতার পরিবর্তে, তথাকথিত সমাজ সমস্যার বদলে তিনি জীবনকে নতুন ভাবে দেখেছেন ও বিচার করেছেন। তাদের পরিবার ছিল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুকূল যা তাকে নাট্যকর্মের দিকে আকৃষ্ট করে। তার প্রথম দিকের নাটক 'গল্লি' সমাজ-চেতনার পরিচয় দেয। 'স্ত্রী' (১৯৮৩) লেখেন পথ নাটকরূপে যা সমাদৃত হয। এই নাটক পণপ্রথা ধর্ষণ ইত্যাদি প্রচলিত বাস্তববাদী নাটকের বিষয় আলোচিত হয়নি, তাদের সামাজিকীকরণের (socialization) পথে নারীদের ওপর 'নারীত্ব' যে ভাবে আরোপ করা হয় তা বলা হয়েছে ('My play was about the way 'womanness' was imposed on women in the process of their socialization' Play wright at the Centre-Shanta Gokhale, P-391).

'পৌগন্ড' (বয়ঃসন্ধি) নাটকে বয়ঃসন্ধিকালের তরুণদের মানসিক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বোধের কথা বলা হয়েছে। এই বয়সের তরুণদের এক বিশেষ প্রবণতা hero-worship বা বীরপূজার চিত্রও নাটকীয় ভাবে আনা হয়েছে যা এদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। এই নাটকটিও অভিনীত ও সমাদৃত হয়। 'চার চৌঘী' (সাধারণ মেয়েরা) নাটকের প্রথম অভিনয় হয় পুণেতে চন্দ্রকান্ত কুলকার্ণীর পরিচালনায় ১৯৯১ সালে, প্রকাশকাল ১৯৯১। নাটকটি নর-নারীর সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে লেখা তত্ত্বনাটক — ঘটনার ঘনঘটার বদলে তর্ক-বিতর্কই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য নারীস্বাধীনতার বিষয় উৎকট হয়েছে কখনো। 'ধ্যনি মণি' (হৃদয় ও মন) এক নারীর দত্তক পুত্র গ্রহণের কথা। এখানেও মাতৃহীনা নারীর বেদনা ও ব্যাকুলতা নয়, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ জীবনের ছবি পাওয়া যায়।

'চাহুল' মঞ্চস্থ হয় ১৯৯৮ সালে চন্দ্রকান্ত কুলকার্ণীর পরিচালনায়। প্রকাশ সন ১৯৯৯। এই নাটকও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম; এতে প্লট নেই, আছে কেবল আলোচনা ও তর্কবিতর্ক এক তরুণ দম্পতির মধ্যে। নাটকের বিষয় হল এ সময়ের প্রবল ভোগবাদ যা মানুষকে পণ্যে পরিণত করছে এবং সবাইকে বিস্মিত করে নাটকটি মঞ্চে বিপুল সমাদর লাভ করেছে।

মকরন্দ সাঠে (১৯৫৭) উত্তর আধুনিক সমাজের মানুষের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন; অনন্ত ব্যাপ্ত সময় চেতনাকে ক্ষণিক বা কালিক বোধে সংবৃত করতে চেয়েছেন যা বিপণনমুখী আধুনিক সমাজের প্রতিভূ। তিনি প্রথমে তিনটি একাংক লেখেন — 'বাস স্টপ' 'ওয়াড়ধিবম' (জন্মদিন) ও 'ঘর' যেগুলি বাস্তব হয়েও অনেকটা অধিবাস্তবধর্মী। এগুলি ১৯৮৯এ প্রকাশিত হয়। 'চারশে কোটি বিসরভোলে' (চার বিলিয়ন বা লক্ষকোটি বিস্মরণ) অভিনীত ও প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। 'The concept of time as currency on all levels, from time in daily life to psychological and meta-

physical time' বিষয়টি নাট্যকারকে আলোড়িত করেছে অনেকদিন ধরে এবং তাকেই তিনি নাটকে রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি অনন্ত সময়কে বুঝতে চেয়েছেন। সময় অনন্ত কেন? খ্রিস্টীয় মতে সময়ের শুরু আছে শেষ নেই; বিজ্ঞান মতে তা হল বৃত্তাকার, হিন্দু মতে তা হল অনাদি অনন্ত। এই প্রশ্ন একে অন্যকে ছেদ করে। আমাদের পুরাণের চরিত্রগুলোর কি রূপ যারা অমররূপে পরিগণিত? অমর ও অনন্তর তফাত কী। সামাজিক বিচারে যদি সময় মানে অর্থ, তাহলে কে ধনী কে দরিদ্র? এমন সমাজের শক্তি বিন্যাস কেমন হবে? মকরন্দ সাঠের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'চারশে কোটি বিসরভোলে' এই বিষয়কেই নাট্যরূপয়িত করে।

'আয়ীস পায়ীস সোইনে বাইস' (যেমন ভাল লাগে তেমন করে বস) তার রীতি থেকে ব্যতিক্রম বাস্তববাদী নাটক। যে সামাজিক ও মননশীল প্রতিবেশে আজকের মানুষ থাকে নাটকটি তারই প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ। 'সপতনেকরনচে মূল' (১৯৯৮) নাটক বিভিন্ন স্তরে সত্য ও মিথ্যার দ্বৈততার প্রশ্নে আবর্তিত হয়েছে, সাধারণ শঠতা থেকে চূড়ান্ত জ্ঞানতত্ত্বীয় সত্য ও মিথ্যা পর্যন্ত। নাটকের সেটে আলোক দ্বারা ভেদ্য কিন্তু অস্বচ্ছ পর্দা এবং আয়না আছে এবং উল্লম্ব বা খাড়া মঞ্চস্থান ব্যবহার করা হয়েছে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য। নাটকে ক্লাউন আছে যারা ওপর থেকে মঞ্চে ঢোকে। কখনো তাদের পা দেখা যায় স্ক্রীণের নীচে এবং রঙচঙে মুখ ওপরে আসে।

মকরন্দ সাঠের 'সূর্য পহিলেলা মানুষ' (যে মানুষ সূর্য দেখেছিল) সক্রেটিসের জীবন ও কর্মের ওপর আধারিত। সক্রেটিস চিরকাল সত্যের সাধনা করেছেন এবং সত্যনির্ভর জীবনদর্শকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক রাজনৈতিক মত ও বক্তব্যকে তিনি সত্যের নিরিখেই বিচার করতে চেয়েছিলেন। তার এই 'সত্য' আদর্শকে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী বিপজ্জনক বলে মনে করতেন, কিন্তু সৎ জ্ঞানবান মননশীল সক্রেটিসের সঙ্গে তারা কোনদিনই পেরে ওঠেননি। পরিণামে সক্রেটিসের জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজেডি তাকেও এই সূর্য সন্ধানী মানুষটি নির্বিকারভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই মহাজীবন কথা অসাধারণ নাটকে রূপায়িত করেছেন মকরন্দ সাঠে যা অতুল পেঠের পরিচালনায় বিস্ময়কর মঞ্চসাফল্য অর্জন করে। পুণে মুম্বাই কলকাতা দিল্লী ইত্যাদি স্থানে এটি মহাসমারোহে মঞ্চস্থ হয়। শ্রীরাম লাগু-র অসাধারণ অভিনয় এই নাটকের বিরল সম্পদ। নাটকে প্লেটোর রচনার বিশেষ প্রভাব আছে।

দেবেন্দ্র প্রেম-এর 'অল দি বেস্ট' অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক। এক নারীর প্রতি তিন প্রতিবন্ধী যুবকের আকর্ষণীয় হাস্যরসাত্মক কাহিনী। একজন কালা একজন বোবা ও একজন অন্ধ একই মেয়েকে ভালবাসে। প্রত্যেকেই তাকে প্রেম নিবেদন করে বন্ধুদের না জানিয়ে এবং মেয়েটাকেও তারা বুঝতে দেয় না যে তারা প্রতিবন্ধী। নাটকটি কয়েক হাজার রজনী অভিনয় হয়েছে।

প্রদীপ দলভী-র 'মী নাথুরাম গডসে বোলতোয়' (আমি নাথুরাম গডসে বলছি) অত্যন্ত বিতর্কমূলক রাজনৈতিক নাটক যা মরাঠী রঙ্গভূমিকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম বিনায়ক গডসে এই নাটকের প্রধান চরিত্র যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ও গান্ধীজীর মর্যাদাকে অনেকটাই ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস আছে। নাটকে গডসে গান্ধীজীর অহিংসা নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে — এ কী ধরনের অহিংসা? যখন হিন্দুদের নিধন করা হয় তখন আমাদের চুপ করে থাকতে বলা হয়। হত্যাকান্ড চলতে দেওয়াই হিংসা, তা অহিংসা নয়। এক উদ্বাস্তু হিন্দু পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ আছে —

তাদের বাবা আমাকে মরা ছেলের রক্ত দেখাল; বলল, পরের বারে গান্ধীজী যখন অনশন ভাঙবেন তিনি যেন মোসাম্বির রস না খান, তিনি যেন খান আমার ছেলের ......। নাটকটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। ভিন্ন ভাব ও রীতির দ্বারা মরাঠী নাটক সমৃদ্ধ হচ্ছে। **দিলীপ চিত্রে** নাট্যরচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট হল 'মিঠু মিঠু পোপট' (মিষ্টি মিষ্টি টিয়া)।

গজেন্দ্র আহের-এর 'আযিচ ঘর উনহাত' (মায়ের ঘর রোদ্দুরে), ১৯৯২ সালে উৎকৃষ্ট নির্মাণ ও যোজনার জন্য নাট্যদর্পণ পুরস্কার পান এই নাটকের পরিচালক বিজয় জোষী। নারী স্বাধীনতা এই নাটকের বিষয়। নাটকের দৃশ্য ক্ষমা ও দেবেনের ছোট সাজানো ফ্ল্যাট। ক্ষমা চাকরি করে ও তাতে উন্নতি করতে চায়। তার স্বামী দেবেন ইঞ্জিনিয়ার হলেও সাংসরিক ব্যাপারে সময় দিতে পারেনা ফলে অশান্তি বাড়ে। পাশের ফ্ল্যাটে থাকে রাধা ও তার স্বামী এবং রাধা তার স্বামীর দ্বারা নিপীড়িত হয়। ক্ষমা তার স্বামীর সাহায্যে করা একটি প্রজেক্ট জমা দিয়ে প্রশংসিত হয় ও বিদেশের আমন্ত্রণ পায়। নারী জীবনকে কেন্দ্র করেই মূলত নাটক লেখা।

লক্ষ্মণরাও দেশপাণ্ডের লেখা 'বরহাড নিধালয় লণ্ডণলা' (বরযাত্রী লণ্ডনে চলল) হাস্যরসাত্মক নাটক যাতে এক সাহেব পাত্রের সঙ্গে এক মরাঠী মেয়ের বিয়ে ও সবাই লণ্ডনে যাবার কথা বলা হয়েছে। **জয়ন্ত পাওয়ার**-এর 'অধান্তর' (ঝুলন্ত বা মাঝখানে যারা আছে) মিল শ্রমিকদের জীবন নিয়ে লেখা। **সৌরভ পারেখ** 'থ্রী চিয়ার্স' কলেজ র‍্যাগিং নিয়ে লেখা। **সুরেশ চিখলের** 'গোলপিঠা' পতিতাদের নিয়ে মর্মস্পর্শী কাহিনী। ভাল নাটক লিখছেন **অভিরাম ভড়কম কর** ('যাচ্যা যাচ্যা প্রশ্ন' — আপন আপন সমস্যা, 'জাল্লি তুঝি প্রীত' — প্রেম চুলায় যাও) **ডঃ রঞ্জন দরভেকরের** 'অস ঝলস কস' (এটা কি করে হল) এডস রোগকে নিয়ে লেখা উচ্চমানের নাটক। **রণজিত দেশাই**ও বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছেন। তিনি অনেক নাটক লিখেছেন ও তারা প্রযোজিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিষয় নিয়ে মহারাষ্ট্র কখনো কখনো উত্তাল হয়ে ওঠে। নাট্যকাররা সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন ও এই সংকটকে রোখার চেষ্টা করেন। **অশোক পাটোলে** রচিত 'জ্বালামুখী' সমস্যা সংকুল কাশ্মীরের পটভূমিকায় লেখা। কর্মহীন তরুণ সমাজের মোহভঙ্গ ও হতাশা, ধর্মীয় প্রধানদের মগজ ধোলাই করার প্রয়াস, পাকিস্থান থেকে অনুপ্রবেশ — অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত। জাতীয়তাবাদী মুসলমান অধ্যাপকের দেশপ্রেম ও ভারতবর্ষের পতাকা উঁচুতে তুলে ধরার প্রবণতা সুন্দর। নাটকটি পরিচালনা করেন চন্দ্রকান্ত কুলকার্ণী, বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন, প্রভাকর পণশীকর, সন্দীপ মেহতা, চিন্ময়ী সুর্বে প্রমুখ। **কিরণ নগরকর** রচিত 'কবীরাচ কায় করায়চ' (কবীরকে কি করতে হবে) দেখানো হয়েছে কবীরই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক। এক বস্তি অঞ্চলে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ এক সঙ্গে বাস করে। দাঙ্গা ও রক্তপাতে মানুষের মধ্যকার ঐক্য নষ্ট হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধির প্রকাশ ঘটে।

আলোচ্য নাট্যকারগণ নতুনরীতির প্রবক্তা রূপে সম্মানীয়।

চেতন দাতার (১৯৬৪) নব্যরীতির নাট্যকার হলেও সূচনাপর্বে বসন্ত কানেটকর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তেন্ডুলকর এবং এলকুঞ্চওয়ারের বাস্তবতা তাঁকে পরবর্তী কালেও প্রভাবিত করেছে। চেতনের 'জুলভা' (এক ধর্মাচরণ যাতে একজন লোক কোন জোগতি বা দেবতার কাছে নিবেদিত নারীকে রক্ষিতা রূপে রাখতে পারে) উত্তম বান্ডু টুপে-র উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে লেখা। 'সভল্যা' (ছায়া; প্রথম অভিনয় ১৯৯১, পরিচালক

সত্যদেব দুবে, সংস্থা — আবিষ্কার) এক তীব্র বাস্তববাদী নাটক। তিন বোন নিম্ন মধ্যবিত্তের আবাসে থাকে তাদের মাতামহীর সঙ্গে। এদের বাবার সঙ্গে মাতামহীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল একদা। কিন্তু তা জানাজানি হওয়া বাবা লজ্জায় গৃহত্যাগ করে, মা গায়ে আগুন লাগিয়ে মরে। এরা এখন মাতামহীর সঙ্গে থাকে যে এদের সযত্নে দেখাশোনা করে। প্রত্যেক মেয়েই ভাবে একদিন সে কিছু করবে এবং এখান থেকে পালাবে। নাটকটি মঞ্চে জনপ্রিয় হয়। তার 'রাধা বজা রাণাডে' (রাধা ছাড়া রাণাডে) পৃথ্বী থিয়েটার ফেসটিভ্যাল-এ মঞ্চস্থ হয় ৬ নভেম্বর ১৯৯৯। মহারাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত সমাজের ভোগপণ্যবাদী মানুষদের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ওপর ভিত্তি করে নাটকটি রচিত হয়েছে।

সুষমা দেশপান্ডে (১৯৫৫) দুটি নাটক লিখেছেন যেগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। সাবিত্রীবাঈ ফুলে এবং তমাশা-র মেয়েদের নিয়ে লেখা নাটক দুটি অত্যন্ত জীবন্ত ও আন্তরিক। দলিত সমাজের মানুষ মহান সমাজ সংস্কারক জ্যোতিবা ফুলের স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলেও এক অনন্য সাধারণ নারী। এই মহিয়সী নারীর জীবন নিয়ে লিখেছেন এক সংলাপী নাটক 'হোয় মী সাবিত্রীবাঈ' (হ্যাঁ, আমি সাবিত্রীবাঈ) যাকে সুষমা অভিনয়েও সুন্দর ফুটিয়েছেন। নাটকটির অজস্র অভিনয় হয়েছে। তমাশা-র মেয়েদেব দুঃখকষ্ট বেদনাকে নিয়ে তিনি লিখেছেন 'তীচ্যা আঈচি গোষ্ট' (মেয়েটির মায়ের গল্প) যেটি লেখিকার গবেষণা বিদ্যানুরাগ ও গভীর মানবিক বোধের পরিচয় বহন করে।

মহারাষ্ট্রে **দলিত আন্দোলন** বেশ জোরদার। অবহেলিত লাঞ্ছিত ব্রাত্য মানুষরা যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত নিপীড়িত হয়েছে। এবার তাদের জেগে ওঠার পালা। তাই দলিত আন্দোলন প্রবল এবং দলিত সাহিত্যও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। নাট্যকাররাও এগিয়ে আসছেন নতুন সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে যাতে একদিকে দলিত মানুষদের জীবনেব প্রবল দুঃখবেদনাময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং অন্যদিকে তাদের জাগরণ ও অধিকার অর্জনের কথাও বলা হয়েছে। দলিত নাট্যআন্দোলন চলছে দীর্ঘদিন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাত্মা **জ্যোতিবা ফুলে** জীবনচর্যায় ও সাহিত্য প্রয়াসে দলিত আন্দোলনের সার্থক সূচনা ঘটান। দলিত মানুষদের ও নারীদের শিক্ষা প্রসারে ও চেতনার বিকাশে তাঁর প্রয়াসে গান ও পাঠের নাটকীয় রূপ 'জলসা' অত্যন্ত কার্যকারী হয়েছিল। তাঁর 'তৃতীয় রত্ন' নাটক খ্যাতি পায়। পরে বাবাসাহেব আম্বেদকরের ভাবনায় উদ্দীপিত শক্তিশালী নাটক লেখা হয়েছে দলিত আদর্শ নিয়ে। তারপর এল সাম্প্রতিক কাল।

নাগপুরের **কমলাকর দাহাত** 'নরবল্ল' (মানুষের নিপীড়ন) নামে একটি নাটক লেখেন সাতের দশকে। দলিতদের ওপর পীড়নের সত্য ঘটনা নিয়ে নাটক লেখা যা নিয়ে বিতর্ক ওঠে। মহারাষ্ট্র সরকার নাটকটি নিষিদ্ধ করে। ১৯৭৮এ শ্রী দাহাত আর একটি নাটক লিখলেন 'মৃতুদিন'/'মুক্তিদিন'। মারাঠওয়াদা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন নিয়ে মারাঠওয়াদাতে দলিতদের ওপর মরাঠীরা বর্বর অত্যাচার করে। এটাই নাটকের বিষয়। নাটক শেষ হল স্বাধীনতার মৃত্যু ঘোষণায়। এই নাটক ৩০০রও বেশী বার অভিনীত হয়। পুণার **টি গায়কোয়াড়** রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও তার কার্যকলাপ নিয়ে নাটক লেখেন ও শাসানি সত্ত্বেও গায়কোয়াড় ও তার দলিত বন্ধুরা নাটকটি পুণায় ও অন্যত্র অনেক অভিনয় করেন। (ঐকতান গবেষণা পত্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, কলকাতা)। ড. বিপ্লব চক্রবর্তী বলেছেন — "দলিত সাহিত্যের চারটি প্রধান লক্ষণ হল আত্মজ্ঞান, আত্মশোধন, ঘৃণা ও বিদ্রোহ। এই সব লক্ষণ ও ভাব দলিত নাটকেও ফুটে উঠতে দেখা যায়"। মরাঠী দলিত নাটকেও তাই দেখা গেছে। কয়েকজন আধুনিক দলিত নাট্যকারের পরিচয় দেওয়া যাক।

প্রেমানন্দ গজভী (১৯৪৭) তাঁর নাটকে দলিত ও ব্রাত্য মানুষদের শোষণের নিখুঁত ছবি ফুটিয়েছেন। 'দেবনবরী' (দেবতার বধূ, ১৯৮১) নাটকে দেবদাসীদের সমস্যা-সংকট তুলে ধরা হয়েছে। দেবদাসীরা যৌন অত্যাচারের শিকার হয় যে পাপ করে পুরোহিত ও জমিদার শ্রেণী। নাটকের প্রধান চরিত্র দ্রৌপদী যে ভালবাসে পান্ধারী-কে। পান্ধারীও শিশুকাল থেকে দেবী ইয়েল্লাম্মা-র মন্দির আশ্রিত। গ্রামের শক্তিশালী ব্যক্তিরা দ্রৌপদীকে শারীরিক অত্যাচার করে; দ্রৌপদী ও পান্ধারী এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই পান্ধারীকে ছুরি মেরে হত্যা করে এক ব্যক্তি যাকে দ্রৌপদী অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। ক্রুদ্ধ দ্রৌপদী আক্রমণ করে খুনীকে ও পুরোহিতকে সেই অস্ত্র দিয়ে যা গান্ধারীকে হত্যা করেছিল। তারা পালায়, ক্রুদ্ধ দ্রৌপদী মন্দিরে ঢোকে, দেবীর মুকুট ভেঙে ফেলে। গ্রামবাসীরা মন্দিরের বাইরে সমবেত হয়ে দেখে দ্রৌপদীর ভীষণ মূর্তি –– এক হাতে ছুরি অন্য হাতে দেবীর ভাঙা মুকুট। গজভীর 'ঘোটভর পাণী' (এক চুমুক জল) দেখিয়েছে বর্ণ হিন্দুদের অমানবিক অপমানে ও শোষণে নীচুতলার মানুষ পিপাসায় কাতর হলেও এক ফোঁটা জল পায় না। তাঁর আর এক নাটক 'কীরওয়ান্ত' (যারা মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া করে) শ্মশানের ক্রিয়াকর্মকারী মানুষদের জীবনের রূপ তুলে ধরে। সাধারণত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এক গোষ্ঠী সমাজের অতি প্রয়োজনীয় এ কাজ করে কিন্তু ব্রাহ্মণরা তাদের চ্যুত বা পতিত করে দেয়। এই কীরওয়ান্তরাও অপমান লাঞ্ছনায় দিন কাটায়। তারাও যেন নির্যাতিত দেবদাসী! গজভীর 'বেঠবিগর' (মুচলেকাবদ্ধ) শর্তবন্দী ক্রীতদাসদের করুণ জীবনচিত্র তুলে ধরে। সভ্য সমাজ এদের যন্ত্রণা কল্পনা করতেও পারে না। এরা খাবার পায় কীভাবে? তারা গোশালা থেকে গোবর চুরি করে, গোরুদের না চিবানো গম ও শস্যের দানা ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপর সে সব থেকে আটা করে খাবার তৈরি করে। এই নাটককে নাট্যকার পূর্ণাঙ্গ করেন, নাম — 'তনমজোরী' যেটিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নাটকটি ইংলন্ডেও যায়। নানা পটেকরের অভিনয় নাটককে আরো প্রতিষ্ঠিত করে। ''জয় জয় রঘুবীর সমর্থ'' (১৯৮৭) রামদাস স্বামীর ভাবনার ওপর আধারিত। নাটক আচার্য নামক একটি চরিত্র আছে যে রামদাস স্বামীর আদলে গড়ে উঠেছে। নাটকে প্রথাবদ্ধ ধর্মের প্রয়োজনীয়তার ওপর প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং তার প্রাথঙ্গিকতার বিষয়ও পর্যালোচিত হয়েছে। 'গান্ধী আণি আম্বেদকর' দুই বিশিষ্ট পুরুষের তর্কের ও আলোচনার মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হবার প্রয়াস আছে। যদিও নাট্যকার শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। নাটকে একটি বিদূষক চরিত্র আনা হয়েছে যে ওদের প্রশ্ন করে, উত্যক্ত করে, মুখোমুখী দাঁড় করায়। নাটকটি মঞ্চস্থ করে চিন্তামণি, লতা নরভেকর-এর সংস্থা এটি, পরিচালক চেতন দতর এবং বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী ভক্তি বর্বে ইনামদার।

প্রকাশ ত্রিভুবন 'থাম্বা রামরাজ্য য়েতাই' (দাঁড়াও রামরাজ্যে আসছে) নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর লঘুত্ব দেখিয়ে সাধারণ ব্রাত্য মানুষের কথা বলেছেন। তার 'এক হোতা রাজা' (এক যে ছিল রাজা) দেখায় এক সময় জমির মালিক ছিল দলিতরা, কিন্তু তথাকথিত উচ্চবংশের মানুষরা তা অধিকার করে নিয়েছে। 'আম্বেদকরী জলসা' রচিত হয় আম্বেদকরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। বাবা আম্বেদকরের শিক্ষাকে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌছে দেবার আদর্শে নাটকটা লেখা। মহারাষ্ট্র লোকনাট্য তমাশা রীতিতে এটি উপস্থাপিত। শিক্ষার প্রসার ও গুরুত্ব, ছুৎ-অচ্ছুৎ সংকট, দলিতদের মন্দির প্রবেশ ইত্যাদি বিষয় এতে আছে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন স্বয়ং নাট্যকার প্রকাশ ত্রিভুবন; প্রযোজক সংস্থা দলিত থিয়েটার ঔরঙ্গবাদ।

কিষান ফাগু বনসোড়ে ভক্ত দলিত কবি সন্ত চোখমেলাকে নিয়ে নাটক লিখেছেন যাকে ব্রাহ্মণরা আপাত লাঞ্ছিত ও অপমানিত করলেও অবনমিত করতে পারেননি।

গঙ্গাধর পন্তাওনে রচিত 'মৃত্যুশালা' নাটকের বিষয় এই যে হিন্দুসমাজের প্রচলিত ব্যবস্থায় মৃত্যুর পরও ধর্মীয় শাসন অব্যাহত থাকে। **দত্ত ভগত** (১৯৪৫) দলিত ভাবনার যথাযথ নাট্যরূপ দিয়েছেন 'আবর্ত' 'খেলিয়া' প্রভৃতি নাটকে। তাঁর 'ওয়াটা পড়ওয়াটা' (সংকট ও মুক্তি) নাটকে প্রায় তিন প্রজন্মের মধ্য দিয়ে দলিত জীবনের কথা বলা হয়েছে। আম্বেদকরের সহযোগী দলিতদের জন্য লড়াকু মানুষটা এখন বৃদ্ধ; তার কৃতিপুত্র সতীশ গড়ঘাটে কলেজ শিক্ষক, সে ব্রাহ্মণ মেয়ে হেমাকে বিয়ে করেছে। তার দলিত ছাত্র অর্জুন যাদব এক ক্রুদ্ধ রাজনৈতিক কর্মী সে যেকোনভাবে উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায় — সে দলিত প্যান্থার ও 'বর্ণহিন্দুরা নিপাত যাক' মতবাদে বিশ্বাসী। নাটকে দলিত রাজনীতির দুই গুরুত্বপূর্ণ মত তুলে ধরা হয়েছে সতীশ ও অর্জুনের মধ্য দিয়ে। **অধ্যাপক অচলস্মর** 'কৈফিয়ৎ' নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে দলিত জীবনকে তুলে ধরেছেন। বিশিষ্ট নাট্যরীতি একসংলাপী 'নাট্যচ্ছটা'র মধ্য দিয়ে **দিবাকর** প্রকাশ করেছেন দলিত জীবনের আদর্শ।

৫. বাংলা ও মরাঠী নাটক : পারস্পরিক সম্পর্ক

১. সূচনা ঃ

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাংলার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রেনেসাঁসের ভাবনায় সমুদ্ভাসিত জীবন বোধ, সমাজসচেতনা ও ধর্মসংস্কার দুদেশেই চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল বোম্বাই দেশে কাটিয়েছিলেন চাকুরীর সূত্রে এবং তিনি 'বোম্বাই চিত্র' (১৮৮৯) গ্রন্থে লিখেছিলেন — 'আমি তো বোম্বাইকেই নিজের দেশ মনে করি।' সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ছিল মিল। নাটককে অবলম্বন করেও এই দুই প্রদেশ পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে।

২. প্রথম পর্যায় ঃ

বর্তমান শতাব্দীর একেবারে প্রথম থেকেই বাংলা নাটকের সঙ্গে মরাঠী নাটকের যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট' মরাঠীতে অনুবাদ করেন কৈ. বা. ন. ভাবে। অমৃতলালের 'তরুবালা' 'বিমাতা' বা 'বিজয়বসন্ত' অনূদিত হয়। সবই শতাব্দীর প্রারম্ভেই। এর অনেক আগে অনূদিত হয়েছে 'নীলদর্পণ'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী নাটক' অনুবাদ করেন নরসিংহ চিন্তামন কেলকর ১৯০১ সালে বাংলা থেকে। হরনাথ বসুর নাটকও অনুবাদ হয় ১৯১৬ তে। অচ্যুত বলবন্ত কোলহাটকর স্বামী বিবেকানন্দর জীবন ও আদর্শ নিয়ে লেখেন পাঁচ অংকের নাটক 'স্বামী বিবেকানন্দ' ১৯১৪ সালে।

৩. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নাট্যকার ও মরাঠী নাটক ঃ

বাংলার মত মরাঠীতে ঐতিহাসিক নাটকের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। এবং এ বিষয়ে কোন কোন বাংলার ক্ষেত্রে প্রভাব বা ভাবনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন ১৯০৪ সালে বা. পু. শাঠে লেখেন 'শ্রীশিবছত্রপতি'— 'নাটক কী কথা বঙ্গলা উপন্যাস পর

আধারিত হ্যয় ঔর শিবাজী কে আগ্‌রে কী ঔরংজেব কী কয়েদ সে মুক্তি পানে কে প্রযত্ন সে সম্বন্ধ রখতী হ্যয়''।[১৮] রমেশচন্দ্র দত্তর উপন্যাস এর ভিত্তি।

শ্রীমতী গিরিজবাই কেলকর যোড়শ শতকেব পটভূমিকায় লেখেন 'আয়েযা নাটক' (১৯২১)। এখানে আয়েযা জগতসিংহ তিলোত্তমা ওসমান খাঁর কাহিনী নাট্যরূপে পেয়েছে। এই নাট্য কথা বাংলাব প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর সমরূপ।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকার ভারবর্ষের বীরদেব নিয়ে উচ্চমানের নাটক রচনা করেছেন। মরাঠীতেও তা দেখতে পাওয়া যায়। বিশিষ্ট লেখক নরসিংহ চিন্তামন কেলকর বাংলা জানতেন। ১৯১৩ তে লেখেন তিন অংকেব ঐতিহাসিক নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' যার অন্যতম বিষয় হল (নন্দবংশ ধ্বংসকারী) চাণক্য কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তর কাছে নন্দবংশের শেষ উত্তবাধিকাবী হরনন্দর শির চাওয়া ও চন্দ্রগুপ্তর চাণক্যকে গুরুদক্ষিণা দান। হ.কৃ. কুলকর্ণী লেখেন 'প্রতাপী প্রতাপসিংহ নাটক' (১৯২৪) যেটা বাংলা নাটককে মনে করায়। 'বঙ্গনারী' অবলম্বনে ন. চি. কেলকর লেখেন 'বাহবারে বিদ্বান'।

৪. রবীন্দ্রনাথ ও মরাঠী নাটক ঃ

অ. ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে মহারাষ্ট্রেব গভীর যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রদেশে গেছেন অনেকবাব। তিনি মরাঠী সাহিত্যের রস আস্বাদন করেছেন, মহাবাষ্ট্রের বীর ও বীবনারীদের নিয়ে উচ্চমানের কথিকাদি রচনা কবেছেন, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'রাজা ও রাণী' প্রভৃতি নাটক মহারাষ্ট্রে বাসকালে লিখেছেন। মরাঠী লোকগীতির উপাদান নিয়ে লিখেছেন নাট্যকাব্য 'সতী'। রবীন্দ্র সাহিত্য মহারাষ্ট্রে সমান ও মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত, বিশেষ কবে নাটকের মধ্য দিয়ে দুইয়ের নৈকট্য সাধিত হয়েছে অনেকখানি।

আ. রবীন্দ্রনাটকের মরাঠী অনুবাদ ঃ

মরাঠীতে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের নাটক অনুবাদ করেন শিবরাম গোবিন্দ ভাবে 'মুক্তধারা' ১৯২৪ সালে। কৃষ্ণজী লক্ষ্ণণ সোমন (ছদ্মনাম কিরাত) 'মুক্তধারা' অনুবাদ করেন ১৯২৬-এ। মামা ওয়ারেরকরও এইটি অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাটকের অনুবাদ করেন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী **আচার্য ভাগবত** বা সদাশিব জগন্নাথ ভাগবত। ইনি পুনার কাছে গান্ধী আশ্রমের প্রধান ছিলেন। ভাল বাংলা জানতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে জেলে গেছেন। জেলে অনেককে বাংলা শিখিয়েছেন। ''আচার্য ভাগবত অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন নাট্যকাব্য — গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ, বিদায় অভিশাপ। আচার্য ভাগবত অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই অনুবাদগুলি করেছেন যা অপরূপ সৌন্দর্য নিবিড়। তিনি সেই বিরল মরাঠী যিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের আন্তরিক নিষ্ঠাবান পাঠক।''[১৯] রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্প মরাঠীতে নাটক হয়েছে একাধিকবার ও তাদের অভিনয়ও হয়েছে। হনুমন্তরাও গো মোরে 'কাবুলিওয়ালা' অনুবাদ করেন ও ১৯৫৫ সালে এর অভিনয় হয়। পরিচালনায় ও কাবুলিওয়ালার ভূমিকায় ছিলেন মোরে স্বয়ং। নাটকে পাত্রদের পরিচয় দিতে গিয়ে নাট্যকার জানিয়েছেন —

''ধন্য! ধন্য তে রবীন্দ্রনাথ টাগোর কী জ্যানী দুঃখ দৈর্ব্যাচা মহাসাগরান্ত 'মিনি' 'দীনেশ' 'কাবুলিওয়ালা' য়াসারথে মঙ্গল দ্বিপস্তম নির্মাণ করুন সর্ব জগালা প্রকাশ দিলা — আশা দাখবিলী - সম্মার্গ দাখবলা আণি ভারতাচী বিশ্ববন্ধুত্বাচী - প্রতীচী আণি

সংস্কৃতোচো উজ্জ্বল পতাকা জগান্ত অখন্ড ফড়কবত ঠেবলী, পরমেশ্বরা পুস্থ পুন্থ অশাচ সুপুত্রনা আমচ্যা ভারতান্ত জন্মালা ঘাল হোচ আসচী তুলা প্রার্থনা।"[২০]

অর্থাৎ ধন্য ধন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব যিনি দুঃখদুর্দৈবের মহাসাগরে 'মিনি' 'দীনেশ' 'কাবুলিওয়ালা'ব মত মঙ্গল দীপস্তম্ভ (আলোক স্তম্ভ) নির্মাণ করে সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করেছেন — আশা দেখিয়েছেন (জাগিয়েছেন) — ভারত ও বিশ্বযুদ্ধ — প্রতীচী ও সংস্কৃতের উজ্জ্বল পতাকা পৃথিবীতে আজও উড্ডীয়মান। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা এই বকম সুপুত্র যেন আমাদের ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

'কাবুলিওয়ালা'র আর এক নাট্যরূপ দেন নারাযণ গো শুক্ল যেটা রবীন্দ্রশতবর্ষ উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত হয়। উৎসর্গপত্রে লেখা আছে — "কাবুলিওয়ালা যা কথেচ্যা রূপানে পিতৃ প্রেমাচী অমর গাথা জ্যানী লিহিলী ত্যা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ টাগোর যাঞ্চা চবণো সাদর প্রার্থনা।"[২১] অর্থাৎ — অমরগাথা এই কাহিনী যিনি লিখেছেন সেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরণে সাদর সমর্পণ।

মরাঠীতে অনূদিত রবীন্দ্র নাটকের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল —

বিসর্জন — ক) অর্জুন সীতারাম কেলুসকর	১৯৪৫
খ) ভার্গবরাম বিঠঠল (মামা) ওয়রেরকর	১৯৪৪
গ) 'মাতেতুলা কায় হবয়' - জি. কে. ভট্ট	১৯৪৪
ঘ) 'অনন্ত্যাচা আরাধনেত আনি যজ্ঞ' - ডি. ভি. তেন্ডুলকর	১৯৪৪
(এতে আছে বিসর্জনের গদ্য একাংকরূপ, ৩৬ পাতা)	
বিদায় অভিশাপ — আচার্য ভাগবত (সদাশিব জগন্নাথ ভাগবত)	
চিরকুমার সভা — মামা ওয়রেরকর	
চিত্রাঙ্গদা —ক) কৃষ্ণ মুকুন্দ উজলম্বকর	১৯৬৪
খ) মামা ওয়ারেরকর	
গ) চিত্রা — হেমচন্দ্র	১৯২৬
ডাকঘর — ক) কাশীনাথ বিনায়ক ভাগবত	১৯৩০
খ) রত্নাকর মতকরী	১৯৬০
গান্ধারীর আবেদন — আচার্য ভাগবত	
কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ — আচার্য ভাগবত	
কাবুলিওয়ালা—ক) হনুমন্তরাও গো. মোর	১৯৫৭
খ) নারায়ণ গো শুক্ল	১৯৬১
মালিনী —ক) ডি. এল. অডোনি	১৯৬২
খ) সরোজিনী কমতনুরকর	
মুক্তধারা —ক) শিবরাম গোবিন্দ ভাবে	১৯২৪
খ) কৃষ্ণজী লক্ষণ সোমন	১৯২৬
গ) মামা ওয়রেরকর	
মুকুট	১৯২৪
রক্তকরবী —মামা ওয়রেরকর	
রাজা — মামা ওয়রেরকর	

মামা ওয়রেরকরের রবীন্দ্রনাট্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয় 'ঠাকুরাঞ্চী নাটকে' নামে দুখন্ডে সাহিত্য অ্যাকাডেমি থেকে ১৯৬২ সালে। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে

১৯৪৩ সালে একটি নাটক লেখেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, নাম — 'গুরুদেবঞ্চী হক'।

ই. মরাঠী নাটকে রবীন্দ্রপ্রভাব ঃ

মরাঠী নাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব গভীর বা ব্যাপক না হলেও তার মাত্রা কম নয়। মরাঠী নাটকের স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী ঋজুরীতি প্রত্যক্ষ আবেদনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব প্রতীকময়তা ও নাট্যগ্রন্থনরীতির কিছুটা পার্থক্য আছে। তবু রবীন্দ্র প্রভাব মরাঠী নাটকে পাওয়া যায়। প্রখ্যাত কবি পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে-র গীতি কবিতা অনেক সময় বক্তব্য ও বাচনভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথকে মনে করায়। তাঁর 'রঙ্গ পাঞ্চালিক' 'কালযবন' 'মাধবী : এক দান' প্রভৃতি নাট্যকাব্যের ওপর রবীন্দ্র প্রভাব আছে। বাল সীতারাম মারঢেকার রচিত 'সংগম' 'উক্ষণ' (নটশ্রেষ্ঠ আনি চার সংগীতিকা) প্রভৃতি গীতি নাটিকাগুলি রবীন্দ্রনাথকে মনে করায়। মঙ্গেশ পড়গাওকর এর কবিতায় বাংলার অনুরণ পাওয়া যায়, তাঁর কাব্য নাটিকাগুলোও রবীন্দ্রনাথের মত। বি. এন. দেশপাণ্ডে, এন জি. হুড, বি. আর. কান্ত প্রমুখের কথাও মনে পড়ে এ প্রসঙ্গে। নাট্যধর্মী কবিতার এই বিশেষ রীতি, কবিত্বময় প্রকাশ, গীতিময়তা, মহৎ জীবনবোধ ইত্যাদি রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য মরাঠী নাটকে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মতামত উল্লেখ্য—

"এটা বিশেষ উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথের নাটক মরাঠী মনকে নাটকীয়তা ও মঞ্চ কৌশল অপেক্ষা কবিত্ব ও গীতিময়তা দ্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত করেছে। তাই রবীন্দ্র নাটকের প্রভাব খুঁজতে হবে লিরিকাল ড্রামার ওপর যার মূল্য পেশাদার মঞ্চে কম হলেও সাহিত্যে বিশেষভাবেই উপলব্ধ হয়। ডবলিউ এন দেশপাণ্ডে, এন. জি. হুড, ডবলিউ. আর. কান্ত এবং অনেকেই গীতিনাটক লিখেছেন এবং সম্প্রতিকালে পি. এস. রেগে ও মঙ্গেশ পড়গাওকর এই রীতি গ্রহণ করেছেন।"[২২]

কবি শশাংক ছিলেন রবীন্দ্র প্রভাবিত। তিনি গদ্য কবিতা লিখে খ্যাত হন। তবে "শশাংক কেবল গদ্য কবিতাই লেখেন নি, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে তিনি নাটকও লিখেছেন। শশাংক সেই নাটকের নাম দিয়াছেন শশিকলা"।[২৩]

মামা ওয়রেরকর রবীন্দ্র নাটকের বিখ্যাত অনুবাদক। মৌলিক নাটক রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভুলতে পারে নি। 'ভূমিকন্যা সীতা' (১৯৫০) নাটকে সীতাকে দেখেছেন নতুনভাবে, উর্মিলাকেও — রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন — "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরাণী 'কাব্যান্তীল উপেক্ষিতা' যা লেখান্ত উর্মিলেচা উল্লেখ কেলা আহে আনি তিচ্যাবদ্দল সহানুভূতি প্রদর্শিত কেলী আহে।"[২৪]

বসন্ত কানেটকর বাংলা সাহিত্যের গভীর অনুরাগী। তিনি বলেছেন — 'আমি রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।"[২৫] তিনি জানিয়েছেন যে এই নাটকের মহিমা বা চমৎকারিত্ব, শিশুদের স্বাভাবিক আচরণ ও কথাবার্তা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে।

পু. ল. দেশপাণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা বই লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথ তীন ব্যাখ্যানে' (১৯৮১)। এতে তিনটি প্রবন্ধ আছে — 'রবীন্দ্রনাথাঞ্চী রঙ্গভূমি', 'রবীন্দ্রনাথাঞ্চী শালা', 'রবীন্দ্রনাথ আনি মী'। রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে পু. ল. আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'তুঝে আহে তুঝ্যাপাশী' তে (১৯৫৭) আচার্য যখন জীবনের সত্যকে বুঝতে পারলেন তখন তিনি সামনে এগিয়ে

চললেন একাকী। তাঁর সামনে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ, একলা চলার মন্ত্র সেখান থেকে তিনি গ্রহণ করলেন। আচার্য বললেন — "চলা, মলা গেল পাহিজে — একট্যালাচ চালল পাহিজে মলা — মনাস্ত অসো বা নসো, একট্যালাচ চালল পাহিজে — গুরুদেবনী মহ্‌টল্যু না? — অকলা চালো রে— অকলা চালো রে — তুঝী হাক কণী একো, ন একো, মলা একট্যালাচ চালল পাহিজে- "।

বিজয় তেন্ডুলকর তার নাটকে রবীন্দ্র কবিতার প্রয়োগ করেছেন এক বিশেষ পটভূমিকা সৃজন ও মানসিকতার প্রকাশে। 'অঞ্জী' নাটকে এক রহস্যময় নাটকীয় ও রোমান্টিক মুহূর্তে রবীন্দ্র কবিতার ব্যবহার করা হয়েছে নায়কের মুখে, 'অঙ্ক' সংস্থার প্রযোজনায় তা দেখা গেছে।

ঈ. মরাঠীতে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় ঃ

মরাঠী রবীন্দ্রনাটকের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিনয় হয়েছে। 'কাবুলিওয়ালা'র অভিনয় হয়েছে ১৯৫৫ তে। পরিচালনায় ও কাবুলীওয়ালার ভূমিকায় ছিলেন হনুমন্তরাও গো মোরে যিনি নাট্যরূপটির স্রষ্টাও বটেন। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ 'কাবুলিওয়ালা'র নাট্যরূপ দেন নারায়ণ গো শুক্ল যেটি সগৌরবে অভিনয়ও হয়।

'মালিনী' নাটক অনুবাদ করেন সরোজিনী কমতনুরকর এবং এই নাটকের অভিনয় করেন আনন্দ বিলাস সঙ্গীত নাটক মন্ডলী মহারাষ্ট্র। এদের অভিনয় খ্যাতি পায়।

বোম্বাইতে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' উপলক্ষে অভিনীত হয় রঙ্গায়ন গোষ্ঠীর রত্নাকর মতকরী কৃত 'ডাকঘর' নাটকের মরাঠী অনুবাদ "রাজাচে পত্র", নাটকের পরিচালনায় ছিলেন বিজয়া মেহতা। সমালোচক বলেছেন — "রাজার কাছ থেকে চিঠির প্রত্যাশায় থাকা অসুস্থ ছেলেটির মর্মস্পর্শী কাহিনী রঙ্গায়ন সুন্দর রূপায়িত করেছেন। মঞ্চের দৃশ্যপট ও সাজজ্জা ছিল সহজ কিন্তু বৈশিষ্ট্যময়। ছোট ছেলেটির ভূমিকায় সুরেশ পধ্যে, মাধবরূপে জয়বন্ত বিচারে, দই বিক্রেতা রূপে মাধব ওয়াটবে, ও মোড়লের ভূমিকায় অরুণ জোগেলকর জোরালো অভিনয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকের এক মায়াময় প্রলোভনকারী সরলতা আছে এবং এর গভীর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন। তবু এর মনস্তাত্ত্বিক সারল্য ও স্বচ্ছতা এবং এর কবিত্বের জন্য এই নাটকটির আবেদন সুগভীর হয়ে ওঠে।"[২৬] বিশেষ উলেখ্য এই যে ১৯৬০ সালে রঙ্গায়ন স্থাপিত হয় ও 'ডাকঘর' (রাজার পত্র) দিয়েই তার যাত্রা সুরু।

রবীন্দ্রশতবর্ষে 'বিসর্জন' নাটক মঞ্চস্থ করে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার। অধ্যাপক জি. কে. ভট্ট আন্তরিক অনুবাদ করেন — 'মাতে, তুলা কায় হবয়?' (মা তুমি কি চাও)। বোম্বাইতে বিড়লা থিয়েটারের ঘূর্ণায়মান মঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন রঘুবীর তলশিলকর যিনি কালীমন্দির ও রাজপ্রাসাদের রিয়ালিষ্টিক সেট করেছিলেন এবং তা ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উপযোগী হয়েছিল। অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখান জয়সিংহরূপী কাশীনাথ ঘাণেকর, রাজারূপী কমলাকর তকলকর, অপর্ণারূপী আশালতা পোতদার। প্রবীণ মরাঠী অভিনেতা নানাসাহেব ফাটক রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাট্য পরিচালনায় ছিলেন আত্মারাম ভেন্ডে।

মরাঠীতে রবীন্দ্রনাট্য চর্চা আজও চলছে। ১৯৮৫ তে কলকাতায় রবীন্দ্র জন্মদিনে 'ডাকঘর' এর অংশবিশেষ অভিনীত হয়। পত্রিকা লিখেছে — "মরাঠী ভাষায় ডাকঘর পরিবেশনে আন্তরিকতা আছে।"[২৭] রবীন্দ্রজন্মের ১২৫ বর্ষ উপলক্ষে সঙ্গীত কলামন্দির

আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' পরিবেশন করেন মরাঠী সাহিত্য মন্ডলের অরুণ হোসিং ও অরুণা হোসিং। নাটকটি অনুবাদ করেন অধ্যাপিকা বীণা আলাসে।

রবীন্দ্রনাথের ১২৫ জন্মবর্ষ উপলক্ষে সঙ্গীত নাটক অকাদেমী কর্তৃক দিল্লীতে আয়োজিত রবীন্দ্র নাট্যোৎসাবের শেষ নাটক 'ডাকঘর' (১৬.৫.৮৭)। মরাঠীতে অনূদিত এই নাটক মঞ্চস্থ করেন বোম্বাই-এর 'আবিষ্কার', পরিচালনা করেন সুলভা দেশপান্ডে। প্রখ্যাত সমালোচক নেমির্চাদ জৈন লিখছেন — ''এই প্রয়োজনা সর্বস্তরের দর্শকের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে সরল ও বাহুল্যবর্জিত উপস্থাপনা এবং সংহত ও আন্তরিক অভিনয়ের জন্য। বিশেষ করে অসুস্থ বালক অমলের ভূমিকায় প্রণতি প্রধান-এর অভিনয় পরিপূর্ণ শিল্পসম্মত অন্যদিকে মর্মস্পর্শী। — রবীন্দ্রনাথের নাট্যচেতনার গভীর প্রকাশ ঘটেছে 'ডাকঘর' এর মধ্যে। জীবন অনুভবের বৈচিত্র্যময় ভাবনা এর মধ্যে পাই যাতে আছে বিভিন্ন অর্থের প্রত্যয় — সাধারণ মানুষের বিশেষত শিশুমনের দৈনন্দিন সাধারণ ভাবনা থেকে অনন্তের সুতীব্র ব্যাকুলতা এবং সেই রহস্যকে জানবার, উপলব্ধি করবার মননশীল প্রশ্ন ও অনুধ্যান যার নাম মৃত্যু। বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার যে গভীর ও সাধারণের এত সুন্দর সংমিশ্রণ এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ করেছেন যে তার মধ্যে আছে এক সুতীব্র সারল্য এবং তা হয়েছে ভারতীয় ভাব ও মানসিকতা ও আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।''[২৮] নাটকে অসাধারণ অভিনয় করেছেন অমলের ভূমিকায় প্রণতি প্রধান। অন্যান্য শিল্পীরাও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। আজও রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করছেন মরাঠী সুধীজন। রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতা অবলম্বনে মরাঠী নাটক পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী ও শ্রী ভি. ভি. কুলকার্ণী ২০০০ সালে যে অনুষ্ঠানে বাংলার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫. শরৎচন্দ্র ও মরাঠী নাটক ঃ

মহারাষ্ট্রে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত আপনজন। তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই অনূদিত হয়েছে এবং সমাদর লাভ করেছে। মরাঠী সাহিত্য সমালোচক শরৎচন্দ্রকে 'সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ' লেখক মনে করেন। শরৎচন্দ্রের জীবন নিয়ে সুন্দর উপন্যাস লিখেছেন ডঃ সুমতি ক্ষেত্রমাড়ে— 'জীবন স্বপ্ন'। শরৎচন্দ্রের নাটকও মরাঠীতে সমাদৃত। বিশিষ্ট নাট্যকারদের ওপর শরৎচন্দের প্রভাব আছে। ''শরদবাবুঞ্চা প্রভাব কাহী মহত্বাচা মরাঠী লেখকবর পডলা হে স্পষ্ট আহে। ত্যাঞ্চা জাদুচা অসর মামা ওয়ারেরকর তর পূর্বীচ ঝালা হোতা। ত্যাশিবায় অরবিন্দ গোখলে, পু. ভা ভাবে, গঙ্গাধর গাডগীল য়া যুদ্ধোত্তর কালাতীয় প্রথিতযশা লঘুকথা-লেখকাবর শরচন্দ্রাঞ্চে ঋণ আহে, অর্থাৎ হে ঋণ সর্বাবর সারখে নাহী। গো. নী. দন্ডেকর আণি শ্রী. না. পেন্ডসে যা মরাঠী তীল দোন প্রসিদ্ধ কাদম্বরীকারাবরহী শরদবাবুচা মোঠা প্রভাব আহে, তোহী এক স্বরূপ নাহী। শ্রী. না. পেন্ডশ্যাবর ত্যাঞ্চা বহুরঙ্গী বাস্তববাদাচা খূপচ প্রভাব আহে।''[২৯]

মামা ওয়ারেরকর শরৎচন্দ্রের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছেন আগে থেকে। তাঁর 'অপূর্ব বংগাল' নোয়াখালির দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা, কলকাতাও সেখানে আছে। চরিত্ররাও বাঙ্গালী। ভূমিকায় লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। পু. ভা. ভাবে গভীর শরৎ অনুরাগী। তিনি শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' পঞ্চাশেরও বেশীবার দেখেছেন। জীবনের গভীর মূল্যবোধে আস্থা নারীত্ব সতীত্ব ইত্যাদির প্রত্যয় তিনি শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে যার প্রকাশ আছে। 'স্বামিনী' নাটকের মধ্যেও শরৎচন্দ্রীয় এই ভাবনা প্রকাশিত।

শ্রী. না. পেন্ডসের মধ্যে শরৎচন্দ্রের গ্রামজীবন বর্ণনা ও বাস্তব চিত্রণ, নরনারীর প্রেম সম্পর্কের কথা যেন ছায়া ফেলেছে। তাঁর 'গরমবীচা বাপু' উপন্যাস ও নাটক এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

গো. নী. দন্ডেকর শরৎচন্দ্রের গভীর জীবনবোধ ও প্রেমচেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। তার 'শিতু' নাটকএ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে। এই নাটকে শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে — পরিবেশ চিত্রণে, নায়ক-নায়িকার হৃদয় সম্পর্কের বিচারে।

বসন্ত কানেটকর বর্তমান সময়ের অতি খ্যাতিমান শিল্পী, পেশাদার মঞ্চের বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য স্রষ্টা। তিনি শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগী। তিনি মনে করেন 'শরৎচন্দ্র একমাত্র লেখক যাকে শেকসপীয়রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। শরৎচন্দ্র সাহিত্যকে যেখানে পৌছে দিয়েছেন তাকে আজও কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।''[৩০] বসন্ত কানেটকরের নাটকের ওপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে। বিশেষ করে মনে পড়ে তাঁর 'কস্তুরীমৃগ' নাটক যার নায়িকা অঞ্জনী যে তথাকথিত পণ্যাঙ্গনা হয়েও সহৃদয়, আন্তরিক ও গভীর শিল্পবোধসম্পন্ন নারী। সে রাজলক্ষ্মী কিংবা চন্দ্রমুখী বিজলীর সহোদরা যেন। আদর্শবাদ, সুন্দর জীবনের প্রতি আস্থা, জীবনের মর্যাদাময় চিত্রণ ও কাহিনীকথনের অনায়াস নৈপুণ্যে বসন্ত কানেটকর শরৎচন্দ্রকে স্মরণ করায়।

জয়বন্ত দলভীর 'মহানন্দা' নাটকও শরৎচন্দ্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। দেবদাসীর জীবনের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা নিজস্ব ও মৌলিক ও তথাপি শরৎচন্দ্রের ভাবনার সঙ্গে তার একটা সমরূপতা দেখতে পাওয়া যায়।

৬. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও মরাঠী নাটক ঃ

ক. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক মরাঠীতে

বাদল সরকার মরাঠী ভাষায় বিশেষ সমাদর পেয়েছেন। তাঁর প্রধান প্রায় সবকটি নাটকই মরাঠীতে মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে : তাদের অনুবাদ হয়েছে এবং অভিনয়ও হয়েছে। বিজয় তেন্ডুলকর আগেই জানিয়েছিলেন — ''বাদল সরকারকে আমরা ঘরের লোক করে নিয়েছি। থিয়েটার ইউনিট দল তাঁর 'এবম ইন্দ্রজিৎ', 'বল্লভপুরচি দন্তকথা', 'পগলা ঘোড়া' মঞ্চস্থ করেছেন। অরবিন্দ দেশপান্ডে 'বাকি ইতিহাস' প্রযোজনা করেছেন। আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার পি. এল. দেশপান্ডে বাদল সরকারের 'সারা রাত্রি' নাটকটি অনুবাদ করেন। এখন অপেশাদার শিল্পীরা এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা করেছেন।''[৩১]

'এবম্ ইন্দ্রজিৎ' অনুবাদ করেছেন শ্রীকান্ত কুলকার্ণী (১৯৭৭) যার অভিনয় হয়েছে বেশ কয়েকবার। শম্ভু গণপুলেও এ নাটক অনুবাদ করেন যেটা মহারাষ্ট্র মণ্ডলের উদ্যোগে ১৯৭৫এ কলকাতায় অভিনীত হয়।

'শেষ নেই' অনুবাদ করেছেন এস. বি. যোশী 'অন্ত নাহী' নামে যে নাটক দশম মহারাষ্ট্র রাজ্য নাট্য মহোৎসবে (১৯৭১) অভিনীত হয়। অনূদিত নাটকের কবিতা লিখেছেন মরাঠী কবি সদানন্দ রেগে। নাটকটি পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়। পরিচালনায় ছিলেন মাধব ওয়াটবে যার শিল্পনৈপুণ্য প্রযোজনায় সুন্দর প্রকাশিত। মঞ্চকে সুন্দর রূপায়িত করেন রাম সিতুত যিনি আলোকশিল্পীও বটেন। অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা দেখান প্রভাকর পাটনকর; অন্যান্য ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখান বাল কার্বে (আইনবিদ), প্রেরণা অমর শেখ (সুমন্তর দুর্ভাগা প্রেমিক), দিলীপ কুলকার্ণী (তার রাজনৈতিক সহযোদ্ধা), মাধব ওয়াটবে (অধ্যাপক), সুভাষ যোশী (নায়কের বস) ও ভক্তি বার্ভে (সুমতি)।

'মোঠা আত্যা' সিন্ধু তেওয়ারী কৃত 'বড় পিসীমা' নাটকের অনুবাদ। এই নাটক সিন্ধু তেওয়ারীর পরিচালনায় কলকাতায় মঞ্চস্থ করে মহারাষ্ট্র মন্ডল। 'বাকি ইতিহাস' অনুবাদ কবেছেন অরবিন্দ দেশপান্ডে। এই নাটক মঞ্চস্থ করে 'রঙ্গায়ন'। অভিনয় দক্ষতা দেখান অরবিন্দ ও সুলভা দেশপান্ডে। 'বল্লভপুরের রূপকথা' অনুবাদ করেন অমল পালেকর ('বল্লভপুরচি দন্তকথা'), নাটকটি মঞ্চস্থ হয় সত্যদেব দুবে ও অমল পালেকরের যুগ্ম পরিচালনায়। এই নাটক রাজ্যস্তরে শ্রেষ্ঠ পরিচালক, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার পায়। ১৯৮২ তে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'বৃহন মহাবাষ্ট্র নাট্য স্পর্ধা' উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্র মন্ডল কলকাতা এই নাটক সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করে বিকাশ দীঘের পরিচালনায় যিনি সুন্দর অভিনয়ও করেন।

'মিছিল' মরাঠীকে অনুবাদ করেন চিত্রা পালেকর; অমল পালেকরের পরিচালনায় বেশ কয়েকবার অভিনয়ও হয়। "জুলুস নাটকে কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে যার মধ্যে গান নাচ সংলাপ ও মূকাভিনয়ের সংমিশ্রণ আছে। এতে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত ভারতীয়র যন্ত্রণাময় জীবনের এবং মুক্তি ও শান্তির অন্বেষণের চিত্র আছে। নাটকটির চমৎকার নির্দেশনায় আছেন অমল পালেকর। অভিনেতারা তাদের ভূমিকা যথাযথ অভিনয় করেন ও দর্শকের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এটি এক বিরল নাটক যাতে দর্শকরা নিজেদের নাটকের অঙ্গীভূত মনে করে যার জন্য দায়ী নাটকের অভিনব আঙ্গিক ও দর্শকের মনেব অন্তর্গত ভাবনা। নাটকটি দাদারে ছবিলদাস হাই স্কুলে প্রায়শই অভিনীত হয়।"[৩২]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' (গিনিপিগ) মরাঠীতে একাধিকবার অনূদিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। দিলীপ খন্ডেকর এটি অনুবাদ করেন। এটি মঞ্চস্থও হয় মহারাষ্ট্র রাজ্য নাট্য মহোৎসবে। এর পরিচালনায় ছিলেন অনূয়া পালেকর যিনি অভিনয় পটীয়সীও বটেন। ১ ও ২ চরিত্রে অভিনয় করেন অরুণ জোগলেকর ও অমল পালেকর, অপর দক্ষ অভিনেতা ছিলেন বিহঙ্গ নায়ক। 'রাজরক্ত'র আর এক অনুবাদ করেন মনোহর রোকড়ে যেটাও রূপায়িত হয়।

'চন্দ্রলোকে অগ্নিকান্ড' মরাঠীতে রূপায়িত করেন বিখ্যাত লেখক পুরুষোত্তম দর্ভেকর 'জেওয়া দেভাচা খুন হোতো' নামে যে নাটক বেঙ্গলী এসোসিয়েশন নাগপুর মঞ্চস্থ করে ১৯৭০-এ ও তা বিশেষ সম্মানিত হয়।

বাদল সরকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকাররা অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত করেছেন মরাঠী নাট্যকারদের। বক্তব্য ও আঙ্গিক দুদিক থেকেই এই অনুপ্রাণনা দেখা যায়। অচ্যুত ওঝে সতীশ আলেকর প্রমুখদের কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। "এবং ইন্দ্রজিতের" গভীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় 'চলরে ভোপল্যা টুনুক টুনুক' (অচ্যুত ওঝে) নাটকের ওপর এবং নাট্যকারও তা স্বীকার করেন। অমল পালেকার বলেন, "আমিও 'এবং ইন্দ্রজিত' দ্বারা প্রভাবিত এবং এই প্রভাবের কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই।"[৩৩] অচ্যুত ওঝের 'শাজদা' নাটকের ওপর মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'গিনিপিগ' নাটকের গভীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বক্তব্য দুক্ষেত্রে প্রায় এক, ভাবনার সমতা আছে দুনাটকেই, আঙ্গিকেও সাদৃশ্য আছে।

সতীশ আলেকরের 'শনিবার রবিবার' নাটকটির ওপর বাদল সরকারের 'সারা রাত্তির' নাটকের প্রভাব আছে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ও জটিলতা এবং এর মধ্য দিয়ে মনস্তত্ত্বের গভীর প্রকাশ ও চেতনার উন্মীলন দুই নাটকের বৈশিষ্ট্য।

শম্ভু মিত্র মরাঠী থিয়েটারে এক শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়। তিনি সর্বত্র সম্মানিত ও সমাদৃত হয়েছেন, পু. ল. দেশপান্ডে তাঁর 'রাজা ওয়দিপৌস' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন 'শম্ভুদাকে'। শম্ভু মিত্র পরিচালিত ও অভিনীত বহুরূপীর 'রক্তকরবী' ও অন্যান্য নাটক উদ্দীপিত করেছে মরাঠী নাট্যকর্মীদের। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রর 'কাঞ্চনরঙ্গ' মরাঠীতে অনুবাদ করেছেন মধুকর অমৃতে। এই নাটকটি অভিনীত হয়েছে বেশ কয়েকবার।

বাংলায় 'দশচক্র' নাটক শম্ভু মিত্রর পরিচালনায় ও অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি পায়। মরাঠীতে এই নাটক অনূদিত হয় 'কোন্ডী' নামে, অনুবাদক অশোক সাহানে। এই নাটক মঞ্চস্থ করে বোম্বের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার, পরিচালক শম্ভু মিত্র। সম্ভবত এই সর্বপ্রথম মরাঠী নাটকে নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন অন্য ভারতীয় ভাষার বাংলার পরিচালক।

শম্ভু মিত্রর নাটক অবলম্বনে পু.ল. দেশপান্ডে লেখেন 'রাজা ওয়দিপৌস' নাটকটি। পু.ল. তাঁর নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন যে শম্ভু মিত্রের রাজা ওয়াদিপৌস নাটকের অভিনয় তাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে ও মরাঠীতে এই নাটক তিনি রচনা করেছেন বাংলা নাটক থেকেই।[৩৪]

উৎপল দত্তর বিভিন্ন নাটক মরাঠীতে অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে। তাঁর 'মেঘ' মরাঠীতে অনুবাদিত হয়। 'তিন অংকী সামাজিক নাটক' মেঘ গুজরাতী থেকে মরাঠীকে অনুবাদ করেন যশবন্ত কেলকর 'অড়িচ ঘরং বাজিরালা' (আড়াই ঘরের উজিব) নামে — "উৎপল দত্ত যাঞ্চা 'মেঘ' যা মূল বংগালী অনুবাদাচে খের মরাঠী রূপান্তর।" এই নাটকের প্রথম অভিনয় করে মহারাষ্ট্রীয় কলোপাসক, পুণে ৭ নভেম্বর ১৯৬৮ সালে। কামগর কল্যাণ পরিষদও এই নাটকের অভিনয় করে।

উৎপল দত্তর ঐতিহাসিক মর্যদায় অভিষিক্ত 'কল্লোল' মরাঠীতে রূপান্তর করেন অধ্যাপক মনোহর রোকড়ে। ১৯৭৪ সালে এই নাটক মঞ্চস্থ করেন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, নাগপুর যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবাশীষ রায়।

উৎপল দত্ত-র 'ব্যারিকেড' মরাঠীতে বিশেষ মর্যাদা পায়। বোম্বাই-এর পারফরমিং আর্ট- সেন্টার-এর প্রযোজনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৮৩ সালে। অনুবাদ দিলীপ ঠাকুরদেশাই। তার আগে ১৯৮০ তে বামপন্থী মহলে নাটকটি পঠিত হয়। ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ কো-অর্ডিনেশন কমিটিও এর অভিনয় করে। উৎপল দত্তর 'সূর্যশিকার' মরাঠীতে মঞ্চস্থ করে ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার ফ্রন্ট।

তরুণ রায়ের 'রজনীগন্ধা' সিন্ধু তেওয়ারী অনুবাদ করেন মরাঠীতে। এই নাটক ১৯৬৫তে 'বৃহন মহারাষ্ট্র পরিষদ' উপলক্ষ্যে কলকাতায় অভিনীত হয় সিন্ধু তেওয়ারির পরিচালনায়। তরুণ রায়ের 'রজনীগন্ধা'র অপর অনুবাদ করেন পদ্মাকর গোওঈকর এবং মুম্বাই মরাঠী সাহিত্য সংঘর নাট্যশালা এই নাটকের প্রথম অভিনয় করে ১৬ই মার্চ ১৯৭১, বোম্বাইতে।

তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' মরাঠীতে অনূদিত ও অভিনীত হয়।

অলকা মুখোপাধ্যায়ের দুটি রেডিও নাটক সংকলন 'বিচিত্রিতা' মরাঠীতে অনুবাদ করেন শংকর ব্যানার্জী শাস্ত্রী ১৯৫০ সালে। নাগপুর প্রকাশন, নাগপুর থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

সলিল সেন রচিত 'ডাউন ট্রেন' মরাঠীতে অনুবাদ করেন যশবন্ত কেলকর। নাটকটি অভিনীত হয় ১৯৬৮ তে। বরোদা এমেচার্স ড্রামাটিক ক্লাব এটি মঞ্চস্থ করে যশোধারা কেলকরের পরিচালনায়। বাংলার প্রখ্যাত ঔপান্যসিক জরাসন্ধর উপন্যাস নাটকে রূপায়িত হযেছে। 'লৌহকপাট' মরাঠীতে অনুবাদ করেন বামন পত্রিকর ১৯৬৯ সালে 'রঙ্গ আণি অন্তরঙ্গ' নামে। এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'মল্লিকা' রূপান্তর করেন শম্ভু গন্ডপুলে 'জুঁই' নামে ও রায়পুর মহাবাষ্ট্রে মন্ডল এই নাটকের অভিনয় করে নাগপুরে ১৯৮৩ সালে।

মন্মথ রায় রচিত 'অসাধারণ' একাঙ্ক মরাঠীতে অনুবাদ করেন রা.রা. পাঠক 'অলৌকিক' নামে। নাটকটি প্রকাশিত হয় সুধীর দামলে সম্পাদিত 'নাট্যদর্পণ' পত্রিকায় (মার্চ ১৯৮৫)। নাটকের ভূমিকায় মন্মথ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।

কিরণ মৈত্র-ব 'নাম নেই' মরাঠীতে অনুবাদ করেন প্রদীপ দীক্ষিত 'নাও নহী নাটকলা' নামে যে নাটক বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নাগপুর মঞ্চস্থ কবে অজয় বন্দোপাধ্যায় ও দেবাশিস রায়ের পরিচালনায়।

রাধারমণ ঘোষের বিভিন্ন নাটক মরাঠীতে অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে। 'শতাব্দীর পদাবলী' নাটক 'শতাব্দীচী পদাবলী' নামে অনুবাদ করেন বাল পান্ডে ও এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। 'হারাধনের দশটি ছেলে' অনুবাদ করেন দেবাশিস রায় 'দাহা তুম গেলে শূন্ন' নামে ও তাঁরই নির্দেশনায় এটি অভিনীত হয়।

অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'মারীচ সংবাদ' ও শ্যামলতনু দাশগুপ্তর 'যাদুকর' নাটকদ্বয় অবলম্বেনে মরাঠীতে 'যাদুগর আণি গারোড়ি' (গারোড়ি — যারা ডুগডুগি বাজায়) নাটক লেখেন মনোহর রোকন্দে যেটা ১৯৭৩ সালে অভিনীত হয়। অরণ মুখোপাধ্যায় রচিত পরিচালিত 'জগন্নাথ' মরাঠীতে অনুবাদ করেন বীণা আলাসে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার একে মঞ্চস্থ করেন। পরিচালনায় ছিলেন কমলাকর সোনটাক্কে। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন তরুণ প্রতিভা অরুণ হরনেকর। সহযোগী ছিলেন বসুধা দেশপান্ডে, উদয় টিকেকর, নারায়ণ ঘোসলকর প্রমুখ।

মনোজ মিত্রর 'নরক গুলজার' নাটকটি অনুবাদ করেন 'ও নরকায় নমঃ' নামে লালা ঢাকুলকর। এটিও মঞ্চস্থ হয় কামগর কল্যাণ পরিষদ, মহারাষ্ট্রের উদ্যোগে নাগপুরে।

দেবাশিস মজুমদারের 'অমিতাক্ষর' অনুবাদ করেন অরবিন্দ দেশপান্ডে। 'তাম্রপত্র' নামে এই নাটক অভিনয় করে 'আবিষ্কার' নাট্য সংস্থা সুলভা দেশপান্ডের পরিচালনায়।

সমরেশ বসুর 'ছুটির ফাঁদে' মরাঠীতে অনূদিত হয় — 'মিলালী পরী তবী ব্রহ্মচারী' (পরীর মত বৌ পেয়েছি তবুও ব্রহ্মচারী)। এই নাটক মঞ্চস্থ হয় যার মুখ্য ভূমিকা নেন অমল পালেকর। ঔপন্যাসিক শংকরের 'সীমাবদ্ধ'ও নাটকায়িত হয়, রূপকার রত্নাকর মতকরী।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অগ্নিপুত্র' কাহিনী মরাঠীতে নাটকে রূপায়িত করা হয় যেটি বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপিত করেন বসন্ত গোবিন্দ পোতদার। বাংলার সংস্কৃতি-সাহিত্য নিয়ে কিছু উচ্চমানের লেখা লিখেছেন বসন্ত পোতদার; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর 'একোনিসশে এক' (অর্থাৎ ১৯০১) গ্রন্থটি যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আকর্ষণীয় ভাবে এসেছেন।

খ. সাম্প্রতিক মরাঠী নাটক বাংলায়

মরাঠী নাটক বাংলায় গৃহীত হয়েছে গভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদায়। অনুবাদ ও অভিনয়-এর মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ মরাঠী নাট্যসাহিত্য বাংলায় এসেছে। কখনো মহারাষ্ট্রের শিল্প ও তার আঙ্গিক বাংলাকে প্রভাবিত করেছে, নতুনরূপে বৃত হয়েছে বাংলায়। বিগত শতাব্দীর সূচনায় বাংলার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের যে মিলন ও ভাববিনিময় সুরু হয়েছিল নাট্যসাধনার মধ্য দিয়ে আজ তা বিকশিত হয়েছে ও দুই সংস্কৃতি সভ্যতার মধ্যে মিলনের বক্তরাখী পরিয়ে দিয়েছে।

মরাঠী লোকগাথা ও বীরদের কাহিনী বাঙলা সাহিত্যকে অনপ্রাণিত করেছে দীর্ঘদিন ধরে। ববীন্দ্রনাথের ওপর সে প্রভাব ও প্রেরণা আমরা দেখছি। মরাঠী ইতিহাসের বিখ্যাত পুরুষদের নিয়ে বাংলায় অনেক নাটক লেখা হয়েছে। যেমন দেশপ্রেমিক শিবাজীর বীরত্বময় জীবনকথা নিয়ে বেশ কিছু নাটক লিখেছেন বাংলার নাট্যকারেরা। স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান মরাঠী চরিত্ররাও বাংলায় এসেছেন সগৌরব মর্যাদা নিয়ে। তিলক, ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈ প্রমুখ বাংলা নাটকে এসেছেন মহিমা নিয়ে।

কিন্তু সাম্প্রতিক কাল থেকেই মরাঠী থেকে নাটক বাংলায় আসা বিশেষ করেই আরম্ভ হয়েছে। মরাঠী নাটকের সমৃদ্ধি ও মহিমা বাংলার শিল্পীমনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে এবং ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার নাটকের মধ্যে মরাঠী নাট্য সাহিত্যই বাংলায় সর্বাধিক গৃহীত হয়েছে। বিজয় তেন্ডুলকরের নাম এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হবে।

বিজয় তেন্ডুলকরের বিখ্যাত নাটক 'শান্ততা! কোর্ট চালু আহে' বাংলায় অনুবাদ করেন এস. বি. যোশী ও নীতিশ সেন, রূপান্তরিত নাম ''চোপ, আদালত চলছে'। এই নাটক শম্ভু মিত্রর পরিচালনায় বহুরূপী প্রথম মঞ্চস্থ করে ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১, কলকাতায় কলামন্দির-এ। দ্বিতীয় প্রযোজনা ১৯ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমিতে। এই প্রযোজনা বাংলা নাটকে এক নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা আনে। এই নাটকটির প্রযোজনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মতামত উদ্ধৃত হল—

''কল্পনা আর বাস্তব দুই স্তরে নাটকটি নিয়ন্ত্রিত। তেমনই আবার লঘু আর গম্ভীর দুই সুরেও। কখনও দুই স্তরের অবস্থান সমান্তরাল, কখনও একটির সঙ্গে অপরটি মিশে যাচ্ছে। .... নাটকের সূচনায় বেনারে বাঈয়ের কিছু স্বগতোক্তি আছে যেখানে তার ব্যক্তিগত দুঃখবঞ্চনা আভাসিত। নকল বিচার-পর্বের সাক্ষ্য, জেরা এবং অন্যান্য ক্রিয়া ক্রমশ যেন কল্পনার সুরকে মুছে দিয়েছে — ব্যাপারটা প্রায় স্পষ্টতই হয়ে দাঁড়িয়েছে এক নিষ্ঠুর আক্রমণ। এই নাটকের লক্ষ্যও সম্ভবত তাই। একজনের স্খলন সম্পর্কে তার পরিচিত জনেদের সাধারণ মনোভঙ্গী যদি মমতাহীন, সেখানে সকলের রসনা কত সহজেই যে সক্রিয় হয়ে ওঠে, দুঃখী মানুষটির ভ্রান্তির মূলে কী তা সহানুভূতি দিয়ে বোঝবার লোকের যে একান্তই অভাব সমাজে — সেইটুকুই এ নাটকের ভিতরের কথা। এই বক্তব্য একটি সহজ সত্য যা এখানে বেনারে বাঈয়ের সহকর্মীদের আচরণে পরিস্ফুট। সেই সঙ্গে বেনারে বাঈয়ের ট্রাজেডিও — যে তার ছাত্রীদের সামনে জীবনের মঙ্গলময় ছবি এঁকে দিত, তার অন্ধকার, কুটিল দিকটার কথা বলত না কখনও।

নির্দেশক শ্রী শম্ভু মিত্র এই নাট্যের পরিসরে রিয়ালিটি আর ইলিউশানের দুই স্তরকে, যতখানি সম্ভব, প্রযোজনার নানা অংশে একাকার করে দিয়েছেন। নাট্য ক্রিয়ার ক্ষেত্র এখানে শুধু মঞ্চের পরিধিতে আবদ্ধ নয়, দরকার মত, প্রেক্ষাগৃহের দরজা পর্যন্ত তা

বিস্তৃত। আদালতের 'খেলায়' হয়েছে বার বার আদালতের নিয়মভঙ্গ, কুশীলবদের আচরণেও তাৎক্ষণিক বোধসঞ্জাত ভাবটি স্পষ্ট। চেতন আর অবচেতন মনের কিছু দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াও আমরা অনুভব করি। ....

মঞ্চ সজ্জায় (অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়) স্বভাবতই উপকরণের বাহুল্য ছিল না। কিন্তু স্বল্প উপকরণের ব্যবহার সার্থক। বিরতির আগে ওপরের যে দৃশ্যটি চিত্রার্পিতবৎ (পরিকল্পনা —চমৎকার), সেখানে আলোকসম্পাতের (দিলীপ ঘোষ) কাজ নিপুণ। শেষাংশে নায়িকার করুণ উচ্চারণের মুহূর্তে আলো-আঁধারির পরিবেশটি লক্ষ্য কববার মত। পরিণতিক্ষণের আবহ-সুরও মর্মস্পর্শী।

শিল্পীদের অভিনয় আকর্ষক, স্বতস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত। .... তৃপ্তি মিত্রর বেনারে বাঈ আপাত-আনন্দোচ্ছল। যার অস্থির চপল ভাবের গভীরে এক দমিত দুঃখবোধ। শেষ দৃশ্যে পুঞ্জীভূত সেই বেদনা ভাষায় উচ্চারিত। তারও আগে মৌন, মূক অভিনয় — কখনও শূন্যতার, কখনও যন্ত্রণার অভিব্যক্তিতে।"[৩৫]

বহুরূপীর অসামান্য প্রযোজনা 'চোপ, আদালত চলছে' অভূতপূর্ব উণ্মাদনার সৃষ্টি করে এবং এই নাটক সারা ভারতে অভিনয় হয় বাংলা ভাষায়। সমাজচিত্রণ, মানব মনস্তত্ত্বের গভীর প্রকাশ, নারীহৃদয়ের সুতীব্র বেদনার অভিব্যক্তি নাট্যপ্রেমী মানুষদের মুগ্ধ করে ও সারা দেশে এর অনুরণন শোনা যায়। বহুরূপীর প্রযোজনার পব ১৯৭২ এ বহুরূপী পত্রিকায় নাটকটি প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭২ ও ৭৩ সালে বেশ কয়েকটি ভাল অভিনয় হয়। বোম্বের 'উত্তর সাইক' এই নাটকের সার্থক মঞ্চায়ন ঘটায়। সব শিল্পী সুন্দর ভাবে অভিনয় করেন। পরিচালনায় ছিলেন অমল দাশগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন মানসী দাশগুপ্ত, রাজা গুপ্ত, লালুপীর, বিকাশ চক্রবর্তী, বিনয় চ্যাটার্জী প্রমুখ। এলাহাবাদের 'শিল্পী সংঘ' এই নাটক মঞ্চস্থ করে অমিয় ভট্টাচার্যর পরিচালনায়। চিত্তরঞ্জনের 'সুহৃদ গোষ্ঠী' 'চোপ, আদালত চলছে' সুভাশিস দাশগুপ্তর পরিচালনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করে। ভিলাই-এর 'নিরীক্ষা' সংস্থাও দেবব্রত রায়চৌধুরীর পরিচালনায় 'চোপ, আদালত চলছে' মঞ্চস্থ করে।

'চোপ আদালত চলছে' বাংলায় সফল প্রযোজনা করছে 'নীলকণ্ঠ' নয়ের দশকে। প্রধান চরিত্র মিস বেনারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন শিবানী গাঙ্গুলি যে রূপায়ণে তিনি বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্য পরিচালনায় রঞ্জিৎ গাঙ্গুলি বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পচেতনার ছাপ রেখেছেন। সুতপা রায়, গোপাল মুখার্জী, কবির সেন বরাট, সত্যেন চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীদের প্রয়াসও সার্থক। এই প্রযোজনার জন্য নীলকণ্ঠ সম্প্রদায় অবশ্যই অভিনন্দন পাবেন।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে 'শান্ততা কোর্ট চালু আহে' বহুরূপীর আগেই বাংলায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই নাটক 'নকল হলেও সত্যি' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন দেবাশিস রায় এবং বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নাগপুরে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৯ সালে। বিজয় তেন্ডুলকয়ের বহু বিতর্কিত 'সখারাম বাইন্ডার' বাংলায় প্রথম মঞ্চস্থ করেন শ্রীরঙ্গম কলকাতায় ১৯৭৮ সালে। রচনা ও পরিচালনা দীপক বিশ্বাস। 'সখারাম বাইন্ডার' বাংলায় আবার অনুবাদ করেন রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়। নাটকটা 'ও থিয়েটার থিয়েটার' পত্রিকায় শারদীয়া ১৯৮৪ তে প্রকাশিত হয়।

বিজয় তেন্ডুলকরের 'বলি' বাংলায় অনুবাদ করেন রথীন সেনগুপ্ত। পরেশ দাসের পরিচালনায় করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ দিল্লী এই নাটক মঞ্চস্থ করে ১৯৮৩ তে। বিজয়

তেন্ডুলকরের 'কমলা' বাংলায় অভিনীত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ডঃ পি.জি. আডিয়ালকর ও জয়ন্ত চৌধুরী, পরিচালনায় ছিলেন সমীর মজুমদার ও কাজল চৌধুরী, প্রযোজক সংস্থা — ভূমিকা। প্রথম অভিনয় ১৯ জুন ১৯৮৩, জ্ঞানমঞ্চ, কলিকাতা।

বিজয় তেন্ডুলকরের 'ঘাসিরাম কোতয়াল' বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রসূন মিত্র। নাটকটি 'শূদ্রক' শারদীয় সংখ্যায় (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। বিজয় তেন্ডুলকরের শেষ নাটক 'কন্যাদান' বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন অধ্যাপিকা বীণা আলাসে যেটি শারদীয়া 'বহুরূপী' (১৯৮৬) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'কন্যাদান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৯৫ এর কার্তিক মাসে। বাংলার নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৪.৬.১৯৯২ গিরিশ মঞ্চে, সংস্থা বেসিক থিয়েটার। নাটকটি পরিচালনা করেন পরশুরাম মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নাট্য প্রযোজনায় পরিচালকের দক্ষতা স্বীকার করতেই হবে। একই নাটক পরশুরাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'অর্থন' আবার মঞ্চস্থ করেছে ২০০০ সালে। বাঘা যতীন নাট্য সংস্থা শিলিগুড়ি এই নাটকের অভিনয় করেছে ১৯৮৮ তে। অন্যান্য সংস্থাও 'কন্যাদান' করে। নিউ থিয়েটার্স গ্রুপ বিজয় তেন্ডুলকর অনুসরণে করেছেন 'সম্প্রদান'। নাটকের রূপান্তর করেছেন বিশ্বজিৎ দেবরায়, নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন বেনু চট্টোপাধ্যায়। নাটকটির প্রযোজনা বেশ ভাল। গণনাট্য আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় পুরুষ আন্নাভাউ সাঠে বাংলার দুর্ভিক্ষের ওপর পাওদা জাতীয় নাটক লিখেছিলেন। তাঁর 'মঙ্গলা' উপন্যাস অবলম্বনে বাংলায় বোম্মানা বিশ্বনাথম নাটক লিখেছেন 'অগ্নিদীক্ষা' শ্রেণীসংগ্রামেব যে নাটক প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৬৫-র 'জনান্তিক' পত্রিকায়।

বিদ্যাধর পুন্ডলীক রচিত 'চক্র' নাটক এই নামেই বাংলায় অনুবাদ করেন যূথিকা বসু যা প্রকাশিত হয় বহুরূপী প্রত্রিকায় (১৯৭৪)। 'চক্র' বাংলায় অভিনয় করে নান্দীকার, শিল্পীদের মধ্যে কেয়া চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষ উল্লেখ্য।

রণজিত দেশাই-এর ছোট গল্প 'কৌন ভ্রম ভুলে' বাংলায় অনুবাদ করেন যূথিকা বসু, নাম 'একটি রাগিনীর জন্ম'। গল্পটিকে নৃত্যনাট্যরূপে উপস্থাপিত করা হয়। নাট্যরূপ দেন ভাস্কর বসু, পরিচালনা ও সঙ্গীতে রঞ্জন মজুমদার, নৃত্যে ও অভিনয়ে বিভিন্ন সময়ে অংশ নেন শান্তি বসু, সাধন গুহ, নরেশ কুমার, রেখা মৈত্র, পলি গুহ, আরতি মজুমদার, শম্ভু ভট্টাচার্য, বটু পাল প্রমুখ। 'ছায়া হিন্দোল' সংস্থার প্রযোজনায় এই উচ্চমানের নৃত্যনাট্যটি বেশ কয়েকবার রূপায়িত হয়। জনপ্রিয় মরাঠী নাট্যকার বসন্ত কানেটকরের 'প্রেমা তুঝা রঙ্গ কাসা' নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেন দেবাশিস রায়। নাগপুর বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নাটকটি অভিনীত হয়। বসন্ত কানেটকরের আর একটি নাটক 'গোষ্ট জমান্তরীচী' বাংলায় অনূদিত হয়ে 'বহুভাষী নাট্য সমারোহ' উপলক্ষে কাশীতে অভিনীত হয় ১৯৮৫র নভেম্বরে।

বিষ্ণু বামন শিরওয়াডকর রচিত 'নট সম্রাট' ও চিন্তামন এ্যম্বক খানোলকর রচিত 'কালায় তস্মৈ নমঃ' বাংলায় অনুবাদ করেন কুমার রায় ১৯৮২ তে। 'নট সম্রাট' অভিনয় করে দিল্লীর নাট্য সংস্থা 'চয়ন'।

গোবিন্দ পুরুষোত্তম দেশপান্ডের বিশিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন সমৃদ্ধ 'উধবস্ত ধর্মশালা' বাংলায় অনূদিত হয়। মূল মরাঠী থেকে অনুবাদ করেন বীণা আলাসে ও কেতকী দত্ত, প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৮৪র বহুরূপীতে। নাটকটি নতুনভাবে উপস্থাপিত করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ অশোক মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়।

চন্দ্রকুমার নালাজের একটি মরাঠী ছোটগল্পের ওপর ভিত্তি করে ছোট নাটক লেখা হয় 'আত্মদান' যাতে দেশ ও সমাজের রক্ষার জন্য এক নারীর আত্মদানের কথা বলা হয়েছে। ১৯৮৪র নভেম্বর কলকাতায় সদ্যনিহত ভারবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এটি রূপায়িত হয়। 'অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল 'আত্মদান' শ্রুতিনাটক। মরাঠী কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত এই নাটকটি রচনা করেছেন পূর্ণশ্রী মিত্র। নাটকের বিষয়- বস্তু দর্শকের চিত্তকে আলোড়িত করে।''[৩৬]

অনন্ত বামন ভারতীয় একটি ছোট গল্প অবলম্বন করে একাঙ্ক নাটক লিখেছেন পূর্ণশ্রী মিত্র — 'যৌবনের গান'। নাটকটি 'ভারতীয় একাঙ্ক গুচ্ছ' সংকলনের (১৯৮৫) অন্তর্গত হয়।

অনিল বর্বে-র 'থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার গ্ল্যাড' বাংলায় দর্শকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। এই নাটক দুটি সংস্থা অনুবাদ ও অভিনয় করেছে। প্রথমে এর অনুবাদ করেন আশিস চৌধুরী এবং 'বিনোদন' সংস্থা ১৯৭৮-এ মিনার্ভা থিয়েটার বিজন মঞ্চ প্রভৃতি স্থানে এই নাটক মঞ্চস্থ করে। অপর অনুবাদ করেন মিঠু চ্যাটার্জী যাঁর অভিনয় ও নির্দেশনায় নাটকটি ১৯৮৬র জানুয়ারিতে কলকাতায় বিভিন্ন মঞ্চে একাধিবার অভিনীত হয়।

গঙ্গাধর গাডগীলের কৌতুক রসাত্মক নাটক 'স্নেহলতেচী শিলেদাবী' বাংলায় অনূদিত হয় 'সেপাই' নামে, অনুবাদ দিলীপ কুমার মিত্র। নাটকটি ১৯৮৩ তে 'চেনা অচেনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সতীশ আলেকরের 'মহানির্বাণ' বীণা আলাসে অনুবাদ করেন ঐ নামে। নাটকটি 'বহুরূপী' পত্রিকায় ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটি মঞ্চস্থ করেন অনসম্বল। পত্রিকায় প্রযোজনটি সম্বন্ধে লেখা হয় :

''অন্‌সম্বলের সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা 'মহানির্বাণ' একটা অভিনব অভিজ্ঞতা। সতীশ আলেকরের মূল মরাঠী রচনা অবলম্বনে রচিত এই নাটক যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উদ্রেক করে। উপস্থাপনার গুণে যথার্থই চিত্তচমৎকারী।

'অন্‌সম্বল' গোষ্ঠী আবির্ভাবের অল্পদিনের মধ্যেই দর্শক হৃদয়ে এমন একটা আসন লাভ করেছে যা অনেকের কাছেই ঈর্ষণীয়। ইতিপূর্বে মহেশ এলকুঞ্চওয়ারের 'ওয়াড়া চিরেবন্দী'র বাংলা রূপান্তর 'উত্তরাধিকার' মঞ্চস্থ করে এই দল যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। তারপর সমসাময়িক আরও এক মরাঠি নাট্যকারের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাটক মঞ্চস্থ করে তাঁরা এক বিশেষ নজির স্থাপন করলেন।

সতীশ আলেকরের নাম আজ আর বাঙালি নাট্যপ্রেমীর কাছে অজানা নয়। নান্দীকার আয়োজিত নাট্যোৎসবে তাঁকে যে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল তা অনেকেই জানেন। তাই তাঁর নাট্য সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। 'মহানির্বাণ'-এর অভিনয় দেখে আমাদের সেই ঔৎসুক্যে একটা নতুন মাত্রা যোগ হবে। বাঙালি দর্শকদের এ একটা বড় লাভ।

মূল মরাঠিতে 'মহানির্বাণ' প্রথম অভিনীত হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে পুণার ভরত নাট্য মন্দিরে। কিছু একাঙ্ক নাটক ও একটা পূর্ণাঙ্গ নাটক 'মিকি আনি মেমসাহেব' লিখে আলেকর তখন সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছেন। তারপর আলেকর নিজস্ব নাট্যজগৎ সৃষ্টি করেন। আর তাই ভাউরাও নিজেই তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনাগুলোকে প্রত্যক্ষ করেন দর্শককে হাসাতে, ভাবাতে অথবা ব্যাখ্যা দিতে। ভাউ যখন তার স্ত্রী অথবা পুত্র নানার (বাংলা রূপান্তর রাণা) সঙ্গে কথা বলেন তখন মৃত ও জীবিতের কথাবার্তা মজাদার হলেও বাংলা নাটকের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। কিন্তু এ নাটকের মজা ও নতুনত্ব অন্যত্র।

ভাউ যে পিতৃ-পুরুষের ব্যবহৃত চিতায় পুড়তে চান এবং তার সেই ধনুক ভাঙা পণ রক্ষা করতে তার ছেলে নানা কালোবাজারির খপ্পরে পড়ে। জমে ওঠে আলেকরের এই নাটক 'মহানির্বাণ'। এই নাটকের যেসব গুণ তাঁকে মরাঠি রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট নাট্য শিল্পীরূপে চিনিয়ে দিয়েছিল তারই আস্বাদ দান করেছে অন্‌সম্বলের এই প্রযোজনা।

দুই অঙ্কের এক জমজমাট নাটক এই 'মহানির্বাণ'। মূলত ভাউরাও (বাংলা রূপান্তরে রবি রায়) ও তার পরিবারকে নিয়েই এই নাটক। যখন ভাউকে তাঁর স্ত্রী সকালবেলা ঘুম থেকে তুলতে আসে তখন তিনি নিজেই প্রথমে স্ত্রীকে ও পরে দর্শকদের জানিয়ে দেন যে তিনি আর বেঁচে নেই। এমন একটা ঘটনা ঘটা সম্ভব কি না সে প্রশ্নকে এড়িয়ে নাটকে এমন একটা আবহ সৃষ্টি হয় যে কোন্‌টা বাস্তব, কোন্‌টা অবাস্তব অথবা ফ্যান্টাসি তা বুঝে ওঠার আগেই নাটক শেষ হয় যায়। আর তখনই বোঝা যায় এই সব বিবিধ উপাদানের সংমিশ্রণে নাটকটি প্রস্তুত। অর্থহীন নিয়ম পালন থেকে লাভ ওঠানোর আশায় উদ্‌গ্রীব পড়শীদের আচরণ ও প্রতিক্রিয়ার নানা স্তরে সেই রসের স্ফুরণ। ব্যঙ্গের খোঁচা অথবা হাসির খোরাক দুই-ই সমানভাবে পাওয়া যায় এখানে। নির্দেশনাকর্মে সোহাগ সেন আলেকরের নাটকের মর্ম অনুধাবন করেছেন শুধু নয়, তাঁর বোধকে বাংলাভাষার মাধ্যমে দর্শক মনে সঞ্চারিত করেছেন। বাঙালি পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে তাই মূল নাটকের বহুস্থান তাঁকে সাধ্যমতো পরিবর্তিত করতে হয়েছে। মূল নাটকে উক্ত 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম', 'রাধাকৃষ্ণ জয় কুঞ্জবিহারী' প্রভৃতি প্রচলিত সুরালাপের পরিবর্তে এমন কিছু শোনা যায় যাতে বাঙালি প্রাণ আশ্বস্ত হয়। ভাউ-এর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান (ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা) অথবা শ্মশানযাত্রীদের মিলিত কণ্ঠে রাহুলদেব বর্মণের গান (মনে পড়ে রুবি রায়) প্রভৃতি তারই উদাহরণ। নাটকের পরিবেশ ধরে রাখার পক্ষে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

গীতধর্মী সংলাপ, ছড়ায় কথোপকথন, প্রচলিত গানের কলি, সম্মিলিত অভিনয়, এ নাটকের সার্থকতার সোপান। মূল নাটকে সুর সহযোগে সংলাপ বলার যে নির্দেশ মাঝে মাঝেই পাওয়া যায় তা এই প্রযোজনায় ভাষান্তরে মান্য করা হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভিনয় অতিনাটকীয় মনে হলেও সম্মিলিত অভিনয় দৃশ্যে তা মানিয়ে যায়। সুব্রত মজুমদারের আলো ও অভিজিৎ বসুর সুর নাটকটির সার্থকতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।"

(বিপ্লব চক্রবর্তী, পাক্ষিক বসুমতী, ১ মে, ১৯৯৩)

মাধব অচওয়ালের 'অ্যাডমিশন' বাংলায় অনুবাদ করেন দীপায়ন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত হয় 'বহুরূপী' তে ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে। কলকাতার অপরূপ (নর্থ) এই নাটক প্রথম অভিনয় করে কলকাতায় ১৯৮২ তে। তাদের অভিনয় বিশেষ সুখ্যাতি হয়। জয়বন্ত দলভীর 'সন্ধ্যাছায়া' অনুবাদ করেন দীপক চট্টোপাধ্যায় নাটকটি 'বহুরূপী' (১৯৮৫) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দলভীর আর এক নাটক 'সূর্যাস্ত' বাংলায় বিশেষ সুখ্যাত হয়েছে। নাটকটি অনুবাদ করেছেন কল্যাণ চৌধুরী ও অরূপ দত্ত। এই নাটক ১৯৮৬ থেকে নিয়মিত অভিনয় করেছেন কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা 'ভূমিকা'। নির্দেশনায় ছিলেন মলয় বিশ্বাস। কলকাতা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই নাটকটি অভিনীত হয়। 'ভূমিকা'র প্রযোজনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মতামত উল্লেখ্য —

"ভূমিকা অভিনীত 'সূর্যাস্ত' অবশ্যই মৌলিক বাংলা রচনা নয়। জয়বন্ত দলভির একই নামের মারাঠী নাটকের সতর্ক ভাষান্তর। নাটকে প্রতিফলিত এগারোটি চরিত্রই আজকের সমাজের আলাদা সংকট-এর দেহীরূপ। শালিনীর অবরুদ্ধ সংক্ষোভ ও অসহায়তা, সুনীল-এর অপদার্থতা ও ব্যক্তিহীনতা আর মাতাজীর তীব্র উৎকণ্ঠা ও সরল

পতিপ্রেমকে ছাপিয়ে শান্তারাম-এর নিষ্ঠুর আচরণ ভয়ঙ্কর এক বিরোধের সূচনা করে। এই বিরোধই গোড়ার দিকের সংঘাত — যাকে বলা যেতে পারে কল্যাণবোধের সঙ্গে দানবিক স্বার্থসিদ্ধির লড়াই। অবশ্যই নির্মাণে কঠিন কিন্তু রূপায়ণে স্বতঃস্ফূর্ত। নির্দেশক মলয় বিশ্বাস কোথাও স্থপতির মতো, কেথাও সুদক্ষ চিত্রকরতুল্য। আবার মোশানমাস্টার হিসাবে তাঁর চোখ ও উপলব্ধি রয়েছে সর্বদা সজাগ। ফলে নাটকগুলোর অধিকাংশই প্রয়োজনে হয়েছে জীবন্ত ভাস্কর্য, কোথাও প্রাণবন্ত চিত্রকল্প এবং বর্ণাঢ্য চালচিত্র। দৃশ্য সজ্জা, আবহসংগীত, আলো ও ধ্বনি রচনার প্রত্যেকটি পর্যায়ের সহযোগিতা অবশ্যই দৃষ্টান্তযোগ্য। এর সঙ্গে একাধিক মুহূর্তে কণ্ঠসংগীতে পরিবেশিত কবীর এর ভজনাংশের সংযোজন এমন এক অনুস্যূত বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ যে, এক থেকে অন্যকে আলাদা করতে গেলেই অঙ্গহানি ঘটবে, রসহানিও। সংঘবদ্ধ অভিনয়কে কেন্দ্র করেই প্রয়োগ প্রকল্প রচিত। কখনোই ভোলা যাবে না অচমকা ভেঙে পড়া বাবুজীর গীতা পাঠের মুহূর্তটি অথবা স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার ক্ষণের ছবিটি। ভোলা যায় না মাতাজীর অভিভূত কণ্ঠে বলা অতীতের নিঃসঙ্গতা ও অভাববোধের কথা। শালিনীর অপদস্থ আত্মার করুণ আকুতি। অচ্ছুত 'গাইকোয়াড়' -এর জবানবন্দী। রূপায়ণের দিক থেকে উল্লিখিত চরিত্ররা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। একমাত্র বাবুজী এখানে জ্বলন্ত ভিসুভিয়াস। উত্তর মধ্যাহ্নের দাবহাহের সঙ্গে শুভবোধের আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণ ঘটেছে শরণ চ্যাটার্জির বাবুজী চরিত্রের অভিনয়ে। আদর্শের কাছে জীবন তুচ্ছ কিন্তু জীবনের কাছে আদর্শ নয় যেমন তেমনি দেশের কাছে সন্তান তুচ্ছ সন্তানের কাছে দেশ নয় — অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবুজীর এই প্রতিজ্ঞা শেষতক নিটোল থাকতে দেখি। 'মাতাজী' রূপী কাজল চৌধুরীও শরণের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে গেছেন। ওঁকে যেমন মানিয়েছে, তেমনি চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছে কণ্ঠকারুকৃতি। ওরই মধ্যে মনে থাকবে স্বামীর কাছে নিজেকে মেলে ধরার অবিস্মরণীয় ক্ষণটি। 'গাইকোয়াড়' চরিত্রে সুনীল চ্যাটার্জীর অভিনয়-এ রয়েছে সংযম, আবেগ ও শঙ্কা। এ তিনের প্রয়োগ সম্পর্কে সুনীল ওয়াকিবহাল। মুখ্যমন্ত্রী বালা সাহেবের আবির্ভাব কম কিন্তু কাজ নয়। আদর্শবান পিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ চরিত্রের রূপকার পঙ্কজ দত্ত অনমনীয় ব্যক্তিত্বকে ভাস্বর করে তুলেছেন। রাজনীতির জাঁতাকলে পড়া অসহায় অর্থমন্ত্রী রূপে বিমল দেবের অভিনয় অল্পেই অনেক। নির্দেশক নিজেই 'অমরনাথ' চরিত্রের রূপকার। এক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা স্বীকৃত। 'শান্তারাম'-এর নিষ্ঠুরতা যন্ত্রণার মতন। জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত কিন্তু কাচিয়ে ফেলার নয়। দীপক সরকার এর রূপায়ণে দক্ষতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। 'সুনীল' কে ছুঁয়ে থাকতে পেরেছে মানিক পাল। 'শালিনী'র কাজে আরও আন্তরিকতার প্রযোজন ছিলো। গঙ্গা পাল-এর আনন্দী স্বার্থপর অথচ স্বামী গরবে গরবিনী। নির্দেশককে বলি কমিটমেন্ট মানেই কি ঘরের সবগুলো দরজা জানালা হাট করা?

অসামান্য এই প্রয়োগের আলাদা আলাদা অঙ্গের সুদক্ষ চিত্রী তাপস সেন (আলো), কল্যাণ চৌধুরী (মঞ্চ সজ্জা), হিমাংশু পাল (ধ্বনি), সাধন চক্রবর্তী (সংগীত)। নাটকটির বঙ্গরূপদাতা কল্যাণ চৌধুরী ও অরূপ দত্ত''। (প্রবোধবন্ধু অধিকারী)[৩৭]

জয়বন্ত দলভী-র 'কালচক্র' অবলম্বনে 'এই সময়' লিখেছেন তন্ময় কর্মকার। তাঁরই নির্দেশনায় ভবিষ্যৎ সংস্থা এই নাটক প্রযোজনা করে। জয়বন্ত দলভীর 'মহাসাগর' বাংলায় অনুবাদ করেছেন দিলীপ কুমার মিত্র এবং চেনা অচেনা গোষ্ঠীর আহ্বানে এটি পঠিত ও পর্যলোচিত হয় ১৯৯৮ এ।

মরাঠী থিয়েটার বিভিন্ন প্রকারে বাংলা নাটকে প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত করেছে। 'ঘাসিরাম কোতওয়াল' জব্বর প্যাটেলের পরিচালনায় এক অসামান্য শিল্পকর্মরূপে পরিগণিত। এই নাটকের আঙ্গিকগত প্রভাব বাংলা নাটকে আছে মনে হয় যেমন — 'মহাকালীর বাচ্চা' প্রভৃতিতে।

একক অভিনয়শিল্পী পু.ল. দেশপান্ডের প্রভাব আছে 'অপরাজিতা'র রূপকার তৃপ্তি মিত্রব ওপর। দেশপান্ডের একক অভিনয়-এর কথা শুনে তৃপ্তি মিত্র অনুপ্রাণিত হন একক অভিনয় করতে। নীতিশ সেনকে সেমত নাটকের জন্য বলেন, অনেক ভাবনা চিন্তায় গড়ে ওঠে নাটক, এবং তাকে রূপায়িত করেন তৃপ্তি মিত্র।

শাঁওলী মিত্রর 'নাথবতী অনাথবৎ' বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়। নাটকের কাহিনী, বক্তব্যের অভিনবত্ব ও মৌলিকতায় অভিনব হয়ে উঠেছে, একক অভিনয়ের রীতিটিও অভিনব ও আনন্দ দায়ক। কথকতার ঢঙে কাহিনীর প্রকাশ একক রূপায়ণে যা বিন্যস্ত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজনমত গান, জুড়ি দলের দোহার : লোক আঙ্গিকের সুন্দর প্রয়োগ এখানে পাই। এই অভিনয়ের রীতির প্রয়োগে শিল্পী পূর্বসূরীদের কাছে ধণী। তাঁর নাটকের কাহিনীরও প্রেরণা তিনি নিয়েছেন প্রখ্যাত মরাঠী লেখিকা ডঃ ইরাবতী কর্বে-র মননশীল গ্রন্থ 'যুগান্ত' থেকে যার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন নাটকের সূচনায় ও অভিনয়ের মধ্যে। নাটকের প্রারম্ভে তিনি জানিয়েছেন —

"বাবার সঙ্গে (শম্ভু মিত্র) আলোচনা করি নানা বিষয় নিয়ে। একদিন কথায় কথায় বাবা কথকতার কথা বললেন। বিভিন্ন প্রদেশে কী কী ধরনের কথকতা হয়, কী কী বিষয় নিয়ে ইত্যাদি। আমার মনটা নেচে উঠল। মনে হল যেন রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। এই ফর্মটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে আকর্ষণ করল মহাভারত। ইরাবতী কার্ভের বই পড়ে সব সংশয় গেল ঘুচে।"[৩৮]

বিদুষী নারী ও মননশীল লেখিকা ডঃ ইরাবতী কর্বে রচিত 'যুগান্ত' মহাভারতের নতুনতর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। এই বইটি মরাঠী ভাষায় ১৯৬৭ তে প্রকাশিত হয় ও অ্যাকাডেমি পুরস্কার পায়। বইটির ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকের সঙ্গে 'যুগান্ত'র অনেক জায়গায় আক্ষরিক সাদৃশ্য আছে। কয়েকটি উল্লেখ করা যায় —

ক) 'দ্রুপদ নন্দিনী যে কষ্ট ভোগ করেছিল, সে বড় বাস্তব কষ্ট, সে এই মাটির কষ্ট, আমাদের ইরাবতী দিদি বলেছে এ এক যুগের কষ্ট।'[৩৯] (নাথবতী অনাথবৎ)
'হ্যা যুগান্ত হোতা। হ্যা যুগান্ত্যাচী প্রত্যেক যাতনা দ্রৌপদীনে ভোগলী।'[৪০] (যুগান্ত)

খ) 'যে অর্থে দ্রৌপদী এই মাটির মেয়ে, সেই অর্থে ভীমও এই মাটির সন্তান' (নাথবতী অনাথবৎ)
'দ্রৌপদী জ্যা অর্থানে পার্থিব হোতী ত্যা অর্থানে তোহী পার্থিব হোতা। তী ভূমিকন্যা হোতী, তসা তো ভূমিপুত্র হোতা।'[৪১]

গ) "সারাজীবন ধরে তার কষ্টের মধ্যে ভীমই বোধ হয় এই কথাটি বার বার তাকে বলতে চেয়েছে! 'পাঞ্চালী, তোমার কি বড় কষ্ট হচ্ছে'!

আজ এতদিন বাদে হঠাৎ তার দুচোখ জলে ভরে ওঠে মশায়েরা — তার শুকিয়ে যাওয়া মুখটিতে ফোটে হাসি। অতিকষ্টে সে দুটো হাত বাড়িয়ে ভীমের মুখটি ধরে, অন্ধকার নেমে আসা চোখ দুটোকে কোনো রকমে মেলে ধরে তার দিকে — তার চোখের জলে ভীমের মুখটা ভেসে যেতে থাকে। তারপর তার শেষ নিঃশ্বাসটুকুকে অবলম্বন করে

সে বলে 'আর জন্মে তুমি আমার হয়ো ভীম, কেবল তুমি আমার হয়ো। তোমার কোলে মাথা দিয়ে তাহলে আমি একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারব, কেবল তুমি আমার হয়ো ভীম। তুমি আমার হয়ো।''

"'ক্যায় করু তুঝ্যাসাঠী'? ত্যানে অড়খলত বিচারলে। নেহমীচাচ আয়ুষ্যভর বিচারলেলা, পণ হ্যা পরিস্থিতীত অগদী নিরর্থক, গৈরবাজবী প্রশ্ন হোতা তো। দ্রৌপদী প্রসন্ন হসলী। ভীমাচে তোন্ড আপল্যা তোন্ডাজবল আণুন আপল্যা শেরটচ্যা শ্বাসানে তী ম্হনালী, পুঢল্যা জন্মী পাঞ্চাতলা থোরলা ভাউ হো, ভীমা! তুঝা আসর্যাখালী আমহী সারী নির্ভয়পণে আনন্দাত রাহু।"[৪২]

["তোমার জন্য কি করব? ভীম আস্তে আস্তে বলল। এই প্রশ্ন ভীম সারা জীবন করেছে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তা নিরর্থক, অর্থহীন। দ্রৌপদী প্রসন্ন ভাবে হাসল। ভীমের মুখ তার মুখের কাছে এনে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'পরের জন্মে তুমি পাঁচজনের বড় হয়ো ভীম, তোমার ছত্রতলে আমরা সবাই নির্ভয়ে ও আনন্দে থাকব"।]

মহেশ এলকুঞ্চওয়ারও বাংলা মঞ্চে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তার 'হোলি' বাংলায় অনুবাদ করেছেন অশিস গোস্বামী যে নাটকটি রথীন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'নাট্যচিন্তা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নভেম্বর ৯৩ — ফেব্রুয়ারি ৯৪ সংখ্যায়। সোহাগ সেনের পরিচালনায় অন্‌সম্বল নাট্যসংস্থা মহেশ এলকুঞ্চওয়ারের নাটক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। 'ওয়াড়া চিরেবন্দী' অবলম্বনে 'উত্তরাধিকার' (১৯৮৫)। প্রযোজনা সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় এমন লেখা হয়—

"বাংলা রূপান্তরে 'ওয়াড়া চিরেবন্দী'- কে সামান্যই পালটাতে হয়েছে সুব্রত নন্দীকে। তাঁর 'উত্তরাধিকার' খুঁটিয়ে দেখলে একটা চমৎকার দ্বৈতের বোধ হয়। সংস্কারবদ্ধ ঐ পুরনো জীবনচর্যা ও তার মূল্যবোধ, বিশেষত যৌথ পরিবারের যে মোহময় দ্যোতনা ও তার অবক্ষয়ে যে বিলাপ আমাদের নাটকে-চলচ্চিত্রে বারবার আমাদের চোখে জল এনে দিয়েছে, 'উত্তরাধিকার' যেন বারবার সেই মায়ার আবহে আমাদের টেনে এনেই আবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, উদ্‌ঘাটন করে তার অন্তর্নিহিত ব্যাধিলক্ষণ।

অন্‌সম্বল-এর প্রযোজনায় নির্দেশিকা সোহাগ সেনের পরিচালনায় মহেশের নাটকের ঐ জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে। খালেদ চৌধুরির মঞ্চ পরিকল্পনায় দুটি ঘর একটি উঠানের পিছনে একটি বারান্দা এবং কয়েকটি দরজার বিন্যাসে ধরা যায় যৌথ পরিবারের আপাত অঙ্গাঙ্গিতার পিছনে অগণিত বিচ্ছেদ। তাও মহেশের নাটকে বাড়ির সামনে যে অচল ট্র্যাকটরটির অনড় অবস্থানের কথা বহুবার শোনা যায় (এই পরিবারের সদ্যোমৃত গৃহকর্তা একদা ট্র্যাকটর কিনেছিলেন, আধুনিকতার সঙ্গে রফা করবেন বলে, সে-ট্র্যাকটর মাঠে নামেনি কোনওদিন, এখন মাটিতে বসে গিয়ে কখনও বাড়ির লোকেদের শাড়ির পাড় ছিঁড়ে দেয়, নয়তো বেমক্কা কারও রক্তপাত ঘটায়), তার উপস্থিতি (সরাসরি দৃশ্যে না করেও) কি আরেকটু প্রত্যক্ষ করা যেত না? বস্তুত মহেশের নাট্যরচনায় এই পর্বে সমাজবাস্তবের বস্তুলগ্ন উন্মোচনের বিস্তীর্ণ বিন্যাসের মধ্যে মধ্যেই এক একটি তীব্র প্রতীকী উচ্চারণের প্রবণতা আছে — যেমন এই ট্র্যাক্টরের জড়ত্ব অথচ আঘাত হেনে যাওয়ার অদ্ভুত বৈপরীত্যে কিংবা বড়বৌ যখন পরিবারের বহুদিনের সঞ্চিত গহনাভারে নিজেকে চুপিসাড়ে অলঙ্কৃত করেন, এবং সেই গহনার বাক্স নিয়েই ঘরের ছোট মেয়ে যখন পলাতকা হয়। নাটকের বাস্তবতার দৈনন্দিনতার প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠায় সোহাগ এই প্রতীকী মাত্রাটি ধরতে সচেষ্ট হন না।

সোহাগের জোর পড়েছে বাস্তবধর্মী অভিনয়ে — বয়স, প্রতিবেশের প্রলোভন, অন্তর্নির্হিত কোনও চরিত্রলক্ষণের কারণে এই পরিবারের এক একজন কীভাবে তার সংস্কারের সঙ্গে টানাপোড়েন করে, তার মাত্রা ধরেই তিনি চবিত্রগুলিকে দাঁড় করান — যেমন হওয়ার কথা স্বাভাবিকবাদী নাটকে। প্রায় পরিপন্থী দুটি স্ত্রীচরিত্র দাঁড়িয়ে যায়, সরাসরি সংঘাতে না এসেও প্রচ্ছন্ন সংঘাতের অন্তঃশীলা উত্তেজনা জেগে ওঠে — স্বরূপা দাশ ও সংগীতা চক্রবর্তীর অভিনয়ে—দুজনেই বিদ্রোহিনী, সংস্কারবিচ্ছিন্না, অথচ কী বিভিন্ন— একজনের চাপা রাগ, অন্যজনের চূড়ান্ত দায়জ্ঞানহীনতায়। এই বৈপরীত্য নিয়ে সোহাগ যেভাবে হাল্‌কা অথচ সচেতন চালে খেলা করেছেন, তারই রকমফের আসতে পারত হীরেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথের বৈপরীত্যে, যখন একজন সংস্কারের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে নিজেকে প্রায় উদ্ভিজ্জে পরিণত করে, অন্যজন নেশায় পালাবার পথ খোঁজে। রজত সেনগুপ্ত ও আশিস নস্কর তাঁদের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেই ক্ষান্ত, যেমন ক্ষান্ত বড় বৌ-এর ভূমিকায় অলকানন্দা দত্ত— দোষে-গুণে, সংকীর্ণতা-সংবেদনায়, আবেগে-হিসাবিপনায় নিপাট মধ্যবর্তিনী।

মহীন্দ্রনাথের অসহায়তারই হয়ত প্রকাশ তার ইতর শব্দব্যবহারে, ভাষায়, হীনবল বিদ্রোহীপনায়। কিন্তু অতি দাশের অভিনয়ে এসে যায় প্রায় একটা ইতরতাবিলাসই যেন— তাতে মারা পড়ে চরিত্রের অন্তর্গত জটিলতা, তার নিহিত দুর্বলতার সঙ্গে অবিরত লড়াইয়ের মাত্রা। বস্তুত এই দুই দম্পতির বিরোধের কৃষ্টিগত দ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট হয় না, নাটক হয়ে ওঠে না।

অথচ যারা গ্রামের পাঁচমহলায় রয়ে গেল আর যারা তার কারগার থেকে পালিয়ে গিয়ে বড় শহরের মধ্যবিত্ততার অন্য কারাগারে বন্দী হল, তার দ্বন্দ্ব মহেশের নাটকে ঐতিহাসিকতায় সমুজ্জ্বল। বিদর্ভ-কোঙ্কনের বিরোধকে ঘটি-বাঙালের বৈপরীত্যে চমৎকার পুনঃসংস্থান করে দুই দেশজ কৃষ্টির দ্বন্দ্বের যে-সম্ভাবনাটি সোহাগ উন্মোচন করেছিলেন, তাও শেষ পর্যন্ত বেশি দূর গেল না। স্বতন্ত্র চরিত্রায়ণে সোহাগ ও তাঁর কুশীলবদের কৃতিত্ব যতটা অবিসংবাদিত, নাটকের মর্মকথার সামগ্রিক বিস্তারে ততটা নয়। তবে সোহাগের দক্ষতা দেখে ভরসা হয়, এ ধরনের প্রযোজনায় যা হতেই পারে, চরিত্রগুলি ক্রমেই সম্পর্কের ও বিরোধের সূচীমুখগুলির দিকে এগোতে থাকবে, পুনরভিনয় থেকে পুনরভিনয়ে।

স্বাভাবিকবাদী থিয়েটারের যে পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল 'নীলাম নীলাম'-এ, তারই প্রসার দেখলাম 'উত্তরাধিকার'-এ। সহজ থিয়েটারি কলাকৌশল কিংবা জটিলতর থিয়েটারি বিন্যাসের বাইরে শুদ্ধ বাস্তবের শক্তিতে শক্তিমান এক থিয়েটার বাংলায় ফিরে আসছে। দেখে আশান্বিত ও উৎসাহী বোধ করি।

অন্‌সম্বল যখন তাঁদের প্রথম অভিনয় নিবেদন করেন সফদার হাশমির স্মৃতিতে, তখন তাঁরা একথাও জানিয়ে দেন যে তাঁরা থিয়েটার করছেন বাস্তবের প্রতি দায়বোধেই, থিয়েটারের শুদ্ধ শখে নয়। (শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ৭.৪.১৯৮৯)"

'মগ্ন তল্যাকাঠী' নাটকও 'উত্তরপুরুষ' নামে অনুবাদ করেছেন সুব্রত নন্দী ১৯৯০ সালে এবং এটিও অসামান্য মঞ্চরূপ পেয়েছে। প্রযোজনা অন্‌সম্বল, পরিচালনা সোহাগ সেন।

সোহাগ সেন পরিচালিত অন্‌লম্বন — এর 'পার্টি' সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হল —

মধ্যবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্তের নৈতিক অবক্ষয়ের কিংবা আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতারই শুধু নয়, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী পরিমন্ডলে এই মানসিকতা কিছু না-হতে পারা থেকে স্বার্থ-সন্ধিৎসু হতে হতে কীভাবে এড়িয়ে যায় বৃহত্তর সামাজিক চেতনার সংস্পর্শ, হয়ে পড়ে বিবেকহীন ও বাক-সর্বস্ব—এ সবের একটা আদল সোহগ সেন খুঁজে পেয়েছেন এলকুঞ্চওয়ারের 'পার্টি' নাটকে। সময় ঃ সত্তর দশকের গোড়া, স্থান ঃ মধ্যবয়সী বিধবা দময়ন্তীর বাড়িতে এক মদ্যপানের সমাবেশ, উপলক্ষ ঃ প্রগতিপন্থী নাট্যকার দিবাকরের কোনও পুরস্কার-প্রাপ্তি। দময়ন্তী, দিবাকর ছাড়াও এই সান্ধ্য পার্টিতে ক্রমশ আসবে দিবাকরের একদা 'ব্যর্থ' অভিনেত্রী এবং এখন কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রী মালিনী, বাণিজ্যসফল নাট্যকার ইন্দ্রজিৎ, নতুন রীতির সম্ভাবনাময় নাট্যকার ভাস্কর, তেমন কোনও পরিচয়হীন স্বভাব-উচ্ছল মালবিকা এবং তার ঘুমকাতুরে বয়ফ্রেন্ড নরেন্দ্র, চৌখশ সমাজকর্মী যুবতী বৃন্দা এবং সাংবাদিক অরুণ। নাটকের শুরু থেকেই থাকে প্রায় নিরপেক্ষ আরও দুজন—দময়ন্তীর সহমর্মী বন্ধু এক স্বল্পবাক ডাক্তার এবং দময়ন্তীর 'কুমারী-জননী' মেয়ে সোনা। এদের সকলকেই দেখা যায় মঞ্চে। মঞ্চে দেখা না গেলেও—প্রায় বেকেটের গোডো-র মতো—পরোক্ষ উপস্থিতিতে পার্টির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে যুবক অপূর্ব, সাহিত্য ও রাজনীতিতে সমানভাবে দায়বদ্ধ এবং সেই কারণেই, সংসদীয় রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যে এখন দূরে কোথাও গিয়ে অংশ নিয়েছে আদিবাসীদের স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে।

ডাক্তার, সোনা এবং অপূর্ব যে আলাদা ধরন পাবে, নাট্যকার-আরোপিত তাদের চরিত্রের বহির্লক্ষণেই তা স্পষ্ট। যে-অর্থে অপূর্ব বিদ্রোহী, তার চেয়ে একটু অন্যরকম অর্থে সোনাও তা-ই। ডাক্তারের কাজ ভারসাম্য রক্ষা করা। অন্যরা সচ্ছল, কিন্তু অসুখী; তাদের লক্ষ্য যে-কোনও মূল্যে সাফল্য, স্বীকৃতি। পার্টিতে তাদের কথাবার্তার বিষয় সাহিত্য, রাজনীতি, নারী- পুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি; নৈতিক সততা থেকে দূরে সরে এসে এরা ফাঁপা ও নকল, যেমন নকল এই পার্টি। পারস্পরিকতার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি ক্রমশ উন্মোচন করে নিজেদের হতাশায় সৃষ্ট অন্তঃসারশূন্যতাকে, গালভরা কথার অর্থহীনতাকে। এরই মধ্যে হঠাৎ অপূর্বর মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে আসে সাংবাদিক অরুণ। যে-পার্টি এতক্ষণ ভাঙতে ভাঙতেও জোড়া লেগে যাচ্ছিল, সেই পার্টিই ভেঙে যায় অবশেষে : অপূর্বর মৃত্যুতে হা-হুতাশ করে, আদিবাসীদের দোষারোপ করে এবং শোকসভা আয়োজনের কথা জানিয়ে— যে সভাও অবশ্যই হবে এই পার্টিরই মতো নকল। অপূর্বর জীবন ও আদর্শের কোনও মূল্যই থাকবে না সেখানে। বোম্বাইয়ের উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের একটি ছোট অংশকে নিয়ে লেখা 'পার্টি' মূল মারাঠী ভাষায় 'অনিকেত'-এর প্রযোজনায় এবং অমল পালেকরের পরিচালনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৬-এ। ১৯৮৪- তে নাটকটিকে একই নামে হিন্দিতে চলচ্চিত্রায়িত করেন গোবিন্দ নিহালনি, চিত্রনাট্য তৈরি হয় এলকুঞ্চওয়ারেরই হাতে। বোম্বাইয়ে প্রথম অভিনয়ের প্রায় পনেরো বছর পরে কলকাতায় এনে এই নাটককে কতটা স্থায়িত্ব দেওয়া যাবে তা ভাবনার বিষয়। তবে, সোহাগ সেনের কৃতিত্বই বলতে হবে, বাংলা রূপান্তরকে তিনি নিজের মতো করে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বাসযোগ্যতায়।

বিশেষ উল্লেখ করতে হয় তাঁর মঞ্চ ব্যবহারের। একই সময়ে নাটকটি অভিনীত হয় মঞ্চের তিনটি ক্ষেত্রে—ড্রইংরুম, বেডরুম এবং দোলনা-ঝোলানো পোর্টিকোয়। যখন যে-অংশের অভিনয় গুরুত্বপূর্ণ তখন আধিক্য পায় সেই অংশের আলো ও পাত্র-পাত্রীদের স্বরক্ষেপণ, কিন্তু অন্য অংশের ঘটনাও স্তব্ধ হয় না। বরং এইভাবেই—পার্টিতে যেমন

হয়—মঞ্চের বিভিন্ন অংশে পাত্র পাত্রীদের মধ্যে তৈরি হয় কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও আড়ালের সংযোগ। এই সংযোগ রচনায় তাপস সেনের আলো এবং নন্দন বাগচির আবহ যুক্ত করেছে সৃজনশীল মাত্রা।

যে-নাটকে চরিত্রদেরই গুরুত্ব, সেখানে ছোট বড় সব চরিত্রের অভিনেতৃই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন না হলে অভিনযে টিম-ওয়ার্ক দানা বাঁধে না। পার্টিতেও তেমনটাই হয়েছে। অলকানন্দা দত্তের চাপা অভিনয়ে দময়ন্তী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হতাশা যত সহজে অসামান্য রূপ পায়, তাপস ঠাকুর যেভাবে ব্যক্তিত্ব দেন দিবাকরকে, যতটা অনায়াসে নিবপেক্ষতা অর্জন করে বুদ্ধদেব সমাদ্দারের ডাক্তার, কিংবা মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে-দাপটে বৃন্দার উপস্থিতি টের পাইয়ে দিতে থাকেন সোহাগ সেন — অন্যান্য চবিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রীরা অনুরূপ দক্ষতায় একাত্ম হতে পারেন না চরিত্রের সঙ্গে। অন্যরা যেমন তেমন হলেও, ডলি বসু (মালিনী) প্রায়ই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নাটকীয়, সংলাপ বলতে বলতে রজত সেনগুপ্ত (ইন্দ্রজিৎ) প্রায়ই এসে পড়েন পার্টির ছকের বাইরে— যেন পার্টিকে নয়, তাঁর সম্বোধন দর্শককে। তবে সামগ্রিকভাবে দর্শনীয় দুর্বলতা বলা যাবে না। (দিব্যেন্দু পালিত, ২৮.৬.১৯৯১)।

মহেশ এলকুঞ্চওয়ারের 'প্রতিবিম্ব' ঐ নামেই অনুবাদ করেছেন ও মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন জয়তী বসু ১৯৯০ সালে প্রতিবিম্ব নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায়। এটিও বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। অরবিন্দ বিশ্বনাথের 'অন্ধারাতীল ভীতি' বিপ্লব চক্রবর্তী অনুবাদ করেন 'ভয়' নামে।

মধুসূদন কালেলকর রচিত অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক 'পেইং গেস্ট' অবলম্বনে নাটক 'প্রজাপতি মন'। এটি বাংলায় সুন্দর রূপান্তরিত করেছেন লাকি মুখার্জী। মুম্বাই-এর প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা আনন্দম এটি মহাসমরোহে মঞ্চস্থ করে মুম্বাই এবং কলকাতাতে। এদের প্রযোজনায় পেশাদারী দক্ষতার ছাপ আছে। মঞ্চসজ্জা বেশ সুন্দর, সঙ্গীতে নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। অভিনয়ও উচ্চমানের। প্রধান চরিত্রে লাকি মুখার্জী ডন জুয়ানীয় যুবকের ভাবভঙ্গী আচার ব্যবহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য যথাযথ তুলে ধরেছেন। মিতার ভূমিকাভিনেত্রী গোপা মিত্রও উন্নতমানের অভিনয় করেছেন। অশোক চ্যাটার্জী, দিব্যেন্দু গাঙ্গুলী, রমেশ মুখার্জী, তপন বিশ্বাস, অঞ্জলি ফরিয়া, মহুয়া ইন্দোলকর, তনুশ্রী মুখার্জী ও বিজয়লক্ষ্মী মুখার্জী যথাযথ। কৌতুকরসের চমৎকার রূপায়ণ এই বর্ণাঢ্য নাটকটির পরিচালনায় লাকি মুখার্জী অত্যন্ত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

চি.ত্র. খানোলকরের 'কালায় তস্মৈ নমঃ' বাংলায় পরিবেশন করেছেন শিলিগুড়ির বলাকা নাট্য গোষ্ঠী ১৯৯৭ সালে। নাটক অনুবাদ করেছেন কুমার রায়, নির্দেশনায় ছিলেন কল্যাণ দাশগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন পরিতোষ ঘোষ, প্রলয় চক্রবর্তী, রুদ্রেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, কল্যাণ দাশগুপ্ত, অসীম কুমার নন্দী, স্মৃতিরেখা গাঙ্গুলী, অলোকা চক্রবর্তী, যূথিকা নন্দী। তাঁদের স্মারকপত্রে বলা হয়েছে যে 'কালায় তস্মৈ নমঃ' নাটকটি 'একই সঙ্গে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চেতনা জাগানোর কথা বলে এবং পাশাপাশি বর্তমান সময়, যেখানে মানুষ ব্যক্তি হিসাবে শুধু নয় সমাজবদ্ধ প্রাণী হিসেবে নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের ভাললাগা ভালবাসা সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে নির্মমভাবে বিচূর্ণ করে বা করতে চায় তার কথাও বলে। সেই সময়ে নাটকের চরিত্র তার ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তার ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে আরও বড় জায়গায়। চরিত্রটি তখন মাত্রা পায় সেই সব মানুষের বা সমাজের'।

তেন্ডুলকরের 'কমলা' বাংলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ভারতীয় ভাষা পরিষদ-এর যুবা গোষ্ঠী নাটকটি Silent Play রূপে উস্থাপিত করে ১৯৮৭ সালে ডঃ দীপক চন্দ্র পোদ্দারের পরিচালনায়। অভিনয়ে অংশ নেন ঋতিকা সাহনী, কৃষ্ণেন্দ দে, অমিত শ্রীবাস্তব, সুব্রত মন্ডল, চকিতা চট্টোপাধ্যায় ও আরতি গণাত্রা। নতুন রীতির এই প্রযোজনাটি দর্শকদের সহর্ষ অভিনন্দন লাভ করে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন নরনারায়ণ হরলালকা।

'কমলা' ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের উদ্যোগে নির্বাক নাটক রূপে উপস্থাপিত হয ১৯৯৬ সালে। পরিচালনায় ছিলেন প্রখ্যাত মাইম শিল্পী নিরঞ্জন গোস্বামী। এই প্রযোজনাও বিশেষ সফল হয়।

'কমলা' বাংলা প্রসেনিয়াম মঞ্চেও মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছে। আগে বলা হয়েছে 'ভূমিকা' নাটকটি প্রযোজনা করে ও বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। চেনা অচেনা নাট্যসংস্থাও এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছে অজস্রবার ও নাটকটি বিপুল সমাদর লাভ করেছে। নাটকের পরিচালনায় সমর দত্ত বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পত্রিকার অভিমত দেওয়া হল।

কমলা

বিহারের লোহারডাঙার মানুষ-কেনাবেচার হাট থেকে ঘুরে এসে দিল্লির বিখ্যাত সৎ সাংবাদিক জয় সিংহ যাদব মাত্র আড়াইশো টাকায় সে মেয়েটিকে কিনে নিয়ে যায়, সেই আদিবাসী, হতদরিদ্র মেয়েটির নাম 'কমলা'। তার রক্তে এ ব্যাপারটা এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, সে এর মধ্যে যে অমানবিক কোনও ব্যাপার থাকতে পারে, তা সে কল্পনাই করতে পারে না। গরীব হলে, জাতে বা সমাজে পতিত হলে স্বচ্ছল মানুষের কেনাবেচার, ভোগের পণ্য হবে, এটাই স্বাভাবিক বলে তার বিশ্বাস। এবং এই বিশ্বাস তার জাতের মধ্যেও।

এইভাবেই চাইল্ড লেবার, বণ্ডেড লেবারদের সৃষ্টি। এমন সব কথা, সুখে জীবনযাপন করা সাংবাদিকের স্ত্রী সরিতা, তার কাছ থেকে শুনে প্রথমটা চমকেই উঠেছিল। কিন্তু নিজের দীর্ঘ দশ বছরের বিবাহিত জীবন, নির্ভীক সৎ চমকপ্রিয় সাংবাদিক স্বামীর সঙ্গে ঘর করা, মতবাদ ব্যক্ত করা বা পৌরুষের শিকার হবার ঘটনা তার মধ্যেও প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়ে দিল। এক সময় সরিতার মনে হল সেও কোনও না কোনও অর্থে বণ্ডেড লেবার, ক্রীতদাসী, ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষের ইচ্ছার ক্রীড়নক মাত্র। জয় সিংহ একালের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সাংবাদিক। আদর্শ তার ভেক। কমলাকে সে এনেছিল স্রেফ চমকের জন্য। অন্যদিকে এই মানুষই এস্টাব্লিশমেন্টের হাতের পোষা ক্রীড়নক। যেখানে সচ্ছলতা এবং জীবনের ঝুঁকি পাশাপাশি বিদ্যমান। নাটকে আর একজন সাংবাদিকের উপস্থিতি আছে। তিনি প্রবীণ এবং সৎ। অন্যায়ের সঙ্গে কোনও দিনই কমপ্রোমাইজ করেননি।

নাটকের চরিত্র মাত্রই গুটি পাঁচ ছয়। কমলা, সরিতা, দুই সাংবাদিক ছাড়া, একালের আর এক সাংবাদিক ও সামান্য সংলাপ বলা বাড়ির রাঁধুনি-কাম-কেয়ারটেকার।

'কমলা'র এ নাটকে সংলাপ খুবই কম। যেটুকু আছে তার মধ্যে আনন্দ এবং বিস্ময়ই বেশি। চমৎকার দেহাতি উচ্চারণে কমলাকে সজীব করে তুলেছেন শান্তি জানা। শিক্ষিত

মার্জিত রুচির সরিতার ভূমিকায় রুনা মুখোপাধ্যায় মন্দ নয়। সাংবাদিক বন্ধু জৈন-এব ভূমিকায় অসীম চক্রবর্তী অনেকটাই চরিত্রানুগ। আদর্শবাদী সাংবাদিক কাকা সাহেবের ভূমিকায় সুভাষ ঘোষ যে অভিনয় করেছেন সেটি তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। অমিত মুখোপাধ্যায়, জয় সিংহ চেষ্টা করেও আড়ষ্টতা কাটাতে পারেননি। গৌতম দাশের রামদেও টাইপ চরিত্র। অতএব চলে যায়।

তবুও ঘনবদ্ধ, জটিল নাটকটিকে অনেকটাই স্বচ্ছন্দ করে পরিবেশনের কৃতিত্ব অবশ্যই নাট্যকার (মূল নাটক বিজয় তেণ্ডুলকর) পরিচালক সমব দত্ত'র যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচায়ক। তাঁর আবহ রচনাতেও নাটকটি বাঙ্ময় হয়ে ওঠায় সাহায্য করেছে।

(শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, আনন্দলোক)

ডঃ রঞ্জন দরভেকর এর 'অস ঝলস কস' (এমন বা এটা কি করে হল) বাংলায় অনুবাদ করেছেন তারা পন্ডিত ও মধুছন্দা ঘোষ 'শেষ নয়' নামে। রঞ্জন কলামন্দির (মুম্বাই) - এর সহযোগিতায় আজকের থিয়েটার সংস্থা এই নাটকের অভিনয় করে কলকাতায়। পরিচালক — মুকুল ঘোষ, বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন — গুরুপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মুকুল ঘোষ, অভি ভট্টাচার্য, অশোক ঘোষ, প্রদ্যোৎ গাঙ্গুলী, বিশ্বজিৎ দেবরায়, কমল ব্রহ্ম, মধুছন্দা ঘোষ, রুচিরা দাস, কৃষ্ণা রায়, শান্তা সেন, স্বাতী সেনগুপ্ত ও গৌতম। তাঁদের প্রচারপত্রে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন — 'বিশ্বব্যাপী যে AIDS আতঙ্ক শুরু হয়েছে এবং যার প্রতিষেধক এখনো গবেষণাব স্তরে — সেই নৈরাশ্যের অন্ধকারে কিছুটা আলো দেখাবার প্রয়াসই আমাদের উদ্দেশ্য। হতাশা নয় লড়াই — এই জীবনবোধই এই নাটকের মূল কথা'।

দলিত গল্পকার ভীমরাও শিরওয়াল-এর গল্প অবলম্বনে দিলীপ কুমার মিত্র লিখেছেন এক নারী চরিত্রের নাটক 'জীবন'। নাটকটি সুন্দর অভিনয় করেছেন শুক্লা দাস এবং সেটি ড্রামা একাডেমী ইন্ডিয়া জার্নালে (জানুয়ারী ২০০১) প্রকাশিত হয়েছে। ওয়ামন হোভাল-এর গল্পের প্রেরণায় দিলীপ কুমার মিত্র লিখেছেন 'পাকা বাড়ি'। নাটকটি দলিত নাট্যগুচ্ছ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'পাকা বাড়ি' হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন উমা জয়সওয়াল বাংলা থেকে। মহারাষ্ট্রের নবীন প্রজন্মের শক্তিশালী নাট্যকার শফত খান-এর 'শোভযাত্রা' নাটক বাংলার অনুবাদ করেছেন বীণা আলাসে যেটি ২০০০এর শূদ্রক পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রশান্ত দলভীর 'চার চৌঘী' বাংলায় অনুবাদ করেছেন তারা পণ্ডিত ও বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ 'চারদুয়ার' নামে। গান্ধার প্রথম এটি মঞ্চস্থ করে ২২.২.২০০২ উত্তম মঞ্চে। সম্পাদনা ও নির্দেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যপুরুষ মেঘনাদ ভট্টাচার্য। এটি অত্যন্ত সফল ও শিল্পময় প্রযোজনা। সম্প্রতি শ্যামল ঘোষের পরিচালনায় 'চাণক্য বিষুগুপ্ত' মঞ্চস্থ হয়েছে।

পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এভাবেই বাংলা ও মবাঠী নাটক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

সূত্র পরিচিতি

১. নটসম্রাট ও কালায় তস্মৈ নমঃ, ভূমিকা—মাধব মনোহর, পৃঃ VIII, নয়াদিল্লী, ১৯৮২
২. Theatre in Maharashtra. K. N. Kale. P 8. New Delhi, 1967.
৩ A Panorama of Theatre in India, Som Benegal. P. 76, Bombay, 1968.
৪. নটসম্রাট ও কালায় তস্মৈ নমঃ, ভূমিকা—মাধব মনোহর, পৃঃ VIII, নয়াদিল্লী, ১৯৮২
৫. নটরঙ্গ, নেমিচাঁদ জৈন সম্পাদিত, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা (প্রবন্ধ-মরাঠী রঙ্গমঞ্চ পর প্রস্তুতি ঔর অভিনয়, যশবন্ত কেলকর), দিল্লী, ১৯৬৫।
৬. Marxist Cultural Movement in India, Ed Sudhi Pradhan (Provincial Reports Bombay, P. 147), Calcutta, 1979.
৭. এপিক থিয়েটার, উৎপল দত্ত সম্পাদিত (প্রবন্ধ-আন্নাভাও সাঠের কাহিনী, নিরঞ্জন সেন, পৃঃ ৭৯), অক্টোবর নভেম্বর ১৯৭৮।
৮. ডঃ অমৃতনারায়ণ ভালেরাও স্মৃতি গ্রন্থ, মরাঠী রঙ্গভূমি ঃ মরাঠী নাটক, পৃঃ ২৬২, মুম্বাই, ১৯৭১।
৯. আসর পত্রিকা, সত্যচরণ ঘোষ সম্পাদিত (প্রবন্ধ-মরাঠী নাটক ঃ সেকাল ও একাল, সুকৃতি রায়চৌধুরী, পৃঃ ২৭, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭০।
১০. New Directions in the Marathi Theatre, D Nadkarni, P 25, New Delhi, 1967.
১১. বহুরূপী, শম্ভু মিত্র সম্পাদিত (প্রবন্ধ-আজকের মরাঠী থিয়েটার, দ. নাদকার্ণী), কলকাতা, মার্চ ১৯৭২।
১২. তেন্ডুলকারঞ্চে নাটক, ডঃ রমেশ ঘোংগড়ে, পুণে, ১৯৭৯।
১৩. নট সম্রাট ও কালায় তস্মৈ নমঃ, ভূমিকা—মাধব মনোহর, পৃঃ X, নয়াদিল্লী, ১৯৮২।
১৪. Enact, Ed. R. Paul (article — Experiment, Malhar Dhage), New Delhi, Oct-Nov. 1976.
১৫. Enact, Ed. R. Paul (article — Unrealized Potential : Achyut Waze, Rajeev Naik), New Delhi, Jan-Feb., 1979.
১৬. Enact, Ed. R. Paul (article — Satish Alekar's Ambiguous Black Comedies, Dr. P. N. Panarjape), New Delhi, July-Aug. 1982.
১৭. বহুরূপী, শম্ভু মিত্র সম্পাদিত (প্রবন্ধ — 'বুট পালিশ' প্রসঙ্গে, দুর্গা ভাগবত, পৃঃ ১৯৪) কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।
১৮. হিন্দী ও মরাঠীকে ঐতিহাসিক নাটক, প্র. রা. ভুপটকর, পৃঃ ১৯৩,
১৯. Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebrations Vol. II, Ed. S. C. Sengupta (article — Rabindranth and Marathi Literature G. D. Khanolkar, P. 36) Santiniketan.
২০. কাবুলিওয়ালা, নাট্যরূপ হনুমন্ত রাও গো. মোরে, ভূমিকা, ১৯৫৭।
২১. কাবুলিওয়ালা, নাট্যরূপ নারায়ণ গো. শুক্ল, উৎসর্গপত্র, পুণে, ১৯৬১।
২২. Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebration Vol. II, Ed. S. C. Sengupta (article—Rabindranath and Marathi Literature B. V. Warerkar, P. 23) Santiniketan.
২৩. রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য, ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮, কলকাতা, ১৯৬৭।
২৪. ভূমিকন্যা সীতা, মামা ওয়ারেরকর, প্রস্তাবনা, পৃঃ ৫, ১৯৬২।
২৫. Natya Sodh Sangsthan (Lecture — Basant Kanetkar, Cassetts No. 172), Calcutta, 26.11.1985.

২৬. Natya, Tagore Issue (Dance drama of Tagore, Dr Charles Fabri, P 23), New Delhi.
২৭. দৈনিক বসুমতী, কলকাতা, ২৬.৫.৮৫।
২৮. The Hindu, Madras, 22.5.1987
২৯ The Golden Book of Saratchandra, All Bengal Sarat Centenary Committee, Calcutta, 1977
(প্রবন্ধ — শরচ্চন্দ্রাঞ্চা মরাঠী সাহিত্য বরীল প্রভাব, বসন্ত বাপট, পৃঃ ২৮)
৩০. Natya Sodh Sangsthan (Lecture — Basant Karetkar. Cassettes No 172), Calcutta, 26 11 1985.
৩১ বহুরূপী, শম্ভু মিত্র সম্পাদিত (প্রবন্ধ — নতুন মরাঠী থিয়েটার, বিজয় তেন্ডুলকর, পৃঃ ৮০) কলকাতা, ১৯৭২।
৩২ The Economic Times, Bombay, 22 2.1976
৩৩. Enact, Ed R Paul (Amal Palekar Interviewed, Sunita Paul), New Delhi. July-Aug., 1975
৩৪. রাজা ওয়াদিপাউস, অনুবাদ, পু. ল. দেশপান্ডে, ভূমিকা, মুম্বাই, ১৯৭৯।
৩৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২৪.১২.৭১।
৩৬. কালান্তর, কলকাতা, ৬.১১.৮৪।
৩৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১০.৭.৮৬।
৩৮. কলকাতা ২০০০, জ্যোর্তিময় দত্ত সম্পাদিত, (নাথবতী অনাথবৎ, শাঁওলী মিত্র, পৃঃ ১৭), কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮৩।
৩৯. তদেব, পৃঃ ৪০।
৪০. যুগান্ত, ইরাবতী কর্বে, পৃঃ ১৪৪, পুণে ১৯৬৭।
৪১. তদেব, পৃঃ ১২৬।
৪২. তদেব, পৃঃ ১২৭।

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক ওড়িয়া নাটক

১. সূচনা পর্ব

আধুনিক অর্থে যা নাটক, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে তার নিদর্শন পাওয়া যায় না। ওড়িশার সঙ্গীত ও নৃত্যের অসাধারণ উৎকর্ষ দেখা যায় এবং নাটকে বলতে অধিকাংশ সময়েই তাদের মিলিতরূপ বোঝাত যার রূপায়ণ দেশের সর্বত্র সব মানুষের মধ্যে পাওয়া যেত। ওড়িশা শিল্প ও স্থাপত্যের মহৎ সৃজনক্ষেত্রও বটে, এবং দেশের বৃহৎ মন্দিরসমূহে নৃত্যসভা ও নাটমন্দির স্থাপিত ছিল। বলা বাহুল্য এই সব নাট্যসাধনার সঙ্গে ধর্মের সংযোগ ছিল প্রধান। ক্রমশ লীলা সুআঙ্গ যাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ওড়িয়া নাটক বিকশিত হতে থাকে যা উনবিংশ শতাব্দীতে এসে একটা স্থির রূপ পায়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কিছু নাটক লেখা হলেও (যেমন রঘুনাথ পরিছার গোপীনাথ বল্লভ নাটক, ১৮৬৮) **জগনমোহন লালা-র** 'বাবাজী' (১৮৭৭) আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত প্রথম ওড়িয়া নাটক রূপে বিবেচিত হতে পারে। তৎকালীন সমাজের কুরীতি ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি লালার নাটকে প্রকাশিত। নাটকের প্রধান চরিত্র এক সন্ন্যাসী ও নায়িকা এক পতিতা। তাঁর অপব নাটক 'সতী' তে দেখানো হয়েছে কি ভাবে সমাজের উচুতলার অর্থবান মানুষদের প্ররোচনা ও অত্যাচারে গরিব ঘরের মেয়েরা বিপথগামিনী হয়।

রামশংকর রায় (১৮৫৮-১৯৩১) ওড়িয়া নাটকের নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। "রামশংকর রায়ের প্রথম নাটক 'কাঞ্চী কাবেরী' ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয় এবং সব দিক বিবেচনা করে তাঁকে আধুনিক ওড়িয়া নাটকের জনক বলা যায়।"[১] রামশংকর প্রায় তিরিশটা আধুনিক নাটক লিখলেও তাঁর প্রথম নাটক 'কাঞ্চী কাবেরী' তাঁকে বিরল সম্মান দিয়েছে। ওড়িয়ার ইতিহাসের এক রোমান্টিক অধ্যায় নিয়ে নাটক। সূর্য বংশের রাজা পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চী বা কাঞ্চীভরমের রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে নিয়ে আসেন। এক অন্ত্যজর সঙ্গে তিনি তার বিয়ে দিতে চান কারণ কাঞ্চী রাজা পদ্মাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে চাননি। কিন্তু বুদ্ধিমান মন্ত্রীর কৌশলে শেষ পর্যন্ত পুরুষোত্তম দেবের সঙ্গেই পদ্মাবতীর বিবাহ হয়। অত্যন্ত আর্কষণীয় এই কাহিনীর পরিবেশনায় নাট্যকার বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। নাটকটি মঞ্চোপযোগিতাব সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যগুণেও সমৃদ্ধ। রামশংকর 'রামাভিষেক', 'লীলাবতী', 'শ্রীচৈতন্যলীলা', 'হিন্দুরমনী' প্রভৃতি পৌরাণিক সামাজিক নাটকের সঙ্গে সুআঙ্গও লিখেছেন।

রামশংকরের সমসাময়িক কামপাল মিশ্র 'সীতাবিবাহ' (১৮৯৯) ও 'বসন্তলতিকা' নামে দুটো নাটক লেখেন যা সে সময়ে খুব খ্যাতি পেয়েছিল। 'সীতাবিবাহ' ওড়িয়া ভাষায় প্রথম চলচ্চিত্রের রূপ পায়।

পদ্মনাভ নারায়ণ দেব ও রাধামোহন রাজেন্দ্র দেব ওড়িয়া নাটক ও মঞ্চের উন্নয়নের জন্য প্রয়াস পান। পদ্মনাভ অনেক নাটক লেখেন, তাঁর 'বাণদর্পদলন' মঞ্চস্থ হয় ১৯০২ সালে। চিকিরির রাজা রাধামোহন রাজেন্দ্র দেব বিশশতকের প্রথম দুই দশকে নাট্যব্যক্তিত্ব

রূপে বিশেষ স্মরণীয়। তিনি একাধারে নাট্যকার নাট্যনির্দেশক রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষকও। তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। 'শ্রী প্রতাপ' তাঁর বিশিষ্ট নাটক।

আধুনিকতাব সূচনালগ্নে স্মরণ করতে হবে **বৈষ্ণব পাণিকে** যিনি রাসলীলা কালীয়দমন ইত্যাদি পালাধর্মী রচনায় দক্ষ। ভক্তি তার নাটকের মর্মমূলে বিরাজিত।

২. প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব

কান্তকবি **লক্ষীকান্ত মহাপাত্র** (১৮৮৮-১৯৫৩) ঔপন্যাসিক কবি প্রবন্ধকার রূপে স্মরণীয়। সঙ্গীতেও তিনি দক্ষ। নাটকরচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। একদিকে গম্ভীর ভাবমূলক পৌরাণিক নাটক তিনি লিখেছেন ভক্তি বিনম্র চিত্তে — যেমন 'কর্ণ', 'কালীয়দমন', 'বংশী শিক্ষা', 'শ্রী শ্রী গৌরসন্ন্যাস'; অন্যদিকে সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক নাটকে তাঁর সমাজভাবনা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেমন — 'পরীক্ষা ফল', 'হনুমন্ত বস্ত্র হরণ', 'ফিল্মষ্টার', 'মহামিলন সমস্যা', 'সুইসাইড' ইত্যাদি।

পন্ডিত **গোদাবরীশ মিশ্র** (১৮৮৮-১৯৫৬) একজন মহান দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক। কবিতা গল্প উপন্যাস লেখক হিসাবে বিশিষ্ট। নাটকের ক্ষেত্রেও আপন প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর দুইটি ঐতিহাসিক নাটক 'মুকুন্দ দেব' ও 'পুরুষোত্তম দেব' (১৯৭১) আজও সমান আদৃত। ওড়িশার শেষ স্বাধীনরাজা মুকুন্দদেবের সঙ্গে বাংলার যবন সেনাপতি কালাপাহাড়ের ঘোরতর যুদ্ধ ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুকুন্দদেবেব আত্মদান প্রথম নাটকের এবং কাঞ্চীবিজেতা পুরুষোত্তম দেবের বীরত্বপূর্ণ কথা দ্বিতীয় নাটকের বিষয়। আর্দশদীপ্ত গভীরভাবময় এই দুটি নাটক আজও স্কুল-কলেজের ছাত্রদের অভিনীত প্রিয় নাটক। ডঃ মায়াধর মানসিংহ বলেছেন যে তাঁর নাটক দুটি কাবণে বিশেষ উল্লেখ্য প্রথমত, ভাবনার অপরূপ কাব্যিক প্রকাশ ও ভাষার সৌন্দর্য, এবং দ্বিতীযত, তীব্র স্বাদেশিক ভাবনা যা দুটি নাটকে প্রকাশিত। মূলত এই কারণেই দুটি নাটক, বিশেষত 'পুরুষোত্তম দেব', ওড়িশার স্কুল কলেজে প্রবল উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। পন্ডিত মিশ্রর 'পুরুষোত্তম দেব' নাটকের যে কোন গান যুদ্ধ প্রত্যাগত কোন বিজয়ী সৈন্যদলের রণসঙ্গীত হতে পারে।[২]

বালকৃষ্ণ করের দুটি নাটক বিখ্যাত হয় — 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯২৬) ও 'শিবদাস' (১৯২৭ শেকসপীয়রের কিং লীয়র অবলম্বনে)

নাট্যভারতী নাট্যরত্নাকর **অশ্বিনীকুমার ঘোষ** (১৮৯২-১৯৬২) পঁয়ত্রিশেরও বেশী নাটক লিখেছেন। পুরাণ ইতিহাস ভক্তিতত্ত্ব রাজনীতি সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট হল 'ভীষ্ম' (১৯১৫) 'সাবিত্রী' (১৯২৭), 'রিফর্মড লেডী' (১৯১৬) 'পাইকপুত্র' (১৯৩৩, এক সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে ক্ষত্রিয় রাজা ও পাইকপুত্রের দ্বন্দ্ব), 'উৎকল গৌরব' (১৯৩২, আত্মদানের মহৎ বিষয় নিয়ে লেখা ঐতিহাসিক নাটক), 'কালাপাহাড়', 'শ্রীমন্দির' (১৯৪০? পুরীর জগন্নাথ মন্দির নিয়ে পৌরাণিক নাটক), 'বন্ধু মহান্তি' (১৯৪৫, ওড়িয়ার সমাজ চিত্র), 'চন্ডালুনি' (১৯৫১ অস্পৃশ্যতা সমস্যা নিয়ে লেখা) ইত্যাদি। তিনি ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় অধ্যায়কে তুলে ধরেছেন, ওড়িশার প্রাচীন গৌরবকে উদ্ভাসিত করেছেন, সামাজিক অন্যায় দুর্নীতিকে আঘাত করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের দীপশিখা প্রোজ্জ্বল রাখতে চেয়েছেন।

ত্রিশের পরবর্তী ওড়িয়া নাট্যসাহিত্যে যে বিশিষ্ট প্রবণতা দেখা গেল তা পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় নতুনত্বের সঞ্চার করল যাকে আধুনিক বলে উল্লেখ করা যায়। এসময়ের

নাটকে এল প্রবল সমাজচেতনা—দেশভক্তি ও স্বদেশানুরাগ নাটকে দীপ্ত হল। নাটকের আঙ্গিকে দেখা দিল নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য। প্রতিষ্ঠিত হল পেশাদার মঞ্চ যা নাটককে অগ্রগতি দান করল। তৃতীয় দশকে নাটকে এই নতুনের বোধন হল। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, কালীচরণ পটনায়ক, হরিশ্চন্দ্র বড়াল, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক প্রমুখকে আধুনিকতার স্রষ্টারূপে উল্লেখ করা যায়। সমালোচক বলেছেন—

Kalindicharan Panigrahi's 'Piyadassi' (1933) Harish Ch. Baral's 'Deser Dak' (1932), Baikunthanath Pattanayaka's 'Mukti Pathe' (1933), and Mayadhar Mansinha's 'Nasta Nida' (1939) may be described as model plays gradually introducing the new trends and techniques in modern dramatic writings.[৩]

ত্রিশের পর মানুষ হয়েছে থিয়েটার সচেতন এবং নতুন মানসিকতা নিয়ে এলেন নাট্যকাররা। সারা দেশের জাগ্রত গণচেতনার সঙ্গে সমতা রেখে ওড়িয়া নাটকে যে সমাজরাজনীতি সচেতনা দেখা দিল তা অভিনব। এবং নতুন যুগের উদ্ভাসক রূপে অন্নপূর্ণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৬ সালে।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী (১৯০১-১৯৯১) গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। এক মহৎ আদর্শের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। 'মাটির মনিষ' (১৯৩১) উপন্যাসে সামাজিক পারিবারিক ভাঙন অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃপ্রেম দেশপ্রীতি মানবিকতার অপরূপ উদ্ভাস পাওয়া যায়। গ্রামের প্রতি অনুরাগ, গ্রামসন্নিকর্ষ জীবনের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা, কৃত্রিম নিষ্প্রাণ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পীঠস্থান শহর থেকে দূরে সহজ সরল গ্রামীণ আর্দশকে বরণ করা ইত্যাদি ছিল গান্ধীজীর শিক্ষা এবং কালিন্দীচরণের রচনায় তা পাওয়া যায়। 'মাটির মণিষ'-এর নাট্যরূপ (প্রাণবন্ধু কর কৃত) সারা দেশে অভিনীত হয়েছে। কালিন্দীচরণ তিনের দশকে অনেক একাংক লিখেছেন (যেমন 'সৌম্য' ১৯৩২ 'পদ্মিনী' ১৯৩৩ ইত্যাদি) যারা আদর্শে প্রদীপ্ত ও আঙ্গিকের বিচারেও নতুনত্বের দিশারী।

হরিশ্চন্দ্র বড়াল রচিত 'দেশের ডাক' (১৯৩২) স্বদেশ চেতনার উদ্দীপিত নাটক। লেখক বৈপ্লবিক ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামাদিক দুর্নীতির দিকেও অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। এই নাটকের বৈশিষ্ট্য হল এতে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে আর্ন্তজাতিকতার কথাও শোনা গেল যা ওড়িয়া নাটকে অনেকটাই অভিনব। হরিশ্চন্দ্র গীতি নাটকও লিখেছেন, 'লীলা সঙ্গিনী' (১৯৪১) যার সুন্দর নিদর্শন।

বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক (১৯০৪-১৯৭৯) কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও নাটকরচনায় প্রভূত খ্যাতি পেয়েছেন। তার কবিত্ব কল্পনাপ্রবণতা সৌন্দর্যবোধ নাটকে ধরা পড়েছে। 'মুক্তিপথে' তাঁর বিশিষ্ট নাটক যাতে সমাজে নারীর স্থান ও অধিকার নির্ণয়ের প্রয়াস আছে। এবং সংসারে কল্যাণের ক্ষেত্রে তার যথার্থ ক্ষেত্র তা বলা হয়েছে।

মায়াধর মানসিংহ (১৯০৬-১৯৭৩) কল্পনাপরায়ণ কবি ও মননশীল প্রাবন্ধিক। নাটকে ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার দীপ্ত স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'পূজারিণী' (ধর্ম ও প্রেমের অপরূপ আখ্যান), 'পুষ্পিতা' (নারীত্বের বিভিন্ন পর্যায় — শিশু বালিকা নারী — নাটকায়িত), 'বারবাটী' (কটকের ঐতিহাসিক বারবটী দুর্গ নিয়ে লেখা), 'বুদ্ধ' (বুদ্ধের জীবনও শিক্ষাভিত্তিক) ইত্যাদি।

চল্লিশের পর পালটে গেল পটভূমি পরিবেশ।

'এলো দুর্ভিক্ষ। অতি করাল অতি কুটিল বর্ণনাতীত বীভৎস দুর্ভিক্ষ দেখা দিল মালাবারে বিজাপুরে ওড়িশায়। শস্যশ্যামলা বাঙ্গলাদেশ নিদারুণ দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত হয়ে

গেল।"[৪] ভয়াল দুর্ভিক্ষ তার হিংস্র করাল ছায়া ফেলেছে সারা ওড়িশায়। মৃত্যুর প্রহর গুনছে মানুষ। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ওড়িশার রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে প্রবল আঘাত হেনেছে। জমিদার কালোবাজারী আর মুনাফাখোরের দল আদিম হিংস্র উল্লাসে মেতে উঠেছে মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলায়। শোষিত নিপীড়িত মানুষ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার চেয়েছে, চেয়েছে মনুষ্যত্বের অধিকার।

যুগের এই ক্রোধ বিক্ষোভ বেদনা যন্ত্রণা জ্বালাদাহকে রূপায়িত করতে এগিয়ে এলেন নাট্যকাবগণ, **কবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়ক** (১৮৯৮-১৯৭৮) ১৯৪৪-এ রচনা করলেন 'ভাত', ১৯৪৫-এ তা অভিনীত হল বিপুল উম্মাদনায় — রচিত হল ইতিহাস। সারা ভারত গণনাট্য আন্দোলনের সামিল হল ওড়িয়া নাটক। ঐতিহ্যনিষ্ঠা আব প্রথানুবর্তনকে অতিক্রম করে নতুন পথে চলতে শুরু করলেন ওড়িয়া নাট্যকারগণ। বলা যেতে পারে ওড়িয়া নাটকে যথার্থ আধুনিকতার সূত্রপাত হল এখান থেকেই।

"'ভাত' কালীবাবুঙ্কর এক সামাজিক তথা সমস্যামূলক নাটক। ১৯৪৩ মসিহারে রাজ্যর পড়িথিবা খাদ্যাভাবর নগ্নচিত্র এথিরে প্রদত্ত।..... আম দেশর চাষী মুন্ডঝাল তুন্ডরে মারি ফসল আমদানি করে সত, কিন্তু দুঃখ তা জীবনরু ঘুঞ্চেনা। জমিদার ও সাহুকারর লাল আঁখি দেখি তার স্বাধীনতা সংকুচিত হোই যাএ। এহি পারস্পরিক সত্য মধ্য নাটকটিরে প্রতিভাত।"[৫]

কালীচরণ পট্টনায়কের 'ভাত' নাটকের কাহিনী স্মরণ করা যাক — ওড়িশায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ — গ্রামে নিঃস্ব রিক্ত কৃষকরা কোনক্রমে দিন কাটায়, তর ওপর জমিদার অত্যাচার খাজনা। একদিন অভুক্ত সারাক্ষণ কর্মরত চাষী রঘুনাথকে জমিদার বিক্রম রায়ের পেয়াদা ধরে নিয়ে যায় বাকীর দায়ে। রঘুনাথের মেয়ে রমা ছুটে যায় জমিদারপুত্র সহানুভূতিপরায়ণ জয়ীর কাছে যে টাকা দিয়ে ছাড়ায় রঘুকে। জয়ী রমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ মহামারী — কিন্তু জমিদার প্রজাদের পীড়ন করে টাকা আদায় করে। অন্যদিকে জয়ী, তার বন্ধু অনন্ত, সমাজসেবী স্বামীজী প্রভৃতি সমাজ-সচেতন যুবকরা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তাদের সচেতন আর জাগ্রত করতে চায়। জয়ী ও রমা কাছাকাছি আসে, অনন্ত জয়ীর বোন জমিদার কন্যা বিজয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়। জয়ী ও রমার কথা শুনে ক্রুদ্ধ জমিদার এক ধনী ভুইঞার কন্যার সঙ্গে জয়ীর বিয়ে স্থির করে ও প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করতে যায়। প্রজারা প্রতিরোধ করে জমিদারের অন্যায়কে, জয়ী ও অনন্ত সাহায্য করে তাদের। জমিদার পিতার উদ্যত বন্দুকের সামনে দাঁড়ায় জয়ী। বেদনায় ক্রোধ অপমানে জমিদার দূরে সরে যায়। কিন্তু সকলের অনুনয় ও পরামর্শে তার শুভচেতনা ফিরে আসে, তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়, প্রজাদের মঙ্গলের কথাও সে ভাবে। শেষ পর্যন্ত জয়ী-রমা অনন্ত-বিজয়ার মিলন হয়, প্রজারা পায় শান্তি আনন্দ।

বর্তমানকালে নাটকটির আবেদন যতই সামান্য মনে হোক সে সময়ে একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এই নাটক। দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রাম-ওড়িশার করুণ চিত্র, কৃষক ও নিম্নবিত্ত মানুষদের দুর্দশা, জমিদারের অত্যাচার, লাঞ্ছিত শোষিত মানুষের প্রতিরোধ এবং অত্যাচারের অবসান ও সাধারণ মানুষের অধিকার অর্জন নাটকটিকে অসাধারণ আবেদনশীল করে তুলেছিল। তার ওপর এর আশ্চর্য প্রযোজনা একে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলে দেয়। প্রথম পর্যায়ে মঞ্চায়নেই এই নাটকের শতরজনীর গৌরবময় অভিনয় হয়েছিল যা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে ওড়িশার নাট্য-ইতিহাসে।

কালীচরণের আর একটি নাটক 'রক্ত মাটি'-ও প্রাসঙ্গিক উল্লেখের দাবি রাখে। এই নাটকে পুঁজিপতি মিল মালিকদের অত্যাচার শোষণ চিত্রিত। যন্ত্রশিল্পের করালছায়া গ্রাম্যশিল্পের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে, সাধারণ মানুষ শোষিত নিপীড়িত। কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকা তার হক অধিকার কারুর দয়া বা অনুগ্রহ নয়, লক্ষ্য তার ভিক্ষা নয় দাবি। এবং কোন দাবি আদায় করতে গেলে জাতিকে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়, স্বার্থত্যাগও করতে হয় — 'স্বার্থত্যাগ ন কলে কৌণসি জাতি মুন্ডটেকি পারে না।' 'চল রে আলোকপথ যাত্রী' গানটিও নাটকেব ভাববস্তু নির্মাণে সাহায্য করেছে।

যশস্বী নাট্যকার, নাট্যপরিচারক, সঙ্গীতেজ্ঞ, নৃত্যবিশাবদ কালীচরণ পট্টনায়ক দীর্ঘদিন নাট্যসাধনায় ব্রতী আছেন। মঞ্চ ও সাহিত্যের মধ্যে তিনি যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তিনি অভিনয়রীতির কৃত্রিমতা বাঁধাধরা একঘেয়েমি পরিত্যাগ করে তাকে সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক করে তুলেছেন। তাঁর সংলাপও আশ্চর্য স্বাভাবিক এবং সাহিত্যগুণান্বিত। সঙ্গীতবিশারদ কালীচরণ নাটকে সঙ্গীতের নিপুণ ব্যবহাব করেছেন, কখনো কখনো মনে হয় তাঁর নাটকের সাফল্যের মূলে শৈল্পিক নাট্যোৎকর্ষ অপেক্ষা সঙ্গীতের সার্থক প্রয়োগ ও নিখুঁত মঞ্চায়নই বেশী কার্যকারী হয়েছে। যাত্রা ও সুআঙ্গের দক্ষ প্রয়োগ তাঁর নাটকে পাই। দর্শক মনোরঞ্জনের প্রায় সবকটি উপাদানই তিনি ব্যবহার করেছেন। শ্রীমতী নন্দিনী শৎপথী তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন — Kavicharana Kalicharan Patnaik is told to be a landmark in the history of Oriya literature who gave a definite shape to Oriya social plays and improved the stage craft and introduced songs and dances after the traditional style prevalent in Orissa.[৬] অবশ্য আধুনিক সমালোচকগণ কালিচরণের সমালোচনায় একটু বেশী কঠোর বা নির্মম, কিন্তু যুগের অনিবার্য দাবিকে তিনি মেনে নিয়েছেন — তিনি যুগাশিল্পী, ওড়িয়া নাট্যসাহিত্য তাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক — একথা অস্বীকার করা যায় না।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব

স্বাধীনতার পরবর্তী নাট্যকার বক্তব্য হিসাবে নিয়েছেন সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়কে এবং দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ, অত্যাচারী জমিদার মহাজন ও রক্তশোষক শিল্পপতিদের আঘাত আক্রমণ করেছেন। যদিও সমাজ সমস্যার গভীরে তাঁরা সব সময় যাননি, অর্থনৈতিক সংকটে কারণ অনুধাবন করে তার উৎপাটনের চেষ্টা তাঁরা করেননি। সঠিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণও এদের মধ্যে সবর্দা পাওয়া যায় না। তবু সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা মথিত পারিবারিক জীবনের রূপচ্ছবি অঙ্কনে তাঁরা দক্ষতা দেখিয়েছেন, বিবিধ সমস্যা-সংকটে ক্লিষ্ট সমাজ তাঁদের রচনায় এসেছে, মানুষের কল্যাণময় জীবনের ঐকান্তিক বাসনা নাটকে প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চাশ পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে স্মরণীয় গোপাল ছোটরায়, ভঞ্জকিশোর পট্টনায়ক, উদয়নাথ মিশ্র, যদুনাথ দাস মহাপাত্র, রামচন্দ্র মিশ্র, প্রাণবন্ধু কর, ব্যোমকেশ ত্রিপাঠী, কমললোচন মহান্তি প্রমুখ নাট্যকার। স্বাধীনতা পরবর্তী কোন কোন নাট্যকার জীবনের গভীরে গেলেন, দুরধিগম্য অতলস্পর্শী মানবহৃদয়ে অবগাহন করলেন, সমাজ সমস্যার সঙ্গে মনস্তাত্তিক জটিলতার মিশ্রণ ঘটল। এই ভাবের নাটক লিখেছেন মনোরঞ্জন দাস যাকে ওড়িয়াই নয়, আধুনিক ভারতীয় ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে অভিহিত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে মনোরঞ্জন দাসের 'আগামী' (১৯৫২) থেকেই, বলা যেতে পারে, ওড়িয়া নব নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত।[৭]

গোপাল ছোটরায় (১৯১৮) বেতার নাটকের রচয়িতা হিসাবে অতি স্মরণীয় নাম। মঞ্চ নাটকেও তিমি সফলতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে স্মরণীয় 'ফেরিআ'

(১৯৪৭) 'ভরসা' 'অর্ধাঙ্গিনী' 'ঝঞ্ঝা' 'পথিক' 'পরকলম', 'নুআ-বৌ', 'নষ্ট উর্বশী', 'ঘটক' 'প্রতিজ্ঞা' ইত্যাদি। 'ভরসা' (১৯৫৩) নাটকটি শিল্পের বিচারে উল্লেখ্য — নীলা শংকরকে বিয়ে করতে গিয়ে তার মদ্যাসক্তির পরিচয় পেয়ে হতাশায় দরিদ্র শিল্পী মোহনের আশ্রয় নেয়। খল চরিত্র কুমার সাহেব মোহন অঙ্কিত নীলার ছবি দেখে তাকে পেতে চায়। সে কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে নীলাকে সেই চাকরি পাইয়ে দেয়, আর এক দুর্বৃত্ত নারী শ্রীমতী দাসের সাহায্যে নীলাকে কলকাতায় নিয়ে আসে। বেদনার্ত মোহন কলকাতায় আসে ও দৈবক্রমে কুমার সাহেবের স্ত্রীকে দেখে যাকে কুমার সাহেব বিয়ে করেও নারীসুরার আকর্ষণে পরিত্যাগ করেছে। অনেক দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ আবেগ উৎকণ্ঠার ভেতর দিয়ে কাহিনী এগোয়। শেষ পর্যন্ত মোহন নীলাকে পায়, কুমার সাহেবের সঙ্গে তার স্ত্রীর মিলন ঘটে। নাটকের আবেদন সেন্টিমেন্টাল ও মর্মস্পর্শী, ঘটনা বিন্যাস নাটকীয় ও চমৎকার, সংলাপ জোরালো, সংখ্যায় স্বল্প সংগীত ও নৃত্য ঘটনা উপযোগী, এবং নাটকটি কমেডি হলেও ট্র্যাজিক বেদনা - বিষণ্ণতা একটা অভিনব স্বাদের সঞ্চার করেছে।

ভঞ্জকিশোর পট্টনায়ক ছাত্রাবস্থা থেকে নাটক লিখে আসছেন — দীর্ঘ দিন তাঁর লেখনী সচল। তাঁর নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'বেনামী', 'শিকারী', 'গরীব', 'তোফান', 'জীবন জুয়া', 'মাণিক জোড়ী', 'অতিথি', 'প্রতাপ রুদ্র', 'রাজনর্তকী', 'অশোকস্তম্ভ', 'পহিলীরজ' প্রভৃতি। তার প্রায় সব নাটকই কটকের অন্নপূর্ণা রঙ্গমঞ্চ ও জনতায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চিত্রণে ভঞ্জকিশোর সার্থকতা দেখিয়েছেন। 'মাণিক জোড়ী' তে দুই জমিদার পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। নাটকটি প্রফেশনাল হলেও এর চরিত্রচিত্রণ — বিশেষত সিদ্ধার্থ ও পার্থর — দর্শককে আকৃষ্ট করে। এবং পেশাদারী মঞ্চের উপযোগী করার জন্যই নাটকটিতে তদনুরূপ বিশিষ্টতা-সমূহ আছে। নাটকের কাহিনী সংক্ষেপে বলা হল। মাণিক জোড়ি গ্রামের একটা জমি নিয়ে দুই জমিদারের পরিবারের মর্যাদার লড়াই যাদের প্রধান হল বরদাপ্রসন্ন পটনায়ক ও সিদ্ধার্থ রায়। বরদার মেয়ের সঙ্গে সিদ্ধার্থর ছেলের বিয়ে হলে আপাত শান্তি হলেও মীমংসা হয় না। আপন সম্মান অহংকার বজায় রাখার জন্য সে এই জমির অধিকার পেতে নিজের মেয়ের বিবাহও ছিন্ন করতে চায়। বরদা তার জামাতার চরম সর্বনাশ করতেও উদ্যত হয়। কিন্তু সে অনুতাপদগ্ধ হয় ও শেষ পর্যন্ত দুই পরিবারেব মিলন হয়। এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রচিত নাটকটি কটকের অন্নপূর্ণা থিয়েটার বি প্রায় ২০০ রাত্রি এই নাটকের টানা অভিনয় করে। নাটকটি আবার উৎকল রঙ্গমঞ্চ ট্রাষ্ট মঞ্চস্থ করে ১৯৯৯ এর জুনে ভুবনেশ্বরের নবনির্মিত ভঞ্জ কলা মন্ডপ-এ। পরিচালনা করেন বিশিষ্ট নাট্যপুরুষ অনন্ত মহাপাত্র।

উদয়নাথ মিশ্রের 'আদর্শ-পরিবার', 'বিবাহ' (১৯৫২) 'নরকে বিপ্লব', 'সুভদ্রা পরিচয়', 'হলমংগল', 'স্বেচ্ছামরণ সমিতি' বিশেষ উল্লেখ্য নাটক। ষষ্ঠ দশকে কলাশ্রী থিয়েটার্সে অভিনীত তাঁর 'মধুরেণ' কমেডি-জাতীয় নাটক। ব্যঙ্গের মাধ্যমে লেখক কালোবাজারী, সামাজিক প্রতারণা ইত্যাদির ছবি সার্থক একেছেন। **লক্ষ্মীধর নায়ক**-এর 'জমিদার' (১৯৪৮), 'ধর্মপত্নী' (১৯৫১), 'সর্বহারা' (ঐ নামীয় উপন্যাসের নাট্যরূপ), লাল চাবুক (১৯৪৯) প্রভৃতি নাটক সফলতার সঙ্গে শৌখিন ও পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয়। ইনি ছিলেন শক্তিমান নাট্যকার।

কবি ঔপন্যাসিক গল্পকার ও নাট্যকার **যদুনাথ দাস মহাপাত্র** (১৯২৯) ওড়িশা রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ উল্লেখ্য নাম। তাঁর প্রথম নাটক 'সূর্যমন্দির' (১৯৬২) উৎকলের আসাধারণ শিল্প সৃষ্টি কোনার্ক মন্দিরের ইতিকথার অপূর্ব নাট্যরূপ —

ইতিহাসের সঙ্গে জনশ্রুতির আশ্চর্য মিলন ঘটিয়েছেন নাট্যকার। এর অন্যান্য বিশিষ্ট নাটক হল 'পথভিখারী' (১৯৬০) 'সংগ্রাম', 'ভুলি হুএ না', 'সেতুবন্ধ' (১৯৭০) 'রাত্রি গো তুমে কথা কুহ' (১৯৭১) —এরা সামাজিক নাটক।

যদুনাথ দাস মহাপাত্র-র 'ভুলি হুএ না' বালেশ্বরের 'শ্রীমা থিয়েটার্স' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছে। নাটকটি সামাজিক, পিতৃহৃদয়ের আন্তরিক প্রকাশ এখানে আছে, তার সঙ্গে আছে অপরাধ চুরি অন্যায় পাপের বিস্তার। বিশিষ্ট উকীল দীনেশবাবু অর্থের লোভ ও দাবিতে সামসের আলীর সর্বনাশ করে, ফলে সে তার একমাত্র মেয়ে আমিনাকে হারায়। কন্যা স্নেহে উদভ্রান্ত সামসের দীনেশবাবুরও আদরের একমাত্র মেয়ে অরুণাকে চুরি করে নিয়ে যায় ও তাকে বাৎসল্য ভাবে দেখে। দীনেশবাবু মেয়ের জন্য ব্যাকুল উন্মাদ। বার বছর কেটে গেছে। এক কুটিল মানুষ ধরনী দাসের পাল্লায় পড়ে দীনেশবাবু। সে এক রাস্তার নর্তকীকে অরুণা বলে দীনেশবাবুকে বিশ্বাস করায়। সে সময়ে অনুতপ্ত সামসের নিয়ে আসে অরুণাকে। সৎ যুবক অমরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সুখে মিলনে নাটক শেষ।

'সেতুবন্ধ' (১৯৭০) মহাত্মা গান্ধীর মহান আদর্শ 'অস্পৃশ্যতা নিবারণ' নিয়ে লেখা। গান্ধীজীর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা নিবিড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আছে মানুষের মর্যাদা। আদর্শদীপ্ত নাটক হিসাবে 'সেতুবন্ধ' বিশেষ মূল্য পাবে।

'অথবা অন্ধার' (১৯৭৪) দাস মহাপাত্রর নতুন রীতির নাটক। কোনার্ক মন্দির দেখতে আসা এক শিক্ষিত পরিবারের মানসিক বিবর্তন এতে চমৎকার ফুটেছে। অতীতের মোহ অন্ধকারের আকর্ষণ তাদের মনকে সমাচ্ছন্ন করে, বর্তমানকে বিস্মৃত হয়ে সেই মায়াময় আচ্ছন্ন পরিবেশই তাদের পরম কাম্য হয়। নাটকের মুখবন্ধে বিজয় মিশ্র বলেছেন যে এই নাটকের চরিত্ররা স্থান কালের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের সমস্ত সম্পর্কর ভেতরে ক্রমশ আত্ম মুক্তির প্রবল প্রচেষ্টায় ধাবমান। "এহি ক্ষণিক মুক্তির আকৃতি ও বিদ্রোহ ভিতরে মনিষ জীবনর তথাকথিত আপেক্ষিক সভ্যতা যাহা মিথ্যার এক মোহময় আবরণ মাত্র — তারি আবরণকু অপসারণ করিবারে 'অথবা অন্ধার'রে রহিছি প্রচুর সিদ্ধির সার্থকতা।"[৮]

'রাত্রি গো তুমে কথা কুহ' (১৯৭১) সামাজিক নাটক। ডাক্তার তরঙ্গ, নার্স ঊর্মি ও তেজস্বিনী মেয়ে সিপ্রাকে কেন্দ্র করে রচিত। তরঙ্গ বড় ডাক্তার হবার পর প্রণয়িনী ঊর্মিকে অবহেলায় পরিত্যাগ করে যদিও ঊর্মি তার সন্তানের মা হতে যাচ্ছে। তরঙ্গ ধনী কন্যা সিপ্রার প্রণয় প্রার্থী। অপমানিত কলাঙ্কিত কর্মচ্যুতা ঊর্মি বস্তিতে যায়। এই আঘাতে ঊর্মির দরিদ্র পিতা মারা যায়। সিপ্রার সঙ্গে ঊর্মির পরিচয় হয়। সে শোনে এক লম্পট লোভী কামুক পুরুষের বিকট কামনার অসহায় শিকার হয়েছে ঊর্মি। সিপ্রা এই নারীর উপর অপমানের অবিচারের প্রতিশোধ নেবে কারণ সেও নারী। ঊর্মি না বললেও সিপ্রা বোঝে তরঙ্গর স্বরূপ — সে এ্যাসিড দিয়ে তরঙ্গকে অন্ধ করে দেবে। তরঙ্গর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সিপ্রা আর এক মহৎ কাজ করে, অন্ধ তরঙ্গর লাঠি ফেলে দিয়ে মৃতবৎসা ঊর্মির হাতে তার হাত রাখে। আসে বাদামওয়ালা দাসবুড়া। (যে প্রকৃত পক্ষে তরঙ্গর বাবা) ও ম্যাজিস্ট্রেট গিরিজা (যে তরঙ্গকে মানুষ করেছে)। নাটক শেষ হচ্ছে —

তরঙ্গ — তুম পরি নিঃস্বার্থ যুবতী নিকটরে মু ক্ষমা মাগুচি। তমে মতে ক্ষমা কর।

সিপ্রা — তরঙ্গ, জীবন তুমর মধুময় হেউ।

গিরিজা — বাস্তবিক এই চরম ত্যাগ পাইঁ ভারতর নারী জগত পুজ্যা ...... চির বন্দনীয়া।

দাস — মনে হুএ যেপরি স্বর্গর দেবকন্যা আলোকবর্তিকা ধরি ওলহেই আসিছি এই মর্ত্যধামকু।

গিরিজা — দাস . ...।

দাস — বাবু

গিবিজা — না, দাস, তরঙ্গ যদি তমর পুআ, তাহেলে ন্যায়তঃ ধর্মতঃ উর্মি কণ মোর ঝিঅ নুহে? আজিঠু তুমে মোর ভাই ...... মোর পরিবারর আউ জনে।

নাট্যপ্রাণ **রামচন্দ্র মিশ্র** (১৯২১-১৯৯২) তাঁর শিল্পিত চেতনার জন্য কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদ পরিত্যাগ করে নাট্য সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে স্মরণীয় 'অভিমান', 'কবিসূর্য', (১৯৪৯, উনবিংশ শতাব্দীর লেখক, বিখ্যাত চম্পু প্রণেতা কবিসূর্য বলদেব রথের জীবন নাটক), 'ঘরসংসার' (১৯৫৩), 'সেবিকা', 'পুআণিঘব'। রামচন্দ্র মিশ্রর নাটক ওড়িয়া জাতির রীতিনীতি আচার ব্যবহার সামাজিক পারিবারিক জীবনের নিখুঁত আলেখ্য। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা ও শ্রেণী সচেতনার পরিচয় আছে 'মুলিয়া' (১৯৫২) নাটকে যা ওড়িয়ায় এক ব্যতিক্রম। আধুনিক ওড়িয়া তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যভদ্র নাগরিক জীবনের সফিসটিকেশনের যথার্থ স্বরূপ রামচন্দ্র মিশ্র অংকন করেছেন ব্যঙ্গাত্মক বিষাদঘন নাটক 'নরোত্তম দাস কহে'র (১৯৬৪) মধ্য দিয়ে। গ্রামের সৎ বিবেকবান রিটায়ার্ড শিক্ষক নরোত্তম দাস শহবে এসেছে উচ্চ সমাজের প্রতিভূ তার শালাদের কাছে। বড় শালা বড় অফিসার মিঃ দাসের স্ত্রী প্রণয়ী শ্যামলের সঙ্গে যুগল নৃত্যাভ্যাস করে — শ্যামল মিঃ দাসের ঘুষ নেবার এজেন্টও। মেজ শালা যাদব বড় ব্যবসায়ী, যে ভাবেই হোক সে টাকা রোজগার করবে। ছোট শালা মাধব রাজনীতিবিদ — গ্রামে রাজনীতি করতে গিয়ে যে একটি সৎ সরল মেয়ে ভারতীকে ভালবাসায় প্রতারিত করে। তিন শালার ব্যাপারে নরোত্তম হকচকিয়ে যায়। মেজো শালা বড়র কাছে নরোত্তমকে পাঠায় ঘুষ দিয়ে কাজ করার জন্য, মিঃ দাস তাকে জেলে পোরে শ্যামলেব মাধ্যমে। মাধব ভোটে জিতে এম এল এ হয়েছে, সে মন্ত্রী হতে চায় — এমন সময় গ্রাম থেকে পুত্র কোলে ভারতী এসে তার স্ত্রীর মর্যাদা চাইল। মাধব তাকে অপমানিত করে বলে যে সে ভারতীকে স্বীকৃতি দেবে না কারণ সে এমন অনেক বড়। মাধব ভারতীকে বিষ খেয়ে মরতে বলে। নরোত্তম প্রতিবাদ করলে মাধব তাকে আঘাত করে ও তার মাথা ফাটে। কিন্তু সর্বনাশ ঘটে আরো — ভারতী আত্মহত্যা করে, তার সন্তান বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে নরোত্তম নতুন দিনের প্রত্যাশায়। রামচন্দ্র যথার্থই ওড়িয়া নাটকের সুবর্ণযুগের অনন্য স্রষ্টা।

কার্তিক কুমার ঘোষ প্রারম্ভিক জীবনে এক সফল অভিনেতা ছিলেন। পুরী জেলার বলংগা-য় প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ থিয়েটার্স' এ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করতেন। মঞ্চশৈলী ও নাট্যপরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান তাঁর নাটকের মধ্যে ধরা পড়েছে। তাঁর নাটকের মধ্যে বিখ্যাত 'মাতৃপূজা' (১৯৩১), কলকেতু ফুল্লরার কাহিনী নিয়ে লেখা), 'মীরকাশিম' (১৯৩৮, ঐতিহাসিক) 'বীর অভিমন্যু' (১৯৪০, পৌরাণিক), 'রক্তর ডাক', 'গুরু দক্ষিণা', 'এমিতিবি হুএ' ইত্যাদি। পুরাণ বর্ণিত মহাসতী অনসূয়ার কাহিনী অবলম্বনে 'লক্ষহীরা' ওড়িয়া দর্শকদেরই কেবল নয়, সমালোচকদের কাছেও বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়েছে। ওড়িয়া নাট্য সাহিত্যে কার্তিক কুমারের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে।

আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ের এই নাট্যকারদের সাধনা কয়েকটি কারণে উল্লেখ্য। সামাজিক সমস্যা সংকট তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে, সমাজস্থিত অন্যায় দুর্নীতি ও বিকৃতি

ব্যভিচার সভ্যতা ও ন্যায়নীতিকে ছিন্নভিন্ন করতে চাইছে—নাট্যকাররা তাকে তুলে ধরতে চাইছেন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচিত অধ্যাপক **প্রাণবন্ধু কর** বক্তব্য ও বিষয়ে অভিনবত্ব এনেছেন, মানবচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, প্রচলিত সুগঠিত ঘটনার ঘনঘটার বদলে অন্তর্মুখীনতা এনেছেন, প্রতীকের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। পূর্ণাঙ্গ ও একাংক উভয়বিধ রচনাতেই প্রাণবন্ধু কর অসামান্য সফল। তাঁর 'পাগলা জনতার বাহারে', 'স্থলপদ্মা', 'দূরপাহাড়' প্রভৃতি তাঁর সৃজন ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। **কমললোচন মহান্তি** সংগীত ও নৃত্যভিলাষী, এবং বড় নাট্যকারও। তাঁর নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'সমাধান', 'অভ্যুদয়', 'গাঁ মাটি', 'কেরাণী', 'আজাদী', 'মণিষ', 'সন্তান', 'পাপপুণ্য', 'মিস মল্লিক', 'সুমিত্রার সংসার' 'আমরি গাঁ', 'ভারত আবিষ্কার' প্রভৃতি। শ্রী মহান্তি একাম্র থিয়েটার্স নামে ভুবনেশ্বরে এক নাট্য সংস্থা স্থাপন ও পরিচালনা করেন দীর্ঘকাল। আঙ্গিকের দিক থেকে অভিনব কমললোচনের 'মিস মল্লিক' ওড়িয়া নাটকের ইতিহাসে এক উল্লেখ্য সংযোজন। নাটকের নায়িকার (যার নামে নাটকের নামকরণ) জন্য দীর্ঘকাল দর্শকরা অপেক্ষা করছে, দর্শকের কৌতূহল প্রত্যাশাকে পূর্ণ কবে শেষ পর্যন্ত নায়িকা মঞ্চে এল — তার মৃতদেহ বহন কবে নিয়ে আসা হল। একটা তীব্র সাসপেন্স দর্শকগণকে সারাক্ষণ অস্থির উৎকণ্ঠ করে রাখে এবং শেষ পর্যন্ত তার আকস্মিক অভাবিত সমাধান হয়।

ওড়িয়া ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার, ওড়িয়া নবনাট্য আন্দোলনের স্রষ্টা, অ্যাকাডেমি পুরস্কার জয়ী **মনোরঞ্জন দাস** (১৯২৩) ওড়িয়া নাটককে বিশ্বমানে উপনীত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর জটিল মানসিকতার এক আশ্চর্য প্রতীক মনোরঞ্জন দাস। অবক্ষয়ক্লিষ্ট দুঃসহ শূন্যময় জীবন ও সংশয়-কন্টকদীর্ণ যুগের আহত রক্তাক্ত বেদনা, এক তমিস্রাচ্ছন্ন নিরালোক আলম্বহীন চৈতন্যের বিস্তার মনোরঞ্জন দাসের শিল্পী সত্তাকে নির্মাণ করেছে। আজ মানুষের অস্তিত্ব ব্যর্থ মিথ্যা, সে একক নিঃসঙ্গ নির্জন, অস্থির হৃদয়ের যন্ত্রণার তীর মানুষের বুকে বিঁধে আছে নিরবধি, অর্ধচেতন অবচেতন মনের আলো - অন্ধকারময় ম্লান ছায়াচ্ছন্নতা থেকে অর্থহীনতা অনস্তিত্ববোধ ও অসহ্য ক্লান্তির কাঁটায় সে ক্ষত বিক্ষত। মনোরঞ্জন দাস দেখিয়েছেন আমাদের চৈতন্য লস্টনেসে নিঃশেষিত, মানুষের জীবনের পার্সপেকটিভ পালটে গেছে, বহির্জগতের সঙ্গে চেতনার বোধ ও প্রত্যয়জাত সমস্ত কিছুর ননকম্যুনিকেশন প্রবল হয়ে উঠেছে। মানোরঞ্জন দাসের নাটক রূটলেশনেসের কঠিন উচ্চারণ, দুঃসহ যন্ত্রণার তীব্র কণ্ঠস্বর, অ্যাবসার্ডিটির অবিবাস্তব দর্শনের সুন্দর শব্দালিপি।

অবশ্যই মনোরঞ্জন দাস গভীরভাবেই সমাজমনস্ক। চতুস্পার্শ্বস্থ যুগ ও জীবনের সহস্র তরঙ্গাঘাতে তাঁর চেতনা আহত অস্থির কম্পামান এবং শ্রেণী বিন্যস্ত সমাজ ভাবনাকে তিনি স্থির ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তিনি মনে করেন জীবন মানেই সংগ্রাম আর নাটকে জীবন থাকলেই তা সংগ্রামী ভাবময় নাটক। যদিও মনোরঞ্জন দাস মার্কসবাদকেই সামাজিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বলে মনে করেন না — জাগ্রতবিবেক মানুষের সচেতন প্রতিরোধই সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের মুক্তি আনবে। তবে একথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল নাট্যকার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমস্যা অপেক্ষা অস্থির জটিল দুর্বোধ্য বিংশ শতাব্দীর মানুষের সাইকো-অ্যানালিসিসে অধিকতর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, বহির্জগৎ থেকে সরিয়ে এনে দৃষ্টিকে সংযত সংহত কেন্দ্রনিষ্ঠ করেছেন। তাঁর সুররিয়ালিষ্ট মন অর্ধচেতন অবচেতন-এর ম্লানছায়াচ্ছন্ন ঈষদ্দ্যুতিময় অবিসর্পিল পথে

চংক্রমণ করে চেতনার পরতে পরতে নিষিক্ত অনন্ত রহস্যকে আর সীমাহীন বিস্ময়কে উন্মোচিত করেছে।

মনোরঞ্জন দাস আঙ্গিকের নিপুণ শিল্পী। ঐতিহ্যময় ভারতীয় সংস্কৃতিব উপাদানসমূহ তিনি গ্রহণ করেছেন, লোকশিল্পের উপকরণাদির প্রয়োগও তিনি করেছেন, ইউরোপ আমেবিকার অতি আধুনিক নাট্যকলাকেও তিনি সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। বিভিন্ন বিচিত্র আঙ্গিকের সমন্বয়ে তিনি এক অখন্ড পরিপূর্ণ শিল্পমূর্তি নির্মাণ করেছেন যা চিরায়ত আর্টেব হিবণ্যপ্রভায় দীপ্ত।

প্রায পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী নাট্য সাধনায় ব্রতী রয়েছেন মনোরঞ্জন দাস। ১৯৪১-৪২ এ রচিত 'রাত্রির'র পটভূমি সামাজিক, এতে সমাজ সচেতন নাট্যকারের বস্তু চেতনার পরিচয় প্রস্ফুটিত। 'সমস্যা', 'যৌবন', 'অবরোধ', 'সাগর মন্থন', 'অনশন' প্রভৃতি নাটকে সমাজভাবনায় পরিচয় স্পষ্ট তবে তার সঙ্গে মানুষের অন্তরের গভীর পরিচয় বিদ্যুচ্ছমকের মত উদ্ভাসিত হয়েছে। কবি সম্রাটের জীবন ও আদর্শ নিয়ে লেখা 'কবিসম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ নাটক' ১৯৪৭-এ কবিচন্দ্র কালিচরণের নির্দেশনায় কটকে ওড়িয়া থিয়োটার্সে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বিয়াল্লিশের রক্তাক্ত আগুন ঝরা দিনগুলিকে অসাধারণ দেশ-চেতনাময় নাটকে বিধৃত করেছেন 'অগষ্ট নঅ'। ওড়িশার স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পাইক বিদ্রোহের সফলতম নায়ক জগবন্ধু বিদ্যাধরের সংগ্রামী জীবনকে নিয়ে সার্থক ও জনপ্রিয় নাটক লেখেন 'বকসি জগবন্ধু'।

১৯৫২ সালে মনোরঞ্জন রচনা করলেন সমস্যামূলক মনস্তাত্ত্বিক নাটক 'আগামী' — ওড়িয়া নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস এক উল্লেখ্য অধ্যায় সংযোজিত হল। "সমলোচকরা মনে করেন যে মনোরঞ্জন দাসের 'আগামী'- কে তার আঙ্গিকগত চমৎকারিত্বে, মানুষের অন্তঃ স্বরূপের গভীর বিশ্লেষণে ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক ভাবনায় ওড়িয়ার প্রথম অতি আধুনিক নাটক রূপে অভিহিত করা যায়"।[৯] মিলমালিক সূর্যনারায়ণের সঙ্গে শরতের নেতৃত্বে শ্রমিকদের বিরোধ লাগে। স্ট্রাইক বা অন্য গুরুতর কিছু হওয়ার আগে চতুর সূর্যনারায়ণ তার মেয়ে সরসীর সঙ্গে শরতের বিয়ে দেয় ও উইল করে শরতকে সম্পত্তি দেয়। শরত প্রকৃত মালিক হয়ে ওঠে। সে এম এল এ হয়। তার এলাকার অসুবিধে হবে জেনেও রাজ্যের স্বার্থে সে নদীর ওপর বাঁধ তুলতে চায়। তার এলাকার লোকেরা বাধা দেয়। সূর্যনারায়ণ-এর পরামর্শে শরত পদত্যাগ করে ও নতুন ভাবে নির্বাচনে লড়তে চায়। আসলে সূর্যনারায়ণ তার শ্রেণীচরিত্র ভোলেনি — সে শরতকে দেখে নেবে। নির্বাচনে সূর্যনারায়ণ অপর নেতা বৃন্দাবনকে অর্থ সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য করে জেতায়। পরাজিত বিষণ্নচিত্ত শরত মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে বন্ধু সরোজের মানসিক চিকিৎসালয়ে যায়। সরোজের সম্পর্কিত বোন কল্যাণীর সাহায্যে সে সারতে থাকে, কল্যাণীর দিকে তার মন যায়। এদিকে সরসীও মানসিক স্থিরতা হারিয়েছে। সূর্যনারায়ণ তাকে নিয়ে ওখানেই আসে। শরৎ কল্যাণীর নৈকট্য সরসী সইতে পারে না। শরতের সঙ্গে সরসীর মিলন হয় — সরোজ ও কল্যাণী মানসিক চিকিৎসালয়ে অসুস্থদের সেবায় জীবন কাটাবে। শ্রমিক সমস্যার রূপায়ণ, বুর্জোয়া সমাজের ক্রূর কঠিন মানসিকতার প্রকাশ, গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, শ্রমিক মালিক সমস্যা সম্বন্ধে গলসওয়ার্দিসুলভ এক ভারসম (balanced) সুষম স্থিতিশীলতা এবং দক্ষ চরিত্র সৃজন নৈপুণ্য নাটককে এক বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা দিয়েছে।

মনোরঞ্জন দাসের 'বনহংসী' (১৯৬৮) আইডিয়া ও টেকনিকের দিক থেকে অসাধারণ। প্রচলিত রীতির বন্ধনে একে ধরা যায় না। নাটকের নায়ক মনশ্চক্ষুতে দেখছে

তার বিবাহ হচ্ছে, সন্তান হয়েছে, তারাও জীবন যাপন করছে — এভাবেই জীবন চলছে। নাটকের সৌন্দর্য এই যে যে সব চরিত্ররা মঞ্চে এসেছে, জীবন্ত প্রতিভাত হয়েছে তারা সকলেই অলীক, এমনকি মৃতরাও যেন প্রাণবন্তরূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। নাটকে এ এক আশ্চর্য টেকনিক। দূর থেকে বনহংসী দেখা যায়, তার সৌন্দর্য অনুভব করা যায়, ক্বচিৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মত আমাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, বনহংসী যেন চিরকাল অধরা অপ্রাপনীয়। মানব জীবনের এই সত্য নামকরণে প্রতীকী রূপ পেয়েছে। ১৯৭২-এ অ্যাকাডেমি পুরস্কারজয়ী 'অবণ্যফসল' পাহাড় ঘেরা ডাক বাংলায় কয়েকটি চরিত্রের জটিল গভীর গুহায়িত সত্তার প্রকাশ। নাটকটি মূলত প্রেম নির্ভর — কয়েকটি হৃদয়ের গোপন কামনা বাসনাক্লিষ্ট জটিল দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ তীব্র কিন্তু অবদমিত অনুচ্ছ্বসিত আরক্ত চিত্র। অধ্যাপক সুব্রত ও তার স্ত্রী বেবি, শিকারী বর্মা ও তার স্ত্রী লিলি পাহাড় অরণ্য ঘেরা ভাববাংলোয় আসে বেড়াতে — অকস্মাৎ সেখানে হাজির হয় অদ্ভুত যুবক সংগ্রাম। এই কটি নরনারীর মন অবদমিত পথ বেয়ে তীব্র আঁকাবাঁকা কুটিল চংক্রমণে বিষবিসর্পতায় নিজেকে প্রকাশ করেছে। বেবি-সংগ্রামের একদা প্রবল প্রণয় ও বেবির সুতীব্র অহংকার ও আত্মাভিমানে ছিটকে আসা, সংগ্রাম সুব্রতর প্রতি লিলির সুতীব্র জৈবিক কামনা, সুব্রতর ঔদাসীন্যের অন্তরালে তার অবসেসড বাসনা, সংগ্রামের অগ্নিগর্ভ অগ্নিগিরির উপরিভাগের আপাতশান্ত মদু দহনোদগার ও শেষ পর্যন্ত আত্মহনন — এক শ্বাসরোধকারী নৈরাশ্যক্ষুব্ধ বিকারজীর্ণ ধূ-ধূ করা মরুজ্বালাকেই প্রকট করে তোলে। কাহিনী বিন্যাসে, ভয়চকিত পটভূমি নির্মাণে, হ্রস্ব মিতায়তন অথচ দ্যুতিময় সংলাপ সৃজনে, প্রতীকের আশ্চর্য ব্যবহারে এবং চরিত্রচিত্রণের গভীরতায় 'অরণ্যফসল' বর্তমান কালের এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

বক্তব্য ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই 'কাঠঘোড়া' (১৯৭১) অভিনবত্বের দাবি রাখে। নিরীক্ষামূলক এই নাটকের নাট্যকার একদিকে মানুষের লস অফ আইডেনটিটি বা ব্যক্তি স্বরূপের বিনাশের কথা বলেছেন, অন্যদিকে মানুষের পরম প্রাপ্তির ব্যথাকেও অঙ্কিত করেছেন। পীতাম্বর দীপা স্বামী-স্ত্রী। উদ্ধত কঠিন পীতাম্বর শান্ত নম্র দীপার ওপর অত্যাচার করে আনন্দ পায়। শেষ পর্যন্ত অরুণ দীপা মেলে, পীতাম্বর শিখাও। কিন্তু শান্তি কি পেল! মুক্তি পেয়েও কেউ মুক্ত হতে পারল না। অপূর্ণতা অশান্তি দুঃখ যন্ত্রণা কষ্ট তাদের আগের মতই গ্রাস করল। নাটকে পীতাম্বর ও অরুণর চরিত্রে একই মানুষ, শিখা ও দীপার চরিত্রে একই নারীর অভিনয় তাৎপর্য মন্ডিত। কাঠের ঘোড়া প্রতীক হয়ে উঠেছে — শিল্প সৌন্দর্যের প্রতীক বা স্বপ্নকল্পনার প্রতীকও বলা যায়। নাটকের অপর চরিত্র নির্দেশক ব্যাখ্যা কর্তার কাজ করেছে, নাটকের গ্রন্থনা করেছে, ভারতীয় নাটকের সূত্রধার ও য়ুরোপের ব্রেখট একসঙ্গে মিশে গেছে। ভূমিকায় নাটকের আঙ্গিকের সম্বন্ধে লেখক কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন —

'এপরি নাটক সৃষ্টি করিবা উচিৎ যাহা কি একান্তভাবে হই পারিব 'ভারতীয় নাটক' অর্থাৎ যেউঁ নাটকরে রহিব দর্শকংকু আকর্ষণ করিবার শক্তি ও কৌশল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাহ্ম তার মৌলিক সামাজিক দায়িত্ব তুলাইবা পাই যুগযন্ত্রণার বাহকভাবে দর্শকর বৌধিক চেতনাকু স্পর্শ করিপারুথিব।

এই বিশ্লেষণ উপরে ভিত্তি করি মুঁ কাঠ ঘোড়া লেখিছি এবং এথিরে ওড়িশার পারম্পরিক নাট্যশৈলী যাত্রার কেতেক আঙ্গিক ও কৌশল প্রয়োগ করিবার উদ্যম করিছি। আধুনিক নাটকর বিশ্লষণ পথরে তেণু মুঁ অনুভব করুছি পরম্পরার প্রমাণিত সুদ্রুঢ়

ভিত্তিস্তম্ভ উপরে যদি বৌধিক চিন্তা সম্পন্ন আধুনিক নাটক স্রুষ্টি করা যাই পারে তেবে তাহা হুয়েত হোইপারিব প্রকৃত পক্ষে 'আজির যুগধর্মী নাটক' যাহা অধিক দর্শকংকু আকৃষ্ট করিব এবং যাহা সাধারণ দর্শকক্কু সমপরিমাণরে সন্তোষ দেই পারিব।'

মনোরঞ্জন দাসের শেষ পর্যায়ের দীর্ঘ একাংক 'অববাহিকার স্বপ্ন' মোটামুটি রোমান্টিক — শেলীর একটি গীতি কবিতার ভাব এর কেন্দ্রীয় সুর। ইন্‌জিনিয়র সুকান্তকে নিযে ডাক্তার দীপা অথবা তাব পোলিও রোগগ্রস্ত বোন নীরুর ধর বাঁধবার স্বপ্ন ব্যর্থ হয় — ঝর্ণা নদীর সঙ্গে মেশে, নদী মেশে সাগরে, আকাশে বাতাসেরা পরস্পরের সঙ্গে আনন্দে মিলিত হয়, কিন্তু এদের প্রয়াস ব্যর্থ হল, মিথ্যে হয়ে গেল অববাহিকার স্বপ্ন।

মনোরঞ্জন দাসের 'অমৃতস্য পুত্রঃ' নাটকে জীর্ণ শীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত সমাজকে ধ্বংস করে পাপকলুষমুক্ত নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার দীপ্ত বাসনা ব্যক্ত। নাটকের প্রধান চরিত্র সনাতনকে অবলম্বন করে এই পরম সত্য রূপায়িত। সনাতনের মধ্যে চিরায়ত ভারতবর্ষ, আধুনিক সংস্কারমুক্ত চেতনা ও বিধ্বংসী বিপ্লবীভাবনা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সনাতন বলে —

মুঁ আসিচি তমর তথাকথিত সভ্যতা, তমর মণিষ গড়া প্রক্রুতিকু ভাঙ্গিদেবাকু। মন ভিতরর জমাটবন্ধা ভয়কু মুঁ আসিচি ভাঙ্গি চুরমার করি দেবাকু। মণিষ স্রুষ্টি করিচি নিজ পাই যেউঁ নাগাপশ মুঁ আসিচি তাকু ছিন্ন করি দেবাকু। মুক্তির নুআ সনদ ধরি মুঁ আসিচি। মুঁ এক নুআ যুগর সংকেত ...... মুঁ গতিমান অশ্ব .... মুঁ কাল বৈশাখী .... মুঁ মহাকালর শঙ্খধ্বনি ..... নূতনর স্রুষ্টি পাই মুঁ ধ্বংসকারী।

মনোরঞ্জন দাসের শেষ দিকের নাটক 'শব্দলিপি' (১৯৭৬) তাঁর শিল্পীধর্মকে অক্ষুন্ন রেখেছে। সঞ্জয় পার্থ ভক্ত রঘুনাথ রীতা ও আবাহকের মধ্য দিয়ে জীবনের পৃষ্ঠাকে উন্মোচিত করেছেন, চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন। এবং বহিঃরূপের অন্তরালে তাদের প্রকৃত রূপকে প্রকাশিত করেছেন। নাটকে প্রকৃতপক্ষে জীবনের অর্থহীনতার তত্ত্বই প্রকাশিত। অর্থহীন জীবন ছিন্নমূল মানসিকতা ভয়াল কঠিন বাস্তব ও অস্তিত্বকে টিকেয়ে রাখার মিথ্যা অন্তহীন প্রয়াস বর্তমান পৃথিবীর ক্লান্ত নিঃসঙ্গ স্নায়ুবিকারগ্রস্ত এক সর্বরিক্ত ধুসরতাকেই প্রকট করে তোলে। সমালোচক বলেছেন — Shabdalipi significantly contributes to the establishment of complex Oriya creative consciousness of the sixties and seventies. Shabdalipi has characters and situations but it ends where it begins and its development is one of life's flux and its insight one of intensest to the modern Oriya literature.[১০] মনোরঞ্জন দাসের 'বিতর্কিত অপরাহ্ন' (১৯৮২) সনাতন মূল্যবোধের ক্রমিক বিনাশের ওপর ভিত্তি করে লেখা যা আধুনিক কালের অস্থির দ্বন্দ্বসংক্ষুদ্ধ আবর্তসংকুল মানসিকতাকে প্রকাশ করে। বৃদ্ধ নীলরতন সনাতন মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, তার উচ্চপদস্থ অফিসারপুত্র সুকুমার ও চুকরীরতা পুত্রবধূ শাশ্বতী অস্থির ভঙ্গুর বর্তমানের রূপ, সুকুমারের কলেজছাত্র পুত্র বুলবুল ও বুলবুলের প্রেমিকা লীনা ভবিষ্যৎ অবক্ষয় বিনাশের যেন পূর্বাভাস। নীলরতন সারা জীবনের সঞ্চয় জমিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সোনার মূর্তি গড়িয়েছে যা সে একটা সুন্দর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাই সে গ্রাম থেকে সুকুমারের কাছে এসেছে টাকার জন্য।

নাটক সুরু হয় রবিবার অপরাহ্ণে যখন নীলরতন সুকুমারের অভিজাত ঘরে অপেক্ষা করছে সবার জন্য। সুকুমার অফিসে তার দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে কথা বলছে যে তাকে বলে তার শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে নীলরতনের জন্য টাকা জোগাড় করতে। শাশ্বতী পথে তার দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে কথা বলেছে তার পুরোনো প্রেমিক আদিত্য সম্পর্কে। আর

বুলবুল সময় কাটাচ্ছে লীনার সঙ্গে নির্জন জায়গায়। নীলরতন সব বুঝতে পারে — তার আদর্শ বিশ্বাস ভেঙে যায়, সুকুমার জানতে পারে শাশ্বতী অন্যের প্রতি আসক্ত। নীলরতন গ্রামে ফিরে যাবে। কিন্তু কৃষ্ণ মূর্তি কোথায়? বুলবুল বলে যে সে লীনার সঙ্গে আনন্দ করতে যাবে বলে ওটা বিক্রী করেছে। বিষণ্ণ ব্যথিত ভাঙা মন নীলরতন গ্রামে ফিরে যায়, বাড়ির পরিবেশ অসহ্য মনে হওয়ায় বুলবুল চলে যায় লীনার সঙ্গে, এক শ্বাসরোধকারী পরিবেশে সুকুমার শাশ্বতী থাকতে বাধ্য হয় — কী ভাবে তারা পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে!

'নন্দিকা কেশরী' মনোরঞ্জন দাসের পরিণত বয়সের রচনা ও শেষ নাটক। ১২ শতকের পটভূমিকায় স্থাপিত ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী যাতে যুদ্ধবিরোধিতা ও শান্তির বাণী উচ্চারিত। চোড়গঙ্গা দক্ষিণ থেকে এসেছিলেন। তিনি কটক আক্রমণ করেন। মহানদী বেষ্টিত কটকের রাজা সুবর্ণকেশরীর কন্যা নন্দিকা চোড়গঙ্গাকে দেখে। তার বীর্যবত্তার কথা সে শুনেছিল, এখন তার বীররূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়। রাত্রে লুকিয়ে সে চোড়গঙ্গার কাছে যায়, কিন্তু চোড়গঙ্গা বলে যে সে এভাবে নন্দিকাকে গ্রহণ করতে পারবে না। সে মর্যাদায় ফিরিয়ে দেয় নন্দিকাকে। প্রত্যাখ্যাতা নন্দিকা আত্মহত্যা করে। এটা কিংবদন্তি। নাট্যকার মূল কাহিনীকে মানলেও এটা মানেননি। তিনি মনে করেছেন নন্দিকা গিয়েছিল চোড়গঙ্গাকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে, শান্তির কথা বলতে। কিন্তু চোড়গঙ্গা বলে যে শক্তি দিয়ে রাজ্য না পেলে, প্রজারা তার ক্ষমতার কথা না জানলে, সে ঠিকমত শাসন করতে পারবে না। নন্দিকা বোঝে সব যুদ্ধবাজই সমান যেখানে মনুষ্যত্ব মানবিকতা হৃদয়ধর্মের কোন মূল্য নেই। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষার বাণী উচ্চারণে মনোরঞ্জন দাসের 'নন্দিকা কেশরী' অনন্য মর্যাদা পেয়েছে। নন্দিকা-কে নিয়ে আরো নাটক লিখেছেন — অশ্বিনীকুমার ঘোষ, ভিখারী পট্টনায়ক, ভঞ্জকিশোর পট্টনায়ক, গোপাল ছোটরায় প্রমুখ।

৪. সাম্প্রতিক পর্ব

বর্তমান শতকের ষষ্ঠ দশক থেকেই তরুণ স্রষ্টারা ওড়িয়া নাটককে নূতন প্রাণচৈতন্যে উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। বিজয় মিশ্র, বিশ্বজিৎ দাস, রমেশ প্রসাদ পাণিগ্রাহী, ডঃ বসন্ত কুমার মহাপাত্র, রত্নাকর চাইনি, জগনাথ প্রসাদ দাস, কার্তিক চন্দ্র রথ, গৌর পট্টনায়ক, অক্ষয়কুমার মহান্তি, ডঃ বিনয় কুমার নন্দ, চিন্তামণি জেনা প্রমুখ শক্তিশালী নাট্যকারগণ ওড়িয়া নাটককে নবনব সৃষ্টির বৈচিত্র্যে সুন্দর সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। যদিও এদের কেউ কেউ প্রচলিত ধারার অনুবর্তনই করে চলেছেন। তবু বলতেই হবে আধুনিক নাটককে এঁরা পেশাদারী মঞ্চের শাসন থেকে মুক্ত করে নবীন শৈল্পিক প্রত্যয়ে তাকে দীপ্ত করছেন। এঁদের নাটকে বাস্তবতা আছে তবে তা মূলত মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা বা সাইকোরিয়ালিজম। সমাজের নিখুঁত বিশ্লেষণ এরা করেছেন — সার্জারির ছুরি কাঁচির সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানীর দর্শন ও মনস্তাত্ত্বিকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এতে মিশে আছে। লক্ষকোটি তরঙ্গ সমন্বিত মানবচেতনা এঁদের সৃষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত। আধুনিক ওড়িয়া নাট্যকার সহজ হৃদয়-সংবেদনশীলতা অপেক্ষা বুদ্ধিমার্গীয় ধ্যান ধারণার উপর অধিকতর আস্থাশীল — বুদ্ধিগ্রাহ্য মননশীল চিন্তা ভাবনা তাঁদের নাট্য ভাবনায় প্রবল হয়ে উঠেছে। এ্যাবসার্ড নাটকের বিপুল প্রসার সাম্প্রতিক কালে বিশেষ ভাবে দেখা যাচ্ছে। অনেকটা পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী শূন্যতার দর্শন, বিচ্ছিন্নতার বোধ, একক নিঃসঙ্গ মানুষের যন্ত্রণা, এবং তার সঙ্গে আঙ্গিকগত বৈচিত্র ও বিস্ময় সাম্প্রতিক ওড়িয়া নাটকে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ নিয়ে মননশীল প্রবন্ধ পুস্তকও লেখা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালের অত্যন্ত শক্তিশালী স্রষ্টা আভগার্দ নাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা **বিজয় মিশ্র-র** (১৯৩৬) প্রথম নাটক 'জননী' (১৯৬০) সগৌরবে অন্নপূর্ণা কর্তৃক অভিনীত হয়। পরের নাটক 'একাকী' মঞ্চস্থ করে কটক মহানদী ক্লাব। ক্রমান্বয়ে তিনি লিখে চলেন 'যাযাবর', 'তিমির তীর্থ', 'সাগর তীরে', 'প্রতীক্ষা'। 'যাযাবর' নাটকে দেখা গেল এক যাযাবর সম্প্রদায় গ্রামে এসে সমাজব্যবস্থা গ্রামের জীবনযাত্রা চরিত্রসমূহেব স্বাভাবিক স্থিতি সব কিছুতেই এক তুমুল আঘাত দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করল। প্রেমের জটিল গভীর মনস্তত্ত্বও এতে প্রকাশিত। যাযাবর মেয়ে ঝিল্লী পাঠকের মন আকর্ষণ কবে প্রবল ভাবে। 'অসত্য শহর' এ শ্রেণীসচেতন নাট্যকার সমাজবাদের প্রবক্তা। আধুনিক সমাজ সমস্যার গভীরে লেখক প্রবেশ করেছেন 'ছাই', 'চন্দ্রচোরী', 'এঠি সেঠি সবুঠি' প্রভৃতি নাটক। সম্প্রতিকালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'শববাহকমানে' (শববাহকেরা ১৯৬৮) এক্সপেরিমেন্টাল নাটক — লেখকের প্রবল ক্ষমতার পরিচয়বহ। বনে পিকনিক করতে আসা একদল বন্ধু হঠাৎ বৃষ্টি নামায় কাছাকাছি বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। রহস্যময় বাড়ীর এক ঘরে একটি লোক চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। দেখা যায় সে মৃত। বালিশের নীচে এক কাগজ, তাতে লেখা আছে যে বাগানে একটা নির্দিষ্ট জায়গা খুঁড়লে সম্পদ পাওয়া যাবে। সবাই খুঁড়তে আরম্ভ করে। খোঁড়ার শেষে একটা কাগজ পাওয়া তাতে লেখা যেন সবাই মৃতকে সমাধিতে নিয়ে যায়।

নরেন্দ্র — কণ করিবা এবে?
বতী যে লিভি আসুছি।
বিরূপাক্ষ — শব সৎকার করিবা।
নরেন্দ্র — আমে?
করুণা — আমে এই রাতি অধটারে মুর্দার বোহিবা?
বিরূপাক্ষ — আম ছড়া আউ বাকি কি এ অছি? ....
দুই দুইটা মহাযুদ্ধ যাহাকু ক্ষতবিক্ষত করিথিলা,
তা'র শব ত খালি সৎকার চাহুচি। ....
সুনা লোভ আমকু শত্রু করিথিলা।
শব বোহিবা যদি আমকু একত্র করিপারে — ....
আজি আমর ভূমিকা হব শববাহকর ভূমিকা।

গল্পটি সহজ কিন্তু সামাজিক তাৎপর্যময়। মনুষের লোভ লালসা ঈর্ষ্যা অপরাধবোধেব পরিচয় এই নাটকটি অধীর উৎকাণ্ঠায় পাঠকের মন অধিকার করে রাখে। মঞ্চ সাধারণ কিন্তু দ্যোতনাময় — চাদর ঢাকা বিছানায় এক দেহ ও কয়েকটি দরজা। মঞ্চের এক অংশ সর্বদা চঞ্চল, অপরাংশ অন্ধারাচ্ছন্ন। যেমন বাগানের খননদৃশ্য অপ্রত্যক্ষ, অন্ধকারে ঢাকা, কিন্তু খোঁড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, ঠিক সে সময়েই মঞ্চের অপরাংশ আলোকিত — মানুষের উপস্থিতি ও সংলাপে পূর্ণ।

বিজয় মিশ্রর অপর নাটক 'দুইটি সূর্যদগ্ধ ফুলকু নেই' (১৯৭২) পরীক্ষামূলক নাটকের সুন্দর নিদর্শন। নাটকের দুইটি চরিত্র ছেলে রাজা ও মেয়ে রাণী — তারা দুটো ফুল, মধ্যবিত্ত নীতি চেতনা হল সূর্য। পর্দা ওঠার পর পরিচালক দর্শককে প্রশ্ন করে তারা স্বপ্ন দেখেছে কিনা এবং চরিত্রদ্বয়কে পরিচিত করিয়ে বলে যে নাটক তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। রাজাও রাণী তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও হতাশা বেদনার ছবি আঁকে — তারা দৈনন্দিন সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে পড়া সাধারণ মানুষ। মধ্যবিত্ত জীবনেব

অভাব-অভিযোগ রোগঅসুস্থতা কলহতিক্ততা বিবর্ণ দাম্পত্য জীবন : প্রতিদিনের ক্লান্তি হতাশ্বাস বেদনার ছবি ফুটে ওঠে মঞ্চের ক্যানভাসে। পুত্রের পরীক্ষা ও চাকরীব জন্য বাবার অতি সতর্কতা, একটি বধূর জন্য কর্মক্লান্ত মায়ের অস্থিরতা, ভাবী পুত্রবধূকে বাবার পরীক্ষা, ইন্টারভিউ বোর্ডের নির্বোধ প্রশ্নমালা — এব মধ্যে দুটি তরুণ প্রাণের পবিত্র উজ্জ্বল ভালবাসা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে, অসহ্য সূর্যের দাহে শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে দুটি ফুল। ঘড়ির শব্দে স্টেজটা যেন ওয়েলসের টাইম মেশিনে পরিণত হয় যাতে চড়ে প্রেমিক প্রেমিকা গোলাপ সুগন্ধ বাল্যকাল থেকে তারুণ্যের স্তর বেয়ে অসুখী দাম্পত্য জীবনে চলে যায়। কিন্তু টাইম মেশিনও চলে যায়, স্বপ্ন ভেঙে যায় — তারা সেই আগের মত মুখোমুখী দাঁড়িয়ে (ভুবনেশ্বরে অসীম বসু প্রয়োজিত নাটকটির কথা দর্শকরা সহজে ভুলবেন না)। বর্তমানে কঠিন নির্মম সমাজ ব্যবস্থার আশ্চর্যদ্যোতক অভিনব আঙ্গিকবদ্ধ এই নাটকটি বিজয় মিশ্রকে আধুনিক কালের এক মহৎ স্রষ্টার মূল্য দিয়েছে।

'যাদুকর' বিজয় মিশ্রর এক পরীক্ষাধর্মী নাটক — অনেকংশে অ্যাবসার্ড যদিও প্রতীকময়তাই বেশী। নাটকে এক দিকে যাদুকর যার মায়ায় সবাই আচ্ছন্ন, যার অশুভ প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত হতে পারছে না; অন্যদিকে কিছু সামাজিক মানুষ — রিসার্চ স্কলার সৌরভ, তার প্রেমিকা দ্বন্দ্বময় চরিত্রের নারী যে পুরুষকে নিজের প্রযোজনেই মাত্র চায়, গরিব মায়ের ছেলে সামান্য চাকুরীজীবী দিবাকর, দিবাকবেব স্ত্রী টুনী যে অফিসে কাজ করে ও অফিসারের স্বেচ্ছাচাব মানতে বাধ্য হয়। এই সব চরিত্র দুঃখ বেদনায় অশান্তি জ্বালায় পূর্ণ। এরা সবাই মনে কবে যাদুকরই সব কিছু করে, সেই তাদের দুঃখ অশান্তি দূর করবে। সবাই তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তাদের দাহ যন্ত্রণা দূর হয় না। আত্মবিশ্বাস ও বিবেকের প্রতীক অভয়ের প্রেরণায় তারা জেগে উঠতে চায় যাদুকরের অন্যায়ের বদলা নিতে চায়। কিন্তু পারে না। জয়ী হয় যাদুকর। সে সম্ভবত অপশক্তিব অথবা বিপরীত শক্তির প্রবলতম রূপ যা মানসিকতাকে আঘাত দেয় ক্লিষ্ট করে, তাকে মহৎ ও উন্নত হতে বাধা দেয়।

'তট নিরঞ্জনা' বিজয় মিশ্রর নতুন নাটক। ''ধর্মব অতিভাক্তিক ভাবধারারে বান্ধিহোই ইতিহাসকু ফাঙ্কি দিআযাই ন পারে। বৃদ্ধঙ্কর খাণ্টি মানবধর্মী জীবনচিত্রকু কেন্দ্র করি এ নাটক গঢ়ি উঠিছি। এথিরে উদ্ভটতা বা পরীক্ষাধর্মিতা ন থিলে বি মণিষর চিরন্তন বিশ্বাস বোধ উপরে অতি নিষ্ঠুর ভাবরে সত্যর নির্মম হাতুড়ী প্রহার করা যাইছি। হেবা ও নহেবা মধ্যবর্তী পর্যায়র এহা এক চমৎকাব দোলায়মান রূপচিত্র।''[১১]

বিজয় মিশ্র র ভাবনার গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তী নাটকসমূহে। তাঁর 'তট নিরঞ্জন।' (১৯৭৮) ও 'জনে রাজা থিলে' (১৯৮১) তাঁর বিস্ময়কর সৃজন প্রতিভার পরিচয় বহন করে। ১৯৯৬ সালে তিনি লেখেন 'অজ্ঞাতবাস'। অনুবাদকর্মেও তিনি বিশেষ দক্ষ। আগাথা ক্রিস্টির মাউস ট্র্যাপের অনুবাদ বিশেষ জনপ্রিয় হয়। বিশ্বেব বিপ্লবী ভাবনার শামিল হয়ে তিনি গ্রহণ করেছেন বার্টল্ট ব্রেখটেব নাটককে। তিনি সুন্দর রূপান্তর ঘটিয়েছেন ব্রেখটকে 'থ্রী পেনী অপেবা' রূপান্তবিত কবেছেন 'চোর পুলিশ খেলা' নামে, এবং 'গুড উত্তম্যান অব্ সেজুয়ান' নাটকেব রূপান্তব সাধন করেছেন 'কথাটিয়ে কহু' নামে। প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার বিজয় মিশ্র এখন চিত্রনাট্য ও সংলাপ বচনায় ব্যস্ত এতে নাটক হয়ত কিছুটা পশ্চাদগামী হচ্ছে।

আধুনিক নাট্যআন্দোলনের ঋত্বিক **বিশ্বজিৎ দাস** (১৯৩৬) অবক্ষয়ক্লিষ্ট শোষণভিত্তির সমাজ ব্যবস্থার যথার্থ রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর নাট্যসমূহে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ অবিরল নিষ্পেষিত হচ্ছে, বেঁচে থাকার বাসনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, সমগ্র প্রাণচৈতন্য হতাশায় নিঃশেষিত হচ্ছে : বিশ্বজিৎ দাসের নাটকে তার আশ্চর্য রূপচ্ছবি। ১৯৫২ তে 'ব্যর্থলগ্ন', 'তন্দ্রা' প্রভৃতি একাঙ্ক দিয়ে বিশ্বজিৎ দাসের রচনা শুরু। পরে লেখেন 'আঁখি', 'তৃষ্ণা'। ১৯৬১-৬২ তে সাংস্কৃতিক সংস্থা স্রুজনীর সঙ্গে যুক্ত হন ও এই সংস্থা 'প্রতাপগড়রে দ্বিদিন' অভিনয় করে। প্রিস্টলের অ্যান ইনস্‌পেকটর কল্‌স অবলম্বনে রচিত এই নাটকে আধুনিক সমাজব্যবস্থার অমানবিক বর্বর দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। লেখকের অসাধারণ দক্ষতায় ও সৃজন নৈপুণ্যে নাটকটিকে মৌলিক মনে হয়। অতঃপর তিনি লেখেন 'নিজ প্রতিনিধিঙ্ক ঠারু', 'নালিপন রাণী কলাপান টিকা', 'নিশিপদ্ম', 'শুন সুজনে', 'সম্রাট', 'মৃগয়া'। রূপকার প্রযোজিত 'নিজ প্রতিনিধিঙ্ক ঠারু' (নিজস্ব প্রতিনিধি থেকে) এক সাংবাদিকের জীবন চিত্রের মধ্য দিয়ে গোটা সমাজ ব্যবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে। দৈনিক জনতা পত্রিকার প্রতিনিধি নীতিপরায়ণ অজয় সারা দিন অজস্র কাজে ব্যস্ত থাকায় নিঃসন্তান স্ত্রী ইন্দুমতীকে দেখার সুযোগ পায় না। দরিদ্র হতভাগ্য দুদিস্তা কাগজচুরির জন্য চাকরী যাওয়া কেরানি যদুনাথের ছেলে বাবলুকে নিয়ে ইন্দু মাতৃত্বের স্বাদ মেটায়। যদুনাথকে অজয় একেবারেই পছন্দ করে না ও তার চুরিকে ঘৃণা করে। তার ছেলেকে নিয়ে চলে যেতে বলে। এদিকে ওড়িশার খরায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হওয়ায় শ্রী নিরাকার নামে এক ব্যক্তি অজয়ের সাহায্যে দৈনিক জনতায় জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লেখে 'জনতা জাগি উঠ' ও সরকারকে অবিলম্বে জল সরবরাহের জন্য নলকূপ বসাতে বলে। ব্যবসায়ী উপেন্দ্র জরুরী পরিস্থিতিতে তিন কোটি টাকার নলকূপ দেয় সরকারকে যা কিন্তু একেবারেই অকেজো। ধরা পড়ে নিরাকারই উপেন্দ্র। অতি ক্রুদ্ধ অজয় উপেন্দ্রকে শাস্তি দিতে চায় কিন্তু উপেন্দ্র বলে যে অজয় তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা কারণ তার কাজে কোন খুঁত নেই এবং হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্ট সংসদ তার পক্ষে। যদুনাথ বিধবস্ত চেহারা নিয়ে আসে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে যে চিকিৎসার অভাবে বাবলু মারা গেছে। ইন্দু আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে, অজয় স্তব্ধ নির্বাক।

বিশ্বজিৎ দাসের 'মৃগয়া' (১৯৭১) আজকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অস্থির বিভ্রান্ত মানসিকতার, অবক্ষয়ক্লিষ্ট যুগ ও চৈতন্যের শায়কবিদ্ধ ছবি। মানুষ অন্বেষণ করছে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি, স্বপ্ন দেখছে ছোট্ট নীড়ের, কিন্তু রূঢ় বাস্তবের আঘাতে খান খান হয়ে ভেঙে যাচ্ছে তার সামান্য বাঁচবার কামনা, ঘর বাঁধবার স্বপ্ন। নাটকের তিনটি প্রধান চরিত্র ঃ পিতা—প্রৌঢ় বিবেকানন্দ, পুত্র—যুবক সারথি, মেয়ে—তরুণী মুক্তা। ভূমিকার তাদের পরিচয় প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন ঃ এমানে খোজুথিলে, খোজুছন্তি, খোজুথিবে—যাহা পাইনাহান্তি, পাইবে নাহি। বিবেকানন্দ চাকরী করেছে চিরকাল সৎভাবে, একদা ছাত্র অধুনা প্রতিষ্ঠিত রঞ্জনের স্কুলে এখন চাকরি পায়। সারথি বাঁচবার পথ খুঁজে না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছে। মুক্তা অন্বেষণ করছে আকাশ আর সমুদ্র। কিন্তু কেউ পেল না তাদের কাম্য জীবনকে। প্রেসিডেন্টের অপদার্থ ছেলেকে নম্বর না দেওয়ায় বিবেকানন্দ অপদস্থ হয়, তাকে ঘুষ নিতে বলে। বিবেকানন্দর আর এক অতি দরিদ্র প্রাক্তন ছাত্র ম্যাজিস্ট্রেট শুভেন্দুর মনে একদা মুক্তার প্রতি ভালবাসা ছিল। কিন্তু এখন বিয়ে করলে সে চায় প্রচুর টাকা ও বাড়ি। রাজনীতিবিদ্ শ্রমিক নেতা সনাতন মিশ্রের কাছ থেকে সারথি বাচঁবার পথ পেতে চায় কিন্তু একদিন মদ্যপ প্রায় বিবস্ত্র সনাতনকে দেখে সে মোহহীন হয়। বিবেকানন্দ সারথি মুক্তা তিনজনেই জীবনের মানে ও সার্থকতা খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত ব্যথিত বিষণ্ণ। নাটকের শেষ পর্যায়ে সপ্তদশ দৃশ্যের অংশটুকু স্মরণ করতে পারি—

বিবেকানন্দ - গোটাএ পিলাকু পাশ করেই দেলে তিনশ টঙ্কা, শহে পিলাঙ্কু পাশ করেই দেলে তিরিশ হাজার টঙ্কা, তিরিশ হাজার পিলাঙ্কু পাশ করেই দেলে — (আনন্দরে আত্মহারা হই আউ কহিপারিলে নাহি)।

সারথি (ক্রপ্তির নিঃশ্বাস নেই) — আহ্ কি রাতি।

মুক্তা (পূর্বভলি হসি হসি) — খালি, সমুদ্র আউ আকাশ, আকাশ আউ সমুদ্র।

বিবেকানন্দ (হঠাৎ চারি আড়কু বিসফারিত দৃষ্টিরে চাহি) — কাঁহি, রাতি কাঁহি? সমুদ্র কাঁহি? আকাশ কাঁহি?

মুক্তা (বিবেকানন্দঙ্ক মনরে বিশ্বাস জন্মাইবার প্রয়াস করি) অছি-অছি, সমুদ্র অছি, আকাশ অছি।

সারথি (অভিভূত ভাবরে) — তারাগুলাক আকাশরে আঁখি মিটিকামারি হসুছন্তি— পাহাড় সেপটে জহ্নটা বুড়ি যাউছি—আঃ কি রাতি—মু বঞ্চিবি

বিবেকানন্দ (শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবতে)- ভারি থককা! মু টিকিয়ে শোইবি!

মুক্তা — মু কান্দিবি নাহি!

সারথি — মু পণিকিয়া ডাকে?

এরপর মঞ্চে নামে অন্ধকার, এদের জীবনেও। কিন্তু এখানে কি নাটকের সব শেষ? পরিশেষে নাট্যকার বলেছেন — 'অন্ধকার আহুরি গাঢ় হেলা। এতে অন্ধকার যে তা ভিতরে মঞ্চর অস্তিত্ব সুদ্ধা বুড়ি গলা। নাটক মৃগয়া এইঠি শেষ হেলা, কিন্তু জীবন মৃগয়ার শেষ এ নুহে'।

বিশ্বজিৎ দাসের শেষ দিকের নাটক 'সম্রাট' (১৯৭৭) প্রকৃত পক্ষে আলবেয়ার কামুর 'ক্যালিগুলা' নাটকের সুন্দর অনুবাদ। ভূমিকায় তিনি বলেছেন — ''অনেক দ্বন্দ্ব অনেক 'সু' ও 'কু'র মিশ্রণরে গঠিত এ নাটকের কথাবস্তু — অতিমাত্রারে মানবিক তথাপি তার ভিতরে অতি বাস্তবর এক সূক্ষ্ম প্রতিভাস। 'ক্যালিগুলা' অবলম্বনরে 'সম্রাট' রচনা করিবা পাই এই ইংগিত হি মোরে প্রলুব্ধ করিথিলা''।

বিশ্বজিৎ দাস এখনও লিখে চলেছেন অক্লান্ত ভাবে। ব্যঙ্গে বিদ্রূপে সমাজবোধ আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে তাঁর সাম্প্রতিক নাট্যভাবনা অভিনব রূপ পেয়েছে। 'মহামন্ত্র' (১৯৯৮) সহজ সরল tribal বা উপজাতি গোষ্ঠীর ওপর রাজনৈতিক ও চতুরধুরন্ধর ব্যক্তিদের অত্যাচারের কথা তুলে ধরে। তথাকথিত সভ্যতা থেকে দূরে এই সব মানুষদের অকপট জীবনযাত্রা। কিন্তু এই সব সভ্য মানুষ তাদের আঘাত দেয় আক্রমণ করে, তাদের পরিবেশ ও জীবনচর্যাকে কলুষিত করে। নাটকে শেষ পর্যন্ত এই 'সভ্য শক্তি'র বিরুদ্ধে সহজ সাধারণ মানুষদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ও তাদের বাঁচার অধিকার প্রতিপন্ন হয়েছে। লোভী স্বার্থপর মানুষদের চাপে রাজনৈতিক চক্রে সহজ সাধারণ গ্রাম্য উপজাতি চরিত্র সোনারাম মাঝি ক্লিষ্ট হয় ও সে খোঁজে সেই মহামন্ত্র যা তাকে রক্ষা করবে ও দলিত মানুষদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে। নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় ১৯৯৮ সালে। 'মহামায়া অপেরা' উৎকল রঙ্গমঞ্চ ট্রাস্ট কর্তৃক নিয়মিত মঞ্চস্থ হয়েছে। এটি বর্তমান সময়ের সামাজিক — রাজনৈতিক ভাবনার ওপর আধারিত ব্যঙ্গ নাটক। বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে নাটকটি যেন অ্যাবসার্ডধর্মী হয়ে ওঠে যাতে এক কাল্পনিক অপেরার চরিত্র ও পরিবেশের সঙ্গে মিলে যায় বাইরের বাস্তব চরিত্র ও জীবন। নাটকটি বলতে চায় যেন বর্তমান পরিস্থিতিতে অপরাধী মুক্ত হয় ও নির্দোষ অপরাধী প্রতিপন্ন হয়। 'ওঁ শ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ' উৎকল রঙ্গমঞ্চ ট্রাষ্ট কর্তৃক সপ্তাহে তিন দিন ধরে প্রায় তিন মাস

অভিনীত হয়। এটি লঘুভাবে লেখা প্রবল হাস্যরসের নাটক। এর বিষয় একজোড়া তরুণ-তরুণী যারা নিজেদের ঠিকমত না চিনে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। এটি নিছকই আনন্দদায়ক নাটক। যদিও সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতি অন্যায়ের ওপর আঘাত আছে। অনন্ত মহাপাত্র এদের পরিচালনায় অত্যন্ত সফল। বিশ্বজিৎ দাস এভাবেই আজও নাট্যসাধনায় দুর্বারভাবে ব্রতী।

রত্নাকর চইনি (১৯৪৫) আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। প্রায় কুড়িটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চমানের নাটক তিনি লিখেছেন। মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যেরও তিনি সার্থক স্রষ্টা। সামাজিক মানুষের দুঃখ বেদনা যন্ত্রণার চিত্রলিপি তিনি এঁকেছেন। তার সঙ্গে আছে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা; মানব মনের গভীর বিস্ময়ও নাটকে উদ্ভাসিত। অ্যাবসার্ড ভাবনারও সার্থক প্রবক্তা রত্নাকর চইনি। শূন্যতা বা বিচ্ছিন্নতার উদ্ভটত্ব নয় জীবনের এক পরম প্রত্যয় তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল শেষ অশ্রু, অস্তরাগর চন্দ্র, রাজহংস, কলংকিত সূর্য, নচিকেতা উবাচ, অস্থির উপত্যকা, অথচ চাণক্য ইত্যাদি। 'শেষ অশ্রু' (১৯৬৭) চইনির প্রথম নাটক — ১৯৬৫-র ভারত পাকিস্থান যুদ্ধের ভূমিকায় লেখা। সীমান্তে যুদ্ধ চলছে, দেশের মধ্যেও কলহ বিরোধ। নাটকে যুবশক্তির ভূমিকা, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। 'অস্তরাগর চন্দ্র' (১৯৬৮) শ্রমিক মালিক সংঘর্ষ নিয়ে লেখা। মালিক শোষণ করে, শ্রমিক শোষিত, তারা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে চায়। কিন্তু বাধা আসে কিছু স্বার্থপর মানুষের কাছ থেকে যারা সব গোলমাল করে দিতে চায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এক বোঝাপড়া হয়, শ্রমিকরা কারখানা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে।

১৯৬৯ এ প্রথম অভিনীত 'রাজহংস' নাটকে বেদনার করুণ রাগিনী শ্রুত হয়। অতনু মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার, ধনবান ঘনিষ্ট বন্ধু জয়ন্তর সাহায্যে সে হাসপাতাল তৈরী করেছে। অতনু কবিতা লেখে যুধিষ্ঠির নামে, সকলের মত জয়ন্তর বৌ রীতার ধারণা সেগুলা জয়ন্তর লেখা। যুধিষ্ঠির কবিতা লিখে পুরস্কার পাবে লক্ষ টাকা, পরদিন সংবর্ধনা দেওয়া হবে। জয়ন্ত অতনুর কাছে সেই অধিকার দাবি করে। মানসিক রোগগ্রস্তা রীতা প্রকৃত কথা শুনে আহত বেদনামথিত হয়। অতনু ব্যাকুল বেদনার্ত দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধও — সে কবি খ্যাতি চায় কিন্তু যে বন্ধুর অর্থসামথ্য সাহায্যে সে বড় তাকে এই সন্মান দিতে সে পারে না কি। রীতার জন্যও সে ব্যাকুল। পরদিন সবাই দেখে অতনু মারা গেছে। জয়ন্ত ছুটে আসে অতনুর ফটো নিয়ে, স্থির করেছিল সেদিনই সে অতনুর 'যুধিষ্ঠির' পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে সম্মান মর্যাদা তাকে দেবে। জয়ন্ত আকুল বেদনায় ভেঙে পড়ে।

প্রফেসার — বসন্তর শেষ পত্র ধরি দূত তার চালি যাইছি। তমে তাঙ্কু হসি হসি বিদায় দিঅ বন্ধু। তাঙ্ক আত্মার সদগতি নিমন্তে ঈশ্বরঙ্ক নিকটরে প্রার্থনা কর। ও গর্ড।

জয়ন্ত — অতনু রীতা পুণি ভায়োলিন বজাইবা আরম্ভ করি দেইছি। থরে উঠ অতনু। তাকু আউথরে তু মনা করি দে, তোরি কথারে সে চুপ হেবরে! অতনু! (এক করুণ বেদনা ভরা পরিবেশ ভিতরে যবনিকা নই আসিলা তড়কু।)

'কলংকিত সূর্য' ওড়িয়া সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পায় ১৯৭৪ সালে। ছজন লোকে হাতী দেখেছিল। সবাই নিজ নিজ মতানুসারে বর্ণনা করল হাতীর রূপ। কেউই যথাযথ বর্ণনা করতে পারেন না। অথচ নিজেদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষ। সকলেই অন্ধ, কিন্তু কেউ তা স্বীকার করবে কি? "এই অসহায়তার অহং ও তজ্জনিত সংঘর্ষ ভারতবর্ষরে প্রধান্য লাভ করিছি এবং সেই অসহায়তারু জন্ম নেইছি বিপ্লব। সে বিপ্লবী,

অথচ সে নিজের আদর্শ সম্বন্ধরে স্থির নুহেঁ। জাতি ও ধর্মর নিগড় মধ্যরে সে রুদ্ধশ্বাস। বিজ্ঞান তাকু চেতেই দিএ — 'জীবন গোটাএ অজব জিনিষ। তার সঠিক সূত্র সেই কেউ অনাদি কালরু খোজা চালিছি। মাত্র কেহি আজিযাত্র ঠিক রূপে পাই নাহিঁ। এইহজেই করি খোজিবা ভিতরে হুএতি আনন্দ অছি'। এ ঠিক অন্ধঙ্কব হাতী দেখিলা পরি। খোজা চালিছি। মাত্র সিদ্ধান্ত নাহিঁ।''[১২]

'অথচ চাণক্য' (১৯৮২) ভাববর্ষেব সাম্প্রতিক রাজনীতির চিত্র ফুটিয়ে তোলে। অন্যায় বিকতি পাপ ব্যভিচারে দেশে ছেয়ে গেছে। সমাজ হয়েছে অস্থির এবং রাজনীতিবিদরা সেখান থেকে বৈধ অবৈধ সব উপায়ে মুনাফালোটার চেষ্টা করছে। একদা ভারতবর্ষে এসেছিলেন চাণক্য তিনি নন্দবংশকে ধংস করে চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসান। বর্তমান কালেও সেরকম এক বাজনীতিবিদ্ এসেছিলেন যাব সাহয্যে দীর্ঘস্থাযী এক শাসন পরম্পরাকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হয়ে দেশেব শাসন ভার আসে বিরোধীদের ওপর। কিন্তু অতীত চাণক্যের পরিনাম ও বর্তমান চাণক্যের পরিণাম বোধহয় এক। অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্তমান অবস্থার আরোপ নাটকটিকে ভিন্নতর মূল্য দিয়েছে। নাটক এক সাংবাদিক আছে যার সংবাদ ও ভাষ্য পাঠ ভারতের তদানীন্তন ঘটনাকে স্পষ্ট করে তোলে — ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়, জয়প্রকাশের আবির্ভাব, মোরারজীর প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ, রাজ্যে রাজ্যে স্বাতন্ত্র্যের সংকট, জনতা দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জয়প্রকাশ হস্তক্ষেপ করছেন বলে মোরাবজীর অভিযোগ ইত্যাদি। নাটকটা অনেকাংশে ডকুমেন্টারী ও লিভিং নিউজ পেপারের মত জীবন্ত প্রাণবান হয়ে উঠেছে। 'নিজ নিজ কুরুক্ষেত্র' (১৯৯৫), 'আহে আপনে' (১৯১৭), 'সুনা কলস' (১৯১৮) প্রভৃতি নাটকেও তিনি দীপ্ত হয়ে উঠেছেন।

ডঃ বসন্ত কুমার মহাপাত্র (১৯২৮) পেশায় চিকিৎসক, নেশায় নাট্যকার, চেতনায় মানবতাবাদী—তাঁব নাটকে এই বিচিত্র প্রবণতাগুলি এক মহৎ ভাবময় রূপ পরিগ্রহ করেছে। খন্ডিত ক্ষুদ্র জীবনের সীমাকে অতিক্রম করে বিরাট ব্যাপক বিশ্বচেতনায় সার্বভৌম মহৎ অনুধ্যানে তাঁর ভাবনা উদ্বর্তিত হয়েছে। ডঃ মহাপাত্রের নাটকের মধ্যে স্মরণীয় শেষ শ্রাবণ, কাক জ্যোৎস্না, সূর্যস্নান, কাচঘর, পাষণ কাব্য এবং মুক্তিমশাল। 'সূর্যস্নান' (১৯৬৯) নাটকে ডাক্তারখানা বা হাসপাতালের ভাল মন্দ সৎ অসৎ ন্যায় অন্যায় সমন্বিত এক অত্যন্ত বাস্তব চিত্র। জনতা রঙ্গমঞ্চে গোপাল ছোটরায়ের বিখ্যাত 'নষ্ট উর্বশী' নামক নাটকের অভিনয়ে চিকিৎসালয়ের চিত্র দেখে লেখক বুঝলেন যে তা প্রকৃত এত রোমান্টিক বা মধুর নয়। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই কাহিনী রচনা করলেন। ভূমিকা তিনি বললেন — 'এই কাহিনীটির স্থানকাল চরিত্র লেখকর আঁখি আগরে, কিন্তু তাহা কৌণসি অনুষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষ নুহে। ডাক্তারখানা জীবনকু নেই এথিরে কেউ লঘু হাস্যরস পরিবেশ করা যাইছি তাহা সমালোচনামূলক নহে, সংস্কারমূলক, গঠনমূলক'। অপরদিকে নাটকে এক মহৎ মানবিক প্রত্যায় ধ্রুবনক্ষত্রের মত জ্বলে মানুষকে প্রকৃত পথের দিব্য ইশারা দেয়। নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনয় হচ্ছে হিমালয়ের পাদদেশে। সমাজ মিলতে দেয়নি নায়িকা লেডী ডাক্তার অসীমা ও নায়ক শিল্পী ললাটেন্দুকে। ললাটেন্দুর ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত, কর্তব্যপরায়ণ, মানবিকতার সেবক — সে হিমালয়ে এসে নতুন সাধনা করছে, অসীমা তাকে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু নূতন জীবনব্রতে দীক্ষা নিয়েছে ললাটেন্দু। সে অসীমাকে বলে — মুঁ এইটি এই বৌদ্ধ বিহারর অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিচি। বৌদ্ধ ভিক্ষু হই মুঁ বিশ্বরমণিষ আখিরে আধ্যাত্মিকতার

মশাল জালিবি। আউ তমে পঙ্গু অসহায় মুমূর্ষু বোগীঙ্কর শয্যাধাররে জ্বালিব মায়া মমতা সেবা শুশ্রুষার প্রদীপ। তমে হব সেমানঙ্কর কল্যাণময়ী না। প্রুথিবীর দুই প্রান্তবে দুহেঁ বহি সারা বিশ্বর মনিষ পাইঁ আমে দেবা নতুন জীবনর সন্ধান। সেই হেব আমার মিলন, সেই হেব আমার বিবাহ, সেই হেব আম জীবনর ভল পাইবার নূতন দর্শন। আস অসীমা, এই রাতির অন্ধারবে লিভেই দেবা সবু পুরুণা পবিচয়, সজেই দেবা দেহেব সবু পার্থব দহন।'

ডঃ বসন্ত কুমার মহাপাত্রের শেষ নাটক 'মুক্তি মশাল' (১৯৭৫) এক মহান মানবিক প্রত্যযেব উপর দাঁড়িয়ে আছে। রাজনৈকিত বিশৃঙ্খলা দুর্নীতি সর্বগ্রাসী ব্যাভিচাব থেকে মানুষের মুক্তির প্রকৃত পথ নির্দেশ করেছেন নাট্যকাব এই নাটকে। তিনি বলেছেন — 'বিংশ শতাব্দীর সবুঠারু বড় অভিশাপ হেউচি বাজনৈতিক অস্থিবতা। মণিষ আজ বড নুহে, বড় হেউচি তার রাজনৈতিক মতবাদ।' রাজনীতিগত শৃঙ্খলাহীনতা দুর্নীতি আজ দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নিছক গণতন্ত্রের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হবে না, রাজতন্ত্র নয়, সাময়িক শাসন নয়, গণতন্ত্র নয়, একছত্রবাদ নয় — কেউ পারবে না সমস্যা দূর করতে — কেহি এ দেশরু দুর্নীতি দূরকবি দেশকু কলঙ্ক মুক্ত করিপারিব নাহি — যে পর্যন্ত দেশের ব্যক্তি চরিত্র জাতীয় চরিত্র কলঙ্কমুক্ত ন হোইছি। যেউ দিন এ দেশের প্রত্যেক মণিষ অন্তত দেশ পাই ভল মণিষ হেবাকু চেষ্টা করিব, সেইদিন আমে সবু সমস্যাব সমাধান করিপারিব'। এই মানবিক দার্শনিক প্রত্যয়েব বিতর্কিত কিন্তু শিল্পিত রূপায়ণ মুক্তি মশাল।

সংবেদনশীল হৃদয় আর মননদিগ্ধ চেতনা নিয়ে তরুণ নাট্যকাব **রমেশ প্রসাদ পাণিগ্রাহী** (১৯৪৩) আধুনিক জটিল আবর্তসংকুল অস্থির মানসিকতার স্থির চিত্র অংকন করেছেন। পাশ্চাত্ত্য শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিকরা নাট্যকারের মানস পরিমন্ডল রচনা করেছেন — তাঁর চেতনায় ছায়া ফেলেছে অনন্ত বিশ্ব। রমেশপ্রসাদ পাণিগ্রাহীর প্রথম মদ্রিত 'মু আম্ভে ও আম্ভেমানে' (১৯৭০) নাটকে দেখা যায় কয়েকজন লোক বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছে বাসের জন্য যা কোন দিন আসবে না, তাদের নিয়ে যাবে না পরম সত্যের স্বপ্নলোকে। রাজনীতিবিদ্ কবি চিত্রপরিচালক সেলুনওয়ালা চা-স্টল-মালিক উন্মাদ দার্শনিক সকলেই জীবন সংগ্রামে পরাজিত ও অতল বিস্মৃতিতে পালিয়ে যেতে চায়। তারা নিদারুণ পরাজিত ও ব্যর্থ, টি এস এলিয়টের মাইক্রোস্কোপিক ওয়েস্টল্যান্ডে দাঁড়িয়ে তারা বজ্রধবনির প্রতীক্ষা করছে কিন্তু কয়েকটি অর্থহীন ছদ্ম বিপ্লববাণী ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

'জনে মহাপুরুষঙ্ক জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্করে' (১৯৭২) রমেশ প্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। 'ওড়িআ পরীক্ষাবাদী নাট্য জগতরে এ নাটক এক স্বতন্ত্র আসন দাবী করে। নাটকটি বহুদিগরু এক সার্থক সৃষ্টি। উদ্ভট নাটক আলোচনা কলাবেলে এ নাটকর যে গোটাএ গৌরবাবহ ভূমিকা রহিছি, একথা অস্বীকার করাযাই পরিব নাহি।"[১৩] নাটকে উদ্ভট ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে অন্তশ্চেতনার গভীর উন্মীলন। একটা তিক্ত তীব্র জীবনানুভব সমগ্র কাহিনীকে এক অসহনীয় বেদনায় আপ্লুত করে তোলে। নাটকের নায়ক কৃষ্ণমোহন বৈজ্ঞানিক, ভেক বা ব্যাঙ তার গবেষণার বিষয়। বিশেষ করে সে বিশ্বাস করে যে বর্ষার প্রথম বারিবিন্দু ব্যাঙের মাথায় পড়লে তা মণি হয়ে যায়। এই উদ্ভট অবৈজ্ঞানিক ধারনার প্রতিপাদনে সে ব্যস্ত। পরিবেশ সমাজ থেকে সে বিচ্ছিন্ন। তার স্ত্রী মাধবীকেও সে সঙ্গ দিতে পারে না, নিঃসন্তানা মাধবী দুটো ব্যাঙকে 'পিঙপঙ' ও 'নাইট কুইন' নাম দিয়ে অপত্য ভাবে দেখে। কৃষ্ণমোহন তার হাস্যকর

অবস্থানকে ঢাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার বিশ্বাস খান খান হয়ে ভেঙে যায় যখন দেখে মাধবী অপরের (বীরভদ্র) সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ক্লান্ত অসহায় কৃষ্ণমোহনেব সব আশ্রয় ঘুচে যায়, সে অনাসক্ত ভাবে তথাকথিত ধর্মভাবনায় শরণ নেয়। এটা যেন বৈজ্ঞানিক তথা মহাপুরুষ কৃষ্ণমোহনের করুণ পরিনতি তথা মৃত্যু।

'ধ্রুতরাষ্ট্রর আঁখি' (১৯৭৭) বর্তমান ভারতবর্ষের পরিবার তথা সমাজ জীবনের এক নির্মম প্রতিচ্ছবি। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রর সামনে ছিল কুরুক্ষেত্রের সর্ববিধংসী যুদ্ধ। আজও সেই ভয়ংকর সর্বনাশা সময এসেছে— ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পরিবার সমাজ, মূল্যবোধ পরিবর্তিত তথা বিকৃত হচ্ছে, মানবিকতা হচ্ছে মূল্যহীন, নারীত্ব সতীত্ব নিতান্তই কথার কথা। এক সর্বনাশ অবক্ষয় সভ্যতাকে বিনষ্ট করতে চাইছে, ঘন কাল তামস অন্ধকার আবৃত করছে ন্যায় নীতি সভ্যতা শালীনতা। সমৃদ্ধ অতীত মুছে গেছে, সোনালী ভবিষ্যতের চিহ্ন মাত্র নেই, আছে শুধু বর্তমানে দিন যাপনের আর প্রাণ ধাবনের গ্লানি, শুধু টিকে থাকবে সম্ভ্রমহীন মর্যাদাহীন প্রয়াস। কিন্তু সবাই ধৃতরাষ্ট্র, কেউ কিছু দেখে না দেখতে চায় না। বৃদ্ধ পিতা সীতানাথ অতীত থেকে খুব কষ্ট করে লাঠি ধরে চলে আসে পুত্রেব কাছে, বর্তমান তাকে ধমকায় তুমি এলে কেন পেছনের ঘর থেকে। তাব জ্যেষ্ঠ পুত্র একদা ছাত্র নেতা সন্তান বর্তমানে ক্লান্ত বিধ্বস্ত, সে বিপ্লব আব বোমায় ব্যর্থ পথ খোঁজে। সন্তানের প্রেম করে বিয়ে কবা বৌ সিকতা মিথ্যা সুখেব জন্য ডেপুটি সেক্রেটারি জেকব মহাপাত্রর শয্যাসঙ্গিনী হয় বিনা দ্বিধায়। সুখ খোঁজে যৌন কামনায় অস্থির জেকব পুত্র যোশেফ এবং বংশ পরিচয় ও শিক্ষাহীন অথচ প্রচুর অর্থবান প্রেম দত্ত — এবা দুজনেই সীতানাথ কন্যা বর্ষার প্রণয়কামী। সীতানাথের ছোট ছেলে সংবিত লঘু চপল চঞ্চল - সে গাঁজা খায়, সিনেমায় নাবার স্বপ্ন দেখে, বোন বর্ষার জন্মদিনের নামে বর্ষার প্রেমিকদের কাছ থেকে পয়সা নেয়। বর্ষারও সবুজের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায় - আসন্ন অন্ধকার তাকেও যেন আচ্ছন্ন করে। এই পরিবার তথা সমাজের সামনে কোন মহৎ প্রত্যয নেই, ভবিষ্যতের সোনালী প্রত্যাশা নেই। আধুনিক ভারতবর্ষের বোধ প্রত্যয় হীন নির্জ্যোতি নিশ্চেতন জীবনের প্রতিচ্ছবি 'ধ্রুতরাষ্ট্রর আঁখি'।

'আত্মলিপি' (১৯৭৮) নাটকে এক নাট্যকারের ব্যথা-বেদনা প্রকাশিত। পরিশ্রম করে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে নাট্যকার নাটক লেখেন কিন্তু সমাজ সংসার তার জন্য কি প্রতিদান বা স্বীকৃতি দেয়! সদিচ্ছা, সহানুভূতি বা সম্মান কিছুই তার জোটেনা এর বিনিময়ে। নাটকটি প্রকৃত পক্ষে নাট্যকারের মানসিতার প্রতিলিপি হয়েছে। "আত্মলিপি রমেশ পাণিগ্রাহীঙ্কর নাটক নুহেঁ, বরং আত্মচরিত কহিলে ভুল হেবনি। .... এ নাটকর নির্দেশক প্রযোজক লেখক অভিনেতৃ এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ঠিকাদার চরিত্র আম চলন্ত সমাজর প্রতিনিধি।"[১৪]

রমেশ প্রসাদ পাণিগ্রাহী ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১০০টা নাটক লিখেছেন। তাঁর *'গোটিয়ে ব্রুত্ত অঙ্কিবার সহজ প্রণালী'* (একটা সম্পূর্ণ বৃত্ত আঁকাবার সহজ প্রণালী, ১৯৯৫) নতুন ধরণের নাটক; বলা যায় জগন্নাথকথার উত্তর-আধুনিক ব্যাখ্যা নাটকটি। জগন্নাথ মিথকে যেন বিপ্রতীত ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যখন বিদ্যাপতি জগন্নাথের মূর্তিকে তার মূল স্থান থেকে অপহরণ করে, সে কেবল উর্ধ্ববৃত্তাংশ এনেছিল। সে মূর্তিকে পুরীর মন্দিরে স্থাপন করে মুখোশের মত। কিন্তু মন্দিরে তা ঠিক মত সংরক্ষিত হয়নি। জগন্নাথকে নিয়ে ব্যবসা চলে। বিদ্যাপতি যখন স্নান পূর্ণিমার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে, শবরের উত্তরপুরুষরা তাদের প্রাচীন ঔষধসমূহ দেয়। শবরদের প্রধান বিশ্ববসু পুরীতে

আসেন ও দেখেন যে তাদের প্রভু মন্দিবে বন্দী। আদি বা প্রাচীন মানুষদেব সঙ্গে সভ্য মানুষদের যুদ্ধ লাগে — বিশ্ববসু জয়ী হন। তিনি বৃত্তর নিম্নার্ধ (মূলাধার) নিয়ে আসেন ও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন। এটা পূর্ণরূপ বা পূর্ণবৃত্ত হয়। নাটকটি শহরের অন্ত্যজ জীবনের নিখুঁত ছবি আঁকে এবং পাঠককে ডিকেন্সের কথা মনে করিয়ে দেয়।

'অন্ধ নদীর সুতা' (অন্ধনদীর স্রোত, ১৯৯৭) নাটকে নীচুতলাব সমাজ জীবন অঙ্কিত হয়েছে। মেধাবী কিন্তু দরিদ্র সদাশিব বন্যায় তাদের গ্রাম ভেসে যাওয়ায় শহরে আসে বাঁচাব তাগিদে। সে তার সার্টিফিকেট পুড়িয়ে দিচ্ছিল স্টেশনে তখন মাস্তান গুন্ডা রাজার সঙ্গে তার পরিচয় হয় ও বন্ধুত্ব হয়। রাজা তাকে বাঁচার রাস্তা দেখায় — তা হল অন্ধকারের রাস্তা। সদাশিব একদিন চুরি করতে যায় এক বুড়োবুড়িব বাড়িতে যারা ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথা করে বিক্রি করে। বুড়ি তাকে ধরে, বাড়িতে আটকে রাখে, তাদের মেয়েকে সদাশিব ভালবাসে ও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে। এদিকে শহবে বাস স্ট্রাইক হবে, নেতা রাজাকে বলে স্ট্রাইক ভাঙতে; রাজা অনেক টাকা চায় কারণ টাকা দিয়ে লোক আনতে হবে, বোমা তৈরী করতে হবে। কিন্তু ঐ সংঘর্ষে রাজা মুমূর্ষু। সে সদাশিবকে বলে যে তার বাবা-মা কেউ নেই, ডাস্টবিনে জন্ম। সদাশিব কিন্তু রাজাকে ভালবাসে, বলে এই সম্রাটহীন পৃথিবীতে সেই ছিল রাজা। এখন পৃথিবী হল অনাথ। বাজা সদাশিবকে ভাল করে ঘর সংসার করতে বলে এই অন্ধকার নদীর স্রোত থেকে বেরিয়ে এসে।

আলট্রা মডার্নিটি, প্রখর ইনটেলেক্ট ও বিপুল অ্যাবসার্ডিটি নিয়ে ওড়িয়া নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ অসাধারণ ক্ষমতাবান স্রষ্টা **জগন্নাথ প্রসাদ দাস** (১৯৩৬) সমগ্র মানবতার দুরবগাহ শূন্যতা ও আত্মিক অবক্ষয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর নাটকে। তাঁর 'সূর্যাস্ত পূর্বরু' (১৯৭৭) নাটকে আধুনিক জীবনের ঊষরতা, চৈতন্যের বিনাশ, নিপীড়িত ব্যর্থ বিকৃত সভ্যতার রূপ তীব্রভাবে অঙ্কিত হয়েছে প্রধান চরিত্র দীপঙ্কর তার স্ত্রী শীলা বন্ধু সঞ্জয় ও প্রেমিকা সবোজের মধ্য দিয়ে। তরুণ দীপঙ্কর কবিতা লিখত, দুচোখ ভরা সবুজ স্বপ্ন আর বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে জীবনের মানে খুঁজে বেড়াত। আর আজ সূর্যের আলো সুনীল আকাশ প্রসন্ন বাতাস বর্জিত রুদ্ধ ক্ষুদ্র কক্ষে ভয়াবহ সেলস ফিগারের স্তূপ, অবিশ্বাসী চতুব বন্ধুর সাহচর্য, ভ্রষ্টা স্ত্রীর কৃত্রিম প্রণয় এবং একদা কামনা প্রদীপ্ত বর্ণাঢ্য প্রেমের অধুনা ম্লান নিভন্ত ধূসর বিকর্ষক কান্ত জীর্ণতা তাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। সমাজ-প্রতিষ্ঠিত মদ্যপ নারীদেহ-ভোগী সুখী পরিতৃপ্ত দীপঙ্করের মৃতদেহ সে যেন বহন করে নিয়ে চলেছে আবহমানকাল। সে তার স্বপ্ন ফিরে পেতে চায়, জীবনের মানে জানতে চায়, মুক্তির আস্বাদ চায় — আর চায় শীলা সঞ্জয় সরোজের বিচার। কিন্তু কুটিল সমাজ ঠাট্টায় হাসে, দীপঙ্করই হয়ে ওঠে অভিযুক্ত আসামী ঃ এখন শ্বাসরোধকারী ধুম্রসমাকীর্ণ অসহ্য অরব অন্ধকারে দীপঙ্করের শুধু ইন্তেজার. শুধু প্রতীক্ষা, শুধু 'রক্ত ফেনা মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মত লাশকাটা ঘরের' অপেক্ষা করা। 'সব শেষ লোক' (১৯৮০) বিপ্লবী ভাবনার নূতনতর প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ। বাবুজী সমাজসংসার নিয়ন্ত্রণ করে, অধ্যাপক নাটক লেখে তার নির্দেশে, অভিনেতা কুমার তার নির্দেশে চলে, আর আছে নায়িকা মীনা যে বাবুজীর রক্ষিতা। ঘৃণ্য আপোষকামী জীবন যাপন করে মধ্যবিত্ত জীবন ও মানসিকতার অধ্যাপক ও কুমার, বরং মীনা জীবনের দীনতা সত্ত্বেও কখনো কখনো বিদ্রোহিনী হয়ে ওঠে, ভাঙতে চায় সব কিছু, ছিন্ন করতে চায় সর্ববন্ধন; যদিও যে পাথরে পরিণত তার সমগ্র সত্তা শিলীভূত। বাবুজীর ভৃত্য পরিচয়হীন সহায়সম্বল বর্জিত সর্বরিক্ত রামু শোনে বিপ্লবের পদধ্বনি—তার ভাই আসবে সেই বিপ্লবের আগুন বয়ে। বেজে ওঠে সময়ের

ঘড়ি, এগিয়ে আসছে সর্বহারা সাধারণ মানুষের মিছিল বাঁচবার দাবী নিয়ে, মনুষ্যত্বের অধিকার অর্জনের জন্য। বাবুজী যায় তাকে প্রতিরোধ করতে, ভীরু ক্লীব অধ্যাপক অভিনেতা তাকে অনুসরণ করে, বামু দাড়িয়ে, মানা তার কাছে যায় লড়াই-এ শামিল হতে। নাটক শ্লোগানধর্মী নয়, বিপ্লব চেতনায় গান্ধী ও মাও সে তুং উভয়েই ব্যবহৃত, একটা প্রতীকী রহস্যময়তা যেন ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনা আনে। লেখকের রাজনৈতিক ভাবনা বা দর্শন নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে যদিও তার রূপায়ণে নাট্যকারের কৃতিত্ব আদৌ অস্বীকার করা যাবে না।

'অসংগত নাটক' (১৯৮১) অ্যাবসার্ড ধর্মী নাটক যদিও তা ভারতীয় লেখকদের ব্যবহৃত এ্যাবসার্ড রীতিকে ব্যঙ্গ করেছে। একদিকে সময় চেতনা, অন্যদিকে বাস্তবতার বোধ — দুয়ের মিশ্রণে নাটক গড়ে উঠেছে। তার সঙ্গে সামাজিক নীতি ও প্রথা নিয়ে কৌতুক।

'পূর্ববাগ' (১৯৮৩) গ্রন্থান্তর্গত দুটি নাটিকায় পণ প্রথা ও প্রচলিত বিবাহ প্রথাকে কৌতুক ব্যঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। এদের ঢঙ লঘু হলে ও বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা আছে। পঁচিশ বছর আগে লেখা নাটকদ্বয়ের আবেদন আজও সমান। জগন্নাথ প্রসাদের সৃজন ক্ষমতার উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে 'পূর্ববাগ'।

কিন্তু শেষ নাহি যে শেষ কথাকে বলবে। ওড়িয়া নাটক আজও সম্মুখের অভিযাত্রী। নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন কবি গল্পকার গৌর পট্টনায়ক (অনুতাপ, চন্দ্রকলা, নষ্টনীড়), নারায়ণ শতপথী (সহস্রশিখা, ফল্গুর বন্যা, পাহান্তি তারা, জলতরঙ্গ, মৃগনাভি, তুমকু মিছ মতে সত), অক্ষয় কুমার মহান্তি (রাত্রির বাধা, সম্বিত, বিরোধাভাস), চিন্তামণি জেনা (সন্ধ্যাতারা, ধর্মাশোক)। রঘুনাথ পণ্ডা (নিমাই সন্ন্যাস, গাঁগহলি, মাণিকমালা), কৃষ্ণ চরণ বেহেরা, কুঞ্জ বিহারী দাস প্রমুখ খ্যাতিমান স্রষ্টারা।

এদের অনেক আগেই নাটক লিখতে আরম্ভ করেছেন সুবক্তা অধ্যাপক গবেষক **রজত কুমার কর** (১৯৩৪)। ঐতিহাসিক নাটকে তিনি সফল। 'কবিসম্রাট' (বিশিষ্ট কবি উপেন্দ্র ভঞ্জর দুঃখ কষ্টময় জীবনের আশ্চর্য ছবি), 'চন্দন হজুরী' (জগন্নাথ দেবের সেবক ও স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্ভীক সৈনিকের জীবন কথা), 'সুরেন্দ্র সাএ' প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি পেয়েছে। সামাজিক নাটক 'সলিতা'র মুল বক্তব্য ভূমিকায় কথিত — প্রেমিক প্রেমিকা হোই ভবিষ্যতর রংগীন স্বপ্ন দেখিবা খুব সহজ কিন্তু স্বামী স্ত্রী হোই ঘর করিবা খুব কষ্ট বোলি প্রমাণ করিবাকু চেষ্টা করিছি নাটক সলিতারে। খালি ভল পাই বিবাহ করিদেলে কাম সরি যাএ না। বিবাহ পরে আসে অগ্নিপরীক্ষার বেল — এহাহিঁ নাটকর মূলকথা'। যুগ ও কালের অনেক বিবর্তন ঘটলেও শ্রীকরের বক্তব্য নিঃসন্দেহে স্থির সত্যের দিগ্‌দর্শক।

হিমাংশু ভূষণ সারতও (১৯৩২) নাট্যরচনায় বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন। তার 'অদ্ভুত আলোক,' শ্রীমতী বীণাপাণি মহান্তির 'কস্তুরী মৃগ ও সবুজ অরণ্য' নামক বিখ্যাত গল্পের উজ্জ্বল নাট্যরূপ, দর্শক সাধারণ্যে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। বক্তব্যের গভীরতা থাকলেও শ্রীসারত মূলতঃ সাধারণ দর্শকের জন্যই লেখেন। আধুনিক নাটকের পরীক্ষানিরীক্ষা সাংস্কৃতিকতা বা দার্শনিকতা বিশেষ কিছু মানুষের জন্য, কিন্তু তিনি সকলের আনন্দ বিধান চান। 'অপরিচিত' নাটক সে কথাই ব্যক্ত — 'দর্শকমানঙ্কু রুচিকু আঁখি আগরে রাখি নাটকটির হাস্যরস কারুণ্য এবং উৎকণ্ঠা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিছি। .... সরল গতানুগতিক পন্থারে মঞ্চ নাটকর পরমপরাকু বজায় রাখি 'অপরিচিত' নাটক লেখিবার উদ্যম করিছি।'

নারায়ণ শতপথী অধ্যাপক প্রাবন্ধিক নাট্যকার। ইতিহাস সচেতনতা, সামাজিক বোধ ও জীবন ভাবনা তাঁর নাটকে মিশে গেছে। 'সপ্তশিখা'য় তিনি রাণাপ্রতাপের জীবন অবলম্বনে ইতিহাসের দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলোকে নিপুণ ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে মানব জীবনে সুখদুঃখ হাসিকান্না যন্ত্রণাদাহর সহস্র তরঙ্গাঘাতে তাঁর শিল্পীমন বিকশিত হয়েছে 'ফল্গুর বন্যা' 'পাহান্তি তারা' 'তুমকু মিছ মতে সত' প্রভৃতিতে। নাট্য সাহিত্যের নিপুণ ব্যাখ্যা ও বিশেষণে শ্রীশতপথী বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

গৌর পট্টনায়ক (১৯৪৪) সাহিত্যের বিবিধক্ষেত্রে আপন কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। আধুনিক সমাজের পটভূমিকায় তিনি জীবনের বিচিত্র সত্যকে উদ্ভাসিত করেছেন। তাঁর নাটক উভয়ত মনস্তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক — তিনি মানব মনের জটিল গভীর সীমাহীন রহস্য ও বিস্ময়কে অবিষ্কার করেন এবং বিচিত্র রূপাঙ্গিকে তাকে প্রকাশ করেন। তাঁর 'চন্দ্রকলা' এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখ্য।

প্রফুল্ল কুমার রথ (১৯৩০) আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। একদিকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, অন্যদিকে আদর্শনিষ্ঠ সমাজ ভাবনা তাঁর মধ্যে পাই। সমাজের অন্যায় দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার পাপ হিংস্র রূপ মেলেছে, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়; মানুষের মক্তি সম্ভব, সমাজের এই রূপ পরিবর্তিত হবে। নাট্যকার এই সত্য ব্যক্ত করেছেন তাঁর নাটকে। তাঁর প্রথম নাটক 'আজি ও কালি' ছেষট্টিতে অন্নপূর্ণা বি গ্রুপ দ্বারা অভিনীত হয়, পরিচালনায় প্রখ্যাত সামুএল সাহু (বাবি)। 'ওড়িশার পূজ্য নেতা স্বর্গত উৎকলমণিংক সেবা ত্যাগ আউ আদর্শকু রুপায়িত' করা হয়েছে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে। নাটক প্রযোজনা দেখে দৈনিক মাতৃভূমি লেখেন — বর্তমান এহি অশান্ত ও অস্থিরতার যুগরে যুবশক্তির জাগরণ ও আদর্শবাদর প্রচার পাই নাটকরে যেঁউ প্রচেষ্টাকরা পাইবি তাহা প্রশংসাযোগ্য ও অভিনন্দনীয়'। তাঁর 'শব পড়িচি' (১৯৭১) নাটকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে এই সমাজ ব্যবস্থার এক নিষ্ঠুর দিকে দেখানো হয়েছে। এক বৃদ্ধের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পানওয়ালা শেঠজী পন্ডিত মৌলবী পাদ্রী বিরোধী এম এল এ সকলেই বড় বড় কথা বলল, লেকচার দিল কিন্তু কেউ হতভাগ্য মৃতর সামান্য সৎকারও করতে এগিয়ে এল না।

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্টতম অধ্যাপক **প্রফুল্ল কুমার মহান্তি** (১৯৩৯) ছাত্রাবস্থা থেকেই নাটক লিখে আসছেন, অবশ্য সেগুলো একাংক। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'ঝরা কুহেলি', ১৯৬৪ তে অভিনীত হয়। শ্রী মহান্তির নাটকের উদ্দেশ্য চরিত্রের গভীরতাকে ব্যক্ত করা। বাস্তব পরিবেশে মানুষকে তিনি স্থাপন করেন যেখানে জীবনের সমস্যাসমূহ অত্যন্ত গভীরভাবে বিবেচিত হতে পারে — সেই পটভূমিকায় ট্রাজিক দ্বন্দ্ববিদীর্ণ হৃদয়ের উদ্ভাসন করেন তিনি। তাঁর শিল্প - ভাষা অত্যন্ত কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাট্য যা দ্বারা চরিত্রের অন্তঃস্বরূপ অপরূপ দীপ্তিতে ঝলসে ওঠে। পূর্ণাঙ্গ একাংক মিলিয়ে তার নাটক প্রায় পঁচিশটি। 'কলা জন্থ' নাটকের বক্তব্য এই যে মানুষ গভীর সংবেদনশীলতা নিয়ে পার্থিব ও জড়বাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ঘোষণা করে, কিন্তু বাস্তবিকতাকে মাত্রাহীনতার অতিক্রম করতে চাইলে প্রত্যক্ষ বাস্তব হারিয়ে যায়, কল্পনাও অনায়ত্ত থাকে। 'মেলা আকাশ' নাটকে অতীত বা ঐতিহ্যিক বিষয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে যা প্রতীকায়িত হয়েছে একটি পুরাতন বাড়ির মাধ্যমে যেটা উভয়ত অতীতের মহিমা ও নীচতাকে ব্যক্ত করে। নতুন গড়ার প্রত্যাশা নিয়ে নায়ক সেটা ভাঙতে চায়। কিন্তু অতীত থেকে বিছিন্ন হলে ভবিষ্যতও হারিয়ে যায়। তার বর্তমানও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিবাহের দিনে তার প্রিয় নারী নিহত হয় যখন বাড়িটাকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

তরুণ নাট্যকার **প্রসন্ন কুমার দাস** গল্পের ক্ষেত্র থেকে নাটকে এলেন কারণ তিনি মনে করেন নাটক সাহিত্যের এক জীবন্ত চলমান অধ্যায় এবং নাটকই সমাজকে প্রবল ভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। প্রায় কুড়িটি নাটকের খ্যাতিমান রচয়িতা প্রসন্ন কুমারের নাটকে আধুনিক ওড়িয়া নাট্য সাহিত্যের ধারানুবর্তনে রূপক-প্রতীকসমন্বিত অ্যাবসার্ডিটির দিকে ঝুঁকেছে। তিনি মানব হৃদয়কে বিশ্লেষণ করেন, মানব চৈতন্যের অনন্ত রহস্যের উন্মোচন করেন, অন্যদিকে জীবনের সত্য - শিব সুন্দরের আলোকশিখা অনির্বাণ জ্বেলে রাখেন — সেই উজ্জ্বল আলোকবিকীর্ণ পথে সভ্যতার চিরন্তন পথা চলা। প্রসন্ন কুমার দাসের নাটকের মধ্যে স্মরণীয় ছায়াপথ, চতুষ্পদ, প্রাগৈতিহাসিক, শতাব্দীর স্বপ্নভঙ্গ, কুঁয়াতারার কাব্য, মুঁ হজিছি প্রভৃতি যারা আকাশবাণী ও বিভিন্ন স্থানে সগৌরবে অভিনীত হয়েছে।

আধুনিক মানুষ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে সভ্যতার চরম শিখরে উঠলেও কখনো তার আদিম প্রবত্তি তাকে তাড়িত করে পশুতে পরিণত করে — 'চতুষ্পদ' নাটকের তাই বিষয়বস্তু। মানুষ নিজ সীমার মধ্যে, জ্ঞানবোধ প্রত্যয়ের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক সুন্দর হলেও অর্থ খ্যাতির মরীচিকা তাকে বারবার প্রলুব্ধ করে ও তখনই ঘটে তারপতন — অভিশপ্ত শতাব্দীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভাঙার কাহিনী 'শতাব্দীর স্বপ্নভঙ্গ'। মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ ভন্ডামী স্বার্থপরতা কীভাবে উগ্র প্রবল হয়ে ব্যক্তি জীবন পরিবার ও গোটা সমাজকে আশার আলোক নির্বাপিত অতলান্ত সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে 'প্রাগৈতিহাসিক' নাটকে তা কথিত।

অভিনব রূপ ও ভাবের নাটক 'মুঁ হজিছি' (আমি হারিয়ে গেছি)। গৌতম অন্বেষণ করছে সিদ্ধার্থকে। সে আসে 'স্মৃতিনগর' এ — যেখানে পরিচিত হয় অশোক অনাদি ক্ষণিক নিরাকার ও বিবেকের সঙ্গে। কিন্তু ওরা তাকে অত্যাচার উৎপীড়ন করে বন্দী করে রাখে এক অন্ধকার ঘরে যেখানে প্রীতিও বন্দিনী। বিবেক আশার বাণী নিয়ে আসে। গৌতম মুক্তি পায় না, তার সিদ্ধার্থকে অন্বেষণ কি ব্যর্থ মিথ্যা হবে! বিবেক অন্ধকারে জ্বেলে দেয় আলো যা অনির্বাণ দীপ্ত হয়ে পথ দেখাবে। নাটকটি রূপক ও প্রতীকধর্মী। বাইরের কাহিনীর অন্তরালে আর এক গভীর বক্তব্য সমভাবে এগিয়ে চলেছে এবং প্রতিটি চরিত্র হয়েছে প্রতীকময়। গৌতম পরম সিদ্ধি অন্বেষণ করছে, কিন্তু সেই পরম সত্য তার অন্তরেই নিহিত। বিবেক তাকে বলে — 'সিদ্ধার্থ হেউছি তমে'। আর অন্যরা হচ্ছে তার মনের অসংখ্য ভাবনার কয়েকটি রেখা! 'সে নিরাকার কারণ তম মনর লোভর বিধ্যবন্ধ আকার নাহিঁ। তমরি মনরে যেউ স্তরীভূত হিংসা তারি প্রতিনিধি হেউছন্তি অনাদি। ক্ষণিক তম ভিতরে থিবা ক্রোধর রূপ। অশোক তম মনর আকাঙ্ক্ষা আউ প্রীতিই প্রেম। .... যেঁউ সিদ্ধার্থ তমরি ভিতরে সুস্থ অবস্থারে রহিছি, তাকু পাইবা পাই মহাসাধনা করিবাকু পড়িব। সেই সাধনা ভিতরে যদি তমে এমানঙ্কু ভুলিযাইপার, তাহাহেলে যাই সিদ্ধার্থ সহিত তমর সাক্ষাত।' আর বিবেক গৌতমের মনের আর এক প্রতিনিধি — 'মু জ্ঞানর আলোক জ্বলাই তমরি অন্ধার মনকু আলোকিত করে'। বিবেক আলো জ্বেলে দেয় — জ্ঞানের জোতি বিকীর্ণ হতে থাকে। নাটকের রূপকপ্রতীকের অন্তরালে মানবজীবনের সত্য ব্যঞ্জিত, *চিরায়ত ভারতীয় সভ্যতার প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানবতার অগ্রগতির মন্ত্রোচ্চারণ ঃ* অজ্ঞান অচৈতন্যের ঘনতমিস্রায় পথভ্রান্ত মানুষের সামনে ধ্রুবনক্ষত্রের আলোক দীপ্তিতে সত্যপথের উজ্জ্বল অনির্বাণ ইশারা দেয় নাটকটি।

কার্তিক চন্দ্র রথ (১৯৪৯) জীবনশিল্পী এবং জীবনশিল্পী কথাটা তার গভীর সত্যে ও ঐকান্তিক প্রত্যেয়ে দ্যোতিত হয়েছে তাঁর রচনায়। সাম্প্রতিক জীবন-চেতনা ও যুগ যন্ত্রণা

তাঁর নাটকে পাই ঃ তবে সাম্প্রতিকতাকে চিরন্তনতায় উত্তীর্ণ করেছেন তিনি। কার্তিকচন্দ্র রথের নাটকের প্রধান ধর্ম অন্বেষণ — জীবনের সত্যকে তিনি অন্বেষণ করে চলেছেন শিল্পের মাধ্যমে। যুগব্যাপ্ত দুরতিক্রম্য সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে অন্তরাত্মার অপ্রশমিত অতৃপ্তি, তথাকথিত ন্যায়নীতির বন্ধনে ক্লিষ্ট চেতনার অসহ্য অসংবরণীয় দহন জ্বালা, সুখশান্তিব নিগড়ে মুক্তি- পিয়াসি প্রাণের অস্থির উন্মাদনা তিনি অনুভব করেছেন, এবং খন্ডিত ক্ষুদ্রপরিসর জীবনের অচলায়তনের অতিক্রান্তে এক পরম সত্যকে খুঁজতে চেয়েছেন, থাকা না থাকা অস্তি স্থিতি শূন্যতার পারঘাটায় দাঁড়িয়ে দ্যুতিময় স্বর্গদ্বারের সন্ধান করেছেন, বজ্রকম্পিত অগ্নিদগ্ধ দুঃখবেদনাকীর্ণ পথের শেষে সবুজ পৃথিবীর অন্বেষণ করেছেন। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্যপ্রয়াসী রূপসন্ধানী স্রষ্টা — তীক্ষ উজ্জ্বল সংলাপ, দ্যুতিময় ভাষণ, সুপরিকল্পিত উদ্ভট বিন্যাস ও রূপায়ণ, প্রতীকের বিস্ময়কর দ্যোতনা ও রূপদ্যুতি কার্তিকচন্দ্র রথের নাটককে আশ্চর্য আবেদনশীল করেছে।

পঁয়ত্রিশটির বেশী পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন কার্তিকচন্দ্র রথ, একাংকও অতিক্রম করেছে ত্রিশের মাত্রা। তাঁর নাটক 'এই দেশ এই মাটি' (১৯৬৩) থেকে সম্প্রতিকাল ব্যাপ্ত হয়েছে তাঁর নাট্য সাধনা যার মধ্যে স্মরণীয় 'দীপ লিভি লিভি যায়', 'গোটিএ সাগর কোটিএ ঢেউ', 'জীবন যজ্ঞ', 'স্বর্গদ্বার', 'জউঘর', 'সমুদ্রর রঙ্গ যন্ত্রণা', 'অবশিষ্ট পৃথিবী', 'স্মৃতি সান্ত্বনা ও শূন্যতা', 'দ্বিতীয় দর্পণ', 'তৃতীয় পৃথিবী', 'ঈশ্বরজনে যুবক', 'মু দূহে', 'চন্দ্রবিন্দু' প্রভৃতি।

'স্বর্গদ্বার' নাটকের ঘটনা কোন অলৌকিক লোকে যেখানে মর্ত্য থেকে আসা মৃত কয়েকজন সমবেত হয়েছে যারা জীবনে ব্যর্থ পরাজিত পলাতক। তারা ছুটছে ক্রমাগত ক্রমান্বয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বদোলনের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, অনেক ক্ষত ভীষণ ক্ষুধা অসহ্য জ্বালা নিয়ে কোন এক স্বর্গদ্বারের সন্ধানে। মর্তের প্রেমিক প্রেমিকা অয়স্কান্ত ও অনুরূপা স্বর্গদ্বারে এসে শান্তি পেয়েছে; অনাথ বালক বিকিরণ লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হয়ে গবেষণায় ব্যস্ত থেকে স্ত্রী বিবাসিনীর আনন্দ উপভোগে আদৌ সাড়া দিতে না পেরে রিক্তচিত্রে যাবার সময় গাড়ী চাপা পড়ে মরে; নৃতত্ত্ববিদ সুগত আদিমানবের সন্ধানে ব্যাপৃত থেকে স্ত্রী সুমিতাকে নিদারুণ অবহেলা করে ও তার বন্ধু সুমিতার প্রণয়ী সুমন্তর গুলিতে মারা যায়; দার্শনিক তন্ময় মৃত্যুর পর জীবন সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে স্ত্রীকে অত্যন্ত উপেক্ষা করে ও এক ভয়ঙ্কর মুহূর্তে স্ত্রীকে গলা টিপে মারে ও তার ফাঁসি হয়। তারা সবাই এসেছে স্বর্গদ্বারে, মর্তে তারা শান্তি পায় নি, স্বর্গ কি পরম শান্তি তাদের জন্য বহন করে আনবে? কে জানে। নাটকটির অন্যবিধ তাৎপর্য ভূমিকায় কথিত — 'সাম্প্রতিক চেতনাকু যদি আমর পারিপর্শ্বিক অবস্থা অনেক দিগরু নিয়ন্ত্রণ করুথাএ, তেবে অতিচেতা (সুপ্রা কনসিঅসনেস) রে মণিষর পরিচয় কণ কেবল মণিষ না আউ কিছু — ইএ তার বিশ্লেষণ।

'সমুদ্রর রঙ্গ যন্ত্রণা'য় (১৯৭০) মানুষের অস্তিত্বের সার্থকতা অন্বেষণ করা হয়েছে। সভ্যতার প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবী বদলেছে তার ওপরের মানচিত্রে। একান্ত পুরাতন পৃথিবীর আন্তর পরিবর্তন ঘটেনি। আজ মানুষ নতুন জীবনের জন্য সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একটা সবুজ পৃথিবীর ব্যাকুল প্রত্যাশায় আছে — ঝঞ্ঝাবিক্ষোভ ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাতের ভয়াবহতা সত্ত্বেও মানুষ সেই পরম সত্যের অন্বেষণ করে চলেছে। 'জীবন যজ্ঞ' নাটকে লোকায়ত লোভ ও লাভ এবং লোকোত্তর আনন্দের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। একটি আরণ্যক মানুষ কাম ক্রোধ লোভ ও মোহ অসৎ শক্তি চতুষ্টয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। আকস্মিক ভাবে তাকে দেখি থানায় পুলিশের সামনে একজনের হত্যাকারী

হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে সে হত্যা করেছে কোন মানুষকে নয় — মানবতাকে। 'ত্রুতীয় পৃথিবী' (তৃতীয় পৃথিবী) শক্তিশালী প্রতীকধর্মী নাটক — চারজন পুরুষ ও একজন নারী আদিম অরণ্যে প্রবেশ করে পিকনিক করতে। অত্যাধুনিক স্বাতী বলে সোনার হরিণ আনতে যা সেক্সের প্রতীক। তারা পারে না। নাটকীয় ভাবে ক্যাপটেন মনোজ এসে সেটাকে গুলি করে। তারা সবাই স্থির করে এক রাত্রির জন্য তারা সভ্যতার বাইরের আবরণ খুলে আদিম জগতে যাবে। তারা অতীতে যাবে না কারণ তা অপূর্ণ অপ্রশমিত, ভবিষ্যতও অনিশ্চিত, তাই তারা এক তৃতীয় পৃথিবীতে পালায়। পরদিন সকালে অত্যন্ত ভয় ও আতঙ্কে দেখে যে তারা হরিণের মাংসের বদলে স্বাতীকে মেরেছে ও খেয়েছে। তাদের আত্মস্বরূপ তারা উপলব্ধি করে। এদের পাশাপাশি এক আদিবাসী চরিত্র আঁকা হয়েছে যে সহজ সরল সুখী এবং আদিম পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট নয়।

'জউঘর' (১৯৬৮) নাটক আজকের সমাজের পাঁচটি পুরুষ ও একটি নারীর কাহিনী। সুচরিতা পতিতা নর্তকী — বুকে সবুজ স্বপ্ন আর নিবিড় ব্যথা লুকিয়ে রেখে যৌবন বিকিকিনিতে দিন কাটায়। তার জীবনে আসে যুবরাজ জ্ঞান কুমার, ধনী বিনয় কুমার, উৎপীড়ক চরণ দাস, বিদেশী বণিক প্রণয় কুমার ও সমাজ বিরোধী কিন্তু সহৃদয় সহজপ্রাণ জন। প্রথম তিনজন তাকে অর্থেসামর্থ্যে কিনতে চায়, প্রণয় তাকে অনুজার মত ভালবাসে তার চোখে সোনালী স্বপ্নেব ছবি এঁকে দেয়, আর তাকে নিয়ে ভালবাসায় নিবিড় ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে জন। কিন্তু সুচরিতা কিছু পেল না — সে যৌবনের জতুঘরে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। তার আরক্ত বিদীর্ণ হৃদয়ের আর্তনাদ বাতাসে তুলল কাঁপন। সবুজ হৃদয়ের পবিত্র বাসনা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। সুচরিতার চরিত্র এক আদর্শ সৃষ্টি — সে পতিতা কলংকিনী এক সামান্য নারী, কিন্তু তার অন্তরে সত্যেব অন্বেষা সুন্দরের কামনা মঙ্গলের অনির্বাণ দীপশিখা। সে যুবরাজকে বোঝায় তার জীবনধর্ম, বিনয়কে মিলিয়ে দেয় তার সাধবী স্ত্রীর সঙ্গে, চরণকে প্রত্যাখ্যান করে রূঢ়তায়, প্রণয়ের ভগ্নী সম্বোধন তার বুকে স্নেহমমতার চ্ছলচ্ছল ঢেউ তোলে, আর রিক্ত নিঃস্ব জনের জন্য তার হৃদয় ভালবাসায় প্রেমে নিবিড় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জনকে সে বলে—' আজি মো ভিতরে শোই রহিথিবা নারীত্ব জাগি উঠিছি, মাতৃত্ব চীৎকার করি উঠিছি। মুঁ তুম সন্তানর মা হেবাকু চাহেঁ। কুহ, তুমে মতে সে অধিকার দেবনি? ...... নিজ স্বামী লাগি কানি পাতি সমস্তঙ্কু ক্ষমা ভিক্ষা মাগিবি, নিজ সন্তান লাগি গোড় ধরি ভুল মাগিবি, বঞ্চিবা পাঁই হাত জোড়ি প্রার্থনা করিবি। সেখানে আমকু ক্ষমা দেবে .... নিশ্চয় আমকু বঞ্চিবার অধিকার দেবে। আমে বঞ্চিবা! হঁ-হঁ, আমে বঞ্চিবা।' কিন্তু ব্যর্থ হয় তার নারীত্ব, ঘর বাঁধবার ইচ্ছা, মাতৃত্বের পবিত্র বাসনা—সমাজের কঠিন নিষ্ঠুর শিলাস্তূপে আছড়ে পড়ে তার মন ব্যাকুল কান্নায়, জতুঘরের মত দাউ দাউ জ্বলনে তার অনিঃশেষ দহন। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন — 'এ জউঘর হেউছি যউবনর জউঘর। এই জউঘরে কেবল রূপরংগভরা প্রজাপতি রহে। সমস্তে সবুবেলে এই জউঘরকু আসি স্বপ্নর সৌদা করন্তি। সে দিন বি সুচরিতা তা যউবনর জউঘরে জ্বলিবা পাঁই সমস্তঙ্কু ডাকি আনিথিলা। হেলে আজি ....? আজি সেই জউঘরে 'সেমানঙ্কু জ্বলিবাকু কহি সে নিজে হিঁ জ্বলি যাইছি। সেই জ্বলন্ত যউবনর জ্বলন হেউছি আজির এই জউঘর।' কিন্তু নাটকটির আবেদন এই বক্তব্যের সীমাবদ্ধতাকে অনায়াসেই অতিক্রম করে বৃহত্তর সত্যকে ব্যক্ত করে আশ্চর্য মহিমায়। এটা শুধু যৌবনের জ্বলন নয় — একটি নারীর দাহ, একটি জীবনের অসহ্য জ্বালা, যুগ সঞ্চিত পাপ অন্যায় ব্যভিচারের দাউ দাউ আগুনে মানবসত্তার জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

শ্রী রথর 'বহ্নিমান' ওড়িয়া নাট্যধারায় এক উল্লেখ্য সংযোজন। এ নাটকে অনেকটাই মার্কসীয় রীতিতে ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। সভ্যতার প্রথম লগ্নে মনুষ্য সমাজ থেকেই একজন হয়েছিল রাজা, অপর জন প্রজা। রাজার রূপ যুগে যুগে পালটায়। সে হয় জমিদার পুঁজিপতি যন্ত্রকার এবং তার শাসন ও শোষণ চলে অব্যাহত। সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত নিপীড়িত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ হয়, সে গ্রহণ করে মার্কসের শিক্ষা — 'সর্বহারা লড়ে হারে, পুর্ণবার লড়ে হারে, পুর্ণবার লড়ে অন্তিম বিজয় পর্যন্ত'। সর্বহারা বোঝে তাদের নিয়ে একজন হয়ে বড়লোক। অধিকারের দাবী নিয়ে সাম্যের রাণী উচ্চারণ করে নাটক শেষ হয়। আঙ্গিকের বিচারেও নাটকটি স্মরণীয়। "উভয় লোকনাট্য শৈলী ও শাস্ত্রসিদ্ধ শৈলীরে এহা রচিত ও উপস্থাপিত নূতন ভাব সংবহন পাই নুহে, নূতন পরীক্ষা পাই এবং যথার্থ উপস্থাপনা পাই শ্রী রথর এ নাটকটি উল্লেখযোগ্য।"[১৫]

'ঈশ্বর জনে যুবক' (১৯৮০) নাটক দেশের যুব সম্প্রদায়ের ব্যথা বেদনা অসহায় অস্থিরতার চিত্র। যুবক পরিবারে আনে সুখ সমৃদ্ধি, সমাজের ভিত্তি গড়ে, সে দেশের ভবিষ্যৎ। তথাপি দেশের পরিবেশ পরিস্থিতিতে সে পর্যুদস্ত। ক্রোধে ক্ষোভে সে ঘোষণা করে 'মুঁ ঈশ্বর— মুঁ দ্বিতীয় ঈশ্বর সাজি এ পৃথিবীর সবু কিছিকু ধ্বংস করিবি।' হয়ত তারপর হবে নুতন সৃষ্টি, গড়ে উঠবে নতুন পৃথিবী।

কার্তিক চন্দ্র রথ-র আরো কটি নাটক নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'মহাভারতর অন্তিম পর্ব' (১৯৭৫) নাটকে দেখানো হয়েছে মহাভারতের যুগের তুলনায় বর্তমান যুগ কত আর্দশভ্রষ্ট কত মূল্যহীন। তাই ন্যায় ও সততার প্রতীক পান্ডবরা এদেশে এলে আহত হন দুঃখ পান, তবু তারা আমাদের সামনে রেখে যান আলোকিত জীবনের ছবি। 'রক্তর পাহাড়' (১৯৮০) ওড়িশার দুটি ভয়াবহ সমস্যার কথা বলে — রুখা মাটি ও সাধারণ মানুষদের বেঁচে থাকার অভিশাপ এবং সাম্প্রদায়িক বীভৎসার কথা। নারীরা জননী জায়া কন্যা, তারা সবাইকে সুখী করতে নিজেদের উৎসর্গ করে। কিন্তু সমাজ তারা অবহেলিত লাঞ্ছিত। নারী জীবনের বেদনার কথা নাটকীয় রূপ পেয়েছে 'দ্বিতীয় দ্রৌপদী' (১৯৮১) নাটকে। শিল্পের প্রতি তীব্র আসক্তি এবং সাংসারিক দায় — দুয়ের দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে 'বনাম অভিনেতা' (১৯৮৫) নাটকে। ভারতবর্ষের এক অতি প্রাচীন শহর, শিক্ষা-সভ্যতা-ধর্মভাবনার পীঠস্থান, অতীতের যুদ্ধ-সংগ্রাম-রণকোলাহল মুখরিত, ঐতিহ্য সম্পন্ন এবং আধুনিক কালে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত কটক শহরের হাজার বছরের ইতিহাসের মহিমান্বিত রূপায়ণ 'কটক নগর — বরষ হজার' নাটক। এই মহাকাব্যিক চিত্রণে আসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন কার্তিক চন্দ্র রথ। এটি Cuttack City Millennium Celebration Committee-র উদ্যোগে প্রথম অভিনয় হয় ১০.১২.১৯৮৯ বারবাটী স্টোডিয়াম-এ ৩০০ শিল্পী সমন্বয়ে। চেদী রাজবংশের বিশিষ্ট শাসক খারবেল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁর শাসনে কলিঙ্গ সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে ওঠে। খারবেল ছিলেন বীর যোদ্ধা দক্ষ রাজনীতিবিদ, সঙ্গে সঙ্গে ওড়িশী নৃত্য নাটক সঙ্গীত ইত্যাদির মহান পৃষ্ঠপোষক। তাঁকে বলা হত 'মহামেঘবাহন' এবং 'কলিঙ্গাধিপতি'। ওড়িশার ইতিহাসের গৌরব এই মহানায়ককে নিয়ে কার্তিক চন্দ্র লিখেছেন 'মহামেঘবাহন খারবেল' (১৯৯০)।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'যত্র নার্যস্তু পূজন্তে রমন্তে তত্র দেবতা'। কিন্তু এ দেশেরই নারীদের ওপর অমানবিক অত্যাচার চলে। দেবদাসী ও যোগিনী রূপে তথাকথিত ধর্মের নামে নারীকে সারা জীবন লাঞ্ছিত করা হয়। ঈশ্বর ব্রাহ্মণ ও ধর্মের অজুহাতে নারীভোগের

কদর্য কারবার চলে ভারতবর্ষে স্বাধীনতাব এত বছর পরেও। 'ঈশ্বরী' নাটকে এই চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। যোগিনীরা দেবদাসীদেরই এক শ্রেণী। এই নাটকে এক যোগিনীর পুত্র ধরসু বিবেকবোধে এবং সাহসে পূর্ণ হয়ে এই কদর্য প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। 'ঈশ্বরী' নাটক প্রকৃত পক্ষে নারী মুক্তি ও নারী মর্যাদা প্রতিপন্ন করাব জন্য প্রগতিশীল লড়াই।

কার্তিক চন্দ্র রথ সম্প্রতিকালে সামজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সংকটের দিকে বেশী মাত্রায় নজর দিচ্ছেন। তাঁর 'রক্তব ফুল' (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৯৭) নাটকে রাজনীতিবিদদের রূপ তুলে ধরা হয়েছে। যদিও লেখক ভূমিকায় জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলেছেন, কিন্তু নাটকের তা মূল প্রতিপাদ্য নয়। শক্তিপ্রসাদ রাজনীতিবিদ, পয়সা দিয়েই সে নিজেকে রাজনীতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার এই প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে পার্শ্বচর গণনাথ, গুন্ডা কালুদাদা ও তার দুই সহচর আপ্পা ও জনকে টাকায় কেনা হয়। শক্তিপ্রসাদের স্ত্রী মারা যায়, তার এক মেয়ে অনুপমা। শক্তিপ্রসাদের সঙ্গে এক মহিলাব অবৈধ সম্পর্কের ফলে এক সন্তান হয়। শক্তিপ্রসাদ সেই মহিলাকে আত্মহত্যা কবতে বাধ্য করে ও ছেলেটিকে ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়। রহমান ঐ ছেলেকে উদ্ধার করে ও ভারত নাম দিয়ে লালন পালন করে। স্বাধীনতাসংগ্রামী শিক্ষক সত্যব্রত ভারতকে বিশেষ শিক্ষিত করে তোলে। বেকার ভারত চাকরীর সন্ধানে ঘোরে। এক বিশেষ মুহূর্তে সে সত্যব্রত ও রহমানের কাছ থেকে পিতৃপরিচয় পায়। ভারতের বান্ধবী সত্যব্রতর মেয়ে গীতা। অনুপমা বান্ধবী গীতার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে পরিচিত হয়। শক্তিপ্রসাদ নিজের কলঙ্ক ঢাকতে কালুদাদা ও গণনাথের সাহায্যে সত্যব্রতকে হত্যা করে। শেষে ভারত গীতা অনুপমা রহমান এমনকি কালুদাদাও শক্তিপ্রসাদকে তাড়া করে। ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় সূচিত হয়। নাটকে রক্ত হল শক্তিপ্রসাদ ও ফুল হল ভারত ও অনুপমা। কিংবা নাট্যকাব বলতে চেয়েছেন রক্তের ধারার মধ্যে পাপ মুছে গিয়ে সুন্দরের ফুল ফোটে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় নাটকটি মঞ্চ সাফল্যও অর্জন করেছে। ১৯৮৫ সালের ১১ নভেম্বর এটি মঞ্চস্থ হয় কলা বিকাশ কেন্দ্র মঞ্চ কটকে।

কার্তিক চন্দ্র রথর শেষ দিকের নাটক 'পাদ তলর আকাশ' (পায়ের নীচের আকাশ, ১৯৯৭) সামাজিক সমস্যাবহুল নাটক। এটি উচ্চমানের রচনা। নাটকের চরিত্রবাও বাস্তব জীবন থেকেই উঠে এসেছে। বাঙ্কবিহারী হল বাড়ীওয়ালা, সে বিভিন্ন ঘর ভাড়া দেয়। কিন্তু ভাড়াটেরা সবাই মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ, তারা অতি সাধারণ ভাবেই জীবন যাপন করে। বাঙ্কবিহারী ভাল মানুষ, সে সবাইকে দেখে। দুঃখবন্ধু এর ভাড়াটে, তার একটা মুদির দোকান আছে, যদিও তা ভাল চলেনা। দুঃখবন্ধু অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, কিন্তু লালফিতার দাপটে সে মৃত বলে ঘোষিত হওয়ায় পেনশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত। নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে সে অনেক চেষ্টা করছে। তার দেশের জমিও গ্রাস করে নিয়েছে নিকটজনেরা। দুঃখবন্ধুর ছেলে সঞ্জয় শিক্ষিত বেকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে চুরি ও খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয় ও শেষে জেলে যায়। দুঃখবন্ধুর মেয়ে পদ্মিনী। শিক্ষিত, কিন্তু নিষ্ঠুর পণপ্রথার চাপে শ্বশুড়বাড়ী থেকে পরিত্যক্ত। ওদের পারিবারিক বন্ধু সুকান্তর সাহায্যে সে একটা স্কুলে চাকরী পায়। নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে সে ও স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারকে দেখে। সুকান্ত একজন শিক্ষক যে পদ্মিনীকে ভালবাসত। সে পদ্মিনীকে চাকরী করে দিয়েছে। সে পদ্মিনীকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু পদ্মিনী রাজী হয় না কেননা পদ্মিনী নিজের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে আর সুকান্তর প্রতি শ্রদ্ধায় কোন দাগ লাগতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত সব দুঃখের অবসান ঘটিয়ে দুঃখবন্ধুর পেনশনের চিঠি

আসে, কিন্তু তখন সে মারা গেছে। নাটকে বিভিন্ন সমস্যা একত্রিত হয়ে জটিল পরিবেশ নির্মাণ করেছে। আবাসন সমস্যা, বেকারী সমস্যা, পণপ্রথার সমস্যা, বেকার যুবসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা জনিত সমস্যা, সরকারী কাজের নিয়মহীনতা ও খামখেয়ালীপণা যা মানুষকে করে চরম ক্ষতিগ্রস্থ — এত সব বিষয় নাটকে এসেছে। নাটকের সংলাপ ভাল, উপস্থাপনাও সুন্দর তবে শেষ পর্যন্ত কেমন যেন সঙ্গতি হারিয়ে যায়। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৮৯র ৭ ও ৮ জুন কটকের কলা বিকাশ কেন্দ্র প্রেক্ষাগৃহে। নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন কার্তিক চন্দ্র রথ; উপস্থাপনায় দিল্লীপ কুমার পাটোড়িয়া। প্রযোজক সংস্থা— উৎকল যুব সাংস্কৃতিক সংঘ।

চন্দ্র শেখর নন্দ (১৯৪২) বিভিন্ন ধরনের নাটক লিখেছেন — সামাজিক ঐতিহাসিক পৌরাণিক ব্যঙ্গাত্মক ইত্যাদি। এছাড়া মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, ছোট গল্পেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত নাটক হল — 'অন্তঃসলিলা' (১৯৬৮), 'অসংলগ্ন' (১৯৬৯), 'যুদ্ধবন্দী' (১৯৮৫), 'ঐতিহাসিক এ দুর্গ বারবাটী' (১৯৬৮), 'আমে সবু চন্দ্রসেনা' (১৯৮৫) 'কৃষ্ণা' (১৯৮৬), 'না আঁ' (১৯৯২), 'সেমানঙ্ক আখিরে' (১৯৯৩), 'কস্তুরী' (১৯৯৭), 'কথা কথারে' (১৯৯১)। তাঁর একাংক নাটকগুলি সংকলিত হয়েছে 'রজনীগন্ধা' (১৯৮৬) গ্রন্থে। চন্দ্র শেখর নন্দর নাটকের বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব আছে, ভাবনায় বৈচিত্র্য আছে, সমাজচেতনার নিবিড় পরিচয় আছে, জীনববোধের গভীরতা আছে। এবং আঙ্গিকের বিচারেও তাঁর নাটক সফল। তাঁর নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে এই সব বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হয়।

'যুদ্ধবন্দী' যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত সম্ভবত একমাত্র ওড়িয়া নাটক যাতে দেশাত্মবোধ আত্মোৎসর্গ এবং ভালবাসা আবেগ ইত্যাদি হৃদয়ধর্ম নাটকীয় রূপ পেয়েছে। ভারত-পাক যুদ্ধের সময় দুজন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারকে পাকিস্তানীরা বন্দী করে ও তাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার চালায় ভারতীয় যুদ্ধ কৌশল জানতে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এই দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার দেখে পাকিস্থানী মেয়ে রশ্মি তাদের পালানোয় সাহায্যে করে। রশমী ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি আসক্ত হলেও সে বিয়ে করতে পারবে না শত্রুপক্ষের লোককে। এদিকে হেড কোয়ার্টারে ডাক্তারকে শাস্তি দেওয়া হয় কারণ পাকিস্থানী শিবিরে বন্দী থাকায় সময়ে সে নীতিগত কারণে কয়েকজন পাক অফিসারকে চিকিৎসা করে ও তাদের সারায়। রশ্মি বোঝে ভারত বা পাকিস্থান কোথাও তার স্থান নেই এবং মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তার সামনে কোন রাস্তা নেই। বাইরের সঙ্গে মনের ভেতরেও যুদ্ধ কি বিপর্যয় আনে!

'ঐতিহাসিক এ দুর্গ বারবাটী' নাটকে ১৪৯৭ থেকে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময়ে ওড়িশার ইতিহাসের সঙ্কটময় পরিস্থিতির চিত্র অত্যন্ত সার্থক রূপ পেয়েছে। সূর্য বংশের চূড়ান্ত সমৃদ্ধি ও ভোঈ বংশের অবক্ষয়ও চিত্রিত হয়েছে সার্থকভাবে। 'না আঁ' নাটকে দেখানো হয়েছে মানুষ তার নাম ও যশের জন্য উন্মাদ হয়ে ছোটে। পারিবারিক সামাজিক বন্ধন, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা সবই সে অস্বীকার করতে চায় পরিণামে জীবনে নেমে আসে দুঃখ বেদনা হতাশা। নাটকের প্রধান চরিত্র সনাতন নাম ও খ্যাতির জন্য সব চেষ্টা করে; তার স্ত্রী মারা যায়, ছেলে মুন্না বিপথে যায়; সনাতন দুহাতে টাকা খরচ করে নিজের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোঝে এসবই অসার আর মিথ্যা, তার মৃত্যুর খবর (যা মিথ্যা) শুনে সবাই তার নামটাকে সব জায়গা থেকে মুছে ফেলে। সনাতন বোঝে ঈশ্বর-নামই সত্য। সে বৈষ্ণব হয় আর জপ করে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে....'।

'সেমানঙ্ক আঁখিরে' (ওদের চোখে) নাটক ভাবনার দিক থেকে অভিনব। এই নতুন রীতির রচনার জন্যে নাট্যকার অবশ্যই অভিনন্দন পাবেন। মানুষ মনে করে যে তার জ্ঞানে শক্তিতে অনুভবে সে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু অন্য প্রাণীরা কি তাই মনে করে? অরণ্যের হাতী বাঘ হরিণ বাঁদর ময়ূর তোতা প্রজাপতি গাছ ফুল ফল পর্বত নদী সমুদ্র — এদের নিজস্ব জীবন আছে ভাবনা আছে, স্নেহ ভালবাসা ইত্যাদি অনুভূতি আছে। মানুষ এদের পীড়ন করে তাই এরা মানুষের ওপর ক্ষুব্ধ। এরা সমবেত হলে মনুষ্য প্রজাতিকে বিশ্ব থেকে মুছে ফেলতে পারে। কিন্তু তারা মানুষকে ক্ষমা করে কারণ তারা মনে করে মনুষ্য জাতিও তাদের এক ভ্রাতৃজাতি এবং সকলের অধিকার আছে বেঁচে থাকার যা হবে শান্তিপূর্ণ। 'কথা কথারে' নাটকে নাট্যকার কথা বা সংলাপের শক্তির কথা বর্ণনা করেছেন। কথা দিয়েই মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যায়, তাকে মনের কাছাকাছি আনা যায়, খারাপ কথা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষ কেন বোঝে না মানসিক দূরত্বের ব্যাপারটা। এক পরিবারে বাবা মা ভাই দাদু থাকে, সেই পরিবারের মেয়ে কথা যাকে বোঝে কেবল তার দাদু। বাড়ীর অন্য সবাই পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত ফলে অপমানিত দাদু গাঁয়ে যায়। ভাই অসামাজিক সঙ্গে মেশে। নিজেদের মধ্যে সংযোগের অভাবেই এটা ঘটে। মধুভাষিণী হৃদয়বতী কথা বেদনায় আত্মহত্যা করতে যায় কিন্তু মা তাকে রক্ষা করে। কথা সবায়ের সঙ্গে কথা বলে, গাঁয়ে গিয়ে দাদুকে ফিরিয়ে আনে, ভাইয়ের অসামাজিক বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সুপথে আনে, বাড়ীর সবাইকে তাদের ভুলের কথা বোঝায় ও ঘরে শান্তি ফিরে আসে। নাট্যকার কোরাসের মুখে শেষ বক্তব্য তুলে ধরেছেন যে মিষ্টি ভাষা ও আন্তরিক কথোপকথনের দ্বারা পরস্পরের হৃদয়বন্ধন দৃঢ় করা যায় ও তার দ্বারা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সুদক্ষ নাট্যবিদ অনন্ত মহাপাত্র এক মঞ্চস্থ করেন।

বিজয় কুমার শতপথী (১৯৫২) বিশিষ্ট শিক্ষবিদ। মননশীল প্রবন্ধ রচনা করে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। অধ্যপক ড: শতপথী ওড়িয়া সাহিত্যে প্রগতি চেতনা নিয়ে সফল কাজ করেছেন। তাঁর নাটকে সমাজের সত্য উদঘাটিত হয়েছে যা যন্ত্রণায় কাতর আচ্ছন্ন, কলুষতায় তম, অত্যাচারীর দাপটে কুণ্ঠিত; তবু মানুষ জাগে, বিপ্লবের আহ্বান শোনা যায়, বিষাদবৃত্ত ভেঙে যায়, অন্ধকার বিদীর্ণ কার সূর্যের আলো ফোটে। শ্রীশতপথীর নাটকের কাহিনীর গ্রন্থন ভাল, চরিত্রসমূহ প্রস্ফুটিত; তিনি মিথ ও পুরাণেব ব্যবহার করেছেন সম্যকভাবে এবং তাকে আধুনিক করে তুলেছেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠেছেন অতিনাটকীয় ও প্রচলিত রীতির অনুবর্তনকারী। তবু তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন ও ওড়িশা সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল — 'ফসিলর নিদ্রাভঙ্গ' (১৯৭৫), 'বিবর্ণ সহর' (১৯৭৬), 'ক্ষুধিত সরীসৃপ' (১৯৭৮), 'কংসর আত্মা' (১৯৭৯) 'বিষাদক্রত্তর কাহানী' (১৯৮২), 'এই যে সূর্য উএঁ' (১৯৮২), 'কর্ণ' (১৯৯২) ইত্যাদি।

'ক্ষুধিত পাষাণ' চড়াসুরে বাধা পারিবারিক কাহিনী। একদা যদুনাথের সঙ্গে ওদের ভৃত্য সারথির স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কেব ফলে এক সন্তানের জন্ম হয়। যদিও এই সম্পর্কের কথা গোপন ছিল। পার্বতী আত্মহত্যা করে। শরত সারথির সন্তান হিসাবে পরিচিত হয়। যদুনাথের পরিবারে ভাঙন শুরু হয়। তার বড় ছেলে রমাকান্ত পৌরুষহীন। তাই তার স্ত্রী প্রীতি সহপাঠীর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে সন্তানবতী হয়ে আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয় পুত্র অসবর্ণ বিবাহ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। শরত সারথিকে নিয়ে চাকরী করতে বাইরে যায়। যদুনাথ মৃত্যুবরণ করে।

'কংসর আত্মা' নাটকে অত্যাচারীর ভয়াবহ পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিহত না হলে তারা যে অমিত শক্তিশালী হয়ে ওঠে সে কথা বলা হয়েছে। অত্যাচারী রাজা অন্ধক বিপ্লবী সত্যব্রতকে অন্ধ করে দেয় এবং ধর্মদাসের সন্তান তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে শুনে বন্দী করে ধর্মদাস ও তার স্ত্রীকে এবং নবজাতকের ওপর ভয়ংকর হয়। অন্ধক শিল্পপতি অন্ধলোচন নামে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। সে নির্বাচনে জেতে, কালোবাজারি ও চোরাকারবারে প্রচুর অর্থ পায়, শ্রমিকদের দমন করে, বিপ্লবকে জেলে পাঠায়। সে ভয়ংকর ও অপরাজেয় হয় ওঠে। 'বিষাদক্লান্তর কাহানী' (১৯৮২) নাটকে অন্য সুরে জীবনের কথা কথিত। মানুষের জীবন বন্দীশালার বিষাদব্রত। জন্ম থেকে পরিণতি পর্যন্ত স্বপ্ন কল্পনার জাল বোনা এবং শেষ পর্যন্ত বিষাদময়তায় সমাচ্ছন্ন হওয়া মানুষের অনিবার্য।

'এই যে সূর্য উএঁ' (এই যে সূর্য উঠছে, ১৯৮৩) নাটকে দেখানো হয়েছে অত্যাচারী শাসক নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য যুগে যুগে অত্যাচার করে চলে সাধারণ মানুষের ওপর। তারা রূপ পালটায়, রঙ পালটায়, কিন্তু তাদের শাসন শোষণ থাকে অব্যাহত। সচেতন জাগ্রত মানুষই ঘটাতে পারে অত্যাচারীর পতন। নাটকের আঙ্গিকে বৈচিত্র্য আছে। অতীত ও বর্তমানকে মেলানো হয়েছে — কালের চলমানতা রক্ষিত হয়েছে। নাটকের প্রথম পর্ব যাত্রাপালার আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে — সংলাপ সঙ্গীত ও সজ্জায় রাজা-রাজড়াদের আমলের প্রকাশ ঘটেছে যাতে যাত্রার টেকনিক ব্যবহৃত। মেলোড্রামটিক ও সেন্টিমেন্টাল উপাদানও ব্যবহৃত। বর্তমানের উপস্থাপনায় লেখক তীক্ষ্ণ ও ধারালো। নাটকের প্রথমে অত্যাচারী রাজা বীরাদিত্যের কথা। সে নিজের সুখের জন্য সব কিছু করে, দুর্ভিক্ষের সময়েও প্রাসাদ নির্মাণের জন্য প্রজাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ায়। বিক্ষুব্ধ প্রজারা সাধুচরণের নেতৃত্বে আন্দোলন করে। কবি শ্রীকণ্ঠ রাজার স্তুতিগান করতে ও বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী না হওয়ায় তাকে কারাগারে পোরা হয় এবং তার স্ত্রী মালবিকাকে বীরাদিত্যের কাছে দেওয়া হয় ভোগের জন্য। শ্রীকণ্ঠর মৃত্যু হয়। রাণী কাদম্বিনী রাজার কাজের প্রতিবাদ করে। শেষ পর্যন্ত প্রজারা সাধুচরণের নেতৃত্বে রাজাকে পরাজিত করে। দ্বিতীয় পর্বে বীরাদিত্যে হয়েছে শিল্পপতি আদিত্যপ্রতাপ যে জনপ্রতিনিধি সাধুচরণকে অর্থের দ্বারা বশ করে নিজের প্রতিপত্তি বাড়াতে ব্যস্ত, কারখানার শ্রমিকদের রক্তশোষণ করে সে ভোগবিলাসে মত্ত। শ্রমিক নেতা কণ্ঠদাস আদিত্যপ্রতাপের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুললে আদিত্য মিথ্যে খুনের দায়ে তাকে জেলে পোরে এবং কণ্ঠর স্ত্রী অন্ধ মালতীকে আদিত্যর ভোগ্যা করা হয়। মালতী মৃত্যুবরণ করে। আদিত্যর স্ত্রী কামিনী স্বামীর কাজের জন্য ভর্ৎসনা করে স্বামীকে। কিন্তু আদিত্য অনড়। ঘটনাক্রমে সাধুচরণ গদিচ্যুত হলে আদিত্য আর কেউকে নির্বাচিত করতে চায়। কণ্ঠদাস জেল থেকে বেরিয়ে আদিত্যপ্রতাপকে হত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু ইনসপেক্টরের গুলিতে মারা যায়। মৃত্যুর আগে সে বলে সে পারল না, কিন্তু একদিন শুরু হবে শপথবদ্ধ সংগ্রাম। নাটক শেষ হচ্ছে এইভাবে। সমবেত মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। পেছনে দেখা যাচ্ছে নবোদিত সূর্য ও লাল কিরণ। দীনহীন এক লোক হাতে মশাল নিয়ে তীব্র চিৎকার করতে করতে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে — যে যেন চায় যুদ্ধ করতে, ধ্বংস করতে, সব ভেঙে চুরে জিতে। 'কর্ণ' নাটক মহাভারতের কথার ওপর আধারিত। মহাভারতের পার্থ কর্ণ কুন্তী ইত্যাদি চরিত্র গুলিকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করে নাট্যকার শতপথী আধুনিক সমাজ জীবনের জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্যান্য নাটকের মত এই নাটকটিও মঞ্চসাফল্য লাভ করে।

রতিরঞ্জন মিশ্র (১৯৫৩) প্রায় পঁচিশটি নাটক লিখেছেন যার মধ্যে তাঁর সৃজন প্রতিভার পরিচয় অন্তর্নিহিত। তিনি সমাজমনস্ক . সামাজিক সমস্য সমূহ তাঁর নাটকে রূপ পায়। বিশেষ করে যুবসমাজের সংকটময় জীবন কথার চিত্রণে তিনি দক্ষ। সামাজিক বোধ অবশ্য রাজনৈতিক বোধে রূপায়িত হয়েছে কখনো যা নাটককে তীব্র করে তোলে। নাটকের আঙ্গিক রূপায়ণেও তিনি দক্ষ। পরীক্ষাধর্মী তাঁর নাটকে রতি রঞ্জন মিথ-এর প্রয়োগ করেছেন। প্রাচীন আখ্যায়িকাব অবতারণা করেছেন যাদের মধ্যে আধুনিক জীবনদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সংলাপ অনেক সময় হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক এবং সাজসজ্জা প্রতীকধর্মী। শ্রীমিশ্র সাহিত্য একাডেমী এ্যাওয়ার্ড ও সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড সহ বিভিন্ন সম্মান লাভ করেছেন। ছোট বড় মিলিয়ে তিনি পঁচিশটার বেশী নাটক লিখেছেন যাদের মধ্যে বিশিষ্ট নাটকগুলির নাম প্রকাশকাল সমেত দেওয়া হল — 'হংস শিকার' (১৯৮০) 'আস্তে আস্তে অমাবস্যা' (১৯৮০), 'অতি আচম্বিত কথা' (১৯৮১), 'অরুণ রঙ্গর পক্ষী' (১৯৮২), 'সীতা' (১৯৮৫), 'দেখ বর্ষা আসুছি' (১৯৮৭), 'চাঞ্চল্যকর' (১৯৯১), 'শীতল হুঅনা সূর্য্য' (১৯৯৪), 'রুদ্ধদ্বার' (১৯৯৫), 'অবতার অস্তগামী' (১৯৯৯) 'সঞ্জু সংহিতা' ইত্যাদি। এছাড়া তিনি অনুবাদ করেছেন শেকসপীয়রের 'ওথেলো', চেকভের 'ম্যারেজ প্রপোজাল', বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' এবং বিশাখদত্তর 'মুদ্রারাক্ষস'। 'হংস শিকার' একাঙ্কর নায়ক রঞ্জিত বেকার যুবক। সে পরিপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন দেখে যা দেশেব প্রতিটি যুবকের স্বপ্ন। তা কি কোনদিন পূরণ হবে! যুব সমাজের কথা তাদের অস্থিরতা নীতিহীনতা ইত্যাদি ধরা পড়েছে 'আস্তে আস্তে অমাবস্যা', 'অতি আচম্বিত কথা' প্রভৃতি নাটকে। একদিকে চলচ্চিত্রের আকর্ষণে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হবার নেশা; আবার রাজনীতিকে পেশা করে জীবিকা নির্বাহর চেষ্টা — এই দুই ব্যাধিকে আক্রমণ করেছেন নাট্যকার। 'দেখা বর্ষা আসুছি' তিনটি ছোট নাটকের সংকলন। এদের সম্পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক নাটক বলা যায়। 'দেখা বর্ষা আসুছি' নাটকে জরুরী অবস্থার সময় দেশের অবস্থার কথা বলা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি তরুণদের অবক্ষয়ী চিন্তাধারা এবং তার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের কথা নাটকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় একাঙ্ক 'দুগধজাত'ও রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার ও সামাজিক দুর্নীতির চিত্র। অত্যাচারী শাসকদের হাতে সাধারণ মানুষরা কীভাবে নির্যাতিত হয় তা দেখানো হয়েছে। 'মধুবাবুঙ্ক কালিয়া ঘোড়া' (মধুবাবুর কালো ঘোড়া — সংকলনের তৃতীয় নাটক) সমসাময়িক সমাজচিত্র। ঠিকাদার কাজ করে না, পাট্টাদার পাওনা দিয়ে পুঁজি বাড়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী কেনাবেচা হয় — এটাই সমাজের ছবি।

'সীতা' নাটকে প্রচীন কথাবস্তুকে অভিনব রূপ প্রদান করা হয়েছে। চার বন্ধু শিক্ষালাভকালীন সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আচার্যর নির্দেশে বেরিয়ে পড়ে। অরণ্যের মধ্যে বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য চার বন্ধু পালা করে পাহারা দেয়। প্রথম প্রহরে কঠুরিয়ার ছেলে জগন্নাথ কাঠ দিয়ে এক মূর্তি নির্মাণ করে। দ্বিতীয় প্রহরে কোটালের ছেলে সেই মূর্তিকে বস্ত্র ও অলংকার পরিয়ে দেয়। তৃতীয় প্রহরে মন্ত্রীর ছেলে মূর্তিকে প্রাণদান করে। চতুর্থ প্রহরে রাজার ছেলে ব্রহ্মদত্ত তাকে বাকশক্তি দেয়। মেয়েটির নাম রাখা হয় সীতা। এই সুন্দরী নারীকে সবাই পেতে চায় ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য তারা অন্য এক রাজার দ্বারস্থ হয়। কিন্তু সেই রাজা ঐ নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে চার বন্ধুকে বন্দী করে ও নারীকে ভোগ করতে যায়। ঐ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপের জন্য বন্ধুরা ঐ রাজাকে নিহত করে। কিন্তু ওদের মানস কন্যা সীতা পুনর্বার

কাঠের মূর্তিতে পরিণত হয়। নারীকে পাবার জন্য যুবকদের প্রতিযোগিতার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি অত্যাচারী সামন্ততন্ত্রের অবসানের জন্য মানুষের মিলিত প্রয়াস ও লড়াইয়ের কথাও বলা হয়েছে।

প্রমোদকুমার ত্রিপাঠী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নাট্যপরিচালক এবং নাট্যকার। শিক্ষা সংস্কৃতিব প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বেখেছেন অধ্যাপক ত্রিপাঠী। তাঁর নাটকের মধ্যে লেখকের সমাজচেতনা জীবনবোধ এবং মানবিকতার পরিচয় স্পষ্ট।

'শুন পরীক্ষ দন্ডধারী' (হে শাসক বা রাজদন্ডধারী পরীক্ষিত শোন, ১৯৮৩) নাটকে সামাজিক দুরবস্থা ও সাধারণ মানুষের সর্বনাশা বিপর্যয়ের ছবি আঁকা হয়েছে যার সঙ্গে রাজনীতির যোগ প্রবল। মন্ত্রী আসবেন; তাই বিডিও ঠিকাদার থানাদার বড়বাবু গুরু সবাই ব্যস্ত। রিক্সাওয়ালা পরীক্ষিতের স্ত্রী ললিতাকে মন্ত্রীর জন্য আনা হয়। কিন্তু মন্ত্রী নয়, আসে তার ছেলে। তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। ললিতার ওপর অত্যাচার করে অনেকে মিলে। কিন্তু পরীক্ষিত তাকে গ্রহণ করে।

'গোটিএ বুলা কুকুরর জন্ম বৃত্তান্ত' (একটা রাস্তার কুকুরের জন্মবৃ৫'ন্ত, ১৯৮৩) এই সমাজব্যবস্থায় অতি সাধারণ মানুষের জীবনকথার বেদনাময় রূপ তুলে ধরে। নাটকের প্রধান চরিত্র অত্যন্ত দরিদ্র। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত পিতা ও মাতাকে বাঁচানোর জন্য সে লড়াই করছে। রামকঠিয়া একজন শিল্পী। সে দুটো কাঠ বাজিয়ে গান করে ও এভাবে তার সংসার চলে। রাজু বায়োস্কোপ দেখিয়ে ওর ব্যবসা নষ্ট করে দেয়। রাজা কোটিপতি রাজমালহোত্রা-য় পরিণত হয়। নায়ক দেখে তার মার অপমান, সে প্রেমিকার স্বপ্ন পূর্ণ করতে পারেনা, বাবার জন্যও কিছু করতে পারে না। নিজের সৃষ্টিকর্তার কাছে জবাব চায়।

শঙ্কর প্রসাদ ত্রিপাঠী অত্যন্ত শক্তিশালী নাট্যকাররূপে পরিগণিত। তিনি সমাজমনস্ক নাট্যকার — সামাজিক দুর্নীতিকে তিনি প্রবল ভাবে আঘাত করেছেন এবং সত্যকে নির্ণয় করতে চেয়েছেন। পারিবারিক সমস্যা সংকটও তাঁর নাটকে প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে — যে সব সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে জীবনে ঘনিয়ে আসে বেদনা যন্ত্রণাদাহ তার রূপ তুলে ধরেছেন। হয়ত চরিত্রের ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে, কিন্তু মানুষের ওপর লেখক আস্থা হারান নি, ব্যক্তি পরাজিত হয়েছে কিন্তু জয়ী হয়েছে মানবতা, শ্রী ত্রিপাঠী কখনও দূর ইতিহাসে সঞ্চার করেছেন যদিও তার মধ্য থেকে আধুনিক জীবন কথাই উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল 'প্রথিবী শরশয্যা', 'স্বয়ংবর', 'সাগর সঙ্গম', 'শুনিবা হেউ এ কাহানী', 'সরীসৃপ', 'কাব্যপুরুষ' ইত্যাদি।

পণপ্রথা বিরোধী নাটক 'স্বয়ংবর' (অভিনয় ১৯৮৮, গ্রন্থ প্রকাশ ১৯৯৮) কৌতুক হাস্যরসের মধ্য দিয়ে শুরু হলেও এক গম্ভীর সত্যে শেষ হয় সেখানে মানবতার মর্যাদা প্রতিপন্ন করার ভাবনা আছে। নাটকের সূচনায় দেখা যায় বরের বাজার বসেছে। তারা খুঁটিতে বাঁধা। কৃত্তিবাস তার বোন জাঈ-র জন্য পাত্র খুঁজছে এবং কয়েক হাজার টাকা দিয়ে প্রাইভেট কলেজের রাজনীতি বিজ্ঞানের রবি নামক অধ্যাপককে পাত্র রূপে ঠিক করে। স্কুটার কলার টিভি ফ্রীজ দশ ভরি গয়না আলমারী সোফাসেট ইত্যাদি ছাড়াও দশ হাজার টাকার বিরাট যৌতুকের বোঝা কৃত্তিবাসের ওপর চাপানো হয়। কিন্তু বিয়ের সময় সব টাকা দিতে না পারায় মেয়ের ওপর অমানুষিক অত্যাচার হয় এবং স্বামী শ্বশুর ননদ তাকে মেরে ফেলে। জাঈ হত্যা মামলায় এদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। কিন্তু মন্ত্রীর সাক্ষ্য প্রদানে ও আইনের মারপ্যাঁচে সবাই মুক্তি পায়। জাঈর শ্বশুর সদানন্দ মিশ্রকে হত্যার চেষ্টার জন্য, আইনের সমালোচনা করার অপরাধে কৃত্তিবাসের ছমাস সশ্রম

কারাদন্ড হয়। অ্যাডভোকেট শম্ভুনাথ বিশেষ চেষ্টা করে ও কৃত্তিবাস মুক্তি পায়। কৃত্তিবাস ফিরে এসে দেখে ওর বাবা নীলকণ্ঠ মারা গেছে। সদানন্দ রবি ও হাবিলদার দুর্যোধন কৃত্তিবাসের কাছে আসে, তাকে প্ররোচিত করে ও তাকে মদ খাওয়ায়। উত্তেজিত কৃত্তিবাস বিশেষ ভাবে তার বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য ঐ তিনজনকে মেরে ফেলে। শম্ভু প্রশ্ন করে সে একি করল? কৃত্তিবাস বলে — 'মুঁ সেমানঙ্কু মারিছি। মুঁ জানে এ নাটকর সমাপ্তি এয়া নুহেঁ। তথাপি মুঁ মণিষ। মু নীলকণ্ঠ ভলি সবু বিষকু পিই অমর হেইপারিবিনি। তেনু মু আইন আগরে মুঁ মোর সমস্ত দোষ মানি নউছি।' নাটকে নবরঙ্গী চরিত্রের কল্পনায় লেখক দক্ষতা দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন চরিত্রের রঙে নিজেকে রূপায়িত করে। প্রকৃত পক্ষে সে সূত্রধারের ভূমিকা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে উঠেছে চরিত্রও।

'সরীসৃপ' (১৯৯১) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিক নাটক। ধর্মবিদ্বেষ কীভাবে সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারকেও ক্লিষ্ট ও পীড়িত করে নাটকে তাই দেখানো হয়েছে। অনুপম ও সলমা স্বামী স্ত্রী। তাদের সন্তান সনত। শহরে দাঙ্গা লাগলে এদের সুখী পরিবারে প্রভাব পড়ে, দয়াসাগর হিন্দুত্বের সমর্থক এবং সলমার ভাই ইকবাল, নিজ আদর্শে আস্থাশীল। হিন্দুরা সলমার পরিবারকে ও মুসলমানরা অনুপমের নিকটজনদের ওপর অত্যাচার করে। উদভ্রান্ত সনত উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেয় যাকে তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত অনুপম ও সলমা বোঝে ধর্মবিদ্বেষ, নয়, হৃদয়ধর্মেই নিজেদের কাছাকাছি পাওয়া যায়।

'সাগর সঙ্গম' ১৯৮৪ তে অনুষ্ঠিত অষ্টম লোকনাটক মহোৎসবে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান এনে দেয় শ্রীত্রিপাঠীকে। নাটকের গ্রন্থরূপে প্রকাশকাল ১৯৯২। কবিসূর্য বলদেব রথ-র জীবনকথা এই নাটকের বিষয়। এটা অনেকটা ঐতিহাসিক নাটক কিন্তু ইতিহাসকে অবলম্বন করে সমসাময়িক জীবন এতে ধরা পড়েছে। নাটকের প্রথম পর্যায়ে বলদেব রথের কবিপ্রতিভার কথা, রাজা হরিচন্দনের কবিকে কবিসূর্য উপাধি দিয়ে সম্মান এবং দেওয়ান পদে নিযুক্তির কথা। পরবর্তী অধ্যায়ে রাজার অহংকারের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বলদেব রথের পদত্যাগ, ইংরেজ কমিশনার রসেলের দেওয়ান হওয়া, অবশেষে রসেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শেষ পর্যন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু। সমবেদনার মূর্তিরূপে কবির সহধর্মিণী রত্নমণি ও কল্পনায় সৃষ্ট কলা চরিত্রের আবির্ভাব। নাটক বাৎসল্য রস প্রেমরস এবং ভক্তিরসও প্রাধান্য পেয়েছে।

'ধর্মযুদ্ধ' নাটকের বিষয় একদিকে সামাজিক অন্যায় অবিচার, অন্যদিকে ধর্মের নামে ভয়াবহ শোষণ। এক ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে পারছে না কারণ রাস্তা জুড়ে কীর্তন বসায় পথঘাট আটকে গেছে। হাসপাতালে অতি কষ্টে পৌঁছলে দেখা গেল ডাক্তার নেই কারণ সে মসজিদে গেছে। পরদিন অপারেশনের সময় মাইকে প্রবল চিৎকার শোনা যায় ধর্মস্থানের, মেয়েটি মারা যায়। মেয়ের বাবা পুরীর মন্দিরে গেলে পান্ডারা শোষণ করে এবং যখন জানা যায় সে হরিজন তখন তার ওপর অত্যাচার প্রবলতর হয়—সে শুদ্ধক্রিয়া করতে বাধ্য। সে গ্রামে ফেরে। তার বোনের স্বামী স্ত্রীর সন্তান কামনায় তাকে নিয়ে যায় 'বাবা'র কাছে সে তাকে ধর্ষণ করে। মেয়েটা স্বামীকে সে কথা জানালে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে। ভাই আবার বোনের বিয়ে দেয় এক বৃদ্ধের সঙ্গে যে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে মারা যায়। গ্রামবাসীরা মেয়েটিকে 'সতী' করবে পুড়িয়ে মেরে। 'বাবা' বলে সেই জায়গায় মন্দির হবে ও লোকে করবে করসেবা। আরেকদল

মুসলমান বলে যে সেখানে হবে মসজিদ। দাঙ্গা লাগার উপক্রম। শেষ পর্যন্ত 'মোহন দাস' নামে এক ব্যক্তি এগিয়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবিকতার কথা বলে আসে। তাকে দাঙ্গাকারীরা হত্যা করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বোঝে তার কথা এবং সবাই মিলে এক নতুন দেশ গড়তে চায়। নাটকটিতে এপিক থিয়েটার রীতির প্রয়োগ আছে এবং লোক-আঙ্গিকও ব্যবহৃত হয়েছে।

রণজিত পটনায়ক (১৯৫৭) নাট্যকার নাট্যপরিচালক এবং অভিনেতারূপে বিশেষ খ্যাতিমান। প্রায় ১২ বছর থেকে তিনি অভিনয় শুরু করেন এবং আড়াই শতর বেশী নাটকে অভিনয় করেছেন। ১৯৭৬-এ নাটক লেখা শুরু করেন এবং আজ পর্যন্ত প্রায় ৩৫টি পূর্ণাঙ্গ ও ৩০টি একাঙ্ক নাটক লিখেছেন। শ্রীপটনায়ক প্রবলভাবে সমাজসচেতন এবং সমসাময়িক জীবন তাঁর নাটকের বিষয়; নবীনতাই তাঁর ধর্ম। এবং সমাজের অন্যায় অপরাধ পাপকে তিনি তুলে ধরেছেন এবং এদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ তীব্র ভাবে প্রকাশ হযেছে। তাঁর নাটকের সংলাপ বলিষ্ঠ ও পাত্রোচিত, তাঁর নাটকের আঙ্গিকের মধ্যেও দৃঢ়তা আনার প্রয়াস আছে। নাটকের মঞ্চ সজ্জা ও মঞ্চনির্দেশে নতুনত্ব আছে, পরিচালকদের সুবিধার্থে তিনি কখনও একাধিক মঞ্চরূপের নির্দেশ করেছেন। কাহিনীর টান, বক্তব্যে সামাজিক দারবদ্ধতা, দ্বন্দ্বসংঘাতের তীব্রতা, সংলাপের চমৎকারিত্ব, রণজিৎ পটনায়কের নাটককে অনন্য করেছে। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল — 'চৌকি' (১৯৮৭), 'নাকটা চিত্রকর' (১৯৮৮), 'মুক্তি এক ভুল শব্দ' (১৯৮৮) 'ইচ্ছা বনাম পদ্মনাভ' (১৯৯১), 'দানবীয়' (১৯৯১), 'গুণীয়া ঝাড়েলো ডাহানী (ওঝা ডাইনীকে তাডালো), 'গোইঠা বাবা' (১৯৯৪), 'টিটো' (১৯৯৩), 'তিতলি' (প্রজাপতি) (১৯৯৬), 'গাঁ' (১৯৯৮) ইত্যাদি। তার সব নাটকই অজস্রবার মঞ্চস্থ হয়েছে। 'ইচ্ছা বনাম পদ্মনাভ' নাটকে মানুষের অবান্তর ইচ্ছা বা প্রবল কামনার জন্য কেমন করে তার নৈতিক অধঃপতন ঘটে তা দেখানো হয়েছে। পদ্মনাভ-র ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। পদ্মনাভর তিনটে ইচ্ছা ছিল : ১) ক্ষমতার ইচ্ছা — সে গ্রামের মালিক হবে; ২) খাদ্যর ইচ্ছা — সে তার মামার পোষা আদরের ছাগলের মাংস খাবে; ৩) দেহর ইচ্ছা — সে স্বামী পরিত্যক্ত চম্পাকে লাভ করবে। তার ইচ্ছাগুলো বাস্তবে পরিণত করতে সবায়ের সঙ্গে তার সংঘাত লাগে। তখন সে স্বপ্ন দেখে বড় হবার। সে শেষ পর্যন্ত পথের কাঁটা তার বাবা, তার মামা ও চম্পাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে।

'গোইঠা বাবা' (লাথি মারা সাধু) ব্যঙ্গাত্মক নাটক যার মধ্যে জীবনের সত্য ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষে অনেক তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসীদের দেখা যায় যারা বড় বড় রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারণ মানুষদের মাথার ওপর পা রেখে তাদের আশীর্বাদ করে এবং লোভী মানুষরা এতে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। 'গোইঠা বাবা' নাটকে গোকুলি এক অতি সামান্য ব্যক্তি। পুলিশ অফিসার সরপঞ্চ বিডিও এমন কি মন্ত্রীও তাকে সারাজীবন নির্যাতন করেছে। গোকুলি সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসে কাইঁচ-কে যদিও সে মুখফুটে তার মনের কথা কোনদিন বলতে পারেনি। গোকুলি শেষে নিজেকে গোইঠা বাবা রূপে অভিহিত করে। যখনই সে লাথি মারবে তারা আশীর্বাদ পাবে। সে খুব বিখ্যাত হয়ে পড়ে। পুলিশ অফিসার থেকে মুখ্যমন্ত্রী সবাই তার কাছে আসে পদাঘাত পেতে। কিন্তু ক্রমে জানা যায় যে গোকুলি সাধু নয়, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাতেই সে এমন হয়েছে। সবাই নিজেদের ভুল বোঝে এবং গোকুলির প্রতি তাদের সম্মান অব্যাহত থাকে। এই নাটকটি অত্যন্ত জনসমাদর লাভ করে এরা ওড়িশায় ও ওড়িশার বাইরে ৫০০র বেশী বার অভিনীত হয়।

'গাঁ' নাটকে বর্তমান গ্রামজীবনের কদর্যরূপ অঙ্কিত হয়েছে। গ্রামীণ সভ্যতা ছিল একদা ভারতবর্ষের গৌরব, শান্ত সুন্দর সমৃদ্ধ গ্রামজীবনকে নিয়ে তার প্রাণ বিকশিত হয়ে উঠত। কিন্তু সেই গ্রাম আর আগের মত সুন্দর পবিত্র নয়, বিশৃঙ্খলা অত্যাচার পাপ সেখানে ঢুকে গেছে, ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি প্রকম্পিত হয়ে পড়েছে। রণজিৎ পটনায়কের 'গাঁ' নাটকের প্রধান চরিত্র মায়াধর দিল্লীতে উচ্চপদে কাজ করত যে অবসর নেবার পর গাঁয়ের বাড়ীতে ফিরে আসে গাঁকে ভালবেসে। তার স্ত্রী মারা গেছে, ছেলে ও ছেলের বৌ-রা দিল্লীতে থাকে। কিন্তু গ্রামের রূপ মায়াধরকে ব্যথিত করে। অন্তত সে ভেবেছিল শ্মশানে তার স্থান হবে যেখানে তার পিতা-পিতামহ শুয়ে আছে। কিন্তু মায়াধরের ভাই সতিয়া ও ভাইয়ের ছেলে লোচন — যারা দুজনেই মদ্যপ নীতি-চরিত্রহীন অসৎ — শ্মশান ক্ষেত্রকে বিক্রি করে দেয় রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে এক বীয়ার কোম্পানীকে। মায়াধর এতে অত্যন্ত আঘাত পায়। মায়াধরের বন্ধু কুঞ্জ এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যার ভুবনেশ্বরবাসী ছেলে বাবাকে দেখেনা। গাঁয়ের অবস্থা জেনেও সে চায় তার বন্ধু মায়াধর এখানে থাকুক। মায়াধরের ভাই সতিয়া বদমাস দুর্নীতিপরায়ণ, সতিয়ার ছেলে লোচন বাবার এককাঠি ওপরে -- সে দুই চেলা বাঁয়া ডায়াকে ব্যবহার করে গ্রামে গুন্ডারাজ চালায়। সতিয়ার স্ত্রী চারু লজ্জাপরায়ণা গ্রাম্য বধূ। সে চেষ্টা করেও স্বামী ও ছেলের স্বভাবের পরিবর্তন আনতে পারেনি, চোখের জল ফেলা ছাড়া। কিন্তু এত দঃখবেদনা সত্ত্বেও মায়াধর গ্রামে থাকারই সিদ্ধান্ত নেয়। মায়াধর অনুভব করে ওখানে প্রেতাত্মারা কান্না কাটি শুরু করেছে, মঞ্চে ত্রাহি ত্রাহি রব শোনা যাচ্ছে। মায়াধর বলে —

পচিযাউ মোর এ দেহ ..... সড়িযাউ মোর এ আত্মা ..... পরমাত্মাঙ্ক সহি বড়িযাউ পছে মোর দূরত্ব ..... মু এইঠি রহিবি। মো পূর্বপুরুষঙ্ক মুক্তি দেবা পাইঁ, মো উত্তরপুরুষঙ্ক শান্তি দেবা পাই মু এইঠি রহিবি। এইঠি .... এই গাঁরে .... এই গাঁরে। গ্রন্থে নাটকের মঞ্চসজ্জার একাধিক রূপ দেওয়া হয়েছে যা পরিচালকদের বিশেষ ভাবেই সাহায্য করবে।

মনোরঞ্জন দাস, বিজয় মিশ্র, বিশ্বজিৎ দাস, রমেশ প্রসাদ পানিগ্রাহী, জগন্নাথ প্রসাদ দাস, কার্তিক চন্দ্র রথ প্রমুখ অঙ্কিত আধুনিক ব্যর্থ বিবর্ণ আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের ছবি স্মরণ করিয়ে দেয় কির্কেগার্ডের অস্তিতবাদী দর্শনকে, কামুর সিসিফাসের ব্যর্থ প্রয়াসকে, ইয়োনেস্কোর অসহায় শূন্যতার বোধকে, টি এস এলিয়টের পতিত পোড়ো জমির ঊষর জ্বালাকে, বেকেটের গোডোর ক্লান্ত অনিঃশেষ প্রতীক্ষাকে আর ব্রেখটের সামাজিক তাৎপর্য মন্ডিত এলিয়েনেশন এফেকটকে। দেশ কালের সীমাসংবৃত গন্ডীকে অতিক্রম করে বিশ্বচেতনার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা পড়েছে আধুনিক ভারতীয় শিল্পীমন : বিশ্বনাট্যসাহিত্যের অনুরূপতা অর্জনের অধিকারী হতে চলেছে দার্শনিকতার বিচিত্র রেখাকীর্ণ অপরূপ রূপময় অভিযাত্রিক ওড়িয়া নাটক। আবার এগিয়ে এলেন তরুণ নাট্যকারগণ—ভারতবর্ষের জ্বলন্ত সমস্যা, সমাজের তীব্র প্রখর সংকট, মনের অফুরন্ত বিস্ময়কে তুলে ধরলেন নতুন প্রজন্ম। এভাবেই ওড়িয়া নাটক এগিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে।

৫. বাংলা ও ওড়িয়া নাটক : পারস্পরিক সম্পর্ক

(১) সূচনা

ওড়িশার জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার নিগূঢ় আচ্ছদ্য যোগসূত্রের বন্ধন আছে। শত শত বৎসব ধরে দুই জীবন কাছাকাছি এসেছে, পরস্পরের সঙ্গে গভীর আন্তরিকতায় মিলিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় কালিন্দী চরণ পাণিগ্রাহী বলেছেন "ভৌগোলিক বিচারে ওড়িশা ও বাংলা কেবল নিকট প্রতিবেশীই নয়। ওড়িয়া ও বাঙ্গালীদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি আহার বিহার জীবনচর্যা প্রায় একই। এটা সর্বজনবিদিত যে বাংলা ও ওড়িয়া দুই ভগিনী সম ভাষা একই উৎস থেকে জাত হয়েছে। সাংস্কৃতিক পটভূমি দুই জাতির মধ্যে মানসিকতার সুদৃঢ় বন্ধন নির্মাণ করেছে।"[১৬] আধুনিক কালে এই মিলন গভীরতর হয়েছে নাট্যসাহিত্যকে অবলম্বন করে তা আশ্চর্যভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে বিচিত্র ভাবে।

(২) প্রথম পর্যায়

আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার রামশঙ্কর রায়ের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক নিকট ও গভীর। বাংলা নাটকই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে ওড়িয়া নাটক লিখতে।[১৭] তাঁর 'কাঞ্চী কাবেরী' (১৮৮০) নাটক অনিবার্যভাবে বাংলাকে স্মরণ করায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'নিদিধ্যাসন' নাটক অবলম্বনে "ফকির মোহন সেনাপতি তাঁর পেটেন্ট মেডিসিন গল্প রচনার উপাদন সংগ্রহ করেন" — একথা জানিয়েছেন সমালোচক ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৮] এ কথা মনে রাখা দরকার যে বাংলা নাটক শতাব্দীর সূচনা থেকে ওড়িয়া নাট্য সাহিত্যকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। কত বাংলা নাটক (ও যাত্রা) ওড়িয়াতে রূপান্তরিত ও অভিনীত হয়েছে তার পরিমাণ করা কঠিন।

(৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ওড়িয়া নাটক

ওড়িয়া নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নাটক বিভিন্ন সময়ে ওড়িয়ায় অনূদিত হয়েছে এবং অভিনীতও হয়েছে। এবং তা বিশেষ প্রভাব বিস্তারও করেছে। এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন ডঃ নীলাদ্রিভূষণ হরিচন্দন তাঁর 'ওড়িয়া নাটকরে ইতিহাসর প্রতিধ্বনি' গ্রন্থে। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমিকতা, স্বাজাত্যবোধ, স্বাধীনতার বাসনা এবং প্রকাশভঙ্গীর তীব্র নাটকীয়তা ওড়িয়া নাট্যকারদের আকৃষ্ট করেছিল এবং তাদের নাটকে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়।

চিকিরির রাজা রাধামোহন রাজেন্দ্রদেব বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে নাট্যকাররূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পান। তিনি একাধারে নাট্যকার, নাটনির্দেশক, রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠপোষক। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'শ্রী প্রতাপ' (১৯১৬) দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপসিংহ' দ্বারা প্রভাবিত। তিনি ভূমিকায় বলেছেন — *"কৌণসি ঐতিহাসিক বৃত্তান্তর আশ্রয় নেই স্বীয় জাতীয় সাহিত্যর পুষ্টি সাধন লাগি মুঁ গোটিয়ে নাটক প্রণয়ন* করিবা সংকল্প করিথিলি। অবসরক্রমে বঙ্গর সুবিখ্যাত নাটক রচয়িতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত রাজা প্রতাপসিংহ নাটক পাঠ করি মেবার প্রদীপ প্রতাপঙ্ক জাতীয়তা ও কঠোর সাধনা প্রভৃতি সদগুণাবলীরে প্রমুগ্ধ হোই নিজ রুচি অনুরূপ স্থানে স্থানে পরিবর্তিত কচিত বা সংকুচিত করি তাহাকু হিঁ উৎকল ভাষারে লেখি অছি।"[১৯]

ভঞ্জকিশোর পট্টনায়ক দুটি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন — 'প্রতাপ রুদ্র' ও 'রাজনর্তকী', তাঁর নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আছে। ''ভঞ্জ কিশোরঙ্ক নাট্যকার জীবনর মূলভিত্তি সম্পর্করে বীরকিশোর দাস তাঙ্কর 'যুগে যুগে নাট্যসাহিত্য'রে কাহিছন্তি — 'প্রসিদ্ধ বংগলা নাট্যকার ডি. এল. রায়ঙ্ক নাটক সবুঠারু বেশী প্রিয় থিলা। তেণু সেই নাট্যসম্রাটঙ্ক রীতিমত প্রভাব ভঞ্জকিশোরঙ্ক নাটকরে প্রচ্ছন্ন।''[২০]

কৃপাসিন্ধু পট্টদেব-এর 'মহুরী পতন' নাটক ১৯২৩ সালে অভিনীত হয়। প্রকাশ কাল ১৯২৬। মহুরী গঞ্জামজেলার ছোট বাজ্য, ইংরাজ শাসনকে অস্বীকার করে বিদ্রোহ করে। কিন্তু চিকিটি রাজার বিশ্বাসঘাতকাতার ফলে মহুরী রাজ্যের পতন হয়। এই নাটকের ওপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আছে — বক্তব্য আঙ্গিক ভাষারীতি ইত্যাদি বিষয়ে এই প্রভাব পাওয়া যায়। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের বিখ্যাত সংলাপ — 'কি বিচিত্র এই দেশ', সেরকম এই নাটকে আছে — 'বড় বিচিত্র এ জগত — নিদাঘ সময়ে তপনর তপ্ত কিরণ নিষ্ঠুর জন পরি সমগ্র আকাশ অবনী সন্তপ্ত করি দিয়ে। প্রাবৃট কালে ঘনকৃষ্ণ কাদম্বিনীমালা স্বেচ্ছাচারীর সম নিরন্তর গগনমধ্যে প্রধাবিত। মধ্যে মধ্যে সৌদামিনীর লজ্জা-লোল-ললিত-লাস্য বজ্রর সুকঠিন দারুণ নিনাদ মানবর ভাবনার রাজ্যকু বন্ধুর করি দিয়ে।'

এ প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে মহুবী রাজের মুখে উপরোক্ত সংলাপটি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের সংলাপের ''এক বিকৃত রূপ কহিলে চলে।''[২১]

বালকৃষ্ণ কর প্রণীত 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯২৬) নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

অনন্তপ্রসাদ পন্ডার 'তারাবাঈ' (১৯৩৭) পৃথ্বীরাজ ও তারাবাঈ-এর কাহিনী নিয়ে রাজপুত কথাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক। ''বংগলা 'রাজস্থান' পুস্তকস্থিত তারাবাঈ অনুসরণরে এই নাটকটি রচিত।''[২২] দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে বস্তুগত বিষয়গত মিল থাকলেও লেখক বলেছেন যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'তারাবাঈ' নাটকের সঙ্গে তিনি পরিচিত নন।

বেণী মাধব পাড়ী বেশ কয়েকটি নাটক লিখেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে বিখ্যাত 'সাহাজাহান' ও 'নূরজাহান'। এই নাটক দুইটি বিভিন্ন নাট্য সংস্থা অভিনয় করে। প্রকৃতপক্ষে ''এ দুইটি বঙ্গীয় নাটকর ছায়ানুসরণ মাত্র।''[২৩]

দেবেন্দ্র কুমার সিংহ লিখেছেন ''ভঞ্জকবি' (১৯৫০)। এই নাটকের নাট্যিক বস্তুযোজনা ও সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের সামান্য ছায়াপাত লক্ষিত হয়।

ওড়িয়া নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আজও বিদ্যমান। পূর্ণচন্দ্র কানুনগোর 'ময়ূর সিংহাসন'[২৪] ১৯৭৫ সালে রচিত হয়। নাটকের কাহিনী বক্তব্য সংলাপ ইত্যাদিতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আছে। কখনো কখনো প্রভাব এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে বোঝা যায় লেখক সম্পূর্ণ অনুবাদ করে দিয়েছেন বাংলা নাটক থেকে। যেমন —

ওড়িয়া ঃ

মীরজুমলা — ভারতসম্রাট সম্মুখের সম্রাটঙ্কর এ অপমান .....
যশোবন্ত সিং — কিএ ভারতর সম্রাট?
শায়েস্তা খাঁ — ভারতর সম্রাট সহেনসহ আওরঙ্গজেব।
(জাহানাবাব প্রবেশ)
জাহানা — না, মিছকথা। ভারতর সম্রাট সহেনসহ শাহাজাহান।

মীরজুমনা — কি এ এহি নারী?
জাহানারা — মোর পরিচয় শুনিবাকু চাঁহি? তেবে দেখ, তুম সম্মুখরে ভারত সম্রাট সাহাজাহানঙ্কর কন্যা জাহানারা।
(বুর্খা খোলিদেলে)
আওরঙ্গজেব — বুবুজান ....।
জাহানারা — হঁ, আওরঙ্গজেব। মুঁ জাহানারা। তুমর মুখমন্ডল সহসা বিবর্ণ হোইগলা যে?
(ময়ূর সিংহাসন, প্রথম অংক, দশম দৃশ্য)

বাংলা ঃ
শায়েস্তা — আস্পর্ধা এই কাফেরের জাঁহাপনা — যে ভারতসম্রাটের সম্মুখে—
যশোবন্ত — কে ভারতের সম্রাট?
শায়েস্তা — ভারতের সম্রাট — বাদশাহ্ গাজী আলমগীর।
(অবগুণ্ঠিতা জাহানারার প্রবেশ)
জাহানারা — মিথ্যা কথা, ভারতের সম্রাট ঔরংজীব নয়, ভারতের সম্রাট শাহানশাহ্ সাজাহান।
মীরজুমলা — কে এ নারী।
জাহানারা — কে এ নারী? এ নারী সম্রাট সাজাহানের কন্যা জাহানারা। (মুখ উন্মুক্ত করিলেন) - কি ঔরংজীব। তোমার মুখ সহসা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল যে।
(সাজাহান, দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য)

এ জাতীয় অনুসরণ নাটকে আরো অনেকবার আছে।

অশ্বিনীকুমার ঘোষ বাংলা ও ওড়িয়া দুভাষাতেই সমান পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের প্রভাব আছে, তাঁর ওড়িয়া নাটক কলকাতার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। "১৯২০-২১ রে অশ্বিনীকুমারঙ্ক নাটক কলাপাহাড় কলিকাতার মনমোহন ও ষ্টার থিয়েটাররে অভিনীত হেলা"[২৪] তদানীন্তন কলকাতায় পাঠরত ওড়িয়া ছাত্ররা এই নাটক অভিনয় করেন। বঙ্গরঙ্গপীঠে এই নাটকের অভিনয় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। গিরিশ চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের নাটক দ্বারা অশ্বিনীকুমার বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

(৪) রবীন্দ্রনাথ ও ওড়িয়া নাটক

অ. ভূমিকা

ওড়িয়া সাহিত্যে বিশেষত কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রভাব অনুভব করা যায়। বাংলায় সঙ্গে ওড়িশার নিকট সম্পর্ক, দুই জীবন ও সংস্কৃতির সমান রূপ, দুই ভাষারীতির অতিশয় সাদৃশ্য স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওড়িয়া সাহিত্য সংস্কৃতির এক অপরূপ যোগসূত্রের বন্ধন নির্মাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক অবলম্বন করে এই নৈকট্যের সম্পর্ক আরো নিবিড় আরো আন্তরিক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক ওড়িয়ায় অনূদিত হয়েছে, অভিনীত হয়েছে এবং তা অনুপ্রাণিত করেছে ওড়িয়া লেখকদের। কখনো ঐতিহ্যনিষ্ঠ সৃজনশীল ওড়িশী সংস্কৃতিতে রবীন্দ্র সৃষ্টির অভিনব রূপায়ন ঘটেছে। যেমন ওড়িশী নৃত্যরীতিতে রবীন্দ্র নাটকের মঞ্চায়ন।

অ. রবীন্দ্রনাটকের ওড়িয়া অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের খুব বেশী নাটক ওড়িয়াতে অনুবাদিত হয়নি। কারণ শিক্ষিত ওড়িয়া প্রায়জনই বাংলা পড়তে ও বুঝতে পারেন। মূলের আস্বাদ পাওয়া কঠিন নয় বলেই অনুবাদে তাকে ভাষান্তরিত করার প্রয়োজন হয় নি। তবু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক ওড়িয়ায় অনূদিত হয়েছে মূলতঃ সাহিত্য একাডেমীর পরিকল্পনার অন্তর্গত হয়ে।

রবীন্দ্রনাটকের অনূদিত পরিচয় হল —

বিদায় অভিশাপ	--	সচিদানন্দ রাউত রায়	১৯৭৫
চিরকুমার সভা	—	যতীন দাস	
চিরকুমার সভা	—	কার্তিককুমার ঘোষ	১৯৬১
চিত্রাঙ্গদা	—	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৬১
ডাকঘর	—	সুনন্দ কর	
গান্ধারীর আবেদন	--	সচিদানন্দ রাউত রায়	১৯৭৫
কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ	—	সচিদানন্দ রাউত রায়	১৯৭৫
মুক্তধারা	—	বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক	
রক্তকরবী	—	প্রফুল্ল পট্টনায়ক	১৯৫৭
বজা	—	বসন্ত কুমার শতপথী	
কাবুলিওয়ালা	-	প্রাণবন্ধু কব	১৯৫৫

ই. ওড়িয়া নাটকে রবীন্দ্রপ্রভাব

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটক গীতিনাটকের প্রভাব ও প্রেরণা ওড়িয়া নাটকে বিশেষভাবেই প্রত্যক্ষ হয়। সৌন্দর্যবোধ প্রেমচেতনা আদর্শবাদ রোমান্টিকতা লাবণ্যময় কবিত্ব গীতলতা প্রভৃতি রবীন্দ্র নাটকের বৈশিষ্ট্য ওড়িয়ায় অনুস্যুত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকের ভাবনাকেও কখনও ওড়িয়া শিল্পীরা গ্রহণ করেছেন যদিও এর পরিমান স্বল্প।

ওড়িয়া গীতিনাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ডঃ নিত্যানন্দ শতপথী।[২৬] 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় লক্ষ্মীকে বাদ দিয়ে সরস্বতীকে আরাধনার কথা বলা হয়েছে। 'বাল্মীকি প্রতিভার' শিল্পতত্ত্ব ও বক্তব্য ওড়িয়া কবিদের রচনায় বৃত হয়েছে। পল্লীকবি নন্দকিশোর রচিত 'নির্ঝারিণী' তে এই ভাবনার প্রকাশ। রাধামোহন গড়নায়ক রচিত 'কালিদাস' (১৯৫০) নাটকেও কবি কালিদাস দুঃখদারিদ্রের সম্মুখে লক্ষ্মীর প্রলোভন এগিয়ে ভারতীকে বরণ করেন ও দেবী তাকে আশিস জানান।

মায়াধর মানসিংহ রচিত 'রাজকবি' নাট্যকাব্যে কবি উপেন্দ্র ভঞ্জর জীবনে রাজলক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রভাব দেখানো হয়েছে। কবি রাজলক্ষ্মীর ঐশ্বর্য-সম্পদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সরস্বতী উপেন্দ্র ভঞ্জর উপর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে অর্পণ করলেন বীণা। কবি অর্জন করলেন পরম সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক থেকে প্রেরণা নিয়ে তাকে নতুন রূপে প্রকাশ করলেন কবি মানসিংহ 'পুষ্পিতা' সামাজিক কাব্য নাটিকায় মূলতঃ এক কিশোরীর জাগরণের কথাকে ব্যক্ত করে।

রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী' কাব্যনাটকের প্রভাব আছে বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক রচিত 'উপেক্ষিতা' কাব্যনাটকের ওপর। 'উপেক্ষিতা'য় মগধ বিদ্যাপীঠে পড়তে এসেছে দেবদত্ত, যেখানে আছে কর্মরত মজুর কন্যা সপ্তদশী ছায়া। সুন্দর জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী

দেবদত্তব প্রতি ছায়ার অনুরাগ জন্মায়, দেবদত্ত তা অনুভব করে। কিন্তু তাদের মিলন হবে না। উচ্চবংশীয় জ্ঞানবান দেবদত্ত চলে যায়, উপেক্ষিতা ছায়ার অন্তর বেদনায় নিবিড় হয়। রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' এর প্রভাব আছে কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর 'গান্ধারীর আশীর্বাদ'-এর ওপর। এইভাবে ওড়িয়া কাব্যনাট্যের এক অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ও প্রেরণায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব বিশেষ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি 'মুক্তধারা' নাটকের সুন্দর অনুবাদ করেছেন। তাঁব 'মুক্তিপথে' (১৯৩৩) নাটকে অনেক গান ও গীতিধর্মী কবিতা আছে যেগুলো প্রচলিত ওড়িয়া নাটকেব গান নয়। সেগুলো মনে করায় রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাকে। যেমন —

ক) মঙ্গল সবু চির মঙ্গলময়
তুম আশ্রয় মৃত্যুকু করে জয়
তুম ইংগিতে অ'শান অমা তুটে
তুমর বাণীরে আলোক কমল ফুটে।

খ) বন্ধন গ্লানি সকল জড়তা
দলি আজ পদে অসত্য ব্যথা
মুক্তি নিশান তোলি ধরি হেলে
অবসাদ কর ত্যাগ।
আমরি পাথেয় আমরি শকতি
বিশ্বাস আশা নীরব ভকতি
জাগ্রত শিব জীবন দেবতা
চরণে আশিস মাগ।

গ) আলোক আলোক আলোক পড়ি ঝরি
তুটু অনিমেষে মৃত্যু সমান
অন্তরে বিভাবরী।
যে আলোকে ফুটে মল্লী যুথিকা।
উজ্জ্বলতর পত্র লতিকা
যে আলোকে করি মুক্তি গীতিকা
স্বর্গ ঝরণা সরি
পড় ঝরি।

কমললোচন মহান্তির 'মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র' নাটকের ওপর রবীন্দ্রভাবনার প্রভাব আছে। "মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ও অভিনীত। নাট্যকার এথিরে রবীন্দ্র প্রতিভা ও রবীন্দ্র সাহিত্যর সম্বন্ধরে কিঞ্চিৎ আভাস দেবা সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শন সঙ্গে সমতা রক্ষা করি সমাজপ্রতি সেবিকামানঙ্কর দায়িত্ব এবং সেমানঙ্কপ্রতি সমাজের কর্তব্য সম্বন্ধরে সূচনা প্রদান করি অছন্তি।"[২৭]

কুলমনি মহাপাত্র লিখেছেন হাস্যবসাত্মক নাটক 'বিজ্ঞাপনর অত্যাচার'। রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' র সম্পূর্ণ বক্তব্য নিয়েই লেখা হয়েছে এই নাটক।

বিশ্বজিৎ দাস ছেলেবেলায় কলকাতায় ছিলেন এবং বাংলায় লেখাপড়া করেছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্য তিনি পড়েছেন। বহুরূপী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের নাটকও তিনি দেখেছেন। রবীন্দ্র ভাবনার দ্বারা তিনি প্রভাবিতও হন। তাঁর নাটকে যে কবিত্বময় সংলাপ ও গভীর ভাবের প্রকাশ আছে তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে বলা যেতে পারে।

ঈ. ওড়িয়ায় রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়

ওড়িয়ায় রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটক অভিনীত হয়েছে। তবে সব অভিনয়ের কথা লিখিত হয়নি বা সে সব বিবরণ সংরক্ষিত হয় নি। পাঁচের দশক থেকেই রবীন্দ্রনাট্যাভিনয়ের শুরু হয়। পঞ্চাশের সূচনাতেই 'ডাকঘর' অভিনীত হয় ঢেঙ্কানলে। নাটক অনুবাদ করেন সুনন্দ কর, পরিচালনায় হিমাংশু ঘোষ। পঞ্চাশের মাঝামাঝি 'কাবুলিওয়ালা' বিভিন্ন স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিনীত হয়। মূল কাহিনীকে একাঙ্কে রূপায়িত করেন বিশিষ্ট নাট্যকার প্রাণবন্ধু কর, নাটকটি পরে লেখকের একাঙ্ক সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে অভিনীত হয় 'শেষরক্ষা'। ওড়িয়াতে অনুবাদ করেন কার্তিক কুমার ঘোষ ও দুঃখীরাম সাঁই। অভিনয় করে অন্নপূর্ণা থিয়েটার(এ)। পরিচালনায় কার্তিক কুমার ঘোষ। প্রথম অভিনয় হয় কোরাপুট জেলার জয়পুরে। তাবপর ওড়িয়ার বিভিন্ন জায়গায় এই নাটক অভিনীত হয়।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্র নাট্য প্রযোজনাব বিশেষ প্রসার ঘটে। 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করে জনতা থিয়েটার্স, কটক। নির্দেশক — নিরঞ্জন শতপথী। অভিনয়ে অংশ নেন প্রফুল্ল মিশ্র, শরৎ মহান্তি, ভোলানাথ দাস, প্রফুল্ল শাস্ত্রী, নটবর সেন, সৌদামিনী পতি, সরস্বতী দেবী প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'নটীর পূজা' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য ওড়িয়ায় বিপুল গৌরবে রূপায়িত হয়। নৃত্যপটিয়সী বিদুষী ডঃ মিনতি মিশ্র অভিনয় করেন শ্যামা, নটীর পূজা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি নাটকে। কুমকুম দাস (মহান্তি) ওড়িষী নাচের বিশিষ্ট শিল্পী। তিনি 'চিত্রাঙ্গদা'য় নায়িকার ভূমিকায় অংশ নেন।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে ভুবনেশ্বরে নবনির্মিত রবীন্দ্র মন্ডপ-এর উদ্বোধন উপলক্ষে বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে 'চিত্রাঙ্গদা' রূপায়িত হয়। এই অনুষ্ঠান শিল্পসৌকর্যে অপরূপ হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী রসিক সমালোচকের মতামত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য — "ওড়িষী নৃত্যরীতিতে চিত্রাঙ্গদা উপস্থাপত হয়। এটা এক বিস্ময়কর ও আনন্দময় অভিজ্ঞতা — আমার দেখা অন্য সব চিত্রাঙ্গদার থেকে এই চিত্রাঙ্গদা অনেক উন্নত অনেক আর্কষণীয় প্রযোজনা। ভুবনেশ্বরের এই অনুষ্ঠানে নৃত্যরীতি এত সমুন্নত, ওড়িষী বাকপ্রতিমা এত সমৃদ্ধ এবং কোরিওগ্রাফী এত অপরূপ সৌন্দর্যময় যে আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলুম।"[২৮]

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠান হয় কটকে সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'শুভা' গল্পটি নাটকাকারে পরিবেশিত হয়। শুভার ভূমিকায় অভিনয় করেন আলোকপ্রভা কানুনগো যিনি অলকা কানুনগো নামে নৃত্যশিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। অলকা কানুনগো 'মালিনী' নৃত্য নাটকে মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেন দূরদর্শনে ১৯৮৪ সালে। তিনি সম্পূর্ণ ওড়িশী রীতিতেই চরিত্রটি অভিনয় করেন। অন্য অনুষ্ঠানেও তিনি মালিনী রূপায়িত করেন। ওড়িশার নৃত্য আঙ্গিকে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'ভানুসিংহের পদাবলী' মঞ্চস্থ হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

ওড়িয়ায় রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার ধারা আজও অব্যাহত। ১৯৮৫র ২৫ বৈশাখ ড্রামা একাডেমী ইন্ডিয়ার উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় নাট্য সমাবেশে 'বিনি পয়সার ভোজ' ওড়িয়ায় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেন তরুণ শিল্পী সাফল্য কুমার নন্দী। যুগান্তর

লেখেন — "সাফল্য কুমার নন্দীর ওড়িয়া অভিনয় 'বিনি পয়সার ভোজ' সকলের ভাল লাগে"।[২৯] দেশ পত্রিকার অভিমত — "সাফল্য কুমার নন্দী রবীন্দ্রনাথের 'বিনি পয়সার ভোজ'-কে ওডিয়া ভাষায় 'বিনি পয়সার ভোজি' নামে অনুবাদ করে একটু অতি-অভিনয়ের সঙ্গে দেখালেন। উপস্থাপিত নাটকটি রচনা ও অভিনয়ে ওড়িয়া সংস্কৃতির কাছাকাছি"।[৩০] সঙ্গীত কলামন্দির আয়োজিত অনুষ্ঠানে ওড়িয়া নাটমন্ডল উপস্থাপিত করেন 'বিসর্জন' নাটকের অংশ বিশেষ ১৯৮৬ র জানুয়ারিতে।

১৯৮৬ র ৮ মে মহাবোধি সোসাইটি হলে রবীন্দ্র আবির্ভাবের ১২৫ বর্ষ স্মরণে নাট্যসভার আয়োজন করা হয় যে অনুষ্ঠানে সাফল্য নন্দী রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম চিঠি' গল্পটি নাট্যাকারে পরিবেশন করে বিশেষ খ্যাতি পান। 'হংসধ্বনি' র উদ্যোগে ছিয়াশির ফেব্রুয়ারিতে ওড়িশি নৃত্যাঙ্গিকে 'শ্যামা' অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামার ভূমিকাকে রূপায়িত করে অস্মিতা লাহিড়ি। রেনেশাঁ গ্রুপ আয়োজিত ভুবনেশ্বরে রবীন্দ্র নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে ৩ অক্টোবর ১৯৮৬ রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য'র ওড়িয়া নাট্য রূপান্তর 'পুরুনা চাকর' উপস্থাপিত হয় রবীন্দ্র মন্ডপে। বাংলা নাট্যরূপ কিরণ মৈত্র, ওড়িয়া রূপান্তর ও পরিচালনা বিপ্র সিং, সঙ্গীত নির্দেশনা ফকির জেনা, প্রয়োগ অসীম বসু। নাটকটি প্রযোজনা করেন 'উত্তর পুরুষ নাট্য সংস্থা' ভুবনেশ্বর।

বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী কেলুচরণ মহাপাত্রর নির্দেশনায় 'ভানুসিংহের পদাবলী' অনেকবার অভিনীত হয়েছে ও রসিকজনের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ১২৫ জন্মবর্ষে দিল্লীতে আয়োজিত রবীন্দ্র নাট্যোৎসবে এটি উপস্থাপিত হয়। নাটকের সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের অনুপম সুরমাধুর্য অনুসৃত, কিন্তু নৃত্যরীতিতে সম্পূর্ণ ধ্রুপদী ওড়িশীর প্রয়োগ আছে। নাটক সম্পর্কে পত্রিকার মতামত উল্লেখ করা গেল —

Reviewing in retrospect, the recently concluded Sangeet Natak Akademi's Rabindra Natyotsava, one is inclined to hail Guru Kelucharan Mahapatra's ballet as the most outstanding.

Interpreting the poet philosopher Tagore's Bhanusingher Padabali, he carved out the eternal theme of Radha-Krishna, Paramatma-Jivatma in a most fitting manner.

Under the pseudonym 'Bhanusingh' Tagore wrote these poems (published at sixteen) conveying the Vaishnava thought symbolically through Radha and Krishna.

The choreography of Mahapatra stood out for its abundant clarity, subtle and suggeetive dance passages. Having taken a heavy theme there was absolutely no attempt to put the fools cap with threatening terminologies metaphysically.

What one saw was the metamorphosis of Tagore into a Jayadeva on the stage. One was wondering whether it was Tagore or Jayadeva depicted or a demonstration of the similarity in the thought ot the two poets. A point needs explanation here : While oneness in aim has been the undercurrent of various art forms of this country having different languages, oneness in aim has been the common feature of the various schools of thought in philosophy too from Andal of the South and Meera of the North.

The Vedopanishadic thoughts that reflect throughout the creations and philosphies of great men over the ages : Buddha, Adi Sankara, Tulsi

Das, Kabir, Guru Nanak, and the like, Thyagaraja and Haridas in music, The bhakti-bhav tradition. They established an under current of oneness in thought. It was this aspect that was remarkally brought out in the ballet under review.

The sancharis employed are an extension of the lyrics which reflect the sanctity of the Vaishnava belief and devotion, says the choreographer. Though the music is in the inimitable style of Tagore, the angikabhinaya is the bhangi of classical Odissi. Typical Odissi rhythmic compositions have given a strong Odissi flavour.

The padabhadas and bhumis, the karanas — a stance, a pose, hand gestures and movements ...... the typical Odissi style gave the ballet an Indianness that has not been seen in any of the other ballets that were presented.

Beyond all these techniques, even beyond excellence there is a spirit of dance— a spirit that our sculptures reflect— which should be brought out in a dance form. And that was what exactly Mahapatra did.

The poem almost equated with the 24 ashtapadis of Jayadeva depicted by episode episode. Radha's longing for the company of Krishna and her illusions. Finally the climax of the divine union—the last bliss— was the fitting finale.

Sharmila Das as Radha held the audience spell-bound. This young danseuse should be watched, presented more often.

Leading the orchestra, Dilip Roy swept the audience off its feet. Well measured musical scores trimemd percussions and the timely and tight tailored rhythm and instruments with appropriate vocal touches lifted the ballet to a peak. When a solo violin (Dilip Roy) slowly reached the fourth octave from the sub- bar registers the effect was electrifying.

When finally the curtain was hung down the thunderous ovation of the overpacked audience would linger in one's memory for long.[৩১]

কার্তিক চন্দ্র রথ রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করেন এবং তারই পরিচালনায় এটি ওড়িয়াতে পরিবেশিত হয় কটক শহরে ১৯৭৪ এর আগস্টে। প্রযোজক সংস্থা মৌসুমী সাংস্কৃতিক সংস্থা কটক। অনুষ্ঠান স্থান কলা বিকাশ কেন্দ্র রঙ্গমঞ্চ। প্রখ্যাত ওড়িশি নৃত্যশিল্পী কুমকুম মহান্তি রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে একাধিকবার অংশ নিয়েছেন। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভুবনেশ্বরে রবীন্দ্র মণ্ডপ-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য উপস্থাপিত হয় ১৯৬২ সালে। 'চিত্রাঙ্গদা'য় চিত্রাঙ্গদার অভিনয় করেন কুমকুম মহান্তি (দাস) এবং অর্জুনকে রূপায়িত করেন সংযুক্তা পাণিগ্রাহী। সমুগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমতী সিংহ।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে (৬৯?) ১লা বৈশাখ কটকে এক অনুষ্ঠানে 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' এবং 'গুরু গুরু গুরু মেঘ ঘনমেঘ' গান ওড়িশি রীতিতে নৃত্যভাষায় (কোরিওগ্রাফিতে) উপস্থাপিত হয কুমকুম মহান্তির উপস্থাপনায়। এখানে গানের ভাষা ছিল বাংলা।

এর প্রায় দশবছর পরে দূরদর্শনে রবীন্দ্র জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের 'শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা' গানটি ওড়িশি নাট্যরীতিতে উপস্থাপিত হয়। শিল্পী ছিলেন কুমকুম মহান্তি। এতে ছিল নায়িকার ভাবনার দৃশ্য (সাদা শাড়ি পরে যা করা হয়)। সঙ্গে সঙ্গে ছিল একক

অভিনয় ও নাচ। কোরিওগ্রাফি করেন কেলুচরণ মহাপাত্র। গান গেয়েছিলেন ক্রপ্তি দাস। ওড়িশি রীতিতে নৃত্য ও অভিনয়ের এই দৃশ্যায়ন বিশেষ জনপ্রিয় হয়।

পশ্চিম বাংলার মানুষ ওড়িশী নৃত্যরীতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। কলকাতার মঞ্চে ওড়িশি রীতিতে রবীন্দ্রনাটকের অনুষ্ঠান হয় নিয়মিত। ওড়িশি নৃত্যরীতিতে 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের বিবরণ পত্রিকায় মুদ্রিত হয় তা দেওয়া হল —

EXCELLENT teamwork marked the dance drama 'Chitrangada' presented by Gunjan at Girish Manch. Usually, the princess of Manipur because of her warrior instincts is presented through the Manipuri "kalaripu" technique. Here the Odissi style was utilized Poushali Mukherjee's expertise stood her in good stead while depicting the tension of Surupa and Kurupa. Kurupa's courage and Surupa's romantic temperament found meaningful expression of the Odissi style.

Chitrangada was trained as a warrior to protect the country from invaders but her heart bled for her subjects. This image was the focal point of Poushali's interpretation of Kurupa Chitrangada. She made use of bold foot movements to highlight Kurupa's courage. In the final scene, Poushali dressed in bridal costumes sustained the bold touch with her footwork and hand movements.

Nandini Ghoshal as Surupa maintained the feminine charm of the beautiful princess. The warrior girl was transformed to a charismatic woman to attract the attention of Arjun. This change was depicted by pleasant body movements. The jumps and jerks heightened the mood.

It is difficult to come across a convincing Arjun because few can live up to the qualities of the epic hero. Pradipta Neogy, with his tall and sharp features, bold steps and stage personality, was an exception. Flashes of Kathakali while refusing the princess reflected the ego, but pleasure shot across his face while uniting with Surupa.

The range of voice in "Arjun bramhachari" was the most conspicuous element of Swagatalaksmi Dasgupta's singing. Sraboni Sen rendered "lajya lajya", with maturity. Songs of Arjun were presented by Alok Roychowdhury.

(The Statesman, Calcutta 12.9.97)

ওড়িশি রীতিতে আর এক অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হল —

সুছাঁদ নির্মিতি

ওড়িশি নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওড়িশি আশ্রম সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে তাঁদের চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। আবম্ভে সংবর্ধনা জানানো হল গুরু কেলচুরণ মহাপাত্রকে। গুরু গিরিধারী নায়েকের বিন্যাসে ও শিক্ষার্থীদের সমবেত পরিবেশনায় উপভোগ্য হয়ে ওঠে ওড়িশির পরিচিত পদগুলি।

সন্ধ্যার প্রধান অনুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য অবলম্বনে তিনকন্যা। 'চন্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা' আর 'শ্যামা'র সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত রূপের পরিবেশনে বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছিল এই তিন নারী চরিত্র। গুরু গিরিধারী নায়েক এই ধ্রুপদী

নৃত্যভঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন এমনই নৈপণ্যে যে ওড়িশির ব্যাকরণ বা প্রকরণ রবীন্দ্রনাটকীয়তাকে কোথাও ছাপিয়ে ওঠেনি। অথচ প্রস্ফুটিত হয়েছে এই নৃত্যের সমস্ত সৌন্দর্য। নাচে গানে আবহসঙ্গীতে সুছাঁদ নির্মিতি।

স্মরণীয় চরিত্রচিত্রণে ছিলেন অপর্ণা ফেটিং (মা), সমর্পিতা চন্দ (প্রকৃতি), তৃণা মিত্র (শ্যামা) ও গিরিধারী নায়েক (বজ্রসেন)। সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়ের উত্তীয় ও রোমি দাশগুপ্তের কুরূপাও ভাল। দুর্বল মালঞ্চ ঘোষের সুরূপা ও রেশমি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্জুন। প্রকৃতি ও শ্যামার গান চমৎকার গেয়েছেন রমা মন্ডল। তালবাদ্যে বিপ্লব মন্ডল ধরে রাখেন সমস্ত মেজাজ ও গতি। (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬.১০.৯৬)

নৃত্যশিল্পের অনন্য প্রতিভা সংযুক্তা পাণিগ্রাহী 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শ্যামার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৮৮ র আগস্টে কলকাতার রবীন্দ্রসদনে কিংশুক গোষ্ঠীর উদ্যোগে 'শ্যামা'র উপস্থাপনা কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতে বিশেষ আলেচ্য হয়ে উঠেছিল প্রধানত দুটি কারণে। একটি ওড়িশি নৃত্যশৈলীর অনন্যা শিল্পী সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর শ্যামার ভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ, অন্যটি দীর্ঘদিন পর সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দোপাধ্যায় জুটির উপস্থিতি। সামগ্রিকভাবে আনুষ্ঠান হয়ত দর্শকের চাহিদাকে পূরণ করতে পারেনি, শ্যামার চরিত্রের গভীরতা সংযুক্তা কতটা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তা নিয়েও মতভেদ আছে। তবু ''কখনো খাজুরাহো কখনো বা কোনারকের মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর অঙ্গবিভঙ্গে। কোটালের ভূমিকায় শিবশঙ্কর ছিলেন যথার্থ। কথাকলির আঙ্গিক প্রয়োগে তার চরিত্র রূপায়ণ সার্থক। ..... শ্যামার সখীরা এবং সহচরী সকলেই প্রত্যাশিত ওড়িশীর আঙ্গিকে রূপসৃষ্টিতে প্রয়াসী ছিলেন''। (সুভাষ চৌধুরী, দেশ, ১.১০.৮৮)

(৫) শরৎচন্দ্র ও ওড়িয়া নাটক

সাধারণভাবে শরৎচন্দ্র ওড়িয়া মানুষদের কাছে প্রিয়, তাঁর উপন্যাস ওড়িশাতে সমাদৃত হয়েছে। আমাদের কালে শরৎচন্দ্রের কি মূল্য তা সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন শ্রী বিধুভূষণ দাস মহাশয় তাঁর 'শরৎচন্দ্র — আম সময়র পরিপ্রেক্ষিরে'[৩২] প্রবন্ধে। সুরেন্দ্র মহান্তি বলেছেন যে 'জনে খ্যাতিসম্পন্ন লেখক রূপে আজি শরৎচন্দ্র কেবল বঙ্গদেশরে সীমাবদ্ধ নুহঁন্তু'।[৩৩]

শরৎচন্দ্রের প্রভাব বা প্রেরণা ওড়িয়া নাট্যসাহিত্যে অনুভূত হয়। পারিবারিক ঐক্যবদ্ধ একান্নবর্তী জীবনের প্রতিষ্ঠা প্রয়াস, চরিত্রচিত্রণ নারী হৃদয়ের বিশ্লেষণ, নটী ও পতিতা নারীর সৎ সুন্দর হৃদয়ের উদ্ভাস ইত্যাদি শরত সাহিত্যের বিশিষ্টতাগুলো ওড়িয়া নাটকে দেখা গেছে। গোপাল ছোটরায় 'রামের সুমতি' কে নাটকে রূপায়িত করেছেন 'নুয়া বৌ' নামে। তাঁর 'শঙ্খা সিন্দুর' নাটকে মাধবী এক পতিতার মেয়ে কিন্তু সুগায়িকা নৃত্যনিপুণা। পতিতা মেয়ে হলেও শুদ্ধ সচ্চরিত্র। শেষ পর্যন্ত সমাজ তাকে মেনে নেয়। কালীচরণ পট্টনায়কের 'পরিবর্তন' নাটকেও 'উষা' এক পতিতা রমণী। কিন্তু নারীত্বে কল্যাণময়তায় সে অপরূপ। এরা যেন রাজলক্ষ্মী বা চন্দ্রমুখীর মত। 'রামের সুমতি' অবলম্বনে অনেকে নাটক লিখেছেন।

ভঞ্জকিশোর পট্টনায়ক 'শিকারী' নাটকের মধ্যে বলেছেন যে নারী গণিকা হয়ে জন্মায় না, সমাজ সতী সাধ্বী নারীকে গণিকা সাজিয়ে নরকের দিকে ঠেলে দেয়। যদিও নারী জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা সে বধূ হবে, জায়া হবে, জননী হবে। সতীত্ব ও দেবীত্ব প্রত্যেক নারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত। ভঞ্জকিশোরের 'বৈরাগীর সংসার' অবিভক্ত পরিবারের মনোজ্ঞ

চিত্র। সংসারের সমূহ কল্যাণের জন্য ছোট ভাই বিভূতির ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ দর্শক ও পাঠকের চিত্ত আলোড়িত করে। এরা অনিবার্যভাবে শরৎচন্দ্রকে মনে করায়।

রামচন্দ্র মিশ্র-র 'ভাই-ভাউজ' (দাদা বৌদি) নাটকে গ্রামের দলাদলির কথা আছে। দেওর বৌদি সম্পর্কেও চিত্রণও এখানে পাওয়া যায়। ওড়িয়া নাটকের এই সব ভাবনা বা প্রবণতা হয়ত সদাই শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব নয়। তবে শরৎচন্দ্রের অনুপ্রাণনা থাকা সম্ভব। অন্তত এই জীবন ও সংস্কৃতির একত্ব ও সমরূপতা এদের মধ্যে স্পষ্ট। ওড়িয়াতে শরৎচন্দ্রের নাটক খুব বেশী অভিনীত হয়নি। ডঃ খগেশ্বর মহাপাত্র তখন বলাঙ্গী রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি 'দত্তা' নাটকটি অনুবাদ করেন ও সেটি অভিনীত হয় ১৯৫৯ সালে। অনুবাদ ও অভিনয় দুই-ই হয়েছিল সুন্দর।

কলকাতায় ১৯৮৬ তে ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার উদ্যেগে শরৎ নাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে শ্রীকান্ত উপন্যাসের এক অংশ 'নতুন দা' ওড়িয়াতে উপস্থাপিত হয়, শিল্পী সাফল্য কুমার নন্দী "নতুন দা-র চরিত্র রূপায়ণে বিশেষ দক্ষতা দেখান"।[৩৪] গণশক্তি জানালেন — "শ্রীকান্ত থেকে নতুনদার কাহিনী ওড়িয়া ভাষায় 'নুয়া ভাই' অভিনয় হয়।"[৩৫]

৬. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ওড়িয়া নাটক

ক. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ওড়িয়াতে

ওড়িয়া গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম শিল্পী কালীচরণ পট্টনায়ক রচিত 'ভাত' নাটকটির সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' নাটকের সমরূপতা পাওয়া যায়। একই পটভূমি পরিবেশ উভয়কেই নাট্যরচনায় ব্রতী করেছিল যাতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। কালীচরণ পট্টনায়ক রচিত 'চক্রী' ওড়িয়া পৌরাণিক নাটকের ধারায় নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করেছে। ঐ নাটকটি বাংলা দ্বারা প্রভাবিত — "কেবল পরিবর্তিত নাম ও নূতন সংগীত যাই এহা বঙ্গলা 'পার্থসারথী' র ওড়িয়া সংস্করণ। এ পরিকি সমস্ত সংলাপ এক প্রকার আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র।"[৩৬] কার্তিক কুমার ঘোষের 'মাতৃপূজা' নাটকের ওপর বাংলা ফুল্লরা কালকেতুর কাহিনীর প্রভাব আছে।

কার্তিক কুমার ঘোষের বিভিন্ন নাটকের সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য আছে। তাঁর 'বারবধূ' সুবোধ ঘোষের মত না হলেও বক্তব্যে তাদের মিল আছে। যদিও লেখক তার নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন যে "কলিকাতারে চলিথিবা এহী নামীয় নাটক 'বারবধূ' মুঁ দেখি নাহিঁ — সুতরাং নাটকর কৌণষি প্রকার প্রভাব মোর লেখা ভিতরে প্রকাশ পাই নাহিঁ।" বাংলা নাটকে দেখানো হয়েছে এক বারনারী ভাল হতে চেয়েছিল, সতীত্ব নারীত্বের রূপ উপলব্ধি করে সৎ জীবনে ফিরতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তা পারেনি, তার স্বপ্ন ব্যর্থ হয় — ওড়িয়া নাটকে দেখানো হয়েছে এক গৃহবধূ পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে বারবধূতে পরিণত হয়।

কার্তিককুমার ঘোষের 'পি ডবলিউ ডি' জলধর চট্টোপাধ্যায়ের ঐ নামীয় বাংলা নাটকের ওড়িয়া রূপান্তর। নাট্যকার বলেছেন — "বঙ্গ রঙ্গমঞ্চর চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী নাটক 'পি ডবলিউ ডি'কু কেতেক পরিবর্তন সহ আমর মঞ্চ উপযোগী করিথিলি।"[৩৭]

বাংলায় অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'কর্ণার্জুন' লিখেছিলেন কয়েক দশক আগে। এই নাটক আর্ট থিয়েটার কর্তৃক স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনী ১৫ আষাঢ় ১৩৩০। তারপর এ নাটক বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ১৯৫৫ সালে সুবোধ দাস

ওড়িয়ায় লেখেন 'কর্ণার্জুন' যে নাটক বাংলা নাটকের সম্পূর্ণ অনুকরণ। বক্তব্যে, বিষয়ে, ভাষায় ওড়িয়া নাটকটি বাংলার কাছে সম্পূর্ণ ঋণী।

বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'বিশ বছর আগে' ওড়িয়া ভাষায় রূপান্তর করেন ডঃ খগেশ্বর মহাপাত্র 'কোড়িয়ে বর্ষ তলে' নামে। এই নাটক অভিনয় করে রাজেন্দ্র কলেজ বলাঙ্গীর ছাত্রছাত্রীরা ১৯৬০ সালে। পাবলিক স্টেজে টিকিট বিক্রী করে এর মঞ্চায়ন হয়।

ভগবান নায়ক বর্মা রচিত 'চিরন্তনী' ছটি ছোট নাটকের সংকলন — অঙ্গীকার, পরিচয়, তাপসিকা, পরাজয়, আকর্ষণ ও শেষ অভিসার। এই নাটকগুলির উৎস সুবোধ ঘোষের মহাভারত-এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত বিভিন্ন গল্প। নাট্যকার সেই প্রসঙ্গে জানিয়ে দেন — "এথিরে সন্নিবেশিত ছঅটি যাক ছোট নাটক কালজয়ী মহাকাব্য মহাভারতরু সংগৃহীত। বঙ্গলার মনীষী কথাকার শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ নিজর চমৎকার কলা-নৈপুণ্যরে এহি প্রণয়ভিত্তিক কহানী গুড়িকর যেউঁ অপূর্ব পুনর্বিন্যাস করিছন্তি, তাহাহিঁ এ নাটকগুড়িকর আধার ও আধেয়। অবশ্য কেতেক স্থলরে মুঁ আবশ্যকীয় নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিবা সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন চরিত্র মধ্য সংযোগ করিছি।"[৩৮]

তরুণ রায়ের "এক পেয়ালা কফি" ওড়িয়াতে রূপান্তরিত করেন অসীম বসু 'কপে কফি' নামে, নাটকটি মঞ্চস্থ করে ইউনাইটেড আর্টিস্টস। মনোজ মিত্রর নাটক ওড়িয়ায় অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে। ভুবনেশ্বরের প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা 'শতাব্দীর কলাকার' মনোজ মিত্রের তিনটি নাটকের অভিনয় করে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাদের নাট্যোৎসবে। 'সাজানো বাগান' অনুবাদ করেন ধীর মল্লিক পরিবর্তিত নাম 'বাঞ্ছার বাগিচা', পরিচালক দর্পনারায়ণ সেথি। 'মেষ ও রাক্ষস' — অনুবাদক ধীর মল্লিক, রূপান্তরিত নাম 'মেন্ধা', পরিচালক বৃন্দাবন বারিক। 'চাক ভাঙা মধু' অনুবাদ করেন উদয় নাথ সুতর 'মহুমাছি' নামে যার পরিচালনায় ছিলেন দর্পনারায়ণ সেথি। তিনটি নাটকই বিশেষ সমাদর লাভ করে। মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার' প্রযোজনা করে টেকনো আর্টস রাউরকেলা 'নরকরে চহড় পড়িছি' (নরকে সাড়া পড়েছে) নামে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়-এর 'মহাকালীর বাচ্ছা' শতাব্দীর কলাকার অভিনয় করে আশির সূচনাতেই। ওড়িয়া অনুবাদ — রমাকান্ত ব্যানার্জি। লু সুনের চীনা ছোট গল্প অবলম্বনে অমল রায় নাটক লিখেছেন 'ক্রীতদাস' যে নাটক ওড়িয়াতে রূপান্তরিত করেন ধীর মল্লিক যাঁর পরিচালনায় এটি অভিনীতও হয়েছে।

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' ওড়িয়ায় অনূদিত হয়েছে 'রূপান্তর' নামে। বিখ্যাত অভিনেতা ও শিল্পী অসীম কুমার বসু এটা অনুবাদ করেন, ভুবনেশ্বরের 'রবীন্দ্র মণ্ডপ'-এ এটি অভিনীত হয়।

আধুনিক ওড়িয়া নাট্যকারদের ওপর বাংলা সাহিত্য কখনো কখনো ছায়া বিস্তার করেছে। বিজয় মিশ্রর 'জননী' নাটকের ওপর নীহার রঞ্জন গুপ্তর 'মায়ামৃগ' র ছায়া আছে। তাঁর 'অসত্য শহর' নাটককে অনুপ্রাণিত করেছে বাংলা 'মেঘে ঢাকা তারা'। কার্তিক চন্দ্র রথ রচিত 'বহ্নিমান' স্মরণ করায় বাংলা 'মারীচ সংবাদ'কে।

গোপাল দের 'বিপ্লবর জীবাণু' নাটকের ওপর অচিন্ত্য কুমার সাঁতরার বাংলা ছোট গল্প 'দুর্ভিক্ষ' র প্রভাব আছে। ক্ষুধার জ্বালায় এক অভাগিনী মা তার সন্তানকে পুড়িয়ে খায় — এই নির্মম সংবাদের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে বাংলা গল্প, ওড়িয়া নাটকে সেই বক্তব্যকেই রূপ দেওয়া হয়েছে। গোপাল দের বিভিন্ন বাংলা নাটক ওড়িয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে ও তাদের অভিনয়ও হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। 'অপমৃত্যু গুলোর সংকল্প' হয়েছে

'অপমৃত্যুমানঙ্কর সংকল্প', 'আটক ঘর' হয়েছে 'আটক ঘর', 'ঈশ্বর ফিরে যাও' এর ওড়িয়া নামান্তর 'ঈশ্বর ফেরি যাও'। কটকের 'দি থিয়েটার' বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন বাংলা থেকে ওড়িয়ায় অনুবাদ করে। সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন' ওড়িয়াতে অনুবাদ করেন জাসটিস নবকুমার দাস। এটি প্রথম উপস্থাপিত হয় কলাবিকাশ কেন্দ্রে ১৯৮০ সালে পুরঞ্জন রায়ের পরিচালনায় যার সঙ্গে অভিনয়ে বিশেষ ভূমিকা নেন অলকা রায়।

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ফিংগার প্রিন্ট' অনুবাদ করেন নবকুমার দাস, পরিচালনা করেন পুরঞ্জন রায়। ম্যাকসিম গোর্কীর 'মাদার' উপন্যাসের দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় কৃত বাংলা নাট্যরূপ এবং উৎপল দত্তর 'মে দিবস' একাঙ্ক অবলম্বনে ওড়িয়া নাটক 'মা' রচনা করেন পুরঞ্জন রায় যার পরিচালনায় এটি অভিনীতও হয় মহা সমারোহে ১৯৮৫ সালে কলাবিকাশ কেন্দ্রে ও অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন-এর কনফারেন্সে শহীদ ভবনে। মা-র ভূমিকায় অলকা রায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর 'দুঃসময়' নাটকের অংশ ওড়িয়ায় অনুবাদ করেছেন সাফল্য কুমার নন্দী।

খ. সাম্প্রতিক ওড়িয়া নাটক বাংলায়

ওড়িয়া নাটক বাংলায় তুলনামূলক ভাবে স্বল্প সংখ্যক অনূদিত বা অভিনীত হলেও মর্যাদায় তা কম নয়। ওড়িয়া নাটক বিভিন্ন ভাবেই বাংলা নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে বাংলা ও ওড়িয়া নাটক ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে।

আশ্বিনী কুমার ঘোষের ওড়িয়া নাটক বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর 'শ্রীমন্দির' নাটকটি 'পুরী মন্দির' নামে বাংলায় অভিনীত হয়। "তাঙ্কর 'শ্রীমন্দির'কু 'পুরী মন্দির' নামকরণরে বাংলা অনুবাদ করি স্টার থিয়েটার বহুদিন চলাইলে।"[৩১] এটা চারের দশকে হয়।

ওড়িয়া থেকে বাংলায় অনুবাদ সাম্প্রতিককালেই বিশেষভাবে দেখা যায়। মনোরঞ্জন দাসের বিভিন্ন নাটক বাংলায় অনূদিত হয়েছে, অভিনীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক পুরস্কৃত 'অরণ্যফসল' সুন্দর অনুবাদ করেছেন অরবিন্দ পালিত, প্রকাশিত হয়েছে 'বহুরূপী' পত্রিকায় (১৯৭৭)। মনোরঞ্জন দাসের 'কাঠঘোড়া' অনুবাদ করেন প্রকাশ নন্দী, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৭৪) সনে। মনোরঞ্জনের 'বনহংসী' অনুবাদ করেন অরবিন্দ পালিত (১৯৮১)। মনোরঞ্জন দাসের 'শব্দলিপি' বাংলায় অনুবাদ করেন গোপাল দে এটি ১৯৭৭ সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। নতুনরীতির এই নাটক থিয়েটার সেন্টার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন ১৯৮৪ সালে। নাটক ও তার প্রযোজনা সম্বন্ধে সমালোচকের মতামত উল্লেখ করা হল।[৪০]

বোধের নাটক শব্দলিপি

নাটক শুরুর আগে থিয়েটার সেন্টারের প্রাণপুরুষ তরুণ রায় বললেন, আজ যাদের নাটক দেখবেন, তারা বর্তমান প্রজন্মের মানুষ, তাই ভাবনাচিন্তা ও প্রযোগে এদের সঙ্গে আমার যোজন দূরত্ব, সত্যি বলছি, এদের নাটক আমি ঠিক বুঝিও না। সেই জেনারেশন গ্যাপ আর কী। তবে আজকের নাটকের লেখক বিখ্যাত ওড়িয়া সাহিত্যিক অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রী মনোরঞ্জন দাস। তিনি এ নাটকটি দেখে গেছেন এবং খুশী হয়ে তাঁর দেশে অভিনয়ের আমন্ত্রণও জানিয়ে গেছেন।

অবশ্য 'শব্দলিপি' দেখে মনে হোল, এ কাহিনী আমাদের অজানা নয়। শুধু প্রয়োগ, ভাবনার প্রকাশ এবং গল্প বলার মোড়ক বা রীতিটি আলাদা। তবে একটি রিয়ালিস্টিক কাহিনীকে ফ্যান্টাসিধর্মী করে তোলার মধ্যে যে মুনশিয়ানা আশা করা যায়, বলতে কী এ নাটকে তা আছে। একটি দাঙ্গায় বাবা-মাহারা অজ্ঞাত পরিচিত মেয়েকে (নাম সীতা। ইনি ধরিত্রী হতেও বাধা নেই) ঘিরে তার পালক পিতা, সৎ প্রেমিক, অসৎ নায়ক (যে দশ বছর বয়সে বাড়ি থেকে বিতাড়িত এবং আঠারো বছর পরে অন্য রূপে সংসারে ফিরে এসেছে এবং মেয়েটির প্রেমকে খুন করে, তার ওপর শারীরিক দখল খাটিয়ে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করিয়েছে) এবং দুটি প্রতীক চরিত্র এ নাটকের কুশীলব হলেও নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন, যে শব্দ জীবন এবং গতির নিয়ামক, বেঁচে থাকার সহায়ক, সেই আবার মানুষের প্রধান শত্রু। শব্দ এখানে বোধ হয় বোধেরও পরিপূরক। এবং অনিবার্যভাবেই রিপুরও। এটি নাট্যকারেরই যোগ্যতার পরিচায়ক। এ নাটকে যেমন জীবনে প্রতিবিম্বিত জটিলতার কথা আছে, তেমনি আবার কল্পরূপে উত্তরণের কথাও। এবং সেটা প্রথম এবং শেষ দৃশ্য, এবং প্রতিটি দৃশ্যের প্রারম্ভে কল্পকের বীজ বোনা, পরাহ্নে সেই বীজ খুশী মনে মাঠ থেকে তুলতে গিয়ে আঘাত প্রাপ্তির রূপকে মুড়ে। এতে টোটাল লাইফ সবটা অনুপস্থিত থাকলেও, মানুষের শব্দ ব্রহ্মরূপকল্প এবং সততা নিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে বেঁচে থাকার মন্ত্র নিহিত আছে, নাটকের সর্থকতা এখানেই। ভাবায় এবং মনও ভরায়। (সেক্স নিয়ে স্পষ্ট সংলাপ এবং রেপিং-এর দৃশ্য পরিকল্পনাটি অবশ্যই দুঃসাহসিক) নাটকের টোটল টিমওয়ার্কই চমৎকার (অথচ এরা সবাই একরকম নতুন পথিকই নাট্যজগতে)। তবু বিস্মিত হয়ে দেখতে হয় নায়িকা স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়। বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি রীতিমত আত্মবিশ্বাস নিয়ে আগাগোড়া অভিনয়(?) করে গেছেন। এবং সেই সঙ্গে বিজয় দেবনাথ ও প্রণব ভট্টাচার্য (নির্দেশক)। বাকি চরিত্রে মানব ঘোষ, অমিত ভট্টাচার্য আর সাধন বাগচীও। এবং এ নাটকটির দৃশ্য বদল, সঙ্গীত, আলো, হরবোলা এবং চমৎকার শব্দক্ষেপণে যথাক্রমে সঞ্জয় দাস, সন্দীপ দাস, শিবব্রত কর্মকার, বিমল দাস, স্বরূপ বসু, সুনীল আদক, মদন দাস যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।[৪০]

বিজয় মিশ্র রচিত 'শববাহকমানে' বাংলায় অনুবাদ করেন অসীম বসু, নতুন নাম 'শববাহকেরা'। এই নাটক রবীন্দ্র মন্ডপ ভুবনেশ্বরে অভিনয় করে মিলনী সংঘ।

গোপাল দে-র 'অস্ত্রের নাম টিকে থাকা' নাটকটি তারই ওড়িয়া নাটকের বাংলা রূপান্তর। এটি 'ভারতীয় একাঙ্ক গুচ্ছ' সংকলনের অন্তর্গত।

প্রখ্যাত ওড়িয়া গল্পকার ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী রচিত 'শিকার' গল্পটি বাংলা সহিত্য-সাস্কৃতিকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এই গল্প বাংলায় অনূদিত হয়েছে। মৃণাল সেন এই গল্প অবলম্বনে ফিল্ম করেছেন 'মৃগয়া'। বাংলা মঞ্চে এই কাহিনী এসেছে অনেকবার। 'শিকার' গল্পটি 'ইনাম' নামে অভিনয় করে রূপায়িত করেন 'অনির্বাণ' গোষ্ঠী, নাট্যরূপ ও নির্দেশনা চঞ্চল ভট্টাচার্য-র। 'শিকার' নামে একে মঞ্চস্থ করেন 'নাটকীয়', রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন জহর দাশগুপ্ত। শেষ নাটকটি সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মতামত করা যাক—

"সরল আদিবাসী যুবক ঘিনুয়া জানোয়ার শিকার করে তার কাটামুণ্ড ডেপুটি কমিশানরের কাছে নিয়ে আসে। সাহেব তাকে প্রচুর বক্‌শিস দেন কারণ, সে বন্য জন্তুর হাত থেকে ফসল এবং তার জাতভাইদের বাঁচানোর দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছে। ঘিনুয়া

একদিন নিয়ে এল আরো বড় শিকার — মানুষ। যে তাদের মারে তিলে তিলে। তাদের বৌ-ঝিদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করে। বন্য-সরল ঘিনুয়া এই ভয়ংকর জীবটিকে হত্যা করার জন্য মোটা বক্‌শিস আশা করে। তা সে পেলও — মৃত্যুদন্ড। এই কাহিনী নিয়েই ৯ সেপ্টেম্বর (১৯৮৫) সন্ধ্যায় বালি হাওড়ার দল নাটকীয় নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট, পূর্বরেলের মঞ্চে অভিনয় করলেন নাটক 'শিকার'। ওড়িয়া ভাষায় মূল কাহিনী ভগবতী পাণিগ্রাহী, নাট্যরূপ ও নির্দেশনা জহর দাশগুপ্ত। .... ঘিনুয়ার চরিত্রে শোভন সাউ ভাল অভিনয় করেছেন ....। নাটকের শেষ দৃশ্যটি যেখানে ঘিনুয়ার ফাঁসী হচ্ছে, সেটিকে প্রয়োগ নৈপুণ্যে আরও সুন্দর করাবার অবকাশ আছে।"[৪১]

বিশিষ্ট নাট্যকার প্রাণবন্ধু কর রচিত 'শ্বেতপদ্মা' নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন অরবিন্দ পালিত। ১৯৮১ তে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বামাচরণ মিত্র ওড়িয়ার এক খ্যাত লেখক। তার ওড়িয়া নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছেন অমিয় চক্রবর্তী — 'বিজ্ঞানীর বিয়ে'। অনুবাদ পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ দাস রচিত 'বিষন্ন পৃথিবী' নাটকে অ্যাবসার্ডধর্মী ভাবনায় মানুষের রক্তাক্ত মনের আর্তনাদ শোনা যায়। নাটকটি সুন্দর অনুবাদ করেছেন আশিস মুখোপাধ্যায়। এটি বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জগন্নাথ প্রসাদ দাস আধুনিক সময়ের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। তাঁর নাটক বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাতেও তার বিভিন্ন নাটক অনূদিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। তাঁর 'সূর্যাস্ত পূর্বরু' শিবশেখর সরকার অনুবাদ করেন 'সূর্যাস্তের আগে' নামে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে। এই নাটকের কলকাতায় অভিনয়ও হয়। 'সূর্যাস্ত পূর্বরু' বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জীবন কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় অনুবাদ করেন, 'সূর্যাস্ত' নামে সেটি বিশ্বভারতীর ওড়িয়া বিভাগের প্রযোজনায় অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ নেন বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা।

জগন্নাথ প্রসাদ দাসের 'সবশেষ লোক' শিবশেখর সরকার অনুবাদ করেন 'সর্বশেষের মানুষ' নামে। নাটকটি 'নাট্যদর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জগন্নাথ প্রসাদের 'পূর্বরাগ' অনুবাদিত হয় 'পণের ঘোড়া' নামে, অনুবাদক দিলীপ কুমার মিত্র। কলকাতায় আয়োজিত ভারতীয় নাট্য সম্মেলনে ১৯৮৫ সালে এটি অভিনীত হয়। "জগন্নাথ প্রসাদ দাসের 'পণের ঘোড়া'য় ব্যঙ্গ কৌতুকের মাধ্যমে পণ প্রথার রূপকে তুলে ধরা হয়েছে। একে সফল মঞ্চস্থ করেন শাশ্বত ভদ্রর পরিচালনায় দেবাশিস দাস, অঞ্জন গুপ্ত, অমিত দাস, রঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ নিষঙ্গীন গোষ্ঠীর দক্ষ শিল্পীরা।"[৪২]

কটকের বীণাপাণি ক্লাবের দুর্গাপূজার আসরে কার্তিক চন্দ্র রথর 'সংসার ফুল' বাংলা অনুবাদ করে মঞ্চস্থ হয়। অনুবাদ শ্যামল ঘোষ। তার 'তৃতীয় পৃথিবী'ও বাংলায় অনুবাদ করেন শ্যামল ঘোষ। এটিও মঞ্চস্থ হয়। শ্রীরথর 'ঈশ্বর জনে যুবক' নাটকও বাংলায় অনূদিত হয়েছে ও মঞ্চস্থ হয়েছে কটকে।

কার্তিক চন্দ্র রথ রচিত 'শুক সারী কথা' নাটকটি বাংলায় রূপান্তরিত করেন সাফল্য কুমার নন্দী ও স্বপ্না মজুমদার 'পাঁচুর পাঁচালী' নামে এবং এটি ন্যাশানাল লাইব্রেরী স্পোর্টস এন্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনয় করে ন্যাশনাল লাইব্রেরী মঞ্চে ১৯৮৭র ২৭ জুলাই। নাটকটি রসিকজনের অভিনন্দন লাভ করে।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর প্রয়াণের পর ১৫ জুন ১৯৯১ কলকাতায় এক সাহিত্যসভার আয়োজন করা হয় ড্রামা একাডেমী ইন্ডিয়ার উদ্যোগে। সেখানে কালিন্দীচরণ রচনা পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে কালিন্দীচরণের আসাধারণ উপন্যাস 'মাটির মণিষ' বাংলায়

শ্রুতিনাটকরূপে পরিবেশিত হয়। নাটক — দিলীপ কুমার মিত্র। ওড়িশা তথা ভারতীয় গ্রামজীবনের এই অনন্য চিত্র মানুষদের মুগ্ধ করে।

বাংলায় ওড়িয়া নাট্যচর্চা আজও অব্যাহত। প্রখ্যাত লেখিকা বীণাপাণি মহান্তি-র ছোটগল্প 'তটিনীর তৃষ্ণা' নাটকে রূপান্তরিত করেছেন নিরূপ মিত্র এবং সেটি পরিবেশন করেন সীমিকা রায় ও কুনাল সেনগুপ্ত ২০০০ সালে কলকাতায়। মনোরঞ্জন দাসের অসাধারণ নাটক 'নন্দিকা কেশরী' (কিছু অংশ) বাংলায় অনুবাদ করেছেন সাফল্য কুমার নন্দী। কলকাতা দূরদর্শন আয়োজিত আধুনিক ভারতীয় নাটক বিষয়ে আলোচনায় 'নন্দিকা কেশরী'র অংশ বিশেষ বাংলায় পরিবেশন করেন সুদেষ্ণা দাস ও অভিজিৎ গাইন উৎকৃষ্ট ভারতীয় নাটকের নিদর্শনরূপে।

সূত্র পরিচিতি

১. Indian Literature since Independence. Ed K R.S. Iyenger (article — Oriya, Surendra Mahanti, p. 214), New Delhi, 1973.
২. 'A song from Pandit Misra's Purushottam Dev could be the marching song of any victorious army returning from the battle field.' — History of Oriya Literature, Dr. Mayadhar Mansinha, p. 224–225, New Delhi, 1962.
৩. Indian Litrerature, Sahitya Akademi (article — Oriya Drama, Gopal Chandra Misra, p. 120), New Delhi, April-Sept. 1958.
৪. ভারত সন্ধানে, জহরলাল নেহরু, অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়, পৃঃ ২, কলিকাতা, ১৯৫০।
৫. যুগে যুগে নাট্য সাহিত্য, বীরকিশোর দাস, পৃঃ ৯৪, কটক, ১৯৬৫।
৬. Enact, Ed. R. Paul, Oriya Drama, Nandini Satpathy.
৭. ওড়িয়া নাটক ঔর রঙ্গমঞ্চ, নীলমণি মিশ্র, পৃঃ ৩৫, এলাহাবাদ, ১৯৭২।
৮. আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য, ডঃ নিত্যনন্দ শতপথী, পৃঃ ২০, কটক, ১৯৭৭।
৯. Indian Literature since Independence, Ed. K.R.S. Iyenger (article — Oriya, Surendra Mahanti, p. 217), New Delhi, 1973.
১০. Internation Theatre Souvenir, Ed. Bidhunathan Roul (article — The Play and the Playwright. Prof. Jatindra Mohan Mahanty), Bhuvaneswar, 1977.
১১. উত্তট নাট্য পরম্পরা, ডঃ রত্নাকর চইনি, পৃঃ ১৭৭, কটক, ১৯৮০।
১২. তদেব (প্রবন্ধ-রত্নাকর চাইনি, অধ্যাপক সনত দাস পট্টনায়ক ও বৈষ্ণবচরণ সামলা) পৃঃ ২০৮–২০৯।
১৩. তদেব, পৃঃ ২৩১-২৩২.
১৪. তদেব, পৃঃ ২৩৮-২৩৯.
১৫. তদেব, পৃঃ ২৫০-২৫১.
১৬. Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebration Vol. II, Ed. S.C. Sengupta (Rabindranath and Oriya Literature. Kalindi Charan Panigrahi, p. 108), Santiniketan
১৭. ওড়িয়া নাটক ঔর রঙ্গমঞ্চ, নীলমণি মিশ্র, পৃঃ ২৬, এলাহাবাদ, ১৯৭২।
১৮. অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ, ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৩, কলিকাতা, ১৯৬১।
১৯. শ্রী প্রতাপ নাটক, রাধামোহন রাজেন্দ্র দেব, ভূমিকা (ওড়িয়া নাটকরে ইতিহাসর প্রতিধ্বনি, ডঃ নীলাদ্রিভূষণ হরিচন্দন, পৃঃ ৩০৯, কটক ১৯৮২, উদ্ধৃত)
২০. ওড়িয়া নাটকরে ইতিহাসর প্রতিধ্বনি, ডঃ নীলাদ্রিভূষণ হরিচন্দন, কটক, ১৯৮২।

২১. তদেব, পৃঃ ২৫০,

২২. তদেব, পৃঃ ৩০৭,

২৩. তদেব, পৃঃ ৩০৮,

২৪. ময়ূর সিংহাসন, পূর্ণচন্দ্র কানুনগো, কটক, ১৯৭৫। এর অন্যান্য নাটকেও দ্বিজেন্দ্র প্রভাব আছে, যেমন 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত'র ওপর দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত'র প্রভাব আছে।

২৫. অশ্বিনীকুমার গ্রন্থাবলী (ভূমিকা-কলিচরণ পট্টনায়ক, পৃঃ জ) কটক, ১৯৬৩।

২৬. আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য, ডঃ নিত্যানন্দ শতপথী (গীতিনাট্যর কোতোটি চরিত্র, পৃঃ ৪০-৫০) কটক, ১৯৭৭।

২৭. ওড়িয়া নাট্য সাহিত্য, সর্বেশ্বর দাস, পৃঃ ২১২, ভুবনেশ্বর, ১৯৮১।

২৮. Natya, Tagore Issue (article — Dance dramas of Tagore. Dr. Charles Fabri, p. 12), New Delhi.

২৯. যুগান্তর, কলকাতা, ২২.৭.৮৫।

৩০. দেশ, কলকাতা, ৩.৮.৮৫।

৩১. Patriot, 25.5.87

৩২. The Golden Book of Saratchandra, All Bengal Sarat Centenary Committee, Calcutta, 1977.
(প্রবন্ধ — আম সময়র পরিপ্রেক্ষিরে, বিধুভূষণ দাস, পৃঃ ১৩৫)

৩৩. তদেব (প্রবন্ধ — শরৎচন্দ্র এক মূল্যায়ণ, সুরেন্দ্র মহান্তি, পৃঃ ৪৯)

৩৪. পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ৭.১১.৮৬

৩৫. গণশক্তি, কলকাতা, ৫.১২.৮৬

৩৬. ওড়িয়া নাটক ও নাট্যকার, নারায়ণ শতপথী, পৃঃ ৪০, গঞ্জাম ১৯৬৫।

৩৭. পি ডবলিউ ডি, কার্তিক কুমার ঘোষ, ভূমিকা, কটক, ১৯৬০।

৩৮. চিরন্তনী, ভগবান নায়ক বর্মা, ১৯৭২।

৩৯. অশ্বিনী কুমার গ্রন্থাবলী (ভূমিকা — কালিচরণ পট্টনায়ক, পৃঃ জ), কটক, ১৯৬৩।

৪০. দেশ, কলকাতা, ১৩.১০.৮৪

৪১. বর্তমান, কলকাতা, ৭.১১.৮৫

৪২. কালান্তর, কলকাতা, ১৮.৫.৮৪

নবম অধ্যায়

আধুনিক পঞ্জাবী নাটক

১. সূচনা পর্ব

সমৃদ্ধ-অতীত এক লোক ঐতিহ্যের পথ বেয়েই পঞ্জাবী নাটক আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছে। নৌটংকী নকল প্রভৃতি লোকনাট্য রীতিই পঞ্জাবে প্রচলিত ছিল। মোগল যুগে নাটক ইত্যাদি ললিত কলা নিষিদ্ধ হওয়ায় পঞ্জাবে তা গঠিত হয় নি। পরবর্তী কালে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর স্কুল - কলেজের ছাত্ররা ইংরেজী নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ভ্রাম্যমাণ পারসী থিয়েটার সংস্থাসমূহও প্রভাবিত করে নতুন শিল্পী মনকে। এদের প্রভাবে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ দিয়ে পঞ্জাবী নাটকের দুর্বার যাত্রা সুরু হয় আধুনিক সময়ে।

ড: চরণ সিং ১৮৯৯ সালে 'শকুন্তলা' পঞ্জাবীতে অনুবাদ করেন। তারপর মানসিং জজ (বিক্রমোর্বশী), প্রো: বহল ও প্যারা সিং 'ভোর' (মালবিকাগ্নিমিত্র), শমশের সিং অশোক (মুদ্রারাক্ষস) অনুবাদ রচনায় ব্রতী হন। শেক্সপীয়র অনুবাদ হতে সুরু করে। মোহন সিং বেদ (ভুল ভুলিয়া-কমেডি অফ এররস ১৯১১), অমর সিং (দেশদমন-ওথেলো), বলবন্ত সিং (দুখী রাজা-কিং লিয়র), নারায়ণ সিং (লাল বাদশাহ-ওথেলো) প্রমুখ এবিষয়ে কৃতিত্ব দেখান।

ভাই বীর সিং (১৮৭২-১৯৫৭) পঞ্জাবীতে প্রথম মৌলিক নাট্যকার রূপে সম্মানিত। বহু মুখী প্রতিভা সম্পন্ন লেখক ভাই বীর সিং ধর্ম চেতনায় মহৎ ছিলেন। তাঁর প্রথম ও বিশিষ্ট নাটক 'রাজা লখদাতা' (১৯২১) ধর্মের আদর্শ তুলে ধরে যদিও এর রীতি প্রাচীন পন্থী। অরুঢ় সিং (সুক্কা সমুন্দর), ভাই দিও সিং (১৮৫৩-১৯০১, রাজা প্রবোধ নাটক) বুধসিং (নার নভেলী, মুন্দ্রী চাল ১৯২৭, দামনী ১৯৩০), কৃপা সাগর মিশ্র (১৮৭৫-১৯৩৯, রণজীত সিং) প্রমুখ লেখকরাও নাটক লিখেছেন যদিও বিষয় চরিত্রচিত্রণ বা আঙ্গিক কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রাখেননি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পঞ্জাবী নাটক এক বিদেশিনী নারীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ফিলিপস আর্নেস্ট রিচার্ডস তাঁর স্ত্রী নোরা রিচার্ডসকে নিয়ে ভারতে আসেন ইংরাজীর অধ্যাপক হয়ে। নোরা রিচার্ডস ছিলেন বিদুষী মনস্বিনী এবং নাট্যানুরাগিনী। সে সময়ে পঞ্জাবে কলেজ ছাত্ররা শেক্সপীয়রের নাটক ইংরাজী বা উর্দু ভাষায় অভিনয় করত। নাটকের ভ্রাম্যমাণ দলগুলোও শেক্সপীয়রের বা ভারতীয় নাটক উর্দুতে অভিনয় করত। নোরা রিচার্ডস ছাত্রদের প্রেরণা দিলেন মৌলিক নাটক লিখতে। উদ্বুদ্ধ করলেন মাতৃভাষায় সৃষ্টি করতে। ডাবলিনের অ্যাবি থিয়েটারের আদর্শে তিনি শোনালেন নতুন কথা—'ভারতীয় জনগণের জন্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভারতীয় নাট্যকারদের লেখা ভারতীয় নাটক।' তাঁর বাণী ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করে। তিনি একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেন। ১৯১২ সালে প্রথম হন শান্তি স্বরূপ ভাটনগর

(পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিজ্ঞানী) 'কারামত' উর্দু নাটক লিখে। রোগ নির্ণয়ের প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন পদ্ধতির ওপর ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন এটি। পরবৎসর প্রথম হয় ঈশ্বর চন্দ্র নন্দার 'দুলহান' (বর)—সমাজের নির্মম প্রতিচ্ছবি। এই নাটকে দেখানো হয়েছে যে অর্থলোভী বাবা হুঁশিয়ার চাঁদ তার ছ বছরের মেয়ে লাজোর সঙ্গে বিয়ে দেবে এক বুড়োর কেননা তার আর এক মেয়ে মেলো বুড়োর সঙ্গে বিয়ের ঠিক হওয়ায় পালিয়েছে। তৃতীয় ও শেষ বছরের প্রতিযোগিতায় (১৯১৫) প্রথম হয় রাজিন্দার লাল সাহনীর 'দিনে দি বরাত' ও দ্বিতীয় হয় ঈশ্বর চন্দ্র নন্দার 'বেবে রাম ভজনী'। দুটো নাটকই সফল সামাজিক। শ্রীমতী নোরা রিচার্ডস এইভাবে পঞ্জাবী নাটকে এক অভিনব আবেগ উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। পঞ্জাবী নাট্যসাহিত্যে তিনিই প্রথম আধুনিকতার মন্ত্রবাণী দেন। আধুনিক অর্থে পঞ্জাবী নাটকের বীজ তিনি রোপন করেন।[১] উত্তরকাল তাঁর ঋণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

ঈশ্বর চন্দ্র নন্দা-ই (১৮৯২-১৯৬৬) আধুনিক পঞ্জাবী নাটকের প্রথম পুরুষ বলে অনেকে মনে করেন। 'পঞ্জাবী নাটক কা বাস্তবিক জন্মদাতা হম আই সি নন্দা কো হী কহ সকতে হ্যয়' (সন্তোষ গার্গী)।[২] বলা যায় তাঁর আগে পঞ্জাবী লেখা হলেও সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন নাটক এই প্রথম পাওয়া গেল। গুরচরণ সিং-এর মতে —'পঞ্জাবী সংস্কৃতি দে ইতিহাস বিচ আই সি নন্দা দা নাঁ তে স্থান হমেশা অমর তে অটল রহগা' (পঞ্জাবী নাটককার)।'

একদিকে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা ও অক্সফোর্ডের উচ্চশিক্ষা, অন্যদিকে মঞ্চাভিনয় ও নাটক রচনা — মিলিত হয়েছে আই সি নন্দার মধ্যে। নাটক তাঁর কাছে ছিল শিক্ষা ও সংস্কারের গণতান্ত্রিক মাধ্যম। নন্দার নাটকের বিষয় পরিচিত ঘটনাবলী থেকে আহৃত। তিনি প্রথম ধর্মীয় ও পৌরাণিকতার বন্ধন থেকে পঞ্জাবী নাটককে মুক্ত করেন, নিছক রোমান্টিকতা থেকেও। সমসাময়িক বিষয় থেকে তিনি উপাদান নিয়েছেন, সামাজিক অন্যায় দুর্নীতির ছবি তিনি এঁকেছেন এবং মুক্তির কথা-ও বলেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র নন্দার তিন অঙ্কের নাটক 'সুভদ্রা' (১৯২০) মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণী বিধবার দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ জীবনের চিত্র। সুভদ্রা বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়িতে অবর্ণনীয় অত্যাচার ভোগ করলে তার ভাই পরমানন্দ তাকে নিয়ে আসে ও বন্ধু সুন্দরলালের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। প্রচলিত নীতি নিয়মের স্পর্ধিত প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে নাটকে। 'বর-ঘর' (বা লিম্নী দা ব্যহ ১৯২৮) নাটকে প্রণয় ও বিবাহকে নিয়ে উচ্চ সমাজের লোভ লালসার চিত্র অঙ্কিত। 'মাঁ দা ডিপটী' এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের চিত্র যারা সর্বস্ব ব্যয় করে ছেলেকে শিক্ষিত করলেও এই সমাজে তার মূল্য হয় না। 'ইহ দুমনে' (এই অচ্ছুতরা ১৯২৯) পঞ্জাবে অস্পৃশ্যতার ভয়াবহ চিত্র। 'জিন' (ভূত ১৯৩২) কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের ছবি। 'বেইমান' একাঙ্কেও তথাকথিত উঁচু সমাজের লোভ ও নীচতার চিত্র আঁকা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র নন্দার শেষ দিকে নাটক 'সোসাল সারকেল' (১৯৫৩) শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সমাজের নিপুণ চিত্র। তাঁর 'শামু শাহ' নাটক মার্চেন্ট অফ ভেনিসের সার্থক পঞ্জাবী রূপান্তর—প্রায় নতুন রূপ।

পঞ্জাবী নাটকে নন্দাজীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যরচনা, অভিনয়, নির্দেশনা তিন ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক। তাঁর নাটক ও চরিত্রায়ণে সমকালীন পঞ্জাবী সমাজ পূর্ণ বিধৃত হয়েছে। এইরকম জীবন্ত চরিত্র পঞ্জাবী নাটকে আগে আসেনি। সুদখোর শাহু, পাষণ্ডী সাধু, ঘরভাঙ্গা গৃহস্থ, বাল্যবিবাহের বলি অসহায় মেয়ে, ইংরাজী সাহেবীয়ানা বাবু, ঘুষখোর অফিসার, শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষক — প্রত্যেকে নাটকে জীবন্ত। নন্দাজীর

মূল্যায়নে ডঃ হরচরণ সিং বলেছেন, 'নাট্যকার রূপে নন্দার সার্থকতার মূলে আছে অনেক কিছু - যেমন বাকরীতি ও প্রকাশভঙ্গীর লক্ষণীয় শুদ্ধতা, তাঁর নাটকের মঞ্চোপযোগিতা, বক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়বস্তু চরিত্র ও সংলাপের নির্বাচন এবং প্লটের একমুখী ও স্বাভাবিক গঠন।'[৪]

২. প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব

প্রকৃতপক্ষে তিন দশকের শেষের দিকে পঞ্জাবী নাটকে দুর্বার বলিষ্ঠ আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটল। সন্ত সিং সেখোঁ, হরচরণ সিং, বলবন্ত গার্গী, গুরদয়াল সিং খোলসা প্রমুখ নাট্যকার নুতনতর ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে জটিল-দুর্গম মানবজীবনেব দুরবগাহ গভীরতা ও বিচিত্র বিস্ময়কে তাঁরা মেলালেন।[৫] তখন শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, অত্যাচারী বর্বর ভয়ঙ্কর শক্তির বিরুদ্ধে দুর্দম প্রতিবাদ ঘোষণা করছে সভ্য মানুষ। ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে স্বাধীনতার সংগ্রাম : দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষ ইংরাজ বিতাড়ণের মারণ যজ্ঞে মেতে উঠেছে, লক্ষ কন্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জন আছড়ে পড়ছে—ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো। সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব আসন্ন ও অনিবার্য হয়ে উঠেছে—দিকে দিকে জেগে উঠছে শোষিত নিপীড়িত সর্বহারা মানুষ, আকাশে আকাশে ধ্রুবতাবায় কারা বিদ্রোহে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছে, রক্তে রক্তে লাল হয়ে উঠছে পূর্বকোণ। পঞ্চাবের সচেতন নাট্যকার তাঁদের রক্তে এই ঝড়ের মাতন অনুভব করেছেন, পররাজ্যবাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের ক্রোধ ঝলসে উঠেছে, অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতিরোধ তারা উদ্দীপ্ত হয়েছেন এবং ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণায় মার্কসবাদের প্রত্যয়ে শাসন শোষণ-মুক্ত নতুন সমাজ গঠন করতে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন। সারা ভারতের সঙ্গে সমতা রেখে তৃতীয় দশকেই পঞ্জাবে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের আবির্ভাব ঘটে—পঞ্জাবী নাট্যকারগণ তারই প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হন যা গণনাট্য সঙ্ঘের আন্দোলনে পূর্ণতা পায়।[৬]

পঞ্জাবে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও গণনাট্য সঙ্ঘের নাটক ও নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে পঞ্জাব গণনাট্য সঙ্ঘের বিবরণী উল্লেখ্য যেখানে বলা হয়েছে পঞ্জাবের ডাকনায় অল ইন্ডিয়া কিষাণ কনফারেন্সের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কৃষকদের মধ্য থেকে নাট্যকার শিল্পী নির্বাচন করা হয় ও নাটক লিখিয়ে অভিনয় করানো হয়। সমবেত ও যৌথ প্রয়াসে নাটক লেখা হত। কৃষক নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষদের সামনে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তাদের অভিনয় হয়।

"আমরা সর্বমোট ১৮টা নাটক অভিনয় করি ৬০০০০ লোকের সামনে যাদের মধ্যে ৫২০০০ ছিলেন কৃষক ও ৮০০০ শহরের লোক। নাটকের বিষয় ছিল—১) জাতীয় ঐক্য ২) খাদ্য সংকট ও তার সমাধানের পথ ৩) আরো খাদ্য ফলাও ৪) উৎপাদন বাড়াও ৫) লাল ফৌজের বীরত্ব ৬) ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ৭) অন্তর্ঘাত রোধ ৮) পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ ৯) এক কিষানসভা সদস্যের জীবন ১০) 'হরতাল'।"[৭]

It was only in 1943 that the Punjabi theatre enthusiasts of Lahore were awakened to the exciting developments taking place in Indian theatre. The heightening of the national struggle with the Quit India Movement in 1942 and a national calamity in the form of the Bengal famine in the same year brought the national awareness to an unprecedented pitch. Theatre suddenly assumed a far greater relevance than hereto-before in

the national struggle for Independence. In this period very strong links were forged between the Inidan arts and the resurgence of Indian people. In the world of theatre this movement was spearheaded by I.P.T.A. Both ideologically and aesthetically I.P.T.A. movement called for peoples active participation in all forms of artistic activity such as literature, plastic arts and drama and theatre. To be meaningful to the major life cencerns of the people I.P.T.A. movement stood for re-orientation of theatre arts from mere entertainment to effective instruments for social awakening. I.P.T.A. also stood for abolition of theatre conventions and mannerisms thereby obliterating the distance between the theatre and the autience. The I.P.T.A. movement was the first significant point of convergence between punjabi theatre and Indian theatre tradition. It inspired a new upsurage in theatre activity in Punjab, some of the well known theatre artists who played a very important role liberating Punjabi theatre from the shackles of academism and middle class prudery and puritanism were initiated into theatre arts under the powerful motivation of the theatre. Sheila Bhatia, Balraja Sahni, Balwant Gargi, Tera Singh Chan, Joginder Bahrla, Narinder Dosanjh, Jagdish Fariadi and Pandit Khalili who were responsible taking Punjabi theatre to the masses and for evolving a new robust idiom of dramatic conflict and theatre performance were all inspired by the I.P.T.A. movement [৮]

সন্ত সিং সেখোঁ (১৯০৮ - ১৯৯৭) বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন স্রষ্টা। তিনি ইংরাজী ও অর্থনীতির এম. এ। তিনি 'প্রগতিশীল আন্দোলন'-এর সান্নিধ্যে আসেন যখন তিনি প্রগতি লেখক সম্মেলনে যোগ দেন ১৯৩৭ এ পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত কিষাণ কনফারেন্স চলাব সময়। তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ও গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকাবী হন।

সেখোঁর 'ছে ঘর' একাঙ্ক সংকলন ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। এর অন্তর্গত 'হরতাল' নাটকে ধর্মঘটের সময়ে শ্রমিকদের ভিতরকার এক বাস্তব চিত্র আঁকা হয়েছে। মালিক ও শ্রমিকদের বিরোধ সংঘাত চলছে, প্রধান নারী চরিত্র ('সাধারণ') মার্কসীয় আদর্শে দীক্ষিত যে তার স্বামী ও দলকে শক্তি সঞ্চার করছে। প্রাচীন কাহিনীর নবভাষ্য 'মহাত্মা'র নানক প্রমাণ করলেন যে কঠিন পরিশ্রমজাত অন্নে দুধ আছে, পক্ষান্তরে যারা অপরের শ্রমে অন্ন সংগ্রহ করে তাতে আছে গরীবের রক্ত।

পূর্ণাঙ্গ নাটক 'কলাকার' (১৯৪৬) প্রাচীন অহল্যা কথার নবরূপায়ণ। এতে শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়া নরনারীর সম্পর্ক, নারীর অধিকার প্রসঙ্গ-ও আলোচিত। 'নারকী' (১৯৫২)-তে নাট্যকারের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবলভাবে ফুটেছে। লেখক দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করে অর্থের ওপর, ভালবাসার ওপর নয়। এছাড়া অর্থলোভী কংগ্রেস নেতা ঘুষখোর ন্যায়াধীশ প্রমুখের চিত্রও নাটকে আছে। জীবনী প্রধান 'বারিশ'-এর কাহিনী ওয়ারিশ শাহর বিখ্যাত রচনা হীর রঞ্ঝার অনুরূপ। 'মোয়া সার ন কোই' 'রাজা রণজিৎ সিং' ঐতিহাসিক নাটক।

সেখোঁর প্রেম যৌন ভাবনার (এ বিষয়ে তিনি লরেন্সের অনুগামী) নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'ইক ইতবার'—এক শিক্ষিত বুদ্ধিমান আইনবিদ ও তার সাধারণ স্ত্রীর কথা; 'বিহ আম্নে'—স্বামী তার যুবতী স্ত্রী ও স্ত্রীর প্রেমিকের কথা; 'তপিয়া কিউ খপিয়া' যাতে এক সাধু পতিতার অনুরাগী হয়ে তার সন্ন্যাসের আবরণ খসিয়ে দেয়।

তিন অঙ্কে নাটক 'ভূদান' (১৯৫৫) বিনোবাভাবে প্রবার্তিত ভূদান আন্দোলনের ব্যর্থতার চিত্র। অনেক ঝঞ্ঝাট ঝামেলার পর জমিদার কৃষকদের যে জমি দিল দেখা গেল যে তা চাষের অনুপ্রয়োগী।

একাদেমী পুরস্কার জয়ী 'মিত্তর প্যারা' (১৯৭০) রাজনৈতিক নাটক—লেনিনের প্রতি এটা শ্রদ্ধা নিবেদন। দুদল ভারতীয় বিপ্লবী ভাই রতন সিং ও এম এন রায়ের নেতৃত্বে মস্কোয লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন। লেনিন তাদের উপদেশ দেন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সেজন্য বুর্জোয়া পলিটিকাল পার্টি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে। রতন সিং—এর ওপর নির্দেশ থাকে কৃষক সংগঠনের ও এম এন রায়ের ওপর শহরাঞ্চলের সর্বহারা মানুষদের সংগঠিত করার। এই নাটকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সংঘাত অপেক্ষা সিরিয়াস আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। এরকম জটিল গভীর তত্ত্ববিষয়কে নাটকে প্রকাশ করায় সেখোঁর অপরিসীম দক্ষতা প্রমাণিত।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব

ক্রমে এল স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত কদর্য রূপ প্রকট হল। রক্ত কুয়াশা ভেদ করে স্বাধীনতা সূর্যের আবির্ভাব, দেশের অঙ্গচ্ছেদ পার্টিশান—মানুষের অসহ্য দুঃখকষ্ট, আঘাত যন্ত্রণা, রক্তক্ষরা বেদনা, ছিন্ন মূল নিঃস্ব রিক্ত জীবনের অভিশপ্ত অস্তিত্ব নাট্যকারদের মর্মমূলে গভীর নাড়া দিয়েছে। এই জ্বালা যন্ত্রণা দাহকে রূপায়িত করেছেন তাঁরা।

স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্জাবী মানসিকতা বিশেষ করে প্রকট হল ভাষারীতিতে, গ্রামীণ জীবন চর্যায়, শিখ ভাবনার সুতীব্র প্রকাশে।

After the Independence both thematically and stylistically Punjabi literature is being powerfully pushed towards pronounced involvement with the rural realities and idioms... Ideologically speaking, Sikh revivalism has grown into a very powerful impulse for literrary activity in Punjabi in recent years But this revivalist impulse is sharply balanced by apocalyptic visions of revolution, violence, death and devastation projected alike by the progressive movement in early fifties and contemporary militant ultra-leftist poetry (and drama).[৯] এর সঙ্গে সমসাময়িক ভারতবর্ষের সমাজ অর্থনীতির ত্রুটি -বিচ্যুতি সমস্যা-সংকট দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার আধুনিক পঞ্জাবী নাটকে ফুটেছে। কখনো প্রগতিশীল ও বামপন্থী আন্দোলনের তীব্রতায় তা প্রবল রূপ পেয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্জাবী নাটক বিশ্বচেতনার সঙ্গেও নিজেকে মেলাতে চেয়েছে। বিচিত্র দ্বন্দ্বে আকীর্ণ, বিভিন্ন ভাবনায় জটিল ও নানাবিধ সুর সমন্বয়ে ঐকতানময় হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্জাবী নাটক।

হরচরণ সিং (১৯১৪) আধুনিকতার অন্যতম উদগাতা। ত্রিশের শেষ পর্যায়ে তিনি পঞ্জাবী নাটকে বাস্তবতাকে প্রথম আনলেন — এটা সমালোচকের অভিমত।

হরচরণ সিং মনে করেন যে একজন প্রকৃত সাহিত্যিক হলেন মহামানব—'মেরে সিদ্ধান্ত অনুসার অসল সাহিত্যকার এক মহাপুরুষ হুন্দা হৈ।[১০] তিনি মানব জীবনের পূর্ণতার সন্ধান করেন। হরচরণের দৃষ্টি প্রগতিশীল—সমাজের অন্যায় অবিচার দুর্নীতির তিনি আমুল উৎপাটন চান, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে তিনি আগুন জ্বালতে

চান, কখনো ইতিহাসের জটিল রক্তক্ষরিত পৃষ্ঠাকে আশ্চর্য উন্মোচিত করেছেন নাটকে। হরচরণ সিং-এর সব নাটকই মঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী। তিনি নাট্যকার ছাড়া দক্ষ অভিনেতা এবং পরিচালকও, কাজেই তাঁর প্রায় সব নাটকই মঞ্চ সফল। তাঁর নিজস্ব মতামত এক্ষেত্রে স্মরণীয়—ম্যয় দর্শকাঁ লই খেড়ন যোগ নাটক লিখদা হাঁ। মুঢ় তো লৈ কে অজ তক মেরে সারে নাটক খেড়ে জান লই লিখে গঞ হন।"[১১]

হরচরণ সিং এর প্রথম দিকে নাটক শেকসপীয়র-প্রভাবিত। 'কমলা কুমারী' (১৯৩৭) মধ্যযুগের পটভূমিকায় লেখা কমেডি অফ এররস অনুসারী। 'খেড়ান দে দিন চার'ও (চার দিনের আনন্দ) এ্যাজ য়্যু লাইক ইট-এর মত উজ্জ্বল উত্তপ্ত রোমান্টিক, যদিও পটভূমি একাল। 'রাজা পোরস' (১৯৩৮) আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমনের পটভূমিকায় দেশাত্মবোধক নাটক—এতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুর ধ্বনিত।

সামাজিক নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট 'আনজোড়' (১৯৪২) নরনারীর প্রেম ও বিবাহ সমস্যার এক নির্মম চিত্র—প্রেম-ভালবাসাহীন মিলনের পরিনাম দুঃখ বেদনা মৃত্যু। 'দুর দুরাড়ে শহরোঁ' (১৯৩৯) গ্রামীণ সমস্যা সংকট ও তার উন্নয়নের নাটকীয় রূপ। ভারতীয় নারীর লজ্জা শালীনতা সংযম ও সে কারণে তার দুর্দশার ছবি আঁকা হয়েছে 'দোষ' নাটকে। 'তেরা ঘর সো মেরা ঘর' সাম্প্রদায়িক বিভেদ, জাতীয় সংকট, দেশ প্রেম ও হিন্দু-শিখের মিলনের চিত্র। 'চমকোর দী গড়ী' তিনটি একাঙ্ক সংকলন গুরুগোবিন্দ সিং-এর তিনশ বছর স্মরণে লেখা। প্রথম নাটক 'চমকোর দী গড়ী'তে (চমকোড়ের গড়) দেখানো হয়েছে কিভাবে গুরু গোবিন্দ সিং অল্প সংখ্যক সঙ্গী নিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়েন: দ্বিতীয়টির ('পাপ তিন ভিতর কম্পে'— পাপের ভয়ে তারা কাঁপছে) বিষয় ১৭০৬— এর এক সন্ধ্যায় আহমেদনগরে এক দুর্গে ঔরংজীব অনুতাপ করছে ভীত হচ্ছে অন্যদের ওপর অত্যাচার করে—সে গুরু গোবিন্দর দুই পুত্রকেও হত্যা করেছে; তৃতীয়টিতে ('সরহিন্দ দী কান্দ'-সরহিন্দের দেওয়াল) কথিত হয়েছে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস— সরহিন্দের নবাব ওয়াজির খাঁ গুরু গোবিন্দর বীর পুত্রকে বলেছিল ইসলাম ধর্ম নিতে; বীর পুত্রে সেই আদেশ ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করলে তাকে দেওয়ালে গেঁথে ফেলা হয় এবং শেষ পর্যন্ত গুরু গোবিন্দর শিষ্য বান্দা এসে প্রতিশোধ নেয়।

'রত্তা সালু' (লাল কাপড় ১৯৫৭) অত্যন্ত প্রগতিশীল নাটক—কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের ও বিপ্লবী ভাবনার পরিচয় এতে প্রবল। কৃষকদের ওপর লোভী নিষ্ঠুর অত্যাচারী জমিদার জাগীরদারদের অত্যাচার, তাদের সঙ্গে দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ ও সরকারী কর্মীদের সহযোগ, দরিদ্র কৃষকদের অসহায় দুরবস্থা, সর্বহারা মানুষের ব্যথা বেদনা এবং শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের দুর্বার প্রতিরোধ এই নাটকের বিষয়বস্তু। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী জাগীরদার নৈনিহাল সিং কৃষকদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যচার চালায়, তাকে সাহায্য করে থানেদার ও নম্বরদার। সে মনে করে লাঠি গুলি দিয়ে সব দমন করবে। কৃষক নেতা জোগা বিপ্লবী ভাবনায় দীক্ষিত, সে কৃষকদেব সচেতন করে তাদের অধিকার সম্বন্ধে। নৈনিহাল সিং জোগাকে মিথ্যে চুরি বা চোলাই মদ রাখার দায়ে ফাঁসাতে চায়, না হলে তাকে গুলি করে মারতে চায়। জোগার সুন্দরী বোন লাখোর দিকেও তার লোলুপ দৃষ্টি। নৈনিহাল সিং লাখোকে অপহরণ করে, জোগাকে হত্যা করে। সমগ্র কৃষককুল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ক্রোধে ঘৃণায় ঝলসে ওঠে। তারা বদলা নেবে এই অন্যায় অবিচারের, প্রতিশোধ গ্রহণ করবে কৃষক হত্যার, নারীর ওপর নির্যাতনের। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। বীর কৃষকরমণী জোগার মা ছেলের রক্তে বস্ত্র ভিজিয়ে

সেই রক্ত পতাকা ওপরে তুলে ধরে—কঠিন বক্তাক্ত শপথ নিয়ে এরা অত্যাচারীর ধ্বংস চায়, শুরু হয় বিপ্লবী সংগ্রাম।

'কলহ্ অজ তে ভলক' (গতকাল আজ আগামীকাল ১৯৭২) নাটকের জন্য হরচরণ সিং অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। সমাজ সচেতন শিল্পী এই নাটকেও সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি ব্যভিচার দুর্নীতি দেখিয়ে তার অবসান চেয়েছেন। তিনি মূলত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এজেন্ট বা ঠিকাদারদের তীব্র আক্রমণ করেছেন। এই নাটক সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রতীম সৈনি মন্তব্য করেছেন—ইস্ পুঁজিবাদী সমাজ দে ভ্রিষ্টাচার কালেবাজার অনিয়া (অন্যায়) তে ধকে শাহী (জুলুমবাজী বা মস্তানী) দে কোড় (কুষ্ঠ) নু চিটিয়া কালিয়া (সাদা ফুল) দে রূপ বিচ চিতরিয়া গিয়া হ্যয়। ইহ দর্শকাঁ দে বৌধিক বিকাশ তে নিরভর হ্যয় কি উহ ইস নাটক নু দেখ কে কেবল হস কে হি গুয়া দেন্দে হন জা ইস বিচ পেস কীতিয়া গইয়া (উপস্থাপিত করা হয়েছে) গম্ভীর গলাঁ (জটিল সমস্যা) তে কোড়িয়া অসলী অতাঁ (তিক্ত বাস্তব) বারে কুঝ সোচন তে বি মজবুর হুন্দে হন'।[১২]

ডঃ হরচরণ সিং -এর লেখনী আজো অক্লান্ত। রামচরিত মানস এর চারশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি লিখেছেন 'রামলীলা'। এতে রামায়ণের আদর্শকে আধুনিক পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে। এর আঙ্গিক ও অভিনব হরপাল তিবানা ও নীনা তিবানা পরিচালিত এই নাটক হাজার হাজার দর্শককে আনন্দ দিয়েছে। হরচরণ সিং সম্বন্ধে বলা যায় তিনি যথার্থই জনগণের শিল্পী ও জীবনেব দক্ষ নিপুন রূপকার।

বলবন্ত গার্গী (১৯১৬-২০০৩) পঞ্জাবী নাটকের অসাধারণ কৃতী পুরুষ, তিনি নির্দিষ্ট দেশকাল সীমার গণ্ডিকে অতিক্রম করে পঞ্জাবী নাটককে বিশ্বচেতনায় প্রসারিত করে দিয়েছেন। সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা বিকশিত তবু নাট্যকার রূপেই তিনি সমধিক প্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাত। নাট্যতত্ত্ববিদ হিসাবেও তিনি বন্দিত এবং আলোচনা গ্রন্থ 'রঙ্গমঞ্চ'র জন্যই তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নাটক লিখে চলেছেন বলবন্ত গার্গী। জীবনের বিচিত্র রহস্য তিনি অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর নাটকের বক্তব্য মানবিক। মানুষ ও সমাজের সংঘর্ষ তিনি চিত্রিত করেছেন বিশেষ করে রূপ পেয়েছে নরনারীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ও তীব্র আকর্ষণ বিকর্ষণের প্রচণ্ডতা। এই অনন্ত রহস্যময় সম্বন্ধ তাঁর নাটকে বারবার পাই এবং গভীরভাবেই।

নাটকের বিষয় অনিবার্যভাবে গঠন করে দেয় তার আঙ্গিক রূপ ভাষারীতি। তীব্র আবেগ হৃদয়োচ্ছ্বাস বা প্যাশনকে আঁকতে গিয়ে তাঁর নাটকের ভাষা হয় উত্তপ্ত কখনও কর্কশ কখনও কাব্যিক। যে কোন রচনাতেই তিনি প্রেরণা পেয়েছেন লোককবিতা থেকে তার প্রাণবন্ত শব্দবিন্যাস সরল রূপক অলংকারাদি নিরাভরণ উদ্দামতা থেকে। রিচ্যুয়ালস থেকেও।

থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি জানতে চাওয়ায় বলবন্ত গার্গী বলেছেন—I believe in the physical theatre. A theatre of action of muscle, of movement. Not a theatre of word. The theme must breathe and invade all our sences. We should be able to hear through our eyes. It should have a ritualistic quality of purity, of power, of torture. Most people are keen to give a message to the theatre. A theatre of commitment and propaganda of a social message. My message is 'Theatre'.[১৩]

চল্লিশের কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মুলকরাজ আনন্দের প্রেরণাতেই বলবন্ত গার্গী সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথমে ইংরাজীতে কবিতা লিখতেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

প্রভাবে মাতৃভাষা অর্থাৎ পঞ্জাবীতে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। গার্গীর প্রথম নাটক 'তারা টুটিয়া' (১৯৪২) রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় লেখা প্রায় ডাকঘরের রূপায়ণ।

গার্গীর প্রথম মৌলিক নাটক 'লোহা কুট্' (লোহার, ১৯৪৪) সার্থক বাস্তবধর্মী নাটক। এর বিষয় পঞ্জাবী সাহিত্যে অভিনব ও চমকপ্রদ। প্রচলিত গোঁড়া ও অত্যাচারী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারীর প্রবল বিদ্রোহ এতে চিহ্নিত। লোহা কূট-এ দেখা গেল গ্রাম্য কামার কাকুর মেয়ে বেনো তার প্রেমিকের সঙ্গে পালায়। সারা গ্রামে ছিছিকার পড়ে। কামার অতি ক্রুদ্ধ হয়, তার বৌ শান্তি প্রতিমুহূর্তে মেয়েকে অভিশাপ দেয়। শান্তি তার স্বামীর সঙ্গে আঠার বছর ঘর করেছে, কিন্তু ক্রমশ তার মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। আঠাবো বছরের শেকল বাধা গৃহ-জীবন, বর্বর স্বামীর পীড়ন, কামারশালার কদর্য পরিবেশ তাকে বিদ্রূপ করে তোলে ও তার চেতনায় আগুন ধরায়। মনে পড়ে সেও একদা ভালবেসেছিল এক পুরুষকে কিন্তু সমাজসংসারের নির্মম আঘাতে তার ভালবাসা লাঞ্ছিত হয়েছে, তার হৃদয়ে অবিরত রক্তক্ষরণ। সে অনুভব করে তার মেয়ে ঠিক করেছে এবং স্বামী পুত্র সংসারকে পেছনে রেখে প্রেমিকের সঙ্গে সেও চলে যায়।

গার্গী বেশ কিছু একাঙ্ক লিখেছেন। 'দো অন্হে' (দুই অন্ধ) সিঞ্জের 'ওয়েল অফ দি সেন্টস'; 'চড়দা চন্দ্র' ও 'রাই দা পাহাড়' একাঙ্কদ্বয় গ্রেগরীর 'রাইজিং অফ দি মুন' ও 'স্প্রেডিং দি নিউজ' অবলম্বনে লেখা। 'বেবে' নাটকটিও সিঞ্জেব 'রাইডার্স টু দী সী'ব ভাবানুবাদ।

গার্গী 'প্রেগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশনে'র সঙ্গে যুক্ত হন এবং গণসাহিত্য রচনায ব্রতী হন। কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত কৃষক আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তার প্রথম প্রলেতারিয়েত নাটক 'মোঘা' কৃষক সম্মেলনে খোলা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

তত্ত্বনাটক 'সৈল পত্থর'-এ (১৯৪১) গার্গী শিল্পসাহিত্যে প্রগ্রেসিভ ও প্রলেতারিয়েত আদর্শ রূপায়ণের সপক্ষে জোর প্রচার চালিয়েছেন। 'কেসরো' নারী শিক্ষা ও নারী বিদ্রোহের নাটক। 'গিরঝাঁ' (শকুন ১৯৫১) একাঙ্কর বক্তব্যও অত্যন্ত প্রগতিশীল— কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ এখানে প্রবল। ১৯৪৩ এর বাংলার দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় নাটকটি লেখা। বয়স্ক চাষী ফজুল জমিদারের কাজ করতে বাধ্য হয়। সে ক্ষুধায় কাতর এবং অসহায় অক্ষম তবু প্রহারে জর্জরিত হয়ে সে কাজ করে। তার মেয়ে নূরী ধর্ষিত হয়ে কটা রুটির জন্য। মৃত্যুকালে ফজলু স্বপ্ন দেখে সেই দেশের যেখানে ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ লালসা অত্যাচার নেই, যেখানে রক্ত দিয়ে সবাই পেয়েছে পুরো খাবার। 'পত্তন দী বেড়ী' প্রেম ও বেদনার দুঃসহ মর্মছিন্ন করা চিত্র। 'কনক দী বল্লী' (১৯৫২) বার্ণার্ডশ চেকভ ও'নীল দ্বারা প্রভাবিত, লরকার ছায়াও পড়েছে। নারীর প্রেম, দুর্নীতিগ্রস্ত নিষ্ঠুর সমাজের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ও আত্মহনন—এই নাটকের বিষয়। 'ধুনী দী আগ' (১৯৬৭) সুতীব্র প্রেম, প্রবল ঘৃণা, সর্বগ্রাসী আকর্ষণ ও ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার নাটক। নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণমূলক সম্পর্ক, প্রেমের বিষামৃত স্বাদ, অসংবরণীয় হৃদয়োচ্ছ্বাস অগ্নিগিরির অগ্নুদহনে প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশিনী রিটা অজিতের সুতীব্র আকর্ষণে দেশ ছেড়ে এসেছে ভারতবর্ষে। ভারতীয় মেয়ে মালাও অজিতের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে যুক্ত—তার ভালবাসাও প্রবল উদ্দাম। রিটা সর্বগ্রাসী কামনায় অজিতকে পেতে চায়, অজিতের বীর্য স্বদেহে ধারণ করতে চায়। আবার মালার প্রচণ্ড আকর্ষণে অজিত বাঁধা পড়ে, সে মালাকে বিয়ে করবে। অজিত এই দুই প্রবল আকর্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত, তার অস্থির দোদুল্যমানতা প্রকট হয়ে ওঠে। রিটার গর্ভে অজিতের সন্তান। অজিত বিমূঢ় উদভ্রান্ত, সে রিটাকে বলে সন্তান

নষ্ট করতে। রিটা ভাবতে পারে না সে কথা, সে অজিতকে আপন দেহে গ্রহণ করেছে : তার সমগ্র সত্তা এই প্রাণে প্রাণময় তার অস্থিমজ্জারক্তমাংস অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার সঙ্গে একীভূত—অজিত কেন, সমগ্র বিশ্ব চাইলেও সে তার সন্তানকে নষ্ট করবে না। কিন্তু অস্থির উদ্ভ্রান্ত অজিত মালার আকর্ষণেই ধরা দেয়। অত্যন্ত অসুস্থ, আবেগপ্রবণ ও প্রবল মানসিক উত্তেজনাক্লিষ্ট রিটার সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। মালার সঙ্গে অজিতের বিবাহ স্থির হয় পরের দিন। রিটা শেষবারের মত অজিতকে আহ্বান করে, শান্ত স্থিরভাবে তাকে অভ্যর্থনা করে। রাত্রি হয়। আলো নিভে যায়। বাতির ম্লান আলো রহস্যময় করে পরিবেশকে। তারা বিছানায় শুয়ে পড়ে। অজিত ঘুমিয়ে পড়ে, রিটা উঠে বসে। রিটা ভয়ঙ্কর ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে অজিতের ওপর, সজোরে গলা টিপে ধরে, অজিত ছটফট করতে থাকে। হঠাৎ দরজার ঘণ্টা সজোরে বেজে ওঠে। উন্মাদিনী রিটা সর্ব শক্তিতে অজিতের কণ্ঠনালী চেপে ধরে। সব নিস্তব্ধ। আলো জ্বলল। ঘূর্ণিবাত্যার মত মালা প্রবেশ করে নববধূর বেশে। সব দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে, রিটা শান্ত স্থির উদ্ভাসিত।

বিচিত্র ধরনের অভিনব স্বাদের নূতনতর শিল্পকর্মযুক্ত বহু নাটক রচনা করেছেন বলবন্ত গার্গী। মহামানবের জীবন আশ্চর্য জ্যোতির্ময় হয়েছে তাঁর নাটকে, ইতিহাসের রক্তক্ষরা ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পটভূমি এসেছে কখনো, জীবনের অনন্তবৈচিত্র্য ও বিস্ময়ের উদ্ভাসন তো আছেই। 'গগন মে থাল' (আকাশ এক আরাধনার পাত্র) গুরুনানকের জীবন ধর্ম ও দর্শনের এক বিশাল মহিমাময় চিত্র। লেখকের জ্ঞান তথ্যনিষ্ঠা ঐতিহাসিক সচেতনতা ও আধুনিক পরিশীলিত মন ধর্মগুরু মহামানবের জ্যোতির্ময় জীবনচিত্রকে আধুনিক জগতের কাছে অপরূপ শিল্পময়তায় প্রকাশ করেছে। 'সুলতানা রিজিয়া' নাটকে ইতিহাসের পটভূমিকায় শক্তি অর্জনের খেলা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত নাটকায়িত। তার সঙ্গে কুমারী নারীর প্রণয় কথা আশ্চর্য আবেগ সঞ্চার করেছে। পরিচিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লোকভাবনার নাটক 'মির্জা সাহিবা' ওয়ার্কশপ সিসটেমে পরিচালিত অভিনীত হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মানে বিভূষিত হয়েছে।

যৌনতার প্রবল শক্তিময়তা যা মানবহৃদয়ের গভীর প্রদেশকে উন্মথিত করে তীব্র জ্বালাময় শ্বাসরোধকারী সর্ববিধ্বংসী আদিম পরিমন্ডলের রচনা করে যাতে সমাজ সভ্যতা নীতিবোধ আমূল উৎপাটিত হয়ে যায়, 'সৌকন' (১৯৭৯) নাটকে তার পরিচয় আছে। মাতাকন্যাপুত্রের অজাচারের এক অগ্নিস্রাবী ভয়ঙ্কর কাহিনী এই নাটক। এক প্রবল কাম-বিস্ফারিত ঘূর্ণিবাত্যার তাড়নে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত—আবেগে মনস্তাত্ত্বিকতায় ও দৈহিক সম্পর্কে এবং এক আদিম কামনায় অধিকারের তাগিদে। যৌনভাবনার প্রথাবিমুক্ত প্রবল অবাধ প্রসার, অনুশাসন নিয়ম সংযমহীন দুর্বার দুর্দম আতিশয্য, তার সর্বনিয়ামক তথা সর্বসংহারক অপ্রতিরোধ্য শক্তি বলবন্ত গার্গীর নাটকে দার্শনিকতায় শিল্পঋদ্ধ হয়েছে। গার্গীর 'অভিসারিকা' (৯১) তার প্রিয় লরকার নারীত্বের ভাবনার ওপর আধারিত যা অন্যপুরুষকে কামনা করে নারীত্ব বিচ্ছুরনের জন্য।

ডঃ রোশন.লাল আহুজা একজন শিক্ষাবিদ, ইংরাজী ভাষায় খ্যাতিমান লেখক। দেশবিভাগ তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলে এবং এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি একাঙ্ক লেখেন যাতে আগামী শত বছর ধরে বুকে যে অবিরাম রক্তক্ষরণ ঘটবে সে কথা বলা হয়েছে। 'বলবন্ত কাউর' 'খাকিস্তান' ও 'অবলা'য় (১৯৫০) দেশবিভাগ ও লোকবিনিময়ের বেদনাদায়ক পরিণাম রক্তের অক্ষরে আঁকা হয়েছে। 'শরণার্থী' 'হায় মেরী ধী', 'পাকিস্তানী রাজ' ও 'পাকিস্তানকে পরলো' (১৯৫২) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার নিষ্ঠুর করুণ চিত্র।

তার ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে বিখ্যাত 'রোশন আরো', 'বৈশাখী' (১৯৫৩), 'কলিঙ্গ দা দুখান্ত' (কলিঙ্গর ট্রাজেডী ১০৫৮)। ট্রাজেডী রচনায় তিনি শেকসপীয়র দ্বারা প্রভাবিত।

হাস্যরসাত্মক রচনায় ডঃ আহুজা সুদক্ষ। 'বেকার বি এ' (১৯৫৪) শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ, 'অকল দি খটি' (বুদ্ধি খাটিয়ে রোজগার) ব্যবসায়ীদের বিচিত্র ও অসৎ কার্যকলাপ, 'ভোজ পত্তর' ও 'আম্রা টুলি পেয়ার' (প্লেটোনিক ভালবাসা) নারীদের বিচিত্র ছলাকলার কৌতুক হাস্যপূর্ণ প্রহসন। সমসাময়িক জীবন ও অস্তিত্বের সংকট নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন। 'তালাক' (১৯৫৪) অসুখী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ দাম্পত্য জীবন থেকে মুক্তির কথা, 'বে দখলী' নতুনদিনের নারীর অগ্রণী ভূমিকা নির্ণয়, 'দজ'—পণ প্রথার ভয়াবহতার চিত্রণ, 'হরতাল' মিল শ্রমিকদের ধর্মঘট নিয়ে লেখা। 'ভূমি আন্দোলন' (১৯৫৫) জমির জন্য কৃষক ও বিস্বেদার বা জমিদারদের সংঘর্ষের ট্রাজিক চিত্র। রোশনলাল আহুজার নাটক সম্বন্ধে সমালোচকের মতামত স্মরণীয়—His study of life combined with his knowledge of the philosophy and literature of the west has provided him a flair and enthusiasm of a dramatist.[১৪]

গুরদয়াল সিং খোসলা ১৯৪৬ সালে লাহোরে স্থাপিত লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম চেয়ারম্যান। দেশ বিভাগের পর দিল্লীতে এর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ঘটে। শ্রী খোসলা মূলত ব্যঙ্গপ্রবণ সমাজ সচেতন শিল্পী—মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের বিকৃতি ব্যভিচার ত্রুটি অসংগতিকে তিনি তীব্র ব্যঙ্গে জর্জরিত করেছেন। তাঁর প্রথম একাঙ্ক 'বেঘরে'তে (ঘর ছাড়া) পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা উদ্বাস্তু মানুষের অস্তিত্বের সংকট, অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণা ও অদম্য সাহস আঁকা হয়েছে। 'জুতিয়া দা জোড়া' (এক জোড়া জুতো) এক সন্দেহ প্রবণ স্ত্রীর বাতিককে ভিত্তি করে লেখা কমেডি। 'মুর্দে দি রাশান' বাবাকে মৃত মনে করে এক পরিবারের লোভলালসার চিত্র। এটি স্ট্যানলী হউটনের দি ডিয়ার ডিপার্টেডের আদলে লেখা।

'বুহে বৈঠী থী' প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে আধুনিকতার সংঘাত দেখানো হয়েছে। মূলত বিবাহ বিষয়কে সামনে রেখে লেখা। 'মর মিটন বালে' (যারা মরতে চেয়েছিল ১৯৬৩) স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় লেখা। স্বাধীনতার সংগ্রাম, স্বাধীনতা অর্জন কিন্তু জীবনের ব্যর্থতা এর বিষয়। 'পরলো তো পহলে' (শেষ দিনের আগে) তিন অঙ্কের সামাজিক নাটক, অনিয়োজিত পরিবারের প্রবল সমস্যা সংকট জ্বালা চিত্রিত। জীবন দাস ও তার বিশাল পরিবারে দু মেয়ে ও পাঁচ ছেলে নিয়ে এক ঘরে বাস করে এবং তাদের আয়ও অল্প বিদ্বেষ তিক্ততা অপমান উন্মত্ততা মৃত্যু : এক জ্বালাময় যন্ত্রণা তীব্র জীবনের দুঃসহ চিত্র লেখক এঁকেছেন।

আধুনিক পঞ্জাবী নাটকের ভাবনা উত্তরোত্তর তীক্ষ্ণ জটিল হয়ে উঠছে। মানবচিত্র বিশ্লেষণে তা নিয়োজিত। জীবন সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তিসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, অর্ধচেতন অবচেতন মনের ছায়াছন্ন পথে চংক্রমণ, সুররিয়ালিজমের প্রকাশ, সময়ের অনন্ত বৈচিত্র্য সন্ধান সবই নাট্যকারের অন্বিষ্ট। আজকের পঞ্জাবী নাট্যকার কেবল নিরপেক্ষ ভাষ্যকার নন—তিনি মিথ্যা থেকে সত্যকে কুৎসিত থেকে সুন্দরকে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করতে চান, ফলে তাদের নাটকে এমন নিষ্ঠুর নির্মম সত্যের উদঘাটন ঘটে যা আমাদের চমকিত করে। ব্যভিচার প্রতারণা অসুখী মানসিকতা এমন কি একসপ্লয়টেশনের অন্তরালস্থিত সত্যের বিশ্লেষণ চান নাট্যকার। অহং এবং ব্যক্তিত্ব, পরিস্থিতি পরিবেশ, অসহায়তা ভয় আতঙ্কের সংঘাতকে প্রমূর্ত করতে চান। এতে প্রচলিত মূল্যবোধের ব্যর্থতা

ও উপহাস্যত্ব প্রতিপন্ন করতে চান। কখনো তাঁরা নীতিহীনতা অন্যায় বিকারকে নাটকের বিষয় করেছেন। তাঁদের নাটকের চরিত্ররা মদ্যপ ন্যায়নীতি বোধহীন অসৎ কর্মপ্রবৃত্ত প্রায় বিকৃত চরিত্র। এই চরিত্র সমূহের সুতীব্র দুরন্ত আবেগ অনুভূতি মানসিকতা প্রকাশ করতে গিয়ে যৌনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। বলবন্ত গার্গীর 'ধূনি দী আগ' 'সৌকন' প্রভৃতি নাটকের কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই মনে পড়ে। এই ভাবনার প্রকাশ দেখা গেছে করতার সিং দুগ্গল, সুরজিৎ সিং সেঠী, কপূর সিং ঘুম্মন, আতমজিৎ সিং ও অন্যান্য নাট্যকারদের রচনায়।

করতার সিং দুগ্গল (১৯১৭) ঔপন্যাসিক ছোট গল্পকার কবি নাট্যকার বিভিন্ন রূপে পঞ্জাবী সাহিত্যকে সেবা করেছেন, তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রী দুগ্গল পাশ্চাত্য গভীর প্রত্যয় সমৃদ্ধ ভাবধারার সঙ্গে প্রাচ্য ভাবনার সংমিশ্রণে এক সুন্দর শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন। সরল ভাষ্য ও কল্পনাশীল সংলাপ দ্বারা কাব্যময় বাতাবরণ সৃষ্টি তাঁর নাটকের শক্তি। মূলত রেডিও নাটক তিনি লিখেছেন এবং এবিষয়ে তার দক্ষতা অপরিসীম। 'ইক সিফর সিফর' (এক শূন্য শূন্য ১৯৪১) একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ জার্মান একসপ্রেশনিষ্ট নাট্যকার গেঅর্গ কাইজার ও আর্ণেষ্ট টলারের আদর্শে-অনেকটা অনুপ্রাণিত। মঞ্চে উপস্থিত চরিত্র সমূহ কোন মানব গোষ্ঠীর প্রতীক বা টাইপ। চরিত্ররা মানুষের প্রতীক রূপ ও নামহীন। 'আউ গয়ে সজন আউ গয়ে' (১৯৪২) ঐকই রীতির নাটক। এখানেও কোন রক্ত মাংসের চরিত্র নেই। একই চরিত্রের তিন রূপ —সে কখনো ছেলে কখনো মেয়ে কখনো সংযোগকারী।

'পুরাণিয়াঁ বোতলাঁ' (১৯৫৪) তাঁর প্রথম নাটক যা পঞ্জাবী থিয়েটার দিল্লী দ্বারা অভিনীত হয়। এতে উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের নীতিহীন ব্যভিচার বিকৃতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে—সফিসটিকেটেড কৃত্রিম নীতিবোধ বর্জিত জীবনের প্রতি এটা ব্যঙ্গ। 'সত নাটক' (১৯৫৫) একাঙ্কগুচ্ছ মানব চরিত্রের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এর অন্তর্গত পরীক্ষামূলক এক সংলাপী নাটক 'আমানত'-এ এক মৃত্যুপথযাত্রিনী তরুণী তার অসহ্য মানসিক বেদনাকে ব্যক্ত করেছে যখন অন্যান্য চরিত্র স্থির হয়ে তার পাশে বসে আছে। 'উপরাবালী মঞ্জিল'ও মনোলগ—অন্য পুরুষের প্রতি স্ত্রীর আকর্ষণে একটি পুরুষের হৃদয়বেদনার অসহ্য উৎসারণ। 'মিঠা পানি' এক ভারতীয় কৃষক পরিবারের কথা যারা দেশবিভাগের পর ঘর বাড়ি ছেড়ে ভারতে এসে এক মুসলিম কৃষকের ভূ-সম্পত্তি নিয়েছে যা ছেড়ে সে পাকিস্থানে গেছে। জ্বালা সিং ও তার স্ত্রী ভুলতে পারে না ফেলে আসা ঘর জীবনের কথা বিশেষত কুয়ার মিষ্টি জলের কথা। তবে তাদের ছেলে বলদেবের কাছে এসবের দাম নেই যে নতুন জমি ভালবাসে। তবে দরকার জলের। আশ্চর্যজনকভাবে আগের মুসলিম জমিমালিকের মেয়ে সাকিনা আসে যে এদের আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকতে চায় যা না হলে তাকে জোর করে নিয়ে যাবে। জ্বালা ও তার স্ত্রী সাকিনাকে নিজেদের কাছে রাখতে চায় কারণ তাদের এরকম এক মেয়ে হারিয়েছে, তাছাড়া বলদেব তাদের সঙ্গে থাকতে চায় না। সে ভাকরা-নাঙ্গালে হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশনে কাজ করবে। তিন বছর কাটে। জীবন কঠিন হয়। কুয়া শুকিয়ে যায়। সুদখোর মহাজন উত্যক্ত করে সাকিনাকে। কিন্তু বলদেব শোনায় আশার কথা। একদিন ক্যানালের কাজ শেষ হয়, গ্রামে জল আসে, জ্বালা সিংহের খামারের রূপ পালটায়—ফসল গরু প্রাচুর্য। বলদেব ফেরে, গ্রামের লোকেদের লিখতে পড়তে শেখায়, সাকিনা ও বলদেব পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হয়। একদিন সরকারী কর্মচারীরা ফিরিয়ে আনে জ্বালা সিংয়ের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে সাবিত্রীকে যাকে এরা মৃত ভেবেছিল। এরা সাকিনাকে মেয়ের থেকে বেশী

ভালবাসে তাকে এরা পুত্রবধূ করবে ভেবেছিল। কিন্তু আইন নির্মম। সাকিনাকে যেতে হয়। নাটকের বক্তব্য মর্মস্পর্শী ও এখানে মনস্তত্ত্বিক নিপুণতা আছে, চরিত্র সমূহ জীবন্ত, পঞ্জাবের গ্রাম জীবন চিত্রণ নিপুণ হয়েছে, ভাষা বাস্তব স্বাভাবিক চরিত্রানুগ।

'কোহকন' নাটকের কাহিনী ফরহাদ শীরী মতে হলেও বক্তব্য আধুনিক। ফার্ম মালিক 'সরকারের' মেয়ে শিরিন ইংলন্ড থেকে শিক্ষা শেষ করে ফিরেছে। তার বাবা শিরিনকে দেশভাগের ভয়াবহতার কথা, শরণার্থীদের দুরবস্থার কথা বলে। সরকার এই দেশভাগ চায় না। সে গান্ধীজীর কাছে শপথ করেছিল যে সে হিন্দুদের মধ্যেই থাকবে কারণ তার বিশ্বাস মুসলিমরা হিন্দুদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারে। সে নিজে জীবন দিয়ে তাই করেছে। শিরিন তার বাবাকে সমর্থন করে ও এই সুন্দর বাগান জমি করার জন্যে বাবাকে প্রশংসা করে। কিন্তু আমাদের আরো জল চাই-সে বলে। এসময় আসে ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ—সে হয়ে ওঠে জলের সঙ্গে যুক্ত, সে যেন লোকের স্বপ্ন। ফরহাদ ভাকরা—নাঙ্গালের কথা বলে যা কৃষকদের জল দেবে। শিরিনের ভালবাসায় ফরহাদ ফার্মে থেকে যায়। দুজনের বিয়ে হয়। ইতিমধ্যে ফরহাদ যেখানে কাজ করত সেখানে বিস্ফোরণ হয়, খালের জল ভেসে যায়। ফরহাদ সেখানে চলে যায়, ব্যক্তিগত সুখের দিকে তাকাবার সময় এখন তার নেই।

কর্তার সিং দুগ্গলের নাটক সমূহ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়েছে। তাঁর সংলাপ ও ভাষারীতি সুসংগঠিত ভাবপূর্ণ ও চিত্রাত্মক : তা চরিত্রের চরম গভীরতাকে স্পর্শ করে। তাঁর প্রতীকের প্রয়োগ ও সুন্দর ও ব্যাঞ্জনাঢ্য। চরিত্রের গভীর নিভৃততম ভাবনাকে তিনি উপলব্ধি ও আশ্চর্য প্রকাশ করেছেন। পঞ্জাবী নাটকে অভিনব ভাব ও শৈলীর প্রবর্তক হিসাবে দুগ্গল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পরিতোষ গার্গী (১৯২৩) নাটক নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত এবং পঞ্জাবী নাটকে তিনি গৌরবময় আসন লাভ করেছেন। তিনি সামাজিক নাটক লিখেছেন। এ্যাবসার্ড দর্শনও তার অনেক নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রগতিশীল নাট্যকার এবং জীর্ণ অবক্ষয়ক্লিষ্ট সমাজভাবনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁর নাটকের মঞ্চগুণও প্রবল। ইবসেন চেকভ ও' নীল প্রমুখ নাট্যকার তাকে সবিশেষ প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

'পরছায়ে' চার অঙ্কের সামাজিক নাটক যেখানে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কারকে আঁকা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে দিল্লীনাট্য আয়োজিত বার্ষিক নাট্যাৎসবে এটি দ্বিতীয় স্থান পায়। 'ছলেড়া' (১৯৫৯) সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে এক সচেতন নারীর প্রবল বিদ্রোহ। 'মোহিনী' এক বিবাহিতা নারীর সুতীব্র মানসিক দহনের চিত্র। মোহিনীর কাছে বিবাহিত জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে, সে এই বন্ধন থেকে মুক্তি চায়। অন্য পুরুষের সঙ্গে সে চলে যাবে, অথবা একাকী থাকবে। কিন্তু হায়। সে যাবে কোথায়, বিশাল পৃথিবী তার জন্য কোনও জায়গা রাখেনি। 'বগদে পানি' (জলপ্রবাহ) চার অঙ্কের নাটক। ইউজীন ও' নীলের 'ডিজায়ার আন্ডার দ্য এলমস'-এর অনুরূপ : বৃদ্ধ পিতা কুণ্ডা তার নববিবাহিত যুবতী ভার্ষা বন্তী এবং বৃদ্ধের যুবক পুত্র একদা বন্তীর প্রণয়ী পালার শ্বাসরোধকারী জ্বালাভরা অসহ্য জীবনের চিত্র 'কোপল ফুটী লাভে চো' (মঞ্জরিত আগ্নেয়গিরি) শান্তির সপক্ষে নাটক। অশোকের জীবন—চরিতের ওপর ভিত্তি করে লেখা ঐতিহাসিক নাটক : যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জয় এখানে ঘোষিত। নাটকটি ১৯৬৯-এ সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার পায়।

লুক-ছিপ জানা (লুকোচুরি খেলা ১৯৭৬) অভিনব রূপ ও রসের নাটক। পরেশ রীণা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসত। কিন্তু অপারেশন করতে গিয়ে রীণার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর শিয়রে বসে পরেশ রীণার সঙ্গে কথা বলে—তাদের প্রেম ভালবাসা ব্যর্থ হয়ে গেল। কেন? সমাজ মানুষ আইন সকলেই তাদের মিলনে প্রতিবন্ধকতা করেছে, তাই তারা নির্জন নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল।

গুরচরণ সিং জসুজা-র (১৯২৫) নাটকে মধ্যবিত্ত মানুষের আর্থিক সংকট, মানসিক দ্বিধা ও চেতনার সংকীর্ণতা রূপায়িত। যদিও চরিত্রচিত্রনের বৈচিত্র্যও তাঁর কম নয়। তাঁর নাটকে ব্যঙ্গের বিশেষ প্রকাশ দেখি। ব্যঙ্গপরিহাসের খোঁচায় তিনি জীবনের অসঙ্গতিকে প্রকাশ করে সামাজিক মানুষের রূপকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'মকড়ী দা জাল' (১৯৫৭) তার প্রথম নাটক। এতে ব্যবসায়ী সমাজের অর্থনৈতিক রীতিনীতি বাণিজ্যিক লেনদেন লোভ-লালসা চতুরতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'কন্ধা রেত দিয়া' (১৯৬৩) সামাজিক ভ্রষ্টাচারের চিত্র। সৎ বিবেকবান ইঞ্জিনিয়ার সততার সঙ্গে কাজ করতে চাইলে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়জন সবাই তাকে প্রলুব্ধ বিপথগামী করতে চাওয়ায় সে সবাইকে পরিত্যাগ করে। 'ইক হিরো দি তালাশ' (১৯৭৭) আমাদের রাজনৈতিক ভাবনার বিশ্লেষণ ও ব্যঙ্গ। 'চড়িয়া সোধন ধরত লোকাই' গুরু নানকের জীবন ও আদর্শের সুন্দর নাট্যরূপ, 'অন্ধকার' (১৯৬৯) নাগরিক জীবনের উত্তেজনা উন্মোদনার চিত্র। 'গৌমুখা শেরমুখা' (একাঙ্ক, ১৯৫৫) বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত অভিনীত দৃশ্যের কৌতুকের নিবিড় একাঙ্ক। বাড়ীর দালাল অতি দরিদ্র শরণ সিং বাড়ী বিক্রয়ে অনিচ্ছুক তার প্রতি বিরক্ত কিষণ দেবীর কাছ থেকে বাড়ী কেনালো ক্রয়ে অনিচ্ছুক শক্ত মন চোপড়া সাহেবকে।

'রচনা রাম বনাই' (প্রভুর সৃষ্টি, ১৯৭৭) আঙ্গিক ও বক্তব্যের বিচারে এক অসাধারণ সৃষ্টি। এই নাটকের ভিত্তি গুরু তেজ বাহাদুরের এক উক্তি — প্রভু রাম সব কিছুর স্রষ্টা এবং তাঁর নির্দেশে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। একটা অলিখিত নাটকের প্রস্তুতি চলছে, চরিত্ররা নিজেদের মত করে কথা বলতে বলতে জীবনের নিষ্ঠুর নির্মম সত্যগুলো অনাবৃত করে দেয়—তৈরি হয় এক ভয়ঙ্কর নাটক। কিন্তু চরিত্ররা আবার ফেরে বাস্তবে। সৃষ্টির এক গভীর রহস্য উন্মোচিত হয়। জোসুজার এই নাটক সাতাত্তরের এক অসাধারণ প্রযোজনা রূপে সুধীমহলে অভিনন্দিত হয়। জোসুজা-র 'মখন শাহ' (১৯৯১) রচিত হয়েছে আদি গ্রন্থর দর্শনের ওপর ভিত্তি করে। বিবেকচেতনা বুদ্ধি এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে চরিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে এর গুরুবাণীর বক্তব্যের মত এবং বলা হয়েছে তাদের সংহতিই মানুষের জীবনকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। তাঁর অন্যান্য নাটক হল — 'উব্রা লম্বী দৌড়' (১৯৮০) 'জঙ্গল' (১৯৮৬), 'গুরু গরীবনিবাজ' (১৯৮৬) ইত্যাদি। এছাড়া আলোচনাগ্রন্থও তিনি লিখেছেন —'পঞ্জাবী সাহিত্যকার' (১৯৪৮), 'একাঙ্কী নাটক : সিদ্ধান্ত ঔর তকনীক' (১৯৮৭)।

গুরদয়াল সিং ফুল্ল (১৯১১—১৯৮৯) পঞ্জাবী নাটকের ইতিহাসে সম্ভবত সর্বাধিক নাটকের রচয়িতা রূপে স্মরণীয়। রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান প্রচুর ও তাঁর অসংখ্য নাটক স্কুল কলেজ থেকে পাবলিক স্টেজে অভিনীত হয়েছে। তাঁর নাটকের মূল্যায়নে গুরুচরণ সিং বলেছেন—গুরদয়াল সিং ফুল অসলবাদ তে রোমানস, করুণ তে রসিক, সুভাবিক তে অসুভাবিক, যথার্থতে কল্পনা দা বেরড়া বনাকে এসী খেড় রচান্দা এ জো স্টেজী নুকতে তো সফল, ইস প্রকার দে দরশকা নু বস্থ কে বিঠা দেন বালী তে দুসরী প্রকার দয়া নু হুঅমার কে উঠা দেন বালী হুন্দী এ (পঞ্জাবী নাটককার)।[১৫]

শ্রী গুরুদয়ালের প্রথম দিকে নাটক 'কলেজিএট' পিতা মাতার দৃষ্টি কোণ থেকে বিবাহ সমস্যাকে দেখা। 'জোড়ী'তে জনতার তথাকথিত সেবকদের স্বরূপ উন্মোচিত, সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্মচারী তথা আইনরক্ষকদের প্রতি ব্যঙ্গও তীব্র। 'অজ-কল' নাটকে অফিস-কাছারীর দূষিত আবহাওয়ার চিত্র। 'ধরতী দী আওয়াজ' প্রতীকাত্মক নাটক, এর বক্তব্য প্রগতিশীল—জায়গীদারদারের পুত্র দৌলত ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধ ভূমি ও তার কন্যা আওয়াজের নেতৃত্বে কৃষকদের লড়াই ও তাদের জয়লাভ। 'কলা তে জিন্দগী'তে এক কৃষক বোনের বিয়ের জন্য সাহুকারের কাছে নেওয়া মাথাডোবা ঋণের তাগিদে ডাকাত হয়ে যায়, পরে অবশ্য তার মন পালটায়। 'আদমী দী অকল' বিকৃত ব্যভিচারী সভ্যতাকে ধিকার জানিয়ে সভ্যসুন্দর জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন নাট্যকার।

আশির পরে লেখা গুরুদয়াল সিং ফুল—এর 'চো অজ তক নহী সুক্কা' ঐতিহাসিক নাটক যার ভিত্তি বব্বর অকালি আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকা। নাটকে লোক উপাদানের সুন্দর ব্যবহার আছে।

কপুর সিং ঘুম্মন (১৯২৭ - ১৯৮৫) গভীর আদর্শবাদ, জনপ্রিয় বিষয়বস্তু ও সরল আঙ্গিককে গ্রহণ করেছেন নাটকে। তিনি ১৪টা পূর্ণাঙ্গ ও বেশ কিছু একাঙ্ক নাটক লিখেছেন। অধ্যাপক অতর সিং বলেছেন যে দুটি বিষয়ের ওপর তাঁর শক্তি নিহিত—সংলাপ ও গঠনরীতি : ঘুম্মন দে নাটকাঁ দী শক্তি দো গল্লাঁ বিচ হুন্দী হৈ, উসদী বার্তালাপ তে উসদী প্লাট দী শুঞ্জল বীচ।' তার নাটকের বিষয় সামাজিক, এবং ব্যক্তিচেতনার গভীর পরিচয় যেখানে দুর্নীরিক্ষ্য নয়।

'অনহোনী' এক ভয়ঙ্কর সামাজিক নাটক। বৃদ্ধ শেঠ গাঁয়ের গরিব মেয়ে লাজোকে বিয়ে করতে চাইলে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয় কারণ লাজো প্রকৃতপক্ষ শেঠেরই মেয়ে। লাজো সব জেনে আত্মহত্যা করে ও শেঠের প্রতিক্রিয়া তীব্র মর্মস্পর্শী হয়। 'জিয়োন্দী লাশ'-এ চিত্রকর দলীপ তার মডেল কঞ্চনার প্রতি আকৃষ্ট হলেও কঞ্চনা বিরূপ উদাসীন কারণ সে প্রকৃত পক্ষে এক সন্তানের জননী এবং সেজন্য সে উৎপীড়িত ধিকৃত—সে জীবন্ত লাশ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সব রহস্যের জট খোলে তার সন্তানের পিতৃ পরিচয় জানা যায়। 'জোড়িয়াঁ জগ থোড়িয়াঁ' বর্তমান সমাজে অসুখী অতৃপ্ত দম্পতির জ্বালা যন্ত্রণা জটিলতার চিত্র।

কপুর সিং ঘুম্মন নাটক নিয়ে নিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ চলেছেন। 'তার পুতলী ঘর' নাটকের প্রধান চরিত্র নাট্যকার তার অভিনেতাদের নিছক পুতুল রূপে তৈরী করলে তার স্ত্রী প্রতিবাদ করে চলে যায় কিন্তু সে দেখে যে এই সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যেকে যেন ক্রীড়নক। 'বুঝারত' (ধাঁধা) স্ত্রীভবার্গের জীবনের ওপর ভিত্তি করে লেখা পরীক্ষামূলক নাটক। 'অতীত তে পরছাবে' (অতীতের ছায়া ১৯৬৭) একসপেরিমেন্টাল নাটক। স্বামী সংকেতের সঙ্গে লালসা কাশ্মীরে আসে হনিমুনে যেখানে কিন্তু সে একদা অন্য পুরুষের সঙ্গে এসেছে ও তার সন্তানকে সম্ভবতঃ মেরে ফেলা হয়েছিল। অতীত ছায়ামূর্তি ধবে লালসার কাছে আছে ও সে আত্মহত্যা করে। ভাগ্যের পরিহাস এই যে সংকেত তার স্ত্রীর অতীত কথা জেনে তাকে এখানে এনেছিল সেই স্মৃতির ভার থেকে মুক্ত করতে। নাটকের কাহিনী আকর্ষণীয়, গ্রন্থন উচ্চমানের। লালসার অন্তর সত্যকে উদ্ভাসিত করতে নাট্যকার সুররিয়ালিস্ট টেকনিক প্রয়োগ করেছেন। কাব্যনাটক রচনাতেও ঘুম্মন সুদক্ষ। পঞ্জাবী লোককাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা 'রাণী কোকলন' নাট্যকারের শিল্পসৃজন ক্ষমতার

পবিচায়ক। এই নাটকের জন্য ১৯৮২-তে পঞ্জাবী সাহিত্য সমীক্ষা বোর্ড-এর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার পান তিনি।

'পাগল লোক' ১৯৮৪-তে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পায়। নতুন রীতির এই নাটকের বক্তব্য এই গারদের মধ্যের লোকেরা বাইরের লোকের থেকে অনেক স্বাভাবিক। এর পরিণাম হয় কৌতুকজনক যখন উন্মাদ রোগীরা ডাক্তারের পোশাক পরে ও দুজন ডাক্তার বাগলা ও হেমলা যেন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। উন্মত্ততা বলতে নাট্যকার সব অন্যায় অবিচার সামাজিক দুর্নীতিকেও বোঝাতে চেয়েছেন। ঘুম্মন নাটকটাকে ব্রেখটীয় বলে ঘোষণা করেছেন, যদিও নাটকের মধ্যে নাটকের প্রয়োগ একে পিরানদেল্লোর রীতি দিয়েছে।

ডঃ অমরীক সিং (১৯২০) ছদশক থেকে নাট্যরচনায় ব্রতী হন। তিনি সাধারণ মানুষের বর্ণহীন সামান্য জীবনচর্যার মধ্যে নাটক পেয়েছেন ও জীবনের অর্থ অন্বেষণ করেছেন। তাঁর চরিত্রচিত্রণও স্বাভাবিক। আদর্শ সামাজিক মূল্যের স্থাপন ও মিথ্যা মান্যতার খন্ডন তার নাটকের প্রধান অবলম্বন এবং এরই মধ্যে মনবৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খুঁজে পাওয়া যায়।

অমরীক সিং-এর প্রথম নাটক 'রাহা দে নিখেড় তে' (যেথা থেকে সব রাস্তা বেরিয়েছে) এক আদর্শবাদী ডাক্তারকে নিয়ে লেখা যে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে যায়। 'পরছাবিয়াঁ দী পকড়' (ছায়া কে ধরা) নাটকের বিষয় এই যে ধনীরা আপন পাপের প্রেতচ্ছায়া থেকে বাচতে চায় ও সাধারণ মানুষের ওপর তাকে নির্মমভাবে চাপায়। মিল মালিক নিজে অন্যায় থেকে বাঁচার জন্য অনুগত জনকে বিপদাপন্ন করে। 'আঁখ অগ্নে কখ' নাটকে দেখা গেল যে অন্ধ সহকর্মীর চাকরি বাঁচাবার জন্য সহকর্মীরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে যা আইনসম্মত না হলেও মানবিকতার মহৎ পরিচায়ক।

হরসরণ সিং (১৯২৯) আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট ও সম্মানিত নাট্যকার। তিনি মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার রূপকার, শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও তজ্জাত মানসিক আত্মিক উত্তেজনা সংকট তার নাটকে প্রকাশিত।

হরসরণ সিং-এর প্রথম নাটক 'জিগরা' সোহস বিবাহিতা নারীর পূর্ব পুরুষের প্রতি আকর্ষণ, তার মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বন্ধুস্বজনের ধিক্কার ও শেষ পর্যন্ত ফিরে আসা—আধুনিক জীবনের জটিলতা রূপায়িত। 'উদাস লোগ' নাটকে মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার, তাদের সংকট দুঃখবেদনা, পরিবারের প্রত্যেকের বিচ্ছিন্নতা আত্মকেন্দ্রিকতা রূপ পেয়েছে। 'ফুল্ল কুমলা গয়া' (শুকিয়ে যাওয়া ফুল)য় দর্শনা তার উদার স্বভাবের জন্য ধিকৃতা হলে স্বামীকে বলে সমাজের এই পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে। 'নিজাম সককা' (১৯৭৭) নাটকের পটভূমি প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক। সক্কা তাঁকে জলে ডোবা থেকে বাঁচানোয় কৃতজ্ঞ বাদশা হুমায়ুন তাকে একদিনের বাদশাহ্ করে দেন। ওই ঘটনার প্রেক্ষাপটে আধুনিক রাজনীতির শূন্যগর্ভতা প্রতিবাদন করেছেন নাট্যকার।

হরসরণ সিং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চিত্রণে দক্ষ। তাঁর 'কুলচলে' (কুলক্ষণা) মুক্তি ও সহজ প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। এক নারীর সন্তান বাসনা ও স্বামীর নির্বীর্যতা নাটককে চূড়ান্ত মুহূর্তে নিয়ে যায়।

হরসরণ সিং এর 'দোজখি' সম্প্রতিকালের লেখা নাটক দ্বন্দ্বের বহুমুখী রূপ প্রকাশ করে। মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের মানসিক ও শারীরিক শক্তির ওপর দারিদ্র কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাটকে তার দেখানো হয়েছে।

পান্ধী ননকানভী আধুনিককালের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। তিনি তীব্র মাত্রায় সমাজ সচেতন, সামাজিক ভাবনাই তাঁর নাটকের কায়া কান্তি নির্মাণ করেছে, তাঁর নাটকের দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্ব। তাঁর চরিত্র মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে এসেছে, সামাজিক দুর্নীতি ও ব্যভিচার তাঁর নাটকে ফুটেছে এবং মানুষের নীচতা ভণ্ডামীকে তীব্রভাবে আঘাত করেছেন তিনি। এই ক্রূর চতুর নিষ্ঠুর সমাজের অন্যতম শিকার নারী—তাদের দুঃখবেদনা যন্ত্রণার প্রবাহ চ্ছলচ্ছল বয়ে যায়, তাদের অসহায় কান্না আছড়ে পড়ে সমাজের শিলাতটে—নারীজাতির সেই দুঃখবেদনামথিত চিত্র অঙ্কন করে তার প্রতিকার দাবী করেছেন নাট্যকার।

'ফলদার বুটে' (ফলদায়ী বৃক্ষ ১৯৫৭) নাটকে এক বৃদ্ধ জমিদারের এক দরিদ্র পঞ্চদশী কন্যাকে বিবাহ করতে চাওয়ায় যে নিষ্ঠুর নির্মম পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তারই চিত্র। 'উজলী প্রভাত' (১৯৫৯) শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের কথা বলতে গিয়ে মিল মালিকদের স্বার্থপরতা নেতাদের অপদার্থতা ও পত্রিকা সম্পাদকদের হৃদয়হীনতা দেখিয়েছেন। 'শমা দী বলি' (আলোর জন্য বলি ১৯৬১) বিবাহের পর স্বামীকে ঠিক পথে আনার জন্য স্ত্রী নীতার বলিদান। 'টুটে চপু' (ভাঙা দাঁড় ১৯৬২) নাটকে মদ্যপান নিবারণী সভায় আসন্ন নির্বাচন প্রার্থী রূপচাঁদ জোরদার আলোচনা করে প্রস্তাব নিয়ে সকলের মন জয় করার পর সবাই চলে গেল। এক দর্শক ছড়ি খুঁজতে এসে দেখে রূপচাঁদ হুইস্কী খাচ্ছে। সে বলে- জিস মলাহ কোল চপূ হী টুটে হোএ হন উস বেড়ী দা হসর কী হোবেগা (যে নৌকার মাঝি তার দাঁড় ভেঙেছে সেই নৌকার কি অবস্থা হবে)।

'দীবালী দী রাত' (১৯৬৬) নাটকে দেখা গেল কারখানায় কর্মী ও নাট্যকার জীবন সততা আদর্শ নিষ্ঠা ও তেজস্বিতার জন্য কর্মচ্যুত অপমানিত হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে। 'ইক রাত দী গল' (এক রাতের গল্প ১৯৬৭) উগ্র আধুনিক সমাজের নীতিহীন ব্যভিচারের ছবি—সেঠ রতনচাঁদের ছেলে নরেশ কুমারের সঙ্গে সেঠ পরমাচাঁদের মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর রতনচাঁদ সেই বিয়ে ভেঙে দেয় কারণ সেই মেয়েটি একদা অবৈধ সন্তানের জননী হয়েছিল। মেয়েটি আত্মহত্যা করে কিন্তু আসলে নরেশই সব কিছুর জন্য দায়ী, সেও মৃত্যুবরণ করে। 'দরপদী দী ধী' (দ্রৌপদীর মেয়ে ১৯৭২) মাতা কন্যার নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডী। ১৯৪৭-এর দাঙ্গায় ধর্ষিতা দ্রৌপদীকে অধ্যক্ষ আদর্শ আশ্রয় দেয় ও অধ্যাপক অর্জনদাসের সঙ্গে বিবাহ দেয়। দ্রৌপদীর মেয়ে হয় ও সেই মেয়ে উষা ক্রমশ লেখাপড়া শিখে শিক্ষিকা হয়। কিন্তু তার পরিচয় প্রকাশ পেলে উষা বিমূঢ় হয়। অধ্যক্ষ আদর্শের নাতি ডঃ গুলশন উষাকে বিয়ে করতে চাইলে অধ্যক্ষ বাধা দেয়, অধ্যাপক অর্জন দাসের প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যু ঘটে - এক ঘন কালো অন্ধকার ঘনিয়ে আসে মাতা কন্যার জীবনে।

পান্ধী ননকানভীর 'দো রাতাঁ দা চমকোর দীআ' (চমকোরের গড়ে দু রাত) নাটক গুরুগোবিন্দ সিংহ-র দুই ছেলের শহীদ হওয়ার কাহিনী। দুই বীর কিশোর পুত্র বাবা অজিত সিং ও বাবা জুঝার প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে মারা যান। এই দুই মহান সন্তানকে নিয়ে লেখা এই অসামান্য নাটকটি। 'তলবন্তী দী শমহা' (১৯৮৭, তলবন্তীর শিখা বা আলো) নাটকও শিখ ইতিহাসের উজ্জ্বল ছবি আঁকে। ১৬০৬ থেকে ১৭১৬ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় এতে জীবন্ত হয়েছে। মুসলিম শাসকদের কট্টরপন্থা ও হিন্দুধর্মের ওপর অত্যাচার, শিখ ও মুসলিম দ্বন্দ্ব এতে ফুটেছে। এবং লেখক বলতে চেয়েছেন মহামানব নানক দেবের জন্মভূমি তলবন্তীতে যে আলো জ্বলেছিল তাই মানুষকে পথ দেখাবে। ছোট নাটক 'তীহ জনবরী দী ইক শাম' গান্ধীজীর জীবনদর্শনের ওপর আধারিত। মানুষ বোঝে দেশভাগের ফলে কত লোক মারা

গেছে। কত নারী লাঞ্ছিত হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য মা ,ষকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। এজন্য গান্ধীজীর বেদনার শেষ নেই। কিন্তু হায়, গান্ধীজীকেও দেশপ্রেমের মূল্য দিতে হল জীবন দিয়ে।

ডঃ সুরজীত সিং সেঠী (১৯২৮)-র নাম গল্পকার ঔপন্যাসিক সমালোচক হিসাবে খ্যাত, নাট্যক্ষেত্রেও তিনি বিশ্রুত কীর্তি। তিনি নাটক নিয়ে নিয়তই এক্সপেরিমেন্ট করছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল এবং আধুনিক মানসিকতার পরতে পরতে যে যন্ত্রণা জটিলতা যে রহস্যবিস্ময় যে বিসর্পিল আবর্ত তার নিপুণ উদঘোষক তিনি। তিনি প্রবলভাবেই সমাজ সচেতন, সামাজিক জীবনচর্যা তাঁর নাটকে নিত্য লব্ধ হয়। অ্যাবসার্ড তত্ত্বদর্শন-ও তাঁকে প্রভাবিত করেছে।

'কাফী হাউস' নাটকে বোম্বে তথা আধুনিক ভারতীয় সমাজের কুৎসিত ও কৃত্রিম ঘৃণ্যরূপ তুলে ধরা হয়েছে। রাজিন্দরের স্ত্রী অঞ্জনার সঙ্গে পূর্বে এক ব্যক্তির সম্পর্কের ফলে তার সন্তান হয়েছিল ও সেজন্য সেই ব্যক্তি অঞ্জনাকে কবজা করতে চায়। অঞ্জনার ভাই তাকে হত্যা করে বোনের সম্মান বাঁচায় ও আদালতে আত্মসমর্পণ করে। 'কচ্চা ঘড়া' বাস্তব রীতিতে লেখা মনস্তাত্ত্বিক নাটক। 'কাদর ইয়ার' পঞ্জাবী লোককাব্য 'পূর্ণ ভগত' এর লেখক কাদর ইয়ারের জটিল বিচিত্র জীবন নিয়ে লেখা নাটক। 'মির্জা মেরে ইয়ার' ইতিহাসের পটভূমিকায় গভীর প্রেম, প্রবল বন্ধুত্ব, তীব্র প্রতিহিংসা, উন্মত্ত ক্রোধের নাটক।

'কিং, মির্জা তে সপেরা' (কিং, মির্জা ও সপেরা) নাটকে অ্যাবসার্ড রীতির অনেকটা প্রয়োগ পাওয়া যায়। কিং, মির্জা ও সপেরা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে একটি সাত তলা বাড়ির ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে বলে এসেছে। একটি মেয়ে সুলতানা তাদের কাছে এসে বলে যে তাদের মৃত্যু কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে না, বরং তা ব্যর্থ ও মিথ্যা হবে। তারা বেকেটের চরিত্রের মত বিভিন্ন বিষয়ে এলোমেলো কথা বলে। হঠাৎ দেখা গেল ঐ বাড়ীতেই এক নববিবাহিত দম্পতি ওপর থেকে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। এরা ভাবে পরিস্থিতি তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তাছাড়া আত্মহত্যা ব্যাপারটার তুচ্ছতা অকিঞ্চিৎকরত্বও তারা উপলব্ধি করে। 'দূর বহুত দূর' এ এক দুর্গম আঁকা বাঁকা পথে চলা তরুণ যুবক দুঃসাহসিকভাবে মৃত্যুকে বরণ করে। দুর্গম বঙ্কিম পার্বত্য পথ মানবজীবনের প্রতীক, দুঃসাহসিক তরুণ সেই জীবনের পথে চলে মৃত্যুকে বরণ করে কিন্তু সে এক উজ্জ্বল বলিষ্ঠ মূর্তি। 'নংগী সড়ক রাত দী ওহলা' (রাতের অন্ধকারে নির্জন রাস্তা)য় (১৯৭৩) নাট্যকার দেখিয়েছেন যে মানুষ প্রতিবেশের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারে না। বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবে তিনি অবাধ যৌনতাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

'ইহ জিন্দগী হ্যয় দোস্‌তো' (১৯৭৬) নাটকে আধুনিক সমাজ জীবনের দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারের ওপর তীব্র ব্যঙ্গ ধরা পড়েছে। নারীজাতির ওপর উৎপীড়ন ও এক্সপ্লয়টেশন, সামাজিক অসততা, পুলিশী সন্ত্রাস ও সমাজের প্রতিটি মানুষের অজস্র সমস্যা নাট্যকার তুলে ধরেছেন। কিন্তু এর প্রতিকার কোথায় নাট্যকার বলেননি। সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন এটাই হল জীবন এবং নেচে গেয়েই এ জীবন কাটাতে হবে সমস্যার দিকে না তাকিয়ে। ভূমিকার প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করা যায়—

মেরে ইস নাটক দা নাঁ হ্যয়
ইহ জিন্দগী হ্যয় দোসতো.....
কিহড়ী জিন্দগী? (কোন জীবন)

উহ জিন্দগী জো তুসী রোজ জীউন্দে হো
জো তুহানু জিউনি প্যয় বহী হ্যায় (যা
তোমাকে কাটাতে হবে)
পব জয়দীপ ইস নাটক দা নায়িক
ইক বখবী (বিভিন্ন) জিন্দগী নাল বী
তুহাড়া প্রিচৈ করবাউন্দা হ্যয়
(জয়দীপ বিভিন্ন চরিত্রেব সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়)।
বখরী তে নবী (নতুন) জিন্দগী
তে হুন (এখন) উহ বস এনা (কেবল এই) বোলদা হায় :
ওয়ান টু থ্রী
দিস ইস লাইফ ইউ সী।

৪. সাম্প্রতিক পর্ব

সামপ্রতিক পঞ্জাবী নাটক বিচিত্র ভাবনায় উদ্ভাসিত, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে যা বহুবিধ সুরের সমন্বয়ে এক ঐকতান সঙ্গীত রচনা করে। নাটকে কখনো অ্যাবসার্ডিটির প্রকাশ থাকে এবং রূপক প্রতীকের সংকেত দ্যোতিত পরিমণ্ডল রচিত হয়; কখনো উজ্জ্বল উদ্ভাস পাওয়া যায়; শিখ-চেতনার দুর্বার প্রকাশও ঘটে; অথবা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থাব অগ্নি স্ফুরিত শপথ ঘোষিত হয়।

জীবনের অবক্ষয়, সীমাহীন শূন্যতা, আর্তি নৈরাশ্যের বর্ণহীন স্বপ্ন, নেতিবাদের গহ্বরে আত্মার নিমজ্জন—অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণ। এ্যাবসার্ড নাটকের দর্শন শূন্যতার দর্শন অবক্ষয়ের দর্শন। অ্যাবসার্ড বা অধিবাস্তব হল তাই যা উদ্দেশ্য বর্জিত। তার ধর্মীয় অধিবিদ্যামূলক তুরীয় উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ হয় সর্বশূন্য রিক্ত ও তার সমস্ত কার্যবিধি হয়ে ওঠে অর্থহীন উদ্ভট অপ্রয়োজনীয়।[১৭] এই রীতি অনুযায়ী নাটক লিখেছেন আতমজিৎ সিং, রবিন্দর রবি, অজাইব কমল প্রমুখ। প্রবীণ সুরজীত সিং সেঠীও এই জাতীয় নাটক লিখেছেন।

ড. আতমজীত (১৯৫০) অমৃতসর কলা মন্দির-এর প্রাণপুরুষ, একজন অগ্রণী প্রতিভাবান নাট্যকার ও বিশিষ্ট পরিচালক। তাঁর প্রথম নাটক 'চাবিয়া' ১৯৭৬ প্রকাশিত হবার পরই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মানবজীবনের অ্যাবসার্ডিটি এখানে কথিত। আজ মানুষের জীবন সর্বত্র বন্ধনে সংবদ্ধ। এই বাঁধন থেকে মুক্তির পথ কি? মুক্তির চাবি রয়েছে অন্যত্র অপরের হাতে। 'মুর্গীখানা' বিষয় ও রীতির সংমিশ্রণে সুন্দর। এটা কাব্যনাটক—নাট্যোপযোগী পরিমিত ছন্দবিন্যাসময়। অভিনেতারা প্রতীক হিসাবে মুর্গীর পোষাক পরেছে ও বিভিন্ন ধরনের নাটকীয় কারিকুরি করেছে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করার জন্য। একজোড়া বিদূষক আছে যারা নকলী ও ভাঁড়ের ঐতিহ্যবহ। 'সাড়ে তিন লটন বালা মেজ' (সাড়ে তিন পা ওয়ালা টেবিল) আধুনিক জীবনের জটিলতার রূপ। 'হাওয়া মহল'ও অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 'পূরণ' পঞ্জাবের প্রাচীন চরিত্র পূরণ ভগত ও লুনার কাহিনী অবলম্বনে রচিত। পূরণ চরিত্রের মধ্যে লেখক পঞ্জাবী মিথের যথাযথ প্রকাশ দেখেছেন। তাঁর অন্যান্য নাটক হল 'কব্রিস্তান' 'রিস্তিয়া দা কী রখিয়ে নাঁ', 'ফর্শ বিচ উগ্যা রূখ' 'শহর বীমার হ্যয়', 'দুন্নী তিন্নী চৌকী' 'আঁখে' 'অমৃতসর সিফতী কা ঘর' ইত্যাদি। সাদাত হাসান মন্টোর বিখ্যাত গল্প 'টোবা টেক সিং' অবলম্বনে লেখা 'রিস্তিয়া দা কী রাখিয়ে নাঁ' এক অসাধারণ নাটক যেটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সগৌরবে অভিনীত

হয়েছে। কাহিনীটা স্মরণ করা যাক। দেশবিভাগের কবছর পর ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের কর্তাদের খেয়াল হল কয়েদীদের মত পাগলদেরও আদানপ্রদান করতে হবে। কিন্তু পাগলরা জানে না হিন্দুস্তান বা পাকিস্তান কি এবং তারা কোথাকার লোক। ভেবে টেবে তাদের মাথা আরও খারাপ হয়ে গেল। ১৫ বছর ধরে এক পাগল ছিল যাকে সবাই বলত টোবা টেক যেখানে নাকি তার বাড়ি ছিল। তাকে কেউ প্রশ্ন করলে সে বলত ওপড় দী গড়গড় দী বেধ্যানিয়া দী মুঙ্গী দী দান অফ দী লালটেন ইত্যাদি। সবাইকে জোর করে সীমান্তে পাঠালে টোবা টেক সিং কোথাও না গিয়ে এক পা হিন্দুস্তান আর এক পা পাকিস্তানে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং শেষ পর্যন্ত এক অন্তিম চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল। তার একদিকে হিন্দু অন্যদিকে মুসলমান পাগলরা। আর সে নো ম্যানস ল্যান্ড-এ পড়ে রইল। এই অসাধারণ গল্পকে সুন্দর নাটকে পরিণত করেছেন আতমজিত।

অজমের সিং অউলখ (১৯৪২) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক। তিনি মনসা লোক কলা মঞ্চর প্রতিষ্ঠাতা। বেশ কটি নাটক তিনি লিখেছেন। নাট্য পরিচালনায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুখদুঃখময় জীবনের রূপ তিনি তুলে ধরেছেন, কখনো ব্যঙ্গে বিদ্রূপে তিনি তীব্র হয়ে উঠেছেন। আমাদের পরিচিত জীবন থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং তাকে নাটকীয়তায় বিন্যস্ত করেছেন। পঞ্জাব তথা ভারতবর্ষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট তাঁর নাটকে প্রতিফলিত। তাঁর ছোট বড় নাটক হল 'অরবদ নরবদ ধুন্ধুকবা' (১৯৭৮), 'বগানে বোহড় দী ছাঁ' (১৯৮১), 'মেরে চোভেঁ ইকাঙ্গী' (১৯৮৫), 'গণি' (১৯৯০); 'সাতবেগানে' (১৯৮৭), 'ভজিয়া বাহা' 'কেহর সিং দী মৌত' (১৯৯২), 'সালবাঁ' (১৯৯৪), 'ঝনান দে পাণি' (১৯৯৭) ইত্যাদি। 'গণি' (গলার হার) নাটক তীব্র কৌতুকব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে সামাজিক অসঙ্গতির চিত্র তুলে ধরে। বিমান দুর্ঘটনায় মন্ত্রী মারা গেছে, আর এক রাখাল খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মরা ছাগলের দেহ—দুটোই যেন এক হয়ে যায়। 'বগালে বোহড় দী ছাঁ' (পরের বটগাছের ছায়া) সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র অঙ্কন করে। এক ছোট কৃষক গজ্জন সিং। গজ্জন সিং পরিশ্রম করে আর ধারধোর করে সংসার চালায়। ঘরে আছে বৌ, দুই ছেলে, মেয়ে, ভাই আর ভাইয়ের বৌ। ঋণে সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, ছেলেদের লেখাপড়া ভবিষ্যৎ, অসুস্থতার চিকিৎসা ব্যয়, মেয়ের বিয়ের জন্য পণের টাকা জোগাড় ইত্যাদির চাপ আছে। গাঁয়ের সুদখোর মহাজন টাকা আদায়ের জন্য নির্মম হয়। গাঁয়ের এক প্রতিপত্তিশালী অংশ গজ্জন সিংদের জমিতে চাষের জল বন্ধ করে দেয়, এনিয়েও প্রবল সংকট। নাটকে এই সব জটিলতার ছবি। 'সাত বেগানে' (সাত অচেনা বিদেশাগত) দেখিয়েছে দুঃখ-দারিদ্র ও জাতিগত সংস্কারে একটি পরিবার আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রামজীবনের এইসব রূপ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় যার রূপায়ণে নাট্যকার দক্ষতা দেখিয়েছেন। অউলখের বিভিন্ন নাটকের পাঁচ শতাধিক অভিনয় হয়েছে। তাঁকে যথার্থই বলা হয় playwright of small peasantry.

রবিন্দর রবি-র (১৯৩৭) 'বীমার সাদি' (অসুস্থ শতাব্দী) ও **অজাইব কমল**-এর 'ল্যাংড়া আশমান' (খোঁড়া আকাশ) মুক্ত ছন্দে লেখা অ্যাবসার্ড ধর্মী নাটক যাতে প্রগতি ও সভ্যতার অ্যাবসার্ডিটিকে তুলে ধরা হয়েছে। 'বীমার সাদি'তে বিংশশতাব্দীর অস্তিত্বের পরিবর্তিত, অবক্ষয়ক্লিষ্ট ও বিচূর্ণ মূল্য বোধের অধিবিদ্যামূলক জিজ্ঞাসা তুলে ধরা হয়েছে। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন—ইউরোপীয় দেশসমূহে অভিনব পরীক্ষা চলছে আধুনিক মানব জীবনের বহুস্তর ব্যক্তিত্ব বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনন্ত ডাইমেনশনকে প্রকাশ

কবার জন্য। আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের জটিল দুর্ভেদ্য ইন্দ্রিয়াতীত ও অ্যাবসার্ড প্রকৃতিকে নাট্যবিধৃত করার চেষ্টা চলেছে এভাবে।

অজাইব কমল-এর 'ধরতীনামা' (ধবিত্রীর গল্প) নাটকে মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণেব চরিত্রগুলোকে অস্তিত্ববাদী ভাবনায় বিচার করা হয়েছে।

কিছু উচ্চমানের কাব্য নাটকও লেখা হয়েছে সাম্প্রতিককালে। সন্ত সিং সেখোঁ, কর্তাব সিং দুগ্গল, বীরেন্দ্র তারা প্রমুখ লিখে আসছেন কাব্যনাটক।

শিবকুমার-এর 'লুনা' আধুনিক কালের এক অসাধারণ রচনা, প্রচলিত লোককাহিনী এর ভিত্তি। তরুণী লুনাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ রাজা সালবার সঙ্গে বিবাহ দিলে অসুখী অতৃপ্ত লূনা সমবয়সী সপত্নীপুত্র পুরণের প্রতি আকৃষ্ট হলে পূরণ তাকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে ও ক্রুদ্ধ লূনার নির্দেশে পূরণের প্রাণদন্ড হয়। নাট্যকার দেখিয়েছেন কি সমাজ ব্যবস্থায় লূনাকে এই দুঃখের জীবন বরণ করতে হয়, এবং পূরণকেও তিনি শহীদের মর্যাদা দিয়েছেন। আগুনের প্রতীক, পৌরাণিক উল্লেখ, সুন্দর বর্ণনা, জীবন্ত সংলাপ ও কাব্যিক গভীরতা এবং এক বিদ্রোহিনী নারীর কথা 'লূনা'কে অসাধারণ করেছে।

দিদার সিং-এর 'সুমেল' (পূর্ণ মিল) দার্শনিক বক্তব্য নাট্যকাব্যের রূপে প্রকাশিত। 'চার্বাক' বিশিষ্ট বস্তুবাদী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক চার্বাকের জীবন ও কার্যের নবভাষ্য। **এম এল সেবক** 'ফরহাদ' কাব্যনাটকে দেখিয়েছেন একজন বিপ্লবী যুবক উন্নতর জীবনের জন্য সংগ্রাম করে ব্যর্থ হলেও মনস্তাপে জীবনের যবনিকা না ফেলে কমরেডদের সঙ্গে যোগ দেয়। **গুরুদয়াল সিং ফুল্ল**-এর 'কলযুগ রথ অগন কা' (নরকের আগুন) তিনটি দীর্ঘ মনোলগে আধুনিক সমাজে নারীদের দুরবস্থা ও পুরুষদের লোভলালসার কথা বলেছেন।

রবিন্দর সিং সোটী (১৯৫১) তরুণ নাট্যকার এবং বিশেষ প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন। তাঁর 'হিন্দ দী চাদর' গুরু তেগ বাহাদুরের জীবন আদর্শ ও মহান আত্মত্যাগ নিয়ে লেখা। নাটকের প্রথমাংশে সহজ সরল অথচ মহাপ্রাণ গুরুর অন্বেষণ যেমন সুন্দর, নাটকের শেষাংশে গুরুজীকে হত্যার পর এক উদ্দাম উত্তাল পরিবেশে মোগল সেনাদের চোখে ধুলো দিয়ে গুরুর মরদেহ তার শিষ্যগণ কর্তৃক সংগ্রহণ করার দৃশ্যটিও অতিশয় আকর্ষণীয় ও নাট্যগুণসম্পন্ন।

নকশালবাড়ীর রাজনীতি পঞ্জাবী সাহিত্যে এসেছে অগ্নিপ্রভ মূর্তিতে। চোখে সোনালী স্বপ্ন বুকে প্রদীপ্ত আগুন মনে কঠিন শপথ নিয়ে একদল ছেলে আবিভূর্ত হয়েছিল যাবা সশস্ত্র রক্তাক্ত শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল উৎপাটিত করে শাসন শোষণ মুক্ত সর্বহারার মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল—আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায় শোনা গিয়েছিল বিদ্রোহের পদধ্বনি, বিপ্লবের দাউ দাউ অগ্নিশিখা জ্বলেছিল, রক্তে রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল পূর্ব কোণ। পঞ্জাবী সাহিত্য এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। নাটকেও পড়েছে তার দীপ্ত প্রভাব।

ভারতবিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যবিদ **বলরাজ সাহনী** (১৯১৩-১৯৭৩) ১৯৪০ সালে বি বি সি-র তরফ থেকে এক সাংবাদিক প্রতিনিধির দলে চীনে যান ও চাইনিজ পিপল্‌স থিয়েটার দেখে মুগ্ধ হন। তিনি ১৯৪৪ সালে আই পি টি এতে যোগ দেন যার কার্যকলাপ তার কাছে চাইনিজ পিপলস থিয়েটারের অনুরূপ মনে হয়। তখন খাজা আহমদ আব্বাস বোম্বে গণনাট্য সংঘের প্রধান পুরুষ। উত্তরকালে বলরাজ সাহনী একটি উল্লেখ্য নাটক লেখেন—'কি ইহ সচ হায় বাপু?' (প্রকাশ ১৯৭৪)। ১৯৬৭র হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা। ভারতবর্ষের রাজনীতি সমাজনীতির বিবিধ প্রসঙ্গ নাটকে এসেছে।

বিচিত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন গান্ধীজী নেহরু সুভাষচন্দ্র বসু ভগৎ সিং। এবং নকশাল বিপ্লবীদের মন্ত্রবাণীও উচ্চারিত হয়েছে—ইনকিলাব বন্দুক দি নালী বিচো নিকলদা হ্যয়।

অমরজীত গ্রেবাল (১৯৫২) এর 'দো ঘড়িয়া দা নাটক' (১৯৭৬) নকশালবাড়িব রাজনীতি নিয়ে লেখা—এর আদর্শ নীতিনিষ্ঠা সাফল্য ত্রুটি বিচ্যুতি সবকিছুই নাট্যকার ধরবার চেষ্টা করেছেন। দর্শন বিপ্লবের কবিতা লেখে, নকশাল বিপ্লবীদের সঙ্গে তাব যোগাযোগ আছে। এক বদমায়েশ জৈলদার বিপ্লবীদের হাতে নিহত হলে দর্শনকে তাতে জড়ানো হয় কিন্তু সে পালিয়ে বিপ্লবীদের ডেরা জিৎ এর বাড়ি আশ্রয় নেয়। কমরেডরা জঙ্গী নকশাল নেতা শেবকে ছিনিয়ে আনে পুলিশের হাত থেকে। পার্টি স্থির করে শক্তিশালী অর্থবান ও পুলিশের এজেন্ট সাধুকে হত্যা কবতে হবে ও দর্শনের ওপর সে ভার পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত দর্শন সাধুর কন্যা ইন্দুর অনুরাগী। দর্শন সাধুকে মারতে পারে না, গাড়িতে তার সঙ্গে কটা বাচ্চাও ছিল। শের সাধুকে মারে, ইন্দুও তাতে নিহত হয়। পুলিশের সন্ত্রাস বেড়ে যায়। সাধুর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ও পার্টির কাছে বিশ্বাসঘাতক বলে বিবেচিত দর্শন মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য সেই মূর্তি ভাঙতে গেলে পুলিশ ঠাণ্ডা মাথায় তাকে খুন করে। দর্শনের মা শোকে ভেঙে পড়ে, সে প্রতিশোধ নেবে পুলিশেব ওপর। জিৎ নিজের ওপর দায়িত্ব নেয়, বলে যে তারাই দর্শনের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

গুরশরণ সিং (১৯২৯) আধুনিক পঞ্জাবী নাটক্ষেত্রে এক প্রবল বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। এই কমিটেড থিয়েটার-কর্মী লোকনাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিপ্লবী নাটকের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি ১৯৬৪ সালে অমৃতসর নাটক কলা কেন্দ্র স্থাপন করেন। বিপ্লবী রাজনীতি মার্কসবাদী লেনিনবাদী প্রত্যয় তাঁর নাটকে গভীর প্রভাব মুদ্রিত করেছে ও সেই আদর্শে তিনি সমাজকে নতুন করে গড়তে চেয়েছেন। তিনি বিখ্যাত পঞ্জাবী নাটক সমূহ মঞ্চস্থ করেছেন, উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন, ম্যাকসিম গোর্কী প্রমুখ সমজতান্ত্রিক শিল্পীদের নাটক অভিনয় করিয়েছেন, নিজেও লিখেছেন অজস্র নাটক। সাধারণভাবে সমাজ সচেতন নাটক রচনা এবং পরিচালনা করলেও সত্তরের প্রথম থেকেই বিপ্লবকে তিনি নাটকের প্রধান উপজীব্য বলে মনে করেছেন এবং শোষিত নিপীড়িত সর্বহারা মানুষই তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা হয়েছে। শতাধিক নাটক তিনি লিখেছেন যাতে তার বিদ্রোহী মানসিকতা ধরা পড়েছে। এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়েও তাঁর প্রতিভা বিচ্ছুরিত হয়েছে।

'দমক নগাড়ে দী' আকবরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী পঞ্জাবের গণনায়ক দুল্লা ভাট্টির জীবন নিয়ে লেখা। পুরুষানুক্রমে মোগলদের অত্যাচারে জর্জরিত ভাট্টি-জাতের উত্তর পুরুষ দুল্লা প্রতিশোধ নেবে। প্রথমে সে ধনী ও সামন্ত প্রভুদের আক্রমণ লুণ্ঠন করত, মোগল শাসকদের পর্যুদস্ত করত। ক্রমে তার ব্যক্তিগত ক্রোধ এক বিরাট সার্বিক রূপ পায়। তার নেতৃত্বে এক প্রবল সশস্ত্র সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম শুরু হয় অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এই লড়াই যেন একালের-ও। গুরশরণ সিং গোবিন্দ সিং ও গুরু তেগ বাহাদুরের জীবন নিয়ে নাটক লিখেছেন ও অভিনয় করেছেন অসংখ্য। কিন্তু তাঁদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রূপ না দিয়ে বিপ্লবী রূপেই চিত্রিত করেছেন যাঁরা সনাতনী ধ্যানধারণা সামাজিক দুর্নীতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন ও সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন প্রবলভাবে। রাজনৈতিক নাটক 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ভগৎসিং থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিপ্লবীদের আদর্শ রূপায়ণ। 'গল রোটী দী অতে কিস্সা

কুর্সীকা' (রুটীর গল্প ও কুর্সীর কাহিনী) নাটকের বক্তব্যও তীক্ষ্ণ তীব্র। আধুনিক পঞ্জাবী নাট্য ক্ষেত্রে গুরশরণ সিং-এর ভূমিকা অবিসংবাদী।

গুরশরণ সিং-এর একটি নাটকের বিষয়ে তাঁর কথাই শোনা যাক। "১৯৮২-তে আমি 'এক কুর্শি, মোর্চা, আউর হাওয়া সে লটক হয়ে লোগ' নামে একটি নাটক লিখি। কুর্শিটি ছিল কংগ্রেসের দরবারা সিং-এর, মোর্চা ছিল শিরোমণি অকালি দলের 'ধর্মযুদ্ধ মোর্চা' (আমি এটাকে এক মঞ্জীওয়ালা রূপে প্রতীকী করি) আর হাওয়ায় ভেসে থাকা লোকেরা ছিল বেকাব তরুণরা ছিন্নমূল শ্রমিকেরা, এক নারী যার কন্যা ধর্ষিতা আর এক কৃষক যার তোলা ফসল সে হারিয়েছে। কৃষক কুর্শি অর্থাৎ শাসকের কাছে যায় একটা কাজ চাইতে। সে বলে যে সে ১৬ ক্লাস (এম. এ) পড়েছে। কুর্শি তাকে বলে—'আমি কি তোমাকে পড়তে বলেছিলাম? তোমার আরো কম পড়াশুনা করা উচিত ছিল'। তারপর সে মঞ্জীওয়ালার কাছে একটা চাকরি চায়। মঞ্জীওয়ালা তাকে বলে—'জানি না আমি তোমাকে চাকরী দিতে পারব না, কিন্তু আমি তোমাকে অবশ্য শেখাতে পারি কি করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাইতে হয়। তুমি যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাও তো তোমার কোনো সমস্যাই থাকবে না"। (নাট্যপত্র—নভেম্বর ১৯৯৯)।

Gursharan's work is not mere depiction of events. He tries to go to the root cause of unrest–social, cultural as well as political.

Many of his short plays like Nava Zamana, Mitti De Poot etc. explore the complicated caste matrix in Punjab. Nava Zamana traces the rise of the son of a 'sassiya' community elder, Shibbu to the rank of an officer. Shibbu has spent his life serving the jat landlord and cannot see why his son tries to stop him from doing so. Respect for the working class and particularly the desire to instill this feeling amongst the scheduled castes and scheduled tribes in Punjab is one of Gursharan's aims.

He attacks both the establishment and the fundamentalists as self-seekers. The plight of the teeming educated unemployed in Punjab, the exploitation of the illiterate in the name of religion and by the rich peasants is clearly etched in play after play. Gursharan's strength lies in his deep knowledge of the land of the five rivers, attachment to the beauty of the language and gift for catching that elusive thing called humour. একথা Kavita Nagpal গুরশরণ সিং-এর নাটক সম্বন্ধে বলেছেন, Business Standard-1989এ।

গুরশরণ সিং মৌলবাদ ও ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, শাসক গোষ্ঠীর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেছেন, কর্মচ্যুত ও কারারুদ্ধ হলেও নাটক করা ছাড়েননি, তিনি চিরকাল শোষিত নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের সপক্ষে কথা বলেছেন। তিনি মূলত গ্রামেই নাটক করেন, জনসাধারণের অর্থেই তাঁর নাট্যচর্চা চলে, মানুষের কাছ থেকে তিনি কখনোই দূরে সরে যাননি। ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে পঞ্জাবী নাট্যকার হিসেবে সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কার পান। তার প্রতিবাদী নির্ভীক কণ্ঠস্বর কোনদিন স্তব্ধ হবে না।

আধুনিক নাটক মঞ্চায়ণ ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে ও পঞ্জাবী শিল্পীদের ভূমিকা গৌরবময়। একদা গণনাট্যসঙ্ঘের বিশিষ্ট সদস্য সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয় পটীয়সী প্রতিভাময়ী শিল্পী শীলা ভাটিয়া মূলত অপেরার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটক রচনায় ও গ্রন্থনায় তিনি সুদক্ষ। প্রায় তিন দর্শক আগে তিনি দিল্লী আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠা

করেন এবং এই সংস্থা প্রযোজিত নাটক সমূহ বিশাল খ্যাতি পায়। শীলা ভাটিয়ার 'হীর রাঞ্ঝা' গাম্ভীর্যে মহিমায় মাধুর্যে ঐশ্বর্যয়তায় দেশ বিদেশের রসিকচিত্ত জয় করেছে। তাঁর রচিত ও পরিচালিত 'দর্দ আয়েগা দবে পাও' গায়ক কবি ফৈজ-এর জীবন ও কাব্য নিয়ে লেখা সুশিল্পিত নাটক। 'ইহ ইশাক নহী আসান' এক ম্যাজিকাল ফ্যানট্যাসিয়া। কয়েকটি চরিত্র সমন্বিত শিথিল কাহিনীমগ্ন বক্তব্যকে সুরে সঙ্গীতে শিল্পময়তায় অপূর্ব করে তোলা হয়েছে। আধুনিক নাট্য সংস্কৃতিতে শীলা ভাটিয়া এক উজ্জ্বল আলোকিত নাম।

ডঃ চরণদাস সিধু (সিদ্ধু, ১৯৩৮) আধুনিক সময়ের এক বিশিষ্ট নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও নাট্যতত্ত্ববিদ। 'ভজনো'র জন্য তিনি পঞ্জাবী অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। তাঁর ইতিহাস-জ্ঞান, সমাজ-চেতনা, জীবন-অনুভব নাটকীয়তায় অপরূপ শিল্পিত হয়েছে। সিধু সৌখীন নাট্যচর্চা করেন না, witty bedroom farces রচনায় তাঁর কোন প্রবৃত্তি নেই। কঠিন কঠোর মৃত্তিকাসন্নিকর্ষ জীবন তাকে তীব্র আকর্ষণে জড়িয়ে ফেলে এবং তার রূপ প্রকাশ্যে তিনি সচেষ্ট হন। ভূমিহীন অসহায় মানুষ, শিশু শ্রমিক, নিপীড়িত তরুণী, অসহ্য দারিদ্র তিনি দেখেছেন এবং নাটকে তাকে রূপ দিতে প্রয়াশী হয়েছেন সফলভাবে। অবশ্য তাঁর চরিত্ররা কঠিন বিপর্যয়ের মধ্যেও পরাজয় স্বীকার করে না, অদম্য প্রাণশক্তি তাদের ললাটে পরিয়ে দেয় জয়ের তিলক।

তাঁর প্রথম নাটক 'ইন্দুমতী সত্যদেব' (১৯৭৩) ইতিহাস ও পুরাণের সমন্বয়। ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর্য ও অন-আর্যদের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে লেখা, রাজা ভরত-এর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে কাশী উপজাতির প্রধান সত্যদেবের প্রণয় এতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে যদিও পরিণতি মর্মান্তিক। লেখক প্রাচীনের পটভূমিকায় আধুনিক ভারতবর্ষকে তুলে ধরেছেন—ক্ষমতা দখলের প্রয়াস, দলাদলি, অন্যায় দুর্নীতি এবং তার মধ্যেও কিছু মহৎ ভাবনা—ভারতবর্ষের অবস্থা আজও অপরিবর্তিত। এক মহৎ পরীক্ষামূলক প্রয়াস রূপে 'ইন্দুমতী সত্যদেব' অভিনন্দিত হয়েছে। ডঃ সিধুর অন্যান্য নাটক হল 'স্বামীজী' (১৯৭৫), 'ভজনো' (১৯৭৫, পঞ্জাবের গ্রামজীবনের ছবি), 'বাবা বন্টু' (১৯৮১, এক সর্পপূজকের জীবন ও মৃত্যুর কথা), 'কাল কলেজ বন্ধ রহেগা' (১৯৮১, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব চিত্র), 'বাত ফত্তু ঝীর দী' (১৯৮২-ভারতবর্ষের দারিদ্রের রূপ ও কারণ নির্ণয়), 'মস্ত মেঘোওয়ালা' (১৯৮৬—এক উন্মাদ তরুণের ন্যায়ের জন্য লড়াই), 'শেকসপীয়র দি ধী' (১৯৮৬ পণের জন্য এক তরুণী নারীর ওপর অত্যাচার যে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা পায়), 'প্রেম পিকাসো' (১৯৯০—শিল্প, ভালবাসা ও বিবাহ নিয়ে কমেডি)।

চরণদাস সিধু শহীদ ভগত সিংহর জীবন নিয়ে নাটক লেখার কথা ২৫ বছর ধরে ভেবেছেন, তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন তার জীবন ও কর্ম নিয়ে এবং ১৯৯৮ সনে প্রকাশিত হয় ভগত সিংহর জীবনভিত্তিক ত্রয়ী নাটক 'ভগত সিংহ শহীদ'। ১ম পর্ব 'ভাগ্যবান পোতা' অমর শহীদের বাল্যাবস্থার ওপর ভিত্তি করে লেখা; ২য় পর্ব 'ইনকলাবী পুত্র' তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার ওপর আধারিত; তৃতীয় পর্ব 'নাস্তিক শহীদ' বিপ্লবীর অন্তিম পর্বের কথা। তিনটি পর্ব স্বতন্ত্র নাটকরূপেও বিবেচিত হতে পারে এবং এরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত হয়েই মঞ্চস্থ হয়েছে। তিনটি নাটকেই ভগত সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অশ্বনী চডডা, সঙ্গীত নির্দেশক বীণা সিধু তনেজা, পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করেন রবি তনেজা। 'ভগত সিংহ শহীদ' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই নাটক চরণদাস সিধুর এক মহৎ শিল্পকর্মরূপে বিবেচিত হবে। তাঁর প্রত্যেক নাটকেই সিধু উজ্জ্বল উদ্ভাসিত।

২০০০ সালে প্রকাশিত হয় ড. সিধু-র তিনটি নাটক। 'কিসসা পণ্ডিত কালু ঘুমর'—জাতপাত এবং ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার এবং রুখে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে নাটকে। হিন্দু-মুসলমান বিবাহে সমাজের প্রবল ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে নাটকে। আকবর আলি-র ছেলে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করলে গ্রামে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। অন্য এক গ্রামের সরপঞ্চ উদারমনস্ক মোহন সিং আকবর আলি ও তার মেয়ে রোশনারাকে আশ্রয় দেয় তাদের গ্রামে। মোহন সিং-এর প্রতিবেশী এক হিন্দু পণ্ডিতের ছেলে কুলশ্রেষ্ঠ অন্যত্র আশ্রমে থাকে ও ছুটিতে বাড়ী আসে। রোশনারা ও কুলশ্রেষ্ঠর মধ্যে আবার হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিস্থিতি জটিল হয় ও প্রেমিকরা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। নাটকটি নতুন রীতিতে উপস্থাপিত হয় কলেজিয়েট ড্রামা সোসাইটির উদ্যোগে রবি তনেজার পরিচালনায়। দর্শকরা অর্ধবৃত্তাকারে বসে ও রামলীলার বা লোকনাটকের আদল নির্মিত হয়। সঙ্গীতের প্রয়োগ ছিল সুন্দর। 'পূনম দে বিছুয়ে' নাটকে ভারতবর্ষে বিশেষত হিন্দু পরিবারে নারীজাতির সমস্যা ও সংকট তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মের নামে অধিকারের নামে পুরুষ প্রবল অত্যাচার করে নারীর ওপর। এই নাটকের প্রধান চরিত্র পূনম, সে তরুণী অধ্যাপিকা। বাল্যকাল থেকেই পূনম পুরষদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত তাকে যারা বারবার আহত বিপর্যস্ত করতে চেয়েছে। তাকে আঘাত দিয়েছে তার স্বামী নয়, তার বাবা দৌলত রাম জুনেজা। কিন্তু তেজস্বিনী পূনম লড়াই করে—সে প্রেরণা পায় তার প্রয়াত জননীর ডায়েরী পড়ে এবং প্রাচ্যপাশ্চাত্য কবি ও চিন্তাবিদদের কাছ থেকে। তৃতীয় নাটক 'শাসতরী দী দিবালী' হল একটি 'সুখান্ত পরিবারিক নাটক' যার বিষয় হল ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার দ্বন্দ্ব। পরিবারের প্রাচীনপন্থী পিতামাতার সঙ্গে অতি নবীন উত্তরপুরুষদের সংঘাত প্রবল রূপ পেয়েছে। এই নাটকটিরও প্রথম মঞ্চন করে ১৯৯৮-এর ফেব্রুয়ারিতে দি লিটল থিয়েটার গ্রুপ নিউ দিল্লী।

ড: সিধুর তেত্রিশতম নাটক 'ওয়ওনা ওয়ল ফেরা' (জন্মভূমিতে ফেরা)। এটা শেখায়—সব মানুষের কাছ থেকে শেখার আছে। সে তোমার শত্রু হলেও বা নিন্দুক হলেও তার থেকে তুমি গ্রহণ করবে। নিন্দুক বা সমালোচক কি তোমার সত্যিকারের বন্ধু হতে পারে? তোমার দৃঢ় ইচ্ছাকে কি শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? তুফান বা ঝড়ের সামনে ঘাস হয়ে টিকে থেকে তোমার মাথা কি উঁচু করে রাখতে পারবে না?—এই সব প্রশ্নই নাটকে আলোচিত হয়েছে মুখ্য চরিত্র বলদেব সিং সবাল-এর মাধ্যমে যে দীর্ঘদিন বিলেতে কাটিয়ে দেশে ফিরে আসে। নিজের গ্রামের অন্যায়-পাপকে দূর করে সে স্বর্গ নির্মাণ করতে চেয়েছিল যে আদর্শের জন্য তার প্রাণ যায়। তবু বেঁচে থাকে তার মহিমা। নাটকে পঞ্জাবী সমাজের অন্য দিকগুলিও উন্মোচিত হয়েছে মূলত সঙ্গীতের মাধ্যমে। নাটকটির প্রথম মঞ্চন হয় নভেম্বর ২০০০। এটি সফল মঞ্চরূপ পায়। উদ্যোগ—কলেজিএট ড্রামা সোসাইটি, দিল্লী; পরিচালক রবি তনেজা। সঙ্গীতে ছিলেন বীণা সিধু তনেজা, নূপুর সিধু মাথুর এবং সলোনী সিধু মাথুর।

এখন নাটক লিখছেন **সুশীল শর্মা** ('পুয়ারা সোয়েটারদা'—সোয়েটারের জন্য ঝামেলা, 'ঘর দা ভেদী'—ঘর ভেদী, ১৯৮৯, 'যদো বহার আয়েগী'—যখন বসন্ত আসবে ৯১)। জম্মুর পঞ্জাবী নাট্যকার অভিনেতা পরিচালক **কৃপাল সিং কসালী** সম্প্রীতি ও মিলনের কথা বলেছেন 'আগ দী বীজ', 'সরহদাঁ', 'বাবা জিত্তো' প্রভৃতি নাটকে। মোহন

সিং শীতল-এর কাহিনীভিত্তিক নাটক 'আল্লে জখম পঞ্জাব দা' (পঞ্জাবের খত বা আঘাত) সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল শিল্পরূপ।

শিখ গুরুদের মহত্ত্বব্যঞ্জক কার্যাবলী নিয়ে পঞ্জাবীতে অনেক মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। খালসা পন্থা-র তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কটি নাটক উপস্থাপিত হয় ১৯৯৯তে। মধ্যকালীন কবি ও 'হীর'-এর রচয়িতা বারিসকে নিয়ে সন্ত সিং সেখোঁ লিখেছিলেন 'বারিস' যাতে দেখানো হয়েছে মোগল-পাঠান-আফগানরা যখন পঞ্জাবীদের ওপর অত্যাচার করছিল, গুরুগোবিন্দর শিষ্যরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। জীবনশিল্পী বারিসেরও ভূমিকা ছিল উল্লেখ্য। থিয়েটার বিভাগের অধ্যাপক ড. গুরুচরণ সিং-এর নির্দেশনায় এটা আগেই মঞ্চস্থ হয়েছিল; ১৯৯৯-এ জলন্ধর-এ দেশভগত মেমোরিয়াল হলে, পাটিয়ালা প্রভৃতি স্থানে এটি মঞ্চস্থ হয়। গুরুগোবিন্দব অনুচর লক্ষণ দাস বৈরাগী গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাম হয় বান্দা বাহাদুর। তিনি পঞ্জাবে এসে সামাজিক রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তিনি সত্যিই তুলনারহিত। এতে অভিনয় করেন জীবন জ্যোতি, নগেন্দর সিংহ, ববি কুমার, রূপীন্দব দলজিৎ, শরিফ, বলজিৎ, বাজেশ ধরমিন্দর, অবতার, পরভীন, বিনোদ, নরেশ কুমার এবং নীলু ও সুখবিন্দব যে দুটি মেয়ে ছেলেদের ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করে। গুরু গোবিন্দ সিং-এর দুই শিশুপুত্রকে বশ করতে না পেরে তাদেব দেওয়ালে গেথে ফেলে ওয়াজিব খাঁ, সিরহিন্দের এই মর্মস্পর্শী কাহিনীকে নতুন করে নাটকে রূপ দিয়েছেন গুরশবণ সিং—'আওয়াজ-এ-পঞ্জাব' হয়ে উঠেছে অসামান্য প্রযোজনা।

৫. বাংলা ও পঞ্জাবী নাটক : পারস্পরিক সম্পর্ক

(১) সূচনা

বাংলার সঙ্গে পঞ্জাবের আত্মীয়তা অনেকদিন ধরেই গড়ে উঠেছে। ধর্মপ্রবক্তা মহাপুরুষ শিখগুরু নানক বঙ্গদেশে এসেছিলেন যখন বাংলাদেশ মূলত চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম ও সাধনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। গুরু নানক তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।[১৮] আধুনিককালে এই সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে, বিশেষতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে। জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশচেতনা বাংলা ও পঞ্জাবের মধ্যে তৈরি করেছে একটা রক্তিম অগ্নিময় যোগসূত্রের বাঁধন। রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পরের কাছে এসেছে আরো নিবিড়ভাবে বিশেষ করে নাটকের মধ্যে তার সুন্দর প্রকাশ দেখা গেছে।

(২) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নাট্যকার ও পঞ্জাবী নাটক

বিভিন্ন নাট্যকারদের লেখা বাংলা নাটক পঞ্জাবীতে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। অনুবাদ অনুপ্রেরণা বা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই গ্রহণ ঘটে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবনার সমরূপতা দেখতে পাওয়া যায় তরলোচন সিং ও মুখরাজ সিং-এর 'চন্দ্রগুপ্ত' 'অশোক' প্রভৃতি নাটকে। অতি আধুনিক কালের নাট্যকার অধ্যপক চরণদাস সিধু রচিত 'ইন্দুমতী - সত্যদবে' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আছে, বিশেষত এর গঠনরূপে। সেখোঁর 'কলাকার' মনে করায় দ্বিজেন্দ্রর 'পাষাণী' কে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় বাংলা নাটক 'অলীকবাবু' পঞ্জাবীতে রূপান্তরিত হয় 'ঝুটে শাহ' নামে। অনুবাদ করেছেন প্রেম জলন্ধরী, প্রযোজক সংস্থা কলাসঙ্গম, সময় ১৯৬৮। সমালোচক জে. এন. কৌশল এই প্রযোজনার সুন্দর সমালোচনা করেছেন পত্রিকায়—

"দিল্লীতে কলাসঙ্গম উপস্থাপিত করে বাংলা নাটক 'অলীকবাবু'-র প্রেম জালন্ধরী কৃত পঞ্জাবী রূপান্তর 'ঝুটে শাহ'। অনুবাদ সুন্দর, প্রচলিত পঞ্জাবী বাকরীতির প্রয়োগ বক্তব্যকে সরস ও জীবন্ত করে। পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শ্যাম অরোড়া যিনি নায়কের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রক্ষাকারী বন্ধুর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় সুধা চোপড়াও খুব সুন্দর — রোমান্টিক কল্পনার জগতে সত্যজ্ঞানে তার বিবরণ চমৎকার ও মজাদায়ক। ঝুটে শাহর ভূমিকায় কেবল শাহ মোটামুটি। জন লোবো-ব মঞ্চ সজ্জা সহজ সুন্দর, ও পি কোহলী-র আলোকসম্পাতও।"[১৯]

(৩) রবীন্দ্রনাথ ও পঞ্জাবী নাটক

অ. ভূমিকা

পঞ্জাবের ধর্ম সংস্কৃতি ইতিহাস রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করছে। ছেলেবেলায় অমৃতসর স্বর্ণমন্দির কবি অনেকবার গেছেন ও সেখানকার পূত পবিত্র পরিবেশ তাঁকে অভিভূত করেছে। "একথা বলতে হবে যে পঞ্জাবের গৌরবময় ইতিহাস ও সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আমার জ্ঞান থেকে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে পঞ্জাবী সাহিত্য ও ইতিহাসের সোনালী যুগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে মহৎ অহঙ্কার ও আগ্রহ ছিল আজকের যুগে অধিকাংশ পঞ্জাবীর তা নেই'।[২০]

পঞ্জাবী বুদ্ধিজীবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধায় সমাদৃত হয়েছেন। বিশিষ্ট নাট্যকার বলবন্ত গার্গী রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে বলেছেন—"ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথেব ভূমিকা অভিনব ও বিস্ময়কর। মহৎ কবি, প্রতিভাবান অভিনেতা, নাট্য পরিচালক ও সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সহজাত প্রবণতা ছিল রঙ্গমঞ্চের প্রতি। ভারতীয় ধ্রুপদী নাটক ও দেশীয় লোক নাট্যরীতিতে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ, কিন্তু ইউরোপীয় নাট্য উপস্থাপনা পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রবল সচেতন কবি এক নাট্যরূপের উদ্ভাবন করেন যা শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা থিয়েটারকে প্রভাবিত করে"।[২১]

"যখন ভারতবর্ষের জাতীয় থিয়েটারের কথা বলা হয় তখন অনেকেই বিমূঢ় হয় ও ভাবে এটা কি? এটা কি ফোক থিয়েটার? অথবা ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটক? অথবা পাশ্চাত্য-প্রভাবিত পেশাদারী মঞ্চ? এ সম্বন্ধে কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারে না। যেমন বলা যায় পিকিং অপেরা বা কাবুকি থিয়েটার সম্বন্ধে। কিন্তু একথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নাটকই সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়।"[২২]

আ. রবীন্দ্রনাটকের পঞ্জাবী অনুবাদ

পঞ্জাবীতে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটক অনূদিত হয়েছে; 'বিসর্জন', 'ডাকঘর' প্রভৃতি নাটক একাধিকবার রূপান্তরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাটক প্রথম অনুবাদ করেন সম্ভবতঃ বলবন্ত গার্গী ১৯৪৪ সালে 'ডাকঘর'। বাংলা থেকেই তিনি অনুবাদ করেন। কর্তার সিং

দুগ্গলও বাংলা থেকে অনুবাদ করেন 'বিসর্জন', 'রাজা' ও 'মুক্তধারা'। বিসর্জন এর পরিবর্তিত নাম 'দেবী দী ভেট' যার উৎসর্গপত্রে লেখা হযেছে—'ইহ নাটক উনহা মহাপুরুখাঁ নূ সমরপণ হ্যয় জিহাডে অমল দে তড়ে বল রহে, জদোঁ জঙ্গ দী দেবী আদমী দে লহু দী ভেট মঙ্গ রহী সী''[২৩] অর্থাৎ এই নাটক সেই সব মহাপ্রাণ মানুষদের উদ্দেশ্য নিবেদিত যাঁরা শান্তির সপক্ষে কথা বলেন যখন যুদ্ধের দেবী মানুষের রক্ত কামনা করে। পঞ্জাবী ভাষায় রবীন্দ্রনাটকের অনূদিত তালিকা দেওয়া হল বর্ণানুক্রমিক —

অন্ত্যেষ্টি সৎকার (অন্তিম সৎকার)	নিহাল সিং রস	১৯৬৩
আশ্রম পীড়া (আশ্রম দী পীড়)	নিহাল সিং রস	১৯৬৩
বিদায় অভিশাপ (বিদা সরাপ)	দেবিন্দর সতিআরথী	১৯৬২
বিসর্জন (দেবী দী ভেট)	কর্তার সিং দুগ্‌গল	১৯৬৫
বিসর্জন	হরভজন সিং	
বিসর্জন (বলিদান)	কপুর সিং ঘুম্মন	১৯৬২
চিত্রাঙ্গদা (চিতরা)	মোহন সিং	১৯৬৫
ডাকঘর	বলবন্ত গার্গী	১৯৪৪
ডাকখানা	পি. কে. হরিবংশ	১৯৬১
ডাকঘর	ন্যাশনাল বুক শপ	১৯৭১
গান্ধাবীর আবেদন (গান্ধারীকা নিবেদন)	দেবিন্দর সতিআরথী	১৯৬২
গৃহ প্রবেশ (গৃহ পরবেশ)	নিহাল সিং রস	১৯৬৩
কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ (আশীর্বাদ)	পি. কে. হরিবংশ	১৯৬১
কর্ণ কুন্তী সংবাদ	দেবিন্দর সতিআরথী	১৯৬২
মালিনী	হরভজন সিং	
মালিনী	কপুর সিং ঘুম্মন	১৯৬২
মুক্তধারা	কর্তার সিং দুগ্গল	১৯৬৫
প্রকৃতির প্রতিশোধ (সনিয়াসী)	নিহাল সিং রস	১৯৬৩
প্রকৃতির প্রতিশোধ	হরভজন সিং	
প্রকৃতির প্রতিশোধ (সনিয়াসী)	কপুর সিং ঘুম্মন	১৯৬২
রক্তকরবী (লাল কনের)	কর্তার সিং দুগ্গল	১৯৬৫
রসিক	নিহাল সিং রস	১৯৬৩
রাজা (অন্ধকার কা রাজা)	কর্তার সিং দুগ্গল	১৯৬৫
রাজা ও রানী	হরভজন সিং	
রাজা - রানী	কপুর সিং ঘুম্মন	১৯৬২
সূক্ষ্ম বিচার (সূখম বিচার)	নিহাল সিং রস	১৯৬৩

ই. পঞ্জাবী নাটকে রবীন্দ্রপ্রভাব

রবীন্দ্রনাথ পঞ্জাবী সাহিত্যকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিশিষ্ট পঞ্জাবী নাট্যকার সন্ত সিং সেখোঁ বলেছেন—"আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথ পঞ্জাবী লেখকদের বিশেষ প্রভাবিত করেছেন আর কোন প্রকারে না হোক অন্তত এ বিষয়ে প্রতীতি সৃজনে যে আপন মাতৃভাষায় সাহিত্যরচনা করা নীচ কাজ নয় এবং তাদের মধ্যে সাহিত্যর অনুপ্রেরণা জাগানোয়।"[২৪] একথা অনেকাংশেই সত্য।

বলবন্ত গার্গী পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজীতে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ইংরেজী ভাষায় সুন্দর কবিতা তিনি লিখতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনি পঞ্জাবীতে লিখতে শুরু করেন। বলবন্ত গার্গী নাট্যকার রূপে খ্যাতিমান হন। তাঁর প্রথম দিকের নাটক 'তারা টুটিয়া' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ নভেম্বরে মোহন সিং সম্পাদিত পত্রিকা পঞ্জ দরিয়ায়। এটা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এর প্রধান চরিত্র নিমো যেন অমল-এর প্রতিরূপ। বাংলা নাটকের মত পঞ্জাবী নাটকে আছে মুক্ত আকাশ বাতাসের জন্য ব্যাকুলতা, ঘটনার মধ্যেও বেদনার অনুভব। আকাশের জ্যোতিষ্ক যেন মৃত্যুর প্রতীক, বলা ভাল মুক্তির প্রতীক। নিমোর আচ্ছন্নতা ও বিকার, আকাশে উড়ে যাওয়া ও রথে চড়ার রোমান্টিক স্বপ্ন, তার সঙ্গে বজ্র বিদ্যুতের চমক : যেন তার মুক্তির কথা বলে।

প্রখ্যাত অভিনেতা ও লেখক বলরাজ সাহনী প্রথমে হিন্দীতে লিখতেন। শান্তিনিকেতনে তিনি হিন্দীর শিক্ষক ছিলেন। কবি তাকে মাতৃভাষা পঞ্জাবীতে সাহিত্য চর্চা করতে বললে সাহনী জানান যে পঞ্জাবী ভাষা সেরকম সমৃদ্ধ নয় যাতে সর্বপ্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে ভাষায় গুরু নানকের 'গগন মে থাল রবি চন্দ দীপক বনায়ে'র মত এক অসামান্য কবিতা লেখা যায় সে ভাষার মূল্য ও মর্যাদা অনেক। পরবর্তীকালে বলরাজ সাহনী মাতৃভাষায় অনেক লিখেছেন নাটক। বলরাজ সাহনীর 'মেরি ধর্ণায়ে ঔর দৃষ্টি কোণ' গ্রন্থের এই প্রসঙ্গ নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন আর এক কথাশিল্পী নাট্যকার কর্তার সিং দুগ্গল তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থে।[২৫]

কর্তার সিং দুগ্গলও ইংরাজীর ছাত্র ছিলেন এবং এম এ ক্লাসে ইংরাজী পড়ার সময় ঐ ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করতেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষক রবীন্দ্র শিষ্য কবি ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর নির্দেশে তিনি পঞ্জাবীতে লিখতে শুরু করেন। কর্তার সিং দুগ্গল রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি নাটক পঞ্জাবীতে অনুবাদ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি মৌলিক নাটক লিখেছেন যার ওপর রবীন্দ্র প্রভাব আছে। বিশেষ করে বিষয়ের কাব্যিক রূপায়ণে রবীন্দ্র প্রভাব অনুভব করা যায়।[২৬]

ডঃ হরভজন সিং রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। তিনি পঞ্জাবীতে অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথের চারটি নাটক। 'তার তুপকা' নামে একটি কাব্য নাটক লেখেন যাতে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের কথা আছে। কীভাবে প্রকৃতিকে দূষিত কলুষিত করা হচ্ছে, আণবিক ও অন্যান্য ধ্বংস শক্তি প্রকৃতিকে বিনাশ করছে এখানে তার প্রকাশ আছে। লেখকের প্রকৃতি ভাবনার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তি-ও এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঈ. পঞ্জাবীতে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়

পঞ্জাবী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটক অভিনীত হয়েছে। তবে শতবর্ষের পরেই রবীন্দ্র নাট্যাভিনয়ের প্রবণতা দেখা যায়। সে সময়ে দিল্লী রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে 'থ্রী আর্টস ক্লাব' করে বলবন্ত গার্গী অনূদিত 'ডাকঘর', পরিচালনায় ছিলেন শ্রী বেদ ব্যাস। অমলের ভূমিকায় নবজীতের অভিনয় মনোগ্রাহী হয়েছিল। নাটকে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও এটা একটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন প্রযোজনা যা নাটকের শেষভাগে বক্তব্যকে দর্শকমনে সঞ্চার করে এবং প্রহসন ও হালকা নাটক দেখতে দেখতে ক্লান্ত দর্শকের কাছে নিয়ে আসে এক নতুন অভিজ্ঞতা।[২৭]

১৯৭৬-এ পঞ্জাব ড্রামা রেপের্টরী কম্পানি মঞ্চস্থ করে 'মুক্তধারা' চণ্ডীগড় টেগোর থিয়েটারে। পরিচালনায় ছিলেন রামগোপাল বজাজ, সঙ্গীত নির্দেশক কমল তিওয়ারী। অভিনয়ে অংশগ্রহণ কবেন হরজীত সিদ্ধু (ধনঞ্জয়), অর্চনা সিদ্ধু (অম্বা), জসবন্ত দমন (মাসী), উমেশ কান্ত (অধ্যাপক), বিজয় কাশ্যপ প্রমুখ। গানেব পঞ্জাবী রূপান্তর করেছেন অমরজিৎ চন্দন, সঙ্গীতকার কমল তিওয়ারী।

কলকাতায় পঞ্জাবীতে 'ডাকঘর' উপস্থাপিত হয় ১৯৭৬ সালে তপন থিয়েটারে। সুধা ও অমলের ভূমিকায় কমলদীপ কৌর ও মোহন সিং বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দুই শিশু শিল্পীর অভিনয় দর্শদের আনন্দ দেয়। ফকির রূপে হরবনস সিং রাজ, রাজবৈদ্য রূপে সুখবন্ত সিং-ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রযোজক সংস্থা পঞ্জাবী সাহিত্য সভা।

রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৮৬-তে সঙ্গীত কলামন্দির নানা ভাষায় রবীন্দ্র নাটকের অনুষ্ঠান করে। সেখানে দুটি নাটক পঞ্জাবীতে রূপায়িত করে। 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ' পরিবেশন করেন গুরবিন্দর কৌর ও সুনীতা আরোরা; 'বিনি পয়সার ভোজ' (মুফত দা লঙ্গর) পরিবেশন করেন দীনেশ রায়। ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়া আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসব ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনে দীনেশ রায় এই নাটক পুনরায় উপস্থাপিত করেন। সমালোচক লেখেন—"বিনি পয়সার ভোজ পঞ্জাবীতে অভিনয় করেন দীনেশ রায়। অত্যন্ত সহজ ও সংযতভাবে তিনি নাটককে রূপ দেন।"[২৮] এই নাটক বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হয়।

১৯৮৬-র মে মাসে মহাবোধি সোসাইটি হলে 'মালিনী'র অংশবিশেষ পঞ্জাবীতে উপস্থাপিত হয়। ক্ষেমংকরের ভূমিকায় অংশ নেন ডঃ সুখবন্ত সিং, সুপ্রিয়কে রূপ দেন সিমরত সিং।

ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত নাট্য সম্মেলনে পঞ্জাবীতে পরিবেশিত হয় 'চিত্রাঙ্গদা'। চিত্রাঙ্গদার যন্ত্রণা বেদনা এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যয় ও উপলব্ধির ভাবনা সুন্দর মূর্ত করেন সুনীতা ওয়ালিয়া। সংবাদপত্রের মতে "পঞ্জাবীতে চিত্রাঙ্গদার যন্ত্রণা ব্যাকুলতা মানসিক দ্বন্দ্ব ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সুন্দর রূপায়ণ পাওয়া যায় সুনীতা ওয়ালিয়ার অভিনয়ে।"[২৯]

৬. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও পঞ্জাবী নাটক

ক. সাম্প্রতিক বাংলো নাটক পঞ্জাবীতে

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' পঞ্জাবীতে অভিনীত হয়। ১৯৭৭ সালে বোম্বাই-এর পঞ্জাবী লেখক ও শিল্পীদের সংস্থা নাটক তোলি তেজপাল হলে কাঞ্চনরঙ্গ-র সফল মঞ্চায়ন করে। নাটকটির পঞ্জাবী নাম 'পরশু পরশা পরশরাম'। অনুবাদক জগীত, পরিচালক আর এম সিং। অভিনেতারা হলেন বলদেব ত্রেহান, (বাড়ির মালিক), বীণা (গৃহকর্ত্রী), অমর জীৎ (চাকর পরশু), আশা শর্মা (দাসী ঋতু) প্রমুখ। মজাদার ও আনন্দদায়ক এই নাটকটির পরিচালনা চমৎকার, অভিনয়ও বেশ সুন্দর।[৩০]

তুলসী লাহিড়ীর 'ছেড়া তাঁর' পঞ্জাবীতে অভিনীত হয়েছিল। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'মারীচ সংবাদ' পঞ্জাবীতে অভিনয় হয় সাফল্যের সঙ্গে। পঞ্জাবী সাহিত্য সভা 'মারীচ সংবাদ' কলকাতায় করে ১৯৮১-তে, রূপান্তরিত নাম 'সোনে দা হিরণ' (সোনার হরিণ)। নাটকটির অনুবাদ করেন ও পরিচালনা করেন বলদেব সিং যিনি মাদারীর ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। এই নাটক পঞ্জাবেও অভিনীত হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে বলদেব সিং-এর সফল নির্দেশনায় ১৯৮৬-তে। পঞ্জাবে 'সোনে দা হিরণ' করে রঙ্গমঞ্চ মোগা।

কিছু বাংলা গল্প বা উপন্যাস পঞ্জাবীতে নাট্য রূপায়িত ও অভিনীত হয়েছে। নীল লোহিতের (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) 'কমপ্লেন বুক' রম্যকাহিনীটি পঞ্জাবীতে অভিনীত হয় ১৯৮৫-তে কলকাতায়। এক সংলাপী রূপে নাটকটি অনুবাদ করেন লখবীর সিং অরোরা 'নির্দোষ' যিনি সুন্দর অভিনয়ও করেন। "পঞ্জাবী ভাষায় সুনীলের 'কমপ্লেন বুক'-এর নাট্যরূপ দেন লখবীব সিং অরোরা। একক অভিনয়ে জমিয়ে রেখেছিলেন তিনি সারাক্ষণে।"[৩১] ভাষা পরিষদ মঞ্চে এটি চমৎকার অভিনয় করেন দীনেশ রায়।

১৯৮৬-র অক্টোবরে 'শরৎ নাট্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় যাতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শরৎচন্দ্রের নাটক উপস্থাপিত হয়। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ছোট নাটিকায় রূপান্তরিত হয় যা পঞ্জাবীতে অভিনীত হয়। 'নতুন দা'ও হয। দুই নাটকের শিল্পী লখবীর সিং অরোবা ও দীনেশ রায়। 'পঞ্জাবী মে সঙ্গীত কলা মন্দির কে দিনেশ রায় ও লখবীব সিং অরোরা কী প্রস্তুতি কম প্রশংসনীয় রহী নহী।"[৩২] আর এক পত্রিকায় লেখা হয়েছে— "দেবদাসের প্রেম ভালবাসা যন্ত্রণা দাহকে সুন্দররূপ দেন লখবীর সিং অরোরা।"[৩৩]

বাদল সরকারের প্রভাব ও প্রেরণা পঞ্জাবী নাটকে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নাটক দিল্লী পঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে অভিনীত হয়েছে। বাদল সরকার এইসব জায়গায় অনেক ওয়ার্কশপ-ও করেছেন। পঞ্জাবী নাট্যকার অভিনেতারা তাতে অংশ নিয়েছেন, তাঁব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সমালোচক চরণদাস সিধু নাট্যকার রূপেও বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি বাদল সরকারের নাটকের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, একবার তিনি 'মিছিল' এ (জুলুস) অংশগ্রহণও করেছিলেন। তাঁর নাটকের মার্কসীয় প্রবণতা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছে বাদল সরকারের আদর্শের দ্বারা।[৩৪]

পঞ্জাব এগ্রিকালচারাল ইউনিভাসিটির অধ্যাপক নাট্য সমালোচক ডঃ এস এন সেবক পঞ্জাবী নাটকে বাদল সরকারের প্রভাব নির্ণয় করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন কীভাবে বক্তব্য ও আঙ্গিক দুদিক থেকেই বাদল সরকার অনুপ্রাণিত করেছেন পঞ্জাবী নাট্যজগতকে।

"বাদল সরকার নিঃসন্দেহে পঞ্জাবের নাট্যপ্রেমী ও নাট্যকর্মীদের আকৃষ্ট করেছেন। অবশ্য আমি তাঁর প্রায় সব নাটকেরই প্রযোজনা দেখেছি মূলত হিন্দীর মাধ্যমে। ১৯৭৫-এর ডিসেম্বরে চণ্ডীগড়ে স্বয়ং বাদল সরকার পরিচালিত একটা থিয়েটার ওয়ার্কশপে আমি যোগ দিই, এবং পথ নাটিকায় তাঁর দক্ষতা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আমি পঞ্জাবীতে 'মাদারী' বলে একটা নাটক লিখি, অভিনয় করি ও প্রকাশ করি; আর সত্যি কথা বলতে কি এব্যাপারে আমি বাদল সরকারের 'জুলুস' নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলুম।

অমৃতসরের গুরশরণ সিং বাদল সরকার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তাঁর 'সস্তা' (প্রযোজনা ব্যয়ের বিচারে) অথচ যে থিয়েটার শহর গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জন্য দায়বদ্ধ তার দ্বারা।"[৩৫]

গুরশরণ সিং এর মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী, কমিটমেন্ট-এর ওপর যেমন বাদল সরকারের প্রভাব আছে; তেমনি তাঁর আঙ্গিক পথনাটিকার রীতি, মঞ্চ আলো সাজসজ্জাবিহীন অভিনয় রীতিতেও তিনি বাদল সরকার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

আতমজিৎ-এর অ্যাবসার্ড রীতির নাটকের ওপরেও বাদল সরকারের নাটকের প্রভাব আছে বলে অনেকে অনুমান করেন। বিশেষ উল্লেখ্য বাদল সরকারের 'সাগিনা মাহাতো' পঞ্জাবীতে অভিনীত হয়।

দিলীপ কুমার মিত্র-র 'আমি এখন সম্রাট' পঞ্জাবীতে অনুবাদ ও অভিনয় করেন অশোক আগরওয়াল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধের নাটক 'দুঃসময়' পঞ্জাবী অনুবাদের অংশ ড্রামা অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়া আয়োজিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভারতীয় নাটক সেমিনারে উপস্থাপিত হয় ও দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করে।

খ. সাম্প্রতিক পঞ্জাবী নাটক বাংলায়

পঞ্জাবী নাটকও বাংলায় অনূদিত হয়েছে কিছু এবং সেগুলি অভিনীতও হয়েছে। পঞ্জাবী মহান সৃষ্টিসম্ভার বাংলায় পেয়েছে সম্মানের আসন। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে ঘটেছে এই গ্রহণের ঘটনা যার বিচার পরিমাণে নয়, গুণগত মাত্রায়।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও নাট্যকার বলবন্ত গার্গীর নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হবে যিনি বাংলা ও পঞ্জাবী নাট্য সাহিত্যের মধ্যে এক মিলনের সুর বাজিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। বাংলার বিয়াল্লিশের পটভূমিকায় তিনি লিখেছেন উচ্চশ্রেণীর একাঙ্ক নাটক 'গিরঝা'। বলবন্ত গার্গীর একাঙ্ক বাংলায় অনুবাদ করেন শ্যামল সেন 'অঙ্কুর' নামে যেটা ১৯৫৯-এ গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়। রঙমহল ও অন্যান্য জায়গায় অনেকবার এটি অভিনীত হয়েছে। নাটকটি গন্ধর্ব পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (আগস্ট-অক্টোবর ১৯৫৯)। উত্তর কেরিয়ার যুদ্ধ বিধ্বস্ত গ্রামের এক কৃষক পরিবারের ছেলে শত্রুদের আসার সময় ডিনামাইট দিয়ে ব্রিজ উড়িয়ে শত্রুদের মেরে ফেললেও নিজে মারা যায় এবং তার মা চুন হুয়া পুত্র গর্বে গর্বিত হয় যদিও তার চোখে জল। নাটকের কাহিনী ও তার শিল্পরূপ দর্শকদের মুগ্ধ করে। গার্গীর 'সুলতানা রিজিয়া' বাংলায় অনুবাদ করেন কেয়া চক্রবর্তী ও কে ডবল্যু হক। এটি বহুরূপী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

'পত্তন দী বেড়ী' অসহ্য বেদনামথিত জীবনের কাহিনী যা প্রেমে বিরহে প্রতীক্ষায় ও ভ্রান্ত উপলব্ধিতে নিশেষিত হয় করুণ পরিণতিতে। এই নাটক অনুবাদ করেন বোম্মানা বিশ্বনাথম। প্রকাশিত হয় 'অভিনয়' পত্রিকায়। এই নাটকটি পঞ্জাবী একাঙ্ক নাটক (১৯৮০) সংকলন গ্রন্থেরও অন্তর্ভূত হয় যার অনুবাদক স্মরজিৎ দত্ত। বলবন্ত গার্গীর 'পত্তন দী বেড়ী' নাটকটির বাংলা রূপান্তর 'ঘাটের নৌকা' শ্রুতি নাটকরূপে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেন সৃজন সংস্থা ২০০০ সালে। অভিনয়ে দক্ষতা দেখান শর্মিলা বসু, পিউলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর বসু, বিল্বদল চট্টোপাধ্যায় যিনি নাটকটির পরিচালকও বটেন। সহযোগী প্রবীর ভাদুড়ী।

বলবন্ত গার্গী-র নাটক বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার 'লোহাকূট' নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছেন গুরুদাস ভট্টাচার্য যেটি ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'কামার' নামে। নাটকটি 'লোহাকূট' নামেই মঞ্চস্থ করেছে শোহন নাট্যসংস্থা ১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে। নাটকের ভাষান্তর নির্দেশনা এবং অভিনয়ের বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন জয় সেনগুপ্ত। এই 'লোহাকূট' নাটকটি অন্য দলও মঞ্চস্থ করে। 'বলবন্ত গার্গীর মানবিক সম্পর্কের নাটক' রূপে অভিহিত করা হয়েছে 'লোহার' নাটকটিকে যেটি উপস্থাপিত করেন প্রত্যয় সংস্থা। নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন ঋষি সিন্‌হা। ১৯৯৩-এর জুলাইয়ে এটি অভিনীত হয়।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার কর্তার সিং দুগ্গল-এর 'পুরাণিয়াঁ বোতলাঁ' বাংলায় অনুবাদ করেন গুরুদাস ভট্টাচার্য। নাম 'পুরনো বোতল' (১৯৮০)। 'উপর বালী মঞ্জিল'

অনূদিত হয় 'ওপর তলা' নামে, অনুবাদক স্মরজিৎ দত্ত। কর্তার সিং দুগ্গলের প্যেণ্ডা খান-এর বিখ্যাত গল্প অবলম্বনে এক চারিত্রিক নাটক লেখেন দিলীপ কুমার মিত্র 'চাঁদনী রাত ও প্যেণ্ডা খান' নামে যেটা অভিনীত হয় কলকাতায় ১৯৮৫-তে 'ভারতীয় নাট্য সমাবেশ' উপলক্ষ্যে। অভিনেতা ড: দীপক চন্দ্র পোদ্দার। এ প্রসঙ্গে 'আজকাল' পত্রিকায় লেখা হয়—"কর্তার সিং দুগ্গলের 'চাঁদনী রাত ও প্যেণ্ডা খান'-এ অসহ্য আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত কন্যাভারগ্রস্ত এক মানুষের ভয়াবহ পরিণতি দেখান হয়েছে যখন সে তার পাঁচ মেয়েকে নির্মমভাবে হত্যা করে। একক অভিনয়ে সেই বক্তব্যকে মর্মস্পর্শী করে তোলেন দীপক পোদ্দার"।[৩৬]

সন্ত সিং সেখোঁর দুটি নাটক বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর একাঙ্ক 'হোনী' বাংলায় অনূদিত হয়েছে 'নিয়তি' নামে, অনুবিদ করেছেন স্মরজিৎ দত্ত। পূর্ণাঙ্গ নাটক 'দময়ন্তী' ঐ নামেই অনুবাদ করেছেন ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য। সন্ত সিং-এর নাটকে বাংলার প্রভাব আছে বলে সমালোচক মনে করেন।

অতর সিং সম্পাদিত 'পঞ্জাবী একাঙ্ক নাটক' বইতে ১০ জন নাট্যকারের নাটক অনুবাদিত হয়েছে। অনুবাদক স্মরজিৎ দত্ত। নাট্যকার ও নাটক হলেন—ঈশ্বর চন্দর নন্দা (বেইমান), গুরুদয়াল সিং খোসলা (মৃতের র‍্যাশান), হরচরণ সিং (মনে রয়ে গেল), অমরীক সিং (ভুল দৃষ্টি), গুরুচরণ সিং জসুজা (গোমুখী ব্যাঘ্রমুখী), কপুর সিং ঘুম্মন (ভাগিয়ে আনা মেয়ে), হরসরণ সিং (ফাট্রল)। পূর্বোল্লিখিত সন্ত সিং সেখোঁ (নিয়তি), বলবন্ত গার্গী (ঘাটের নৌকা), কর্তার সিং দুগ্গল (ওপরতলা)-এর নাটকও এতে আছে।

পঞ্জাবের প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও নাট্যকার ডঃ সুরজীত সিং সেঠীর 'কিং মির্জা তে সপেরা' নাটকের ভাব নিয়ে পূর্ণশ্রী মিত্র একটা ছোট নাটক লিখেছেন 'জীবন'। নাটকটি উৎপল দত্ত সম্পাদিত 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায় ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।

গুলজার সিং সন্ধুর 'প্রতারণা' গল্প (বাংলায় অনূদিত) নাটকে রূপায়িত করেন শাশ্বত ভদ্র এবং তাঁরই পরিচালনায় এটা অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ নেন শিখা শ্রীবাস্তব, রঞ্জন রায় ও বৈশাখী ধর। "উঁচুমানের শ্রুতি অভিনয় করে শিখা শ্রীবাস্তব মুগ্ধ করেছেন"।[৩৭]

প্রখ্যাত পঞ্জাবী গল্পকার মোহন ভাণ্ডারীর ছোটগল্প 'ম্যায়নুঁ টৈগোর বনা দে মাঁ' এক রাখাল ছেলের কাহিনী যে রবীন্দ্রনাথের মত বড় কবি হতে চেয়েছিল, কিন্তু সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে তা সে পারেনি। এই গল্পকে নাট্যরূপ দেন দিলীপ কুমার মিত্র, নাম 'আমি হব রবীন্দ্রনাথ'। নাটকটি অভিনীত হয় কলকাতায় ২৫ বৈশাখ ১৩৯১ (১৯৮৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে। "পঞ্জাবী গল্পকার মোহন ভাণ্ডারীর 'আমি হব রবীন্দ্রনাথ' এক পঞ্জাবী রাখাল বালকের কথা যে রবীন্দ্রনাথ হবার স্বপ্ন দেখেছিল যা খান খান হয়ে ভেঙে যায় প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থায়। এই নাটককে সুন্দর ফুটিয়ে তোলেন অজিত কুমার সাঁতরা, রামনারায়ণ দাস, রানা বসু, গৌর অধিকারী, তপন মল্লিক সুধীর দাস।"[৩৮] নাটকটি 'ত্রয়ী' পত্রিকায় ২৫ বৈশাখ মুদ্রিত হয়। অমৃতা প্রীতম বাংলা নাট্যলোকে পেয়েছেন সম্মানের আসন। তাঁর "কাজলী" ছোটগল্পটি নাটকে রূপায়িত করেন নাট্যকার অভিনেতা সৌম্যেন্দু ঘোষ যেটা 'ভারতীয় একাঙ্ক গুচ্ছ' সংকলনের অন্তর্গত হয় (১৯৮৫)। অমৃতা প্রীতমের প্রেমের কবিতা গুচ্ছ অবলম্বনে কাব্য সংলাপিকা লেখেন পূর্ণশ্রী মিত্র—'তুমি এলে'। এটি কলকাতায় প্রযোজিত হয় নক্ষত্র প্রকাশনের উদ্যোগে ১৯৮৫-র অক্টোবরে। "অমৃতা প্রীতমের বিভিন্ন

পঞ্জাবী কবিতা অবলম্বনে 'তুমি এলে' কাব্যনাটিকায় প্রেমের আকুল প্রত্যাশা, সুন্দর রহস্যময়তা ফুটেছে।''[৩৯]

প্রয়াগ আয়োজিত 'সৃজনী' মঞ্চে অনুষ্ঠিত নাট্যসভায় ছিয়াশির মার্চ হরসরণ সিং-এর লেখা 'জিগরা' নাটকটি এক সংলাপী নাটিকা রূপে অভিনয় করেন গার্গী দাস। ''এক বিবাহিত নারীর মানসিক যন্ত্রণা বিক্ষোভ নিযে নাটক। স্বামীব প্রতি প্রবল ক্ষোভ সংসারের প্রতি বিরাগ তাকে উদ্ভ্রান্ত ব্যকুল করে ও সে প্রেমিক পুরুযের সঙ্গে চলে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত তার ভুল ভাঙে এবং জীবনের আহ্বানেই সে ধরা দেয়। শ্রীমতী গার্গী দাসের অভিনয়ে নাটকের ভাব চমৎকার মূর্ত হয়। বাংলা রূপান্তর ও প্রয়োগে শ্রী স্বপন দাস।''[৪০] অন্যান্য স্থানেও এই নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে।

বিশিষ্ট প্রতিবাদী নাট্যকার গুরশরণ সিং এর 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' নাটকটি দিলীপ কুমার মিত্র কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়ে উৎপল দত্ত সম্পাদিত 'এপিক থিয়েটার' (১৯৮৬) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সূচনায় গুরশরণ সিং-এর নাট্য সাধনা সম্বন্ধে সুন্দর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আছে।[৪১]

ড. চরণদাস সিধু-র অমর শহীদ ভগত সিং-এর জীবনাশ্রিত নাটক 'ভগত সিংহ শহীদ'-এর তৃতীয় পর্বাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন শ্যামল গুপ্ত ও দিলীপ কুমার মিত্র। বাগুইহাটি কৃষ্টি সংসদ-এর প্রযোজনায় এটি উপস্থাপিত হয় ২০০০ সালে। পরিচালক তাপস দাস। 'সরফরাসী কী তমন্না অব হমারে দিলমে হ্যয়' সঙ্গীতটির অসাধারণ প্রয়োগ প্রযোজনাকে বিশেষ সমৃদ্ধ করে।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা দূরদর্শনে আধুনিক ভারতীয় নাটক নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে আধুনিক ভারতীয় নাটকের অনন্য দৃষ্টান্ত-রূপে সন্ত সিং সেখোঁ-র 'দময়ন্তী' নাটকের অংশবিশেষ উপস্থাপিত হয়। অভিনয়ে অংশ নেন শেখ হাকিমুল ও মৌসুমী গোস্বামী।

পঞ্জাবী গল্পের প্রেরণায় বাংলায় অসামান্য নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে। প্রখ্যাত লেখিকা অমৃতা প্রীতম বাংলায় স্মরণীয় নাম। তাঁর একটি ছোটগল্প 'আগুনের ফুল' যাকে নিয়ে বাংলা নাটক লেখা হয়েছে 'কর্ণাবতী'। এবং তা মঞ্চে বহুল সমাদর লাভ করেছে। নাট্যকার — চন্দন সেন, পরিচালক—মেঘনাদ ভট্টাচার্য, প্রযোজক সংস্থা — সায়ক। বাংলা নাটকটি সম্বন্ধে পত্রিকার মতামত দেওয়া হল (সানন্দা, শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬.৮.৯৬)।

নদ নারীর কাব্য

কর্ণাবতী নদীর নাম কোথাও নেই অমৃতা প্রীতমের মূল গল্পে। অথচ চন্দন সেনের লেখা, অমৃতা প্রীতমের কাহিনী-অনুসারী, কর্ণাবতী নাটকে এই নদীই অন্যতম রূপক। নাটকের গল্পটি একটি মেয়েকে ঘিরে।

মাওলি গাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ে কুসুম্বি। টাকার লোভে বাবা তার বিয়ে দেয় গাঁয়ের জোতদার, আধবুড়ো, বিপত্নীক কৈলাস রাওয়াতের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়িতে কুসুম্বি বড় একা। তার দুটি বন্ধু। প্রথমটি গ্রামের নদী বানাশ। বানাশকে সে উজাড় করে বলে মনের সব কথা। দ্বিতীয় বন্ধু রাওয়াতের রক্ষিতা মোল্লি। সেও তার মনের মানুষ, যে মনে কৈলাস রাওয়াতের প্রবেশ নিষেধ। মেলায় বেড়াতে গিয়ে কুসুম্বি মন দিয়ে বসে এক ভবঘুরে চুড়িওয়ালাকে। ঘর ছাড়ে তার টানে। পেটে আসে ভবিষ্যতের একটা নতুন

মানুষ। কুসুম্বি ভাবে, সেই সন্তানকে সে শোনাবে তার মায়ের বাপের বাড়ির গাঁয়ের নদী কর্ণাবতীর গল্প। যে নদীকে সে দেখেনি কখনও, কেবল তার গল্প শুনেছে। যে নদী তাব কাছে বহির্জগতের জানলার মতো এক প্রতীক। কিন্তু কুসুম্বির স্বপ্ন সত্যি হবে কি? তাকে ত্যাগ করে চলে যায় তার ভালবাসার মানুষ চুড়িওয়ালাও। সবাই জানতে চায়, কুসুম্বির গর্ভের ভ্রূণের পিতৃত্ব কার? কুসুম্বি বলে, এ সন্তান শুধুই তার, এর পিতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যই নয় কেউ।

মূল গল্পে নাম-ধাম-বক্তব্য সবই আলাদা ছিল। সেই কাহিনীতে কোথাও কর্ণাবতী নদীর পরিবর্তে নায়িকার প্রিয় refuge ছিল একটি সরোবর, পদ্মফুলে যার বুক ভর্তি। এ প্রতীক প্রীতমের, তাই মনে হয়, পদ্মফুলে ভরা পুকুরের মধ্যে পুরনো ভারতের, শাশ্বত ভারতের একটা ছাঁচ আনতে চাইছেন তিনি। 'আগুনের ফুল' ছোটগল্পকে সূত্র হিসাবে ধরে গড়ে উঠেছে চন্দন সেনের নাটক 'কর্ণাবতী'। বদলে গেছে গল্পটির আদিঅন্ত, বদলে গেছে সামাজিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট। বদলে গেছে, এমনকি, প্রীতমের একান্ত প্রিয় প্রতীকও। প্রীতমের গল্পের পদ্মপুকুর চন্দন সেনের নাটকে হয়ে উঠেছে খরস্রোতা নদী। ফুলের স্তব্ধ সমারোহ নয়, দুরন্ত জলোচ্ছ্বাস, কঠিন পাথর আর রুক্ষ বালির নদী। নাম কর্ণাবতী। অমৃতা প্রীতমের গল্প ভোল বদলে পেয়েছে এক অন্য শরীর, তারই নাম কর্ণাবতী। প্রযোজক : সায়ক। নির্দেশনায় মেঘনাদ ভট্টাচার্য।

সার্থক চলচ্চিত্রে সিনেমাটোগ্রাফারের যে ভূমিকা থাকে, তাপসবাবুও ঠিক সেই কাজটিই করেছেন এখানে। অনেকটা লেনস-আইয়ের নীতি মেনে তৈরি এ নাটকেব আলোকবিজ্ঞান।। বিশাল মঞ্চে, বিরাট সেটের ঠিক যে অংশটুকু যতটা গাঢ় illumination-এ দেখাতে চান নির্দেশক, ঠিক ততটুকুই দেখার মতো আলো ফেলছেন আলোকসম্পাতশিল্পী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রে যেমন ক্যামেরায় চোখ দিয়েই দেখতে বাধ্য আপনি, কর্ণাবতীতেও তাই। প্রথম দৃশ্যে পর্দা উঠতেই মঞ্চের একপাশ দিয়ে অন্যপাশে বেরিয়ে যায় প্যান্টোমাইমে গঠিত একটি উট। রাজস্থানের এই ছোট্ট অনুষঙ্গটি ধরিয়ে দিয়েই মঞ্চের বাঁ কোণ দিয়ে প্রবেশ করে রাজস্থানি মহিলাদের একটি মিছিল। সবাই চলেছে জল আনতে, মাথায় পিতলের কলস। তিরের মতো সূক্ষ্ম আলোয় উদ্ভাসিত শুধু কলসরেখা, নারী শরীরের সিল্যুয়েট। এ নাটকের দুই কেন্দ্রীয় থিম নদী আর নারী। তাদের মধ্যে বহমান সম্পর্কের কাব্যটুকু বুনে দেন তাপস সেন ও তাঁর সহায়ক সম্পাতশিল্পী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেই বুনোটেই তৈরি হয় নাটকের সুর—নদী নারীর কাব্য।

গুলবন্তীর মতো একটি অন্ত্যজ চরিত্রের আত্মানুসন্ধানই অমৃতার লেখার বিষয় ছিল। কিন্তু চন্দন সেনের কুসুম্বি তা নয়। কুসুম্বির সামাজিক বিদ্রোহ অনেক প্রখর, অনেক বেশি প্রকট। কুসুম্বির সাহস ও প্রত্যয় ফুটিয়ে তুলতেই মোল্লির অসহায়তা দেখিয়ে একটা কনট্রাস্ট বা বৈপরীত্য তৈরি করা হয়েছে। অমৃতার গল্পের দাসী রৌতায়নের মধ্যে এতটা ভয়াবহ অসহায়তা ছিল না। মোল্লি শুধু রাওয়াতের রক্ষিতা নয়, সে একই সঙ্গে রাওয়াতের প্রেমাকাঙ্ক্ষী ও প্রতিশোধস্পৃহ। তার matter of fact চরিত্রের পাশে কুসুম্বির রোম্যান্টিসিজম আর একটি কনট্রাস্ট। এ জন্যই কুসুম্বি ও মোল্লি দুটিই জটিল মানসিকতার দুরূহ চরিত্র। তাই তাদের অভিনয়ে আলোছায়ার বৈপরীত্যও অনেক বেশি। মোল্লির চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদীপা বসু। তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ অভিনেত্রী। তাঁর অভিনয়ে সেই অভিজ্ঞতায় অর্জিত কলাকৌশল চোখে পড়ে। কুসুম্বির চরিত্রাভিনেত্রী

অনিন্দিতা সাহা একেবারেই নতুন মুখ। রোমান্টিক, প্রায়-কাব্যিক, দুঃসাহসী কুসুম্বি হয়ে ওঠার জন্য তিনি খুবই পরিশ্রম করেছেন। সায়কের প্রযোজনার দুটি বৈশিষ্ট্য সবাই জানেন। বৈশিষ্ট্য দুটি হল, অভিনয়ের মান ও প্রযোজনার সজ্জা। 'কর্ণাবতী' সেই বৈশিষ্ট্য বা ঘরানা ধরে রেখেছে হুবহু। ব্যয়বহুল এ প্রযোজনা। রাজস্থানি পোশাক, দ্রুত পরিবর্তনযোগ্য মঞ্চ প্রপার্টিজ, খালেদ চৌধুরী-কৃত মঞ্চচিত্রণ, খালেদবাবুর পরামর্শে নির্মিত স্বাগতা চক্রবর্তী-কৃত আবহসঙ্গীতে লোকায়ত সুরের ব্যবহার—সব কিছুর মধ্যে একটা সমতা এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন নির্দেশক। মেঘনাদ ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব এই সামগ্রিকতা। অমৃতা প্রীতমের গল্পে যা ছিল নেহাতই সুপ্ত বীজ, চন্দন সেনের সংলাপ ও মেঘনাদ ভট্টাচার্যের সম্পাদনার গুণে তাই হয়ে উঠেছে এক লিরিকাল থিয়েটার। সায়কের পূর্বতন প্রযোজনা 'দায়বদ্ধ' বা 'বাসভূমির' চেয়ে অনেক বেশি কাব্যিকতা। শিল্প হিসেবে সেজন্যই কর্ণাবতী বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্র পরিচিতি

১. The Influence of the West on Punjabi Literature, Dr. M P. Kohli, P. 96, Ambala city, 1956
২. আধুনিক হিন্দী ঔর পঞ্জাবী নাটক। ড: সন্তোষ গার্গী, পৃঃ ২২৫, পাতিয়ালা, ১৯৭৪।
৩. পঞ্জাবী নাটককার, গুরুচরণ সিং, পৃ: ১৪০, অমৃতসর, ১৯৫১
৪. "Nanda's success as a play-wright lies in many things; such as remarkable purity of idiom and expression, suitability of his plays for the stage, drawing upon his personal experience in the selection of themes, characters and dialogues and single but natural construction of plot." The Dramatic Tradition in the Punjab, Dr, Harcharan Singh, p. 282.
৫. "In the late thirties Punjabi theatre entered a new phase. From mere social reform, Punjabi drama slowly ventured to touch psychological theme"–Punjabi Drama. Balwant Gargi, Indian Literature, April-Sept., 1958. p. 124. New Delhi.
৬. vide - Punjabi Literature, I Serebriakov, Moscow, 1968.
৭. Marxist Cultural Movement in India. Ed. Sudhi Pradhan (article Punjabi reports, p. 159), Calcutta, 1979.
৮. Enact, Ed. R. Paul, Jan-Feb, 1980 (article-Punjabi theatre a perspective, Dr. Attar Singh), New Delhi, 1980.
৯. Indian Literature since Independence, Ed. K. R. S Iyenger (article - Punjabi, Attar Singh, p. 226-227), New Delhi. 1973
১০. সারে দে সারে নাটক, হরচরণ সিং, পৃ: ১৫
১১. তদেব, পৃ: ৯
১২. ডঃ হরচরণ সিং দী নাটককলা, প্রীতম সৈনি, লুধিয়ানা, ১৯৭৫
১৩. Enact, Ed. R. Paul, Jan-Feb, 1980. How Delhi.
১৪. The Influence of the West on Punjabi Literature, De.M.P. Kohli, p. 124. Ambala City. 1969
১৫. পঞ্জাবী নাটককার, গুরুচবণ সিং, পৃ: ৪৬৮, অমৃতসর, ১৯৫১।
১৬. অনহোণী, কপুর সিং ঘুম্মন, ভূমিকা, পৃ: ৭
১৭. Eugene Ionesco Quoted in The Theatre of the Absurd, Martin Esslin, p. 23, a Pelican Book. 1968.

১৮. বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, পৃ: ৪০৫, ১ বৈশাখ, ১৩৯২ সাল।
১৯. Enact, Ed. R. Paul. Sept. 1968. New Delhi.
২০. Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebrations (Vol. II) Ed. S. C. Sengupta (article-Rabindranath and Punjabi Literature, Trilochan Singh, p. 7), Santiniketan
২১. Theatre in India, Balwant Gorgi, p. 116, New York, 1962.
২২. Ibid, p. 123.
২৩. টেগোর দে নাটক, বিসর্জন, কর্তার সিং দুগ্গল, দিল্লী, ১৯৬৫।
২৪. Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebration (Vol II), Ed. S C. Sengupta (article - Rabindranath and Punjabi Literature, Sant Singh Sekhon, p. 13). Santiniketan.
২৫. Literary Encounters, Kartar Singh Duggal, p. 193, New Delhi, 1980.
২৬. "Tagore has influenced Kartar Singh Duggal greatly especially his poetic treatment of the themes"–The letter written by K. S. Duggal to the author on 29.1.86.
২৭. Natya, Tagore Issue, (article - Tagore on Delhi Stage. L. Thapalyal)
২৮. পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ১.৮.৮৬
২৯. যুগান্তর, কলকাতা, ৫.৬.৮৭
৩০. The Economic Times, Bombay, 8 5.1977
৩১. আজকাল, কলকাতা, ৯.৭.৮৫
৩২. স্ক্রীণ (হিন্দী), কলকাতা ২৭.১১.৮৬
৩৩. পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ৭.১১.৮৬
৩৪. Letter written to the author by C. D. Siddhu.
৩৫. Letter written to the author by S. N. Sevak
৩৬. আজকাল, কলকাতা, ১৪.৫.৮৫।
৩৭. দেশ, কলকাতা, ৩.৮.৮৫
৩৮. কালান্তর, কলকাতা, ১৮.৫.৮৪।
৩৯. দৈনিক বসুমতী, কলকাতা, ২৮.১০.৮৫
৪০. পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ২৮.৩.৮৬
৪১. এপিক থিয়েটার, উৎপল দত্ত সম্পাদিত, সংখ্যা ৬-১০, কলকাতা, ১৯৮৬।
৪২. সানন্দা, কলকাতা, ১৬.৮.৯৬।

দশম অধ্যায়

আধুনিক তামিল নাটক

১. সূচনা পর্ব

আধুনিককালের তামিল নাটক বুঝতে গেলে গত শতাব্দীর নাট্যভাবনাব পবিচয় দবকাব যা ছিল প্রধানত তিন ধরনের — (১) সঙ্গীত নাটক, যেমন 'নন্দনর চবিত্র কীর্তনই' ও 'রাম নাটকম', (২) নৃত্যনাটক যার রূপ পাওয়া যায় কুরভঞ্জী, পাল্লু এবং নন্দী নাটকম রীতিতে. (৩) লোকনাটক যাতে সংলাপ সঙ্গীত ও নৃত্যেব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

সঙ্গীতনাটক ও নৃত্যনাটকে সংলাপকে বসানো হয়েছে সুরে, অনেক সময় কথা ও গান এক হযে গেছে। এই সব নাটক মূলত ধর্মীয়—কোন মহাপুরুষ সাধুসন্তের জীবন বা পুরাণ গাথা এর বিষয়। কিন্তু এদের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এতে সংলাপ বা বাকবীতি মধ্যযুগেব তামিল ক্লাসিক সাহিত্যের ভাষাব তুলনায় অনেক প্রত্যক্ষ জীবন্ত ও সাধাবণ মানুষের মুখের ভাষাব কাছাকাছি। সেই বিচারে এরা আধুনিক নাটকের পূর্বসূরী।

Folk Play বা লোকনাটক এদের থেকে কম সাহিত্যে মূল্যের। এখানে সঙ্গীত থাকলেও তা প্রাধান্য পায়নি। নাটকের সংলাপে বিশেষ সাহিত্য মূল্য না থাকলেও তা অত্যন্ত বাস্তব। নাটকের বিষয় পুরাণ বা লোককথা বা ইতিহাসের গল্প, চবিত্র রাজা মন্ত্রী পুরোহিত কৃষক মজুর, অন্ত্যজ ব্রাত্য চরিত্ররা যখন মঞ্চে আসত তাতে জীবনেব ছোঁয়া লাগত—রাজামন্ত্রীদের জাঁকজমক পূর্ণ পোযাক পরিবেশ ও আড়ম্বরপূর্ণ কথার বদলে সাধাবণ মানুষেব জীবন-কথা সুখ-দুঃখের ভাবনা সহজভাবে অনায়াসে ভঙ্গীতে প্রকাশ পেত।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিশেষ করে ইংরাজী সাহিত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তামিল নাটক অভিনব ও প্রত্যয়-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন ইংরাজী শিক্ষিত তামিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে মুগ্ধ, শেক্সপীয়র তাঁদের চোখে মোহাঞ্জন পরিয়ে দিয়েছে—বিশেষ করে শেক্সপীয়র-এর কবিত্ব ভাষা নাট্যরীতি তাঁদের মুগ্ধ করেছে। শেরিডনের কমেডি পড়েও তারা উচ্ছ্বসিত। এঁদের নাটকে অনিবার্যভাবে এল পাশ্চাত্য প্রভাব—আদিমধ্যঅন্ত সমন্বিত কাহিনী, কবিত্ব, জাঁকজমকপূর্ণভাষারীতি ও দার্শনিকতা যা অনেক সময় নাটক—সম্পর্ক বর্জিত বা আরোপিত। এই জাতীয় নাটকের ভালো নিদর্শন অধ্যাপক **সুন্দরম পিল্লাই** (১৮৫৩-১৮৯৭) এর 'মনোম্মনীয়ম' এবং সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রীর 'মন বিজয়ম' ও 'কলাবতী'। স্বামী বিপুলানন্দ রচিত 'মদঙ্গশূলামনি' নাটকও স্মরণীয়। এদের মধ্যে সুন্দরম পিল্লাই-এর 'মনোম্মনীয়ম' বিশেষ উল্লেখ্য। এর বিষয় বস্তু নেওয়া হয়েছে Lytton এর Secret Way থেকে। লেখক চেষ্টা করেছেন এতে তামিল মহাকাব্যের রীতি আনতে। এতে ভঙ্গী পুরোনো, প্রবাদ ও নীতিবাক্য বহুল ব্যবহৃত, চরিত্র সুঅঙ্কিত নয়। অভিনয়োপযোগিতাও এর বিশেষ নেই। মাঝে মাঝে আশ্চর্য কবিত্ব আছে।

প্রথম যুগের নাট্যকারদের মধ্যে **শঙ্করদাস স্বামীকল** (১৮৬৭-১৯২২) অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি প্রহ্লাদ, সতী অনসূয়া, সুলোচনা সতী, নল্লটংকল প্রভৃতি

অন্তত চল্লিশটা নাটক লিখেছেন। তিনি আধুনিকতার অন্যতম পূর্বসূরী। নাটকে তোপ্‌পাইকুত্তাটি প্রভৃতি চরিত্র বাদ দেওয়া, কাব্যছন্দের মধ্যে গদ্য সংলাপ আনা, নাটককে বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত করা ইত্যাদি বিভিন্ন নতুনত্ব তাঁর নাটকে পাওয়া যায়।

২. প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব

সূচনাপর্বের এই সব ভাবনাকে পূর্ণতা দান করে তামিল নাটককে যথার্থ শিল্পময় সাহিত্য গুণান্বিত করে তুলেছেন **পি সম্বন্দ মুদালিয়ার** (১৮৭৩ - ১৯৬৪) যিনি প্রকৃতপক্ষে আধুনিক তামিল নাটকের প্রথম লেখক। তিনি প্রায় আশিটি নাটক লিখেছেন। তাঁর সংস্থা 'সুগুন বিলাস সভা' তাঁর অনেক নাটক মঞ্চস্থ করেছে এবং তাতে তিনি অভিনয় করেছেন। শ্রীমুদালিয়র নাটক রচনা প্রযোজনা ও অভিনয়কে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মঞ্চের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর নাটকগুলো লেখা ও সে ব্যাপারে তারা সফল। অকারণ সঙ্গীত প্রয়োগে নাটকগুলো আচ্ছন্ন নয়। ইংরাজী নাটক তাঁকে অনুপ্রাণিত করলেও সংস্কৃতকে তিনি বর্জন করেননি। তিনি দু-ধরনের নাটকই অনুবাদ করে তামিল নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। অসংখ্য মৌলিক নাটকও তিনি লিখেছেন। রাজারানী সভাসদ থেকে শুরু করে সমসাময়িক অগণিত সামাজিক চরিত্র তাঁর নাটকে এসেছে। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন-গুলো সমাজের অন্যায় অবিচার দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে। তাঁর 'সভাপতি' সিরিজের নাটকগুলো সমাজের সুন্দর চিত্রণ। ঐ পর্যায়ে প্রথম নাটক প্রকাশিত হয় ১৯১৮-তে। তারপর ক্রমশ লেখেন 'পোঙ্গল পণ্ডিকাই' (পোঙ্গল উৎসব, ১৯২৩), 'ওর ওত্তিকাই' (একটা রিহার্সাল), 'ওর ভিরুনদু' (একটা ভোজন), 'ভিটুদি পুষ্পাঙ্গল' (ঝরা ফুল ১৯৩৭), 'সভাপতি' (জমিদার), এবং সপ্তম পর্যায়ে 'সভাপতি টুনুক্কুকাল' (১৯৪৯)।

তাঁর অন্যান্য উল্লেখ্য নাটক হল — রোমান্স ধর্মী নাটক 'মনোহর', অনুবাদ ও ভাবানুবাদ 'মগপতি' (শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ অবলম্বন), সামাজিক নাটক 'বিরাম্মনমুম শুদ্দিরনুম' (ব্রাহ্মণ ও শূদ্র) প্রভৃতি।

পি সম্বন্দ ছ খণ্ডে আত্মজীবনী লিখেছেন — 'নাটক মেটাই নিনাইভূকল' (রঙ্গমঞ্চের স্মৃতিকথা ১৯৬৩)। তাঁর ষাট বছরের নাটকচর্চার কথা গ্রন্থে আছে। একটু ক্লান্তিকর হলেও তামিল থিয়েটারের আলোচনায় এই গ্রন্থ অপরিহার্য।

বর্তমানে পি সম্বন্দ মুদালিয়রের নাটক সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ আনা হয়। তাঁর কবিত্বশক্তি উচ্চমানের নয়, সংলাপ ও ভাষা বিবর্ণ, জীবনের রূপায়ণে কোন দার্শনিকতা তাঁর রচনায় নেই, মনস্তাত্বিক চরিত্রচিত্রণও অনুপস্থিত। তবু তাঁর নাটকের মূল্য বা মর্যাদা অস্বীকার করতে পারেননি সমালোচক। It is generally accepted that his plays were eminently presentable and have held the stage for nearly two decades, that they brought about a revolution in the attitude to the theatre and made people realise the potentialities of the drama as an interpretation of life, that they lifted Tamil drama from the misty symbolism of the musical and dance pastorals and the rough and tumble banalities of the folk-play, to clarity, dignity and significance that he cleared the deck for the advent of the dramatist.[১]

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়। সমস্ত দেশ ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মেতে ওঠে—গ্রামে গঞ্জে নগরে প্রান্তরে সর্বত্র সুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। তামিল নাটকে তার ছাপ পড়ে গভীর ভাবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শ নাটকে আসতে শুরু করে সোজাসুজি। মঞ্চ প্রচার করতে সুরু করে কংগ্রেসের আদর্শ ও

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাণী। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রেরণা দিয়ে অনেক নাটক লেখা হয়। **টি. কে. পাভলর** লেখেন 'কাদারিন ভেট্রি' বা খদ্দর বিজয়—এতে ভারতবর্ষের সপক্ষে ও ব্রিটিশ রাজের বিপক্ষে সোজাসুজি বক্তব্য রাখা হয়। এটি মঞ্চস্থ হয় ১৯২১ সালে। এই নাটকের জনপ্রিয়তায় ব্রিটিশরাজ একে নিষিদ্ধ করে। পাভলরের 'দেশক্কোডি' বা জাতীয় পতাকা নাটকও স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রবাণী উচ্চারিত করে ও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বলে, —এটিও নিষিদ্ধ হয। তার 'পঞ্জাব কেশরী' নাটক ভারত ইতিহাসের গৌরব তুলে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ধিককার জানায় ব্রিটিশকে। **স্বামীনাথ শর্মা** দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় কৃতিত্ব দেখান যা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর 'দেশভক্তি' স্বাদেশিকতার মহৎ ভাবনায় দীপ্ত। 'পানপুরত্তু বীরম' (১৯২৪) নাটকও এ বিষয়ে উল্লেখ্য। শ্রী শর্মার অন্যান্য উল্লেখ্য নাটক হল 'লক্ষীনাথন' (১৯১৫),' উত্তীয়োকম' (১৯২৩), 'অভিমন্যু' ইত্যাদি। গান্ধীজীর বিভিন্ন সংস্কারবাদী আন্দোলনও নাটককে প্রেরণা দেয়। এ যুগের দর্শক এই সব নাটককে প্রবল উৎসাহ বরণ করে।

১৯৩০-এর শেষ দিকে মঞ্চের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবলভাবে জড়িয়ে পড়ে যা তামিল নাটকে গভীর প্রেরণা দেয় ও নতুনত্বর সঞ্চার করে। স্বাধীনতার সংগ্রাম গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি নাটককে এত প্রভাবিত করে যে কোন নাটকে সোজাসুজি রাজনীতির কথা না থাকলেও নাটকের প্রধান চরিত্ররা বিরতি বা দৃশ্যান্তরের সময় মঞ্চের সামনে এসে স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে বা গান্ধীজী বা নেহরুকে নিয়ে গান গাইত। অভিনেতারা না পারলে অন্য কোন শিল্পী যেমন হারমোনিয়াম বাদক—এ কাজ করত। চল্লিশের প্রথম দিকে প্রায় সব নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যসংগ্রহ অন্তত একটা রাজনৈতিক নাটক থাকত।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক নাটকেও নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। এইসব নাটকে তামিলনাড়ুর ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়, এবং পরোক্ষে যেন ব্রিটিশরাজের স্বরূপকেও উদ্ঘাটিত করা হয়। দেশীয় রাজা বা সংগ্রামী সৈনিক যিনি ইংরাজদের বিরোধিতা করেছেন যেমন (কাট্টাবোম্মান) তিনি, এমন কি আভ্ভাইয়ারের মত সাহিত্য স্রষ্টারাও জনপ্রিয় হন। অবশ্য এইসব নাটকের সাফল্যের মূলে আছে এইসব নামকে অবলম্বন করে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ, যদিও অভিনেতাদের কৃতিত্বও কম নয়।

সি সুব্রহমন্য ভারতী (১৮৮২ - ১৯২১) তামিল সাহিত্যে নবজাগরণের কবি, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের মহৎ রূপকার। তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি এবং কবিতার মাধ্যমে বিপ্লবী ভাবনাকে রূপায়িত করেছেন। দুটি নাট্যধর্মী দীর্ঘ কবিতা তিনি লেখেন—'কুইল পাট্টু' (কোকিলের গান) ও 'পাঞ্চালী শবদম' (পাঞ্চালীর শপথ)। দুটি নাট্যকাব্য ফরাসী শাসিত পন্ডিচেরিতে বসে লেখা যেখানে কবি ব্রিটিশ শাসনের দমন পীড়নে বাধ্য হন আশ্রয় নিতে। দুটির সম্পূর্ণ প্রকাশকাল ১৯২৩ ও ১৯২৪, কবির মৃত্যুর পর। 'কুইল পাট্টু'তে প্রেমের দার্শনিকতাময় অপরূপ সৌন্দর্য প্রকাশিত। 'পঞ্চালী শবদম' মহাভারত কথার ওপর ভিত্তি করে লেখা। পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, দ্রৌপদীকে পণ রাখা ও হারানো, দুশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ লাঞ্ছনা ও বস্ত্রহীন করার প্রয়াস, সভাসদ ও পঞ্চ-পাণ্ডবের অসহায় নীরবতা, দ্রৌপদীর প্রবল ক্ষোভ ও শপথ বাক্য উচ্চারণ—এই কাহিনী নাটকীয়তায় বর্ণিত। ভারতীয় কাহিনীর দ্রৌপদী যেন লাঞ্ছিতা শৃঙ্খলিতা ভারত জননী যাকে শুধু বাইরের অত্যাচারীরাই নির্যাতিত করছে না, নপুংসক

দেশবাসী স্বজনপ্রিয়জনও নীরবে তার অপমান দেখছে। দ্রৌপদীর কথায় নিপীড়িতা দেশমাতার ক্ষোভ যন্ত্রণা তীব্র ভাবে উৎসারিত হয়েছে—তিনি প্রতিবাদ করেছেন অন্যায় অত্যাচারের, জাগাতে চাইছেন দেশবাসীকে, প্রত্যাশা করছেন মুক্তি ও মর্যাদা। 'পাঞ্চালী শবদম' স্বদেশচেতনার এক অগ্রিপ্রভ শিল্পরূপ। সহস্রনামম ও তাঁর গোষ্ঠী এই নাটকের অসাধারণ রূপায়ণ ঘটান। অন্য ভাষায়ও নাটকায়িত হয়েছে।

পুদুমাইপিত্তন (সি বৃদ্ধচলম ১৯০৬-১৯৪৮) পৌরাণিক নাটক লিখেছেন 'ওয়াক্‌কুম ওয়াক্‌কুম' (কথা ও তার প্রতিধ্বনি)। রূপক ধরনের এই নাটকে সামাজিক রাজনৈতিক বক্তব্যকে ফিল্ম সিনারিওর রূপে তুলে ধরা হয়।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব

স্বাধীনতা আন্দোলন যত জোরদার হয়, সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ের নাটকও তত বাড়তে থাকে। কিন্তু তখন মঞ্চে কোন বিশেষ দলের কর্মসূচী বা কট্টর রাজনৈতিক বা সামাজিক বক্তব্যকে তুলে না ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শজাত উপনিবেশিকতা-বিরোধী ভারতীয় আদর্শকেই রূপ দেওয়া হত। কুড়ির সময় থেকে মধ্যচল্লিশ পর্যন্ত দেশের অন্যান্য স্থানের নাটকের মত তামিল নাটকও স্বাধীনতার সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পুষ্ট করেছে। কিন্তু ক্রমে তামিল নাটকে রাজনীতি অন্য পথে চলতে সুরু করে। দ্রাবিড়ীয় ভাবাদর্শের অনুবর্তী আন্দোলনের উদ্ভব রাজনীতি-সচেতন তামিল থিয়েটারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তামিলনাড়ু ও তামিল সংস্কৃতির মহিমা ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা সুরু হয়। ১৯৫০ থেকেই তামিল নাটক (ও সিনেমা) ডি এম কে পার্টি ও তার আদর্শকে তীব্র ভাবে প্রচার করতে থাকে।

এই সময়ের নাটকে দেখা যায়—রাজনীতির প্রাধান্য : প্রথম পর্যায়ে জাতীয় রাজনীতি ও পরবর্তীকালে দলীয় রাজনীতির প্রকাশ; উত্তর ভারতীয় নীতি সংস্কৃতির প্রবল বিরোধিতা; সামাজিক প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঃ ব্রাহ্মণত্বের বিরোধিতা, জাতপাতের অবসান ঘোষণা, বিধবা বিবাহ সমর্থন, সমাজে নারীর স্থান ও অধিকার নির্ণয় ইত্যাদি; অর্থনৈতিক সংঘাত — জমিদার শ্রেণী ও ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াই ইত্যাদি। প্রধানত এইসব প্রবণতাই স্বাধীনতার পরবর্তী তামিল নাটকে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়েছে। সমালোচক বলেছেন যে স্বাধীনতার পর তামিল নাটকে রেনেশাঁস ঘটে।[২]

তামিল থিয়েটার (ও সিনেমাকে) দলীয় রাজনীতির আবর্তে আনেন **সি এন আন্নাদুরাই** (১৯০৯ - ১৯৬৯) এবং সম্ভবত তিনিই প্রথম তামিল রাজনীতিবিদ যিনি রাজনৈতিক প্রচারের শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে মঞ্চের উপযোগিতা উপলব্ধি করেন। তিনি নিজেও একজন দক্ষ অভিনেতা ও নাট্যকার ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে A revival in the theatre is very essential. It is a good index to the new awareness in the country, A good theatre will indicate how people shall live in the future.[৩]

তাঁর প্রথম নাটক 'চন্দ্রোদয়ম' (১৯৪৩) প্রচলিত সমাজবোধে প্রবল আঘাত হানে। হিন্দু দেবত্র সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন, বিধবা বিবাহ নিরোধ আইনের সংস্কারে জোর দেন, এবং জমিদারী প্রথাকে অন্যায় মনে করে তাকে আক্রমণ করেন। আন্নাদুরাই চারের দশকে অন্যান্য নাটক রচনা করেন পার্টির সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে। যে ভারতীয় পৌরাণিক গল্পকাহিনীর ওপর তামিল নাটক ছিল নির্ভরশীল ডি কে ছিল তার সম্পূর্ণ বিরোধী। ডি কে গোষ্ঠীর মতে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত ও পুবাণ কাহিনী তামিল সংস্কৃতিতে উত্তর ভারতীয় বা ব্রাহ্মণ্য

ভাবাদর্শের অনুপ্রবেশের উদাহরণ। যেমন—রামায়ণ ঈশ্বরের অবতার পাপীর শাস্তি-বিধানকারী সাধুর পরিত্রাতা রামচন্দ্রের গল্প নয়, তা হলে উত্তরাঞ্চলের এক বিচারবোধহীন দুঃসাহসিক যোদ্ধা-অভিযাত্রীর তামিলনাড়ুর সংস্কৃতি সভ্যতার বিজয় কাহিনী।

এরকম উত্তর-ভারত বিরোধী ভাবাদর্শ আন্নাদুরাই-এর প্রায় সব নাটকেই দেখা যায়। যেমন 'নীদি দেবন মায়াক্কম' (রাজার প্রলোভন) নাটকে রামায়ণের অনুবাদক বিখ্যাত তামিল কবি কম্বন-কে রাবণ রাজসভায় ডেকে পাঠান ও রাবণকে রাক্ষস হিসাবে অঙ্কিত করার জন্য অভিযুক্ত করেন (আন্নাদুরাই নিজে রাবণের অভিনয় করতেন)। এইরকম তিনি লিখেছেন 'কাল সুমন্দ কাসাডর' (যারা পাথর বয়েছিল)। তামিল মহাকাব্য 'চিল্পপ্পদিকরম' থেকে নেওয়া এই নাটকে একজন দ্রাবিড় রাজা উত্তর ভারতে যায়, বিভিন্ন রাজ্য জয় করে। এবং দুজন রাজাকে নিয়ে আসে যারা তাকে বিদ্রূপ করেছিল এবং তাদের মাথায় পাথর বহন করতে হয় যা দিয়ে মন্দির হয়েছিল।

ডি এম কে-র আদর্শ প্রচারমূলক আন্নাদুরাই-এর 'কাদাল জ্যোতি' (ভালবাসার শিখা) নাটকটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। নাটকের প্রধান চরিত্র ব্রাহ্মণ জমিদার চন্দ্রশেখর আয়ার যে ভিলেনও। চন্দ্রশেখর ও তার দুই অনুচর থণ্ডবরায়ণ ও পোন্নান সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ। কৃষকদের ওপর তারা অত্যাচার করে। আয়ারের দুই সন্তান — জনপ্রিয় চিত্রতারকা অরুণকুমার ও বিধবা ডাক্তার মেয়ে যে শহরে প্র্যাকটিস করে। থান্ডবরায়ণেরও এক বিধবা মেয়ে পোন্নি যে পোন্নানের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার পর আত্মহত্যা করতে যায়। কিন্তু তার ভাই পাকিরি তাকে বাঁচায় ও পোন্নানকে বলে তাকে বিয়ে করতে। যদিও বিধবা-বিবাহ গ্রামের চিরকালীন নীতিনিয়মের বিরোধী, তবুও আয়ার অনিচ্ছা না জানিয়ে আশীর্ব্বাদ করে। কিন্তু আয়ার ক্রুদ্ধ হয় যখন শোনে যে তার নিজের মেয়ে বিয়ে করতে চায় তার পছন্দ করা ছেলেকে যে ভারতীয় সৈন্যদলে কাজ করে ও যে আয়ারের গ্রামের এক চাষীর পুত্র। আয়ারের ফিল্মস্টার ছেলেও এর বিরোধী যদিও বিভিন্ন নতুন ভাবনার বইয়ে অভিনয় করে সে জনপ্রিয়। আয়ার তার কন্যার প্রেমিকের বাড়ি আগুন দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারতে চায়। শেষ পর্যন্ত আয়ার বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বিবাহ হয় ডি এম কে-র নির্দেশিত পথে এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বদলে একজন নেতাই অনুষ্ঠানাদি করে। তেত্রিশটি দৃশ্য সমন্বিত (সাতটি ফ্ল্যাশব্যাক আছে) শিথিল আঙ্গিকের এই সিনেমাটোগ্রাফিক নাটকে আন্নাদুরাই ব্রাহ্মণদের সংকীর্ণতা নীচতা, জমিদারের অত্যাচার অবিচার, সাধারণ মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক সংকট চিত্রণে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

জটিল রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণে আন্নাদুরাই ডি কে থেকে চলে এসে ১৯৪৯-এ ডি এম কে গঠন করেন। ডি এম কে প্রথম থেকেই থিয়েটারকে জনসংযোগ-এর মাধ্যমে হিসাব গ্রহণ করে। পার্টি মিটিং-এর শেষে নাটক করা শুরু করেন আন্নাদুরাই যাতে নেতৃবৃন্দ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন। একদল নাটকমনা তরুণ যুবক ছিলেন আন্নাদুরাই-এর সহযোগী যাদের মধ্যে উল্লেখ্য এম করুণানিধি, ই নেডুনচেডিয়ান, কে এ মথিয়ালকন, এ পি জনার্ধনম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আন্নাদুরাই ১৯৪৪-এ তামিল নাটকের ওপর এক সেমিনার-ও করেছিলেন যাকে সফল করেছিল T. K. S. Brothers Company. যাই হোক ডি এম কে সদস্য বা সমর্থকদের রচিত নাটকে তামিল সভ্যতা সংস্কৃতির সগৌরব ঘোষণা থাকত, আর্য সংস্কৃতির নিন্দা থাকত, যে ব্রাহ্মণ্য বা উত্তরভারতীয় সংস্কৃতি তামিল আদর্শকে লাঞ্ছিত করতে চাইত তাদের ওপর প্রবল ঘৃণা বর্ষিত হত।

ভারতীদশন (কনকসুব্বারত্নম ১৮৯১-১৯৬৪) কবিতাধর্মী নাটক লিখেছেন অনেক যাদের বলা যায় Drama in verse. ভারতীদশনের রচনায় তিনি তামিল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন, উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, ধর্মের গোঁড়ামীকে আঘাত করেছেন, তামিল নারীত্বের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর 'তামিলচ্চিয়িনকত্তি' (তামিল নারীর ছুরি ১৯৪৯) নাটকে দেখা যায় তামিল মেয়ে কুপ্পাম্মা উত্তরাঞ্চল থেকে আগত আর্মি ক্যাপটেন সুদর্শন সিংকে ছুরি দিয়ে মারাত্মক আঘাত করে কারণ সে কুপ্পাম্মার স্বামীকে আর্মিতে ভাল পোস্টে দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে কুপ্পাম্মাকে ভোগ করতে চায়। কুপ্পাম্মা কোর্টে দাঁড়িয়ে জোরালো বক্তৃতা দিয়ে জয় অর্জন করে।

'নাটকঙ্গল' চারটি প্রচলিত রীতির নাটকের সংকলনগ্রন্থ। 'ইনবাক কাদাল' (আনন্দ সমুদ্র) সাধারণ প্রণয় ও মিলনের কাহিনী—এই সংকলনের অন্যতম নাটক। নাটকের নায়ক ইলাবাড়াকন ভালবাসে থঙ্গম-কে, ধূর্ত চতুর আরাসাপন আসক্ত পাট্টুর প্রতি। কিন্তু আরাসাপন লোভের বশবর্তী হয়ে বিয়ে করতে চায় প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক থঙ্গম কে। ইলাবাড়াকন ও থঙ্গমের বিয়ে স্থির। কিন্তু বিবাহ দিনেই আরাসাপন কৌশলে ইলাবাড়াকনকে নিয়ে যায় ও তাকে ঔষধ প্রয়োগে অচেতন করে রাখে। তারপর আরাসাপন বিবাহস্থলে গিয়ে থঙ্গমকে মঙ্গলসূত্র পরাতে যায়। কিন্তু থঙ্গম বাড়ি থেকে চলে যায়—সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরবে। এ দিকে পাটু অচেতন ইলাবাড়াকনকে নিয়ে আসে ও থঙ্গমের প্রাণ বাঁচায়। ইলাবাড়াকন পট্টুকে পাঠায় আরাসাপনের কাছে। সকলের মিলনে নাটক শেষ হয়।

'এদিরপারাদা মুত্তম' (অপ্রত্যাশিত চুম্বন ১৯৩৮) এক বিষাদান্তক প্রণয়কাহিনী। 'কাডালনীর কুমিলিকল' (সমুদ্র বুদবুদ ১৯৪৮) দেখিয়েছে কিভাবে ব্রাহ্মণও অন্যান্য অত্যাচারী শোষকদের বাদ দিয়ে জনগণ আপনাদের অধিকোর প্রতিপন্ন করেছে, প্রতিষ্ঠিত করছে নিজেদের শাসন।

এম করুণানিধি (১৯২৪) একজন কবি নাট্যকার ছোটগল্পলেখক এবং সফল অভিনেতা। তিনি ডি এম কে-এর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও চিত্রনাট্যকার। তিনি বড় রাজনীতিবিদ্, মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, তামিল সাহিত্যে তাঁর অবদান স্মরণ করে দেশবাসীর নাম দিয়েছিলেন 'কালাইঞর' (বা শিল্পে নিবেদিত প্রাণ)। তিনি সংস্কার ঐতিহ্য ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, হিন্দী ভাষা প্রবর্তনের তিনি তীব্র বিরোধী, এবং এজন্য তিনি অনেকবার কারাবরণ করেছেন। ডি এম কে-র সফল আন্দোলনের তিনি পুরোধা।

চারের দশকের প্রথম দিকে করুণানিধি পণ্ডচেরীতে 'দ্রাবিড় নাটক মনরম'-এর প্রযোজনায় 'শান্তি' নাটক মঞ্চস্থ করেন যাতে দ্রাবিড়ীয় ভাবাদর্শ প্রকাশিত ও কংগ্রেসী আদর্শ ধিকৃত হয়েছে। নাটকের প্রধান চরিত্র 'শিবগুরু'র মুখ দিয়ে করুণানিধির বক্তব্য প্রকাশিত যে চরিত্রে তিনিই অভিনয় করতেন। করুণানিধি পার্টিকে সাহায্য করার জন্য লেখেন 'পরাব্রাহ্মন' 'মনি মহদম' ইত্যাদি। শিবাজী গণেশন প্রথমটিতে, এস এস রাজেন্দ্রন দ্বিতীয়তে অভিনয় করেন। 'কাগজের ফুল' নাটকে এক কংগ্রেসী যুবক কাঝাগাম দলে যোগ দেয় কারণ সে তামিল ভাষাকে গভীর ভালবাসে। এতে করুণানিধি অভিনয় করতেন। করুণানিধি আরো লেখেন 'মনমোহন', 'মালাইকাল্লান', 'পুম পুহর' 'পু মালাই' প্রভৃতি। আন্নার মন্ত্রীসভায় ১৯৬৭-তে যোগদানের আগে লেখেন 'এসু নাথর' (যীশু খ্রিস্ট) যেটা ফিল্মও হয়।

করুণানিধির বিখ্যাত নাটক 'থুক্কু মেডাই' (ফাঁসি কাঠ ১৯৫১) যাতে দ্রাবিড় কাঝাগামের আদর্শ প্রচার করা হয়েছে—গ্রামের কৃষকদের অবস্থা, পুরোহিতদের প্রাধান্য, ব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য কোটা ও অব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য আলাদা হোস্টেল ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তামিল ভাবনাকে অবদমনকারী ব্রাহ্মণদের বিবোধিতা এই নাটকে আছে। এর নায়ক পন্ডিয়ন এক বলিষ্ঠ সাহসী বুদ্ধিমান তামিল যুবক সে অব্রাহ্মণ ছাত্রদের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয় এবং প্রবল যুক্তিবাদী হিসাবে সরল তামিলদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ব্রাহ্মণদের সামাজিক অনৈক্য ও পুরাণ গল্পকথার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেয়। আদর্শ নারীকে ভালবাসার পরিণামে তাকে ফাঁসিকাঠে চড়তে হয়। ফাঁসিকাঠে ওঠার আগে সে তামিল জাতীয় ভাবোদ্দীপক দীর্ঘ বক্তৃতা দেয় ও নাটক শেষ হয়। আন্নাদুরাই 'থুক্কু মেডাই'কে তামিল রেনেশাঁসের এক অসামান্য প্রয়াস মনে করতেন। নাট্যকার স্বয়ং পনডিয়ানের চরিত্রে অভিনয় করতেন। তাঁর অগ্নিপ্রভ সংলাপ ছিল অসাধারণ। ডি এম কে ব শত্রুরাও এই নাটক দেখতে আসত। কংগ্রেস সরকার একে বাজেয়াপ্ত করে।

তামিল সংস্কৃতিতে তাঁর মূল্যবান সংযোজন হল যুবরাজ কবি ইলাঙ্গো-র লেখা অমর ক্লাসিক 'চিলপ্পদিকরম'-এর নাট্যরূপায়ণ। যখন ১৯৫৩ সালে তিনি তিরুচিরপল্লী জেলে ছিলেন এই মহাকাব্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন ও একে নাট্যরূপদানের সিদ্ধান্ত নেন। এইভাবে জন্ম নেয় 'পুম পুহর' (কাবেরি পথিনম-এর প্রাচীন নাম, অর্থ 'ফুলের শহব')।

'মন্দিরি কুমারী' (মন্ত্রী কন্যা) নাটকে এক ধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও তার ছেলে যড়যন্ত্র করে মাতৃভূমিকে কলঙ্কিত করতে চায় কিন্তু নায়িকা (এক মন্ত্রী-কন্যা) তার মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্য আত্মদান করে।

করুণানিধির শ্রেষ্ঠ রচনা 'পরাশক্তি' প্রথমে ফিল্ম ও পরে নাটক হয়। তিন তামিল ভাই চন্দ্রশেখরণ, জ্ঞান. .রণ ও গুণশেখরণ বর্মায় কাজ করে। তাদের বাবা ও বোন কল্যাণী মাদুরাই-তে থাকে। বোনের বিয়ের খবরে গুণশেখরণ তাড়াতাড়ি বাড়িতে যাত্রা করে, অন্য ভাইরাও আসছে। ইতিমধ্যে কল্যাণীর স্বামী দুর্ঘটনায় মারা গেছে, তার বাবাও শোকে প্রাণত্যাগ করে। কল্যাণী শিশুপুত্র নিয়ে পথে দাঁড়ায়। গুণশেখরণ মাদবাজে এসে এক পতিতার পাল্লায় পড়ে টাকা ও জিনিসপত্র হারিয়ে উন্মত্ততার ভান করে। কল্যাণীর দেখা পেলেও সে লজ্জায় আত্মপ্রকাশ করে না। নিরুপায় সহায়-সম্বলহীন কল্যাণী কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়। সে একটা ব্রিজে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে নীচে ছুড়ে দেয়, কিন্তু নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পুলিশ তাকে ধরে। শিশু হত্যা ও আত্মহত্যার প্রয়াসে কল্যাণীর বিচার হয়। কল্যাণী বিচারককে তাব জীবনের করুণ কাহিনী বলে, তার ভাইও এসে বলে সব কথা এবং এক তরুনী নিয়ে আসে কল্যানীর সন্তানকে যাকে সে বাঁচিয়েছে। কল্যাণীকে মুক্তি দেওয়া হয়। অন্য ভাইরাও আসে, গুণশেখরণ তার বোনের সন্তান রক্ষাকারী মেয়েকে বিয়ে করে। শিথিল কাহিনীবিন্যাসে ও চূড়ান্ত অতিনাটকীয়তা সত্ত্বেও 'পরাশক্তি' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। এটা ডি এম কে-র এক বিরাট প্রচার মাধ্যম। এতে সোসিও ইকনমিক পদ্ধতির কুফল দেখানো হয়েছে। যাতে এক সৎলোক উন্মত্ততার ভান করে ও তরুণী বিধবা আত্মহত্যায় উদ্যত হয়। নাট্যকার সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন ও সাধারণ মানুষের সৎ জীবনচর্চার অধিকার দাবি করেছেন।

করুণানিধি অন্তত ২৫টি নাটক, দেড়শো ছোটগল্প, শতাধিক কবিতা ও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি প্রথমে প্রচারক পরে শিল্পী। শিল্পের দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তিনি মনে করেন An art without ideals is like a house without a roof কিংবা a Kalaignar without principles is just a clown.[৪] তাঁর মাধ্যম যাই হোক না কেন,

মনে হয় করুনানিধি বলছেন উঁচু মঞ্চ থেকে। 'He is a mixture of Savarnola and the Mahatma in his stern crusades against the callous selfishness of the luxurious, and in his fervent mission for the salvation of the poor and the distressed. The uplift of those in misery and wretchedness is the principal theme of all his works. His shafts are aimed against the cruelties inflicted on orphaned humanity by the Knavish, the self-secking and the greedy.[৫]

অরু রামনাথন (১৯২৪ - ১৯৭৪) রচিত 'রাজ রাজ চোলন' নাটকে চোল বংশের বিখ্যাত রাজা রাজরাজ (৯৮৫ - ১০১৬ খ্রিস্টাব্দ)-এর সময়ের তামিলনাড়ুর গৌরবকে তুলে ধরা হয়েছে যা দেশপ্রেম বীরত্ব ও মহত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত। এই নাটকের বক্তব্য বিষয় গভীর ও গম্ভীর, সংলাপ ও ভাষারীতি জোরালো ও সাহিত্য গুণান্বিত, গঠনরীতি সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ যদিও তাতে সিনেমার প্রভাব আছে। টি কে এস ব্রাদার্স (টি কে সম্মুগম, টি কে ভাগরথী, টি কে শঙ্করম, টি কে মুথুস্বামী) নাটকটির মঞ্চায়নে অত্যন্ত সাফল্য দেখিয়েছেন।

শক্তি কৃষ্ণস্বামী রচিত 'কাট্টাবোম্মান' নাটক ঐ নামীয় বিখ্যাত তামিল দেশপ্রেমিক যোদ্ধার উপাখ্যান যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করেছিলেন। শিবাজী গণেশনের অভিনয় একে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে।

পণ্ডিত সমালোচক এ **শ্রীনিবাস রাঘবন** (১৯০৫ - ১৯৭৫) নাটক রচনাতে খ্যাতি অর্জন করেছেন—পৌরাণিক ঐতিহাসিক রচনাতেই তিনি পারঙ্গম। একাঙ্ক রচনাতেও তিনি দক্ষ। তাঁর 'বিশ্বরূপম' রামানুজাচার্যের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে লেখা যেখানে দেখানো হয়েছে উরঙ্গবল্লি নামে এক সাধারণ মানুষ কীভাবে ধর্মের প্রেরণায় সব পার্থিব সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করে। 'বানুম মান্নুম' (আকাশ ও পৃথিবী) চণ্ডীদাস ও রামীর কথা নিয়ে লেখা। নীচ জাতির মেয়ে রামীকে মন্দিরে ঢুকতে দেয় না উচু সমাজ। রামী চণ্ডীদাসকে ভালবাসে যে ভালাবাসা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। এবং রামী ঈশ্বরের নাম করতে করতে প্রাণত্যাগ করে। এ শ্রীনিবাস রাঘবনের 'অভন অমরন' পঁচিশ পৃষ্ঠার নাটিকা—কবি কম্বনের জীবনের শেষ দিকের ঘটনা এতে চিত্রিত। তামিল এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক তামিল ছোটগল্পের দক্ষ লেখক **পেরিয়াস্বামী থুরন** নাটকরচনাতেও পারদর্শিতা দেখেয়িছেন। তাঁর 'অলাকু মায়াক্কম' (১৯৫১) একাঙ্কগুচ্ছ জীবনের বিচিত্র বিস্ময়কর রূপায়ণ।

বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক **এম ভরদরাজন** বেশ কয়েকটি নাটক লিখেছেন। পচ্চাইআপ্পা মুদলিয়রের জীবন নিয়ে লেখা 'পচ্চাই আপ্পার' (১৯৫১), রাজপুত্র কবি সন্ন্যাসী ইলাঙ্কো ভাটিকল-এর আশ্চর্য জীবনের সুন্দর নাট্যরূপ 'ইলাঙ্কো' (১৯৫২) এবং একাঙ্ক সংকলন 'কাদাল এঙ্কে' (১৯৫২) ও 'মনকানরু' (১৯৫২) অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

বি এস রামাইয়া (১৯০৫ — ১৯৮৭) একটু হালকাচালে হলেও সমাজের (মূলত নীচুতলার) মানুষের ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন 'পোলিশকারণ মকন' (পুলিশের ছেলে) 'তেরট্টিমকন' (শকটচালকের ছেলে) ইত্যাদিতে৷ শেষোক্ত নাটকের ভিত্তি মহাভারত কথা—মহাবীর কর্ণের জীবন নিয়ে লেখা। দ্রৌপদীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রী সহস্রনামম-এর পরিচালনায় 'সেবা স্টেজ' এর অসাধারন অভিনয় করে ১৯৫৮-তে।

টি জানকীরমণ (১৯২১ - ১৯৮২) মূলত **কথাশিল্পী** — গল্প ও উপন্যাস রচনায় তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পেশাদারী মঞ্চের (সেবা স্টেজ) তাগিদে তিনি কয়েকটি নাটকও লেখেন। ১৯৫৭ সালে তাঁর প্রথম নাটক প্রকাশ পায়। 'নালু ভেলি নিলম' (চার কাঠা জমি), 'ভডিভেলু ভাথিয়ার' বা শিক্ষক ভডিভেলু প্রভৃতি নাটক সমাজ

জীবনের প্রতিচ্ছবি। শেষোক্ত নাটকটিতে একজন আদর্শবাদী শিক্ষকের কথা বলা হয়েছে যিনি অন্যায় অপরাধের সঙ্গে আপোষ করতে রাজী নন। ষাটের প্রথম দিকে এই নাটক তামিল মঞ্চে নতুন স্বাদ আনে। মফঃস্বল টাউনের এক হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষক আপ্রাণ চেষ্টায় দাঁড় করিয়েছেন স্কুলকে। সমস্ত ছাত্র তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করে। কিন্তু এক প্রাক্তন ছাত্র সামিয়াপ্পা, এখন শহরের গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, তাঁকে সহ্য করতে পারে না। সামিয়াপ্পা ঐ স্কুলের পরিচালনভার পায় ও মিথ্যা অভিযোগে ভদিভেলুকে পদচ্যুত করে। ছাত্ররা ধর্মঘট করতে গেলে ভদিভেলুই বাধা দেয়। দুঃখে তার দিন কাটে। বল্লি সামিয়াপ্পার মেয়ে ও তার ছাত্রী এবং সে তার শিক্ষককে গভীর শ্রদ্ধা করে ও তাকে ভাল চাকরী দিতে চায় কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করে। বল্লি বোঝে তার বাবার কোন পুরাতন অপরাধ ও শাস্তির জন্য শিক্ষকের ওপর তার রাগ। তার চেষ্টায় সামিয়াপ্পা দোষ স্বীকার করে ও শিক্ষক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশচেতনা ও রাজনীতি-সচেতনতা তামিল নাটকে প্রাধান্য পায়। সমাজ ভাবনাও প্রবল হতে থাকে। প্রাসঙ্গিকভাবে উপন্যাস সমূহও নাট্যরূপে পায়, যেমন **কল্কি**-র (আর কৃষ্ণমূর্তি, ১৮৯৯-১৯৫৪) 'পরথিপন কানাভু' (পরথিপনের স্বপ্ন ১৯৪৮), শিবকামীয়িন শবদম' (শিবকামীর শপথ ১৯৪৮) প্রভৃতি। সপ্তম শতাব্দীর পল্লব যুগের পটভূমিকায় দুটি উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের সামাজিক ভাবনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। দুটি রূপায়িত নাটক বিশেষ খ্যাতি পায়।

এস ডি সুন্দরম (১৯২১ - ১৯৭৭) তামিলনাড়ু সঙ্গীত নাটক সঙ্ঘম-এর সভাপতি ছিলেন। বিশিষ্টতম লেখকও। সমাজ স্বদেশের পটভূমিকায় তিনি লেখেন 'কবিয়িন কানাভু' (কবির স্বপ্ন ১৯৪৬), 'নাম তাই' (১৯৪৭) প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি নাটক। 'ভীর সুদনদিরম' (বীরত্বময় স্বাধীনতা) ১৯৭৩-এর ১ অক্টোবর ইউনিভার্সিটি সেন্টীনারী হলে সগৌরবে অভিনয় হয় যাতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশের বর্বরতা রূপায়িত। নাটকের চরিত্ররা হলেন ভগৎ সিং লালা লাজপত রায় চিদাম্বরম পিল্লাই সুব্রাহমান্য ভারতী প্রমুখ। মুথুরমন অভিনয় করেন ভগৎ সিং-এর ভূমিকায়, সুন্দরম হলেন ভারতী। শিবাজী গণেশনও অভিনয় করেন।

'ভিয়েটনাম ভীড়ু' (ভিয়েতনাম বাড়ি) সুন্দরম-এর বিশিষ্ট জনপ্রিয় নাটক (ও ফিল্ম)। ভিয়েতনামে যেমন সর্বদা যুদ্ধ সংঘর্ষ, প্রেস্টিজ পদ্মনাভ আয়ারের বাড়িতেও তাই— সর্বদাই হৈ-হট্টগোল কলহ-বিদ্বেষ। স্ত্রী, কহলপরায়ণ মা, ঝগড়াটে পুত্রবধূ ও তার মিনমিনে স্বামী, কুপথে যাওয়া ছেলে, কলেজ পড়া অবিবাহিত স্বেচ্ছাচারী মেয়ে ও অন্যান্য চরিত্ররা যেন অসহ্য করে তোলে জীবন ও পরিবেশ। পরিস্থিতি পালটে যায় যখন পদ্মনাভ আয়ার হঠাৎ রিটায়ার করে ও তার হার্ট ট্রাবল দেখা দেয়। তার পুনর্নিয়োগের খবর আসে কিন্তু সে খবর তার অন্তিম পরিণতিকে আটকাতে পারে না। ছয়ের দশকে এই নাটক বিশেষতঃ শিবাজী গণেশনের অভিনয়ের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

৪. সাম্প্রতিক পর্ব : সম্প্রতিকালের তামিল নাটক সামাজিক ভাবনায় তীব্র উদ্দীপ্ত, — কখনো তা আক্রমণে প্রখর কখনো ব্যাঙ্গ তিক্ত। Modern Drema is either aggresively attacking the social evils or making fun of the foils and foibles of society.[৬] অসংখ্য সমস্যা সংকটে জর্জরিত সমাজে এই জাতীয় নাটকই নির্মিত হয়। 'আইরাত্তু তোল্লাইরাত্তু এন পাত্তোনড্রিল সমুখ নাটকক্কলে মিকুদিয়াকা তোনডিয়ুল্লানা সমুদয় প্রচ্ছন্নইকল মিকুদিয়াকাত তোনড্রুম পোলুদুদান ইত্তকাইয়া নাটকক্কলে এলুদাপ্পড়ুম।'[৭] অর্থাৎ উনিশশ একাশিতে অভিনীত অধিকাংশ নাটকই

সামাজিক নাটক। যতদিন সমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা থাকবে ততদিন এরকম নাটক লেখা হবে।

আধুনিক কালে যে সব সমস্যা নিয়ে নাটক লেখা হচ্ছে তারা হল জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা, বেকারী, পণপ্রথা, নারীদের সামাজিক স্থান ও অধিকার, অফিস আদালত প্রভৃতিতে দুর্নীতি, যুবকদের গভীর হতাশা ইত্যাদি। চো রামস্বামী, পূর্ণম বিশ্বনাথন, মেরিনা, অম্বাই, জয়ন্তন প্রমুখ নাট্যকারদের রচনায় এইসব সমস্যা সংকট রূপায়িত হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে, কখনো তা হয় তীব্র ভয়ঙ্কর—যেমন 'মক্কল কলাই মনোরম' গোষ্ঠীর বিপ্লবী নাটক। কোমল স্বামীনাথনের 'তান্নীর তান্নীর' খরাক্লিষ্ট গ্রামীণ মানুষের অসহায় দুর্গতি এবং শাসনযন্ত্রের নির্মম ঔদাসীন্যের যে চিত্র আঁকে তাতে শাসকগোষ্ঠী বিচলিত হয় এবং এর চিত্ররূপকে তারা নিষিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল।

মানবমনের গভীর অতল রহস্যের উন্মোচন আধুনিক তামিল নাটকের বিশিষ্ট ধর্ম। নাট্যকার মানব মনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপকার, মানবমনের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন আঁকাবাঁকা পথে তাঁর চলাফেরা। মনোবিকলনের দুরূহ দুর্বোধ্য অধ্যায়কে নাট্যকার তুলে ধরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আছে নারী পুরুষের জটিল গুঢ়ৈষ সম্পর্ক। ইন্দিরা পার্থসারথি প্রমুখ নাট্যকারদের কথা এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে পড়ে।

অ্যাবসার্ড দর্শনের প্রভাব তামিল নাটকে আছে তবে সেই সব নাটক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদগ্ধ স্রষ্টার সচেতন শিল্পপ্রয়াস মাত্র—শূন্যতার অবক্ষয়ের দর্শন সেখানে সর্বগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে আসেনি। বরং এই সব নাটককে রূপকপ্রতীকধর্মী বলা যায়—রূপকের চাতুর্য প্রতীকের সংকেত এদের সুন্দর করেছে। না মুথুস্বামী এই জাতীয় নাটকের উল্লেখ্য স্রষ্টা।

আধুনিক তামিল নাটকের রীতিতে এসেছে পরিবর্তন। ব্যবহৃত হচ্ছে মুখের ভাষা যাতে নাটকে বাস্তবতা আসছে। উপভাষার প্রয়োগও দেখা যাচ্ছে। কখনো আসছে ফ্যানটাসী, অবশ্য তাও সমাজ বাস্তবতাকে প্রকাশ করে। খুঁটিনাটি মঞ্চ নির্দেশও দিচ্ছেন ইন্দিরা পার্থসারথি, ড গোরা সুন্দরম প্রমুখ। সাম্প্রতিক তামিল নাটক আগের মত অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত হচ্ছে না, কেবল দৃশ্য থাকছে (অবশ্য অনেক)। কখনো কখনো পেশাদারী নাটকেও মাঝখানে একবার মাত্র পর্দা পড়ছে ও নাটক শেষ হচ্ছে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে। তামিল নাটকে এও এক নতুনত্ব।

মাদরাজ তামিল নাটকের দর্শকের দর্শকরা সহজে ভুলবেন না 'খানি কুডিথানম' (আলাদা সংসার) নাটকের অসাত্তু অথিমবার-কে : গোঁড়া হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের বিচিত্র স্ত্রৈণ এই চরিত্রটির রূপকার **পূর্ণম বিশ্বনাথন**। রাজাজীর হিন্দী আন্দোলনের সমর্থক বিশ্বনাথন প্রথমে হিন্দী নাটকে অভিনয় করতেন। হিন্দী প্রেমী মণ্ডলের প্রযোজনায় ডি এল রায়ের নাটকে (হিন্দী) ১৫ বছরের বিশ্বনাথন অভিনয় করেন। তিনি প্রথমে দিল্লীতে রেডিওতে কাজ করতেন, এখানে নাটক করা ছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় থিয়েটার নিয়েও প্রচুর কাজ করেন দিল্লী থাকাকালে। ১৯৬৪ সালে মাদরাজে আসেন—তখন তিনি খ্যাতিমান নাট্যপরিচালক, চরিত্রাভিনেতা এবং নাট্যকার।

নাট্যকার সাবি-র 'ওয়াশিংটনিল থিরুমানম' (ওয়াশিংটনের বিবাহ) নাটকের প্রযোজনায় তিনি সাফল্য অর্জন করেন। তারপর 'ভিসিরি ভালাই' নাটকেও তিনি সফল। অতপর 'ইরাভু মনি পথথু' (রাত দশটা) ও 'সেক্রেট এজেন্ট ৭৭৭'; পূর্ণম বলেন যে

শেষের নাটকে অন্যমনস্ক প্রফেসরের চরিত্রাভিনয় তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পূর্ণম এরপর রমেশ মেহতার 'আণ্ডার সেক্রেটারী'র অনুবাদ ও অভিনয় করেন। তিনি বেশ কিছু একাঙ্ক লিখেছেন ও অভিনয় করেছেন। তিনি পাঁচটি নাটক এক সন্ধ্যায় অভিনয় করেন— 'মারাটম' (বাদল)। এগুলো তাঁরই লেখা। তামিল থিয়েটারে এরকম কাজ আগে হয়নি। পরবর্তীকালেও তিনি এরকম প্রয়াসে সফল হন।

তারপর নাটক হল যাকে বলা যায় **পূর্ণম-মারিনা** ট্রিলজি। 'থানি কুডিথানম' (বিয়ের পর আলাদা সংসার), 'উর বামবু (আড্ডা, গাল গল্প), 'কালকাটটু' (বেঁধে রাখা)—নাটক তিনটি মধ্যবিত্ত নীতিবোধের ওপর ভিত্তি করে লেখা। মারিনার নাটকের গভীর অনুরাগী তিনি। অতঃপর সুজাথার সঙ্গে পূর্ণমের যোগযোগ হয় ও সুজাথার নাটকের সুন্দর মঞ্চায়ন ঘটান। তাঁদের জুটি নাট্যকার-পরিচালক সম্পর্কের সুন্দর নিদর্শন। পূর্ণম মনে করেন সব নাটকই এক্সপেরিমেন্টাল। কিন্তু দর্শকের কাছে পৌঁছলে তবেই সেই এক্সপেরিমেন্ট সার্থক। তাঁর নাটক সম্বন্ধে সমালোচকের মতামত স্মরণ করা যায়—

The play of Purnam do not admit of categorisation. Take a down to earth urban middle class family situation, add to it the essence of interesting conflict, introduce a steady undercurrent of humour and a sprinkling of pathos, tone it up with telling detail, make it colourful with faint traces of satire or irony, and finally integrate the ingredients with the help of experience and you have the ready intellectual cocktail that is now quite familiar as the 'Poornam Play !'[৮]

ইরা পলানিস্বামী পৌরাণিক নাটকরচনায় দক্ষ। প্রখ্যাত শিল্পী মনোহর তাঁর নাটকের মঞ্চরূপকার ও প্রধান অভিনেতা — প্রকৃতপক্ষে মনোহরের অসাধারণ অভিনয়ের জন্যই পলানিস্বামীর নাটকের খ্যাতি। তাঁর অসংখ্য নাটকের মধ্যে স্মরণীয় 'সুরপদ্মম', 'শুক্রাচারিয়ার', 'শিবথাণ্ডবম' প্রভৃতি। 'শুক্রাচারিয়ার' নাটকে শুক্রাচার্যের প্রথম বয়সের তেজ প্রতাপ, দেবতাদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও জয়ের কথা অতি সুন্দর রূপ পেয়েছে। 'শিবথাণ্ডবম' এক ঐশ্বর্যমণ্ডিত কল্পনা সমুজ্জ্বল পৌরাণিক নাটক। এতে নাট্যকার বিভিন্ন পুরাণ কথা অবলম্বনে এক একটি সুসম্পূর্ণ নাট্যকাহিনী নির্মান করেছেন, যেমন— দক্ষযজ্ঞম, কুমারসম্ভবম, কিরাতার্জুনীয়ম প্রভৃতি এবং করাইক্কল আম্মাইয়ার পুরাণম আনন্দরামায়ণম প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে কাহিনী ঘটনা নিয়েছেন ও তাদের সুগ্রথিত করেছেন। মনোহরের নির্দেশনা ও অভিনয়ে সমৃদ্ধ এরকম বিশাল অসাধারণ প্রযোজনা কম দেখা যায়।

কোমল স্বামীনাথন (১৯৩৫-১৯৯৫) আধুনিক কালের এক অত্যন্ত শক্তিশালী নাট্যকার এবং পরিচালক ও অভিনেতা। তিনি পরিবার ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের অসংগতি বৈষম্য সংঘাতকে রূপ দিয়েছেন তাঁর নাটকে। ব্যক্তি মানসের বেদনাযন্ত্রণা হৃদয়ের আর্তনাদও তার লেখায় ধরা পড়েছে। প্রথম দিকে স্বামীনাথন ছিলেন অনেকটা কমার্শিয়াল রীতি বৈশিষ্ট্যের অনুসারী। পরে পরীক্ষামূলক নাটক লিখতে সুরু করেন, তাঁর জীবনদর্শনও পালটায় অনেকটা। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের নির্মম চিত্র তিনি যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন সাম্প্রতিক নাটকে—সামাজিক অর্থনৈতিক সঙ্কট, উঁচুতলার মানুষের অত্যাচার পীড়ন, শোষিত নিপীড়িত ও ব্রাত্য অন্ত্যজ জাতির অসহায় বেদনা আর্তি যথাযথ ফুটেছে তাঁর নাটকে। তিনি শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেন দৃঢ়ভাবে এবং তদনুযায়ী তাঁর শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন নিশ্চিত প্রত্যয়ে।

ত্রিশটিরও বেশী নাটক লিখেছেন কোমল স্বামীনাথন। 'পুদিয়া পাদাই' (নতুন পথ

১৯১৬) নাটক দিয়ে তাঁর অভিযান সুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে সে জয়যাত্রা অব্যাহত। তাঁর নিজস্ব সংস্থা, স্টেজ ফ্রেন্ডসের জন্য ১৯৭১-এ লেখেন 'যুদ্ধ কান্ডম' (১৯৭৫) যে নাটকে বাইরের যুদ্ধ নয়, নরনারীর পারস্পরিক সম্বন্ধ চিত্রিত—তাদের তেজ ব্যক্তিত্ব দম্ভ, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত সংঘর্ষ হয় ও শেষ পর্যন্ত সুখান্ত পরিণাম ঘটে। 'দিল্লী মামিয়ার' (দিল্লীর শাশুড়ি ১৯৭৫) পারিবারিক সামাজিক নাটক। দুই উৎকেন্দ্রিক নারী, দুই স্বামী, জাঁদবেল শাশুড়ি—এরাই নাটকে বিচিত্র খেলা জমিয়েছে। 'সুলতান একাদশী' (১৯৭৮) মধুর রসাত্মক নাটক। আদিশেষণ এক নারীর (মহেশ্বরী) ভালবাসা পেয়েও বিয়ে করে অন্যজনকে। অনেক পরিবর্তন ঘটে যায় ক্রমশঃ, আদিশেষণের স্ত্রী মারা যায়, মহেশ্বরী জীবনেব অভিশাপকে মেনে নেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্মানেব সঙ্গেই বৃত হয় আদিশেষণেব জীবনে। এটা সুন্দব কমেডি নাটক।

'চেক্কু মাড়ুগল' (কলুর বদল ১৯৮০) নাটকে স্বামীনাথন দেখিয়েছেন কীভাবে ভূমিচাষীরা বদমায়েশ নিষ্ঠুর মালিকদের দ্বারা বিভিন্নভাবে শোষিত হয়। পুরুষানুক্রমে তাদের ওপর পীড়ন চলছে ও ভালভাবে বেঁচে থাকার সামান্য দাবিকেও নির্মমভাবে দমন করা হচ্ছে। স্টেজ ফ্রেন্ডস-এর এই নাটকের প্রযোজনা উন্মাদনা সৃষ্টি করে।

'স্বর্গভূমি' অনেকটা নকশালবাড়ির আদর্শ নিয়ে লেখা যদিও তাকে লেখক সমর্থন করতে পারেন নি। বিপ্লবীরা হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। তারা স্থির করে একটা ব্রিজ ওড়াবে যেখান দিয়ে অত্যাচারী জমিদার যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্কুল ছাত্রদের নিয়ে একটা বাস তখন যাচ্ছিল, ব্রিজ ভেঙে তারা মারা যায়। আঘাতকারী বিপ্লবীরা বিমূঢ় হয়, তারা ভেঙে পড়ে। নেতারা বলে যে বড স্বার্থে এসব হয়। পুলিশ এসে নেতাদের হত্যা করে। এটা বিপ্লব বিরোধী নাটক নয, হত্যা বিরোধী নাটক। নাটকটির প্রযোজনায় ব্রিজ, গাড়ি যাওয়া, গাড়ি ভাঙা ইত্যাদি নতুনত্ব ছিল।

'তান্নীর তান্নীর' (জল জল ১৯৮০) খরা পীড়িত তামিলনাড়ুর একটি গ্রামেব অসহায় দুর্দশার চিত্র। পাঁচ বছরের খরাপীড়িত গ্রামে এক পলাতক খুনী ভেলিয়াস্বামী আসে ও জলের দুরবস্থা দেখে সে সমবেত চেষ্টায় দূর অঞ্চল থেকে জল আনার বন্দোবস্ত করে; কিন্তু তাকে আশ্রয় দিতে হবে। তার অপরাধ বিবেচনা করে গ্রামবাসীরা তাকে রক্ষার শপথ নেয়। ইতিমধ্যে গায়ের একটি মেয়ের সঙ্গে পুলিশের বিযে হয়। এক নেতা ভোটে জেতার জন্য এদের জাতপাতের খোঁচা দেয়। কিন্তু এরা ভোট বর্জন করে। যুদ্ধ ক্রুদ্ধ নেতা জল আনা আয়োজন নষ্ট করে দেয়। গ্রামবাসীরা দূরের জল-উৎস থেকে খাল খুড়ে জল আনার চেষ্টা করে। এর মধ্যে পুলিশ খুনীকে চিনতে পেরে ধরবে কিন্তু খাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্রামবাসীরা তাকে বিরত হতে বলে। যখন জল প্রায় আসছে এক PWD ইঞ্জিনিয়ার (যে সরকারী লালফিতের প্রতীক, যার কাছে জল বড় নয়, বড় হল আইন) বে-আইনী খাল খোড়ার জন্য পুলিশী শাসন ও ভয় দেখায়। ঘটনা চূড়ান্ত নয়। সেই আশ্রয় পাওয়া ব্যক্তি পালায় ও জঙ্গলে তৃষ্ণায় মারা যায়। জলের আনার চেষ্টা নষ্ট হয়। আবার সেই খরা হাহাকার। গ্রামবাসী অনেক শহরে যায় ভিক্ষার জন্য। যারা আছে তারা শুষ্ক নির্মম আকাশের দিকে তাকিয়ে। 'তান্নীর তান্নীর' নাটক হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। এর চিত্ররূপও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পায়। রাজরোষ এর ওপর পড়লেও 'তান্নীর তান্নীর' আজও অনন্য।

'ওরু ইনদিয়া কানাভু' (এই ভারতের স্বপ্ন ১৯৮২) জাতিভেদ ক্লিষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য-এ পর্যুদস্ত এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নীচুতলার মানুষ এবং সৎ বিবেকবান মানুষ কি নিদারুনভাবে নির্যাতিত নিষেপষিত হয় নাটকে তা তুলে ধরা হয়েছে।

'নাল্লিরাভিল পেট্রোম' (মাঝ রাতে পাওয়া স্বাধীনতা) নাটকেও গ্রাম ভারতবর্ষের অসহায় মানুষের জীবনচিত্র পাওয়া যায়। কুড়ি বছরের আপ্রাণ চেষ্টায় অনাবাদী জমিতে ফসল ফলায় পুঙ্গবন। এর সঙ্গে আছে তার মেয়ের বিয়ে। কিন্তু আনন্দ কতক্ষণ। গরিব অসহায় পুঙ্গবন শোনে যে ঐ জমি পুরোনো দলিল অনুযায়ী গ্রামের মন্দিরের। সে প্রতিকারের আশায় ছটফট করে, সব জায়গায় যায় ও নিরাশ হয়। গ্রামের এম এল এ ভৈরবন তাকে আশ্বাস দেয়। কিন্তু আদর্শবাদী যুবক সোমন জানায় ভৈরবের স্বরূপ যে বেনামে ঐ জমি কিনবে বলে এত কাণ্ড করছে। আদর্শবাদের পরিণামে সোমনকে মরতে হয়। কিন্তু ভৈরবন শাস্তি পায় না। কারণ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এলে মুখ্যমন্ত্রী ভৈরবনকে নিজের দলে নেয় ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়। রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের নির্মম চিত্র নাটকে ফুটেছে। সেবা স্টেজের এই নাটকও বিপুল অভিনন্দন পায় যাতে পরিচালক ও অন্যতম অভিনেতা হলেন কোমল স্বামীনাথন। পৌরাণিক বাস্তব ও ব্রেখটীয় রীতির প্রয়োগ নাটকে আছে।

কোমল স্বামীনাথন আমৃত্যু অক্লান্ত। ফিল্ম সিনরিও রচনা ও পরিচালনা, নাটক রচনা, পরিচালনা, অভিনয় অব্যাহত চলেছিল এবং সর্বত্র সমাজ জীবন ও মানুষের ছবি। শেষ দিকের নাটক 'ইরুট্টিলে তেড়াদীংগে' (অন্ধকারে খুঁজো না, ১৯৮৫) পার্থিব ও ব্যক্তিগত সুখ সম্পদের খোঁজে যে মানুষ সামাজিক নীতি নিয়ম মানবিকতাবোধকে বিসর্জন দিতে চায় তাদের চিত্র আঁকা হয়েছে। এখানেও স্বামীনাথন উজ্জ্বল উদ্ভাসিত।

চো রামস্বামী (১৯৩৪) অন্ততঃ ত্রিশটি নাটকের রচয়িতা, মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা, প্রতিষ্ঠিত আইনবিদ্ এবং তামিল ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত রাজনৈতিক পত্রিকা (মাসিক) 'তুঘলক'এর সম্পাদক। তিনি তামিল মঞ্চের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। গোঁড়া ব্রাহ্মণ তামিল পরিবারের সন্তান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবী চো বন্ধনমুক্ত প্রবল মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন এবং হয়ে উঠেছেন এক বিতর্কিত (কিছুটা কমিকাল) চরিত্র। তীব্র ব্যঙ্গ শাণিত বিদ্রূপ চো-র নাটকের বৈশিষ্ট্য, সমাজের অন্যায় অসত্য ভণ্ডামী অধার্মিকতাকে তীব্র আঘাত করেছেন ব্যঙ্গের মাধ্যমে। পলিটিক্যাল স্যাটায়ারে তাঁর সমকক্ষ কম আছে। তাঁর রাজনীতি কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীচেতনায় আবদ্ধ নয়। তিনি বলেছেন—I cannot say I am a communist, I cannot say I am a socialist or that I subscribe to any of their ideals. My primary objective is to express the evils of any ruling Government.[৯]

চো রামস্বামীর প্রথম দিকের নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'মোহম্মদ বিন তুঘলক'। ১৯৬৮ সালে লিখিত এই নাটকে ঐতিহাসিক উদ্ভট চরিত্র তুঘলকের মধ্য দিয়ে যেন ইন্দিরা গান্ধীকেই চিত্রিত করেছেন ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের দ্বারা। এই নাটকে যা বলা হয়েছে জরুরী অবস্থার প্রয়োগের মধ্যে তাই প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তুঘলকের মুখের কথায় যেন স্বৈরাচারী শাসকের বক্তব্য শোনা গেছে।

'কুয়ো ভাডিস' নাটকে পারিবারিক তথা সামাজিক সঙ্কটের ছবি। এক সন্দেহপ্রবণ স্বামী স্ত্রীর প্রতি অবিচার করে প্রবলভাবে। পরে ভুল বুঝে সেই স্বামী স্ত্রীকে ফিরে চায় কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়।

'সম্ভবামি যুগে যুগে' নাটকে সামাজিক ব্যঙ্গ তীব্র। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণর আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু যদি আধুনিককালের কৃষ্ণর আগমন হয় কি হবে? প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তরুণ কৃষ্ণের পালক পিতা রাজরত্নম একজন কনট্রাকটর। কৃষ্ণ রাজরত্নমকে দুর্নীতির পথ থেকে সরিয়ে আনতে চায়, সমাজকে করতে

চায় সুন্দর। একদিন রাইফেল পরিষ্কাররত কৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনার উত্তেজিত মুহূর্তে হঠাৎ আলো নিভে গেলে দেখা যায় রাইফেলের গুলিতে রাজরত্নমের সেক্রেটারী পীতাম্বরম মারা গেছে। কৃষ্ণকে গ্রেফতার করা হয় (যদি সে হত্যা করেনি, সব চক্রান্ত রাজরত্নমের)। বিচারে কৃষ্ণ দোষী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু বিচারক বলে যে কৃষ্ণ উন্মাদ ও তাকে উন্মাদাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

'এনডু তানিয়ুম ইনদা সুদনদরা দাকম' (কবে আমার স্বতন্ত্রতার পিপাসা মিটবে ১৯৭১) নাটক স্বাধীনতা ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদ্ ও নিম্নমানের পাবলিক লাইফ নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ। স্বর্গে সোসালিস্টিক ডেমোক্রেসী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলেছে, কিন্তু তা কি হবে! মর্ত থেকে নাল্লাথাম্বি নামক ব্যাক্তি এখানে এসেছে কিন্তু সে আছে যমলোক বা নরকে কারণ মর্তে মন্ত্রী থাকাকালে সে অনেক অন্যায় করেছে। নাল্লাথম্বি স্বর্গের নতুন গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দেবে। তার ভয়াবহ রাজনৈতিক কার্যাবলীতে ইন্দ্র যম কুবের নারদ প্রভৃতিও ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠে। দেব লোকের এখন নাম হয়েছে 'নাল্লাথাম্বিনাডু', স্বর্গ হয় মর্তের মত। শেষ দিকে আসেন নেহরু ও কবি ভারতী—তাঁদের রচনা পঠিত হয়। গান্ধীজীর হাস্যকরভাবে অনশন করেন। নাটকে ভারতবর্ষের রাজনীতি ও নেতাদের চরিত্র যথাযথ ফুটেছে এবং এই প্রশ্ন পাঠক মনে জাগে—দেবতারা যদি একজন নাল্লাথাম্বির হাতে এরকম পুতুল হয় তাহলে হাজার নাল্লাথাম্বির কাছে ভারতবর্ষের কি অবস্থা?

'ইয়ারুক্কুম ভেটকামিল্লাই' (কারুর লজ্জা নেই ১৯৭৩) চো-র ষোড়শ নাটক। এখানে নাট্যকার এক ভয়ঙ্কর সামাজিক ছবি এঁকেছেন, দেখিয়েছেন কিভাবে এই সমাজে পুরুষের অন্যায় কাজের জন্য নারীরা পতিতা হয়ে যায়। নাটকে প্রমীলা পতিতা হয়ে যায়, তরুণ উকিল বেনু, সহৃদয় রাউত্তর তাকে বাঁচাতে চায় কিন্তু আইন তাকে শাস্তি দেয়। প্রমীলা আত্মহত্যা করে। রাউত্তর বলে একটি মেয়ে নিজে থেকে পতিতা হতে পারে না যদি না পুরুষরা তাকে ওপথে ঠেলে দেয়। সমাজই সৃষ্টি করে পতিতাকে, পরে তাকে শাস্তি দেয়।

'ঈশ্বর কি মৃত' নাটকে একজন নাস্তিকের সঙ্গে একজন পুরোহিতের সংঘাত। শেষ পর্যন্ত পুরোহিতের মন অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সমালোচকের মতে এটা নীরস অনাটকীয় মনে হলেও চো ও অনেক পাঠকের মতে এটা নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ রচনার অর্ন্তগত।

'চো-র বিচার' নামে এক বিচিত্রনাটক লেখা হয় যেখানে চো-কে যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে এবং বিভিন্ন দর্শকের প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন। তাঁর আদর্শ ও দর্শন প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে চো বলেছেন যে যা তিনি সঠিক বুঝেছেন তাই লিখেছেন এবং সমাজের ভাবনাই তিনি নাটকে রূপায়িত করেছেন। তার অনেক ঘটনার ভিত্তিই সত্য ঘটনা ও এতে সামাজিক বক্তব্য আছে।

'নেরমাই উরঙ্গুম নেরম' (যখন সততা ঘুমোয়) শেষ দিকের নাটক। কুড়ি বছর পর কাহিনীর ঘটনা। স্থান মাদরাজ। তামিলনাডুর মুখ্যমন্ত্রী মারা গেছে, সামনে ভোট। শাসক গোষ্ঠীর নেতারা মৃত মুখ্যমন্ত্রীর মত দেখতে এক গ্রাম্য লোককে মুখ্যমন্ত্রীর জায়গায় বসায় ও ভোটে জেতে। চলে দুর্নীতি অপশাসন। কিন্তু জাল মুখ্যমন্ত্রীর বিবেক জাগ্রত হয় ও সে আসে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে পরামর্শর জন্য, কিন্তু সেও কিছু বলল না বা করল না। আবার চলে গতানুগতিক রাজনৈতিক সামাজিক দুর্নীতি অপশাসন।

'কাদল ইল্লাইয়েল সাদল' (প্রেম অথবা মৃত্যু ১৯৮১) ড্রইংরুম কমেডি যা ভালবাসার তথাকথিত 'সর্বনাশা' দিককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নাগরাজন তার প্রেয়সী মালতীকে পেতে চায় বন্ধু সুরেশের সাহায্যে এর ফলে কৌতুককর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। নাটকে সমসাময়িক প্রসঙ্গও এসেছে। আধুনিক কবিতার প্রতি ব্যঙ্গ এতে প্রবল যখন বলা হয়

আধুনিক কবিতা যত কম বোঝা যায় ততই উপাদেয় হয় এবং কবি ও শিল্পীরা জীবদ্দশায় কোন সম্মান বা সাহায্য পান না। মাদুরাইতে ১৯৮১ জানুয়ারির প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত World Tamil Conference প্রভৃতি প্রসঙ্গ এনে নাটককে চলমান করার প্রয়াস চলছে।

চোর শেষ পর্বের নাটক 'জাজমেন্ট রিভার্সড' এক কলেজে ছাত্রর নারী ধর্ষণ বিষয়ক অভিযোগ নিয়ে লেখা—বিভিন্ন ব্যক্তি ও মিডিয়া কি ভাবে এই ঘটনা ও পরিস্থিতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রয়োগ করেছে তাই লেখক বলেছেন। সমাজসেবী সম্পাদক রাজনীতিবিদ কলেজ অধ্যাপক—সকলেই কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ -- সবাই ছাত্রটিকে ফাঁসাতে চায় ও নিজেদের স্বার্থ পূরণ করতে চায়। নাটকেব সংলাপ যথারীতি তীক্ষ্ণ কৌতুকময়। এখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মর্যাদালোভী সমাজসেবী, যে ঘটনাব প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশের কাছে বিবরণ দিচ্ছে–

পুলিশ সুপাব—কখন ব্যাপারটা ঘটেছে?

সমাজসেবী—আজ সন্ধ্যে ছটা নাগাদ।

কনস্টেবল (যে এতক্ষণ ইতস্তত ঘুবছিল)—হায় ভগবান, আমি শপথ করে বলছি তখন আমার ডিউটি ছিল। আমি একপাও বেবোইনি ডিউটি ছেড়ে, প্রমাণ আছে।

পুলিশ সুপার—ঠিক আছে ঠিক আছে। তা তুমি এত উত্তেজিত হচ্চ কেন?

কনস্টেবল (হতাশায়)- কেননা কোন ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেই সবাই পুলিশেব ওপর পড়ে। তা, মেয়েটার পেটে কি বাচ্চা এসে গেছে?

সমাজসেবী—তা কী করে বলব? এখন তো সবে আটটা বাজে।

কনস্টেবল—সিনেমা হলে আমরা এক্ষুনি জানতে পাবতুম।

চোর কটি নাটকে নারীরা প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর 'ইয়ারুক্কুম ভেট্কামিল্লাই' (কারুর লজ্জা নেই) পতিতাদের নিয়ে লেখা। 'সাস্তিরঙ্গল সোলভাদিল্লাই' (শাস্ত্র একথা বলে না) জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লেখা। জাতপাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় চো অভিনয় করেন। নতুন সহস্রাব্দেও চো সক্রিয়। ২০০১-এর মার্চে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হয়। The Hindu পত্রিকায় 4 March 2001 বিজ্ঞাপন দেওযা হয়—March 25th (2001) Sunday, 7 p.m. Our nation's pride journalist Cho's uncomparable masterpiece political satire NERMAI URANGUM NERAM. রাজনৈতিক ব্যঙ্গে যে চো সুদক্ষ এই নাটকে আবার তা প্রমাণিত হল। নাটকটির নামও তাৎপর্যপূর্ণ—নেরমাই উরঙ্গুম নেরম কথার অর্থ সততা ঘুমোবার সময়।

চো রামস্বামী তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিমান, বিদ্রোহী মন তার। কিন্তু স্ববিরোধিতা আছে প্রচুর। তিনি সরকার বিরোধী কিন্তু এস্টাব্লিসমেন্ট বিরোধী নন, তিনি নারীর মুক্তি চান কিন্তু নার্সিং ও শিক্ষকতা ছাড়া অন্যত্র তাদের স্থান দেবেন না, তিনি সমাজকে আঘাত করেন কিন্তু পাল্টাতে পারেন না, তিনি ব্যঙ্গাত্মক কমেডি বা স্যাটায়ার লিখেছেন কিন্তু মহৎ সাহিত্য বুঝি বা অনায়ত্ত রয়ে গেছে। সারা ভারতে খ্যাতিমান সাংবাদিক ও ব্যঙ্গশিল্পী চো নাট্যক্ষেত্রে বোধহয় স্থিতধীতম হতে চানও নি, হয়ে উঠতে পারেননি, যদিও তাঁর ক্ষমতার সীমা নেই।

কে বালচন্দর (১৯২৮) চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান পরিচালক, মঞ্চের সফল নাট্যকারও বটেন। নাটককে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে তিনি জানেন এবং তাঁর বক্তব্যও মানুষের কাছে গৃহীত হয়। তাঁর নাটকের মধ্যে বিখ্যাত হল 'চতুরঙ্গম' 'মেজর চন্দ্রকান্ত' 'নীর কুমিলি' (জল বুদবুদ) 'সর্বর সুন্দরম' প্রভৃতি। 'এধীর নীচল' (স্রোতের বিরুদ্ধে) সমাজ ব্যঙ্গের নাটক। এক দরিদ্র পরান্নজীবি অপরের দয়ায় বেঁচে থাকে। কিন্তু

হঠাৎ সবাই খবর পায় তার ধনসম্পদ আছে অনেক পরিমাণে, তার ওপর আচরণ পালটে যায়, অনুগ্রহপ্রার্থী থেকে হয় অনুগ্রহকারী। কিন্তু আবার জানা যায় তার অর্থ সম্পদ সব মিথ্যা। লোকের আচরণ পালটায়। এবারে চলতে থাকে ঘটনার ধারা যা সমাজের বুকে আঘাত হানে।

এম কে রাধা মঞ্চ সফল নাট্যকার। দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। তিনি সমাজমনস্ক হলেও কৌতুকভাবনা রসরসিকতা অনেক সময় প্রাধান্য পায় নাটকে। বিমূঢ় ও জটিল প্রশ্ন সমাধান করার প্রয়াস তাঁর 'এন কানাভরুডয় মনইভি' (আমার স্বামীর স্ত্রী) নাটকে। স্বামীর সঙ্গে অন্য নারীর কি বিবাহ হয়েছে অথবা পুরাতন জীবনের কোন জটিল উপাখ্যান আছে কিনা—কখনো কৌতুকে কখনো গভীরভাবে এইসব প্রশ্ন ও ভাবনাকে নাটকে রূপ দেওয়া হয়েছে। 'কল্যাণদিল গলাটা' (বিবাহে গন্ডগোল) কৌতুকরসাশ্রিত সামাজিক নাটক। 'হয় প্রতিজ্ঞামত হীরের আংটি অথবা বিয়ে বন্ধ'—খুড়ি এ ব্যাপারে আপোষ করবেন না। তাঁর ভাইপো কল্যানমের সঙ্গে বিয়ে স্থির পঞ্চপকেশনের মেয়ে কল্যাণীর। জটিলতা সুরু হয় প্রতিশ্রুতি হীরের আংটি হারানোয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আংটি রহস্যের সমাধান ঘটে।

বিশু নাট্যকার রূপে খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর 'আন্ডাল অভল আন্ডাল' (আন্ডাল হল আন্ডাল) এক পরিবারের চিত্র এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির মূল্যায়নও বটে। আন্ডাল গুরুত্বপূর্ণ পদের মন্ত্রী। তার ব্যবসায়ী স্বামী প্রতি মুহূর্তের মূল্য পযসায় নিরূপণ করে, ছেলে শ্রমিক নেতা, অসহায় মেয়ে কারুর ভালবাসা পায়নি। এক রাজনীতিবিদ কাকাও সর্বদা কাজে ব্যস্ত। এই জটিল দ্বন্দ্বময় জীবনের অবসান কোথায়? লেখক শেষ পর্যন্ত যেন বলেছেন নারীই পারে জীবনকে সুন্দর করতে। বিশুর 'আভল সুমঙ্গলি তান' (ও সধবাই) সেন্টিমেন্টাল নাটক, এখানেও নারীত্বের আদর্শ চিত্রিত।

কান্নন পৌরাণিক সামাজিক সব ধরনের নাটক লিখেছেন। 'শুভ মুহূর্ত পথিরিকই (শুভ মুহূর্তের আমন্ত্রণ ১৯৮০) নাটকে দেখানো হয়েছে কি ভাবে উচ্চারিত সমাজে জাঁকজমক আতিশয্যের ওপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে হৃদয়ের মূল্য নেই এবং যেখানে মেয়েকে বধূকে পণ্যের মত বেচাকেনা করা হয়। কান্ননের 'তামিলওয়ালা তালাইক্কুটত্তান' (তামিল ভাষার জন্য আত্মত্যাগ ১৯৮০) তামিল ভাষা সাহিত্যের সগৌরব প্রতিষ্ঠা করে।

সুজাথা (এস রঙ্গরাজন ১৯৩৫) পেশায় ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু মানসিকতায় শিল্প সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। তিনি দক্ষ কথাশিল্পী, নাটক রচনাতেও তাঁর যোগ্যতা স্বীকৃত। সুজাথা পূর্ণম বিশ্বনাথনের জন্য নাটক লিখেছেন, তাঁদের সমবেত প্রয়াসে সৃষ্টি হয় যুগ্ম-প্রযোজনা—'ওরু কোলাই ওরু প্রয়াণম' (একটি হত্যা একটি যাত্রা) এবং এভাবে নাট্যকার পরিচালকের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

তিনি অতঃপর লেখেন 'কাডাভুল বন্ধীরূনধর' (ঈশ্বর এসেছেন) যেটা কমপিউটার যুগের প্যারডি বা ব্যঙ্গচিত্র। সাধারণ এক মানব সংসারে দ্বাবিংশ শতাব্দীর মহাকাশ যুগের এক মানুষ এসে পড়ে ও ফলে কি কাণ্ড বাধে তারই চিত্র। হিউমার স্যাটায়ারের সঙ্গে ইমোশান সাসপেন্সের মিশ্রণ।

সুজাথার 'আডিমাইগল' (ভৃত্য ১৯৮০) প্রতীকী রচনা—অত্যাচার পীড়ন ও বশ্যতা আত্মসমর্পণের অভিনব নাট্য চিত্র। সংলাপে তামিলের সঙ্গে ইংরাজীর মিশ্রণ। ছোট নাটক 'ভান্তাভান' (১৯৮০ সে এসেছে) বেকার মানুষদের কথা বলে যারা সৎ মানবিক, কিন্তু জীবিকার জন্য তারা অসৎ পথে যায়।

সুজাথার 'ডঃ নরেন্দ্রনিন বিনোতা ভালাকক্' (ডঃ নবেন্দ্রনের অদ্ভুত কার্যক্রম) একজন ডাক্তারের অদ্ভুত মানসিকতা তথা কার্যর কথা যা প্রকৃতই ভালত্বকে প্রকাশ করে। তাই সে এক মেধাবী বুদ্ধিমান তরুণ অসুস্থ হলে সে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করে কিন্তু সে মারা যায়। আর এক বৃদ্ধ রোগীর সামনে তার নিকট আত্মীয় স্বজন তার সম্পত্তিতে ভাগের কথা বলে, সে সবই শুনতে বুঝতে পারছিল যদিও রোগাচ্ছন্ন ও তার বেদনা অপরিসীম। ডাক্তার ওষুধ প্রয়োগ তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করে। সামাজিক দৃষ্টিতে তা অন্যায় কিন্তু ডাক্তারের উদ্দেশ্য মহৎ।

সুজাথার 'ভারতী ইরুন্ডা ভীড়' (কবি ভাবতীর অন্ধকার বাড়ী) নাটকে এক অসাহায় বৃদ্ধর কথা বলা হয়েছে যে দুই পুত্র ও পুত্রবধূদেব হাতে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়। তার বাড়ি পুরোনো ও জীর্ণ, সেখানে একসময় বিপ্লবী কবি সুব্রহমন্য ভারতী থাকতেন। আজ তাই সরকার প্রচুর টাকা দিয়ে বাড়িটা কিনতে চায়। এখন বৃদ্ধর পুত্র ও পুত্রবধূরা আবার তাকে সমাদর করে। তবে শেষ পর্যন্ত বেদনাতেই কাহিনী শেষ হয়। সুজাথার অন্য নাটকের মত এই নাটকও পূর্ণম বিশ্বনাথনের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার সফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে।

সমাজচিত্র বিভিন্ন প্রকাবে আধুনিক নাটক এসেছে। যেমন **সুকি সুব্রমনিয়ম** রচিত 'পিরতিবাতি আন্নামল' (প্রতিবাদী আন্নাম্মল) কোর্টরুমের নাটক। **আরভি** (আর ভেঙ্কটরমন, ১৯২১) রচিত 'পোলি' (নকল, জাল ১৯৬৭) মাদরাজের এন ব্লকে শহরবাসের ভয়াবহ ও বাস্তব চিত্র। নাটকের কালওপটভূমি হচ্ছে সাতষট্টির গোড়ার দিকে মাদরাজে শহরের এন ব্লকের ও কলোনী। চলতিভাষায় লেখা এই উচ্চমানের নাটকে শহরজীবনের কৃত্রিমতা ভণ্ডামী প্রতারণা উন্মোচিত হয়েছে।

কয়েকটি নাটকের পরিবেশ স্থানিক, ভাষারীতিতে আঞ্চলিকতা আছে। **কা গণপতি পিল্লাই** রচিত 'পোরুলো পোরুল' (সম্পদ হল সম্পদ, ১৯৫২) নাটকের ঘটনা জাফনা ও কলম্বোতে। ইনি আকর্ষণীয় রাজনৈতিক নাটক লিখেছেন 'তাভরান এন্নাম' (ভুল হিসাব ১৯৫২)। নাটক নাগদের পৌরাণিক রাজ্যের ঘটনা, কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ যা তামিল-ইংরাজী ভাষা নিয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। এক প্রধান চরিত্র বলছে—আমরা জনগণকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামাব ও সরকারী শাসনযন্ত্র অচল করে দেবো। ধর্মঘট তুলবে ঢেউয়ের পর ঢেউ ও আমরা রাজ্যপালকে পদাঘাতে সমুদ্রে ফেলে দেবো।'

এ পি নাগরাজনের বিখ্যাত ফিল্ম সিনারিও 'মাক্কালাইপেট্রা মহরসি'তে (পুত্রভাগ্যবতী নারী ১৯৫৭) কোয়াম্বটারের উপভাষা ব্যবহৃত।

মেরিনা (টি. এস. শ্রীধরণ) সমাজ ভাবনার পরিচয় রেখেছেন তাঁর নাটকে। 'সামিয়ারিন মামিয়ার' (স্বামীজীর শাশুড়ি) নাটকে লেখক সারা দেশব্যাপী পণপ্রথাকে জাতীয় সমস্যা বলে চিত্রিত করেছেন। এবং বলেছেন যে বক্তৃতা বা আলোচনায় তা দূর হবে না। স্বামী স্ত্রীর বোঝাপড়া ও পারস্পরিক ভালবাসা তার অবসান ঘটাতে পারে।

'স্কাইল্যাব সম্বন্দী' (স্কাইল্যাব বেয়াই) পারিবারিক সমস্যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অন্নপূর্ণীর বিবাহকে কেন্দ্র করে বিবিধ সংকট উপস্থিত হয়, গোটা পরিবার পড়ে বিপদে। শেষপর্যন্ত সব কিছুর সমাধান হয়। মেরিনার অন্যান্য নাটক হল 'কাল কাট্টু' (বিবাহ বন্ধন), 'এনগাম্মা' (আমাদের মা), 'শান্তি নী এংঘে' (শান্তি তুমি কোথায়), 'আন্না শুরু আপাভি' (বাবা কত নির্দোষ), 'স্বীকরম' (নিজস্বকরণ বা গ্রহণ) ইত্যাদি। মেরিনার নাটকের বিষয় পরিবার, চরিত্ররা প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত, ঘটনা বাস্তব, সংলাপ স্বাভাবিক ও

স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর সঙ্গে প্রখ্যাত অভিনেতা পরিচালক পূর্ণম বিশ্বনাথনের সংযোগ তামিল নাটকের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হয়েছিল।

ইন্দিরা পার্থসারথি (১৯৩০) তামিল নাটকে নতুন প্রাণ এনেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তীক্ষ্নধী মননশীল এই শিল্পী সর্ববিধ আতিশয্য ও ক্লান্তিকর একঘেয়েমি প্রাচীনতার অনুবর্তন থেকে তামিল নাটককে মুক্ত করে তাকে প্রাণবান গতিসম্পন্ন আবেগদীপ্ত ও দ্যুতিময় করে তুলেছেন। আধুনিক তামিল নাটক সম্বন্ধে পার্থসারথির অভিমত ভাল নয়, বিভিন্ন প্রযোজনা তাকে হতাশ করেছে। তিনি বলেছেন—আমি চো, মনোহর এবং অন্যান্য পরিচালক শিল্পীদের নাটক দেখেছি, এবং তামিল নাটক বা প্রযোজনার ওপর আমার কোন আস্থা নেই।[১০] সমসাময়িক তামিল নাটক সম্বন্ধে তার মতামত তীব্র —The contemporary Tamil stage is dominated by cheap entertainers, pseudo-reformers, moral-mongering maniacs and dubious satirists. Theme is only one kind of audience in Tamilnadu. The situation can be called mono-aesthetic [১১]

ইন্দিরা পার্থসারথির নাটকের মূলে আছে মনস্তত্ত্ব। তিনি চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। মানবমনের জটিল গভীর বিসর্পিত ভাবনা যা তার ব্যক্তিক অস্তিত্বকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে তার নাটকে ফুটে উঠেছে। নাট্যকার বলেছেন—I belive in psychology. If you could have seem my play Rains, you would have known that I write only psychological plays. Here I understand Aurangzeb only in that context.[১১(ক)] নাট্যকার সমাজমনস্কও বটেন। সমাজ-অর্থনীতির সংকট তিনি উপলব্ধি করেছেন যা চরিত্রের ভাবপরিমণ্ডল নির্মাণে সহায়ক হয়। যেমন 'পোরভাই পোরথিয়া উদলগল' নাটকে বাসন্তী চরিত্র যে অভিজাত সমাজে দেহের ব্যবসা করে যা সে করতে না চাইলেও করতে বাধ্য হয়, কারণ সামাজিক অর্থনৈতিক সংকটই তাকে ঠেলে দিয়েছে এই পথে।

ইন্দিরা পার্থসারথির 'মালাই' (বৃষ্টি ১৯৭০) তামিল ভাষার চিরাচরিত প্রথাবদ্ধ নাট্যরীতি থেকে স্পর্ধিত ও দুঃসাহসিক ব্যতিক্রম। তিন অঙ্কের নাটক 'মালাই' অবদমিত বাসনা ঘৃণা ও ব্যর্থতার নাটক। ত্রিশ বছরের নির্মলা তার বৃদ্ধ পিতা অধ্যাপক চন্দ্রশেখরের সঙ্গে থাকে তানজাভুরের কাছে ছোট এক গ্রামে। প্রায় দশ বছর আগে তার ভাই রঘু বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে ঝগড়া করে। অসুস্থ চন্দ্রশেখরকে দেখতে ডাক্তার এসেছে চল্লিশ বছরের যে মানুষ স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। ডাক্তারকে চমকে দিয়ে নির্মলা বলে—'আমার একটা পুরুষ চাই—..... সেটা আপনিও হতে পারেন।' সে আরো বলে—'আচ্ছা ডাক্তার, সব ভাল মানুষই কি নির্বীর্য?' বাইরে প্রবল বৃষ্টি। সহসা ঘরের আলো নিভে যায়। নির্মলা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে যখন বাতি নিয়ে এল ডাক্তার দেখল যে রোগী মৃত।

২য় অঙ্কে রঘু বাড়ি ফিরেছে। বাবার মৃত্যুতে সে ব্যথিত নয়, নির্মলাও যেন খুশী। নির্মলা সব কিছু ঘেন্না করে—বাড়ি গ্রাম গোটা পরিবেশ। সে একা নিঃসঙ্গ। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। নির্মলা চায় মুক্তি স্বাধীনতা চায়। যেহেতু, তার বাবা মৃত, নির্মলাও যেন মৃত। সহসা সে অদ্ভুত কথা বলে—'ভালবাসা ও ঘৃণা প্রকৃতপক্ষে একই চেতনা থেকে আসে। যাকে ভালবাস তাকে হত্যা কর।' রঘু দেখে যে নির্মলা একটা বই পড়ছে হত্যার নৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে। নির্মলা বলে যে সে ডাক্তারকে চায় প্রবলভাবে যেটা যৌনবোধের ব্যাপার নয়, ব্যাপার হল যে ডাক্তার স্বাভাবিক মানুষ। সে রঘুকে পাঠায় ডাক্তারকে ডেকে আনতে। বাইরের প্রবল বর্ষণ তাকে অসহ্য করে।

৩য় অঙ্কে রঘু ফেরে। ডাক্তার আসেনি। গ্রামের অবস্থা ভয়াবহ, গরিবদের ঘরবাড়ি ডুবে গেছে। কুড়ি দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ডাক্তার এল। নির্মলা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। রঘু

ডাক্তারকে নির্মলার অদ্ভুত ধারণার কথা বলে—নির্মলাই তার বাবাকে হত্যা করেছে, বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে এই হত্যা জড়িত। হঠাৎ বৃষ্টি থামে। নির্মলা জেগে ওঠে ও স্পষ্টই বলে 'আমিই বাবাকে খুন করেছি।' নির্মলার কথায় ডাক্তার তার সঙ্গে চলে যেতে রাজী হয়। সে বাইরে যায় কাজ শেষ করতে, কিন্তু ফিরে এসে জানায় যে গ্রামে কলেরা লেগেছে কাজেই সে যেতে পারছে না। নির্মলা ক্রোধে জ্বলে ওঠে—'আমি জানতুম তুমি আমার সঙ্গে আসবে না। তুমি ভীরু, সব ভাললোকই নির্বীর্য।......আমি বাবাকে মেরেছি তাই তুমি ভয় পেয়েছো, ক্রশটাকে আকড়ে ধরেছো ..... তুমি একটা মেয়েকে কলেরার থেকেও ভয় কর'। নির্মলা তার বাবাকে মেরেছে একথা ডাক্তার বিশ্বাস করে না। নির্মলা তীব্র স্বরে বলে—'আমিই মেরেছি আমিই মেরেছি।' ডাক্তার চলে যায়, নির্মলার চোখে জল ধারা। কিছু পরে জানলা খুলে সে বাইরে দেখে বৃষ্টি পড়ছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ..... থামবে না থামবে না। তামিল নাটকে ফ্রয়েড কাফকা ইয়োনেস্কো এরূপে এল যথাযথভাবে। একটা মর্বিড বিষণ্ণতায় নাটক ঘেরা। নির্মলার চরিত্র জটিল সিনিক্যাল, অন্যদিকে ডাক্তার অনেক স্বাভাবিক মহৎ। নাটকে অদ্ভুত সাসপেন্স আছে, নির্মলার বাবাকে মারল কে? দর্শকরাই এর বিচার করবে। বৃষ্টির উদ্দেশ্য নিপুণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে নাটকের মধ্যে। তামিল নাট্যধারায় 'মালাই' এক বিস্ময়কর নতুন মূর্তিতে আবির্ভূত।

পরবর্তী নাটক 'পোরভাই পোরথিয়া উদলগল' (চাদর ঢাকা শরীর) নাটকে নাট্যকার প্রচলিত মূল্যবোধ নীতিনিয়মকে তীব্র আঘাত করেছেন। বাসন্তী দেহপণ্যের ব্যবসা করে, উচ্চ অভিজাত সমাজে তার স্থিতি, উঁচুতলার মানুষ তার কাছে নিত্য আনাগোনা করে। কিন্তু বাসন্তী অপরের অধীন, অন্য বৃহৎ মানুষ তাকে চালনা করে, বাসন্তী দেহের বিনিময়ে আনে সংবাদ অথবা অন্য কিছু। এই সমাজে পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে এই পরিণামের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু স্থির বিবেকবর্জিত প্রখরবুদ্ধি বাস্তবসচেতন বাসন্তী মেনে নেয় এই অবস্থানকে এবং তার তীব্রতীক্ষ্ণ বিদ্রূপমণ্ডিত হাসি সমাজকে তীব্র আঘাত হানে। নাট্যকার ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক চিরাচরিত নীতি নিয়মকে যেন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন একটা মক হিরোয়িক (mock herioc) ঢঙে এবং প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন জীবনের মূল্যহীনতা, বেঁচে থাকার নিরর্থকতা।

ইন্দিরা পার্থসারথির তৃতীয় নাটক 'টাইম মেশিন' নিয়ে। সময় সম্পর্কিত এক দার্শনিক বোধ লেখেকের মনে বিদ্যমান ছিল অনেকদিন ধরে। জ্যোতির্বিজ্ঞান-এর নিয়ম অনুযায়ী একটা মানুষ দিনে চব্বিশ ঘণ্টা কাটায়। কিন্তু তার যথাযথ অস্তিত্ব অন্যবিধও হতে পারে। যেমন বেটোফেন তাঁর মহত্তম সৃষ্টি করেছেন এক ঘণ্টায়। তিনি সারা জীবন অসংখ্য মুহূর্ত কাটিয়েছেন কিন্তু সারাজীবনের সাধনা এক ঘণ্টায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে ও পূর্ণতা পেয়েছে। যে মুহূর্তের সৃষ্টি বেটোফেনকে অমর করেছে, তাঁর সুরকে চিরকালের করে তুলেছে, তাঁর প্রকৃত জীবন বা অস্তিত্ব সেই মুহূর্তের। এই নাটকে সেই সময় চেতনা প্রকাশিত। নাটকে তিনটি চরিত্র। বাবা ব্যবসায়ী—যে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মিনিটে অর্থোপার্জনে নিয়োগ করে। মেয়ে এক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত—সে দু-এক বছর হয়তা বাঁচবে এবং এই অল্প সময়েই সে সমগ্র জীবনের স্বাদ পেতে চায়। মা বার্ধক্য আসন্ন জেনেও চির-যৌবনা থাকতে চায়—যযাতির মত সে সময়কে পরাজিত করতে চায়। নাটকের আইডিয়া এদের মধ্যে রূপ পেয়েছে।

পরের বিশিষ্ট নাটক 'আওরঙ্গজেব' ইতিহাসের পরিচিত ও বিশিষ্ট কাহিনীর মধ্যে নতুন মাত্রা সংযোজন করতে চেয়েছেন। বৃদ্ধ শাজাহানের অসহায়তা, উদার মহৎ কিন্তু রাজনৈতিক জ্ঞান বর্জিত দারাকে সাহায্য করা ও প্রেরণা দান, ধূর্ত কৌশলী

আওরঙ্গজেবের হাতে ভ্রাতাদের পরাজয় ও আওরঙ্গজেবের মসনদে বসা এবং শেষ দৃশ্যে কালের নিষ্ঠুর পরিনামে বিষণ্ণ অনুতাপ-জর্জরিত বৃদ্ধ আওরঙ্গজেব-এর সুতীব্র বেদনা— এই নাটক। তবে মনস্তত্ত্বই নাটকে প্রধান। যেমন আওরঙ্গজেবের মানসিকতা বিচারে দুটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়—একবার শাজাহান কোন ব্যাপারে আওরঙ্গজেবকে জামিন রাখতে গেলে তার পিতামহ জানায় যে আওরঙ্গজেব নয়, শাজাহানের প্রিয় পুত্র দারা হবে জামিন; এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক মত্ত হাতীর মোকাবিলায় আওরঙ্গজেবেব অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ায় বোঝা যায় শাজাহানের অন্য পুত্রদের প্রতি অনুরাগ আওরঙ্গজেবের প্রতি বিরাগের প্রতিক্রিয়া—এই দুটি ঘটনা আওরঙ্গজেবের মনকে স্বজনবিমুখ কবে তোলে, বিশেষত শাজাহান ও দারার প্রতি তার বিরূপতা প্রবল। কিন্তু এদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভালবাসাও গভীর এবং দুয়ের দ্বন্দ্বে সে জর্জরিত।

কয়েকটি ছোট নাটকও পার্থসারথি লিখেছেন যেমন 'মন্দির' 'পাসি' প্রভৃতি যেখানে সমাজচেতনার সঙ্গে প্রতীক ও এ্যাবসার্ডিটিও পাওয়া যায়। ইন্দিরা পার্থসারথির তীক্ষ্ণ সামাজিক বিশ্লেষণ এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের অবস্থান নির্ণয় ও তাদেব জারণের কথা উচ্চারিত হয়েছে 'নন্দন কথা' নাটক। তামিল ভাবনায় নন্দনার এক লিজেন্ডরী চরিত্র যে সমাজের নিম্নতম স্তরে জন্মগ্রহণ করে যারা ক্রীতদাস এবং দারিদ্রে অবহেলায় অপমানে অত্যন্ত কদর্য জীবন-যাপন করে। নন্দনার এই জীবনকে চায়নি এবং সে উচ্চ জীবন কামনা করেছিল। পুরাণ-কথা বলে যে নন্দনার হল শিবের অবতার এবং যে শেষপর্যন্ত চিদাম্বরম মন্দিরে পবিত্র দেবমূর্তির সঙ্গে মিশে যায়। নাট্যকার নন্দনার-এর শ্রদ্ধাবাচক 'অর' উপসর্গ বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষ নন্দন করেছেন যে হয়ে ওঠে দলিত মানুষদের নেতা। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মানুষরা ব্রাত্যমানুষদের বিদ্রোহ ও সংগ্রামকে আটকাতে তাদের নেতার মধ্যে দেবত্ব আরোপ করে যাতে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। নাটকে লেখক দলিতদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা বিচার করেছেন ও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ইন্দিরা পার্থসারথি শেকসপীয়রের 'কিং লীয়র' তামিলে রূপান্তর করেন 'ইরুথিয়াট্রম' নামে যাকে অসাধারণ রূপায়িত করেন পণ্ডিচেরীর আরঙ্গম গোষ্ঠী, পরিচালক ছিলেন আর রাজু। 'রামানুজর' মধ্যযুগের বৈষ্ণব মাধক রামানুজের জীবন ও আদর্শ নির্ভর উচ্চমানের নাটক। তামিল নাটকে আধুনিকতার সঞ্চার করেছেন ইন্দিরা পার্থসারথি। প্রায় মধ্যযুগীয় ভাবনা থেকে তামিল নাটককে মুক্ত করেছেন তিনি। Parthasarathis dramas are unusual in the Tamil setting, off-beat, cynical, clever, artful and modern.[১২] সমালোচকের এই মন্তব্য যথার্থ। তামিল নাটকে ইন্দিরা পার্থসারথি প্রকৃত অর্থেই আধুনিক — তিনি নতুন ভাবনার মহৎ শিল্পী।

না. মুথুস্বামী (১৯৩৬) ভাবনার নবীনতায়, আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে, রূপ-কল্পনাব অভিনবত্বে তামিল নাটকের আভ গার্দিস্ত রূপে পরিগণিত। অ্যাবসার্ডিটির জটিলতা ও প্রতীক রূপকের দ্যুতি তাঁর নাটকে আছে, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ভাবনার পরিচয়ও ফুটে ওঠে। 'নাবকালিক্কারর' (১৯৭৪, চেয়ারওয়ালা) নাটকে দেখা গেল একটা লোক মঞ্চের এক কোণে চেয়ারে বসে আছে। একদল লোক একধারে মার্বেল খেলছে, আর একদল অন্যদিকে তাস খেলায় মত্ত। একজন লোক মাঝখানে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে ও দু দলকে উৎসাহিত করছে উচ্চৈস্বরে। তার প্ররোচনায় দু দল প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়। চেয়ারওয়ালার প্রবল আপত্তি ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তাকে বিচারব করা হয় এবং সে মার্বেল খেলোয়াড়দের জয়ী করে কারণ 'তাস খেলা আমাদের

ঐতিহ্যবহ নয়, কিন্তু মার্বেল আমাদের দেশের খেলা।' জয়ী পক্ষ শ্লোগান দেয় উল্লাসের, পরাজিত দলও শ্লোগান দেয়—'তাস খেলা আমাদের ঐতিহ্যনিষ্ঠ খেলা, তাস খেলে স্ত্রীকে বাজী রাখা যায়' এবং চেয়ারওয়ালাকে মারতে সুরু করে যে সাহায্যের জন্য চীৎকার করে। নাটকে বর্তমান রাজনীতি ও দলীয় সংকীর্ণতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে কিভাবে সাধারণ মানুষদের এতে আনা হয় ও তাদের বিপর্যস্ত করা হয়।

'কালংকালমাক' (বংশপবম্পরা) নাটকে এক হাসপাতালের পরিবেশে রোগীদের আসা যাওয়া, কর্তৃপক্ষের হাতে তাদের মৃত্যু, পরিচালকদের পারস্পরিক বিদ্বেষের নাটকীয় রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বর্তমানের যুগ কাল অসুস্থ সময়কে আঁকা হয়েছে।

'কট্রিয়াকরন' (সূত্রধার) নাটকে স্যাটায়ারের মধ্য দিয়ে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ও সামাজিক বিবাহ প্রথার উপযোগিতার বিষয় আলোচিত। নাটকটি তামিলের প্রচলিত লোকনাট্যের রূপ থেরুকুটু-র রীতিতে রচিত যেখানে দুজন গানের লোক একজন কাট্রিয়াকারণ ও একজন অভিনেতা আছে। যখন কাট্রিয়াকরণ দলের সঙ্গে আলোচনা করছে দর্শকদের সামনে কি উপস্থাপিত করা হবে তখন একজন অপরিচিত লোক হঠাৎ আসে ও বলে যে সেই কাট্রিয়াকারণ। দল তাকে মেনে নেয়। বোঝা যায় যে সে এক রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি যে ব্যাঙ্ক জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাকে টাকা দেয়। ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে মানবজাতি সুখী হবে যদি প্রত্যেকের সুন্দর মুখ থাকে। একজনকে রবারের সুন্দর মুখোশ করতে বলা হয় যা নবনারীকে বিক্রয় করা হবে, অবশ্য কনট্র্যাসেপটিভের সঙ্গে। ফলজাত বিমূঢ় জটিল পরিস্থিতি দেখানো হয় ও সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর জীবনের জটিল সম্পর্কের কিছু প্রশ্ন থাকে। ১৯৮১ অভিনীত এই নাটকটি পরিচালনা করেন জ্ঞানী।

'উনদিচুলি' নাটকের কাহিনী ভবিষ্যৎকালে যখন বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন গর্ভাধানের পদ্ধতি যাতে নারীরা স্বাভাবিকভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারে অথবা ডিম পাড়তে পারে যা তা দিতে দিতে ফুটে উঠবে। এরকম একটা ডিমের ফোটার সময় নাটক শুরু এবং তারপর বিভিন্ন প্রশ্ন আলোচিত হয় বিবাহ আনুগত্য ব্যভিচার সর্ম্পকিত, পিতা-পুত্র নর-নারী সম্পর্ক নিয়ে। নারীপুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয় মুথুস্বামীর নাটকে এসেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে। ১৯৮১-তে অভিনীত এই নাটকের পরিচালক ছিলেন পুওর থিয়েটারের কে সি মানবেন্দ্রনাথ এবং সুন্দর দৃশ্যায়ন করেন বিখ্যাত অঙ্কন শিল্পী পি কৃষ্ণমূর্তি।

না মুথুস্বামীর 'ইংলন্ড' এর বিষয় গ্রাম-শহরাঞ্চলের অর্থনীতির বিভাজন, আধুনিকতা ও মূল্যবোধ। গান্ধীজীর মত একজন ব্যক্তি এর চরিত্র। নাটকে যৌনতারও প্রবল ভাবনা আছে। সমালোচক এমন নাটককে কোন বিশেষ সৃষ্টিশীল কাজ মনে করতে চান না। অ্যাবসার্ড রীতির অন্যতম প্রবক্তা মুথুস্বামীর এই নাটকেও উদ্ভটতার প্রকাশ আছে।

অম্বাই (সি এস লক্ষ্মী ১৯৪৪) লিটল ম্যাগাজিনের বিশিষ্ট লেখিকা। ছোট গল্প লিখে খ্যাতি পেয়েছেন। নবনাট্য তথা শিল্প আন্দোলনের অগ্রনী পথিক। তাঁর বিশেষ উল্লেখ্য নাটক 'বাইয়াঙ্গল' (ভয়) এক সংস্কার যুক্ত নারীকে নিয়ে লেখা যে এক প্রেমপরায়ণ কিন্তু অক্ষম পুরুষের সঙ্গে থেকেই জীবন কাটাতে চায় ও প্রাক্তন প্রেমিককে বিদূরিত বিতাড়িত করে যে একদা নিজ স্বার্থের জন্য তাকে পরিত্যাগ করেছিল। 'উল্লে ভেলিয়ে' (ভিতর বাহির) কৃষকদের ওপর অত্যাচার নিয়ে লেখা। 'অগ্নি' নারী জীবনে আগুনের ভূমিকা

নির্ণয় : অগ্নি সাক্ষী করে এক মেয়ের বিয়ে হয়, এবং পণের জ্বালায় সে অগ্নিতেই প্রাণ বিসর্জন দেয়।

জয়ন্তন আধুনিক কালের এক পরীক্ষাধর্মী নাট্যকার। তার 'নিনাইক্কাপড়ুম' (এ নিয়ে ভাবতে হবে) বিবিধ সামাজিক দুর্নীতি ও সংকট নিয়ে লেখা। তাঁর বিশিষ্ট নাটক 'মানুষ মানুষ' এন্ডারসনের বিখ্যাত গল্প নিয়ে লেখা যাতে রাজার দামী পোশাক দেখে সবাই প্রশংসা করলেও একটা ছোট ছেলে বলে যে রাজা বস্ত্রহীন নগ্ন। এর মধ্যে সমাজের নীতি সততার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

জ্ঞানী শংকরণ (১৯৫৪) পরীক্ষামূলক নাটকরচনায় ও পরিচালনায় দক্ষ। 'পরীক্ষা' নামক এক্সপেরিমেন্টাল নাট্যসংস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত : তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও (১৯৭৮)। বাদল সরকারের নাটক প্রযোজনায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। জ্ঞানীর প্রথম উল্লেখ্য নাটক 'নবীন কুচুলন কাদাই' (১৯৭৮, আধুনিক কুচুলন বা কৃষ্ণসখা সুদামার কথা)। কুচুলন বা সুদামা আধুনিক মানুষ, কৃষ্ণের কাছে একটা চাকরী চায়, কৃষ্ণ নেমে আসে, সুদামার জন্য চাকরী খোজে, কাটিয়াকরণ বা সূত্রধার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কথা বলে। কৃষ্ণ চারপাশের নীতি নিয়ম দেখে বোঝে কঠিন জগত, সে ফেলে দেয় মুকুট বাঁশি, মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের জন্য লড়াই করবে সে। 'বিধি' এই নাটক অনেকবার করেছে। এর আগে লেখা 'এ এ ন' (য়েয়েন, কেন?) সমকামিতার বিষয় নিয়ে লেখা যা আসে ব্যর্থতা থেকে। এই নাটক 'পরীক্ষা' অভিনয় করে।

'বালুন' (বেলুন ১৯৮১) নাটক বেশ হৈ চৈ ফেলে। নাটককে প্রেরণা দিয়েছে দুটো ঘটনা। প্রথম — ভিয়েতনাম যুদ্ধ সংক্রান্ত খবর এবং বীটনিকদের বিচিত্র প্রতিবাদ যা চার্লস মারোউইজ (Charles Marowitz) এর বিখ্যাত নাটক 'চিকাগো কনস্পিরেসি'তে রূপায়িত হয়েছে। দ্বিতীয়—লেখকের বন্ধু সহযোগী কয়েকজনের বাসভাড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। একটা প্রসেশন হয় যাতে যোগ দেয় ১৯ জন, কিন্তু সঙ্গে পুলিশ ছিল ৩০০ জন। অফিসার বিমূঢ়—অন্য সব কোথায় গেল। অফিসারকে বলা হয় মিছিলে যোগ দিতে তাহলে এদের শক্তি বাড়বে। অগত্যা ৬০ জন ছাড়া অন্য পুলিশ চলে যায়। প্রসেশনটা আরো বিস্ময়কর ও অভিনব—বেলুন নিয়ে মিছিল : বাস ভাড়া বাড়লে বেলুন করে যাওয়া যাবে। এই দুটো ঘটনার ওপর 'বালুন' নাটক লেখা। বেলুন নিয়ে মিছিল চলে, পুলিশ এদের ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে, তাদের কোর্টে আনা হয়। কিন্তু তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে না, বরং মজার মজার জবাব দেয়। তাদের ছ-বছরের জেল হয়। ওরা বলে যে ওরা একদিন জেল থেকে ফিরে আসবে। এই সমাজের মাথারা তাদের সমর্থন করেনি, কিন্তু তাদের (জজ, সরকারী উকিল ইত্যাদি) ছেলেরা চাকরী পাবে না, সমাজের শিকার হবে, তারাই আসবে এদের সঙ্গে, সবাই বলবে এদের কথা—প্রতিবাদের কথা।

প্রবীণ নবীন নাট্যকাররা প্রচলিত অথবা নতুন রীতিতে নাটক লিখে চলেছেন। নাটক লিখছেন গজেন্দ্রকুমার ('পুগাইয়ে ইল্লাদা নেরুপ্পু'—আগুন ছাড়া ধোঁয়া), পূবাই মণি (সবাইঈলে মৌনম'—নিঃশব্দ সভা, 'মৌনম নেরম' — (নিঃশব্দ সময়, ৮৮) রমনী ('মঙ্গলম মানসুপোলে'—মনের মত বিয়ে), ভেঙ্কট ('কুডুম্বম ওরু সিলম্বম', 'বায়ুম্রে উমাইগল' — মুখ থেকেও বোবা), কে এস এন সুন্দর ('নেরুক্কনের'—মুখোমুখী, 'আইরঙ্গকালাত্তু পইয়া —প্রাচীন রীতি বা রেওয়াজ) ইত্যাদি।

ক্রেজি মোহন মজা কৌতুক ও সহজ সমাজ ভাবনায় উল্লেখ্য স্থান নিয়েছেন। তার '৩৬ বীরঙ্গি লেন' বিজ্ঞাপিত হয়েছে situaticanal comedy রূপে যা আজও মঞ্চস্থ

হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে আছেন ক্রেজি বালাজী। তাঁর নাটক সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মতামত দেওয়া গেল।

Hilarious Tamil plays

CRAZY Mohan's troupe of Crazy Creations and V K V Sisions from Chennai presented two hilarious Tamil plays at the Keyes High School which marked the delightful conclusion of the Kalasagaram's 32nd annual festival.

Meesai Anaalum Manaivi written by Crazy Mohan was about Madhuya who had to wriggle himself constantly out of piquant situations of his own creation. He utters one lie after another in order to come out of the difficulties. In the process, he had to contend with three women, his own wife Janaki, his former and long forgotten love, Mythili and a non-existent Kushma Devi. The play proceeds with a racy tempo and the side splitting jokes and gags flow with rapid fire succession. How the tangle is solved in the end provides a couple of hours of non-stop entertainment except for the 10-minute interval.

The second play, Maadhu plus two, which was presented on Sunday had a record crowd watching how Maadhu, obsessed with an over generosity of gifting away other people's money and belongings, involves himself in undertaking the responsibility of finding a groom for a good looking and highly educated but stone deaf young lady. He offers to marry the bride himself, unconscious of the fact that he is already married. How he manages with the two wives in the same house without the one knowing about the other and how the bubble breaks at the end offers a feast of humour. The specialty about the plays is that the scenes change with top speed and the dialogue delivery is natural and word perfect. R Balaji portrays the main role of Maadhu in both the plays while Swaminadhan as Cheenu-Kushma, Geetha Ravishankar as Mythili and Madhumathi as Janaki deserve kudos for their excellent and unfazed portrayal. Kanthan directed the plays written by Crazy Mohan. (I. E. 10.12.99)

৯০-এরপর বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন এস ভি শেখর যিনি নাট্যকার অভিনেতা পরিচালকরূপে বিশিষ্ট। তাকে বলা হয় Comedy King যদিও তাঁর নাটকে কোন গভীরতা বা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনাচিন্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে আছে হাসি, ঠাট্টা, সমকালীন জীবন ও রাজনীতি নিয়ে ব্যঙ্গ। তাঁর নাটক হল 'কাটুলে মালাই' (অরণ্যে বৃষ্টি) , 'এল্লামে তমস' (সব কিছুই মজা), 'অদৃষ্টকারণ' (ভাগ্যবান), 'পেরিয়া থমবি' (বড় ভাই), 'আইরম উধাই ওয়াঙ্গিয় অপূর্ব সিকমনি' (হাজারবার মার খাওয়া মানুষ), 'দাত্তুপিল্লাই' (দত্তক পুত্র) ইত্যাদি। ২০০২ সালেও মঞ্চস্থ হচ্ছে তাঁর "Peculicar superhit comedy' 'মহাভারততিল মঙ্গ্যতা'। শেখরের নাটকে হাসি আছে মজা আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে প্রবল সমাজবোধ। সামাজিক সমস্যা-সংকটকে তিনি আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপিত করেন। তিনি একই দিনে আটটা নাটক মঞ্চস্থ করেছেন যেটা একদিকে অভিনব অন্যদিকে রেকর্ডের অধিকারী। তাঁর দল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছে। দিল্লীতে আমন্ত্রিত শেখরের নাটক সম্বন্ধে The Hindustan Times-এর (11.5.1996) আংশিক সমালোচনা উল্লেখিত হল।

While theatre is his profession, S.V. Shekher has contributed his bit in making the world a better place to live. He has helped in raising funds for various social organisations and needy causes. It was such an occasion that brought him to the capital. The collection from the five plays staged over three days here went towards the Nandalala Samity, an organisation working for bettering the cause of women and children. His show was inaugurated by the Chief Election Commissioner T.N. Seshan who despite his tight schedule, sat through the inaugural play.

The plays staged in Delhi were *Ellamme Tamash* (Everything is Fun) *Athristakaaran* (Lucky Person), *Periya Thambi* (Big Brother), *Aayram Udhai Vangiya Apporva Sigamani* (The Strange Man Who Received Thousand Kicks) and *Thathupillai* (Adopted son). Though all the plays were well received and his style of comedy readily lapped up the highlight of the three day shows was perhaps Aayram... Sigmani and Thathupillai. While the former is about how a jobless youth gets into trouble away from his home and is forced to play the role of a MLA who is his look alike, the latter brings the audience closer to an issue (Jayalalitha's lavish spending on a wedding) that is the focus of debate presently. In his inimitable style, Shekher has brought into play the various games played by different people in power. Centrerd on 'four characters' the p;ay was well appreciated by the audience.

A real treat for Delhi Tamilians at last. In fact it is after 13 years that S.V. Shekher has revisited the national capital. In his own words, "It is not that I don't want to come here, It's just that nobody seems to invite me."

Going by the public response in the three days it does seems like he is going to be back here soon. (R.I.)

৫. বাংলা ও তামিল নাটক : পারস্পরিক সম্পর্ক

(১) সূচনা

শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলার সঙ্গে তামিল সংস্কৃতির এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম-দর্শনও এই সম্পর্ক নির্ণয়ে সহায়ক হয়েছে। শতাব্দীর সূচনাতেই তিরুচ্চিরমপরম পিল্লা প্রমুখের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র এসেছেন তামিলে। এন বিশ্বনাথন প্রভৃতি নাট্যকারদের রচনার সঙ্গে (রাজশেখরণ — ১৯২৭, রানা রঘুপতি সিংহ, শ্রীরামদাস ১৯২০) বাংলার ঐতিহাসিক লেখকদের সমমর্মিতা অনুভব করা যায়। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর দর্শন প্রভাবিত করেছে তামিল মানুষদের, নাটকেও তার প্রতিফলন পড়েছে। তিনের দশকে শুদ্ধানন্দ ভারতী লিখলেন 'পরমহংস লীলাই' নাটক যাতে রামকৃষ্ণ দেবের জীবন ও শিক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

(২) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও তামিল নাটক

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তামিল নাটকের যোগসূত্র পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি নাটক তামিলে অনূদিত হয়েছে। 'নূরজাহান' অনুবাদ হয়েছে দুবার — ১৯৪৪ সালে অনুবাদ করেন পি. কে. বিজয় রাঘবন, এবং ১৯৫১ সালে কে আপ্পাত্তুরাই পিল্লা।

'সীতা' অনুবাদ করেন এস এন শংকরলিঙ্গায়ার। 'মেবার পতন' অনুবাদ করেন দিনকরণ, পগুমপন, কে অরুমগম পিল্লা।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের তামিলে অভিনয় হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য 'সাজাহান' নাটকের অভিনয়। আবাডির এক নাট্যসংস্থা বিজয়ন্ত ক্রিয়েশনস্ এই নাটক অভিনয় করেন ১৯৭৮ এর মার্চে। নাটকটি বাংলা থেকে অনুবাদ করেন শ্রীমতী রোহিনী নারায়ণ, পরিচালনায় ছিলেন এম এ ভেদগিরি। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন আর কুপ্‌পুস্বামী (শাহজাহান), পি স্বামীদাস (দারা), চন্দ্রপ্রকাশ (সুজা), এম এস বিশ্বনাথন (মোরাদ), এম এ ভেদগিরি (আওরঙ্গজেব), এস সুশীলা (জাহানারা) যাঁরা সকলেই বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন অভিনয়ে। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপিত হয় কলাইভনর আরঙ্গম-এ। সমগ্র নাটপ্রদর্শনীটি দর্শকদের ভাল লেখেছিল।

সম্প্রতিকালে ইন্দিরা পার্থসারথি লিখেছেন 'আওরঙ্গজেব'। এই নাটকের ঘটনা বিন্যাস, কাহিনী ইত্যাদি দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' কে স্মরণ করায়। তবে ইন্দিরা পার্থসারথির নাটক মনস্তত্ব প্রধান, চরিত্রের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ঘটনাময় ও দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রধান।

(৩) রবীন্দ্রনাথ ও তামিল নাটক

অ. ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথকে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছেন মাদ্রাজের শিল্পী ও স্রষ্টারা। মহাকবি সুব্রহ্মন্যভারতী বোধ হয় প্রথম তামিল লেখক যিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে গভীর প্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রী আচার্য, ভি ভি এস আয়ার, ভি আর এম চেট্টিয়ার প্রমুখ শ্রদ্ধেয় লেখক শিল্পীরা ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগী। তাঁরা রবীন্দ্র সাহিত্য ও নাটক অনুবাদ করেছেন এবং প্রেরণা নিয়েছেন তার থেকে। বিশিষ্ট লেখক ও রবীন্দ্র ভক্ত এবং রবীন্দ্র নাটকের দক্ষ অনুবাদক টি. এন. কুমারস্বামী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন — "এটা হল রবীন্দ্র যুগ। এই শতাব্দী শেষ হবার আগে রবীন্দ্র ভাবনা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। ...... রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন চিরকাল"।[১৩]

রবীন্দ্রনাথও প্রেরণা ও উপাদান নিয়েছেন দক্ষিণী শিল্প থেকে, বিশেষ করে ঐতিহ্যসম্পন্ন ও সৌন্দর্যময় নৃত্যরীতি থেকে। চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি নৃত্যনাটকের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। প্রতিমা দেবী এ বিষয়ে লিখেছেন —

"প্রাচীন দক্ষিণী নৃত্যের নাট্যকলাকে অঙ্গীভূত করে ভারতের বর্তমান নৃত্যকলায় আমরা কি চেহারা ফোটাতে পারি তারই আভাস চন্ডালিকায় পাওয়া গেছে। চন্ডালিকায় সংগীতই হল এক বিশেষ সৃষ্টি। দক্ষিণী নাচের বিচিত্র তাল ও ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে সুর সেখানে একটি অভিনব প্রহেলিকার রচনা করেছে।"[১৪] চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের মধ্যেও বিভিন্ন তালের সমন্বয় দেখা যায় — মণিপুরী ও হিন্দীর সঙ্গে মাদ্রাজী নাচের তাল মিশে অপরূপ সৌন্দর্য নির্মাণ করেছে। "মাদ্রাজী তেওরা ও দাদরা মণিপুরী খোলের বোলের সঙ্গে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কানে খাঁটি তেওরা ও দাদরার আমেজ লাগায়। .... নৃত্যে কেবল প্রাচীনকে মেনে চললে নাটকের যোগ্য বৈচিত্র্য প্রকাশ অসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু দেখেছি ধ্রুপদী বিভিন্ন নাচকে যথোচিত কৌশলে জুড়ে দিয়ে সাজাতে পারলে নৃত্যে ভাবপ্রকাশে কোনো জড়তা থাকে না। চিত্রাঙ্গদার মধ্যে অনেক দৃশ্যেই এই দুই নাচকে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি জায়গায় উল্লেখ করা যেতে

পারে। যেমন 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে' এই নাচের মধ্যে মণিপুরী, কাওয়ালী, চারতাল ও মাদ্রাজী তেওরা ও দাদরা তালের মিলন ঘটেছে।''[১৫]

আ. রবীন্দ্রনাটকের তামিল অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকই তামিলে অনূদিত হয়েছে। অনেক নাটকের একাধিক অনুবাদ হয়েছে। টি এন কুমারস্বামী প্রমুখ সুধীজন শান্তিনিকেতনে থেকেছেন ও রবীন্দ্রসান্নিধ্য পেয়েছেন। তাঁরা বাংলায় পারঙ্গম বলে তাঁদের রচনায় মূলের আস্বাদ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাটকের প্রথম অনুবাদ করেন সম্ভবত কে সাবিত্রী অম্মল। তাঁর অনূদিত 'চিত্রা' একাঙ্ক ১৯২২ এ বিশিষ্ট তামিল সাহিত্য সাপ্তাহিক 'তামিল ওলাগু' তে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য একাডেমী ২ খণ্ডে প্রকাশ করেছেন সাতটি রবীন্দ্র নাটক। তামিলে অনূদিত রবীন্দ্রনাটকের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

বিসর্জন (বলিদান)	এস ভি এস যোগী	১৯৫৮
বিসর্জন	টি এস পার্থসারথি	১৯৬১
চিত্রাঙ্গদা	কে সাবিত্রী অম্মল	১৯২২
চিত্রাঙ্গদা	কে এস আপ্পাস্বামী আয়ার	১৯৪৮
চিত্রাঙ্গদা (কিশোর সংস্করণ)	কে এস আপ্পাস্বামী আয়ার	১৯৪৮
চিত্রাঙ্গদা	এস আড়কপ্পন	১৯৬২
চিত্রাঙ্গদা	টি এস পার্থসারথি	১৯৬১
চিরকুমার সভা	টি এস পার্থসারথি	১৯৬১
ডাকঘর	টি এস পার্থসারথি	
হাস্যকৌতুক	টি এস কুমারস্বামী	১৯৬১
কালের যাত্রা	টি এস কুমারস্বামী	১৯৬০
মালিনী (একাঙ্ক)	টি এস সেনাপতি	১৯৪৪
মুক্তধারা	টি এস পার্থসারথি	১৯৬১
মুকুট	টি এস কুমারস্বামী	১৯৫৫
নটীর পূজা	এ কন্ডস্বামী	১৯৫৬

(নডীয়ীন পূজাই — গল্পকারে লেখা নাটক। তার সঙ্গে আছে মুক্তধারা, রাজা, চণ্ডালিকা)

রক্তকরবী	টি এস পার্থসারথি	১৯৬১
রক্তকরবী (সেমবরতি - একটা ফুল)	রাজমণি	১৯৬১
রাজা	টি. এস. পার্থসারথি	১৯৬১
রাজা ও রানী	ত্রিলোক সীতারাম	

ই. তামিলে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটক ও নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়েছে অমিল ভাষায় ও দক্ষিণীরীতিতে। বিশিষ্ট তামিল অভিনেতা ও পরিচালক এস ভি সহস্রনামম তাঁর নাট্যগোষ্ঠী 'সেবা স্টেজ' শুরু করেন ১৯৫২ সালে রবীন্দ্রনাথের নাটক দিয়ে। নাম 'কঙ্গল' : 'দৃষ্টিদান' এর নাট্যরূপ। লেখক এন ভি রাজমণি। এটা ফিল্মও হয় ১৯৫৩ সালে যাতে শিবাজী গণেশন অভিনয় করেন।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে মাদ্রাজে কয়েকটি রবীন্দ্র নাটক অভিনীত হয়। মাদ্রাজ বাজ্য রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ কমিটি সেই সময় বেশ কিছু রবীন্দ্র নাটক উপস্থাপনার অয়োজন করে। মাদ্রাজ নাট্য সঙ্ঘ মঞ্চস্থ করে 'দৃষ্টিদান' যে নাটকের অভিনয় মানুষের মনকে স্পর্শ করে। 'বিসর্জন' অবলম্বনে 'সত্য বিজয়ম' (অনুবাদ করেন এস ডি এস যোগী) অভিনীত হয় সগৌরবে। প্রখ্যাত পেশাদারী ও সুদক্ষ নাট্য সংস্থা টি. কে. এস ব্রাদার্স মঞ্চস্থ করে 'বলিদান' (বিসর্জন)। 'বলিদান' মাদ্রাজেব স্কুল কলেজে অসংখ্য বার অভিনীত হয়। নবাব রাজমানিক্কম পিল্লার নেতৃত্বাধীন সংস্থা মঞ্চস্থ করে 'রাজা'। দুটি অভিনয়ই জনপ্রিয় হয়েছিল। রেডিও নাটক 'রাজা ও রানী' অনুবাদ করেন কবি ত্রিলোক সীতারাম ও তা প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রশতবর্ষে বিখ্যাত কলাক্ষেত্র নৃত্যনাট্য সংস্থা অভিনয় করে 'শ্যামা' যা বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। পরমাবিদুষী নৃত্যপটিয়সী রুক্মিনী দেবী অরুণ্ডেলের প্রয়াসেই 'শ্যামা' একটা পরিপূর্ণ শিল্প মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। সমালোচকের মতামত আমরা স্মরণ করতে পারি — "শ্রীমতী রুক্মিনী দেবী অরুণ্ডেলের 'শ্যামা' এক অসামান্য অনুষ্ঠান। গত কয়েক বৎসর আমি যে সব 'শ্যামা' নৃত্যনাটক দেখেছি তার থেকে এই প্রয়োজনার কোরিওগ্রাফী, প্রকাশময়তা ও নাটকীয় তীব্রতা অনেক উন্নত। নাচগুলি হয়েছিল ভরতনাট্যম বা কথাকলিতে, অনেক গান ছিল বাংলায় যাকে অনেক ক্ষেত্রে কর্ণাটিক সুরপ্রয়োগে সমৃদ্ধ করা হয়েছিল"।[১৬]

কলাক্ষেত্র কলকাতায় 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য উপস্থাপিত করে ১৯৬৯ এর ১৩ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে। 'মনমাতানো নৃত্যের ছন্দে আর সুরের খেলায় উজ্জ্বল' হয়ে উঠেছিল এই অনুষ্ঠান। সংবাদপত্রে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে লেখা হয় —

"কী নৃত্যে কী সঙ্গীতে সব শিল্পীই ছিলেন অবাঙালী। তবু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঠিক অনুসরণ ও পরিবেশন সকলকে মুগ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। নৃত্যনাট্যটি আগাগোড়া সংগঠিত কথাকলি ও ভারতনাট্যম নৃত্যের ছন্দে। রবীন্দ্রনাট্য পরিবেশনের প্রচলিত রূপের ব্যতিক্রম এটা সন্দেহ নেই, কিন্তু শিল্পীর অননুকরণীয় মুদ্রা আর ভঙ্গী যেন সংলাপেরই পরিপূরক হয়ে ওঠে। নৃত্যনাট্যটি যাঁদের নৃত্যকুশলতায় মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁরা হলেন বজ্রসেনরূপী জনার্দন, কোটালরূপী কুনহীরামন, উত্তীয়রূপী বালগোপাল ও শ্যামারূপী ইন্দিরা বড়ুয়া এবং কণ্ঠসঙ্গীতে মুগ্ধ করেন ভগবতালু সীতারাম শর্মা। এ নৃত্যনাট্যের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও রুক্মিনী দেবী দক্ষিণী রীতিই অনুসরণ করেন। রং ও পারিপাট্যের গুণে তা সার্থকরূপে দেখা দেয়"।[১৭]

'তাসের দেশ' এবং 'ডাকঘর' তামিলে অভিনীত হয় রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উৎসবে। এই সময়ে মাদ্রাজ আকাশবাণীও রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ে বিশেষ ভূমিকা নেয়। মাদ্রাজ বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৬১ র ৬ মে সম্প্রসারিত হয় তামিলে 'শেষরক্ষা'। ৮ মে অভিনীত হয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তামিল নাট্যরূপ 'কর্মফলমু'। ন্যাশানাল প্রোগ্রামের সূচী অনুযায়ী ১১ মে প্রযোজিত হয় 'ডাকঘর'। এগমোর ড্রামাটিক সোসাইটি রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে মঞ্চস্থ করে 'নটীর পূজা'। রবীন্দ্র প্রতিভার সূক্ষ্ম সুকুমার দিকগুলো তামিল দর্শক-শ্রোতার সামনে উদ্ভাসিত হয় এভাবে।

ক্যালকাটা প্লেয়ার্স 'বিসর্জন' নাটকের বেশ কয়েকটি অভিনয় করে তামিল ভাষায়। প্রথম অভিনয় হয় ১৯৬৭ র মে মাসে কলকাতার ত্যাগরাজ হলে। মূল বাংলা থেকে নাটক অনুবাদ করেন এন বিশ্বনাথন যিনি রঘুপতির ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন। জয়সিংহ করেন অশ্বিনীকুমার। অপর্ণার ভূমিকায় ছিলেন মীনা রামন যিনি গানেও

পাবদর্শিতা দেখান। কলকাতা ছাড়া জামশেদপুব ভিলাই প্রকৃতি স্থানেও 'বিসর্জন' অভিনীত হয়।

'চিবকুমার সভা' অশ্বিনীকুমারেব নির্দেশনায় অভিনীত হয় ১৯৬৯ সালে। অনুবাদক-এন বিশ্বনাথন। 'চিরকুমার সভা' সমৃদ্ধ নাটক এবং তামিল ভাষায় বাংলা সুরে গানগুলি বিশেষ আর্কষণীয হয।

ববীন্দ্রনাথের ১২৫ জন্মবর্ষ উৎসবে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে বিভিন্ন ভাষায় যে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হয় তাতে এস আর সভাপতি উপস্থাপিত করেন তামিল ভাষায় 'বিনি পয়সার ভোজ'।

রবীন্দ্রনাথের ১২৫ জন্মবর্ষ উপলক্ষে দিল্লীতে আয়োজিত রবীন্দ্র নাট্যোৎসবে (৮.৫.১৯৮৭ -১৬.৫.১৯৮৭) তামিল নৃত্যনাট্য 'গীতাঞ্জলি' উপস্থাপিত হয় মাদ্রাজের নৃত্যোদয় সংস্থার প্রযোজনায়। প্রখ্যাত ভারনাট্যম নৃত্যশিল্পী পদ্মা সুব্রহমনিয়ম রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার রূপ দিয়ে। এটি গ্রথিত হল এবং উপস্থাপিত হল 'গীতাঞ্জলির' মণিমানিক্য দিয়ে গাথা রূপক কাহিনীর মাধ্যমে যেখানে আত্ম উপলব্ধি ও পরমকে পাওয়ার পথ হল যখন বুদ্ধি - এই নাটকে নায়িকা - ভক্তিতে নিবিড় হয় ও বরণ করে নাদ ব্রহ্মম - কে (প্রণব) যা অন্তর থেকে শ্রুত হয়। চিত্তবিক্ষোভকারী পঞ্চ ইন্দ্রিয়র (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ) সঙ্গে কখনো লাগে সংঘাত ও তারা বুদ্ধিকে পরাভূত করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির সঙ্গে মিলন হয় পরম পুরুষ বা নাট্য ব্রহ্মর। রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে শঙ্কর দর্শনের সংযোগ ঘটেছে পদ্মা সুব্রহমনিয়মের শিল্প ভাবনায় যদিও তার সিদ্ধি সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। তাঁর বক্তব্য জানাতে গিয়ে অনুষ্ঠান পত্রে শ্রীমতী পদ্মা জানিয়েছেন —

"My mental vision, which has been influenced by Adi Sankara's philosophy, caught just four disconnected passages of Tagore and linked them, weaving an episode and creating a flower vendor (symbol of yearning Buddhi, i.e. intellect) with the faculty of Viveka (Discrimination) seeking her lover (her soul i.e. Atman). Whenever Tagore referred to third persons (the world outside himself), I visualized them as the five senses. The five senses (Shabda, Sparsha, Roopa, Rasa and Gandha) chain the Buddhi, which is in search of the self with realisation and the consequent bliss. Buddhi yearns for release from physical limitations and bondage. Bliss of self realisation is only experienced in the state of Swapna (dream) and not while the Buddhi is awake (Jaagrat). Realisation of the self is not merely an intellectual execise. Only when the ego of the Buddhi is totally drowned in devotion, the all prevading Naada Brahman (Pranava) is heard from within."

(৪) শরৎচন্দ্র ও তামিল নাটক

তামিল রসিকজনের কাছে শরৎচন্দ্রের মূল্য অপরিসীম। "তামিল পাঠকদের কাছে শরৎচন্দ্র এখনও এক অতি পরিচিত ঘরোয়া নাম। তাঁর উজ্জ্বল নাম তামিলনাদে বেঁচে থাকবে আরো একশ বছর।"[১৮]

শরৎচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাস তামিলে অনূদিত হয়েছে, তামিল কথাকাররা (রামানি, পদুমাই পীঠন, চূড়মণি, অকিলন প্রমুখ) শরৎচন্দ্র দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।

শরৎচন্দ্রের নাটকও গৃহীত হয়েছে তামিলে সমাদরে। তাঁর নাটকের অনুবাদ হয়েছে, অভিনীত নাটক আরো বেশী। 'ষোড়শী' নাটক 'টুনাই' নামে অনুবাদ করেন সৌরী ১৯৬১ সালে।

শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু নাটক তামিলে মর্যাদার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। 'চরিত্রহীন' এর মত দুরূহ কঠিন গ্রন্থও মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে। 'চরিত্রহীন' রূপায়ণ সম্বন্ধে বিদগ্ধজনের মতামত উল্লেখ করা যায়।[১৯]

''তামিল রসিক চিত্ত শরৎচন্দ্রকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে একটি ঘটনার স্মৃতি আজও আমাকে আনন্দ বিহ্বল করে তোলে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে আমি তখন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কোন এক দুঃসাহসিকতায় ভর করে আমরা 'চরিত্রহীন' মঞ্চস্থ করেছিলাম। চরিত্রহীনের অভিনয় সার্থক হোক বা না হোক, কিন্তু শিক্ষিত তামিল জনসাধারণের কাছে 'চরিত্রহীন' যেভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিল তার তুলনা বিরল। তৎকালীন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনমন্য শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত মুদালিয়র অনুরোধ করেছিলেন তাঁর বাড়িতে এই অভিনয়ের জন্য। সেখানে বিশিষ্ট অতিথিদের নিমন্ত্রণ করে তাঁদের তৃপ্ত করেছিলেন। এই অতিথিবর্গের মধ্যে বহু খ্যতনামা বিদেশী অতিথিও উপস্থিত ছিলেন।''[১৯]

'চরিত্রহীন'-এর আরও অভিনয় হয়। ১৯৭২ এ ক্যালকাটা প্লেয়ার্স করে 'চরিত্রহীন'। সতীশের ভূমিকায় অভিনয় করে ভূতলিঙ্গম, কিরণময়ী করেন সারদা নারায়ণস্বামী।

শরৎ শতবর্ষ উপলক্ষে শবৎচন্দ্রেব নাটক তামিলে অভিনীত হয়। 'পরিণীতা' রূপান্তরিত হয় 'মলার মলাই' নামে ও তা অভিনীত হয়। রূপকার বি. এস. রাঘবন। 'পল্লীসমাজ' নাটকও এই উপলক্ষে অভিনীত হয়।

পাঁচের দশকেই সাউথ ইন্ডিয়া ক্লাবের প্রযোজনায় অভিনীত হয় 'দেবদাস' কলকাতায়। নাটকের অনুবাদ করেন এন. বিশ্বনাথন যিনি পরিচালনার দায়িত্বেও ছিলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন — দেবদাস — রাজামণি, পার্বতী — সারদা নারায়ণস্বামী, চুনিলাল — এন. বিশ্বনাথন যিনি তামিল 'দেবদাস' বাইতেও এই ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেন। চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় অভিনয় করেন মীনা রমন যিনি নাচ ও গান দুয়েতেই পারদর্শী ছিলেন চন্দ্রমুখীর অভিনয়ে যার প্রয়োগ দেখা যায়।

৬. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও তামিল নাটক

ক. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক তামিলে

বাংলা সামাজিক কাহিনী তামিলে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কারণ দুই সমাজের রীতি নীতি, হৃদয়ধর্ম, মানসিকতার মধ্যে অনেকটাই সমরূপতা আছে। এক্ষেত্রে নাট্য সাহিত্যের কথা বিশেষভাবে মনে আসে। তামিলে 'ভিয়েটনাম ভীডু' এক অতি আকর্ষণীয় নাটক। সাতের দশকে এই নাটকের অভিনয় বিশেষ জনপ্রিয় হয়। নাটক, পরিচালনা ও অভিনয়ে ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা শিবাজী গণেশন। প্রযোজক সংস্থা-শিবাজী নাটক মন্ডলম। এই নাটকের ওপর আশাপূর্ণা দেবীর 'যোগ বিয়োগ' উপন্যাসের বিশেষ প্রভাব আছে। কাহিনী, ঘটনা, চরিত্রচিত্রণ দুক্ষেত্রেই অনেকটা সমরূপের। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস 'পডিক্কাদে মেদাই' (পড়াশুনা না করেও যে জ্ঞানী) নামে তামিলে অনূদিত হয়েছিল।

শম্ভু মিত্র ও আমিত মৈত্র রচিত 'কাঞ্চন রঙ্গ' তামিলে খ্যাত হয়। এই নাটকের সম্পূর্ণ অনুসরণ বলা যায় 'এধীর নীচল' (স্রোতের বিরুদ্ধে)। 'এধীর নীচল' রূপায়িত করে রাগিনী রিক্রিয়েশন্স কে. বালচন্দর-এর পরিচালনায় যিনি নাটকের লেখকও।

তরুণ রায়ের 'এক পেয়ালা কফি' তামিলে উপস্থাপিত হয় 'দি পারফেকট এলিবাই' নামে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রযোজক সংস্থা ক্যালকাটা প্লেয়ার্স। অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা দেখান এন বিশ্বনাথন, এস ভি আর রাজা, অশ্বিনী কুমার প্রমুখ। নাটকটি কলকাতায় হয় বেশ কবার, তাছাড়া জামশেদপুর ভিলাই প্রভৃতি স্থানেও অভিনীত হয়। মাদ্রাজেও এই নাটকের অভিনয় হয় ও দর্শকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

'সাহেব' গল্প বাংলায় বিভিন্ন ভাবে দর্শকের সামনে এসেছে। কখনো সেলুলয়েড়ের পর্দায়, কখনো বা নাটক রূপে। তামিল টি. ভি. নাটক 'পরাভাইগল' বা পাখী বাংলা নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তামিল নাটকটি পরিচালনা করেন ইউ এস কান্নন।

উৎপল দত্তর "Hunting the sun" বা 'সূর্য শিকার' অভিনয় করেছে যাত্রা ড্রামাটিক্স এসোসিয়েশন। পরিচালনায় ছিলেন অধ্যাপক যোশেফ জেম্স। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এই নাটক বেশ উচ্চমানের প্রযোজনা রূপে অভিনন্দিত হয়।

বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' তামিলে অনুবাদ করেছেন এস. কৃষ্ণ মূর্তি। রূপান্তরিত নাম 'পোঙ্গল'।

বাদল সরকার যে নতুন রীতির নাট্যচর্চা করেছেন তামিল নাটককে তা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছে। বাদল সরকারের নাটকের কাহিনী ও বিন্যাস, 'থার্ড থিয়েটার' ঢঙের প্রযোজনা, এবং অ্যাবসার্ড বা প্রতীকধর্মী বক্তব্য ও দর্শন তামিল নাটকের ওপর প্রবল ছাপ ফেলেছে। বাদল সরকারের নাটক তামিল ভাষায় অভিনীত হয়েছে, মাদরাজে ইংরাজীতে অভিনীত হয়েছে, বাদল সরকারের নাটক ও নাট্যশিক্ষা নিয়ে তামিল ভাষায় বই লেখা হয়েছে। বলা হয় বাদল সরকার তামিল মঞ্চের একজন আভ-গার্দিস্ত।[২০]

বাদল সরকারের 'সলিউশন এক্স' তামিলে অভিনীত হয় ১৯৬৭-৬৮ সালে গোপী থিয়েটার্স-এর প্রযোজনায় 'মায়া বাজার' নামে। নাটকের সর্ববিধ পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট মঞ্চ ও চিত্রশিল্পী গোপাল কৃষ্ণণ বা গোপী। নতুন রীতির নাটক রূপে এটি অভিনন্দিত হয়।

এর পর বাদল সরকারের নাটক অভিনীত হয় ইংরাজীতে, তামিল শিল্পীদের দ্বারা। ১৯৭০-এ দি ম্যাডরাস প্লেয়ার্স উপস্থাপিত করে 'এবং ইন্দ্রজিৎ'। এই নাটক আবার করে লোওলা কলেজের (Loyola College) ছাত্ররা। ম্যাডরাস ক্রিশ্চান কলেজের ছাত্ররা অভিনয় করে 'মিছিল'-এর ইংরাজী রূপান্তর। তামিলে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' অনুবাদ করেন জি. রাজারাম 'পিরাকোরু ইন্দ্রজিৎ' নামে যেটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ এর ডিসেম্বর।

বাদল সরকারের 'মিছিল' তামিলে রূপান্তরিত হয় 'থেডুঙ্গল' নামে, অনুবাদক রাজারাম। এই নাটক মঞ্চস্থ করে পরীক্ষা মূলক নাট্যসংস্থা 'পরীক্ষা' পরিচালক তরুণ সাংবাদিক - নাট্যবিদ জ্ঞানী। ১৯৮১ তে এই নাটক অভিনীত হয় মিউজিয়ম থিয়েটারে। পরীক্ষাধর্মী এই নাটকের প্রযোজনা তামিল নাট্যধারায় এক নতুন উম্মাদনা সঞ্চার করে। 'পরীক্ষা'র পরবর্তী নিজস্ব প্রযোজনায় (যেমন 'বেলুন') এই রীতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ক্যালকাটা প্লেয়ার্স বল্লভপুরের রূপকথা অভিনয় করেন 'বল্লভপুরিন ওরুকাদাই' নামে ১৯৮১ তে। নাটকের অনুবাদ করেন এন বিশ্বানাথন। এইভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাদল সরকারের নাটক তামিলে রূপায়িত হয়েছে।

না. মুথুস্বামী সম্প্রতিকালের এক বিশিষ্ট শিল্পী যিনি পরীক্ষামূলক নাটকরচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর নাটক 'কাট্টিয়াকারণ' প্রভৃতি নাটকের সঙ্গে বাদল সরকারের সাদৃশ্য

আছে এ্যাবসার্ড ভাবনায় ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। এবং একই মঞ্চে বাদল সরকারের নাটরের সঙ্গে মুথুস্বামীর নাটক উপস্থাপিত হয়েছে একই ভাব ও রীতির নাটক রূপে। বাদল সরকার প্রবর্তিত থার্ড থিয়েটার রীতির নাটক তামিলনাড়ুতে বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপিত হয়েছে।

বাদল সরকার পরিচালিত একটি থিয়েটার ওয়ার্কশপের বিবরণ নিয়ে একটি তামিল নাট্যবিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে 'মনসিল পাদিনজা কালাডিচ্চুয়াড়ুকল' (মনে আঁকা পদচিহ্ন), লেখক এস. স্বামীনাথন। ১৯৮০ তে দশ দিনের এক থিয়েটার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় মহাবলীপুরম-এর নিকটবর্তী স্থান চোলমন্ডল-এ, জায়গাটি শিল্পী-ভাস্করদের মিলন স্থল। এস স্বামীনাথন (যিনি একজন অংশগ্রহণকারী বটেন) এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন 'মনসিল পাদিনজা কালাডিচ্চুয়াড়ুকল' গ্রন্থে যেটি পরীক্ষামূলক নাট্যসংস্থা 'পরীক্ষা'র উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় ১৯৮০-র ডিসেম্বরে।

বাদল সরকার প্রথমেই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী নাট্যশিল্পীদের নাটকের মূল কথা শেখান অনেকটা খেলাচ্ছলে। যেমন — শক্তি পরিমাট্রম (শক্তি পরিবর্তন), কান্নাডি বিলাইয়াট্রু (দর্পণ খেলা), নাম্বিক্কাই বিলাইয়াট্রু (বিশ্বাস খেলা), শিলাই সেইয়ুম বিলাইয়াট্রু (প্রতিমা নির্মাণ খেলা), লয়া বিলাইয়াট্রু (লয়া খেলা), শারীরিক কসরৎ ইত্যাদি। প্রাথমিক অনুশীলনের পর ২৮ জন অংশগ্রহণকারীর প্রত্যেকেই বলা হয় অভিনয় ক্ষেত্রে (দর্শক ঘেরা জায়গা) আসতে ও অভিনয় করে দেখাতে বাদল সরকার যা বলবেন, যেমন-বাজারের দৃশ্য, হাসপাতাল, রেলওয়ে ষ্টেশন ইত্যাদি।

অভিনেতারা অভ্যাস করে অনুকৃতি, কণ্ঠের পরিবর্তন, সঙ্গীত ও নৃত্য। মঞ্চের প্রপ বা উপাদানগুলো নির্মাণ করতে শিক্ষা করতে হয়; যেমন গাছ, সাইকেল, নদী ইত্যাদি। অতঃপর পাঁচ মিনিট করে প্রত্যেক অভিনেতাকে সময় দেওয়া হয় নির্দিষ্ট বিষয়টি উপস্থাপিত করতে।[২১]

এভাবে এগিয়ে চলে বাদল সরকার পরিচালিত তামিল নাট্যশিল্পীদের অনুশীলন।

খ. সাম্প্রতিক তামিল নাটক বাংলায়

বাংলা নাটক তামিল ভাষায় অজস্র অনূদিত ও অভিনীত হলেও তামিল নাটক বাংলায় অনেক কম গৃহীত হয়েছে। যদিও তামিল গল্প উপন্যাস বাংলাতে মর্যাদার আসন পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে বাংলা ও তামিল নাট্য-সংস্কৃতির মহান মিলন সাধিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রভাবিত করেছিলেন তামিল নৃত্য ও নাট্যকলাকে, তেমনি তিনি প্রভাবিতও হয়েছিলেন। প্রতিমা দেবীর 'নৃত্য' গ্রন্থে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ কিভাবে দক্ষিণী রীতিকে গ্রহণ করেছেন তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' ইত্যাদি নৃত্যনাট্যে। ভরতনাট্যমে নৃত্যরীতিও গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন অভিনয়ে। মাদ্রাজের যুবক বাসুদেবন চিত্রকলা শিখতে শান্তিনিকেতনে এলে সুঠাম সুগঠিত দেহ ভরতনাট্যমে পারদর্শী বাসুদেবনকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে কাজে লাগিয়েছিলেন। বাসুদেবনের কথা সুন্দর ভাবে বলেছেন শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য' গ্রন্থে।[২২]

আধুনিক সময়ের তামিল নাটক বাংলায় কিছু অভিনীত হয়েছে। পুদুমাই পিত্তন রচিত 'মপিলাই বারুগিরার' নাটকটি অনুবাদ করেন এন. বিশ্বনাথন 'জামাই আসছে' নামে ও কলকাতায় এই নাটক অভিনীত হয় ১৯৬৫ সালে। অভিনয় করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্ররা। পি. ভি. ওয়াই. রমন-এর 'ইমপারফেকট মার্ডার' নাটকটিও বাংলায়

অভিনীত হয় ১৯৭৫ সালে। প্রখ্যাত চিত্রপবিচালক কে. বালচন্দর-এর নাটকও মঞ্চস্থ হয় বাংলায়।

তামিল নাটক বাংলায় যা অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য ইন্দিরা পার্থসারথিব নাটক। 'মানুষ ও কুকুর' নামে এই নাটকটি (তামিল নাম 'পাসি') অনুবাদ করেন দিমিত্রণ ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত হয় 'ভারতীয় একাঙ্ক গুচ্ছ' সংকলন গ্রন্থে ১৯৮৫ তে।

ভি গোবিন্দ রাজন রচিত ছোট গল্প অবলম্বনে নাটক লেখেন অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা। 'আসামী' নামে এই নাটকটি প্রকাশিত হয় 'ও থিয়েটার থিয়েটার' পত্রিকায় ১৯৮৪ র অক্টোবরে। মূল গল্প তামিল থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন বোম্মানা বিশ্বনাথম।

না পার্থসারথি রচিত 'সত্যম' গল্পটিকে বাংলায় একসংলাপী নাটকে রূপান্তরিত করা হয়। এই নাটকটি অনেকবার অভিনীত হয়েছে। প্রথম অভিনয় হয় ১৯৮৪ র মে মাসে কলকাতায় ভারতীয় নাট্য সম্মেলন উপলক্ষে। অনুষ্ঠানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের উপাচার্য এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অভিনেতা অশোক গোস্বামী। অন্যান্য স্থানেও এর অভিনয় হয়েছে।

গল্পকার জয়কান্তন-এর লেখা ছোটগল্প অবলম্বনে একটি এক সংলাপী নাটিকা লেখেন সৌম্যেন্দু ঘোষ- 'কি করি বলুন তো?'। এই নাটকটিও অভিনীত হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে।

পি. ভি. সুব্রহ্মনাম রচিত 'মিন্নাকালাই' নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন এস. কৃষ্ণমূর্তি। নাটকটি অনুবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ এ।

টি এন বিশ্বনাথনের নাটক বাংলায় রূপান্তরিত হয় 'আমার মত এক মানুষ' নামে। অনুবাদ করেন শশাঙ্কভূষণ মৈত্র। নাটকটি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। পরিচালনায় ছিলেন শোভনলাল মুখোপাধ্যায়।

তামিল নবনাট্যরীতির প্রবক্তা না. মুথুস্বামী রচিত 'কালংকালমাক' নাটকটি বাংলায় অনূদিত হয় এবং প্রকাশিত হয় অনুবাদ পত্রিকায় 'কালের ধারায়' নামে মার্চ ১৯৮৭ তে। সূচনায় নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। অনুবাদক — দিলীপ কুমার মিত্র।

সুব্রহ্মন্য ভারতীর 'পাঞ্চালী শপথম' মহাভারতের কথার ওপর ভিত্তি করে লেখা। এতে নাট্যকাব প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ আমলে ভারতবাসীর ক্লীবত্ব কাপুরষতাকে তীব্র আক্রমণ করেছেন ও শেষ পর্যন্ত মানুষের জেগে ওঠার কথা বলেছেন। এই নাট্যধর্মী কাব্যটি বাংলায় অনুবাদ করেন দিলীপ কুমার মিত্র এবং ভারতীয় ভাষা পরিষদ এটি মঞ্চস্থ করে (২৫.৪.৮৭) ডঃ দীপক চন্দ্র পোদ্দারের পরিচালনায়। নতুন রীতির উপস্থাপনা দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। অভিনয়ে অংশ নেন অমিত শ্রীবাস্তব, অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, অশোক ভট্টাচার্য, অজয় পড়িয়া, দেবীপ্রসাদ গুঁই, তরুণ পারেখ, দীনেশ রাই, মহেশ ভোরা এবং চন্দনা দে।

নিভা আর্টস নিবেদিত 'মনমোহিনী' একটি তামিল নাটকের ওপর ভিত্তি করে লেখা। অনুবাদ করেছেন শ্রীধর বিশ্বনাথন, পরিচালনায় ও বিশিষ্ট চরিত্রে ছিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য শিল্পীরা হলেন শঙ্কর চক্রবর্তী, জয় সেনগুপ্ত, সুনীল মুখার্জী, অমিত দে, সুমিতা মুখার্জী, সুব্রতা চ্যাটার্জী, দোলন রায় প্রমুখ। হালকা ধরনের এই কমেডির প্রযোজনা হয় ১৯৯৫-এ এবং এই নাটকের শতাধিক অভিনয় হয়েছে।

সূত্র পরিচিতি

১. Indian Literature. Sahitya Akademi. April-Sept. 58 (article - Tamil Drama, A Srinivasa Raghaban, P. 131) New Delhi.
2. 'After Independence, the renaissance of the literary reached Tamil drama also' – Literary Heritage of the Tamils, S. V. Subramanian & N. Ghadigachalam, P. 461, Madras, 1981.
৩. T.D.R. (50), Vol. 15 No. 3, Ed. Erika Munk (article – Politicians as Players, Karthegisu Sivathamby) New York.
৪. Karunanidhi – Man of Destiny, S. Swaminathan, P. 77-78, New Delhi, 1974.
৫. Ibid, P. 77.
৬. Literary Heritage of the Tamils, S.V. Subramanian & N. Ghadigachalam, P. 462, Madras, 1981.
৭. Enpattonril Tamil (Tamil in 1981), S.V. Subramanian & N. Ghadigachalam, P. 70, Madras, 1983.
৮. The Hindu, 5.10.80, Madras.
৯. Gentleman, Ed. Minha & Merchant, May 1981, P. 46, Bombay.
১০. Enact, Ed. Rajinder Paul, Jan-Feb. 73, New Delhi.
১১. Ibid
১১. (a). Ibid.
১২. Tamil Literature, Kamil V. Zvelebil, P. 297, Germany, 1974.
১৩. Rabindranath Tagore Birth Centenary Celebrations, Ed. Santosh Chandra Sengupta (article – Rabindranath and Tamil Literature, T.N. Kumarswamy, P. 136).
১৪. নৃত্য, প্রতিমা দেবী, পৃঃ ৩২-৩৩, বিশ্বভারতী, ১৯৬৫।
১৫. তদেব, পৃঃ ২৫,
১৬. natya, Tagore Issue (article – Dance Dramas of Tagore, Dr. Charles Fabri, P. 14-15), New Delhi.
১৭. যুগান্তর, কলকাতা, ১৫.২.১৯৬৯।
১৮. The Golden Book of Saratchandra, All Bengal Sarat Centenary Committee (article–Saratchandra & Tamil Literature, T.N. Kumarswamy, P. 209) Calcutta, 1977.
১৯. শরৎচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য, ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত, (প্রবন্ধ — তামিল সাহিত্যে শরৎচন্দ্র — আদর্শবাদী ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৫) নয়াদিল্লী, ১৯৭৬।
২০. The Hindu, Madras, 22.5.81.
২১. মনসিল পাদিনজা কালাডিচ্চুয়াড়ুকল (মনে আঁকা পদচিহ্ন), এস. স্বামীনাথন, মাদরাজ, ১৯৮০।
২২. গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, শান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ৩২, ৩৩, ৪১, ৫৫, ৫৭, ৫৮, কলকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৯০।

একাদশ অধ্যায়
আধুনিক তেলুগু নাটক

১. সূচনা পর্ব

আধুনিক অর্থে তেলুগু নাটকের উদ্ভব উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হলেও মধ্যযুগে তার উৎস নির্ণয় করা যায়। তেলুগুর প্রাচীনতম নাটশিল্প 'যক্ষগনম' সঙ্গীত নৃত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের কথা ব্যক্ত করত। 'বুররা কথায়' হাস্য পরিহাসের ভেতরে থাকত লোকচেতনা। 'হরিকথা' মূলত ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করত। 'তোল বোম্মালু' বা ছায়া নাটক-ও পারফরমিং আর্টের এক সুন্দর রূপ। 'বিধিনাটকম'ও (বীথি নাটক বা পথ নাটক) মানুষের নাট্য পিপাসা নিবৃত্ত করত।

ক্রমে ইংরেজী থিয়েটার এল। বোম্বের পার্সী থিয়েটার ও মহারাষ্ট্র ধারবারের বিভিন্ন দল নাটক করতে এল — তাদের সুন্দর বার্ণাঢ্য দৃশ্যপট সাজসজ্জা ইত্যাদি আকর্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করে জনমানসে। এই সব কারণে তেলুগুতে নাটক রচনা সুরু হয় — প্রথমে অনুবাদ, পরে মৌলিক।

১৮৭৬এ ভি. বাসুদেব শাস্ত্রী 'জুলিয়াস সীজার' অনুবাদ করেন। ১৮৮৫তে গুড়জাদা শ্রীরামমূর্তি ও কে. বীরেশলিঙ্গম 'মার্চেন্ট অফ ভেনিসের' প্রথম দু অংক অনুবাদ করেন। ক্রমে শেকসপীয়র, শেরিডন প্রমুখ আরো অনূদিত হল তেলুগু ভাষায়। কোক্কোণ্ডা ভেঙ্কটরত্নম সংস্কৃত 'নরকাসুর বিজয় ব্যায়োগম' অনুবাদ করেন। কে. বীরেশলিঙ্গম-এর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' বিশেষ মূল্য পায়।

কোরাড রামচন্দ্র কবি রচনা করেন 'মঞ্জরি মধুকরিয়ম' (১৮৬০) যা প্রথম তেলুগু মৌলিক নাটক। **ভি বাসুদেব শাস্ত্রীর** 'নন্দক রাজ্যমু' (১৮৮০) এক অর্থে বিশেষ উল্লেখ্য কারণ এতে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের দুই গোষ্ঠী বৈদিকী ও নিয়োগীদের চিরকালীন দ্বন্দ্ব সংঘাতকে রূপ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় মৌলিক নাটক **কে. বীরেশলিঙ্গম** — এর 'হরিশচন্দ্র' জনপ্রিয় হয়। বীরেশলিঙ্গমের 'ব্রাহ্ম বিবাহম' গুরুত্বপূর্ণ নাটক যাতে শিশু বিবাহ বা কন্যাবিক্রয়ের মত অসামাজিক অন্যায় কাজের বিরোধিতা আছে। **ধর্মাভরম কৃষ্ণমাচরিয়া** (১৮৫৩-১৯১৩) নাটক লিখতেন 'সরস বিনোদিনী সভা' বেল্লারীর জন্য। প্রাচীন রীতিকে অস্বীকার করে তিনি লেখেন প্রথম ট্র্যাজেডী —'বিষাদ ষড়ঙ্গধর' (১৮৮৯)। তিনি ৩০টা নাটক লেখেন। তাঁকে বলা হত 'অন্ধ্র নাটক পিতামহ'[১]। এর নাট্যপ্রতিদ্বন্দ্বী **কে শ্রীনিবাস রাও** ঐতিহাসিক নাটকের বড় মাপের লেখক। তিনিও প্রায় ৩০টা নাটক লেখেন।

বেদম ভেঙ্কট রায়শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯২৯) রচিত 'প্রতাপরুদ্রীয়ম' (১৮৯৭) প্রথম ঐতিহাসিক নাটক ও আজ পর্যন্ত সমভাবে সমাদৃত। এই নাটকের চরিত্র রাজা প্রতাপ রুদ্রব মন্ত্রী যুগন্ধর আজও পাঠক ও অভিনেতার কাছে প্রিয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে তেলুগু নাট্য ক্ষেত্রে অসাধারণ মহিমায় বিরাজিত ছিলেন **পানুগন্টি লক্ষীনরসিংহ রাও**। তিনি প্রায় ৩২টি নাটক লেখেন যাদের মধ্যে স্মরণীয় 'রাধাকৃষ্ণ' (১৯০১) 'বিপ্রনারায়ণ' (১৯০৯), 'কণ্ঠাভরণ' (১৯১৭), 'পাদুকা' (১৯১৯) ইত্যাদি। **ধর্মাভরম কৃষ্ণমাচারুলু** সিনেমা আবির্ভাবেব আগে তেলুগু মঞ্চকে পূর্ণ রেখেছেন নাটকের দ্বারা।

গুড়জাদা ভেঙ্কট আপ্পারাও (১৮৬২-১৯১২) অন্ধ্রের যুগপুরুষ ও আধুনিক তেলুগু নাটকের জনক — তাঁর নাটকে সমকালীন সমাজ সমস্যাকে আশ্চর্য রূপায়িত করলেন। তখন নবজাগরণের কাল। রেনেশাঁসের আলোকধারায় স্নাত রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের উজ্জ্বল প্রদীপ্ত ভাবনা ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থবির মূল্যবোধের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। অন্ধ্রের মহান লেখক সমাজ সংস্কারক কে. বীরেশলিঙ্গম সেই আদর্শকে অন্ধ্র জীবনে প্রয়োগ করতে চাইলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন, পতিতাবৃত্তি নিরোধ, জাতিপ্রথা বিলোপ, নারীমুক্তি, শিশুবিবাহ রোধ, কন্যাকে পণ্যরূপে বিবাহ বাজারে বিক্রর তীব্র বিরোধিতা প্রভৃতি সমাজ কল্যাণের মহৎ ভাবনাগুলি অন্ধ্রের সমাজ জীবনকে নূতন প্রাণের সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। গুড়জাদা আপ্পারাও এই বিষয়গুলি অবলম্বন করেই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন এবং তাঁর অবিস্মরণীয় নাটক 'কন্যাশুল্কম' যুগের প্রদীপ্ত তিলক ললাটে ধারণ করে চির ভাস্বর হয়ে আছে। এই নাটক জীবনের চিত্র নয়। জীবনটাই নাটক হয়ে গেছে, নাটক হয়েছে জীবনেরই মত বিরাট বিচিত্র। গোটা সমাজকে লেখক নাটকের ক্যানভাসে যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছেন। সুবিধাবাদী স্বার্থপর ভণ্ড চরিত্রহীন অথচ লোকসমাজে মাথা উঁচু করে চলা গিরিশম, বুদ্ধিমতী মানবিক গুণসম্পন্না বিচিত্র স্বভাবের পতিতা মধুরবাণী, নির্দোষ গোঁড়া অথচ প্রাচীন অন্যায় বর্বর নীতি পদ্ধতির উগ্র সমর্থক ব্রাহ্মণ আগ্নিহোত্রবধানলু, বখে যাওয়া ছেলে ভেঙ্কটেশম, সদাস্বার্থান্বেষী উকিল ভীমারাও ও নাইডু, শিক্ষিত অথচ হীনচরিত্র অর্থলোভী যুবক রামাপ্পনটুলু, আদর্শবাদী আইনবিদ সৌজন্যরাও — পুরো সমাজটাই নাটক হয়ে গেছে, সব মানুষ হয়েছে কুশীলব, পাঠকও এই নাটকের অর্থাৎ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ের নাটক প্রথানুবর্তনেরই কাল। গুড়জাদা আপ্পারাও নতুন নাট্যকারদের প্রেরণা। যেমন **কাল্লাকুরি নারায়ণ রাও** যিনি পতিতা সমস্যা, মদ্যপানের কুফল ইত্যাদি নিয়ে নাটক লেখেন 'চিন্তামণি' (১৯২১) 'মধুসেবা' (১৯২৬) প্রভৃতি। পণপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর বিশিষ্ট নাটক 'বরবিক্রয়ম' (১৯২৩)। সাহিত্যিক গুণান্বিত নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য। **বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ** রচিত 'নর্তনশালা' (১৯২০) 'আনারকলী' (১৯২৩) 'ত্রিশূল'। প্রথমটিতে কীচকের হাত থেকে দ্রৌপদীর রক্ষা বিষয় বর্ণিত। 'আনারকলী' মোগল যুগের বিখ্যাত কাহিনী নিয়ে লেখা বিষাদ নাটক।

চিন্তা দীক্ষিতুলু (১৮৯০-১৯৬০) দুটো উচ্চমানের একাংক লিখেছেন। 'শবরী' (১৯২৫) ও 'অহল্যা' যাতে রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিভাবনার গভীর পরিচয় ফুটেছে।

স্বাধীনতার সংগ্রাম রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে নিয়ে নাটক লেখা হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ, বন্দেমাতরম মন্ত্র, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন নাট্যকারদের প্রভাবিত করে। **দামরাজু পুন্ডরীকাক্ষুডু** লেখেন 'গান্ধী মহোদয়' 'গান্ধী বিজয়' 'পাঞ্চাল পরাভব'। প্রথমটিতে বলা হল লোকমান্য তিলকের প্রয়াণ নবযুগের সূচনা করল, দ্বিতীয়টিতে নাগপুর অধিবেশন পর্যন্ত ইতিহাস, তৃতীয়টিতে কুখ্যাত জালিয়ানওয়ানাবাগের হত্যাকারী ডায়ারের উল্লেখ। **ডি. সীতারামাইয়া** লিখলেন 'স্বরাজ্য ধ্বজ' (১৯২১), **বি. পট্টভিরামাইয়া** লিখলেন 'মাতৃদাস্য বিমোচনমু' (১৯২৪), **মদ্দুরি অন্নপূর্ণাইয়া** লিখলেন 'চিচ্চু লপিডুগু' (অগ্নিকণা রাশি, ১৯২৯)**শ্রীপাদ কৃষ্ণমূর্তি** শাস্ত্রী লিখলেন 'তিলক মহারাজা' (১৯২২)।

২. প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব

ত্রিশের পরবর্তী নাট্য সাহিত্যকেই আধুনিক বলা যায়। আদর্শবাদ থেকে বাস্তববাদে তেলুগু নাটকের রূপান্তর ঘটে। একদিকে সমাজ রাজনীতির অভিঘাত অন্যদিকে পাশ্চাত্য নাট্য সাহিত্যের বুদ্ধিগত প্রভাব তেলুগু নাট্যসাহিত্যে নবীনতার সঞ্চার ঘটায়। "১৯৩০

পর্যন্ত যে সব নাট্যকার এসেছিলেন তাঁবা ছিলেন আদর্শবাদী। বিষয়বস্তু ছিল পুরাতন, নাট্যরীতিও। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে থেকে পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব তেলুগু নাটকে পড়ে। ইবসেনশ চেকভ টলষ্টয় প্রমুখ স্রষ্টাদের নাটক অধ্যয়ন করতে সুরু করেন লেখকরা। এদের প্রভাব নাট্যকারদের ওপর পড়ে।"[২] রোমান্টিকতা ও আদর্শবাদ অতিক্রম করে তীব্র বাস্তবতার প্রকাশ, নারীদের সামাজিক অবস্থান, তাদের উপর পুরুষ শাসিত সমাজের অত্যাচার ও তাদের অধিকার প্রসঙ্গ, হরিজন সমস্যা ও উচ্চবর্ণের মানুষদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ, দরিদ্র অবহেলিত কৃষকদের দাবি অর্জনের কথা : সমসাময়িক যুগের এই প্রবণতাসমূহ ত্রিশোত্তর তেলুগু নাটকে প্রতিফলিত হয়। এই নাট্যভাবনা চূড়ান্ত ও বিস্ফোরক রূপ পায় ১৯৪৪ এর গণনাট্য আন্দোলনে। আধুনিকতাব অন্যতম লক্ষণ মনোবিশ্লেষণ, জটিল দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ গভীর মানব মনকে উন্মোচিত করা। ত্রিশেব পরবর্তী তেলুগু নাটকে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে পি. ভি. রাজমান্নার আধুনিক পর্বের প্রথম নাট্যকার এবং তার নাটক দিয়ে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়।

"The modern Telugu plays commences with 'Tappevaridhi?' written by P. V. Rajmannar, a gifted writer. This full length play dealing with the status of women in society is at once inspiring and interesting "[৩]

আরেক সমালোচক বলেছেন — "পি. ভি. রাজমান্নারের 'তপ্পেবারিধি?' ১৯৩০ এর প্রথম বাস্তবধর্মী নাটক। এটা গদ্যে লেখা। সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এতে আছে। যৌবনের নতুন উন্মোদনা এতে জেগেছে। তাই এই নাটক 'বিদ্রোহের নাটক' রূপে প্রসিদ্ধ।"[৪]

পি. ভি. রাজমান্নার (১৯০১-১৯৭৯) মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিশ্ব চেতনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, যুগ ও জীবনের বার্তা নিয়ে, ইবসেনের প্রচণ্ড শক্তিমত্তাকে গ্রহণ করে তিনি আবির্ভূত হন। সমসায়িক সমাজজীবন থেকে তাঁর কাহিনী ও চরিত্র, এবং সমস্যা সমূহ আহরিত হয়েছে, বিচারকের তীক্ষ্ণ তীব্র বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাদের বিচার করেছেন এবং সুপরিকল্পিত রূপে প্রকাশ করেছেন। বঞ্চিত সমাজ - পরিত্যক্ত নারীরাই তাঁর নাটকে ভীড় করে এসেছে — তিনি এদের অন্তরের সৎ শুভ্র রূপকে উদ্ভাসিত করেছেন, এদের ওপর অত্যাচার অবিচারের কথা বলেছেন, এদের মুখে বিদ্রোহের ভাষা দিয়েছেন এবং ভণ্ড কাপুরুষ ক্লীব পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে এদেব অট্টহাসি ধ্বনিত হয়েছে। রাজামান্নারের বিশিষ্ট নাটকসমূহ হল : 'এমি মাগভাল্লু' (কোথায় পুরুষ মানুষ, ১৯৩১) পেশাদার নটীর গৃহবধূ হওয়ার সমস্যা; 'নিস্ফলম' — তথাকথিত অসতী নারীর মহৎ হৃদয়ের পরিচয়; 'সঙ্কল্পম পর্যবসনম' — প্রেম ও মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা; 'মাতৃপ্রেম — জটিল মনস্তত্ত্বিকতা যাতে মা তার অসুস্থ পুত্রকে হত্যা করে অসতী স্ত্রীর হাত থেকে তাকে মুক্তি দেবার জন্য; 'বিমুক্তি' — সমাজে বিধবা যুবতীদের অসহায় অবস্থা; 'তাপ্পে বারিধি (কার পাপে ১৯৩০) — নারীদের দুরবস্থা ও বৃদ্ধের তরুণী বিবাহের কুফল : এক বৃদ্ধের প্রথম পক্ষের যুবাপুত্রের প্রতি তার দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী র্ভাযা আকৃষ্ট হয় ও গভীর সংকট সৃষ্টি হয়; 'দেয়ালা লঙ্কা' (শয়তানের দ্বীপ) — শয়তান সমাকীর্ণ সমাজে বিধবা নারীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবন; 'পরকীয়া' — প্রচলিত রীতি বহির্ভূত সমাজধিকৃত প্রকৃত প্রেমের পরিচয়।

১৯৬০ এ লেখা রাজমান্নারের 'মনোরমা' নতুন করে নারীত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে। দেবদাসী মনোরমা আত্মবলে দীপ্ত হয়ে সব সমস্যার সমাধান করে।

গুডিপটি ভেঙ্কটচলম (১৮৯৪-১৯৭৯) এর নাটকে নারীজাতির সমস্যা-সংকট ও নারীদের প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। ফ্রয়েডের মনোবৈজ্ঞানিক ভাবনার দ্বারাও তিনি

প্রভাবিত। তাঁর 'পঙ্কজ' আপন স্ত্রীর মানবক্ষায় অসমর্থ এক পুরুষকে তীব্র ব্যঙ্গ। 'ঈর্ষা' তে নারী সমস্যার কথা। চলমের নাটকে নারীর মহিমা ও মর্যাদা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যা আধুনিক যুগ তথা নাট্য সাহিত্যের বিশেষ ধর্ম। তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট নাটক হল — 'চিত্রাঙ্গী' (পৌরাণিক), 'পদ্মারাণী' (১৯৪৩, ঐতিহাসিক), 'শশাঙ্ক' (তারা ও চন্দ্রদেবতার প্রণয় কথা), 'সাবিত্রী' (১৯৪৮, পৌরাণিক) যাদের মধ্যে চলমের বিশিষ্টতা ফুটেছে।

সামিনেনি মুদ্দুকৃষ্ণ র নাটকেও মনস্তত্ত্বের পরিচয় আছে, যেমন 'আশোক' যাতে রাম ও সীতার দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় আছে। তাঁর 'টি কাপ্পুলু তুফানু', (১৯৪০, চায়ের কাপে তুফান) বেদনাব ছোঁয়া লাগা কমেডি নাটক এতে সামাজিক মানুষের ব্যক্তিক সমস্যার প্রতিপাদন আছে। **মল্লাদি অবধানী** (১৯১৫) লেখেন 'গালিবান' (তুফান) যা নারীদের আর্থিক অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলে।

গান্ধীজীর আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়ে 'হরিজন সমস্যা' অবলম্বনে কটি নাটক লেখা হয় যা তেলুগু নাটকে নতুন প্রত্যয়ে গণচেতনা আনে। এই জাতীয় নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য — ধর্মবরম গোপাল আচার্যর 'অস্পৃশ্য বিজয়', কৃষ্ণ কৌডিন্যর 'নন্দনার', পি যজ্ঞনারায়ণ-এর 'নন্দনাব', তাড্রু সুব্রহ্মন্যশাস্ত্রীর 'পতিত পাবন', মুনিমানিক্য নরসিংহ রাও এর 'তিরুগুবাটু' (বিদ্রোহ)। শেষোক্ত নাটক অর্থাৎ 'তিরুগুবাটু' তে হরিজন সমস্যা বা অন্ত্যজ প্রসঙ্গ চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছে যখন হরিজনবা হিন্দুদের প্রতি বিদ্রোহী ভাবনায় জাগ্রত হয়েছে।

ত্রিশোত্তর সময়ে কৃষিজীবী মানুষ প্রথম উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়ে এল তেলুগু নাটকে। সি. সত্যনারায়ণ রচিত 'স্বেচ্ছাজীবলু' তে (১৯৩৭) কৃষক জীবনকে চিত্রিত কবার প্রয়াস আছে। সম্ববীসু রামা রাও এর 'রেতুবিড্ড' (কিষান) নাটকে কৃষকদের সমস্যাসমূহের আলোচনা, বিচার ও মানসিক ভাবনার পরিচয় আছে। নাটকের ভাষা চলিত ও সরল। গ্রামীণ ভাষার সুন্দর প্রয়োগ আছে। এ প্রসঙ্গে এম. সূর্যনারায়ণ রচিত 'কৃষিবল বিজয়' (১৯৩৫) ও শেষাদ্রি শর্মার 'হালিকোদ্ধারমু' (১৯৩৫) বিশেষ উল্লেখ্য।

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে নাটক।

প্রগতি লেখক সংঘ ও সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সমতা রেখে অন্ধ্রেও গড়ে ওঠে নতুন নাট্য আন্দোলন। সমস্ত দেশ প্রগতিশীল চেতনায় উদ্দীপিত হয়েছে, মার্কসবাদ প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। শোষিত নিপীড়িত মানুষ অন্যায় অত্যাচারের বন্ধনকে ছিন্ন করে জাগ্রত হয়ে উঠছে, সামন্ত প্রভু জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে, কৃষক মজদুর সর্বহারা মানুষ অর্জন করতে চাইছে আপনাদেব অধিকার। যে মজুর কলের চাকা ঘোরায় কারখানায় ওপর তার অধিকার বেশী, যে কৃষক হাল ধরে সেই হবে জমির মালিক — এই অধিকারবোধ তীব্র হয়ে দেখা দেয়। নাটকে তার অনিবার্য প্রতিফলন পড়ে।

১৯৪৪ মার্চ মাসে বিজয়ওয়াডায় 'অল ইন্ডিয়া কিষান কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয় যা রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেও জোরদার করে তোলে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সহযোগিতায় কিষাণ সভা সে সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান করে তা প্রগতিশীল ও বিপ্লবী নাট্য আন্দোলনের ধারাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায়। বুররা কথা, হরিকথা প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয়। অনেক বিধিনাটকম খোলা মঞ্চে রূপায়িত হয় যার মধ্যে উল্লেখ্য 'হিটলার পরাভবম'। ১৯৪৪ এর মার্চ মাসে বিজয়ওয়াডের কৃষক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত এই নাটক অগণিত দর্শকও উপভোগ করে। হিটলার নিজের সম্বন্ধে দাম্ভোক্তি করে যায় ও তার অনুগত এই ধনী কৃষক তাদের স্ত্রীরা সে সব কথা পুনরাবৃত্তি করে যায় এবং দর্শকরা মজা

পায়। কিন্তু চূড়ান্ত হয় যখন মুসোলিনী ও তোজো তাদের দুরবস্থার কথা বলে ও হিটলারের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে সুরু করে। দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ে।

এই সময়ে অন্ধ্রের বিভিন্ন স্থানে প্রগতিশীল নাট্যকার অভিনেতা মঞ্চশিল্পীরা অজস্র নাটক অভিনয় করেন যেগুলো প্রকৃত অর্থেই জনগণের নাটক। অন্ধ্র গণনাট্য সংঘ এ বিষয়ে অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নোক্ত নাটকগুলো বিশেষ খ্যাতি পায় — 'পশ্চাত্তাপম' (অনুতাপ) ২৫টি গ্রামে অভিনয় হয় ও অনুমানিক ৩৫,০০০ হাজার লোক দেখেন; 'প্রতিমা' বাংলার দুর্ভিক্ষর ওপর লেখা, দেড়শতর বেশী অভিনয় হয় ও আড়াই লক্ষ লোক দেখেন; 'মব্‌বু থেরা' (মেঘ ছায়া) মিলন ও ঐক্যর ওপর লেখা; 'পরিষ্টারম' এটা-ও একতার নাটক; 'ইলিয়া' রুশ একাংক নাটক ইলিয়ার অনুবাদ। তেনালি-তে প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে অভিনীত হয়; 'দেশভক্তলু' (ফোর কমরেডস এর অনুবাদ) ও 'অপ্রত্যাশিত মিলন' (তিঙ লিঙ এর -Unexpected Reunion এর অনুবাদ)। 'প্রেস ওয়ার্কার', প্রেস কর্মীর লেখা নাটক যাতে প্রেস কর্মচারীর দুঃখ দুর্দশাময় জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে, কাগজেব ওপর কন্ট্রোল কালোবাজারী ইত্যাদি প্রসঙ্গও আছে। অন্ধ্র গণনাট্য সংঘের দুটি শাখা এই নাটক অভিনয় করে। প্রেস কর্মচারীদের ইউনিয়ন যে সব শহরে আছে যে সব জায়গায এর অভিনয় হয়। রাজমুণ্ড্রীতে অনুষ্ঠিত অন্ধ্র ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্সে এর অভিনয় দেখেন দশ হাজার লোক। 'প্রসূথী' (প্রসূতি) - শিশু জন্মের আগে ও পরে মা ও শিশুর প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব নিয়ে এ নাটক লেখা। শিশু জন্মবার পর হাতুড়ে নার্সদের (ধাই) প্রয়োগ এতে নিন্দিত ও বৈজ্ঞানিক পথই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। গুন্টুরে মহিলা সমাবেশে এর অভিনয় হয় ও নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। মহিলা শিল্পীরা এতে অংশ নেন। সুঙ্কর সত্যানারায়ণ ও বাসিরেড্ডী রচিত 'মুন্দড়ুগু' (আগে কদম) কিসটনা আঞ্চলিক কিষাণ সভায় অভিনীত হয় ও বিপুল খ্যাতি অর্জন করে।[৫]

সুঙ্কর সত্যনারায়ণ (১৯০৯-১৯৭৫) ও **বাসিরেড্ডী ভাস্কর রাও** (১৯১৪-১৯৫৭) গণনাট্য আন্দোলনের দুই শ্রদ্ধেয় ও মহান শিল্পী। সামন্ত প্রভুদের জমিদারদের অত্যাচার পুজিপতিদের শোষণ সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। কিন্তু শেষ পর্যত রুখে দাঁড়ায় সর্বহারা মানুষ, অত্যাচারীর পরাজয় ঘটে, জয় হয় মানুষের : শোষিত নিপীড়িত সর্বহারা মানুষই অর্জন করে পৃথিবীর অধিকার। যুগের তথা ইতিহাসের এই অনিবার্যতা এই নাট্যকারদের রচনায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়েছে। এঁরা অনেক নাটক লিখেছেন, বিশেষ করে 'মা ভূমি' হয়ে উঠেছে শোষিত অত্যাচারিত মানুষের যন্ত্রণার কণ্ঠস্বর, বিদ্রোহের স্বরলিপি।

সত্যনারায়ণ ও ভাস্কর রাও এর 'মুন্দড়ুগু' (আগে কদম বা এগিয়ে চল ১৯৪৩) জমিদারী শাসনে এক কৃষকের জীবনের কথা বলা হয়েছে। জমিদারদের অত্যাচার প্রবল হয়ে ওঠে, দরিদ্র কৃষকের দুরবস্থা সীমাহীন হয় ও তারা শাসনে শোষণে পর্যুদস্ত হয়; এবং অত্যাচারের প্রতিবিধান কল্পে সঠিক পথে এগিয়ে চলে— সেই কাহিনী নাটকে আছে। এই নাটক অন্ধ্রের গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সামনে মহাসমারোহে অভিনীত হয়। গুন্টুর জেলার কিস্‌টনা কিষাণ সম্মেলনে চল্লিশ হাজার দর্শকের সামনে এই নাটক অভিনীত হয়। 'প্রজা নাট্যমণ্ডলী'র এই নাটক অন্ধ্র মঞ্চে যুগান্তর আনে।

'মা ভূমি' (আমাদের মাটি) তেলেঙ্গানার লড়াইয়ের পটভূমিকায় লেখা ঐতিহাসিক মর্যাদা সম্পন্ন বিপ্লবী নাটক। তখন তেলেঙ্গানা নিজামের অধীন ছিল। গ্রামকে শাসন করত দেশমুখ বা জমিদার, পাটওয়ারি ও আমিন : নিজামের গুণ্ডা রাজাকার বাহিনী এই অত্যাচার বাড়িয়ে দিত। নাটকের নায়ক বীরা রেড্ডী উচ্চবংশজাত হয়েও নীচুতলার

মানুষের সঙ্গী। সে কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত অন্ধ্র মহাসভার সঙ্গে যুক্ত, যারা গ্রামকে জমিদার প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে চায় ও চূড়ান্তভাবে নিজামের শাসন থেকে মুক্ত করতে চায়। নাটক সুরু হয় বন্দেগীর সমাধি প্রাঙ্গণে যেখানে গ্রামের সবলোক এসেছে, তারা জমিদার পাটওয়ারি আমিনের অত্যাচারে বিপর্যস্ত। তারা একটা সঙ্গম (সংস্থা) স্থাপন করতে চায়। বীরা রেড্ডী তাদের প্রধান। সেখানে কাঁদতে কাঁদতে আসে য়েল্লামন্দা যার ভেড়া আমিনের জন্য জোর করে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করলে সে মার খায়। সবাই ক্ষুব্ধ। গ্রামের জমিদার বা দেশমুখ জগন্নাথ রেড্ডী জানতে পারে গ্রামবাসীরা সঙ্গম গড়ছে। সে ব্রাহ্মণ পাটওয়ারিকে ডাকে। স্থির হয় সরকারকে দিয়ে কিছু করাতে হবে। এদের ওপর ট্যাক্স বসাতে হবে যা দরিদ্র কৃষকরা দিতে পারবে না, তখন নিজাম লোক পাঠিয়ে এদের মারবে ধরবে। সে অনুয়ায়ী ঘটনা চলে। দেশমুখরা পুলিশ ডাকে, কৃষকরাও সঙ্গম গঠন করে প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ করে। পুলিশ দেশমুখকে বলে তার জাতের বীরা রেড্ডীকে ডেকে বোঝাপড়া করতে, কিন্তু তা হয় না। আমিন গরিব মুসলমান চাষীদাদা সাহেবকে বলে — তুমি হিন্দুদের সঙ্গে আছ কেন? ওরা মুসলমান নিজামকে উচ্ছেদ করতে চায়। দাদাসাহেব বলে — গরিবদের জাত নেই, তারা সবাই এক। পুলিশ বীরা রেড্ডীকে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গম-এর সভ্যদেরও গ্রেপ্তার করবে। পুলিশ বীরা রেড্ডী বাড়ির দিকে যায়। দাদাসাহেব পুলিশকে বারণ করে ঘরে ঢুকতে, পুলিশ গুলী চালায়, সে মারা যায়। বীরা রেড্ডী স্ত্রী সীম্মা ছুটে যায়, সেও মারা যায়। বীরা রেড্ডীব বোন কমলা লঙ্কা গুঁড়ো ছোঁড়ে, পুলিশ থমকে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে ছুটে আসে সঙ্গম তথা গ্রামের লোকজন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে। দেশমুখের ঘরে আটক বীরা রেড্ডীও আসে। ক্রুদ্ধ জনগণের মুখোমুখী হয়ে দেশমুখ, আমিন ও পুলিশ পালায় — জনগণ এদের তাড়া করে। পাটওয়ারি ও কিছু লোক ধরা পড়ে, সবাই তাদের মারতে যায়। বীরা রেড্ডী তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলে। এভাবে গ্রাম মুক্ত হয়, মানুষ হয় স্বাধীন, নীচুতলার লোক তাদের জমি জমা ফিরে পায়। বন্দেগীর সমাধিতে নাটক সুরু হয়, শেষও হয় সেখানে।

বামপন্থী স্লোগান 'দুন্নে ওয়াডিদে ভূমি' বা 'যে চাষ করে জমি তার', এই নাটকে যথাযথ রূপায়িত হয়েছে। নাটকের উদ্দেশ্য লড়াইকে জোরদার করা, জনগণকে সচেতন করা, হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধন করা, নারীদের সংগ্রামের সাথী করা। নিজাম তথা অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে জনগণকে মুক্ত করতে হবে, তারা অর্জন করবে আপনাদের অধিকার এবং সেই লড়াইয়ে সংস্কৃতিও হবে তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্র যা অত্যাচারীকে উৎপাটিত করবে। এই নাটক সহস্রাধিক বার অভিনীত হয়, লক্ষ লক্ষ লোক এই নাটক দেখেন ও বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯৪৬ সালে সরকার এই নাটকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। নিজাম শাসিত তেলেঙ্গানা-র অন্তর্গত নাল্লাগোণ্ডা অঞ্চলে অন্ধ্র মহাসভা পরিচালিত গণ আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে লেখা এই নাটক তেলুগু তথা ভারতবর্ষের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। তবে ইতিহাসের স্রষ্টা প্রজা নাট্য মণ্ডলীর-র নাম পরবর্তী কালে আর বিশেষ শ্রুত হয় না।

৩. স্বাধীনতা উত্তর পর্ব

সাতচল্লিশে বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা এল। সাম্রাজ্যবাদী শাসক বিতাড়িত হল, ভারতবাসী আস্বাদন করল পরম মুক্তির স্বাদ। কিন্তু গান্ধীজীর রামরাজ্যের স্বপ্ন ব্যর্থ হল, স্বাধীনতা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারল না। অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অসাম্য, রাজনৈতিক বিভেদ ও জটিলতা প্রায় সবটাই রয়ে গেল যা জনজীবনকে ক্লিষ্ট পর্যুদস্ত করে তুলল। স্বাধীনতা পরবর্তী তেলুগু নাটকে তার প্রতিফলন পড়েছে।

"স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্ব ও পরে আর্থ- রাজনৈতিক সমস্যা তেলুগু মঞ্চে প্রবল হয়ে দেখা দেয় বিশেষ করে একটা অংশ হয়ে ওঠে 'কমিটেড'। প্রগতিশীল নাট্যকাররা শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতিতে তীব্র বিশ্বাসী ছিলেন।"[৬]

সুঙ্করের 'ভূমি কোসম' (জমির খোঁজে) ও 'গিত্তল বেরম' (গোরু বিক্রয়), বাসিরড্ডীর 'পোতু গডড' (জন্মভূমি) প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'ভূমি কোসম' এ পোড়ো জমিকে কৃষক অমানুষিক পরিশ্রমে ফসলপূর্ণ করে তুললে জমিদার তাকে ছলে বলে তাড়িয়ে দেয়। 'পোতু গডড' - তে সেই দেশমুখদের অত্যাচারের কথা। তবে সুঙ্কর ও বাসিরেড্ডী পূর্ণ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পাননি। মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্যা সংকট স্বাধীনতা পরবর্তী নাটকে দেখা যায়। নাট্যকাররা গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতির সঙ্গে আর্থিক সামাজিক দুঃখ যন্ত্রণায় জর্জরিত মধ্যবিত্ত মানুষের ছবি এঁকেছেন নাটকে; যেমন আত্রেয়, পিনিসেট্টি শ্রীরামমূর্তি। এতাবৎকালের ব্রিটিশ সৃষ্ট বিভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িকতরে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন নাট্যকাররা, হিন্দু মুসলমান মিলনের কথা শোনালেন নাটকে, যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তির কথা শোনালেন নাট্যকাররা। কখনো নারীত্বের মহিমা সূচিত হল তাঁদের নাটকে। কখনো রাজনীতির প্রবল ভূমিকা চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলাদলি সংকীর্ণতা প্রভৃতি তুলে ধরলেন নাট্যকার।

জীবনের বিচিত্র সুর ঝংকৃত হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী তেলুগু নাটকে, অনন্ত বিস্ময়ে তা হয়েছে উদ্ভাসিত। **আচার্য আত্রেয়** (১৯২১-১৯৮৯) স্বাধীনতা পরবর্তী তেলুগু নাট্য সাহিত্যের বিশিষ্টতম লেখক। আধুনিক যুগ ও জীবনের লক্ষণ তাঁর নাটকে সুন্দর ফুটেছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকণ্ঠ, শান্তির তিনি প্রবল সমর্থক, মানুষের দুঃখ বেদনার প্রতি তাঁর সুগভীর মমতা। ১৯৪৮-এ লিখিত 'ঈনাডু' (আজকাল) হিন্দু-মুসলিম একতার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে লেখা। দুপরিবার পাশাপাশি বাস করে। দুবাড়ির কর্তা পুরুষোত্তম ও আকবর অত্যন্ত বন্ধু, ভাইয়ের মত। কিন্তু তাদের ছেলে রাম ও রহিম অন্যরকম। ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট দুপরিবার আনন্দ উৎসবের আয়োজন করছে তখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের খবর আসে। সবাই একে অবহেলা করলেও রাম রহিম করেনা। দুপরিবারের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক থাকলেও প্রতিবেশীরা এসব সন্দেহ করে ও দুবাড়ির মধ্যের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক সংঘাত। আকবরের মেয়ে নসীমের বন্ধু বৎসলাকে কটি মুসলমান যুবক তাড়া করলে সে আকবরের বাড়িতে ছুটে আসে। আকবর ও নসীম তাকে সমাদারে রাখে, যদিও রহিম ইচ্ছুক নয়। গ্রামে আসা এক বিদেশী ব্যক্তি ডাক্তার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ছড়ায় ও হিন্দুদের বলে যে বৎসলাকে মুসলমানের ঘর থেকে মুক্ত করতে হবে। সে এ জন্য আকবরের বাড়ি গেলে বিতাড়িত হয়। কিন্তু রহিম ছুরি নিয়ে বৎসলাকে মারতে যায়, নসীম বলে যে আগে তাকে মেরে তবে বৎসলাকে মারতে হবে। তৃতীয় দৃশ্যে পুরুষোত্তমের বাড়ির লোক এক তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে জল দিলে হিন্দুরা পুরুষোত্তমকে আক্রমণ করে, আকবর ও নসীম তাদের বাঁচতে এগিয়ে আসে। এদিকে রাম ভাবে আকবররা অসৎ উদ্দেশ্যে বৎসলাকে আটকে রেখেছে। তার বাঁচার থেকে মরাই ভাল। সে আকবরের বাড়ি নিয়ে বৎসলার দিকে ছুরি ছুড়ে মারে। নসীম বৎসলাকে বাঁচায় কিন্তু ছুরি বেঁধে গান্ধীজীর গায়ে, যে ছবি রামই দিয়েছিল নসীমকে (উল্লেখ্য এই যে এই ঘটনার কয়েকমাস পর এক উগ্রতাবাদী হিন্দুর হাতে গান্ধীজী মারা যান)। এদিকে বৎসলা বাইরে গেলে তাকে খুন করা হয়, সঙ্গী রহিম তাকে রক্ষা করতে পারে না। আবার হিন্দুরা আকবরের বাড়ি আক্রমণ করে ও নসীম মারা যায়। রাম বাঁচাতে পারে না নসীমকে।

চারপাশে দুঃখ বেদনা, কেবল ডাক্তার আনন্দিত। হিন্দু ও মুসলমানদের হৃদয়ের সম্পর্ক পারস্পরিক প্রীতি ভালবাসা নাটকে সুন্দর ফুটেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিভেদপন্থীদের উগ্রতা ও ভয়াবহতাও যথাযথ রূপায়িত হয়েছে। এই নাটক অজস্রবার অভিনীত হয়েছে এবং নাট্যকার স্বয়ং রহিমের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

'এন জি ও' (নন গেজেটেড অফিসার) আত্রেয়র অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক। সরকারী অফিসে কর্মরত গোমস্তা বা কেরাণীর করুণ জীবনের কথা এখানে পাই। ব্যুরোক্রেটিক প্রথার শেষ ধাপে এই স্বল্প বেতনভুক কর্মভারাক্রান্ত অসহায় লোকটির অবস্থান, ঘরের জীবনও দুঃখের। সে স্বস্তিতে বাঁচতে পারে না ও মৃত্যুতেও শান্তি পাবে না সে বোঝে যে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যর থেকে কোন রকমে টিকে থাকাই জীবনের লক্ষ্য। দরিদ্র অসহায় মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের যথাযথ চিত্র-সমন্বিত এই নাটক তেলুগু নাটকের ইতিহাসে এক দিকচিহ্ন।[৭]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতাকে সামনে রেখে প্রবল যুদ্ধবিরোধী মানসিকতা প্রকাশ করেছেন 'বিশ্বশান্তি' ও 'অশোক' নাটকে। এই দুটি নাটকের চরিত্র প্রতীকী হয়ে উঠেছে। আত্রেয় এখানে যুদ্ধপ্রেমী ও যুদ্ধদ্বেষী দুয়ের সংঘাত দেখিয়েছেন এবং যুদ্ধের পরিণামে যে বীভৎস জাগতিক ও মানসিক পতন ও বিকার ঘটে তার ছবি এঁকেছেন। 'প্রগতি' নাটকে ভয়াবহ মানববিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণকারী এক বৈজ্ঞানিকের হত্যা দেখানো হয়েছে। আত্রেয় 'ভয়ম্' নাটকে ভয়ের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন। ভয় মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। যুগ অনুসারী হীন ভাবনার প্রবৃত্তি ভয়ের হেতু। ভয় অনেক রূপে আসে। ভয়ের জন্য সবাই নীচে মাটিতে পড়ে থাকে ও বিনাশের সম্মুখীন হয়। শংকর একমাত্র চরিত্র যার কোন ভয় নেই। ভীত ও ভয়হীন ব্যক্তিদের সংঘর্ষ নাটকে আছে। ভয়ের জন্য জীবন এগিয়ে যেতে পারেনা। ভয়কে অতিক্রম করে সামনে চলতে হবে তবেই জীবনে সার্থকতা আসবে। বিজয়ওয়াড়ার অন্ধ্র আর্ট থিয়েটার আত্রেয়র বিভিন্ন নাটকের সফল প্রয়োজনা করেছেন।

কোপ্পারাপু সুব্বারাও (১৮৯০-১৯৫৯) অন্ধ্রের নাট্য আন্দোলনের এক অগ্রণী পুরুষ। তাঁর 'তেলুগু লিটল থিয়েটার' নাট্য প্রবাহকে জোরদার করে তোলে। সুব্বারাও অনেক নাটক লিখেছেন, তার 'নোটনাটুড়ু' (আজকের অভিনেতা), 'চেসিনা পাপম' (যে পাপ করেছে), 'আল্লী মুঠা' (আলীর দল) প্রভৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় ও সারা দেশে অসংখ্যবার অভিনীত হয়। অপরোর ঢঙে লেখা 'আল্লী মুঠা'র কাহিনী মজার ও আকর্ষণীয় — একদল ডাকাত বনে লুকিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন শহরে এসে বিভিন্ন খবর নিয়ে গেল : ওখানে মানুষ প্রকাশ্যেই চুরি ডাকাতি করছে, অপরের ধন সম্পত্তি অপহরণ করছে। তখন দস্যুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সভ্য সমাজে মানুষ যদি চুরি ডাকাতি করে সবায়ের মধ্যে বাস করতে পারে তবে তারা কার ভয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে? তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ নাটকে আছে।

প্রিস্টলের 'অ্যান ইন্‌সপেকটর কল্‌স' অবলম্বনে 'ইনপতেরালু' লেখেন সুব্বারাও ও পরিচালনাও করেন। নাটকটি সারা অন্ধ্রে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও প্রকৃত থিয়েটারের মর্যাদা পায়।

কে. গোপাল রায় শর্মা সাম্প্রদায়িক অনৈক্য অসাম্যের বিরুদ্ধে আত্রেয়র মতই লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁর 'এক দেশম' নাটক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যা ব্রিটিশ সৃষ্ট বিভাজন ও দুঃশাসনরীতির চিত্র। এক সমাজ সংস্কারকের সমস্যা-সংকট উপস্থাপিত করেছেন 'এদুরীতা' (স্রোতের বিরুদ্ধে) নাটকে। এক গোঁড়া নীতিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুত্রের

সঙ্গে এক পতিতার প্রণয় ও পরিণয় নিয়ে যে সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হয় নাটকে তাই দেখানো হয়েছে। এক সৎ কিন্তু দরিদ্র মানুষের সংগ্রামকে গোপাল রায় শর্মা তুলে ধরেছেন 'ন্যায়ম' নাটকে।

নারলা ভেঙ্কটেশ্বর রাও (১৯০৮-১৯৮৫) আধুনিক সময়ের এক বিশিষ্ট নাট্যকার যিনি বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ সম্যক উপলব্ধি করেছেন ও তাদের দূরীভূত করারও প্রয়াস পেয়েছেন। হৃদয়ে গভীরতার সঙ্গে মননশীলতার মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর নাট্য ভাবনায়। মূলত গ্রাম জীবনের পটভূমিকায় সমাজের বিবিধ সমস্যা তুলে ধরেছেন। 'ভ্যানটেনা' (সেতু) নাটকে দেখানো হয়েছে কিভাবে একটি ছোট সেতু গ্রামের উন্নয়ন ঘটায় যা তাবৎ কালের সব ধারণা পালটে দেয়। এ নাটকের আবেদন ব্যাপক। 'প্রারব্ধম' সমাজে পুরুষদের অত্যাচারের কথা বলে। হিন্দুঘরে বিশেষত গ্রামে স্ত্রীরা পুরুষদের খেয়ালখুশীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই নাটকে স্বামী স্ত্রীর শরীরে দুরারোগ্য ব্যাধি ঢুকিয়ে দেয় এবং তাকে সারানোর বদলে তার বাবা মার কাছে পাঠিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে বলে 'যেখানে থেকে রোগ এনেছো সেখানে যাও'। মেয়ের বাপের বাড়ির প্রতিক্রিয়াও সুন্দর দেখানো হয়েছে। মেয়ের বাবা শাস্ত্র আওড়ায় ও জীবনের নশ্বরতার কথা বলে, মায়ের বুক ফেটে যায় মেয়ের দুঃখে, ক্রুদ্ধ ভাই তার দিদির ওপর অত্যাচারের বদলা নিতে চায়, ছোট বোন কম কথা বলে কিন্তু তার সরল মনেতে তীব্র বেদনা বাজে। নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচারের শিকার ঐ মেয়েটিক প্রতি পাঠকের মন সমবেদনায় ভরে ওঠে।

নারলার 'সীতা যোস্যাম' (সীতার ভবিষ্যবাণী) ১৯৮১ তে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পাওয়া প্রথম তেলুগু নাটক। নাট্যকার বিংশ শতাব্দীর সন্ধানী আলোক ফেলে প্রাচীন মহৎ সাহিত্যের যুগ জীবন ভাবনাকে আলোকিত বিশ্লেষিত করতে চেয়েছেন। রামায়ণ কাহিনী-ভিত্তিক ৫৪ পাতার এই ছোট নাটকটির ভূমিকা ১২৯ পাতার। নারলা বলেছেন যে রামায়ণের তিন-চতুর্থাংশ নিতান্তই কাল্পনিক, বাকী এক-চতুর্থাংশ রাজা রাজড়াদের ষড়যন্ত্র রাজ্য দখল ইত্যাদি প্রসঙ্গ। তাঁর মতে রাম কখনই বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করেননি, রাবণ একজন উপজাতীয় (গোণ্ড) রাজা বা শাসক, রাবণের লঙ্কা ও আজকের লঙ্কা এক নয়, রাম ও রাবণের সংঘাত নিতান্তই এক নারীকে নিয়ে নয়, তা হল অন্ন বা শস্য উৎপাদন অর্থনীতির সঙ্গে শস্য- সঞ্চয় অর্থনীতির সংঘাত (The confilict is between a food production economy and a food-gathering economy)).

নাটকে পাঁচটি চরিত্র আছে — রাম লক্ষণ সীতা ও দুজন ঋষি। সীতা চরিত্রই নাটকে প্রধান, সেই নাট্যকারের মুখপাত্র। বিতর্কিত এই নাটকটি বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

পিন্নিসেট্টি শ্রীরামমূর্তি (১৯২১) অনেকাংশেই গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় সমাজ ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন। 'পল্লে পড়ুচু' (গাঁয়ের মেয়ে, ১৯৫২) নাটকেও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের ছবি আছে যেখানে এক জমিদার অর্থ সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে এক নারীকে আকৃষ্ট করে ও আপন লালসা পূরণ করতে চায়। 'আন্না চেল্লেলু' (ভাই-বোন) নাটকে ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত হয়ে ভাইবোন মৃত্যু বরণ করে। 'আত্মীয়ুলু' নাটকও গ্রামীণ পটভূমিকায় স্থাপিত বিশেষত ধনী আত্মীয়ের ধন প্রাচুর্য আত্মীয়জনদের জীবনে কি বেদনা ও বিসংগতি রচনা করে সে কথা বলা হয়েছে। সহজ সরল গ্রামজীবন কিভাবে ক্লিষ্ট হয় সে কথা ও কথিত হয়েছে নাটকে।

কোডালি গোপাল রাও (১৯২২) নিম্নবিত্ত মানুষের ছবি আঁকায় পারদর্শিতা

দেখিয়েছেন। দরিদ্র কৃষক, সর্বহারা শ্রমিক, অসহায় কুলি তাঁর নাটকে এসেছে বারবাব। তার 'পেদা রায়তু' (গরীব কিষাণ, ১৯৫২) কৃষক জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যর ছবি। আঞ্চলিক তথা গ্রামীণ রাজনীতির অসংগতি ও বিচ্যুতিকে তুলে ধবেছেন 'চেয়ারম্যান', 'প্রেসিডেন্ট পট্টাইয়া' প্রভৃতি নাটকে কৌতুক পরিহাসের মাধ্যমে। পুঁজিবাদী সভ্যতার পরিণাম দরিদ্র অসহায় মানুষের শোচনীয় জীবন চর্চা যা ফুটেছে 'কুলী' (১৯৫৩) নাটকে। রায়লসিমাব দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় এই নাটক লেখা। অপরিমিত অর্থলোভ, ধনবাসনা মানবকে করে তোলে দানব। এই ভয়ংকর সত্যের উন্মোচন করেছেন কোডালি গোপাল রাও 'দোঙ্গা বীরডু' (সাহসী চোর, ১৯৫৮) ও 'লঙ্কেনা বিন্দেলু' (১৯৫৯) নাটকে। প্রথমটিতে দয়া মায়া বিসর্জন দিয়ে রাঘবরাও তার ছোট ভাইয়ের আদরের পুত্রকে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়টিতে ধনী কৃষক বিন্দেলু লোভের জন্য অকারণ নরহত্যাতেও দ্বিধান্বিত হয় না।

ডঃ কোররাপটি গঙ্গাধর রাও উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষের চিত্রাঙ্কনে দক্ষ। তিনি খ্যাতিমান পরিচালকও। পারিবারিক সাংসারিক জীবনের ঘটনাবহুল দ্বন্দ্বসমাকীর্ণ পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন 'গুড্‌ডিলোকম' (অন্ধ পৃথিবী, ১৯৫৫), 'না বাবু' (আমার ছেলে) প্রভৃতি নাটকে যা ডঃ রাজা রাও, কে. ভেঙ্কেটেশ্বর রাও প্রমুখ শিল্পীরা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। 'নিজরূপালু' (নিজ পরিচয়) নাটকে দেখানো হয়েছে আদর্শ কর্তব্য প্রেম ভালবাসার ওপর যে যৌথ পরিবারের ভিত্তি, বর্তমান আর্থিক সমস্যা সংকট ও স্বার্থপর সংকীর্ণতা তাকে নষ্ট করে দেয়। সাতের দশকের একটি বিখ্যাত নাটক 'যধা প্রজা তধা রাজা'-র (যেমন লোক তেমনি রাজা) বক্তব্য হল যে মানুষ তাদের উপযুক্ত নেতাই পায়। মানুষ সচেতন হলে তবেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। নাটকটি লিখেছেন **কোররাপটি।** দণ্ডধরণ এক ধনী জোতদার ও ধূর্ত রাজনীতিবিদ যে সরকারের কাছে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছে কো-অপারেটিভ সোসাইটি সমূহের নামে যাদের প্রকৃতই কোন অস্তিত্ব নেই। তার অপকর্মের কথা সরকারের কাছে পৌছলে একজন অফিসার পাঠানো হয় অনুসন্ধানের জন্য। অফিসার গ্রামে এসে সব বুঝতে পারে এবং কাগজপত্র দেখতে চাইলে দণ্ডধরণ তাকে হত্যার ভয় দেখায়। দণ্ডধরণের চাকর অফিসারকে সমর্থন করলে দণ্ডধরণ তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। পুলিশ গ্রামে এলে কেউ সাক্ষ্য দেয়না। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় যখন দণ্ডধরণের মেয়ে তার বাবাকে হত্যা করে। নাটকটি ১৯৭৬ সালে অন্ধ্র প্রদেশ সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পায়।

'ই রোড্‌ড এক্‌কডিকি?' (এ রাস্তা কোথায় গেছে) নাটকে ডঃ গঙ্গাধর রাও আধুনিক পঞ্চয়েত রাজ ব্যবস্থাকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। একটা গ্রাম সম্বন্ধে খ্যাতি আছে যে সেখানকার জমির ফসল সুমিষ্ট লাগে। কিন্তু এক ডাক্তার মাটি পরীক্ষা করে বলে যে ঐ মাটিতে উৎপন্ন ফসল খেলে পেটের বিভিন্ন রোগ হয়। কিন্তু পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ ডাক্তারকে উৎকোচ দিলে সে মিথ্যা কথা বলে। শেষ পর্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ যুবক সত্য এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ও প্রকৃত সত্য উদঘাটিত করে দেয়।

বুচ্চিবাবু (শিবরাজু ভেঙ্কট সুব্বারাও ১৯১৬-১৯৬৭) সমাজভাবনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করতে চাইলেন। তিনি জীবনের পতন ও লাঞ্ছনার কারণ খুঁজলেন কেবল সমাজে নয়, মানুষের মনেও। বুচ্চিবাবু শিল্পে আনলেন তেলুগু ক্লাসিকের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল পাশ্চাত্য নাট্যসংস্কৃতিতে তাঁর গভীর জ্ঞান। 'তিষ্যরক্ষিতা' নাটকে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্রাট অশোকের ধর্মবিশ্বাসের জীবনবিমুখ ও নীতিবাগীশ মতাবাদকে চিত্রিত করে। নাটকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে রাজা অশোকের যুবতী রানীর

ট্রাজিক জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে যে প্রচলিত নীতি নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। 'ওমর খৈয়াম' নাটকে বিশিষ্ট দার্শনিক কবির জীবন ও ভাবনার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। 'দারিনি পোয়ে দনায়্যা' (১৯৫২, পথচলতি লোক) এক জনপ্রিয় নাটক যাতে কৌতুককর ভাবে এক তরুণ সমাজকর্মীর কার্যবিধিকে তুলে ধরে ও কিছু সমসাময়িক লোকের নির্বুদ্ধিতাও প্রকাশ করে। 'আত্ম বঞ্চনা' (১৯৫১) অজস্র অভিনীত হয়েছে ও অন্ধ্র নাটক কলা পরিষদ ১৯৫০ তে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেয়। মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করেছেন নাট্যকার ও নির্ণয় করেছেন জীবনের অন্তনির্হিত বেদনা। নাটকের নায়িকা ঘরে অতিথি যুবকের সঙ্গে প্রেম করে। কিন্তু সেই নারীর কল্যাণের জন্য যুবক আত্মহত্যা করে। কেউ নিজের মনের কথা অপরকে বলতে পারে নি — নিজের মনেই যেন ভালবেসেছে। নাটকে ব্যঙ্গ-ও প্রবল হয়ে ওঠে কখনো।

বুচ্চিবাবু বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাও করেছেন নাটক নিয়ে। 'তেরা পড়ি না নাটকমু' (নাটকের পর্দা পড়ে না) এক রাজার কথা যে সব জ্ঞানকে একটি মাত্র বাক্যে ধরবার জন্য বলেছিল কারণ তার চারপাশের অজস্র গ্রন্থ জীবনের এই অল্প সময়ে পড়া অসম্ভব। তার প্রকৃত জ্ঞান জন্মায় অনেক পরে ও মরবার সময়ে নিজের বিদূষকের কাছে সে বিদ্রুপ বাক্য শোনে। 'নালুগো পরিমানসু' (চতুর্থ ডাইমেনশন বা মাত্রা) বিবাহের পূর্ব রাত্রে এক অঙ্কবিদের মানসিকতার উদ্ভাসন ঘটায়। তার মনের এক অদ্ভুত প্রজেকশন বা অভিক্ষেপ ঘটে যার দ্বারা অজাত ভবিষ্যতকে সে দেখতে পায় — সে দেখে তার বিয়ে হয়ে গেছে ও সে এক সন্তানের জনক। 'মনসা বাচ' পরীক্ষামূলক নাটকে প্রতিটি চরিত্র যখন কথা বলে আর একটি অন্তঃস্বরও শোনা যায় সেই নাটকের যেটা হল প্রকৃত সত্য যা অনুভব করা হয় কিন্তু বলা হয় না।

'গোলুসু' (শৃঙ্খল) নাটকে মানুষের সর্ববিধ শৃঙ্খল মুক্তির কথা বলা হয়েছে — 'আ গোলুসু - মানুষ্যিউলা সারিহাদ্দু - মানুষ্যিউলা দ্বেষানিকি সারিহাদ্দু। আ গোলুসু তেগাগোট্টি আদ্বেষাম আনে সারিহাদ্দুলু দাটিতেগানি মানুষ্যিউলু বাগু পাডাবু' অর্থাৎ এই দ্বেষের শৃঙ্খল মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, ষড়যন্ত্রে পৃথক করে, মানুষ একে না ভাঙ্গলে মুক্তি পাবে না।

অনিসেট্টি সুব্বারাও (১৯২২-১৯৭৯) রাজনৈতিক দলাদলি ও সংকীর্ণতার ছবি এঁকেছেন যার ফলে সমাজ জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দলবাজী গ্রামীণ জীবনকে কতটা বিপর্যস্ত করে 'মা বুরূ' (আমাদের গ্রাম) নাটকে অনিসেট্টি তা দেখিয়েছেন। স্কুল শিক্ষক শিবশঙ্কর এই সংঘর্ষে প্রাণ দেয়। চেতনা এই নাটকের নায়ক—তার বেদনা এতে প্রকাশিত। অন্য এক ভাব ও রূপের পরীক্ষা ধর্মী নাটক 'গালিমেডলু' (হাওয়া মহল)। মানুষ আশাবাদী। সে জন্য সে কল্পনালোকে বিচরণ করে। সাধারণ মানুষ স্বপ্ন দেখে ও শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণ করে। মানব স্বপ্নের এই করুণ মধুর চিত্র ফুটেছে 'গালিমেডলু' নাটকে। অন্ধ্র আর্ট থিয়েটার, বিজয়ওয়াড়া এই নাটককে মঞ্চস্থ করে।

বোয়ী ভীমান্না (১৯১১) প্রবলভাবে সমাজ সচেতন। নীচু তলার মানুষ, শোষিত নিপীড়িত মানুষ তাঁর নাটকে বারবার এসেছে এবং গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গে তিনি এদের কথা বলেছেন। তার 'রাগ বশিষ্টম' ধ্রপদী সামাজিক নাটক যা প্রাচীন ভারতবর্ষে হরিজনদের অবস্থা চিত্রিত করে। সঙ্গে সঙ্গে ঋষিদের উদারতাও দেখানো হয়েছে। অরুন্ধতী বশিষ্ঠ পত্নী, এক অন্ত্যজ পরিবারের নারী হয়েও তার সদগুণ ও ভক্তিতে বড় হয়েছেন। ভীমান্নার 'পডিপোতুন্না আড্ডুগোডালু' (বাধার পড়ন্ত দেওয়াল) একাংকও এবিষয়ে উল্লেখ্য। নাটকে বর্ণিত হয়েছে বৈদিক যুগে হরিজনদের অবস্থা, পরের

যুগে তাদের পতন ও উত্থান। নাট্যকার বলতে চে'ছেন যে 'সবর্ণ' ও 'অবর্ণ' দের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে হরিজনদের সুখ-দুঃখ।

'পালেরু' নাটকে গ্রাম জীবনের ছবি সুন্দর ফুটেছে। 'কুলী রাজু' এক কুলীর দুঃখময় জীবনের চিত্র।

বেল্লামকোণ্ডা রামদাসু (১৯২৩-১৯৬৯) সমাজ সচেতন নাট্যকার। এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত নারীত্ব অপমানিত হয়, নাট্যকার তাই ব্যক্ত করেছেন। 'অতিথি' নাটকে যন্ত্র এবং মানুষ, ন্যায় এবং অন্যায়ের সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে। নাটকে নায়কের কোন নাম গোত্র নেই, সে গরিব এবং তার নাম হল 'ও' বা 'সে'। সে অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করে এবং অর্থবান বদমায়েশ লোক টাকার জোরে তাকে হত্যা করে। 'পুনর্জন্ম' (১৯৫৬) নাটকে পতিতা নারীর অবস্থা অংকন করা হয়েছে। রাক্ষস প্রেম ও দিব্য প্রেমের সংঘাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত দিব্যপ্রেম জয়ী হয়। পূর্ব পরিচয় গোপন করে এক পতিতা নারী এক চিকিৎসককে বিয়ে করে। কিন্তু তার পূর্ব পরিচিত এক ব্যক্তি তার পরিচয় প্রকাশ করবার ভয় দেখিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করে। কিন্তু চিকিৎসক এই খবর জানালেও অপরিসীমে ঔদার্যে সেই নারীকেই গ্রহণ করে ও তার পুনর্জন্ম হয়।

অবসরাল সূর্যরাও রচিত 'পঞ্জরম' নাটকও নারীর পতন নিয়ে লেখা। এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীর পদস্খলন ঘটে কিন্তু তার এই পরিণতির জন্য তার স্বামীর দায়িত্ব থাকে। 'পুনর্জন্ম' ও 'পঞ্জরম' প্রায় সমভাবসম্পন্ন, এই নাটক দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় ও ১৯৫৫ থেকে প্রায় ১৯৭০ পর্যন্ত অসংখ্য অভিনয় হয়। সম্প্রতিকালেও এদের জনপ্রিয়তা কমেনি। এরা নরনারীর গভীর ও আবেগময় সম্পর্ক চিত্রণে সার্থক।

রবি কোণ্ডলরাও হাস্যরসাত্মক নাটক রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। জীবন ও সমাজের জটিলতা, কৌতুককর অসঙ্গতিকে তিনি তুলে ধরেছেন হাস্য পরিহাসের মাধ্যমে। যেমন— 'নালগিলুল চাবডি' (বারো ভাড়াটের বাড়ি), 'পাট্রালু তপিনা বণ্ডী' (লোইনচ্যুত গাড়ী) প্রভৃতি নাটক। তবে 'কুক্কা পিল্লা দোরি কিণ্ডি' (কুকুরটি পাওয়া গেছে) কৌতুক ব্যঙ্গে সামাজিক অসংগতিকে ব্যক্ত করে। ষাটের প্রথম দিকে এসব নাটক বেশ জনপ্রিয় হয়।

এস. এম. ওয়াই. শাস্ত্রী-র নাটকে কৌতুক ব্যঙ্গের পরিবর্তে স্যাটায়ারের তীক্ষ্ণতা পাওয়া যায়। সামাজিক অন্যায় অসংগতিকে তিনি তিক্ত আঘাত করেছেন। তাঁর 'কল্যাণী' 'পেড্ডা মনিসি' 'এররা টেপু' (রেড টেপ বা লালফিতে) প্রভৃতি নাটক এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ভমিডিপাটি রাধাকৃষ্ণ (১৯৩১) পাঁচের দশকে আলোড়ন ফেলেছিলেন 'কীর্তিশেষুলু' নাটক রচনা করে। একজন কবি শিল্পী জীবদ্দশায় যে মূল্য পায় মৃত্যু হলে তার মর্যাদা আরো বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতির অপব্যবহার করে কিছু লোক যারা মৃতকে শ্রদ্ধা জানাতে অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। একদিকে বেদনা অন্যদিকে বিদ্রুপ এই নাটককে বিশিষ্ট করেছে যা অনেকটা ইবসেনীয় ঢং পেয়েছে। ভমিডিপাটির ইবেসেনের অনুবাদও জনপ্রিয় হয়। 'পিলার্স অফ দি সোসাইটি' তিনি অনুবাদ করেন 'সংঘনায় কুলু' নামে। সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে লেখা 'দৈব শাসনম' (দৈব বিধান) নাটকের বিষয় হল বিবেক ও উদগ্র লালসার দ্বন্দ্ব। জগন্নাথমের মেয়ে কমলার বিয়ে ঠিক হয়েছে বিশাখ রাও - এর ছেলে শঙ্করমের সঙ্গে। ঘুসখোর বিশাখ রাও ও তার স্ত্রী পণস্বরূপ অনেক টাকা চায়, যদিও শঙ্করম তা জানেনা। জগন্নাথমের লোভী স্ত্রী কনকম ও বদমায়েস শ্যালক ভুজঙ্গম সরকারী অফিসার জগন্নাথমকে প্ররোচিত করে ঘুস নিয়ে ঐ পণের টাকা দিতে। প্রথমে প্রতিবাদে

করলেও জগন্নাথম 'একবার মাত্র' টাকা নেয়, কিন্তু তা অনেকবার হয়ে দাঁড়ায় যে সব ফাঁদ পাতে তার স্ত্রী ও শ্যালক। কিন্তু জাগতিক ও দৈব বিধানে এর পরিণাম ভাল হয় না। জগন্নাথমের ছেলে মদ্যাপান জুয়া কুসঙ্গলিপ্ত হয় ও পতিতালয়ে মারা যায়। শয়তান ভুজঙ্গম দুপরিবারের ক্ষতি করলেও আইনের জালে ধরা পড়ে। কনকম-ও ভয়ংকরী হয় ও প্রায় পরিত্যক্ত হয়। নাটকে পণপ্রথা, ঘুষ নেওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ আছে।

৪. সাম্প্রতিক পর্ব

অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন ধারার অনুবর্তন করলেও সাম্প্রতিক তেলুগু নাটক নূতনতর বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হচ্ছে। অতি আধুনিক তেলুগু নাট্যকার বাস্তববাদী দৃষ্টিতে জগৎ জীবনকে দেখেছেন, বৈজ্ঞানিকের সচেতন সন্ধানী মর্মভেদকারী দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু বিচার করেছেন, সমাজ বৈষ্যমের কারণ নির্ণয় করেছেন, শত্রুকে সঠিক চিহ্নিত করেছেন এবং সমস্যা সমাধানের পথ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। ষাটের মাঝামাঝি থেকে তেলুগু নাটকে এই প্রবণতা দেখা যায়।

আসে সত্তর। পিণাকেতে টংকার লাগে, দিগন্তে বজ্রধ্বনির রুদ্ররোষ শোনা যায়, স্ফুলিঙ্গের বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো দাবানল সৃষ্টি করে। ১৯৭৩ এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিরসম' — বিপ্লব রচয়িতাল সংঘম, বিপ্লবী শিল্পী সাহিত্যিকদের যে বিখ্যাত সংস্থার পরিচালনায় ছিলেন মহাকবি শ্রীশ্রী, কে. ভি. রমন রেড্ডী, চেরাবাণ্ডারাজু প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকগণ। বিদ্রোহের নাটক শ্রেণী সংগ্রামের নাটক রচনা করলেন শিল্পীরা, শ্রেণীশত্রুর প্রতি ঘৃণা তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হল তীব্র ভাবে, দুনিয়াটাকে পালটে দিয়ে শাসন শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের দুর্বার বাসনা এদের রচনায় প্রবল হয়ে উঠল। আধুনিক তেলুগু নাটক এভাবেই হয়ে উঠেছে বিদ্রোহের থিয়েটার, ঘৃণার স্বরলিপি, সংগ্রামের গান।

'বিরসম'-এর সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য আর এক বিপ্লবী সাহিত্যিক সংগঠন গড়ে ওঠে 'জন সাহিতি সাংস্কৃতিক সমখ্যা'। বিরসম-এর মুখ পত্র 'সৃজনা'র (সম্পাদিকা পি. হেমলতা) মত এদেরও পত্রিকা প্রকাশিত হয় 'প্রজা সাহিতি' (জনগণের সাহিত্য) যার সম্পাদক হলেন কে. রবিবাবু। বিপ্লবী মৌলিক নাটকের সঙ্গে দেশী-বিদেশী অনুবাদ নাটকও এতে প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যকারদের মধ্যে আছেন গুরশরণ সিং (ইনকিলাব জিন্দাবাদ-পাঞ্জাবী থেকে অনুবাদ, বিজয়ানন্দ, ১৯৮১), বুল্লিমুনতা নাগেশ্বর রাও (কুক্কালনি করচিনা-খরগোস কামড়েছে কুকুরকে, ১৯৮২), কে. সত্যনারায়ণ (বিমুক্তি) প্রমুখ। বৈপ্লবিক রাজনৈতিক ভাবনা ও দর্শন এদের নাটকে পাওয়া যায়।

লোক-উপাদানের সুন্দর ব্যবহার সাম্প্রতিক নাটকে পাওয়া যায়। তেলুগু নাট্যকাররা ঐতিহ্য থেকে উপাদান উপকরণ নিয়ে নাটকে তার প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন। মিথ ইত্যাদিতে নতুন ভাবনা সঞ্চারিত হচ্ছে; বিধি নাটকম, বুররা কথা প্রভৃতি লোকরীতিও ব্যবহৃত হচ্ছে। সূত্রধার বিদূষক প্রভৃতি ধ্রুপদী থিয়েটারের উপদানও নতুন করে প্রয়োগ করছেন শিল্পীরা। সব উপদানের সমন্বয়ে গঠিত এই শিল্পরূপকে অত্তিলি কৃষ্ণ রাও মনে করেন 'টোটাল থিয়েটার'।[৮]

রাচকোণ্ডা বিশ্বনাথ শাস্ত্রী (১৯২২) পেশায় আইনবিদ এবং তাঁর বিভিন্ন রচনায় পেশাজাত জীবন অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। তিনি কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন, স্বল্প কিছু নাটক তিনি রচনা করেছেন যেখলো তেলুগু আধুনিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। 'নিজম' 'বিষাদম' (একাংক) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ্য নাট্য প্রয়াস। 'নিজম' (সত্য ১৯৬২) নাটকে সত্যের দর্পণে সমাজের মুখ বিম্বিত হয়েছে। 'অল্পজীবী' নামক উপন্যাসের

ভূমিকায় তিনি বলেছেন — "আমি অ্যাডভোকেট। আদালতে প্র্যাকটিস করি। কোর্ট-এ যাওয়ার কদিনের মধ্যে আমি বুঝতে পারি বর্তমান সমাজের চালক রূপে যে সব শক্তি আছে তারা হল দুরাচার, অন্যায়, মিথ্যাচার ও লুণ্ঠন। আমি বুঝতে পারলুম ন্যায়ের জন্য সত্যের জন্য কেউ যদি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে কোন লাভ হবে না — ভগবান চান বা না চান তিনি গরীবদের কোন সাহায্য করবেন না। 'নিজম' 'বিষাদম' প্রভৃতি রচনায় আমার দুঃখ প্রকাশ করেছি"।[৮(ক)]

'নিজম' নাটকের কাহিনী নাট্যকারের তীব্র সচেতন মানসিকতা যথার্থই প্রকাশ করে। এক প্রতিপত্তিশালী নেতা (এম পি) সার্বভৌম রাও জানতে পারলেন তার প্রণয়িনী সুশীলার সঙ্গে এক সামান্য যুবক সোমসুন্দরমের প্রণয়ের কথা। একদিন তার বাড়িতে এদের দুজনকে দেখে তিনি সোমসুন্দরমকে পুলিশের হাতে দেন। ইতিমধ্যে খবর আসে তার পানোন্মত্ত পুত্র একটা পিকনিক পার্টিতে সত্যমকে খুন করেছে। তিনি এক ঢিলে দুপাখী মারতে চাইলেন। তিনি চক্রান্ত করে সোমসুন্দরমকে সত্যমের হত্যাকারী সাজিয়ে পুত্রকে রক্ষা ও সুশীলাকে আয়ত্ত করতে চাইলেন। বিচার সুরু হয়। অন্যতম প্রধান সাক্ষী সুশীলা সোমসুন্দরের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা স্বীকার কবে ও বলে যে হত্যাকাণ্ডের সময় তারা সার্বভৌমরাও-এর বাড়িতে ছিল। কিন্তু চতুর কৌশলী পাবলিক প্রসিকিউটারের কথা যুক্তি তর্কের জালে সুশীলা জড়িয়ে পড়ে, তার ভাষণে স্ববিরোধিতা দেখা যায়। আদালত মনে করে সোমসুন্দরমই আসল হত্যাকারী। আসামীর উকিলের সত্য নির্ণয় করার আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়, মিথ্যা জয়ের মুকুট পরে নির্দোষ মানুষকে ফাঁসি কাঠে ঝোলায়। সত্যের মৃত্যু ঘটে। এভাবেই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায়নীতি ধর্ষিত হয়, মানবতা হয় পরিহাসের বস্তু, মিথ্যার কালো ভয়াল হিংস্র হাত সত্যকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। ১৯৬০ এ লেখা 'তিরস্কৃতি' এক অত্যাচারিত নারীর বেদনাকে তুলে ধরে। কিন্তু যখন সেই অপরাধীকে বাধ্য করা হয় মেয়েটিকে গ্রহণ করতে, মেয়েটি তা প্রত্যাখ্যান করে। একটা পশুর সঙ্গে বিবাহিত জীবন কাটানোর চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো অনেক ভালো — এটা সে বুঝতে পেরেছে।

নোকারাজু নন্দী (১৯৩৩) সমাজ সচেতন বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও নাট্যকার। তার 'আরণি' নাটক ১৯৭২ সালে অন্ধ্র প্রদেশ সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পায়। 'মারো মহেঞ্জোদারো' (আর এক মহেঞ্জোদারো ১৯৭০) ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় অনূদিত হয়। ষাটের মাঝামাঝি থেকে এই নাটক অগণিত বার অভিনীত হয়েছে। নাটকের বিষয়বস্তু সুন্দর ও আঙ্গিক নতুন রীতির। নাট্যকার সভ্যতার আদর্শ মহেঞ্জোদারোর পতন ও তার কারণ দেখিয়েছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন আর এক সভ্যতার-ও কেমন পতন ঘটছে অর্থাৎ বর্তমান সভ্যতা কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নাটকে আছে বৈজ্ঞানিক যে ভবিষ্যৎ মানব। ভবিষ্যৎ থেকে সে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছে। সে মানবজাতি নিয়ে গবেষণা করেছে। দেখেছে মানুষের সভ্যতা তার রীতিনীতি। সে দর্শকদের বলে, দেখুন অতীত সভ্যতা (অর্থাৎ বর্তমান) কিরকম ছিল ও কিভাবে তারা নিজেদের পতন ঘটিয়েছে। বৈজ্ঞানিক একটা করে সুইচ টেপে ও একজন করে চরিত্র আসে যারা এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল। তারা শুরু করে তাদের জীবন কথা, আরম্ভ হয় নাটক। চরিত্ররা হল বড় ব্যবসায়ী, শ্রমিক নেতা, লোভী মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি। ব্যবসায়ী যে কোন প্রকারেই হোক টাকা বাড়াবে, শ্রমিক নেতা প্রতিবাদ করবে, লোভে লালসায় সাধারণ মধ্যবিত্ত উগ্র হয়ে ওঠে। শেষ পরিণাম হয় শোচনীয়। ব্যবসায়ীর চক্রান্তে শ্রমিক নেতা মারা যায়, লোভী মধ্যবিত্তর স্ত্রীকে ব্যবসায়ী প্রলুব্ধ করলে সে ব্যবসায়ীকে মারাত্মক আঘাত করে এবং

নিজেও মৃত্যু আঘাত পায়। বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাও আত্মহননকারী। এক সর্বনাশা বিপর্যয় ঘটে, যেন সভ্যতারই মৃত্যু ঘটে যায়। ভবিষ্যৎ মানুষ বৈজ্ঞানিক অতীতের অর্থাৎ বর্তমানের ছবি দেখায় - কীভাবে মানুষ নিজেদের সভ্যতার বিনাশ ঘটিয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শোষণ অত্যাচার আত্মকেন্দ্রিকতা নীচতাই এর জন্য দায়ী। ভেসে আসে গানের সুর —

মারুগু পাডিত্তি ওকা মহিধরম
স্মরণীয় বিজয় ধরাধরম
পুরাতন মনুজ পুরোগমনামন
মারপুরোনিদি মহেঞ্জোদারো।

অর্থাৎ-বৃহৎ পর্বত (অর্থাৎ বৃহৎ সভ্যতা) মুছে গেছে পৃথিবী থেকে কিন্তু তা স্মরণীয় হয়ে আছে। তেমনি করে বর্তমান সভ্যতা মরে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে লোক বলবে এ আর এক মহেঞ্জোদারো। নোকারাজু নন্দীর 'পুণ্যস্থলী' (১৯৬৯)-তেও সামাজিক শোষণের নির্মম চিত্র পাই। পুন্যস্থান মন্দিরে সমাজপতিদের পাপ ও অন্যায় কাজ অবাধে চলে তাকে পংকিল করে তোলে ও এদের শাসনে শোষণে সাধারণ মানুষ কি প্রবল ভাবে নির্যাতিত নিষ্পেষিত হয় নাটকে তা দেখানো হয়েছে। মন্দিরের ক্রূর চতুর শয়তান মালিক জগন্নাথ স্বামী তার যোগ্য অনুচর মন্দির পুরোহিতের মাধ্যমে বিশাল পাপচক্র নির্মাণ করে — তারা ধর্মশালার যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নেয়, কর্মী শ্রমিককে অভাব অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় ও তার স্ত্রীকে উন্মাদিনী করে; বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক চিদাম্বরমকে বিতাড়িত করে জগন্নাথের অযোগ্য অপদার্থ শ্যালককে পুণ্যস্থলী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কবে, মন্দির সংলগ্ন গৃহাদি নির্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে, সর্ববিধ অত্যাচারে লিপ্ত থাকে। অধ্যাপক ও উন্মত্ত হয়ে যাওয়া নারী এদের অন্যায় কাজে বাধা দিতে চাইলে তাদের আঘাত করে ও অধ্যাপক মারা যায়। শাসন শোষণ ক্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার এক নিখুঁত চিত্র নাটকে অংকিত।

এস. কাশী বিশ্বনাথ সমাজের শাসন শোষণ অবক্ষয়ের কথা বলেছেন তীব্রভাবে। তাঁর নাটকে জোতদার জমিদার মহাজনদের বর্বর পাশব মানসিকতার ছবি ফুটেছে। সমাজের ন্যায় নীতি ধর্ম মানবিকতাকে অবহেলা অগ্রাহ্য করে এরা মানব পীড়ন ও অত্যাচারের নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে — ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ ও ভয়ানক সময়ের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে এরা ইতিহাসের অনিবার্য গতি রুদ্ধ করতে চেয়েছে। নাট্যকার 'গরীবী হটাও' নাটকে একে রূপ দিতে চেয়েছেন। জমির সীমা বেধে দেবার জনকল্যাণমূলক আইন হবার কথা শুনে জমিদার তার বিশাল জমির কিছুটা বিক্রী করে; শুধু জমি রাখবার জন্য কাগজে-কলমে স্ত্রীকে ডাইভোর্স করে তাকে জমির ভাগ দেয়, যদিও স্ত্রী কেবল জমির জন্য তার সতীত্ব নারীত্বকে এভাবে অপমানিত করতে একেবারেই চায় না; অন্য নিকট পরিজনদেরও এভাবে কৌশল করে জমি দেওয়া হয়। কিন্তু তার অধীনস্থ এক কর্মচারী যাকে এই জমিদার পীড়ন করেছে, কর্মচ্যুত করেছে, সর্বরিক্ত করেছে, এই কাজের প্রতিবাদ করে পুলিশকে খবর দেয় ও এই অত্যাচারী রক্ত শোষক নারীপীড়নকারী মহাজনদের স্বরূপ সে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু তার বিদ্রোহী কণ্ঠ স্তব্ধ হয় তাকে জমিদারও তার লোকেরা মেরে ফেলে - বলে গ্রাম থেকে গরীবী হঠেছে। কৃষিজীবী ভারতবর্ষে সমন্ততান্ত্রিক বর্বরতার চিত্র নাটকে সুন্দর ফুটেছে। কাশী বিশ্বনাথের অপর নাটক 'ওকা দীপম ভেলিগিন্দি' (একটা আলো জ্বলল) নাটকও সমাজের সুন্দর ছবি।

গোল্লাপুডি মারুতি রাও (১৯৩৯) ছাত্রাবস্থা থেকে অভিনয়ে ও নাটক রচনায় দক্ষতা

দেখিয়েছেন। 'কমনীয় কল্পনা-কৌশলের সঙ্গে প্রখর আলোচনা বোধ তাঁর নাটকে প্রয়োজনীয় সৌষ্ঠব দান করেছে।'[৯] তার নাটক 'রাগরাগিনী' 'করুনিচনি দেবতলু' এবং একাংকসমূহ 'অনন্তম' 'পতিতা' 'প্রশ্ন' 'রেনডু রেল্লুলু আরু' 'আশয়ালকু সংকেল্লু' (শৃঙ্খলিত আশা) প্রভৃতি বিবিধ স্থানে সগৌরবে অভিনীত ও সংবর্ধিত হয়েছে। 'কাল্লু' (চোখ) নাটকে তিনি সমাজ ভাবনার নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। নাটকের প্রধান চরিত্র ভাঙ্গা মন্দিরে বসবাসকারী পাঁচ অন্ধ ভিক্ষুক — পেদদাইয়া, করীম মিয়া, রজিগাড়ু, রংগড়ু এবং মেয়ে সীতালু। এরা একত্র সহৃদয়তা ও আন্তরিক নৈকট্যের সঙ্গে থাকে। শহরে এক বড় চক্ষু চিকিৎসক এলে এরা এদের সমগ্র ভিক্ষালব্ধ অর্থ এক করে সর্বকনিষ্ঠ রংগড়ুকে বেছে নেয় যার চোখকে ঠিক করা হবে। রংগড়ু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। কিন্তু এদের দেখে সে ঘৃণায় দূরে সরে যেতে চায়। সে পুরাতন মালিক সিংহাচলামের মত এদের শোষণ করতে আরম্ভ করে ও এদের ভিক্ষান্ন থেকে বঞ্চিত করতে চায়। সে সীতালুর যৌবন দেখে প্রলুব্ধ হয় ও একদিন জোর করে তাকে ভোগ করতে গেলে প্রবল ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় ও মন্দিরের ত্রিশূল তার চোখে লাগলে সে আবার অন্ধ হয়। লজ্জিত ধিকৃত রংগড়ু আবার এদের মধ্যে ফিরে আসে।

এই নাটকের তাৎপর্য কী? এটা সমাজের যথাযথ চিত্র। অথবা এর বক্তব্য এই যে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত সমাজের দুর্বলতাই অন্ধত্ব ও নেতার হাতে সব ক্ষমতা অর্পণ করলেও তাদের প্রতারণা ও বেদনা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। বৃহত্তর সমাজকে বাদ দিয়ে একক মানুষের মুক্তি বাসনা ও উন্নয়নপ্রয়াস ব্যর্থ হয়, তা ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি কারুরই কল্যাণ সাধন করে না — এই সত্যের দিকেও লেখক অঙ্গুলি সংকেত করতে পারেন এই নাটকে।

অংগর সূর্যরাও (১৯২৮) সহজ জীবনের শিল্পী। হাসিকান্না আনন্দবেদনা সমন্বিত জীবনের চিত্রণে ইনি পারদর্শী, কখনো রূপক প্রতীকে বক্তব্যেকে বিস্তরিত করেছেন। তার 'নীলি তেরলু', 'সংসার সাগবম', 'রণরঙ্গ', 'কালকন্যা' নাটক বিখ্যাত হয়েছে। 'শ্রীমতুলু-শ্রীযুতুলু', 'স্বপ্নসীমা', 'চতুর্মুখুলু', 'স্ত্রীলকু প্রত্যেংক' প্রভৃতি একাংকও বিশেষ পরিচিত। 'নীলি তেরলু' (নীল পরদা, ১৯৫৯) নাটকে দেখানো হয়েছে সংসার রূপ রঙ্গমঞ্চে মানুষ অভিনেতা। সবায়ের একত্র অভিনয় (তথা স্থিতি) পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারে।

সূর্য রাও এর হাস্যরস নিষিক্ত কল্পনা ধরা পড়েছে 'এক ঘন্টার গৃহস্থী' নাটকে। অবিবাহিত যুবক কামরাজু বাস করার উপযোগী বাড়ি পাচ্ছে না। শিবরামাইয়ার বাড়িতে ঘর খালি থাকলেও সে অবিবাহিত কামরাজুকে ঘর ভাড়া দেবে না। কামরাজুর বন্ধু পাপারাও এক অভিনেত্রী বাজেশ্বরীকে কামরাজুর স্ত্রী সাজিয়ে আনলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাটকে তাই দেখানো হয়েছে। এ নাটক অনেক অভিনীত হয় ও ১৯৭৩ সালে আকাশবানীর বিজয়ওয়াড়া কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়।

পরুচিউরি-র লেখা 'সমাধি কাড়ুটুন্নম চন্ডা লিড্ডনডি' (একটা সমাধির নির্মাণ হবে — দয়া করে অর্থ দিন) এ সময়ের রাজনীতিকে সমালোচনা করে। রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতারা বলে যে নীচুতলার সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। কিন্তু সেই নীচুতলার মানুষ ক্ষমতা অর্জন করলে তাকে দাবিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। দরকার হলে তাকে সরিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনা এবং সেই অপরাধীরা নিহত ব্যক্তির স্মৃতিতে ফলক তৈরীর জন্য টাকাও সংগ্রহ করে।

টি শেষচলপতির নাটকে মনস্তত্ত্ব প্রাধন্য পেয়েছে। তার 'রুদ্ধ বাসনা' নাটকে দেখা যায় অধ্যাপক মনোহরের উপন্যাস 'সাগর সংগ্রাম' সর্বত্র অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত হয়েছে।

অধ্যাপক মনোহর শান্ত সৎ মানুষ কিন্তু তার উপন্যাসের চরিত্র ক্রূর সেন পাশবিকতার ভয়াল আচরণে ভয়ংকর চিন্তা ও কর্মে পাঠককে শিহরিত করে। লেখকের অনুরাগীরা এই সৃষ্টির স্বরূপ তাঁর কাছ থেকে জানতে চায়। একদিন অকস্মাৎ ক্রূর সেন অধ্যাপক মনোহরের কাছে আসে, সে জানতে চায় কেন এভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে বলে আসলে সে লেখকের অবদমিত রুদ্ধ বাসনারই সৃষ্টি — মনোহরের আদিম বর্বর মন সামাজিক অনুশাসনে চাপা পড়েছে বাইরে প্রকাশ পায় নি; যা তার সৃষ্ট ক্রূর সেনের ভয়ংকর ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্রূর সেন আজ প্রতিশোধপরায়ণ, সে পৃথিবী ধ্বংস করবে। ভীত ত্রস্ত মনোহর আতঙ্কে জেগে ওঠে — ক্রূর সেন মনোহরের নিদ্রাজাগর তন্দ্রাচ্ছন্ন রূপের মধ্যে এসেছে, বাস্তবে নয়। মনোবিকার তথা মনোবিকলনের এক আশ্চর্য রূপ নাটকে প্রকাশিত।

আদিবিষ্ণু বিশ্বেশ্বর রাও (১৯৪০) উপন্যাস লিখেছেন, সিনেমা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিচিত। বেশ কটি একাংক ও পূর্ণাঙ্গ তিনি রচনা করেছেন। সহজ সুরে জীবনের কথা তিনি বলেছেন, পারিবারিক সংকট ও সামাজিক সমস্যা তার নাটকে বার বার এসেছে। তাঁর বিখ্যাত 'চুড়ু চুড়ু নীডালু' (১৯৭০, দেখ দেখ ছায়া) অন্ধ্র জ্যোতি সাপ্তাহিক পত্রিকা আয়োজিত দীপালী একাংক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায়। ধনবান ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথম মাতৃহীন পুত্র বসবরাজুকে গভীর যত্ন ও ভালবাসায় মানুষ করে। কি এক অপরাধবোধ তার বুকে বাসা বেধেছে যে কথা জানে সে আর পুরাতন ভৃত্য পেরু। কিন্তু আঘাত আসে অনুগত পুত্রের কাছ থেকে। সে দময়ন্তী নামে এক মেয়েকে বিয়ে করতে চায় যে জানতে পেরেছে বসবের পিতার গোপন কাজের কথা। বসবরাজুও রূঢ়ভাবে জানতে চায় সব। অপমানিত ও অনুতপ্ত জগন্নাথ ব্যক্ত করে পুরাতন জীবনের কথা। সে তরুণ বয়সে বারণসীতে গিয়ে এক তরুণী পার্বতীকে গোপনে বিয়ে করে ও শিশুসন্তান সহ পার্বতীকে রেখে চলে আসে যাদের কোন খবর আর সে পায়নি। এগিয়ে আসে জগন্নাথমের প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিশ্বাসভাজন বাসুদেব রাও। সে হতভাগিনী পার্বতীর পুত্র। মায়ের সুতীব্র বেদনা ও অপমান বুকে রেখে সে জগন্নাথের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল তাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করে। মিলনেই নাটকে শেষ হয়। দময়ন্তী প্রসঙ্গ মিথ্যা, বাসুদেবের নির্দেশেই বসবরাজু ওকথা বলেছিল।

'ভাল্লিদ্দারিতু ভীল্লু মুগ্গু' (তিনজন লোক ও দুজন লোক, ১৯৭৯) এক সামাজিক উপাখ্যান — ধনী ও দরিদ্র বন্ধুদের কথা, তাদের বন্ধুত্ব অবিশ্বাসের টানাপোড়েনে গঠিত। দুই ধনী রামবাবু ও চিন্নার তিন গরীব বন্ধু-শাস্ত্রী, শ্রীহরি ও কোগুল রাও আছে যারা বড়লোক বন্ধুদের পয়সায় আনন্দ উৎসব করে ও তাদের স্তুতি করে চলে। এরা কি সত্যি বন্ধু। চিন্না বলে যে শাস্ত্রীরা গরিব হলেও যথার্থ তাদের বন্ধু, কিন্তু রামবাবু তা মানে না। তারা শত্রুতার ভান করে এবং শাস্ত্রী প্রমুখ তিনজন প্রত্যেকের সামনে প্রশংসা ও অপরের নিন্দা করতে শুরু করে। রামবাবুই জেতে কারণ এই তিনজন প্রকৃত বন্ধু নয়। সবায়ের বন্ধুত্ব ভেঙে যায়। আরেক জটিলতা আসে! রামবাবু ও চিন্না চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রতিযোগিতা করবে — এবার তারা সত্যই পরস্পরের শত্রু। এরা আলাদা ভাবে সমর্থনের জন্য তিন বন্ধুর কাছে আসে যারা দুজনকেই সমান প্রশংসা করে। রামবাবু ও চিন্না বিপদে পড়ে। দরিদ্র বন্ধুরা আর ধনীদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না এবং তাদের সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করে না। সামাজিক মানুষদের স্বার্থপ্রণোদিত ভাবনা ও পারস্পরিক ঈর্ষা বিদ্বেষ সমাজকে কলুষিত করে — এটাই নাটকের বক্তব্য। আদি বিষ্ণুর 'এনটেনটা দূরম' (কত কত দূর) সামাজিক নাটক। সমাজের সমস্যা সংকট শোষণ পীড়নের চিত্র।

শিক্ষিত সমাজে বেকারী কি ভয়াবহ ও উঁচুতলার মানুষরা কেমন এক হয়ে অত্যাচার করে সাধারণ মানুষের ওপর তা দেখানো হয়েছে। বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ যদিও প্রকাশ কিছুটা লঘু হয় পড়েছে।

য়েণ্ডামুরি বীরেন্দ্রনাথ (১৯৪৮) অন্ধ্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। সাহিত্যিক রূপে প্রতিভাবান ও সম্মানীয়। নাট্য রচনাতেও বিরল ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোটবড় মিলিয়ে অন্তত পঁচিশটা নাটক লিখেছেন যেগুলো বিষয়বস্তু প্রকাশ রীতির ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে। সমাজই তাঁর নাটকের পটভূমি, বিভিন্ন সমস্যা সংকটে ক্লিষ্ট মানুষ তাঁর কুশীলব। সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত তার নাটকে এসেছে প্রবল ভাবে, অঙ্গিকের ক্ষেত্রেও নবনবোন্মেষশালিনী ক্ষমতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

'গুলাক রল্লু গুলাবি মল্লু' (১৯৬৮) বেকার সমস্যার ওপর ভিত্তি করে লেখা। দুই ভাইকে অবলম্বন করে সামাজিক সংকটের তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে। চরমপন্থী পথের কথাও ব্যক্ত হয়েছে নাটকে। 'মানুষুলোস্তুন্নারু জাগ্রত' (১৯৭৮, সাবধান মানুষ আসছে) নাটকে বেকার সমস্যার ভয়াবহতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দুর্নীতির ছবিও ফুটেছে। তিন সৎ শিক্ষিত তরুণ গান্ধী, রেড্ডী ও জনি চাকরি না পেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে যায়। এক অপরিচিত ব্যক্তি তাদের বলে যে এ ভাবে মরার কোন মানে হয় না, এবং বিদ্রোহও অসম্ভব কারণ তা নিষিদ্ধ হয়েছে দেশ থেকে — তা আছে কেবল ছাত্রদের হৃদয়ে ও জঙ্গলে, এখন সৎ অসৎ যে ভাবেই হোক টাকা রোজগার করতে হবে। বন্ধুরা অসৎ পথে না গিয়ে বিষই খায়, কিন্তু মরে না — কারণ তাতে ভেজাল। জনি ও গান্ধী চুরি জুয়াচুরী করে টাকা রোজগার করতে যায় কিন্তু রেড্ডী বুট পালিশ করে। একদিন রেড্ডীকে দিযে জুতো পালিশ করিয়ে পয়সা না দিলে রেড্ডী জনিকে মারতে যায়। জনি বলে এভাবে যদি রেড্ডী টাকা ছিনিয়ে নিতে পারে ভালই হয়। দেখা গেল পূর্বের সেই ব্যক্তি টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে। গান্ধী দেখে সেটা তার বাবার ব্যাগ, তাতে তার বোনের বিয়ের টাকা আছে। সে টাকা ছিনিয়ে নিতে চাইলে তাকে ছুরি মারে, সবাই পালায়, রেড্ডী যাবার সময় দর্শকদের বলে যে সে যাচ্ছে পুলিশের ভয়ে নয়, যাচ্ছে মানুষ আনতে যারা প্রকৃত মানবিক গুণসম্পন্ন ও যাদের সহানুভূতি ভালবাসা আছে মানুষের প্রতি। পাঁচ হাজারের-ও বেশী বার এই নাটকের অভিনয় হয়েছে।

'কুক্কা' (কুকুর ১৯৭৮) পরীক্ষামূলক নাটক, তেলুগুতে প্রথম একসপ্রেসানিস্টিক নাটক। মঞ্চে কোন প্রপ বা উপদান না থাকলেও পরিবেশ রচিত হয়। নাটকে দাসপ্রথার ভয়াবহতা দেখনো হয়েছে, ভয়াবহ অত্যাচারে ক্রীতদাসরা কিভাবে শেষ হয়ে যায় নাটকে তাও দেখনো হয়েছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে জনগণকে জাগ্রত করতে লেখক বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

'জলতরঙ্গিনী' (১৯৭৯) বক্তব্য ও আঙ্গিক দুদিক থেকেই নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। যক্ষগণের আধুনিক রীতি অনেকটা ব্যবহৃত হয়েছে, এসেছে সূত্রধার। নাটকের বিষয়বস্তুও অভিনব। হিংসা ও শান্তির মধ্যে সংঘাত নাটকে আছে। একদিকে আছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, অন্যদিকে নকশালপন্থী বিপ্লবী। কিন্তু এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। এরা দুজন 'পরকায়া প্রবেশ' করে যেন আত্মা পরিবর্তন করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী মন্ত্রী কি এখন জঙ্গলে যাবে আর বিপ্লবী যুবক কি ক্ষমতায় আসবে! কোন সমাধান হয় না। তখন সূত্রধার এগিয়ে এসে বলে যে শক্তি বা অবস্থান নয়, পুরো সমাজব্যবস্থা না পালটালে কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

'রুদ্রবীণা' (১৯৮০) নাটকেও সামাজিক ভাবনা দীপ্ত হয়েছে, অন্যায় অত্যাচারের

বিরুদ্ধে নাট্যকারের ক্রোধ প্রবল হয়েছে। 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' নাটকের জন্য তিনি ১৯৮১ তে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। এটা তিন ভাইকে অবলম্বন করে সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা-সংকটের তীব্র ছবি। বড় ভাই রঘুপতি নিরীহ শিক্ষক, ছমাস মাইনে না পেয়েও চুপচাপ, সে নাটক ভালবাসে; মেজভাই রাঘব গ্রাজুয়েট বেকার, ভাল লেখে; ছোট ভাই রাজারাম কারখানা কর্মী, শ্রমিকনেতা, বিপ্লবী। রাঘব কারখানা-মালিক মানিক্যরাওয়ের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য মাণিক্যরাও তাকে মেয়ে দেবে না। রঘুপতি নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে দেখে সবটাকা একজন নিয়ে চলে গেছে ও নাটক হয় না; ক্রুদ্ধ দর্শকরা তাকে প্রবল মারে। জানকী মঙ্গলসূত্র বিক্রী করে চিকিৎসার টাকা যোগাড় করে। এই দারিদ্র্য দেখে আহত ব্যথিত রাঘব ফিল্মে যোগ দেয়। সে প্রচুর টাকা রোজগার করে। রাজারামের নেতৃত্বে শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধর্মঘট করে, কিন্তু আর তারা রাজারামকে মানবে না, তারা কারখানায় আগুন দেয়। রাজারামের ওপর দোষ পড়ে, সে পালায়। ইতোমধ্যে বিত্তবান রাঘবের সঙ্গে মানিক্যেরাওয়ের ভাল সম্পর্ক হয়েছে, সে মেয়ের সঙ্গে রাঘবের বিয়ে দেবে। সে রাঘবকে আমন্ত্রণ করে পরম আত্মীয়ের মত, রাজারামের খবরও পায়। কিন্তু সে বলে এক ভয়ংকর কথা — বিয়েতে বাধা দেওয়ায় তার মেয়ে মরে গেছে, প্রতিশোধ নেবার জন্য মানিক্যরাও এদের সঙ্গে মিশেছে ও জানতে পেরেছে রাজারামের সন্ধান যাকে তার লোকেরা মারতে গেছে। তাই হয়, রাজারামকে মানিক্যরাওয়ের লোকেরা হত্যা করে। দুঃখ মনস্তাপে উন্মত্তপ্রায় রাঘব ঘর ছেড়ে চলে যায়। রঘুপতি একা নির্জন নিঃসঙ্গ। সমাজ ভাবনার সঙ্গে মানব হৃদয়ের গভীর উন্মোচন নাটককে বিশিষ্ট করেছে।

বৈপ্লবিক ভাবনার শিল্পী অত্তিলি কৃষ্ণরাও (১৯৩৮) অভিনয় ও নাট্যরচনা দুয়েতেই পারদর্শী। তিনি একজন নাট্যতত্ত্ববিদও বটেন। কৃষ্ণরাও গভীর ভাবে সমাজ সচেতন — সামাজিক মানুষের দুঃখবেদনা যন্ত্রণাদাহ তিনি দেখেছেন, বিশেষ করে নীচুতলার মানুষ তাঁর নাটক বারবার এসেছে মানবিক পরিচয় নিয়ে এবং অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। 'দগাপডিন চেল্লেলু' (প্রতারিত বোন) 'ই বসসু ইক বেল্লদু' তাঁর বিখ্যাত নাট্যরচনা। এদের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় হয়েছে। রেডিওতেও বেশ কয়েকবার সম্প্রচারিত হয়েছে তাঁর নাটক।

'যুগসন্ধ্যা' নাটকে সামাজিক অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র চমৎকার ফুটেছে — এটা উচুতলার মানুষ ও তার সহযোগী শাসকদের অত্যাচারে পীড়িত সাধারণ মানুষের করুণ বেদনার কাহিনী। ছোট ছেলে রামুডু অসুস্থ বাবা ও ক্ষুধার্ত ভাই বোনদের জন্য আট আনার সবজি কিনে যাচ্ছে, পুলিশ অপ্পলস্বামী তাকে তাড়া করে ও চোর বলে ধরে। তবে আট আনা পয়সা পেলে সে ছেড়ে দেবে। আদর্শবাদী যুবক সত্যম প্রতিবাদ করে। আর এক পুলিশ এসে ভাগ চায়। সমাজের বিশিষ্ট মানুষ বরহালু পুলিশের সাহায্যে অন্যায় কাজ করে থাকে। তার চোরাই মাল আনতে হবে। সে ঐ পুলিশকে, ও রামুডুকে খুঁজতে আসা অসুস্থ সিংহাচলমকে অর্থের প্রলোভনে মিথ্যা ভুলিয়ে তার মাল আনতে পাঠায়। মাল নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে সিংহাচলম ফেরে। এমন সময় দারোগা আসে ও সব বুঝেও সিংহাচলমকে চোর বলে ধরে নিয়ে যায়। সত্যম এই সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে প্রবল আঘাত করে। আহত যন্ত্রণাকাতর সত্যম দর্শকদের আহ্বান করে এই সমাজ ব্যবস্থাকে পালটাতে বলে, অন্যায় অত্যাচারকে আমূল উৎপাটিত করতে বলে। তাঁর সম্প্রতিকালের নাটক 'তুরুপু রেখালু' (পূর্বের রেখা বা আলো) পার্বত্য আদিবাসী অঞ্চলের মানুষের ওপর অত্যাচার নির্যাতন নিয়ে লেখা যারা শেষ পর্যন্ত অর্থবান

কুসীদজীবীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামিল হয়। অত্তিলি কৃষ্ণরাও শ্রীকাকুলামের নকশাল বাড়ি আন্দোলন থেকে এই নাটকের প্রেরণা পান। প্রয়োগে পুরাতন লোককথা রীতির প্রয়োগ আছে এবং নাটকের সূত্রধার (যমকুল বাদু) নাটকের বিদ্রোহী চরিত্র হয়ে ওঠে।

গণেশ পাত্র (১৯৪৫) আধুনিক বিদ্রোহী তেলুগু নাট্যকারদের মধ্যে স্মরণীয় নাম। তিনি নাটককে অস্ত্র মনে করেন ও লড়াই করে সমাজটাকে পালটাতে চান। 'পাবলা' (সিকি - চার আনা, ১৯৬৫) নাটক দিয়ে তার সাহিত্য সাধনা সুরু যা সর্বত্র সমাদৃত হয় ও ইউনেস্কো সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নাটকে নীচুতলার মানুষরা এসেছে তাদের যথাযথ জীবন নিয়ে। একটি অতিদরিদ্র ও তাদের মত করে সুখী জেলে পরিবারের একজন একটা সিকি পায় ও সকলেই সেটা দাবি করে এবং নিজেদের সম্পর্ককে ভুলে গিয়ে ঝগড়ায় মেতে ওঠে। কিন্তু দেখা গেল ওটা অচল। 'আগণ্ডি কোনচেম আলোচিনচান্ডি' (একটু অপেক্ষা করুন ও ভাবুন) নাটকে ক্রীতদাস প্রথার ভয়াবহ রূপ দেখানো হয়েছে। কোন সময় মালিক টাকা ধার দিয়ে কিনেছিল দাস-কে। পুরুষানুক্রমেও তা শোধ হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত জাগ্রত সচেতন দাস বিদ্রোহ করল, কিন্তু মালিক চক্রান্ত করে তাকে জেলে দেয়, একটা পরিবার ধ্বংস হয়। লেখক এই অবস্থার পরিবর্তন চান — তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল উৎপাটিত করতে চান এবং এই আদর্শ সংবেদনশীল বিচারদক্ষ পাঠক তথা দর্শকের চেতনায় সঞ্চার করে দেন।

'অসুর সন্ধ্যা' নাটকেও সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত দুর্নীতি পচনশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। গ্রামের দুই প্রধান পরস্পরের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতা করে কে গরিবদের বেশি ঠকাবে, পীড়ন করবে ও আইনকে নিজেদের স্বার্থে লাগাবে। তারা শহরে আসে বিশিষ্ট আইনজীবীর কাছে যে এদের দুজনকে প্রতারিত করে। সেই আইনজীবী আবার তার পুত্র ও অন্যদের দ্বারা প্রতারিত হয়। এই ভাবে প্রতারণা ও উৎপীড়নের চক্র চলতেই থাকে।

'মল্লী মধুবনম' (আবার বসন্ত ১৯৭৯) অনেকটা পারিবারিক নাটক — এক মেয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা ও মনোবিকল্পন এবং এক পুরুষের ব্যর্থ ভালবাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উমার বিয়ে হয় ধনী কণকরাজুর সঙ্গে যদিও উমার সঙ্গে ভীমাশংকরের আবাল্য নিকট সম্পর্ক। ভীমাশংকর উমাকে গভীর ভালবাসলেও উমা তাকে সে ভাবে দেখে না। উমা প্রথম স্বামী গৃহে যাবে এমন সময় খবর আসে কণক মারা গেছে। সকলে বিস্মিত ব্যথিত। কিন্তু উমা নয়। এদিকে উমার এক সন্তান হয়। সেই সন্তানের পিতা কে? কণক তো এ বাড়িতে আসেনি। ভীমাশংকর বলে যে সে-ই সন্তানের পিতা (যদিও প্রকৃত তা নয়। উমার জন্যই এ কথা সে বলেছে)। ভীমা এ অবস্থাতেও উমাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু উমা রাজি নয়। উমা বলে যে তার স্বামীই ছদ্মবেশে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এদিকে কণকরাজু ফিরে আসে, বলে এক জটিল পরিস্থিতিতে সে তার মৃত্যু সংবার ঘোষণা করেছিল (যদিও সম্ভবত সে কোন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত)। ভীমা চলে যায় অনেক দূর। কণকরাজু বুঝতে পারে উমার প্রতি ভীমার আকর্ষণের কথা। সেও চলে যায়। মিলনের পূর্ণতা এল না।

ধাবল সন্ন্যাসী রাও (১৯৪৩) পেশায় সিভিল ইনজিনিয়ার কিন্তু নাটকের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। সামাজিক অন্যায় অবিচারের কথা তিনি বলেছেন এবং তার অবসান চেয়েছেন। সাধারণ মানুষ, দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের সপক্ষে তিনি লেখনী ধারণ করেছেন এবং তাদের অধিকারের কথা বলেছেন। 'কিউ' (১৯৮১) ব্যঙ্গাত্মক কাহিনীতে রেশন দোকানের সামনে প্রতীক্ষারত মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে নাট্যকার সমাজ ব্যবস্থার একটা যথাযথ চিত্র তুলে ধরেছেন। রেশন দোকানের সামনে লোকরা অপেক্ষা করছে, প্রহরারত

পুলিশ টাকা নিচ্ছে, 'সাট্টা' লেখা চলছে — একজন রেশন কার্ডকেই বাজী রেখেছে, কিন্তু সারা দিন অপেক্ষা করেও রেশন পাওয়া গেল না। কাজকর্ম গেল, দিন নষ্ট হল, এখন ভাবনা কি খাওয়া হবে! ডক শ্রমিকদের নিয়ে লেখা 'সিপ্পোচিণ্ডি' (জাহাজ এসেছে) জনপ্রিয় হয়। তাঁর অন্যান্য নাটক 'পান্ধিকোককুলু' (ছুঁচো) 'রেপুনিরে' (আগামী কাল তোমাদের), 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' প্রভৃতি নাট্যকারের সমাজ সচেতন মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

সুব্বারাও পাণিগ্রাহী (১৯৩৩-১৯৬৯) মহান বিপ্লবী এবং যথার্থই জনগণের শিল্পী ছিলেন। কেবল তত্ত্বগতভাবে তিনি মানুষের লড়াইয়ের কথা বলেন নি, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন। "বিপ্লবী গান ও নাটকের মাধ্যমে তিনি নিজে নিপীড়িত জনতার কাছে মুক্তির ডাক পৌঁছে দিয়েছেন। সঠিক ভাবেই তিনি কৃষিবিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে নিজের লেখাকেও এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। গণসংগ্রামের ক্ষেত্রে এক হাতে অস্ত্র ও অন্য হাতে কলম নিয়ে এগিয়ে পাণিগ্রাহী প্রমান করে গিয়েছেন যে লেখকের দায়িত্ব কেবলমাত্র লেখার মধ্যেই সীমিত নয় বরং নিজেকে গণ-সংগ্রামের সঙ্গেও যুক্ত করতে হয়।"[১৩] শ্রীকাকুলামের গিরিজন কৃষক জনতার মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রামে অস্ত্র নিযে লড়াই করতে কবতে এই কবি নাট্যকার শহীদ হন ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে।

নাটকের মধ্য দিয়ে সুব্বারাও সামাজিক - রাজনৈতিক অন্যায় ও দুর্নীতির স্বরূপ উদঘাটিত করেছেন ও অত্যাচারীদের নির্মূল করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'প্লীডার গারি আব্বাই' (উকীল বাবুর ছেলে), 'মিত্রদ্রোহী', 'জ্ঞানযোগী', 'এদি সত্যম' (সত্য কি?) ইত্যাদি নাটক উল্লেখ্য। ধর্মীয় কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন 'কুমকুম রেখা', 'রিকিসাওয়ালা', 'কালচক্র', 'বিমুক্তি' প্রভৃতিতে। সুব্বারাও ছিলেন সঙ্গীতনিপুণ ও বুররা কথার দক্ষ শিল্পী। লোকরীতির ঢঙে রচিত ও অভিনীত 'জমকুল কথা' শ্রীকাকুলামের সংগ্রাম নিয়ে লেখা। সারা দেশে এই নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

চেরাবাণ্ডারাজু (১৯৪৪-১৯৮২) অন্ধ্র প্রদেশের বিপ্লব রচয়িতাল সংঘম-এর প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় জনগণের শোষণ মুক্তির সংগ্রামে প্রথম সারির সৈনিক। চেরাবাণ্ডারাজু শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়াই করেছেন, অনেকবার কারাবাস করেছেন। বিপ্লবী কার্যক্রমে অংশ নেবার জন্য চাকরি হারান, কিন্তু কোন অত্যাচার তাঁর মনোবল নষ্ট করতে পারেনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি লড়ে গেছেন এবং তাঁর কলমকে ব্যবহার করেছেন শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের জন্য। অজস্র কবিতা তিনি রচনা করেছেন, গল্প রচনাতেও তিনি দক্ষ এবং তাঁর নাটকও বিপ্লবী ভাবনায় তীক্ষ্ণ সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

চেরাবাণ্ডারাজুর ছোট বড় নাটকগুলো 'নাটকলু নাটিকালু' সংকলন গ্রন্থে গ্রথিত হয়ে যেটা ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। 'গ্রামালু মেলু কোনটুন্নাই' (গ্রাম জাগছে) নাটক শ্রেণী সংগ্রামের নাটক। কৃষিজীবন এর ভিত্তি। একদিকে জোতদার অমৃত রাও ও গোপাল রেড্ডী, অপরদিকে কৃষক ও সর্বহারা মানুষ। জমি মালিকদের অত্যাচার প্রবল হয়। এগিয়ে আসে বিপ্লবী যুবক পাণ্ডারী যে কৃষকদের নেতৃত্ব দেয়, তাদের সংগঠিত করে ও বিপ্লবী কার্যে শিক্ষা দেয়। বিপ্লবী কর্মী কোনডাড়ুও তাকে সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ জয়লাভ করে, কৃষকের অধিকার রক্ষিত হয়, জয়ী হয় বিপ্লবের আদর্শ।

'পাল্লে পিলিচিন্দি' (গ্রামের ডাক) নাটকে কৃষিজীবন ও গ্রাম জীবনের মর্যাদা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এক কৃষক-এর বড় ছেলে গ্রামে থাকে, চাষ বাস করে। ছোট ছেলে

শহুরে, সে হাল ফ্যাশান শিখে কেবল বাড়ি থেকে টাকা চায়। এরা সাধ্যমত দেয়। গ্রামের এক শিক্ষক আছেন যিনি কেবল শিক্ষক নন — গ্রামসেবক মানব-কল্যাণকামী এক আদর্শবাদী মানুষও বটেন। তিনি ছোট ছেলেকে টাকা দিতে নিষেধ করেন, তাকে ঠিক পথে ফেরাবার চেষ্টা করেন, বোঝান কিভাবে কৃষকরা পরিশ্রম করে লড়াই করে বেঁচে থাকে নিজেদের মর্যাদা নিয়ে। কৃষকের ঘরে বাইরে তিক্ততা কলহ বাড়ে। শেষ পর্যন্ত উন্মার্গগামী শহুরে ছেলের পরিবর্তন ঘটে, সে গ্রাম জীবনের মানোবাঝে ও সেখানেই ফিরে আসে।

'টেমপোরারি লেবার' নাটিকায় কারখানা মালিকের চাতুর্য ও বদমাইসি, তথাকথিত শ্রমিক নেতাদের দালালী এবং বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর জয় দেখানো হয়েছে। মালিক শ্রমিকদের টেমপোরারি চাকরী দেয়, চুক্তি শেষে এদের ছাঁটাই করে, আবার নতুন অস্থায়ী শ্রমিক আনে — এভাবে তাদের দাবি দাওয়া কিছুই পূরণ করেনা এবং তাদের প্রাণশক্তিকে নিংড়ে নিজের কাছে লাগায়। কারখানায় এইরকম এক শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হলেও মালিক সে দায়িত্ব নেয় না কারণ টেমপোরারি লেবাররা কোন সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকারী নয়। শোধনবাদী দালাল নেতাও মালিককেই সমর্থন করে। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা তাদের চূড়ান্ত অধিকার অর্জন করতে প্রবল বিক্রমে এগিয়ে আসে।

চেরাবাণ্ডারাজু আরো নাটক লিখেছেন যাদের মধ্যে উল্লেখ্য 'ভূমি ভাগতম' (ভূমির কথা), 'ভেন্নেল্লো মানটালু' (চাঁদের আলোয় আগুন), 'সংঘর্ষম', 'কোনডালু পগলে সিনম' (আমরা পাহাড় ভেঙেছি) ইত্যাদি।

গাঙ্গী রেড্ডী বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার বিশিষ্ট নাটক 'নান্দী' শোধনবাদ বিরোধী নাটক। সি পি এম প্রমুখ শোধনবাদী দলগুলোর চরিত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ বিপ্লবী আদর্শেরও প্রতিপাদন নাটকে আছে। ১৯৭৪-এ বিপ্লব রচিয়তাল সঙঘম - এর করনুল কনফারেন্সে-নাটকটি অভিনীত হয়। এর আগে ও পরে নাটকটি অজস্রবার অভিনীত হয়েছে।

নরসিংহ রাও বিশিষ্ট হয়েছেন 'মা ভূমি'-র প্রযোজক রূপে। অনেক বিপ্লবী নাটক তিনি রচনা করেছেন। 'এসো আমরা গণসেনার সামিল হই' তাঁর বিখ্যাত নাটক। গ্রামে গরীব কৃষকদের ওপর চলে পীড়ন শোষণ অত্যাচার। জোতদার ও মহাজন তাদের দাপটে সবাইকে অস্থির ও সংকুচিত করে রাখে। শেষ পর্যন্ত কৃষকরা জেগে ওঠে। তারা গেরিলা স্কোয়াডে যোগ দেয় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

ভি. বি. গদ্দার (১৯৪৮) জন নাট্য মণ্ডলীর প্রধান শিল্পী। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণসংগীত শিল্পী। তিনি অভিনয়ে দক্ষ, নাচও জানেন। তার 'রাগল জেণ্ডা' (লাল ঝাণ্ডা) অন্ধ্র প্রদেশের আদিল বাদেরগোণ্ড উপজাতি কৃষকদের অভ্যুত্থান নিয়ে লেখা। এদের ঠকাচ্ছে শহরে ব্যবসায়ীরা, তারা জঙ্গলের মালিক হয়ে শোষণ চালাচ্ছে, ফরেস্ট অফিসাররাও অত্যাচার করছে। রাডিক্যাল ইয়ুথ লীগ এই অত্যাচারিত মানুষদের সচেতন করে তাদের অধিকার সম্বন্ধে, তারা এগিয়ে আসে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে। 'রাগল জেণ্ডা' অল-ইন্ডিয়া লীগ ফর রেভলিউশানারী কালচার - এর প্রথম সম্মেলনে (১৪-১৫ অক্টোবর, ১৯৮৩, পিয়ারীলাল ভবন, নিউ দিল্লী) সগৌরবে অভিনীত হয় জননাট্য মণ্ডলী দ্বারা। এই প্রযোজনার রিপোর্ট উদ্ধৃত হল —

"Jana Natya Mandali presented a ballet titled 'Ragal Zenda' (Red flag) on the peasant uprising of the Gond tribals in Andhra Pradesh writ-

ten and directed by Gaddar. The entire production attained a very high pitch of artistic beauty and enthralled the audience with exuberant revolutionary fervour."[১১]

জানি না তেলুগু নাটকের আগের মত গৌরব আছে কিনা। যোগ্য নাট্যকারদের অনীহা, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, মাটির সঙ্গে সংযোগহীনতা বা দূরদর্শনের প্রভাব আধুনিক তেলুগু নাটককে কিছুটা দুর্বল করেছে। তবু চলেছে নাট্যচর্চা। এ সময়ের বিশিষ্ট নাট্যকার হলেন — পরিচুরি ভেঙ্কটেশ্বর রাও, জয়প্রকাশ ('গরাদী'—বাজিকর), রামচন্দর ('লিফট'), তানিকেল্লা ভরাণী ('গোগ্রহণম'), ডি এস এন মূর্তি (মহানগর)। **শঙ্করমুষ্ঠি পার্থসারথি** বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন ('নিচ্চেনা'— মই, ১৯৮৫, 'ডোঙ্গালা বাণ্ডী' — চোরেদের বাড়ি, ১৯৯২-৯৩; 'সাইলেন্স প্লীজ' — ১৯৯৬ এবং অন্যান্য নাটকে)। সম্প্রতিকালে অভিনীত ও জনপ্রিয় 'সাইলেন্স প্লীজ' কমেডি নাটক। বাড়ীতে চোর ঢোকে। বাড়ীর কর্তার চোখ অসুস্থতার জন্য বাঁধা। সে ভাইপোর কথা বলে ও ভাবে এই ভাইপো। পুলিশ আসে ও মনে করে চোর হল ভাইপো। ক্রমে ঘরের সব জিনিষ চুরি যায়। শেষে চোরকে ধরা হয় ও সবাই বলে — সাইলেন্স প্লীজ। খুব উচ্চমানের কমেডি নয়।

তবু অন্ধ্রের নতুন নাট্যকারদের রচনায় সমাজের জটিল প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে। সম্প্রতিকালে বিশেষত বাবরি মসজিদ ভাঙার কলঙ্কময় ঘটনার পটভূমিকায় বেশ কিছু নাটক রচিত হয়েছে তেলুগু ভাষায়। **সঞ্জীবী** লিখেছেন 'অযো(ব)ধ্যা' যার নামকরণেই রয়েছে একদিকে বেদনা অন্যদিকে আক্রমণ। মিলনের বাণী নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। **বীনেডু কৃষ্ণাইয়া** রচিত 'ধর্মযজ্ঞম', **এস ভি এস হরনাথ রাও** রচিত 'পঞ্চম বেদম' ও 'জগন্নাথ রথচক্রলু' সাম্প্রদায়িক মিলনের কথা আন্তরিকভাবে উচ্চারণ করে। 'জগন্নাথ রথচক্রলু' নাম নেওয়া হয়েছে প্রগতিশীল কবি শ্রীশ্রীর কবিতা থেকে। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী, অত্যাচার ও ধর্মবিদ্বেষ সমাজে ভাঙন আনতে গেলে এক মুসলিম যুবকই শান্তি আনতে প্রয়াসী হয়। **জলদঙ্কি সুধাকর** লিখেছেন 'গালি গোপুরম' ও 'হালাল'। 'গালি গোপুরম' নাটকে দেখানো হয়েছে এক মুসলমান যুবক রাত্রিবেলায় এক হিন্দুমন্দিরকে বুঝতে না পেরে সেখানে আশ্রয় নেয়, নমাজ পড়ে ও রাত্রিতে গোপুরমে পা রেখে ঘুমোয়। পরদিন হিন্দুরা মন্দিরে এক বিধর্মীকে দেখে আপত্তি করে। কিন্তু পুরোহিত বলে যে যেকোন মানুষই পবিত্র স্থানে আশ্রয় নিতে পারে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবেশগত নীচতা যার পরিণামে পুরোহিতকে কর্মচ্যুত করা হয়। কিন্তু সেই যুবক বলে যে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে সে মানুষ হয়েছে ও হিন্দুদের ধর্মকর্ম সে ভালোই জানে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও তিক্ততায় এসবের মূল্য কতটুকু! আজান আর পূজার সময় শুধু পায়রাগুলো উড়ে যায় মন্দির থেকে মসজিদে, আর মসজিদ থেকে মন্দিরে ঃ কোন বিভেদ পার্থক্য তাদের ভাবনায় নেই। নাটকটি পবিচালনা করেছেন ভানুপ্রকাশ; প্রযোজক সংস্থা হিন্দুস্থান এ্যারোনটিকস লিমিটেড কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন।

এস চন্দ্রশেখর রাও রচিত 'চিচ্চু' (স্ফুলিঙ্গ) সাম্প্রদায়িক মিলনের বাণী প্রচার করে গভীরভাবে। মন্দির আর মসজিদ পাশাপাশি আছে : মসজিদ যেতে গেলে মন্দিরের দরজা দিয়ে যেতে হয়। মন্দিরের গোঁড়া পুরোহিত আর তার মেয়ে আছে, আছে শিষ্য; মোল্লারও আছে ছেলে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের হলেও তারা পরস্পরের অনুরাগী। শুরু হয় প্রবল সংঘাত, শেষ পর্যন্ত ধ্বনিত হয় মিলনের বাণী — জাতিধর্ম নয়, সব মানুষই সমান।

৫. বাংলা ও তেলুগু নাটক : পারস্পরিক সম্পর্ক

(১) সূচনা

অন্ধ্রের জীবন ও সাহিত্য সংস্কৃতি রেনেসাঁসের আলোক ধারায় উদ্ভাসিত। অন্ধ্র প্রদেশের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ক্ষেত্রে বাংলারও এক বিশেষ ভূমিকা আছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর অন্ধ্রের জাগরণ ও উপলব্ধিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র প্রমুখেব ভাবনাতেও তেলুগু সাহিত্য সম্মুখের অভিযাত্রী হয়েছে। সাহিত্যই বাংলাদেশ ও অন্ধ্রকে মিলনের রক্তিম সূত্রে বেঁধেছে; এক্ষেত্রে নাটকের বিশেষ ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। নাট্যশিল্পের মাধ্যমে বাংলা ও তেলুগু সংস্কৃতি এসেছে কাছাকাছি, দুই জীবনে এক মিলনেব সুর ঝংকৃত হয়েছে — পারস্পরিক প্রভাব অর্থাৎ অনুবাদ অভিনয় ও অনুপ্রাণনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা ও তেলুগু নাটকের নৈকট্যের সম্পর্ক।

(২) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও তেলুগু নাটক

তেলুগু ঐতিহাসিক নাটকের সূচনায় বাংলার নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব স্বীকার করতেই হবে। অন্ধ্রের মানুষদের প্রবল স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যাভিমান দ্বিজেন্দ্রলালের নাটককে অবলম্বন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক তেলুগুতে বহুল পরিমাণে অনূদিত হতে শুরু করে। দ্বিজেন্দ্রলালেব অনূদিত গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হল —

১।	ভারতরমণী	—	শ্রীপাদ কামেশ্বররাভু	১৯২৬
২।	ভীষ্ম	—	জনধ্যাল শিবন্নশাস্ত্রী	১৯২৭
৩।	চন্দ্রগুপ্ত	—	নন্দুরী শিবরাভু	১৯৩৬
৪।	দুর্গাদাস	—	জোন্নালগড্ডা সত্যনারায়ণ মূর্তি	১৯২৫
৫।	দুর্গাদাসু	—	জনধ্যাল শিবন্নশাস্ত্রী	১৩১৩
৬।	নুরজাহান	—	জোন্নালগড্ডা সত্যনারায়ণ মূর্তি	১৯২৫
৭।	মীবার পতনমু	—	শ্রীপাদ কামেশ্বব রাভু	১৯২৯
৮।	মীবাড়ু পতনমু	—	পালপর্তি সূর্যনারায়ণ	১৯২৬
৯।	মেবার রাজ্য পতনম	—	পিঙ্গলি নগেন্দ্ররাও	১৯২৪
১০।	তাগিনা শাস্তি (প্রায়শ্চিত্ত)	—	শ্রীপাদ কামেশ্বররাভু	১৯২৯
১১।	পিসিনিগোট্টু (পুনর্জন্ম)	—	শ্রীপাদ কামেশ্বররাভু	১৯২৭
১২।	রাণা প্রতাপসিংহ	—	শ্রীপাদ কামেশ্বররাভু	১৯২৬
১৩।	সাজাহান	—	দিনবহি সত্যনারায়ণ	১৯২৭
১৪।	সাহাজান	—	জো. সত্যনারায়ণ মূর্তি	১৯২৭
১৫।	সোরাব রুস্তমুলু	—	শ্রীপাদ কামেশ্বররাভু	১৯২৫
১৬।	পাষাণী	—	পিঙ্গলি নগেন্দ্ররাও	১৯২৩

পরবর্তী কালেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক অনুবাদ হয়। এই সব নাটক অভিনীতও হয়েছে বহুলভাবে। 'মেবার রাজ্য পতনম' মঞ্চস্থ করে ইন্ডিয়ান ড্রামা কোম্পানি (১৯২৪) বান্দার (মছলিপতনম) ও অন্যান্য স্থানে যাতে প্রখ্যাত অভিনেতা ডি ভি সুব্বারাও অভিনয় করেন। লেখক শ্রীপাদ কামেশ্বররাভুও ছিলেন বড় অভিনেতা। 'চন্দ্রগুপ্ত', 'রাণাপ্রতাপ সিংহ' প্রভৃতি মঞ্চস্থ হলে তিনি তাতে অভিনয় করেন। ১৯৪৯-তে তেলুগু

নাট্যকার অভিনেতা আর. ভি. চলম 'চন্দ্রগুপ্ত' অনুবাদ করেন 'চাণক্য' নামে এবং ইউনাইটেড আর্টিস্টস অন্তত ২০ বার তা অভিনয় করে মাদরাজ বিজয়ওযাড়া হাযদ্রাবাদ জামসেদপুর কলকাতায়।

অন্ধ্রের মানুষদের দেশচেতনা ও জাতীয়তাবোধকে পূর্ণ কবেছিল দ্বিজেন্দ্রলালেব নাটক। ভারতচেতনায় উদ্বুদ্ধ নাট্যকাররা এই সব নাটককে আপন কবে নিয়েছিলেন। তবু দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত কিছু নাটকও লেখা হয়। পিঙ্গলি নগেন্দ্র বাও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবে লেখেন 'জেবুন্নিসা' (১৯২৩) যা প্রকাশিত হয় 'কৃষ্ণা পত্রিকা'য যে পত্রিকা স্বাধীনতার ভাবনায় উদ্দীপ্ত ছিল। নিজাম সরকার এই নাটকের বক্তব্যে তীব্র আপত্তি জানান।[১১(ক)]

দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরূপ তেলুগুতে বেশ কিছু ঐতিহাসিক নাটক লেখা হয। কোপ্পারাপু সুব্বারাও লেখেন 'রাণা প্রতাপ', 'নূরজাহান' (১৯৪৮)। কোটমূর্তি চিনারঘুপতিরাও লেখেন 'প্রতাপ সিংহ' (১৯২৭) ও 'চিতোড় পতনমু' (১৯৩৫) — যদিও প্রথমটিতে হ্যামলেটের ছায়া আছে। মারেমণ্ড বামারাও তিনটি ছোট ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। একটিতে ছায়া ও চন্দ্রগুপ্তর মধ্যে প্রেমের অনুভব দেখা গেলেও রাজ্যেব স্বার্থে চাণক্য তাদের মিলনে বাধা দেন ও নায়িকার জীবনে ট্র্যাজেডি আসে। মারেমণ্ড রামারাও-এর অন্যান্য নাটক হল 'নৈবেদ্যম', 'পরিত্যাগম', 'প্রতীকারম', 'বিপ্লবম'।

ঐতিহাসিক নাটকের ধারাকে বহন কবে জি. ভি. সুব্বারাও পাঁচের দশকে অনুবাদ করেন নিশিকান্ত বসু রায়ের 'দেবলাদেবী'। পরিবর্তিত নাম হয় 'খিলজী রাজ্য পতনমু'। ১৯৫৬ সালে কলকাতায় অন্ধ্র অ্যাসোসিযেশন এই নাটকের অভিনয় করেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের উপস্থিতিতে।[১২] অন্যান্য স্থানেও এই নাটকের অনেক অভিনয় হয়। বেদান্তম সুব্রহমনিয়ম এই অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ নেন।

(৩) রবীন্দ্রনাথ ও তেলুগু নাটক

অ. ভূমিকা

তেলুগু ও বাংলা নাটকের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনায় অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের নাম আসে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের সম্পর্ক নিকট ও আন্তরিক। সাহিত্য সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে এই নৈকট্য গভীর, নাটকেও তার প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তেলুগু সাহিত্যিকদের আন্তরিক পরিচয় ছিল। প্রখ্যাত নাট্যকার গুড়জাদা ভেঙ্কট আপ্পারাও অনেকবার কলকাতায় আসেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর গভীর পরিচয় হয়। এছাড়া শান্তিনিকেতনে এসেছেন এবং কবির সঙ্গে নিকট হয়েছিলেন রায়প্রোলু সুব্বারাও, জোন্নালগড্ডা সত্যনারায়ণ, অবুবুরি রামকৃষ্ণ রাও, কারুমুরি বৈকুণ্ঠ রাও, মল্লবরাপু বিশ্বেশ্বর রাও, বি গোপাল রেড্ডী প্রমুখ সুধীজন যারা রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চায় ও রবীন্দ্রনাট্য চর্চায় খ্যাতি পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক তেলুগুতে অনুবাদিত হয়েছে, তার অভিনয়ও হয়েছে, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিতও করেছেন তেলুগু নাটককে।

আ. রবীন্দ্রনাটকের তেলুগু অনুবাদ

তেলুগুতে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সম্ভবত প্রথম অনুবাদ কোপ্পার্তি নারায়ণমূর্তির 'মুক্তধারা' (১৯২৩)। রবীন্দ্রনাটকের অনুবাদে বি-গোপাল রেড্ডীর নাম বিশেষ উল্লেখ্য। প্রখ্যাত এই মানুষটি রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্যেরও গভীর চর্চা করেছেন। তিনি রবীন্দ্রভক্ত, শান্তিনিকেতনে দীর্ঘদিন ছিলেন, রবীন্দ্রভাবনায় অনুপ্রাণিত হন। রায়ভেলোর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকার সময় ১৯৪৩ সালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটক অনুবাদ করতে

সুরু করেন। মোট অনূদিত নাটকের সংখ্যা ১১। এই অনুবাদ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন — "এই নব নাটকের আঙ্গিক ও ভাষাবীতি সমৃদ্ধ হয়েও সহজ, যদিও তাদেব মধ্যে আছে বাংলা প্রকাশ ভঙ্গীর বিশিষ্টতা। যিনি বাংলা জানেন এবং যাঁর রবীন্দ্রনাথেব প্রতি ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পরীতির প্রতি গভীব শ্রদ্ধা আছে, তাঁর রচনায় এই সব বৈশিষ্ট্য থাকবেই।"[১৩] বিশেষ উল্লেখ্য এই যে তেলুগুতে তাঁব অনূদিত 'বিসর্জন' অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্বাচিত হয়েছিল। তেলুগুতে অনুবাদিত ববীন্দ্রনাথের নাটকের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

অরূপরতনম — শ্রীনিবাস চক্রবর্তী ১৯৬২

বিদায় অভিশাপ (কচ ও দেবযানী)—
- ক) দেবযানী — বি গোপাল রেড্ডী
- খ) কচুনি ভিডকোলু (কচেব বিদায) — উৎপল সত্যনারাযণ

বিসর্জন —
- ক) বলি — এস ব্রহ্মাইযা ১৯৫৩
- খ) বিসর্জন — বি. গোপাল রেড্ডী ১৯৫৪
- গ) বলিদানমু — বি. বামদাসু ১৯৬১
- ঘ) আত্মার্পণ — আর. ভি চলম ১৯৬০

চণ্ডালিকা — বি. বামদাসু

চিত্রাঙ্গদা —
- ক) মল্লভারপু বিশ্বেশ্বর রাও ১৯৪৭
- খ) এণ্ডামুরি ভেঙ্কটরমন ১৯৪৪
- গ) বি. গোপাল রেড্ডী
- ঘ) বি. রামদাসু

ডাকঘর —
- ক) উত্তরম (চিঠি) — লোককাজু আপ্পারাও ১৯৫৬
- খ) কারুমুরি বৈকুণ্ঠ রাও ১৯২৭
- গ) রাজু গরি যাবু (মহান রাজার চিঠি) চিরঞ্জীবী ১৯৫৬

গৃহপ্রবেশমু — কারুমুরি বৈকুণ্ঠ রাও ১৯২৭

গান্ধরীর আবেদন —
- ক) গান্ধারী — উৎপল সত্যনারায়ণাচার্য ১৯৫০
- খ) গান্ধারী আবেদন — বি. গোপাল রেড্ডী

হাস্য নন্দিনী (হাস্য কৌতুক) — চৌধুরী বৈরাগী ১৯৬১

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ — বি. গোপাল রেড্ডী

মালিনী —
- ক) বি. গোপল রেড্ডী
- খ) বি. রামদাসু

মুক্তধারা —
- ক) কোপ্পার্তি নারায়ণমূর্তি — ১৯২৩
- খ) পোলাভরাপু শ্রীহরি রাও —
- গ) পি. ভি. এস. নারায়ণদাস — ১৯৬১
- ঘ) এন. সি. রামানুজাচার্য — ১৯৬১

নটীর পূজা (নটী পূজা) —

ক) পি. শ্রীহরি রাও	—	১৯৬১
খ) শ্রী বিরিঞ্চি	—	
গ) স্বর্ণরাজ হনুমন্ত রাও	—	১৯৩১

নরকবাসমু — বি. গোপালরেড্ডী

পতিতা — বি. গোপালরেড্ডী

প্রকৃতির পরিশোধ —

ক) প্রকৃতি প্রতিকারমু	—	বি. গোপাল রেড্ডী	
খ) সন্ন্যাসী	—	বি রামদাসু	
গ) সন্ন্যাসী	—	রেন্টালা গোপাল কৃষ্ণ	১৯৬১

রক্তকরবী —

নন্দিনী — শ্রী নিবাস চক্রবর্তী

রাজা — চিকাটি গাদিলো রাজু — রেন্টালা গোপাল কৃষ্ণ

(অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাজা)

রাজা ও রাণী —

রাজু রানী — বি. রামদাসু

সতী —

সহগমনমু — বি. গোপাল রেড্ডী

ই. তেলুগু নাটকে রবীন্দ্রপ্রভাব

তেলুগু নাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ রূপ ও অরূপ চেতনা, রোমান্টিক অনুভব, কাব্যময় প্রকাশভঙ্গী এবং মানবিক বোধ ও তার মর্মস্পর্শী প্রকাশ নাট্যকারদের নাট্যশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছে বিভিন্ন ভাবে। রায়প্রোলু সুব্বারাও শান্তিনিকেতনে ছিলেন, রবীন্দ্র সান্নিধ্যেও আসেন। দেশে তিনি রবীন্দ্রনাথকে আদর্শরূপে রেখে কাব্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি মূলত কবি। তবে নাটকও লিখেছেন। তার 'রূপনবনীতম' (১৯৫৩) উচ্চামানের রূপক নাটক। প্রেমের আদর্শ মহিমময় ভাবনা এতে অঙ্কিত হয়েছে। ভাব ও আঙ্গিকে এটা অনেকটাই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করায়।

টি শিবশঙ্কর শাস্ত্রী কবি হিসাবে পরিচিত। তিনি সাহিত্য সমিতির প্রধান পুরুষ ছিলেন। অনেক নাটকও তিনি লিখেছেন — তাঁর সব নাটকই 'পদ্য গেয় নাটক'। তাঁর নাটকের ওপর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রভাব আছে, ভাগনারের প্রভাবও অনুভূত হয়। 'পদ্মাবতী চরণচরণ চক্রবর্ত্তী' (১৯৩৩), 'বর পরীক্ষা' (১৯৬৩) প্রভৃতি নাটকের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটকের রীতির অনুবর্তন অনেকটা পাওয়া যায়।

মল্লভরপু বিশ্বেশ্বর রাও (১৯০৬-১৯৮৬) বিখ্যাত কবি। তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগী তিনি। 'চিত্রাঙ্গদা' অনুবাদ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের রীতিতে বেশ কটি সঙ্গীত রূপক ও গেয় নাটক লেখেন। 'বিল্‌হনীয়ম' সঙ্গীত রূপক লেখেন ১৯৩৯ সালে। 'কলাভাষিনী' ও 'বরুধিনী'ও কাব্য নাটক। এদের রোমান্টিক ভাব ও কল্পনা, এবং প্রকাশ রীতির কবিত্ব ও সঙ্গীতধর্মিতা রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ। 'শারদোৎসবমু' গেয় নাটক, প্রকৃতি চেতনায় ও অঙ্গরূপে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার সদৃশ।[১৪]

ঈ. তেলুগুতে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়

অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় রবীন্দ্রনাটকের অনেক অভিনয় হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৌখীন নাট্য সংস্থাতেই প্রথম দিকে রবীন্দ্র নাটক অভিনীত হত। ক্রমশ তা প্রসারিত হয়। তেলুগুতে বেশ কিছু রবীন্দ্র নাটক অভিনীত হয়েছে। 'বির্সজন', 'চণ্ডালিকা' অভিনয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। 'বলিদান' (বিসর্জন) প্রখ্যাত তেলুগু চিত্রাভিনেতা কোঙ্গর জগ্গাইয়া অভিনয় করেন পাঁচের দশকে। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে মাদ্রাজের ঐতিহ্যমন্ডিত মিউজিয়ম থিয়েটারে 'বলিদান' (বির্সজন) মঞ্চস্থ করে চেন্নাপুরী অন্ধ্র মহাসভা। নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা আর. ভি. চলম 'বিসর্জন' ঈষৎ সংক্ষেপিত রূপে অনুবাদ করেন 'আত্মার্পণ' নামে ও ১৯৬৫ এ প্রথম অভিনয় করেন বিজয়নগরম-এ। তারপর বিভিন্ন স্থানে এর অভিনয় হয়।

তেলুগুতে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র অভিনয় অত্যন্ত মনোরম ও জনপ্রিয় হয়েছে। বিশিষ্ট কুচিপুডি নৃত্যশিল্পী কুমারী শোভা নাইডু 'চণ্ডালিকা' সফলভাবে উপস্থাপিত করেন। তাঁর প্রযোজনা রসিকজনের আন্তরিক স্বীকৃতি পেয়েছে। 'চণ্ডালিকা'র যে প্রযোজনা আরো খ্যাতি ও মর্যাদা পায় সেটি হল মাদ্রাজ কুচিপুডি আর্ট অ্যাকাডেমির প্রয়াস যার পরিচালনায় আছেন ভেম্পটি চিন্না সত্যম। 'চণ্ডালিকা'র সঙ্গীত ও সংলাপ তেলুগুতে সম্পূর্ণ অনূদিত হয়েছে যা কর্ণাটকী রাগে সন্নিবদ্ধ হয়েছে। এই নাটক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। কলকাতায়ও এর রূপায়ণ দর্শকদের মুগ্ধ করে। 'দেশ' পত্রিকায় চণ্ডালিকার অভিনয় বিবরণ চমৎকার বিবৃত হয়েছে —

"ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কুচিপুডি নৃত্যগুরু ভেম্পটি চেন্না সত্যমেব চণ্ডালিকায় প্রধান সম্পদ এর নৃত্যাংশ। অভিনয় প্রধান কুচিপুডি নৃত্যকলার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ দেখে রসিক দর্শক, মাত্রেই উপলব্ধি করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে ধ্রুপদী নৃত্যরীতির কুশলী ব্যবহার নান্দনিকভাবে কত সফল হতে পারে। এই প্রযোজনায় স্পষ্টত মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল — রোমান্টিক প্রেম থেকে বুদ্ধ - নির্দেশিত মৈত্রীভাবনার পথে চণ্ডালিকার ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উত্তরণ নয় — অন্ত্যজ দশার গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়ে মানবিক মর্যাদায় তার প্রতিষ্ঠা অর্জন, যা এদেশের প্রতিটি হরিজনের লাঞ্ছিত জীবনের প্রতিমুহূর্তের কামনা। এই শেষ দৃশ্যে চণ্ডালিকা আনন্দের আর্শীবাদ পেয়েই ক্ষান্ত হল না, অন্য ভিক্ষুদের সঙ্গে আনন্দকে অনুসরণ করল। কারণ হিন্দু ধর্মে অস্পৃশ্য বলে যে অপমানিত তার মর্যাদার প্রতিশ্রুতি ছিল অন্য ধর্মের আশ্রয়ে। অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা নয় সুবোধ্য সামাজিক ন্যায় বিচারের এই প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য মনে রেখেই ভেম্পটি এই নাটকের নৃত্যাভিনয় পরিচালনা করেছেন। চণ্ডালিকার ভূমিকায় ভেম্পটির প্রিয় ছাত্রী বালা নৃত্যে - অভিনয়ে প্রকৃতির বেদনা, গ্লানি, বিদ্রোহ, আনন্দ, উদ্বেগ ও মুক্তির মুহূর্তগুলিকে সপ্রাণ কুশলতায় মূর্ত করতে পেরেছিলেন। অনুরূপভাবেই উল্লেখযোগ্য প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় দুর্গা দেবীর অভিনয় ও তাঁর সমবেত ও একক মায়ানৃত্য। রূপ সজ্জায় ভি এন মূর্তির আনন্দ যেন অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের আঁকা বুদ্ধ। ...... ভেম্পটির নৃত্যরচনায় যেমন আধুনিক ধ্রুপদী অঙ্গের কুচিপুডির সঙ্গে নানা লৌকিক উপাদান মিশেছে তেমনি কে মল্লিকের সঙ্গীত রচনায় ধ্রুপদী কর্ণাটকী রাগের সঙ্গে সুষ্ঠু সুষমায় মিলিত হয়েছে তেলুগু লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় সুর"।[১৫]

রবীন্দ্রনাথের ১২৫ বর্ষ স্মরণে কলামন্দির-এ 'জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক নাটক' বিষয় সেমিনারে 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' অভিনীত হয়। অনুবাদ করেন এম অঞ্জনায়েলু ও

সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেন ডঃ এন ভি সুব্বারাও ও এন প্রমীলা। 'ভারতীয় ভাষা পরিষদ' আয়োজিত অনুষ্ঠানেও এই নাটকটির আর্কষণীয় উপস্থাপনা করেন। ওয়াই লক্ষ্মী নরসাম্মার একক অভিনয়ে 'চিত্রাঙ্গদা'র বক্তব্যও আন্তরিক হয়ে প্রকাশিত হয়। শোভা নাইড়ু কুচিপুড়ি নৃত্যের অসামান্য দক্ষ শিল্পী। তাঁদের কুচিপুড়ি আর্টস অ্যাকাডেমি হায়দ্রাবাদ এই ঐতিহ্যনিষ্ঠ নৃত্যচর্চায় বিশেষ খ্যাতি পেয়েছে। শোভা নাইড়ু রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র অসাধারণ প্রযোজনা করেছেন কুচিপুড়ি রীতিতে এবং তা সর্বত্র সম্মানিত হয়েছে। তাঁর পরিচালিত অ্যাকাডেমির 'চণ্ডালিকা'র একটি প্রযোজনার বিবরণ দেওয়া হল যা Deccan Chronicle পত্রিকায় ৪ঠা জুলাই ১৯৯৯এ প্রকাশিত হয় —

It takes a lot to convey something in just a few expressions. But for some, like Nritya Choodamani Shobha Naidu, it's just a cakewalk. Her dance ballet *Chandalıka,* based on Rabindranath Tagore's play of the same name, proved it. Performed last Friday at Tyagaraya ganasabha by Sobha Naidu and party, the ballet strongly condemns the evil of untouchability.

Naidu has carved a niche for herself in the delightful genre of dance ballets, *Chandalıka,* in which she plays the eponymous protagonist is amongst foremost of ballets in her repertoire.

The ballet was organised under the auspices of Nritya Kala Bhavan of which Natyacharya Mahankali Mohan, one of the prominent *Nattuvanars* in the city, is the director.

The ballet was spread over six scenes. The first three scenes show flower-sellers, milk maids and banglesellers, offering their wares for sale and young Chandalika being attracted to them. But, what deprives Chandalika from acquiring these little joys of life is her being born as an untouchable.

Humiliated because of her lowly birth, she is distraught at the unfairness of fate and society. Ananda, a Buddhist monk, comes as a whiff of fresh air and comforts her. He preaches that all are equal and that caste is only a human convention.

He asks Chandalika to offer him water with her own hands. Chandalika is ecstatic; she falls in love with him. She wants her mother Maya to bring him back by using her occult powers. Maya conjures up evil spirits with her magic and Chandalika sees Ananda being enveloped by fire. After a series of events, Ananda initiates Chandalike into monkhood as she moves from darkness to light.

The audience were thrilled by Shobha Naidu's *abhinaya,* especially in the song in which Chandalika complains of the unfairness of fate. The songs were well sung and her team of artistes did a neat job.

Bharathi as Maya, AS Purnima as Ananda and the entire team did justice to their roles. Natyacharya Mahankali Mohan offered Nattuvangam support and AK Rao, T Sarada and Swetha gave vocal support. PRC Sarma on the Mridangam and D Jayakumaracharya on the Tabla, M Anantha Krishna on the flute and Ashok Gurjale on the violin gave the orchestra. (BV)

(৪) শরৎচন্দ্র ও তেলুগু নাটক

অন্ধ্র জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক গভীর ও নিবিড়। অন্ধ্রের মানুষরা তাঁকে ভালবেসেছেন আন্তরিকভাবে। তিরিশ ও চল্লিশ দশকের মধ্যবিত্ত বিক্ষুব্ধ তেলুগু যুবসম্প্রদায় শরৎচন্দ্রকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।[১৬] সমালোচক জানিয়েছেন 'শরৎচন্দ্র তাঁর কালের অনেক উল্লেখযোগ্য তেলুগু লেখকগণের অপেক্ষা তেলুগু পাঠকগণের নিকট অধিকতর প্রিয় লেখক ছিলেন।'[১৭]

সমালোচক শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন —

'He is the great artist who portrayed with rare insight, the play of emotions in human progress. He was the champion of the socially outcast and downtrodden mutes The physical chastity of woman is not a social convention it is her own training and discipline. Love is greater than the body and the individual nobler than the society - this is his proclamation.'[১৮]

বিশেষতঃ 'His artistry mesmerises us '[১৮(ক)] তাই দেখি 'সৃষ্টিধর্মী তেলুগু সাহিত্যে তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য;[১৯]

তেলুগু শরৎনাটকের অনুবাদ

শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস তেলুগুতে অনূদিত হয়েছে। কোন কোন রচনার একাধিক অনুবাদও আছে। শরৎ গ্রন্থাবলীও প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রর নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরূপও তেলুগুতে পাই। শরৎচন্দ্রের তেলুগুতে রূপান্তরিত নাটক হল —

পল্লী সমাজ	ইরুগুপোরুগু (প্রতিবেশী)	কেরা এলরু	১৯৫৩
পল্লী সমাজ	রমা	গদ্দে লিঙ্গাইয়া	১৯৫৫
দেবদাস	দেবদাসু	বি. সূর্যনারায়ণ	
দেবদাস	দেবদাস	সীতারামরাজু ভেঙ্কটেশ্বর রাও	
দেবদাস	দেবদাসু	কে. ভি. জে. রামারাও	
ষোড়শী	পূজারিণী	পুরাণম কুমাররাঘবস্বামী	১৯৫৩
চন্দ্রনাথ	মনালোমাটা	নাগু	১৯৫৯

তেলুগু নাটকে শরৎচন্দ্রের প্রভাব

পি. ভি. রাজমান্নার-এর নাটকে সমাজের লাঞ্ছিত অবহেলিত নারীদের কথা গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গে আঁকা হয়েছে। পতিতা নারীদের হৃদয়ের মহিমা ও পবিত্রতা আছে, বিধবারাও সমাজে দেহমনের অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়। রাজমান্নারের নাটকের এই বক্তব্য অনিবার্যভাবে মনে করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রকে। 'এমি মাগভান্ন' যেখানে পেশাদার নর্তকীর গৃহবধূ হওয়ার সমস্যার কথা বলে, 'নিষ্ফলম' এ এক তথাকথিত অসতী নারীর মহৎ হৃদয় ধর্মের পরিচয় দেয়, 'মনোরমা' যা এক সামান্য দেবদাসীর সৎ শুভ্র হৃদয়কে উন্মোচিত করে -- এসব শরৎচন্দ্রের অনুপ্রেরণা বলে মনে করা সঙ্গত।

"শরৎবাবুর দেবদাসের ছায়ায় গণিকার উত্তরণের কাহিনী একাধিক তেলুগু নাটকে লক্ষ্য করা যায়।"[২০] কে. নারায়ণ রাও এর 'চিন্তামণি' (১৯২১) নাটকে এক পতিতার উত্তরণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। চিন্তামণি পতিতা, কিন্তু যে এই জীবন চায়নি। মায়ের চাপে সে এ কাজ করতে বাধ্য হয়। পতিতা হলেও মনের দিক থেকে সে সৎ। তার মনের মধ্যে সংঘাত চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার উত্তরণ ঘটে। 'বিল্বমঙ্গল' এক আদর্শ চরিত্র। সে পতিতা চিন্তামণির সান্নিধ্যে আসে। কিন্তু তার ভুল ভাঙে এবং যে কিছুটা উদাসী হয়ে

পড়ে। তার মানসিকতা চিন্তামণিকেও প্রভাবিত করে এবং তারও পরিবর্তন হয়। এই নাটকের সঙ্গে দেবদাস-চন্দ্রমুখী শ্রীকান্ত। রাজলক্ষী প্রভৃতির সাদৃশ্য আছে।

বেলামকোণ্ডা রামদাসু বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক অনুবাদ করেন। তাঁর 'পুনর্জন্ম' (১৯৫৬) একটা উল্লেখ্য সামাজিক নাটক যাতে এক গণিকা নারীর উত্তরণের কথা বলা হয়েছে। সে পূর্বপরিচয় না জানিয়ে এক ভদ্রজনকে বিয়ে করে। স্বামী ক্রমে তার পরিচয় জানলেও তার সহৃদয় মহৎ ব্যবহারে মেয়েটির যেন পুনর্জন্ম হয়।

শরৎচন্দ্রের ভাবনার সমরূপতা অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে পাওয়া যায়। গুডিপটি ভেঙ্কট চলম-এর নাটকেও সামাজিক সংস্কার ও বন্ধনমুক্ত নারীত্বের কথা বলা হয়েছে। তিনি মনে করেন ভালবাসাই সমাজকে ধরে রাখে। অবসরাল সূর্যরাও এর 'পঞ্জরম' (১৯৫৮) নাটকেও পতিতা সমস্যা ও তার সমাধানের কথা আছে। এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীর 'পতন' কে অবলম্বন করে নাটক গড়ে উঠেছে। কে-গোপাল রায় শর্মার 'এদুরিতা' নাটকেও এক বারাঙ্গনার সামাজিক স্বীকৃতির কথা। এক কট্টর ব্রাহ্মণপুত্রের সঙ্গে এক গণিকার প্রণয় ও বিবাহের কথা নিয়ে এই নাটক গড়ে উঠেছে।

৬. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও তেলুগু নাটক

ক. সাম্প্রতিক বাংলা নাটক তেলুগুতে

বেদান্তম সুব্রমনিয়ম এক বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। তিনি বাংলা সামাজিক নাট্যধারাকে তেলুগুতে আনয়ন করেন মূলত অনুবাদ ও অভিনয়ের দ্বারা। বাংলার খ্যাতিমান নাট্যকার তরুণ রায়ের বিভিন্ন নাটক তিনি অনুবাদ করেন এবং তাদের অভিনয়ও হয়। তরুণ রায়ের 'রজনীগন্ধা' অনুবাদ করেন 'আশা দেবী' নামে। নায়িকার নামে নাটকের নামকরণ করা হয়। ''আশা দেবী'' ১৯৬৫ সাল থেকে কলকাতা, খড়গপুর, ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় অভিনীত হয়। এই নাটক সুব্রমনিয়ম ইংরেজীতেও অনুবাদ করেন The Odor of Tuberose নামে সেটা প্যারিসে ১৯৬৫ সালে International Drama Competition এ সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়। বেদান্তম 'নিশাচর' নাটকের অনুবাদ করেন যেটা বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। একত্র গ্রথিত এই দুই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন নাগ ভৈরব অহোবালারাও যিনি তরুণ রায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেন।

বেদান্তম 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকটি অনুবাদ করেন সেটা বিজয়ওয়াড়া থেকে প্রকাশিত 'জাগৃতি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে।

তরুণ রায়ের 'রজনীগন্ধা নাটক আর ভি চলম অনুবাদ করেন 'বিরজাজি' (একটা ফুলের নাম) নামে। এই নাটক মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ খড়গপুর কলকাতা প্রভৃতি স্থানে অর্ধশতাধিক অভিনয় হয় ও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

তরুণ রায় প্রতিষ্ঠিত 'থিয়েটার সেন্টার'-এ বিভিন্ন বাংলা একাংক নাটক অভিনীত হয় ও তারা একটি সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষাটের প্রথম দিকে সুব্রমনিয়ম তাদের কয়েকটি অনুবাদ করেন। গোপীনাথ রায় চৌধুরীর 'সম্রাজ্ঞী'র তেলুগু অনুবাদ প্রকাশিত হয় অন্ধ্র থেকে প্রকাশিত 'নাট্যকলা' (মাসিক) ও 'অন্ধ্রপ্রভা' (সাপ্তাহিক) পত্রিকায়। আগন্তুক রচিত বাংলা নাটক 'শতাব্দীর স্বপ্ন'র অনুবাদ 'শতাব্দমুলা স্বপ্নম' প্রকাশিত হয় 'অন্ধ্রপ্রভা'য় এবং এলুরু ও অন্যান্য স্থানে অভিনয় হয়। কিরণ মৈত্রর 'বুদবুদম' (বুদবুদ) ও অমরেশ দাশগুপ্ত 'দৈনন্দিনম' (দৈনন্দিন) নাটক দুটিই 'অন্ধ্রপ্রভা'য় প্রকাশিত হয় ও হায়দ্রাবাদে অভিনীত হয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাড়াটে চাই' নাটক এম. অঞ্জনেয়ুলু অনুবাদ করেন 'গাদি

আদ্দেকু ইভ্‌ভাবডুনা' নামে যেটা অভিনীত হয়। রবীন্দ্র ভট্টাচার্যর নারী চরিত্র সমন্বিত 'তবে কেমন হত' অনুবাদ করেন অঞ্জনেয়ুলু 'তীরপুলো মারপু' নামে যেটা অন্ধ্র এসোসিয়েশনের মহিলা শিল্পীরা ১৯৮৪ সালে অভিনয় করেন কলকাতায় ও আসানসোলে। বোম্বাইবাসী দিব্যেন্দু গুহর 'চিরকুমারী সংসদ' অনূদিত হয় 'ব্রহ্মচারিণী সমাজম' নামে, অনুবাদক অঞ্জনেয়ুলু মেট্টা। এই নাটকেরও অনেক অভিনয় হয়। উৎপল দত্তর অনেক নাটক তেলুগুতে অনূদিত হয়েছে।

নব্যরীতির নাট্যকার পরিচালক বাদল সরকারের 'মিছিল' তেলুগুতে রূপান্তরিত হয় 'উরেগিম্‌পু' নামে। অনুবাদক করেন অত্তিলি পদ্মাবতী কৃষ্ণা। ওপেন থিয়েটার পারফরম্যানস রূপে এর অভিনয়ও হয়। নতুন ধারার এই নাটক বিশেষ অভিনন্দিত হয়। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' অনুবাদ করেন ভাসি রেডডি সীতা দেবী ও 'বাকি ইতিহাস' রূপান্তরিত করেন দয়াবন্তী। দুটো অনুবাদই বেশ ভাল।

খ. সাম্প্রতিক তেলুগু নাটক বাংলায়

বাংলায় ও তেলুগু নাট্যসংস্কৃতি সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য তুলনামূলক ভাবে বাংলায় তেলুগু নাটকের প্রভাব বা অনুপ্রেরণা কম। যদিও তেলুগু কথাশিল্প বা নাটকের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বাংলা এড়াতে পারেনি এবং সমাজসচেতন জীবননিষ্ঠ তেলুগু সাহিত্য পরিমাণে অল্প হলেও গভীর প্রত্যয়ে বাংলা সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে ও বাংলা নাট্যশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। পি. ভি. রাজমান্নার-এর বিখ্যাত নাটক 'এমি মাগভাল্লু' অনুবাদ করেন প্রখ্যত লেখক বঙ্গবাসী তেলুগুভাষী বোম্মানা বিশ্বনাথম 'পুরুষের মন' নামে। এটি ১৯৬৫ সালে 'শারদীয়া সংলাপ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। বোম্মানা বিশ্বনাথম বি. শঙ্করমের একটি একাঙ্ক নাটক অনুবাদ করেন 'অন্বেষণ' নামে যেটা বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রাক শতবর্ষ পূর্তি সংকলন সংখ্যা 'সংলাপ' এ প্রকাশিত হয়। বিশ্বনাথম জনপ্রিয় তেলুগু নাট্যকার য়েন্ডামুরি বীরেন্দ্রনাথ-এর 'রুদ্রবীণা' নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন 'বজ্রনির্ঘোষ' নামে। বাংলা ও অন্ধ্র সংস্কৃতির মিলনে বোম্মানা বিশ্বনাথমের ভূমিকা স্মরণ করতেই হবে।

ত্রিপুরানেনি গোপিচন্দর গল্প 'পিরিকিওয়াড়ি' (কাপুরুষ) নাট্যকার সরোজ চক্রবর্ত্তী নাট্যরূপ দেন 'দেশপ্রেমিক' নামে। এটি প্রকাশিত হয় 'সংলাপ' পত্রিকায় (১ম সংখ্যা ১৯৬৪)। কলকাতার বিখ্যাত নাট্যসংস্থা 'সংগঠনী' এই নাটকের অভিনয় করে। অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকা পল্লীতে বাংলায় এই নাটকের অভিনয় জনসম্বর্ধিত হয়। অহীন্দ্র ভৌমিক সত্যেন সাহা প্রমুখ এতে অভিনয় করেন।

'সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত' করার দুর্বার বাসনা নিয়ে যে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতবর্ষের মৃত্তিকাকে প্রকাম্পিত করেছিল, বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ গর্জন করে উঠেছিল প্রান্তরে পর্বতে, বন্দুকের নল হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক শক্তির উৎস, শোষণ শাসনের শৃঙ্খলকে চূর্ণ করবার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, রক্তে রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল পূর্বকোণ, সেই ভয়ংকর সময় বাংলা ও অন্ধ্রকে বেঁধেছিল বিপ্লবের রক্তসূত্র বন্ধনে। তেলুগু নাটকে এই বিপ্লব চেতনা তীব্র জ্বলন্ত মূর্তিতে দেখা দিয়েছে এবং বাংলায় তা পরম শ্রদ্ধায় গৃহীত হয়েছে। শ্রীকাকুলামের সংগ্রামী লেখক সুব্বারাও পাণিগ্রাহীর রচনা বাংলায় সমাদৃত হয়েছে, অমর শহীদ কিষ্টা গৌড় ও কুল্লা ভূমাইয়ার অন্তিম জীবনক্ষণ নাটকে রূপায়িত করেছেন অমল রায় ('নিঃশেষে প্রাণ'), ভারতীয় জনগণের শোষণ মুক্তির সংগ্রামের অগ্রণী চেরাবাণ্ডারাজুর শিল্পকর্ম বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। অন্ধ্রের বিপ্লব বাংলার চেতনাকে দীপ্ত করেছে, অন্ধ্রের বিপ্লবী নাট্যসাহিত্য বাংলার শিল্পকে ঋদ্ধ করেছে।

বাংলার তরুণ বিপ্লবী নাট্যকার অমল রায় তেলুগু সাহিত্যের সমাজ সচেতনা ও প্রগতিবাদী মানসিকতার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। তেজোনিধির গল্পকে তিনি নাটকে রূপায়িত করেন 'সমতার ফল' নামে যেটা ১৯৮২র শারদীয়া তরঙ্গ প্রবাহে প্রকাশিত হয়। আর একটি তেলুগু গল্প অবলম্বনে তিনি লেখেন 'আইন শৃঙ্খলা', নাটকটি শারদীয়া গ্রুপ থিয়েটাবে প্রকাশিত হয় ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মানসগঠনে তেলুগু সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে অমল রায় সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২১]

চেরাবাণ্ডারাজু শুধু অন্ধ্রেব নয় ভারতীয় জনগণের শোষণমুক্তির সংগ্রামে এক অগ্রণী সৈনিক। অন্ধ্রের এই বিপ্লবী শিল্পী সৈনিক বাংলাব মানুষদের কাছেও অতি প্রিয় ও প্রত্যযময নাম। তাঁব শিল্প ও সাহিত্যে বাঙালী প্রাণকে উদ্দীপিত কবেছে। তাঁব গল্প কবিতা নাটক বাংলায় বেশ কিছু অনূদিত হযেছে।

অন্ধ্রের বিপ্লবী শিল্পী সাহিত্যিকদেব সংস্থা বিপ্লব বচয়িতাল সঙঘম-এব গ্রন্থ 'ইপ্পুড় ভীসথুন্না গালি' বাংলায় অনূদিত হয় 'এখন যে হাওয়া বইছে' নামে। এই সংকলনের প্রথম গল্প 'অমব' চেরাবাণ্ডারাজুর লেখা। এটা 'মৃত্যুঞ্জয়' নামে নাট্য রূপায়িত করেন বোম্মানা বিশ্বনাথম। চেরাবাণ্ডারাজুর শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার অর্জনের বিপ্লবী শিল্পরূপ নাটিকাটি 'টেম্পোরারি লেবার' মূল তেলুগু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন দিলীপ কুমার মিত্র ও কে. এস. রাও। এটি শারদীয় অভিনয় পত্রিকায় (১৯৮৫) প্রকাশিত হয়। চেরাবাণ্ডারাজুর আব এক শ্রেণী সংগ্রামের নাটক 'ফ্যান' বাংলাতে অনূদিত হয। এটি প্রকাশিত হয় মধ্যপ্রদেশ থেকে 'চেরাবাণ্ডারাজু ঃ ব্যক্তিত্ব ও কবিকৃতি' গ্রন্থে (১৯৮৫)।

দুই অনুবাদক শ্রী মিত্র ও শ্রী রাও তেলুগু ভাষার শ্রদ্ধেয় কবি শিল্পী শ্রী শ্রীর নাটক অনুবাদ করেন 'কেরাণীর স্বপ্ন নামে'। এই নাটক ধীরেন্দ্র বসু সম্পাদিত 'ভারতীয় একাঙ্ক গুচ্ছ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

মার্কসবাদী লেনিনবাদী প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ বিশিষ্ট নাট্যকার মনোরঞ্জন বিশ্বাস একটি তেলুগু নাট্য প্রদর্শনী দেখে অভিভূত হন ও তাঁব নাটকে সেই প্রত্যয় গ্রহণ করেন। নাট্যকারের সেই নাটক দেখার অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যায় —

"একদিন রাতে একটা নাটক দেখেছিলুম। জায়গাটা হচ্ছে অন্ধ্রের তিরুপতি। বিপ্লবী লেখক সঙ্ঘের সম্মেলন চলছে। সারা রাত চলছে গণ সংস্কৃতি উৎসব।

আর সে যে কত দর্শক তার ঠিক ঠিকানা নেই। আর এ যে সে দর্শক নয়। একেবারে মাটি ঘেঁষা মানুষ। বলা যায় অধিকাংশই গরিব ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর, জনমুনিষ খাটা মানুয। তার সঙ্গে বয়েছে ছোট ছোট শিল্পকারখানার মজুর। আর আছে কিছু ছাত্র, যুব, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ। সব মিলিয়ে সে অনেক। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে সেই রাতের বসে থাকা। মানুষগুলোর হাতে উঁচু করা ছোট ছোট মাটির আগায় লাল পতাকা। মানুষ আব লাল পতাকা ভরা সভা। এক আশ্চর্য রূপ!

নাট্যকার হচ্ছেন অন্ধ্রের বিপ্লবী লেখক সঙ্ঘের একজন সদস্য ও নাট্যকার রুদ্রজ্বালা। নাটকটির বিষয় হচ্ছে বুদ্ধিজীবী ছাত্রযুবদের গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকযুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা ও ভূমিকা গ্রহণের প্রশ্ন। তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় পুলিশী অত্যাচার। সেই সঙ্গে প্রধান শত্রু সামন্ত প্রভু ও পুলিশের যৌথ আক্রমণ বিপ্লবী কর্মী যোদ্ধাদের ওপর। এতদিন পরেও ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি রাষ্ট্র ও সামন্ত শোষণের দৃশ্যটি। এক ধর্মপ্রাণ গরীব কৃষকের বিশ্বাসের প্রশ্ন। যে বিশ্বাস সে নিজেই নির্মাণ করেছে।

গরীব কৃষকটির ছেলে আত্মগোপনকারী বিপ্লবী। পুলিশ তাকে খুঁজছে। জোতদার

কৃষকটির দুর্বলতা জানে। তাকেই কেমন করে ব্যবহার করল, এ দৃশ্য তারই দৃশ্যায়ণ। ধর্মকে ব্যবহার করার কাহিনী।

কৃষকটিকে দেবতার মন্দিরে আনা হয়েছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। যেখানে উপস্থিত আছেন জোতদার, পুলিশ ও মন্দিরের পুরোহিত। তারা এক জোট। কৃষকটি জানায় সে জানে না কোথায় তার ছেলে আছে। যখন কোনমতেই তার কাছ থেকে সন্ধান আদায় করা গেল না, তখন পুরোহিত একটি তামার পাত্রে, মহাকালীর খাঁড়াটিকে রেখে তাকে ছুঁয়ে বলতে বলে, তুই সত্যি করে বল জানিস কিনা। তখন তার দ্বিধা। এখানেই নাট্য সঙ্কট। জীবন সঙ্কট। নীতির সঙ্কট। বিশ্বাসের সঙ্কট। ধর্মের পরীক্ষা। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারলনা, বলে দিলে কোথায় আছে তার ছেলে। তখন শত্রুরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কেমন করে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করে শাসক শ্রেণী, এ তারই ছবি। নকশালবাড়ী কেমন করে শিল্প সংস্কৃতিতে নাট্যে প্রভাব ফেলেছে এ তার এক অসামান্য প্রমাণ। আমি এতই প্রভাবিত হয়েছিলাম যে আমি এই সুন্দর তত্ত্বটিকে আমার 'একদিন দাবানল' নাটকে গ্রহণ না করে পারিনি।"[২২] 'একদিন দাবানল' নাটকটি অভিনয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৮২র শারদ সংখ্যায়।

বাংলা নাটককে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে 'ইপ্পুডু ভীস্থুন্না গালি'। এই সংকলনের আর এক গল্প রাচকোণ্ডা বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর 'বেতন শর্মার ভূমিকা'। এই গল্পের ছাপ আছে বিভিন্ন আর বাংলা নাটকে। যেমন রাধারমন ঘোষের নাটকে। সি. এস. রাও-এর 'ইপ্পুডু ভীস্থুন্না গালি' বা 'এখন যে হাওয়া বইছে' গল্পটিকে নাটকে রূপান্তরিত করেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নাটকটি মঞ্চস্থ কবেন কল্লোল সাস্কৃতিক সংস্থা, চুঁচুড়া ১৯৮২ সালে।

এস. প্রতাপ রেড্ডীর একটি গল্পকে নাট্যরূপ দেন পূর্ণশ্রী মিত্র 'প্রতীক্ষা' নামে। এটি মঞ্চস্থ হয় কলকাতায়। এর অভিনয় সম্বন্ধে আজকাল লিখেছে যে এই নাটকটি 'কন্যাকুমারীর লোককথার ওপর ভিত্তি করে লেখা। প্রেমের আকুলতা ও প্রতীক্ষা এবং ট্র্যাজিক বেদনা যা পূর্ণতা পায় মৃত্যুতে সুন্দর ফুটেছে নাটকে। সব্যসাচী বসুর গম্ভীর ও আবেগময় কণ্ঠ নাটককে ধরে রাখে, সঙ্গে সঙ্গে সমান দক্ষতায় অভিনয় করেছেন চকিতা চট্টোপাধ্যায়, উৎপল ধর ও শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়।"[২৩] নাটকটি অন্ধ্র এ্যাসোসিয়েশন জার্ণালে (১৯৮৬) প্রকাশিত হয়।

নরনারীর জীবনের জটিল সম্পর্ক ও তার শোচনীয় পরিণাম বিশেষতঃ পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের শোচনীয় জীবনচর্যা নিয়ে লেখা হয়েছে মুপ্পাল রঙ্গনায়কম্মা-র উপন্যাসে 'পেক মেড়ুলু' (তাসের প্রাসাদ)। এই উপন্যাসটি এক সংলাপী নাটিকায় রূপান্তরিত করেন দিলীপ কুমার মিত্র ও তা কলকাতার অন্ধ্র এসোসিয়েশন এ্যানুয়াল-এ প্রকাশিত হয় (১৯৮৪)। এই নাটিকাটি অভিনীত হয়। নাটকে দেখানো হয়েছে অন্ধ্রের এক মেয়ের দুঃখ বেদনার সঙ্গে বাঙালী মেয়ের দুঃখ-বেদনাময় জীবনের কি আশ্চর্য মমতা আছে। আজকাল লেখেন — "তাসের প্রাসাদ গল্পটিতে বিবাহিতা নারীর আত্মমর্যাদার সমস্যা দেশ কালের প্রভাব ঘুচিয়ে দেয়।"[২৪] কালান্তর পত্রিকায় লেখা হয় "পেক মেডলু উপন্যাসে এক সামান্য নারীর ট্র্যাজিক বেদনা দেশকালের সীমা ছাড়ায়। তাকে মর্মস্পর্শী রূপে পরিবেশন করেন শুচিস্মিতা গুপ্ত"[২৫]। বাংলা ও অন্ধ্রের জীবন ভাবনার সমত্ব এভাবেই ধরে পড়েছে বারংবার।

সূত্র পরিচিতি

১. History of Telugu Literature, G V. Sitapati, P. 263. New Delhi, 1968.
২. তেলুগু নাটক ঔর রঙ্গমঞ্চ, ডঃ কর্ণ রাজশেষগিরি রাও, পৃঃ ১৫১, এলাহাবাদ, ১৯৭৭।
৩. Landmarks in Telugu Literature, C.R. Sharma. P. 49. Madras, 1975.
৪. তেলুগু নাটক ঔর রঙ্গমঞ্চ, ডঃ কর্ণ রাজশেষগিরি রাও, পৃঃ ১৫১, এলাহাবাদ, ১৯৭৭।
৫. Marxist Cultural Movement in India (1936-1947), Ed. Sudhi Pradhan. P. 272-279, Calcutta, 1979.
৬. Indian Literature since Independence. Ed. K.R.S. Iyenger. (article – Telugu, D. Anjaneyulu, P. 334-335) New Delhi, 1973.
৭. Landmarks in Telugu Literature. C.R. Sharma, P. 50, Madras, 1975
৮. Enact, March — April 1982, Ed. R. Paul, Delhi.
৮. (ক) অন্নজীবী, রাচকোণ্ডা বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, ভূমিকা, পৃঃ ৬, নয়াদিল্লী ১৯৮৩।
৯. তেলুগু একাংকী, ইল্পাবুলুরি পাণ্ডুরঙ্গরাও সম্পাদিত, পৃঃ ২৪২, নয়াদিল্লী, ১৯৭৬।
১০. বিপ্লবী কবি সুব্বারাও পাণিগ্রাহীর সংগীত সংগ্রহ, অনুবাদ বোম্মানা বিশ্বনাথম, পৃঃ ৬-৭, কলিকাতা, ১৯৮১।
১১. Frontier, Ed. Samar Sen, Calcutta, 1983.
১১. (ক) তেলুগু নাটক বিকাশম, ডঃ পি. এস. আর. আপ্পারাও, পৃঃ ৩৭৬, হায়দ্রাবাদ, ১৯৬৭।
১২. Andhra Association Annual, 1961-1962, Calcutta.
১৩. History of Telugu Literature, G.V. Sitapati, P. 270, New Delhi, 1968.
১৪. দ্রষ্টব্য — (ক) তেলুগু নাটক বিকাশম, ডঃ পি.এস. আর. আপ্পারাও, পৃঃ ৪১১ ও ৪১৯, হায়দ্রাবাদ, ১৯৬৭।
(খ) তেলুগু সাহিত্য কোষ (খণ্ড ২) তেলুগু একাডেমী, পৃঃ ৯০৭, হায়দ্রাবাদ, ১৯৮৬।
১৫. দেশ, ২২-৯-৮৪, কলিকাতা ১৯৮৪।
১৬. শরৎচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য, ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত, (প্রবন্ধ — তেলুগু সাহিত্যে শরৎচন্দ্র, কে. ভি. রমণ শাস্ত্রী, পৃঃ ৮৪) নয়াদিল্লী, ১৯৭৬।
১৭. তদেব, পৃঃ ৫০।
১৮. The Golden Book of Saratchandra, All Bengal Sarat Centenary Committee (article – Saratchandra an evaluation, G.V. Subbaya, P. 230), Calcutta, 1977.
১৮. (ক). Ibid.
১৯. শরৎচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য, ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত (প্রবন্ধ — অনন্য কথাকার শরৎচন্দ্র, গোরেপতি ভেঙ্কট সুব্বাইয়া, পৃঃ ৪৬) নয়াদিল্লী, ১৯৭৬।
২০. পরবাস, ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রাণী ধর সম্পাদিত, শারদ সংখ্যা, হায়দ্রাবাদ, ১৯৮২।
২১. অমল রায়ের লেখা চিঠি।
২২. মনোরঞ্জন বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ, সংরক্ষিত, অভিনয় দপ্তর ও ড্রামা একাডেমী ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৮৭।
২৩. আজকাল, ২৬.১১.৮৫, কলকাতা।
২৪. আজকাল, ১৫.৪.৮৪, কলকাতা।
২৫. কালান্তর, ১৮.৫.৮৪, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

(ভারতীয় ভাষা)

বাংলা বর্ণানুক্রমিক

অসমীয়া নাট্যসাহিত্য, সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, গুয়াহাটী, ১৯৮৩।

অসমীয়া নাট্যসাহিত্যর জিলিঙনি, ডঃ হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, গুয়াহাটী, ১৯৬৮।

অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (ষষ্ঠখণ্ড), সম্পাদক হোমেন বরগোহাঞি, গুয়াহাটী, ১৯৯৩।

অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, গুয়াহাটী, ১৯৮১।

আওয়ারা মসীহা, বিষ্ণু প্রভাকর (বাংলা অনুবাদ, ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ, দেবলীনা ব্যানার্জী কেজরিওয়াল), নয়া দিল্লী।

আজকে হিন্দী রঙ্গ নাটক, জয়দেব তনেজা, নয়া দিল্লী, ১৯৮০।

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যর অভিলেখ, ডঃ নগেন্দ্র শইকীয়া সম্পদিত, জোরহাট, ১৯৭৭।

আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য, ডঃ নিত্যানন্দ শতপথী, কটক, ১৯৭৭।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৬১।

আধুনিক হিন্দী ঔর পঞ্জাবী নাটক, ডঃ সন্তোষ গার্গী, পাতিয়ালা, ১৯৭৪।

আধুনিক হিন্দী কবিতা ঔর রবীন্দ্র, ডঃ রামেশ্বর দয়াল মিশ্র, দিল্লী ১৯৭৩।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান, ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৫৭।

উদ্ভট নাট্য পরস্পরা, ডঃ বত্নাকর চইনি, কটক, ১৯৮০।

এনপাট্টনরিল তামিল (তামিল উনিশশ একাশিতে), এস ভি সুব্রমনিয়ন ও এন গডিগচলম, মাদ্রাজ, ১৯৮১।

ওড়িয়া নাটক ও নাট্যকার, নারায়ণ শতপথী, গঞ্জাম, ১৯৬৫।

ওড়িয়া নাটক ঔর রঙ্গমঞ্চ, নীলমণি মিশ্র, এলাহাবাদ, ১৯৭২।

ওড়িশা নাটক কোষ, ডঃ হেমন্ত কুমার দাস, ভুবনেশ্বর, ১৯৯৬।

ওড়িয়া নাটকরে ইতিহাসর প্রতিধ্বনি, ডঃ নীলাদ্রিভূষণ হরিচন্দন, কটক, ১৯৮২।

ওড়িয়া নাট্যসাহিত্য, সর্বেশ্বর দাস, ভুবনেশ্বর, ১৯৮১।

কন্নড় রঙ্গভূমীয় বিকাশ, এইচ কে রামনাথ, ১৯৯০।

গুজরাতী সাহিত্যনী বিকাশ রেখা, ডঃ ধীরভাই প্যাটেল, সুরাট, ১৯৫৭।

গুজরাতী সাহিত্যনো উদ্ভব অনে বিকাশ, মহেশ চোকশী, আমেদাবাদ, ১৯৬৫।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, শান্তিদেব ঘোষ, কলকাতা, ১৩৯০।

তেণ্ডুলকারেঞ্চে নাটক, ডঃ রমেশ ঘোংগড়ে, পুণে, ১৯৭৯।

তেলুগু নাটক ঔর রঙ্গমঞ্চ, ডঃ কর্ণ রাজশেষগিরি রাও, এলাহাবাদ, ১৯৭৭।

তেলুগু নাটক বিকাশম, পি এস আর আপ্পারাও, হায়দ্রাবাদ, ১৯৬৭।

তেলুগু সাহিত্য কোষ, তেলুগু অ্যাকাডেমি, হায়দ্রাবাদ, ১৯৮৬।

নাট্যচিন্তা ঃ শিল্প জিজ্ঞাসা, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭৮।

নাট্যতত্ত্ব পরিচয়, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, কলকাতা।

নৃত্য, প্রতিমা দেবী, বিশ্বভারতী, ১৯৬৫।

পঞ্জাবী নাটককার, গুরচরণ সিং, অমৃতসর, ১৯৫১।

প্রগতিবাদ ঔর সমানান্তর সাহিত্য, রেখা অবস্থী, নয়া দিল্লী, ১৯৭৮।

বজালী বিচিত্রা, অসম সাহিত্য সভা, জোরহাট, ১৯৭৮।

বিপ্লবী কবি সুব্বারাও পাণিগ্রাহীর সংগীত সংগ্রহ, অনু. বোম্মানা বিশ্বনাথম, কলকাতা, ১৯৮১।

ভারত সন্ধানে (বাংলা অনুবাদ), জহরলাল নেহরু, কলকাতা, ১৯৫০।
মঞ্চ লেখা, অতুলচন্দ্র হাজরিকা, গুয়াহাটী, ১৯৬৭।
মনসিল পাদিন্‌জা কালাডিচ্চুয়াড়ুকল (মনে আঁকা পদচিহ্ন), এস স্বামীনাথন, মাদ্রাজ, ১৯৮০।
মলয়ালম নাটক চরিত্রম, জি শংকর পিল্লা, কেরালা, ১৯৮০।
যুগে যুগে নাট্যসাহিত্য, বীর কিশোর দাস, কটক, ১৯৬৫।
শরৎচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য, ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, দিল্লী, ১৯৭৬।
সমকালীন হিন্দী নাটককার, গিরীশ রস্তোগী, দিল্লী, ১৯৮২।
সারে দে সারে নাটক, হরচরণ সিং, জলন্ধর, ১৯৬৭।
সৃজন কা সুখ দুখ, ডঃ প্রতিভা অগ্রওয়াল, নয়া দিল্লী, ১৯৮১।
স্বাধীনতা সংগ্রাম, ডঃ বিপান চন্দ্র, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী, ডঃ বরুণ চন্দ্র, নতুন দিল্লী, ১৯৮১।
ডঃ হরচরণ সিং দী নাটককলা, প্রীতম সৈনী, ১ম সং
হিন্দী ঔর গুজরাতী নাট্যসাহিত্য কা তুলনাত্মক অধ্যয়ন, ডঃ রণবীর উপাধ্যায়, দিল্লী, ১৯৬৬।
হিন্দী ঔর মরাঠীকে ঐতিহাসিক নাটক, পি আর ভূপটকর, বারাণসী, সংবৎ ২০২৭।
হিন্দী নাটক, ডঃ বচ্চন সিং, এলাহাবাদ, ১৯৫৮।
হিন্দী নাটক ঃ উদ্ভব ঔর বিকাশ, ডঃ দশরথ ওঝা, দিল্লী, ২০১৮ বিক্রমাব্দ।
হিন্দী নাটক ঃ সিদ্ধান্ত ঔর সমীক্ষা, রাম গোপাল সিংহ চৌহান, দিল্লী, ১৯৫৯।
হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, রামচন্দ্র শুক্ল, কাশী, সংবৎ ১৯৯৭।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

(ভারতীয় ভাষা)

বাংলা বর্ণানুক্রমিক

অনুবাদ পত্রিকা, বৈশম্পায়ন ঘোষাল সম্পাদিত, কলকাতা।
অভিনয় দর্পণ, ঋত্বিক ঘটক/দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা।
অসম সাহিত্যসভা পত্রিকা, জোরহাট।
আজকাল, কলকাতা।
আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা।
এপিক থিয়েটার, উৎপল দত্ত সম্পাদিত, কলকাতা।
গ্রুপ থিয়েটার, কলকাতা।
ছায়ানট, উত্তরপ্রদেশ সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, লখনৌ।
জন্মভূমি প্রবাসী, মুম্বাই।
থিয়েটার বুলেটিন, কলকাতা।
দেশ, কলকাতা।
নটরঙ্গ, নেমিচাঁদ জৈন সম্পাদিত, নয়া দিল্লী।
নাট্যলিপিকা, কলকাতা।
পরবাস, হায়দ্রাবাদ।
পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা।
প্রজাতন্ত্র, কটক।
বহুরূপী, কলকাতা।
বিশ্বভারতী দীপিকা, শান্তিনিকেতন।
বিশ্বভারতী পত্রিকা।

মধ্যাহ্ন, শৈলেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কলকাতা।
যুগান্তর, কলকাতা।
রূপকার, গুয়াহাটী।
সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য, সাহিত্য একাডেমী, নয়া দিল্লী।
সমাজ, কটক।

BIBLIOGRAPHY
(ENGLISH)
Alphabetically

Absurd Drama, Penguin Book, 1967.
Collected works, M.K. Gandhi, New Delhi.
Collected works, V.I. Lenin, Moscow.
The Dramatic Tradition in the Punjab, Dr. Harcharan Singh.
Gandhian Era in Gujrati Literature, Dr. J. Thakore, Rajkot 1955.
The Golden Book of Saratchandra, All Bengal Sarat Centenary Committee, Kolkata, 1977.
Encyclopoedia of Indian Literature, Sahitya Akademi, New Delhi.
History of Kannada Literature, R.S. Muggali.
History of Oriya Literature, Dr. Mayadhar Mansinha, Sahitya Akademi, New Delhi.
A History of Malayalam Literature, Krishna Chaitanya, New Delhi, 1971.
History of Malayalam Literature, T.P. Meenakshisundaram, Annamalai University, 1965.
History of Telugu Literature, G.V. Sitapati, New Delhi, 1968.
Indian Literature Since Independence, K.R.S. Iyenger, New Delhi, 1973.
Indian Struggle, Subhas Chandra Bose, Kolkata, 1952.
The Indian Theatre, Adya Rangacharya, New Delhi, 1971.
The Influence of the West on Punjabi Literature, Mohindar Pal Kohli, Ludhiana, 1969
Karunanidhi, Man of Destiny, S. Swaminathan, New Delhi, 1974.
Landmarks in Telugu Literature, C.R. Sharma, Madras, 1975.
Literary Encounters, Kartar Singh Duggal, Delhi, 1980.
Literary Heritage of the Tamils, S.V. Subramanian and N. Ghadichalam, Madras, 1983.
Marxist Cultural Movement in India (1936-1947), Ed. Sudhi Pradhan, Kolkata, 1979.
Modernism, Malcolm Bradbury and James Mcfarlane, Penguin Book.
The National Bibliography of Indian Literature (4 Vols.), Ed. B.S. Kesavan, Sahitya Akademi, New Delhi.
Nehru The First Sixty years, Ed. Dorothy Norman, Bombay, 1965.
New Directions in the Marathi Theatre, Dnyaneshwar Nadkarni, New Delhi, 1967.
Otakkuzhal and other poems, G.S. Kurup, Madras, 1966.

The Pelican Guide to English Literature, Modern Age, Ed. Boris Ford.
A Panorama of Theatre in India, Som Benegal, Bombay, 1968.
Playwright at the Centre, Shanta Gokhale, Kolkata, 2000.
Punjabi Literature, I Serebriakov, Moscow, 1968.
Rabindranath Tagore Birth Centerary Celebrations, Vol II. Ed. Santoshchandra Sengupta, Santiniketan.
Selected Poems of Kumaran Asan, Trivandrum, 1975.
A Survey of Malayalam Literature, K.M. George, Bombay, 1968.
Tamil Literature, Kamil V Zvelebil, Germany, 1974.
Theatre in India, Balwant Gargi, New York, 1962.
Theatre in Maharastra, K. Narayan Kale, New Delhi, 1967.
The Theatre of the Absurd, Marlin Esslin, Pelican Book, 1968.
The Tradition of Kannada Theatre, Ed. K.D. Kutkorti.
Western Influence on Malayalam Language and Literature, K.M. George, New Delhi, 1972.
Who's Who of Indian Writers, Sahitya Akademi, New Delhi, 1999.

NEWSPAPERS AND JOURNALS

(ENGLISH)

Alphabetically

Andhra Association Journal, Kolkata.
Bombay (Fortnightly Journal), Bombay.
Deccan Herald, Bangalore.
Economic Times, Bombay.
Enact, Ed. Rajinder Paul, New Delhi.
The Hindu, Madras.
The Hindusthan Times, New Delhi.
Indian Express, New Delhi.
Indian Literature, Sahitya Akademi, New Delhi.
Natya, New Delhi.
Natyakala (English and Telugu), Andhra Pradesh Sengeet Natak Akademy, Hyderabad.
Natyakala (Anamika), Kolkata.
Rangvarta (News Bulletion of Natya Sodh Sangsthan), Kolkata.
Sangeet Natak Akademi Journal, New Delhi.
The Special Bulletion of the National Book Stall. Kottayam.
The Statesman, Kolkata/New Delhi.
Theatre India, N.S.D., New Delhi.
Times of India, Bombay.

নির্দেশিকা